সূচীপত্র

Four Bestsellers
by
Harold Robins
Translated by
Shuvadeb Chakraborty & Souren Dutta

মুখবন্ধ

হ্যারল্ড রবিন্স। ক্যালিফোর্ণিয়ার পাম স্প্রিং-এর বাসিন্দা। এই কোটিপতি লেখক ঢের আগেই একটি বই লিখে দারুণ অবিশ্বাস্য সাড়া ফেলেছেন পাঠক মহলে, সে বই-এর নাম 'দ্য কার্পেটব্যাগার্স।' যদি আমার ভুল না হয় তাহলে 'দ্য ড্রিম মার্চেন্টস' ও 'দ্য ইনহেরিটার্স' ছিল ঐ বই-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিপূরক।

'দ্য কার্পেটব্যাগার্স' থেকে 'দ্য স্টোরিটেলার', এই বিশাল ব্যাপ্তির মাঝখানে রবিন্স-এর লেখা কম করে ১৮ ২০ টা বই বেস্টসেলার হয়ে আজও পাঠককুল দাপিয়ে চলেছে। .

আমেরিকা ভূখণ্ড আবিষ্কারের কথা আগাম না জানলেও যে স্বপ্নের তাড়নায় একদা কলম্বাস সেখানে পৌঁছেছিলেন তাকে 'দ্য গ্রেট আমেরিকান ড্রিম' বললে কি খুব ভুল বলা হবে ? আশ্চর্য 'দ্য কার্পেটব্যাগার্স' থেকে শুরু করে রবিন্স-এর সাম্প্রতিকতম উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো যেন সবাই একসময় হয় উঠেছে কলম্বাস-এর প্রেতায়িত অস্তিত্ব—উচ্চাশাপূরণের স্থির লক্ষে নিজেদের বারবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে যারা এগিয়ে চলেছে সোনায় মোড়া সেই অলীক ভূখণ্ডের দিকে যার কাছাকাছি নোঙ্গর ফেলতে পারলে শেষ হবে তাদের কষ্টসাধ্য সমুদ্রযাত্রা, নাকি সমুদ্র মন্থন?

আবার লক্ষে পৌঁছোনোর যে ইঁদুর দৌড়ে রবিন্স-এর গল্পের চরিত্রগুলো গোড়ায় সামিল হয়েছে পরে তা একসময় পরিণত হয় বিষাক্ত ট্যারানটুলা মাকড়সার আমৃত্যু বীভৎস নাচ অথবা ট্যানটালাস এর তৃষ্ণা বা রাহুর গ্রাসে যা কখনও মেটে না। সাফল্যের পাশাপাশি একেকটি স্বার্থসংকুল চরিত্রের অমোঘ সর্বনাশ যেন পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক ভোগবাদী সংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণু সত্তার প্রকাশ যা লাল আলোর ঝলকানি তুলে আগামি প্রজন্মের উন্মার্গগামী পাঠককে পদে পদে হুঁশিয়ার করে।

সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা আলাদাভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না, সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি যে কোন প্রাসঙ্গিক ইতিহাসকে নিষ্ঠাভরে তুলে ধরার দায়িত্ব লেখক কখনোই এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে রবিন্স এর একটি বইয়ের কথা ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে যেখানে সে শর্ত পালিত হয়েছে- - হলিউডের আদিযুগে টকি ছবি কিভাবে নির্বাক জনপ্রিয় ওয়েস্টার্ণ ছবির বাজার দখল করেছিল, 'দ্য কার্পেটব্যাগার্স' এর ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে তার এক তথ্যবহুল প্রামাণ্য দলিল। রবিন্স এর অন্তত এই একখানা বই সেদিক থেকে আমার বিচারে আমেরিকান ক্লাসিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

পৃথিবীর পাঁচজন বেস্টসেলিং ঔপন্যাসিকের নাম করলে প্রথমেই ধরতে হবে রবিন্সের নাম। প্রতিসপ্তাহে তিন লক্ষেরও বেশী বই বিক্রি হয় ওর বই। প্রেবয়ের বুক রিভিউ কলামে রবিন্স সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'একালের সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্যিক হ্যারল্ড রবিন্স। আমেরিকার সেরা গল্পকার এবং স্পেকট্যাকুলার উপন্যাসের জনক।'

আমরা এই সংকলনে জনপ্রিয়তার নিরিখে রবিন্সের যে চারটি উপন্যাস বেছে নিয়েছি তার মধ্যে তার জীবনের প্রথম উপন্যাস 'নেভার লিভ মি' তে দেখা গেছে একজন নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রেম ভালবাসা আকাঙ্খার তূন। আবার সাম্প্রতিক কালের উপন্যাস 'ডিসেন্ট ফ্রম জানাডু তে' দেখা যাবে এমন এক পুরুষকে যে নারী সঙ্গে কখনই বিমুখ নয় অথচ সে আবিষ্কার করতে চায় রমনী রমনের এমন বটিকা যা মানুষকে করবে চিরযৌবনের অধিকারী। সবশেষে '৭৯ পার্ক এভিনিউ' — রবিন্সের সবচেয়ে বেশী বিক্রিত উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। যেখানে কালচক্রে এক যৌবনবতী রূপসী বাধ্য হয়েছে পাপচক্রে নামতে।

আধুনিক ক্লাসিক সাহিত্যের অন্যতম রূপকার হ্যারল্ড রবিন্স গল্প বলার মুন্সিয়ানায় যে অদ্বিতীয় তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডিসেন্ট ফ্রম জানাডু

প্রথম অধ্যায়

❑ এক ❑

ছোট-খাটো চেহারার ডাক্তার, চোখে ঈষৎ রক্তিমাভার ইউরোপিয় চশমা, উঠে দাঁড়াল তার ডেস্ক থেকে জানালার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। মেয়েটি তাকে হাতের ইশারায় কি যেন বলল।

মেয়েটি তাকে অতিক্রম করে তার হাতের নিশানা অনুসরণ করে পায়ে পায়ে হেঁটে সবুজ ঘাস পেরিয়ে বিরাট একটা দৈত্যের মতো ঝরণার দিকে এগিয়ে গেলো।

'মিঃ ক্রেনি, ওই ঝরনাটা যে কি, আপনি কি জানেন?' তার উচ্চারণটা মধ্য-ইউরোপিয়দের মতো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। 'হ্যাঁ অবশ্যই ডঃ জ্যাবিস্কি। ওটা পোন্স ডি. লিওনের ঝরনা।'

মিঃ ক্রেনির দিকে তাকাল মেয়েটি। 'এটা একটা রূপকথা মিঃ ক্রেনি। ওটার মধ্যে বাস্তবতা কখনই থাকতে পারে না।'

'আমিও জানি ডঃ জ্যাবিস্কি,' উত্তরে বলল সে।

ডঃ জ্যাবিস্কি তার ডেস্কে ফিরে গিয়ে তার চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে থাকল মিঃ ক্রেনির জন্য, যতক্ষণ না তার উল্টোদিকের চেয়ারে এসে বসে সে।

মিঃ ক্রেনি চেয়ারে বসতেই তার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলল, 'বাঃ, আপনার চোখ দু'টো কেমন সুন্দর গাঢ় রূপোলি-নীল রঙের।

মিঃ ক্রেনির ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'আর আপনার চোখ দু'টো তো তামাটে হলুদ-বাদামী রঙের প্রায় বেড়ালের চোখের মতোন।'

সে এবার সরাসরি তার চোখে চোখ রাখল, স্থির, অকম্পন। 'যদি আপনি চিরস্থায়ী অসুখ নিয়ে এখানে এসে থাকেন মিঃ ক্রেনি,' নরম গলায় বলল ডক্টর, 'তাহলে বলব, আপনি আপনার সময় নষ্ট করছেন।'

মিঃ ক্রেনির দৃষ্টি তেমনি স্থির, অচঞ্চল রইল, কোনো বড় পরিবর্তন দেখা গেলো না। 'এরকম কথা তো আমি শুনিনি।'

'তাহলে আপনি ভুল শুনেছেন,' বলল সে।

তারপরেও তার মধ্যে অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো না। বরং নিজের উপলব্ধি বেশী করে জাহির করতে গিয়ে বলল, 'কুড়ি মিলিয়ান ডলার ভুল খবর?'

রক্তিমাভায় রাঙায়িত চশমার কাচে মেয়েটির চোখ দুটি আবার ঢেকে গেলো। 'আমার ধারণা, আমি যা শুনেছি, সবই সত্য,' বলল, সে। 'পৃথিবীর বিত্তবানদের মধ্যে আপনি একজন।'

'এখন আমি বলব,' আপনি ভুল শুনেছেন,' নরম গলায় সে এবার বলল। 'পৃথিবীতে আমিই সব থেকে ধনী।'

'ওরা সবাই আমার কাছে বাচ্চা খেলোয়াড়দের মতো,' উত্তরে বলল সে, 'আমার আঙুলের কারসাজিতে তাদের হাতের সব তাস ছিনিয়ে নিতে পারি।'

'তাহলে আপনার জন্য কেবল একটা খেলাই অবশিষ্ট রয়ে গেছে,' বলল ডক্টর, 'আর সে খেলা হলো অমরত্বলাভের খেলা।'

'এটাই সব থেকে ভালো খেলা ডাক্তার। আমরা স্পেস-গেম খেলে জিতেছি। মহাসাগরের গভীরতা মাপের খেলাতেও আমরা জিতেছি। গতি, উচ্চতা এবং গভীরতা, সব খেলাতেই আমরা জিতেছি। অর্থ, ক্ষমতা এবং সেক্স সব খেলাই তো খেললাম। আমি সেগুলো ভালবাসি, এবং সব সময়েই সেই সব খেলা খেলতে ভালবাসি। কিন্তু বাঁচার খেলায় আমি বড় হয়ে উঠতে চাই। অমরত্ব লাভ। আমিই হবো প্রথম মানুষ, যে কিনা বেঁচে থাকবে চিরদিনের জন্য।'

'তার মানে আপনার চাহিদা খুব বেশী নয়, আপনার চাহিদা কেবল এমন কিছু, যা অন্যেরা অধিকার করতে পারে না।' মিঃ ক্রেনির চোখ দু'টো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকে সে। তার চোখের দৃষ্টি কিংবা ভাবাবেগের কোনো পরিবর্তন হতে দেখা যায় না। 'কিন্তু আমি যদি বলি এগুলোর কোনোটাই আমি জয় কতে পারিনি, আপনি বিশ্বাস করবেন?'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি,' বলল সে।

একটু ইতস্তত করে মহিলাটি। 'তাহলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমার কাছ থেকে কি আপনি চান?'

'কিছুই না।' শান্ত গলায় বলল সে। 'আবার সবকিছুও বটে! এমন একটা কিছুর এতো কাছে এসে গেছেন যা আমার একান্ত কাম্য।'

'কয়েকটা কেসে আমি সাফল্য পেয়েছি, যেমন বৃদ্ধদের অসুখের চিকিৎসা করা, তাদের রোগ যন্ত্রণা হ্রাস করা ইত্যাদি। তবে তাই বলে এই নয় যে, বৃদ্ধদের অসুখের চিকিৎসা এবং সেই অসুখ আমি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের করায়ত্ব করতে পেরেছি। আর সেটা কখনোই অমরত্ব লাভ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না।'

'কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোককে আপনি সাহায্য করেছেন,' বলল মিঃ ক্রেনি।

ঠোঁটে সামান্য একটু স্মিত হাসি ফুটিয়ে বলল সে, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য সত্য। যেমন জার্মানি থেকে এসেছিলেন ডারঅ্যালটি, রোমের পোপ, এমন কি মস্কো থেকে স্বয়ং স্ট্যালিনও এসেছিলেন। সাময়িকভাবে তাঁদের সব রোগ-যন্ত্রণার উপশম করলেও শুধু সেই সময়টার জন্য, চিরদিনের জন্য নয়। পরে নির্দিষ্ট সময় মতোই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে তাঁদের।'

'কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা সবাই এখানে এসেছিলেন। এবং কিছু না কিছু পেয়েছিলেন তাঁরা।'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সাড়া দিলো ডঃ জ্যাবিস্কি। 'প্রতিটি ক্ষেত্রে বয়স তাঁদের যাইহোক না কেন তাঁদের জীবনের মান অনেক ভালো ছিলো।'

'মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে?' প্রশ্নের থেকে সেটা যেন অনেক বেশী এজাহার স্বরূপ।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরতে তাঁদের হয়েছে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আদৌ আমার চিকিৎসায় সাড়া দেননি। তাঁদের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনি।'

'আর যদি আমি আপনার চিকিৎসায় সাড়া দিই, আমি কি আশা করতে পারি?'

'গড়পড়তায়?' মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবল ডঃ জ্যাবিস্কি। 'তা আপনার বয়স তো এখন বিয়াল্লিশ হবে, তাই না?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় সে। আট বছরে ১৯৪৪ সালে, আমার চিকিৎসার গুনে পঞ্চাশ বছর বয়সে আপনাকে দেখাবে ঠিক পঁয়তাল্লিশ: অনুরূপ ভাবে ষাট বছর বয়সে বাহান্ন, হয়তো আশিতে ষাট বছরও দেখাতে পারে, আবার সম্ভবত চৌষট্টি থেকে ছেষট্টিও দেখাতে পারে।' একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল, 'অবশ্য ধরে নিতে হবে, এই প্রোগ্রামের শেষ পর্যন্ত আপনি অবশ্যই অনুসরণ করবেন।'

'তার মানে আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, এ একটা সারা জীবনের কর্মসূচী বলা যায় মিঃ ক্রেনি,' মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দেয় ডঃ জ্যাবিস্কি। 'শুরুতে আমাদের চিকিৎসায় আপনার শরীর বা স্বাস্থ্য সায় দেয় কিনা, সেটা দেখার জন্য এখানে আপনাকে দু'মাস থাকতে হবে। আর সে রকম সম্ভাবনার আভাষ পেলে তখন প্রতি তিনমাস অন্তর পরবর্তী চিকিৎসার জন্য এক সপ্তাহ থাকতে হবে আপনাকে।'

হাসল সে, তবে সে হাসি অখুশির নয়। 'হয়তো অনেক দিন আগেই আমি মারা যেতে পারি। কিন্তু সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, চিকিৎসা চালু থাকবেই।'

'এখানে থাকা, যাতায়াত করা, সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, বছরে ছ'মাস সময় আমাকে খরচ করতে হচ্ছে। আচ্ছা, আমার বাড়িতে বসে চিকিৎসা করার কোনো রকম সুযোগ আছে?'

মাথা নেড়ে ডক্টর তার জবাবে বলল, 'মিঃ ক্রেনি, আমি দুঃখিত। এই কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে টানা তিরিশটা বছর আমার সময় লেগেছে আর এ ধরণের কমপ্লেক্স পৃথিবীতে একটাই আছে।'

'কিন্তু আমি যে শুনেছি ডকট্রেস আসলাম, ফিলাটভ এবং নিয়েরহানস্, এঁরা সবাই তাঁদের চিকিৎসা বাইরে ছড়িয়ে দেন,' বলল মিঃ ক্রেনি। 'আর তাদের চিকিৎসাগত কিছু পদ্ধতি আপনাদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।'

স্বীকার করল সে, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।'

'তাহলে আপনাদের চিকিৎসার পদ্ধতিতে এমন কি গোপন উপাদান আছে, যা কিনা এখানে, এই কমপ্লেক্স থেকে পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও চালান করা যায় না?'

ডঃ জ্যাবিস্কির ঠোঁটে অর্ধস্ফুটিত হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'মিঃ ক্রেনি, যেমন আপনি বললেন, গোপন উপাদান, সে তো— আপনি।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কিন্তু মিঃ ক্রেনি, আমি মনে করি,' বলল সে, 'আপনি ঠিকই বুঝেছেন।'

'সব পদ্ধতিই আমার জানা,' খোলাখুলি ভাবেই বলল সে, 'আমি জানি, আসলামের প্রোকেন, ম্যাগনেসিয়াম এবং খনিজ পদার্থ, ফিলটভের টাটকা গর্ভের ফুল যা অন্যের দেহের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়, এবং নিয়েরহানস্-এর ইনজেকসান দেওয়া অজাত ভেড়ির জীবকোষ, এ সবই আপনি একত্রে মিশিয়ে থাকেন। এমন কি এক এক সময় আমি ভাবি, এগুলো সব আপনি একটা ফরমূলায় তৈরী করে থাকেন। আর সেই কারণেই কি এখানে একটা গোপন উপাদান লুকিয়ে আছে!'

'মিঃ ক্রেনি, আপনি আমার কথাটা ঠিক শোনেননি,' ধৈর্য সহকারে বলল সে। 'আমি আপনাকে আগেই বলেছি, সেই গোপন উপাদান আপনি, হ্যাঁ আপনিই!'

ইচ্ছে করেই সে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ওদিকে ডঃ জ্যাবিস্কি তখন নীরব। ডঃ ক্রেনির কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নেমে এলো।

'তার মানে দেহের নিজস্ব রিজারভার থেকে জীবন্ত গর্ভের ফুলের জীবকোষগুলো স্থাপন করা?' তার ঘন নীল চোখের রঙ আকাশ-নীলে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। তার সেই নীল চোখে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে। 'মানুষের ক্ষেত্রে কখনোই সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়।'

ডঃ জ্যাবিস্কির জীবনে সেই প্রথম ভয়ের উদ্রেক হতে দেখা যায়। তার সারা দেহে একটা শীতল হিমবাহের স্রোত যেন বয়ে যায়। তার কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা। 'শুনুন মিঃ ক্রেনি, আপনি ছাড়াও আমাকে এখন আরো অনেক রোগীকে দেখতে হবে। তাই ভাবছি, কাল বরং আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যেতে পারে।'

'আগামীকাল,' একটু চিন্তা করে বলল সে, 'আমি পিকিং-এ থাকব।'

'তাহলে অন্য কোনো একদিন,' বলল ডঃ জ্যাবিস্কি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিঃ ক্রেনি। 'তাহলে দেখছি, কুড়ি মিলিয়ান ডলার যথেষ্ট নয়,' বলল সে। 'পঞ্চাশ মিলিয়ান ডলার? যথেষ্ট বলে মনে হতে পারে, তাই না?'

তার দিকে তাকিয়ে বলল ডঃ জ্যাবিস্কি, 'মিঃ ক্রেনি আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না, টাকাটাই বড় নয়। তাছাড়া এটা একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ। এখানকার সব কিছুই সরকারের।'

'বেশ তাহলে 'অর্থ' শব্দটা ভুলে গিয়ে বরং তার পরিবর্তে 'অগ্রাধিকার' শব্দটা বসিয়ে দিন,' বলল সে। 'প্রতিটি দেশের নিজস্ব একটা অগ্রাধিকার এবং নিজস্ব ফরমান আছে।'

'মিঃ ক্রেনি, আপনি আমাকে হারালেন,' বলল সে।

হাসল ক্রেনি। 'ডঃ জ্যাবিস্কি, আপনি একজন চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক এবং আপনি আপনার পেশা সম্পর্কে বেশ ভালই বোঝেন, এখন দয়া করে যদি আপনি আমাকে অনুমতি দেন তো বলি, আমার পেশা হলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করা।' এই বলে সে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। 'ডঃ জ্যাবিস্কি, আপনার মহামূল্যবান সময় থেকে আমার জন্য কিছু খরচ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ডঃ জ্যাবিস্কির হাতটা বেশ দৃঢ় এবং উষ্ণ। 'মিঃ ক্রেনি, আমি সব সময় নিজেকে আপনার

সেবায় নিয়োজিত করতে চাই,' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হাসল ডক্টর, যদিও তার সেই হাসিটা ঠিক পছন্দ হলো না মিঃ ক্রেনির। যাইহোক, দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল, 'গুডবাই মিঃ ক্রেনি।'

খোলা দরজাপথে দাঁড়িয়ে বলল ক্রেনি, 'ডঃ জ্যাবিস্কি, আপনি একজন মহান মহিলা।'

জুড চলে যাওয়ার পরেই ডঃ জ্যাবিস্কির ব্যক্তিগত চেম্বারের দরজাটা খুলে যায়। সে তার ডেস্কের পিছনে চলে যাওয়ার আগেই বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী এবং কাঠিন্যে ভরা মুখের এক রুশ ভদ্রলোক পৌঁছে গেলো সঙ্গে আকর্ষনীয়া এক যুবতী মহিলা, পরনে সাদা ল্যাবরেটারি কোট। তাকে অনুসরণ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

জ্যাবিস্কি তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা বলো?'

'শূয়োরের বাচ্চা, অহংভাবে পরিপূর্ণ! ভাবখানা এই যে, টাকা দিয়ে সব কিছু কিনতে পারে সে।'

যুবতী রুশ ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমার তো মনে হয়, ভদ্রলোক খুবই আকর্ষনীয় এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান।'

এবার রুশ ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে জ্যাবিস্কি বলল, 'কমরেড নিকোলাই, তুমি ওভাবে ওঁকে হেয় করো না। উনি অত্যন্ত স্মার্ট। দেখলে না কেমন তাড়াতাড়ি সে আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতিটা উপলব্ধি করে নিলো!'

'তাতে কিছু এসে যায় না কমরেড ডাক্তার,' উত্তরে বলল নিকোলাই। 'যাতে সে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে না যায়, সে ব্যাপারে অবশ্যই তোমাকে নিশ্চিত হতে হবে।'

'আমাদের কাছে তার এতো গুরুত্বই বা মনে হলো কেন তোমার?' জ্যাবিস্কি জিজ্ঞেস করল। 'সে যে আমাদের ক্লিনিকের আর পাঁচটা রোগীর মতো, এ কথা কেন মনে করছ না?'

জ্যাবিস্কির দিকে তাকাতে গিয়ে তার চোখে পলক পড়ে না। কথা বলার সময় তাকে ঠিক শিশুর মতো মনে হয়। 'সারা বিশ্বের ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে ক্রেনি ইন্ডাষ্ট্রিজই সব থেকে বড় শুধু নয়, আমেরিকান সরকারের সব থেকে বৃহৎ সরবরাহকারী একটি প্রতিষ্ঠান।'

'বহু বছর ধরে এই কোম্পানি এক্সিকিউটিভ পর্যায়ে সবার অলক্ষ্যে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল সে কিন্তু সম্ভব হয়নি। কারণ জুড ক্রেনি নিজেই সেখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা, সব ব্যাপারে সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সেখানে। আমেরিকান সরকারের কূটনীতি এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সে যা জানে, সম্ভবত সে দেশের স্বয়ং প্রেসিডেন্টও বোধহয় জানেন না। আর তুমিও তার থেকে কম বিচক্ষণ নও।'

স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল ডঃ জ্যাবিস্কি, 'তুমি যদি আমাকে সেই রকম লোক ভেবে থাকো, তুমি তাহলে মস্ত বড় ভুল করছ। আর সে যদি চায়, তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমি কাজ করি, সেটাও অসম্ভব। আমার এখন যে বয়স, শারীরিক দিক

থেকে তার সঙ্গে তাল দিয়ে আমি চলতে পারবো না।'

'না, আমরা তোমাকে তা করতে বলছি না। আমরা শুধু চাই, তুমি যে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাও, সেটাই তাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করো। এক্ষেত্রে সোফিয়াকে তোমার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করাতে হবে। বৃদ্ধ বয়সে কি ভাবে যৌবন ফেরানো যায়, একজন চিকিৎসক হিসেবে সেই বিদ্যাটা তার বেশ ভালভাবেই জানা আছে এবং এক্ষেত্রে তুমি যে ভাবে তার চিকিৎসা করতে চাও, সেই পদ্ধতিটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে ওয়াকিবহাল সে।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'তার কথার ধরণ দেখে আমার মনে হয়েছে, তোমার সব রকম পরামর্শই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যাবে সে।'

চকিতে তার দিকে ফিরে সোফিয়া বলে উঠল, 'নিকোলাই হয়তো ভেবে থাকবে, আমি খুবই অল্প বয়স্কা যুবতী একজন।'

হাসল নিকোলাই। 'বোকার মতো কথা বলো না সোফিয়া। বছর তিরিশ বয়স কি যুবতীর পর্যায় পড়ে না? তাছাড়া তুমি এখনো একজন সুন্দরী মহিলা এবং তুমি বেশ ভালোকরেই জানো, কি ভাবে তোমার এই সৌন্দর্য ব্যবহার করা যায়, অল্প সেক্স অপচয় করে কি ভাবে প্রয়োজনীয় কাজ হাঁসিল করা যায়। আর এরকম কাজ তুমি কিছুদিন আগেও করেছিলে। শুরুতেই তোমার কাজ হবে তার ভেতরের উদ্ধত জানোয়ারকে বশে এনে তাকে বাগে নিয়ে আসা।'

'আমার কাছে সহজে ধরা দেওয়ার মতো সেরকম বোকা সে নয়,' বিরক্ত হয়ে বলল সোফিয়া।

'তার হোটেল অ্যাপার্টমেন্ট আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি,' বলল সে। 'তার সেক্রেটারির ঘরে তার জন্য তিন তিনটি যৌনকর্মীকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে দেখেছি। অবশ্যই তারা আমাদের কর্মচারিণী, কিন্তু সে তা জানে না।'

'তা তুমিও কি আমাকে সেই রকম একজন ভাবো নাকি?' ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল সোফিয়া। 'স্রেফ আর একজন পেশাদার যৌনকর্মীর জন্ম দেওয়া, এই তো?'

দ্রুত তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল নিকোলাই, 'আমি বলি কি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্রেনির সঙ্গে তুমি দেখা করো,' কথাটা সে ডঃ জ্যাবিস্কির উদ্দেশে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা করব কমরেড নিকোলাই,' বলল ডঃ জ্যাবিস্কি।

তারপর সোফিয়ার দিকে ফিরে বলল সে, 'দেখো সোফিয়া, তার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ হওয়াটা খুবই জরুরী।'

চকিতে একবার তার দিকে তাকাতে গিয়ে সোফিয়ার দু'চোখ দিয়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ডাক্তারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো সে।

করিডর পেরিয়ে সোফিয়া তার ওপর-তলার ঘরে এসে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, একবারের জন্যও পিছন দিকে ফিরে তাকাল না। এক সময় সে তার কাঁধের ওপর পুরুষের বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ অনুভব করল। তবুও পিছন ফিরে তাকাল না সে।

'তোমার এ-দশা কতদিনের সোফিয়া?' রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করল পুরুষটি।

'আট বছর,' তিক্তস্বরে বলল সোফিয়া। 'কিন্তু এখনো পর্যন্ত একাটেরিনার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রয়েছ তুমি।'

'সোফিয়া, আমি তো তোমাকে কতবার বলেছি,' উত্তরে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে সে বলল, 'ওর বাবা এখনো পলিটব্যুরোয় রয়েছে। অতএব বুঝতেই পারছ, ওকে ডিভোর্স করলে আমার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই অ্যানড্রোপোভ যতক্ষণ না নিজের থেকে সরে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা তো আমাকে করতেই হবে। আর তারপরেই আমি স্বাধীন, মুক্ত, তখন আমরা দু'জনে এক সঙ্গে মিলিত হতে পারব।'

তখনো নীরবে সিগারেটে টান দিতে থাকে সোফিয়া।

তার হাত দু'টো সোফিয়ার পিঠের ওপর দ্রুত ঘোরাফেরা করতে থাকে। এক হাত দিয়ে সে তার সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে তার বুকে টেনে নিলো। তারপর অন্য হাত দিয়ে পিছন থেকে সে তার স্কার্টটা তুলতে থাকে। মোজার ওপর থেকে তার উরু এবং নিতম্ব সম্পূর্ণ নগ্ন। সোফিয়ার দুই উরুর মিলনস্থানে তার হাতটা থেমে গেলো। 'তোমার এখানটা ভিজে ভিজে ঠেকছে,' নীরস গলায় বলে উঠল সে।

তখনো এক চুলও নড়ল না সে। 'আমি সব সময়েই সিক্ত,' সোফিয়া অনুরাগে উদ্দীপ্ত হয়ে বলল।

সোফিয়া তার ট্রাউজারের বোতাম খোলার শব্দ শুনতে পেলো, তারপর এক হাত দিয়ে পিছন থেকে নিতম্ব চেপে ধরে জানালার কপাটের ওপর ঝুঁকে পড়ল, সোফিয়া তার দেহের প্রচণ্ড ভার অনুভব করল। পরমূহূর্তেই সে তার বিরাট এবং কঠিন বস্তুটা তার অভ্যন্তরে অনুভব করল, ক্রমশ সেটা শক্ত হয়ে উঠছে এবং প্রতি পদক্ষেপে বাধা অনুভব করছে। প্রচণ্ড চাপে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল সোফিয়ার, হাঁ করে শ্বাস নিতে গিয়ে তার মুখের সিগারেটটা খসে জানালার বাইরে পড়ে গেলে, দেহের ভর নেওয়ার জন্য জানালার কপাটের ওপর হাত দু'টো চেপে ধরল। আবার হাঁ করল সে। তার গলা থেকে বেড়ালের মিঁউ মিঁউ শব্দ বেরিয়ে এলো।

ওদিকে সোফিয়ার কোমরের ওপর হাত দু'টো ভারী পাথরের মতো চেপে বসছিল তখন এবং সে নিজে তখন হাতুড়িপেটার মতো তার কোমরটা ওঠা-নামা করাচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বর তখন উচ্চগ্রামে, সে তার পৌরুষপতাকা উত্তোলনের আনন্দে উদ্বেলিত তখন। 'তুমি, তুমি এখনো এরকম সুখের সাগরে ভেসে যেতে ভালোবাস, ভালোবাস না?'

প্রথমে উত্তরে দেয় না সোফিয়া শ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁ করে গোঙাতে থাকে।

সোফিয়ার নরম নিতম্বের ওপর সে তার আঙুলের নখ দিয়ে বিলি কাটতে থাকে। 'নরক ভোগ কর!' চিৎকার করে উঠল সে। 'তা না হলে বলো, তুমি, তুমি এখ্নো এরকম সুখের সাগরে ভেসে যেতে ভালোবাস, ভালোবাস না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, আমি ভালোবাসি!' অবশেষে সোফিয়া তার নীরবতা ভঙ্গ করে তার মনের কথাটা বলে ফেলল, সে তখন যুগপত যন্ত্রণা এবং এক অপূর্ব স্বর্গসুখের আবেশে প্রায় গোঙাচ্ছিল। 'হ্যাঁ, এমনি সুখের সাগরে ভেসে যেতে আমি ভালোবাসি, এমনি

এক স্বর্গীয় সুখ আমি আশা করে বসেছিলাম তোমার কাছ থেকে। এ সুখ থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না কখনো, আমাকে ছেড়ে যেও না কখনো প্লিজ—'

❑ দুই ❑

এলিভেটার থেকে বেরিয়ে হেঁটে পেন্টহাউসের ডাবল দরজার সামনে এসে বোতাম টিপল জুড। বন্ধ দরজার ওপারে ঘন্টার শব্দটা প্রতিধ্বনিত হলো। কয়েক সেকেন্ড পরেই ফার্স্ট এডি দরজা খুলে দিলো, তার হাতে ব্লু-ব্ল্যাক কোল্ট পয়েন্ট ফরটিফাইভ অটোমেটিক।

অ্যাপার্টমেন্টের পথে তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে ছোটখাটো বেঁটে কৃষ্ণকায় লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল জুড। 'ওই জিনিষটা তুলতে গিয়ে দেখবে একদিন না একদিন তুমি ঠিক হারনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছ।'

সেফটি লক্ করার পর অটোমেটিকটা ফাস্ট এডি তার কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল। 'বিশ্বের বিস্ময় যুগোশ্লাভিয়া,' উত্তরে বলল সে। 'এমন কি টয়লেটের নিচে আরসোলা রাখা হয়।' মাথা নাড়ল জুড। 'এই হলো জীবন। কিছু কিছু লোক আছে যাদের কোনো শ্রেণী নেই।' বসবার ঘরে ডেস্কের সামনে গিয়ে থামল সে। সেখানে একটা অ্যাটাচিকেস রাখা ছিল। কম্বিনেশন লকগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে ফেলল সেটা। ভেতরের ব্রোঞ্জের ফলকটা লাল ও সবুজ ঝিলিমিলি দিয়ে ঢাকা ছিলো। 'দেখতে ঠিক খৃষ্টমাস গাছের মতো।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় ফাস্ট এডি।

ফলকের সুইচটা ঘুরিয়ে তিনবার চাপ দিলো সেটার ওপর। হঠাৎ ঝিলিমিলিগুলো হলুদ রঙে পরিণত হয়ে গেলো। হাসল জুড। 'অবাক হচ্ছি, আরসোলারা কানের পর্দা ভেঙ্গে ফেলেনি তো?'

ফাস্ট এডিও হেসে উঠল। 'সেটা আমার ডিপার্টমেন্ট নয় বস। মনে রাখবেন, আমি আপনার একজন সাজভৃত্য মাত্র।'

'তাহলে আমার জন্যে ড্রিঙ্ক নিয়ে এসো,' বলল জুড। 'অ্যাটলান্টা চেরি, কোকা-কোলা, সঙ্গে একটু বেশী করে বরফের টুকরো, বুঝলে?'

ড্রিঙ্কস হাতে ফিরে এলে ছোটখাটো মানুষটি, কোমরে অটোমেটিকটার দিকে তাকিয়ে জুড জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এতো স্নায়ু দুর্বলতার কারণ কি জানতে পারি?'

'কাজের লোড অত্যন্ত বেশী বলে,' ছোটখাটো মানুষটি গ্লাসে ড্রিঙ্ক ভর্তি করে আইসকিউব ঢালতে গিয়ে বলল, 'যেমন ধরুন, তিনজন পরিচারিকা, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার একজন, দু'জন জানালা সাফ করার লোক, একজন ইলেকট্রিসিয়ান, দু'জন টেলিফোনের লোক। এই তো সবে শুরু, ও'হারার এয়ারপোর্টের মতো।'

শুনে জিজ্ঞেস করল জুড, 'এই সুইটে ক'টা ঘর আছে?'

'পাঁচটা।'

জুড তার অ্যাটাচি কেস থেকে একটা ছোট ট্রান্সফর্মারের মতো বাক্স বার করে ডেস্কের ওপর রাখল। বোতাম টিপে বলল সে, 'তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নাও।'

ফার্স্ট এডি তার কোমরের বেল্ট থেকে অটোমেটিকটা টেনে হাতে নিয়ে নিলো। ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে জুডকে অনুসরণ করল সে। প্রতিটি ঘরের ভেতরে নিভৃত কক্ষের দরজার সামনে বাক্সটা স্থাপন করল জুড।

'এ একটা নতুন পন্থা,' বলল, ফাস্ট এডি।

'একেবারে আনকোরা নতুন,' বলল জুডি। 'এ একটা হিট স্ক্যানার, বডি হিটের জন্য অন করা আছে। ঘরের ভেতরে যদি কেউ থেকে থাকে দরজা না খুলেই এটার অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে।'

'গ্যাগডেট?' জিজ্ঞেস করল ফাস্ট এডি। 'এর থেকে আমরা কি কি জানতে পারি?'

'এক মিনিট,' উত্তরে জুড বলল। মুহূর্তের জন্য বক্সের কাঁটাটা নিরীক্ষণ করল সে। 'আমরা কিছুই করতে পারব না। এই লোকটির দেহের তাপ এখনি ৯৮.২। এমন এক নিভৃত কক্ষে একজন এজেন্টকে অন্তরীন রাখাটা তাদের বোকামো। তার ওপর সে একজন হার্টের রোগী, সামান্য শক্ পেলেই হার্টফেল করে মারা যেতে পারে।'

তারপর বসার ঘরে ফিরে এসে সে তার অ্যাটাচিকেসের মধ্যে হিট স্ক্যানারটা রেখে দিলো। ফাস্ট এডির দিকে ফিরে বলল সে. 'অতঃ কিম?'

ফাস্ট এডি তার গলা থেকে সোনার চেনটা খুলল। সোনার চাবি দিয়ে সোনালি শিশিটা খুলল এবং সতর্কতার সঙ্গে জুডের দিকে এগিয়ে দিলো সেটা। দু'টি সুখ-চুমুক দিলো জুড।

তার দিকে করুণ চোখে তাকাল ফাস্ট এডি। 'আমি এখনো ভয়ে কাঁপছি। একঢোক আমিও কি খেতে পারি?'

'অবশ্যই, আমার অতিথি হয়ে।'

'ধন্যবাদ,' বসের দিকে তাকাল সে। 'আর একটা কোকাকোলা চাই তো?'

'আমার তাই মনে হয়,' বলল জুড।

এরই ফাঁকে টেলিফোনটা বেজে উঠল। এডি বার-এর দিকে এগিয়ে যেতেই রিসিভারটা তুলে নিলো জুড। 'হ্যাঁ, ক্রেনি কথা বলছি।'

'মিঃ ক্রেনি, আমি ডঃ জ্যাবিস্কি বলছি। আমাদের আলোচনার পর আমি আরো ভেবে দেখলাম—'

'হ্যাঁ, ডাক্তার, বলুন কি ভাবলেন?'

'যদি আপনার সুবিধে হয়, তাহলে আজ রাত ন'টায় আপনার হোটেলে আমি দেখা করতে পারি।'

জুড তার কব্জি-ঘড়ির দিকে তাকাল, সন্ধ্যা ছ'টা তখন। 'হ্যা ডাক্তার, সময়টা আমার খুবই উপযোগি হবে। তা আপনি আমার সঙ্গে আজ নৈশভোজে মিলিত হলে কেমন হয়?'

'আমার সঙ্গে আমার একজন সহকারীও থাকবে।'

'বেশ তো, তাতে কি হয়েছে, স্বচ্ছন্দে তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

'ধন্যবাদ মিঃ ক্রেনি। তাহলে ওই কথা রইল।'

'ধন্যবাদ ডাক্তার।' রিসিভার নামিয়ে রেখে এডির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল সে, 'মারলিন কোন্ ঘরে যেন থাকে?'

'টেন-ও-নাইন। আমাদের নিচের তলায়।'

সেই ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করল জুড। তার সহকারী উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, বলুন মিঃ ক্রেনি?'

'পোরটোফোনটা সঙ্গে নিয়ে তুমি একবার এখানে চলে আসতে পারো এখনি?' বলল জুড।

'কিন্তু স্যার, এখনো যে তিনজন সেক্রেটারির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার বাকী রয়েছে—'

'তাদের জন্যে এখন আমাদের এক মুহূর্তও সময় নেই,' বলল জুড। 'ওদের বিদায় করে এখনি চলে এসো!'

'ঠিক আছে মিঃ ক্রেনি। আমি এখনি যাচ্ছি।'

একটু পরেই মারলিন এসে ঘরে ঢুকল, তার হাতে পোরটোফোনের অ্যাটাচিকেস। জুডের ডেস্কের সামনে এসে বলল সে, 'মিঃ ক্রেনি, আপনার বার্তা আমি পেয়েছি।'

'ধন্যবাদ মারলিন।' তার অ্যাটাচিকেসটা নিয়ে অপর অ্যাটাচিকেসটা তাকে ফিরিয়ে দিলো। সে তার সহকারীর কাছ থেকে বার্তার বান্ডিলটা হাতে নিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেনকে বলো, মাঝ রাতের কিছু পরেই আমরা এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকব।'

'ঠিক আছে মিঃ ক্রেনি।' মারলিন যখন অ্যাটাচি কেসটা খুলে পোরটোফোনটা বার করছিল তারই ফাঁকে বার্তাগুলো পড়ে নিতে থাকে জুড। ওদিকে ক্যাপ্টেনের কথা শোনার পর জুডের দিকে ফিরে বলল সে, 'ক্যাপ্টেন বললেন, মাঝপথে তেল নেওয়ার জন্যে আমাদের যাত্রার বিরতি ঘটাতে হবে।'

'দেখি ফ্লাইটে যথেষ্ট পরিমান তেলের ব্যবস্থা করা যায় কিনা,' বলল জুড। 'কারণ যদি আমরা মাঝপথে থামি, দু'তিন ঘন্টা সময় নষ্ট হয়ে যাবে।'

বার্তাটা রিলে করার পর পোরটোফোনটা নামিয়ে রাখল মারলিন। 'ক্যাপ্টেন বললেন, তেলের ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি।'

'ভালো।' জুড এবার মারলিনের উদ্দেশে বলল, 'তাহলে কালকের ফ্লাইটেই আমরা যাচ্ছি। আজ রাত ন'টায় ডঃ জ্যাবিস্কির সঙ্গে আমার একটা সাক্ষাৎকার আছে। এই হোটেলের রেস্তোরাঁয় একটা টেবিলের ব্যবস্থা করে রাখো। তার আগে আমি একবার স্নান করে নিতে চাই।'

'আর কিছু আপনার বলার আছে স্যার?' জিজ্ঞেস করল মারলিন।

'না, আমার মনে হয়, এই যথেষ্ট। আমি যখন নৈশভোজে যাবো, তখন তুমি ফাস্ট এডিকে সঙ্গে নিয়ে প্লেনে ফিরে যেও। রেস্তোরাঁ থেকে আমি সোজা চলে যাবো।'

'সাদা শার্ট, কালো টাই, আর সুট, এই তো মিঃ ক্রেনি?' এবার প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো ফাস্ট এডি।

ন'টা বাজতে তখন দশ মিনিট বাকী, ডঃ জ্যাবিস্কির জন্য অপেক্ষা করছিল তারা। লিমুসিন গাড়ি থেকে ভ্রমণের উপযোগি কতকগুলো ব্যাগ বেলবয়কে নামাতে দেখল মারলিন এবং ফাস্ট এডি। 'পোরটোফোনটা আমার সঙ্গে রাখছি,' বলল জুড। মাথা নাড়ল

মারালিন, অপর অ্যাটাচিকেসটা তার হাতে ঝুলে থাকতে দেখা গেলো।

'আপনার স্যুইটের ব্যাপারে আমি খুবই চিন্তিত,' ফাস্ট এডি তার বসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে আপনিও যদি আসতেন, ভালো হতো।'

'বারো মিলিয়ান লোক বলে থাকে, এটা কোনো সমস্যাই নয়,' উত্তরে বলল জুড। 'জ্যাবিস্কি কেন যে পত্রপাঠ সাড়া দিলো, 'একথা কেন তুমি বুঝতে পারছনা আমার সঙ্গে আলোচনা চালানর জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই এতে আমার চিন্তার কিছু নেই।' স্বয়ংক্রিয় দরজার দিকে তাকিয়ে সে আবার বলে উঠল, 'ওই যে, ও এখন আসছে—ঠিক আছে, তোমাদের দু'জনের সঙ্গে বিমানে দেখা হবে। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডঃ জ্যাবিস্কির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেলো জুড।

ডঃ জ্যাবিস্কির পিছন পিছন এগিয়ে আসছিল এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। সোনালি চুল, পরনে একটা সেক্সি চ্যানেল সুট। তার দেহের অনুভূতি-প্রবণ স্থানগুলো সেই স্বচ্ছ পোশাক ভেদ করে যেন অতি নগ্ন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। এই মুহূর্তে ফাস্ট এডির সতর্ক-বানীর কথা মনে পড়ে গেলো ক্রেনির, যুগোস্লাভিয়ান প্রধান।

❑ তিন ❑

ডঃ জ্যাবিস্কি তার সহকারিণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

'গত দু'বছর ধরে ডঃ আইভানসিক আমার প্রথম সহকারিণী হিসেবে কাজ করছে।' বলতে থাকে সে। 'তার আগে জর্জিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে জেরানটলজির একজন সহকারী প্রফেসার হিসেবে বছর দু'য়েক কাজ করেছিল। তারও আগে মস্কোয় সোভিয়েট অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে বছর দুই জেনিয়াট্রিক স্টাডির ডাক্তার ছিলো। আর তারও আগে বছর দুই বাল্টিমোরে ন্যাশানাল ইনস্টিটুটে বিশেষ অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলো। নিউইয়র্কের কলম্বিয়া মেডিক্যাল স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট।'

তার কথা শেষ হওয়া মাত্র যুবতীর দিকে তাকাল জুড। 'আমি প্রভাবিত।' তার কথায় আন্তরিকতা ছিলো। 'এই অল্প বয়সে ডঃ আইভানসিক দেখছি অনেক ভালো ভালো কাজ করেছে।'

আমেরিকান সুরে ইংরিজীতে বলে উঠল সুন্দরী, 'মিঃ ক্রেনি, আপনি বোধহয় ভুল করছেন, আমার বয়স খুব একটা কম নয়।' নরম গলায় সে আরো বলল, 'আমার বয়স এখন তিরিশ।'

'তিরিশ! সে এমন কি বেশী, তরুণীই বলা যায়,' হাসতে হাসতে বলল জুড।

টেবিলে খাবার সাজাতে থাকে ওয়েটার। সে চলে যেতেই ডঃ জ্যাবিস্কির দিকে ফিরে জুড আবার বলল, 'ফোনে আপনি বলেছিলেন, আমাদের আলোচনার পর আপনি নাকি আরো ভেবেছিলেন, তা আপনার সেই ভাবনাটা কি জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! যদি আপনি আমার চিকিৎসায় আগ্রহী হন, সম্ভবত প্রথম ছ মাসের

চিকিৎসা/টেস্টিং-এর সময় হ্রাস করে দু'সপ্তাহে নামিয়ে আনা যায়।'

'কি ভাবে?'

'আপনার সঙ্গে বেড়ানর জন্য ডঃ আইভানসিকের ছুটির ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এই সময়ে আপনার প্রাথমিক পরীক্ষা এবং টেস্টের ব্যবস্থা করতে পারবে ও। সেই সঙ্গে ও দেখবে, আমাদের চিকিৎসায় আপনি সাড়া দেন কি দেন না।'

কথা বলতে বলতেই একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো জুডের দিকে এগিয়ে দিলো ডঃ জ্যাবিস্কি। হাতে লেখা ছোট্ট একটা চিঠি, কালি'তে নয় পেন্সিলে লেখা। 'চিঠিটা পড়ার পর নষ্ট করে ফেলবেন। ডঃ আইভানসিকের ওপর সম্পূর্ণ ভাবে আস্থা রাখা যায়। আপনার প্রস্তাবে আমি খুবই আগ্রহী।'

কোনো কথা না বলেই তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল জুড। কাগজটা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে মুখে পুরে ফেলল্ সে। এক মুহূর্তের জন্য সেটা চিবিয়ে বেশ কয়েক ঢোক ড্রিঙ্ক গলায় ঢালতেই সেটা উধাও।

এই প্রথম ডঃ জ্যাবিস্কি হাসল। মাথা নেড়ে সায় দেয় সে।

'আজ সন্ধ্যায় আমি চলে যাচ্ছি,' বলল জুড। 'ডঃ আইভানসিক তৈরী হলেই আমাকে জানাবেন, আমি তখন যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা ঠিক করবই।'

'মিঃ ক্রেনি, যদি আপনি চান তো আজ রাত থেকেই আপনার চিকিৎসা আমরা শুরু করে দিতে পারি,' জ্যাবিস্কি বলে উঠল, 'ওর লাগেজপত্তর আমার গাড়িতেই রয়েছে। আমি আমার দিক থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

হাসল জুড। 'আমি জানি, যে মুহূর্তে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখনি মনে হয়েছে, আমার প্রতি আপনি দয়ালু।' এই বলে ডঃ আইভানসিকের দিকে ফিরে বলল 'ডাক্তার, আমার বিশ্বাস, আমার সঙ্গে তোমার যাত্রাপথ সুখের হবে।'

'সঙ্গ-সুখ আমি খুব ভালোবাসি মিঃ ক্রেনি।'

'ভালো,' বলল সে। 'ডঃ আইভানসিক অত্যন্ত মনোরম নাম। তা তোমার নাম কি জানতে পারি?'

'সোফিয়া,' উত্তরে বলল সে।

'আমি জুড,' সে এবার তার নাম বলল। 'আমেরিকানরা প্রধানত তাদের প্রথম নামই ব্যবহার করে থাকে। ডাক্তার, আমরা পরস্পর পরস্পরের নাম ধরে ডাকলে তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'না, আদৌ নয় জুড,' মুখে স্বল্প হাসি ফুটিয়ে বলল সোফিয়া। 'তাছাড়া আমার মা একজন আমেরিকান। আর আমার স্কুল জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে স্টেটসে।'

এই সময় তাদের টেবিলের সামনে এসে হাজির হলো হোটেল পরিচালক। মাথা নিচু করে বলল সে, 'ডঃ জ্যাবিস্কি, আপনার টেলিফোন এসেছে।'

জুডের দিকে ফিরে ডঃ জ্যাবিস্কি বলে উঠল, 'আপনি আমাকে মাফ করবেন?'

মাথা নাড়ল জুড। ডঃ জ্যাবিস্কি চলে যায় সেখান থেকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডঃ আইভানসিকের দিকে ফিরে তাকাল। 'সোফিয়া, তোমার অতীত অনেক কৌতূহলের

খোরাক জোগায়,' বলল জুড। 'আমেরিকা এবং রাশিয়া। ধনতন্ত্র এবং সাম্যবাদ, এ এক অদ্ভুত সমন্বয়!'

'না, ঠিক তা নয়,' উত্তরে বলল সোফিয়া, 'কেবল এ দু'টি দেশেই গবেষণা করার সবরকম সুযোগ-সুবিধা রয়েছে বলেই আমি আমার মনোমতো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পেরেছি। নিউ ইয়র্কে ইউ.এন'র হয়ে মা প্রায় পাঁচ বছর কাটান, আর তখনি আমার জন্ম হয় সেখানে। সেখানেই আমার পড়া-শোনা, সেখান থেকে যুগোস্লাভিয়ায় ফিরে আসি, তারপর রাশিয়ায় কিছুদিন বসবাসও করেছি। তারপর আমাদের সরকার ডঃ জ্যাবিস্কির কাজ মনোনীত করলে আমি ওঁর সঙ্গে যোগ দিই।'

'সে আজ প্রায় বছর দুই আগে হবে তাই না?' জিজ্ঞেস করল সে। 'একজন ভালো ডাক্তার হিসেবে এখানে এই যুগোস্লাভিয়ার থেকে অন্য যে কোনো দেশে আরো বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারতে।'

'হয়তো', বলল সোফিয়া। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে ডঃ জ্যাবিস্কির সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা তো আর হতো না। আমার মতে আমাদের কর্মক্ষেত্রে তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী ডাক্তার।'

আড়চোখে তাকাতে গিয়ে জুড দেখল, ডঃ জ্যাবিস্কি ফিরে যাচ্ছে। তার গভীর নীল চোখে একটা গভীর বিস্ময় বিরাজ করছিল। তার মনে হলো, সেই প্রথম দিনেই জুড তার মনের গভীরে-গোপনে হানা দিয়ে তার সব কিছু দখল করে নিয়েছে। টেবিলের সামনে বসে নরম গলায় বলল সে, 'যদি দেখা যায় যে, মৃত্যু এবং অমরত্ব লাভ এক ও অদ্বিতীয়, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা অদ্ভুত হবে!'

মৃত্যু এবং অমরত্ব লাভ। কথাটা তার মনে বার বার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সে আজ প্রায় বছর কুড়ি আগে হবে, তার বাবা প্রায় এই একই ধরণের চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছিলেন।

১৯৫৬ সাল তখন। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার দ্বিতীয়বার পুনঃনির্বাচিত হওয়া দু'দিন পরেই নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে বোস্টন থেকে আকাশ পথে উড়ে আসেন। নিউইয়র্ক তার কাছে উত্তেজনাপূর্ণ এবং জীবন্ত। হেঁটে চলে সে পার্ক অ্যাভিনিউ ধরে। ঘড়ির দিকে তাকাতে গিয়ে সে দেখল, তখনো এগারোটা বাজেনি। হাতে সময় আছে। তার বাবা তাকে তাঁর অফিসে দুপুরে দেখা করতে বলেছেন। স্টেনলেস স্টীলের পালিশ করা গোটা গোটা অক্ষরে ক্রেনি ইন্ডাসট্রিজ লেখা নেমপ্লেটটা নতুন অফিসের সামনে ঝুলে থাকতে দেখল জুড, তখনো মিনিট কুড়ি বাকী ছিলো। এই সময়টা ইতস্তত এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর প্রথম প্রহরীকে পেরিয়ে দ্বিতীয় প্রহরীর কাছে আসতেই এলিভেটার বক্সে স্যুইচবোর্ডের চাবি ঘুরিয়ে দিলো সে। একটু পরেই এলিভেটারের দরজা খুলে যেতে দেখা যায়। পিছন দিকে সরে গিয়ে বলে উঠল সে, 'মিঃ ক্রেনি, ফরটি-ফিফথ্ ফ্লোর।'

এলিভেটারের ভেতরে প্রবেশ করে বোতামটা টিপে দিলো জুড। দরজা বন্ধ হতে শুরু হলে তার কানে তখন ভেসে এলো, প্রথম প্রহরী দ্বিতীয় প্রহরীকে বলছিল, 'আমাদের

বসের ছেলে, বুঝলে!'

নিজের মনে হাসল জুড। হাওয়ায় দ্বিতীয় প্রহরীর কথাটা মিলিয়ে গেলো।

ওদিকে দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল রিসেপসনিস্ট। 'সুপ্রভাত মিঃ ক্রেনি,' বলে উঠল মেয়েটি। 'আপনার বাবা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' তার বাবার অফিসে যাওয়ার প্রাইভেট এলিভেটারের দরজা খুলে দেয় সে, পেন্টহাউস ফ্লোরে যাওয়ার একমাত্র পথ সেটা।

ছোট এলিভেটার থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখা হয়ে গেলো তার বাবার সেক্রেটারির সঙ্গে। 'জুড!' অস্ফুটে বলে হাসল সে।

'মিস ব্যারেট,' ঝুঁকে পড়ে তার চিবুকে চুমু খেতে গিয়ে বলল, 'আপনার বয়স খুব কম দেখাচ্ছে. সেই সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দরী, চিরদিনের সুন্দরী আপনি।'

এক অনিন্দ্যসুন্দর মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল মেয়েটির ঠোঁটে। 'আহা কি মিষ্টি কথা,' বলল সে। 'কিন্তু আমি তো আপনাকে ছেলেবেলা থেকে জানি, এরকম প্রশংসা করার মতো লোক আপনি নন।'

'বিশ্বাস করুন,' হাসল সে। 'আমি সত্যিই ঠিক তাই মনে করি। তারপর জুড সেক্রেটারির ঘরের ভেতর দিয়ে ব্যারেটকে অনুসরণ করে তার বাবার অফিস-ঘরে [illegible]য়ে হাজির হলো।

জানালার ধারে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন তার বাবা। পিছন ফিরে না তাকিয়েই তিনি ডাকলেন, 'জুড?'

'হ্যাঁ বাবা, এই তো আমি এসে গেছি।'

'এখানে এসো,' এবারেও পিছন ফিরে না তাকিয়েই বললেন তিনি। তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াল জুড। তখনো তাঁরা দু'জনে মুখোমুখি হলেন না। একটু সময় তিনি নীরব থেকে এবার পিছন ফিরে তাকিয়ে জুডকে দেখলেন। 'জুড, তোমাকে বেশ ভালই দেখাচ্ছে।'

পিতা-পুত্রের চুম্বন বিনিময়ের পরে অনুযোগ করে বলল জুড, 'তুমি আমাকে আর পছন্দ করো না, এ কথাটা ভাবতে শুরু করেছিলাম।'

'বোকার মতো কথা বলো না,' তার বাবা বলে উঠলেন, 'বৎস, আমি তোমাকে এখনো ভালোবাসি।'

'বাবা, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।'

'খিদে পেয়েছে?'

হাসল জুড। 'তুমি তো জানো ড্যাড, সব সময়েই আমার খিদে লেগে থাকে।'

ডেস্কের বোতামটা টিপলেন তার বাবা। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্লাইডিং ডোর খুলে যেতেই দরজার ওপারে একটা ছোটখাটো ডাইনিংরুম চোখে পড়ল জুডের। ইন্টারফোনের সুইচ টিপে তিনি এবার কাছে যেতে নির্দেশ দিলেন, 'মধ্যাহ্নভোজের জন্য আমরা প্রস্তুত।' তারপর জুডের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি তো স্কচ পান করবো, আর তুমি?'

বাবাকে অনুসরণ করতে গিয়ে জুড বলল, 'ওটা বরং দু'টো করে দাও।'

ডাইনিংরুমের অপর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো কৃষ্ণকায় ছোটখাটো চেহারার একজন লোক। 'বলুন মিঃ ক্রেনি, কি চান?'

'দুটো স্কচ ফাস্ট এডি।'

একটু পরে স্কচের ট্রে হাতে সে ফিরে এলে জুডের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'ফাস্ট এডি, এ আমার ছেলে।'

জুডের হাতে স্কচের গ্লাস তুলে দিতে গিয়ে ফার্স্ট এডি বিনীত গলায় বলল, 'এ আমার সৌভাগ্য মিঃ ক্রেনি।'

'ধন্যবাদ,' বলল জুড। তারপর ফাস্ট এডি চলে যেতেই সে তার বাবার স্কচের গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে বলে উঠল, 'চীয়ার্স।'

'চীয়ার্স,' প্রত্যুত্তরে তার বাবা বলে উঠলেন।

তারা তাদের গ্লাসে চুমুক দিলো অতঃপর। 'আচ্ছা ড্যাড, ফার্স্ট এডি কতদিন তোমার কাছে কাজ করছে?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'প্রায় মাস তিনেক হবে। বৃদ্ধ রোসকোর নাতি সে। বড় ভালো ছেলে। মাত্র আঠারো বছরে সে পা দিয়েছে, বিশ্বাস করা যায় না।'

'হ্যাঁ, চমৎকার বলেই মনে হয় সে।'

'হ্যাঁ ঠাকুর্দার মতোই হয়েছে সে।' তার বাবা চেয়ারে বসে বললেন, 'তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে আশ্চর্য হয়েছি।' একটু ইতস্তত করে তিনি আবার বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তবে প্রথমে কি কথা দিয়ে শুরু করবো? শুভ সংবাদ, নাকি অশুভ সংবাদ দিয়ে?'

'তুমি যা ভালো বোঝো তাই বলো।'

'তাহলে প্রথমে শুভ সংবাদটাই দিই। পনেরো বছর আগে তোমার মা'র মৃত্যুর পর আমি একা, নিঃসঙ্গ। এই সময়ে অনেক মহিলাই এসেছে, সেটা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে তো অন্যরকম হয়ে যেতো। যাইহোক, এখন আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। আর আমার মনে হয়, তাকে তোমার খুবই পছন্দ হবে।'

জুড তার বাবার দিকে সরাসরি তাকাল। 'শোনো ড্যাড, তাকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে, সেটাই যথেষ্ট। তোমার সুখেই আমার সুখ।'

হাসলেন তার বাবা। 'কিন্তু তুমি তার নামটা জানতে চাইলে না তো!' একটু থেমে তিনি নিজেই তাঁর ভাবী স্ত্রীর নাম বললেন, 'বারবারা।'

'মিস ব্যারেট?' জুডের কথায় গভীর বিস্ময়।

তার বাবা শব্দ করে হেসে উঠলেন। 'এটা কি এমন বিস্ময়ের ব্যাপার?'

'হ্যাঁ,' হাসতে হাসতে বলল জুড। 'তবে এটা ভালো খবরই বটে। কিন্তু কেন আমি জানি না আমার মনে হচ্ছে, আগে কেন তুমি তাঁকে বিয়ে করলে না? ওঁকে দেখে তো সব সময়েই মনে হয়, উনি যেন আমাদের পরিবারেরই একজন। ভেতরে গিয়ে আমি ওঁকে বলবো, তোমাদের দু'জনের জন্যই আমি কতো না খুশী?'

'মিনিট খানেকের মধ্যে আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেবে ও,' বললেন তার বাবা।

'তা কখন তোমরা বিয়ে করছ?'

'আজ অপরাহ্নে ছ'টার সময়ই' উত্তরে বললেন তার বাবা। 'আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে জাজ গিটলিন উপস্থিত থেকে উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।'

'আঙ্কল পলকে আমি জানি,' হাসল জুড। 'এখন একটা ভালো টাই'র খোঁজ করতে হবে।'

'ওটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আমাদের কয়েকজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরা আসছে।' তারপরেই তার বাবার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে একটা গাম্ভীর্য্যের রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'এখন তাহলে অশুভ সংবাদটা শোনো।'

নীরব হলো জুড।

'আমার হজকিন রোগ হয়েছে,' বললেন তার বাবা।

'এ রোগের কথা তো আমার জানা নেই।' বলল জুড।

'এ অনেকটা ব্লাড ক্যান্সারের মতো।' একটু অপেক্ষা করে তিনি আবার বলতে থাকেন, 'যাইহোক, সেটা খুবই খারাপ হতে পারে। ডাক্তাররা বলেছেন, এখনো বছর পাঁচ-ছয় হেসে খেলে সময় কাটিয়ে দিতে পারবো। আর কে বলতে পারে তখন আমার অসুখ কোন্ দিকে মোড় নেবে? হয়তো রোগমুক্ত হয়ে যেতে পরি তখন।'

জুড তখনো নীরব। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখের জল মুছে বলল সে, 'আমিও তাই আশাকরি। না, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত দেখবো তখন, আমি নিশ্চিন্ত।'

'আর তারা যদি সেটা দেখতে না পায়,' বললেন তার বাবা। 'আমি অভিযোগ করব না। তবু তখনো ভালো জীবনযাপন করব।'

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে নীরব রইল জুড।

'মৃত্যুকে আমি ভয় করিনা,' নরম গলায় তার বাবা বললেন। 'মৃত্যু এবং অমরত্ব লাভ, দুটোই আমার কাছে একইরকম বলে মনে হয়।'

❑ চার ❑

লিমোসিন গাড়িটাকে অনুসরণ করে এয়ার-কারগো গেট পেরিয়ে এয়ারফিল্ডে এসে দাঁড়াল কাস্টমস জীপ। একদিকে ব্যবসায়িক বিমান, আর একেবারে শেষ প্রান্তে মিলিটারি কামানগুলো ল্যান্ড করা ছিলো। মিডনাইট ব্লু বি-৭৪৭ বিমানটা ছোট্ট যুগোস্লাভিয়ান ফাইটার বিমানের কাছে দৈত্যের কাছে মক্ষীরানীর মতো মনে হচ্ছিল। লিমোসিন গাড়ি থেকে নেমে সোফিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো জুড।

সোফিয়া তাকাল জুডের দিকে। 'ফিল্মে ছাড়া জাম্বো বিমান আমি কখনো দেখিনি,' বলল সে।

কাস্টমস অফিসাররা এগিয়ে এলো তাদের দিকে। 'দয়া করে আপনারা আপনাদের পাসপোর্টগুলো যদি দেখান, আমরা স্ট্যাম্প দিয়ে দেবো,' তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল।

জুড ও সোফিয়া দু'জনেই যে যার পাসপোর্ট কাস্টমস অফিসারের হাতে তুলে দিলো।

তারা তাদের জীপের কাছে গিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পাসপোর্ট দু'টো পরীক্ষা করে দেখতে থাকে।

কার ট্রাঙ্ক থেকে তিনটি স্যুটকেশ বয়ে নিয়ে এসে সোফিয়ার সামনে রাখল সোফার। ঠিক সেই সময় হুইল বে থেকে স্টেনলেস স্টীল রঙের রেলিং দেওয়া একটা এলিভেটর নেমে এলো বিমান থেকে। সেখান থেকে দু'জন ইউনিফর্ম পরিহিত মানুষ বেরিয়ে এলো তাদের সামনে।

তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় জুড। 'সোফিয়া, ইনি হলেন ক্যাপ্টেন পিটার্স। আর উনি চিফ স্টুয়ার্ড রাউল।' তারপর তাদের উদ্দেশ্যে বলল সে, 'ভদ্রমহোদয়গণ, ইনি ডঃ আইভানসিক।'

করমর্দন করে বলল ক্যাপ্টেন, 'ডক্টর, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ ভদ্রমহোদয়গণ,' উত্তরে বলল সোফিয়া।

ওদিকে একজন কাস্টমস অফিসার ফিরে এসে বলল, 'আপনাদের পাসপোর্ট ঠিক আছে। কিন্তু ডঃ আইভানসিকের লাগেজগুলো আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। অবশ্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির লাইসেন্স যদি থাকে তো অন্য কথা।'

সারবিয়ান ভাষায় কথা বলতে গিয়ে সোফিয়ার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়। তারপর জুডের দিকে ফিরে বলল সে, 'ওঁদের অফিসে আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে। দেখছি এদের সবার মনোভাবই আমলাতান্ত্রিক। যাইহোক, আমার মনে হয়, ইতিমধ্যে এক্সপোর্ট লাইসেন্স প্রস্তুত হয়ে গেছে। কিন্তু নিয়ম রক্ষার জন্য—'

'ডক্টর, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো,' বলল ক্যাপ্টেন পিটার্স, 'আমাকেও ফ্লাইট প্ল্যান অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।'

'লিমো গাড়িটা নিয়ে যাও,' বলল সে। 'তোমার সঙ্গে বিমানে দেখা হবে আবার।'

সোফিয়ার লাগেজপত্তর কাস্টমস অফিসাররা তাদের জীপে তুলে দিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলো, এবং সেই জীপটাকে অনুসরণ করতে থাকে লিমোসিন। এলিভেটারের দিকে এগিয়ে গেলো জুড, তার সঙ্গে যোগ দিলো রাউল। তারপর তারা উঠে এলো হুইল বেতে। এরপর গ্যালিফ্লোরে, সেখান থেকে মূল কেবিন ফ্লোরে।

'প্রথম গেস্ট-স্টেটরুমে ডাক্তারের থাকবার ব্যবস্থা করো,' স্টুয়ার্ডকে বলল জুড।

'হ্যাঁ মিঃ ক্রেনি।'

ফ্লাইট ডেক স্টেয়ারকেসের দিকে এগিয়ে গেলো জুড। তারই পিছনে ছিলো তার ব্যক্তিগত কেবিন। স্টুয়ার্ডের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল সে, 'মারলিনকে বলো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'ঠিক আছে স্যার, তাই বলছি।'

ফার্স্ট এডি তার কেবিনে বরফ-ঠান্ডা কোকাকোলা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। জুড তার হাত থেকে গ্লাসটা তুলে নিলো ঠিক সেই সময় দরজায় নক্ করল মারলিন। দরজা খুলে দেয় ফার্স্ট এডি।

'হ্যাঁ বলুন মিঃ ক্রেনি,' বলল মারলিন, তার হাতে নোটবুক।

'ডঃ আইভানসিক্, অর্থাৎ মিস সোফিয়া আমার অতিথি। আমি তার কঠোর নিরাপত্তা আর কমপিউটার চেকিং চাই।' সেই সঙ্গে ডঃ জ্যাবিস্কি এবং সোফিয়া যা যা বলেছিল সব বলল জুড। 'আমি কোনো চমক চাই না।'

'হ্যাঁ,' আরো বলল জুড। 'ডঃ সওয়েরকে জিজ্ঞেস করো মেডিক্যাল রিসার্চে একটা মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য মানুষের দেহে স্থাপন করার ঘটনা সে শুনেছে কিনা।'

'ঠিক আছে স্যার, বিমান, ছেড়ে দিলেই এ ব্যাপারে আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবো,' বলল মারলিন।

মারলিন চলে যাওয়ার পরেই ইন্টারফোন তুলে চীফ স্টুয়ার্ডকে নির্দেশ দেয় জুড, 'ডাক্তার ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞেস করো বিমান আকাশে ওড়ার সময় ফ্লাইট ডেকে আমার সঙ্গে সে মিলিত হবে কিনা!'

আলমারি খুলে জুডের নির্দেশমতো একটা টেরিক্লথ জ্যাম্পসুট বার করে বিছানার ওপর রেখে দিলো ফাস্ট এডি। সেই সঙ্গে একটা ফ্রেঞ্চ সিল্ক বিকিনি এবং একজোড়া টেরিক্লথ স্লিপার। সেই ফাঁকে জুড তার কেবিনের এ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে স্নানটা সেরে নিলো। বাথরুম থেকে ফিরতেই জুডকে খুবই সতেজ দেখাচ্ছিল। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজেই সে বলে উঠল, চলবে, ভালই দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু তবুও ক্লান্তি, বোধ করছিল সে, যা সে চায় না, কারণ এখন তাকে অনেক অনেক কাজ সারতে হবে। ড্রয়ার খুলে একটা সোনালি রঙের শিশি হাতে নিয়ে ছিপিটা দ্রুত খুলে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের পাইপ বেরিয়ে এলো। সেই প্লাস্টিকের পাইপটা পালা করে দু'বার সে তার নাকের ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে জোরে জোরে টানতেই একটু স্বস্তিবোধ করল। বেশ খানিকটা কোকেনের নির্যাস নাকে নিয়ে আয়নার সামনে আবার তাকাল সে, ক্লান্তি ভাবটা এখন আর নেই। তোমার নিজের কেমিক্যাল কোম্পানির ওষুধ বেশ কাজে লেগেছে, নিজের মনে ভেবে হাসল সে। সোফিয়ার সঙ্গে প্রেমের খেলায় তাকে আর চিন্তা করতে হবে না।

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর উপদেশের মতো ভেসে এলো। 'সমস্ত অফিসাররা যে যার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নাও। মিনিট খানেকের মধ্যে বিমানের যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে।'

সোফিয়ার দিকে তাকাল জুড, সে তার পাশের আসনে বসেছিল। বিরাট জাম্বো বিমান চলতে শুরু করতেই কেঁপে উঠল জুড। সোফিয়ার হাতের দিকে তাকাল সে, খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তার হাত দু'টো নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে।

'মনে হচ্ছে পাখির মতো বিমানটা ডানা মেলে দিয়েছে,' নিচু গলায় বলল সোফিয়া।

জাম্বো বিমান তার নির্দিষ্ট উচ্চতা মাটি থেকে বারো কিলোমিটার উপরে উঠতেই ধূমপান নিষেধের বিজ্ঞাপন এবং সিট বেল্টের আলোটা নিভে গেলো। একটা মায়াময় অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। দ্রুত হাতে জুড নিজের বেল্ট কোমর থেকে খুলে ফেলে এবার সোফিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল তার বেল্টটা খুলতে সাহায্য করার জন্য। একটু ইতস্তত করল সোফিয়া, জুডের ভারী শরীরটা তার ওপর অনেকটা চেপে বসেছিল তখন। হাসল জুড,

'ঠিক আছে?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় সোফিয়া এবং তাকে তার বেল্ট খুলে ফেলতে দেয়।

ফাস্ট এডি খাবারের ট্রে এবং স্যাম্পেনের বোতল ও গ্লাস রেখে যায় তাদের টেবিলে। যাওয়ার আগে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায়।

স্যাম্পেনের গ্লাসটা সোফিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল জুড, 'আমেরিকার উদ্দেশে বন্ধুত্বপূর্ণ উড়ানকে স্বাগত জানাই।'

'এখনো আমাদের পায়ের নিচে যুগোস্লাভিয়ার মাটি রয়েছে।'

'কিন্তু এখন তো তুমি আর সেখানে নেই, আছো কি?' হাসল জুড।

'তা ঠিক।' স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাসল সোফিয়া। 'অপূর্ব।' একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করল, 'বিদেশে তুমি কখনো রাশিয়ান ভডকা খেয়েছ?'

'নিশ্চয়ই!'

'আমাকে ভডকা খাওয়াতে পারো?' নির্লজ্জের মতো বলল সোফিয়া।

'কেন দেবো না?' বোতাম টিপতেই ফাস্ট এডি কেবিনে ঢুকল। জুড তাকে ভডকার ফরমাস করতেই একটু পরে এক বোতল ভডকা নিয়ে এসে তাদের গ্লাসে ঢেলে বাকীটা ট্রের ওপর রেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো।

ভডকার গ্লাস হাতে নিয়ে মুহূর্তের জন্য জুডের দিকে একবার তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে গলাধকরণ করে ফেলল সে, 'তুমি দেখছি খাচ্ছ না, কি ব্যাপার?'

'আমি খুব বেশী ড্রিঙ্ক করি না।' উত্তরে বলল সে, 'ওই নৈশভোজের আগে একটু মদ, বীয়ার কিংবা হাল্কা স্কচ। আমি তো মাতাল হতে চাই না।'

'ডোপ?'

'কিছুটা।'

'ম্যারিজুয়ানা, কোকেন?' জুডের দিকে তাকাল সে।

হাসল জুড। 'এক সময় ভালবাসতাম।'

'একেবারে পুরোপুরি আমেরিকান।' দ্বিতীয়বার ভডকার গ্লাস শেষ করে সোফিয়া বলল, 'আমেরিকায় স্কুলে পড়ার সময়কার কথা আমার মনে আছে। আর এটা একেবারে ইউরোপিয়ান।'

এই সময় চেয়ারে হেলান দিয়ে জড়ানো গলায় বলে উঠল সোফিয়া, 'একটা উষ্ণ ভাব অনুভব করছি। মনে হয়, একটু মাতাল হয়ে পড়েছি।'

'ক্লান্তবোধ করলে তুমি শুয়ে পড়তে পারো।'

'ওহো না, না। দারুণ উপভোগ করছি,' মুখে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল সোফিয়া, 'এরকম কৌতুক এর আগে কখনো অনুভব করিনি। আমি মাতাল হতে চাই, আরো বেশী নির্লজ্জ হতে চাই। তা তোমার কাছে কোকেন আছে?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুড। তারপর সে তার শয়নকক্ষে গিয়ে সেই সোনালি শিশিটা হাতে নিয়ে ফিরে এলো একটু পরেই। এসব দেখে সোফিয়া বলল 'মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা খুবই জটিল। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

কোকেন ভর্তি শিশির ছোট প্লাস্টিক টিউবটা নাকের দু'টো ফুটোয় ঢুকিয়ে তাকে জোরে জোরে শ্বাস টানতে বলল জুড। সোফিয়া তার নির্দেশ পালন করল, একবার কোকেন নেওয়ার পর সে বলে উঠল, 'আবার দাও!' এ ভাবে বেশ কয়েকবার কোকেন টানার পর তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হলো। 'মনে হচ্ছে, কোকেন যেন এবার আমার মগজে প্রবেশ করেছে। এখন আমি সত্যি সত্যি খুব গরম মনে করছি।' উত্তেজিত গলায় সে আরো বলল, 'এমন কি আমার স্তনের বোঁটা দুটো উষ্ণ আর শক্ত হয়ে উঠেছে।'

নিঃশব্দে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে জুড।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি বৈকি,' হাসতে হাসতে বলল জুড।

'দেখছি, এখনো আমার দিকে তাকিয়ে হাসছ, তার মানে আমাকে এখনো বিশ্বাস করতে পারোনি। ঠিক আছে, তাহলে নিজের চোখেই দেখো এবার।' এই বলে একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল সোফিয়া। দ্রুত হাতে সে তার জাম্পসুটের জীপারটা টানতেই তার নগ্ন স্তনজোড়া উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জুড়ের চোখের সামনে। জুড়ের চোখে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'এখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে তো?'

সোফিয়ার স্তনজোড়া বেশ তারিয়ে তারিয়ে দেখতে থাকে জুড। সত্যি এতটুকু মিথ্যে সে বলেনি, তার দু'টি স্তনই পুরুষ্টু এবং নিটোল গোল, একটুও ঝুলে পড়েনি। তার স্তনের বোঁটাদুটি কিসমিস রঙের মতো দেখতে এবং পাথরের মতো শক্ত। তার বুকের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে এবার সোফিয়ার মুখের দিকে তাকাল। 'অপূর্ব-সুন্দর।'

'আমাকে জড়িয়ে ধরো,'উত্তেজিত গলায় বলে উঠল সোফিয়া। সে তার কাঁপা কাঁপা হাত দুটো প্রসারিত করে দিয়ে আবার বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো, তা না হলে গত পাঁচ বছর ধরে যেমন আমি নিজেই নিজের রাগমোচন করে এসেছি, এখনো তাই করতে বাধ্য হবো।'

জুড এবার আর শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারল না, সজোরে সোফিয়াকে তার বুকে টেনে নিলো, তার কপালে সোফিয়ার কপাল তার ঠোঁটে সোফিয়ার ঠোঁটজোড়া চুম্বিত হতে থাকে ক্রমাগত। জুড তার এক হাত দিয়ে সোফিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে এবং অপর হাত দিয়ে আবেশে তার স্তন দুটো চেপে ধরল। তার বুকের মধ্যে সোফিয়ার দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই স্থির, শান্ত হয়ে যায় সোফিয়া। জুড কিন্তু এক চুলও নড়ল না।

তার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে সোফিয়া জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সুইটে পাঠানো সেই তিনটি মেয়েকে তুমি উপভোগ করেছিলে?'

'না,' উত্তরে বলল জুড, 'আমি তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিই।'

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে বলল সোফিয়া, 'শুনে খুশি হলাম। জানো, তোমার ঘরের বিছানায় ক্যামেরা লুকিয়ে রেখেছিল ওরা।'

'ওটা বোকামো,' বলল জুড। 'তাতে ওদের কিই বা লাভ হতো?'

'জানি না। তবে শুনেছি, তোমার পুরো সুইটে ফাঁদ পেতে রেখেছিল ওরা।'

'ওটা ওদের সেই চিরাচরিত ধারা,' বলল জুড। 'এমনটিই আশা করেছিলাম।' হাসল সে। 'এ একটা ছেলেমানুষি খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।'

'তুমি ওটাকে ছেলেখেলা বলো না,' প্রতিবাদ করে উঠল সোফিয়া। 'সেই খেলায় একজন খুন হলো, তিনজন লোক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো। এর কারণ, তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটে থাকবে কোথাও।'

'খুবই খারাপ।' বলল জুড। 'এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।' এরপর তারা এ ওর কাছ থেমে বিচ্ছিন্ন হয়ে জুড তার আসনে বসে পড়ল। সোফিয়া বাথরুমে চলে গেলো মুখ ধোয়ার জন্য, কোকেনের গুঁড়ো লেগেছিল তার নাকে, সেটাও পরিস্কার করা দরকার ছিলো।

জুড যখন স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে যাবে, বাথরুম থেকে ফিরে এলো সোফিয়া। নতুন করে তাকে দেখল জুড। মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে এসেছিল সে। 'তুমি কি মনে করো আমি ভয়ঙ্কর?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'না,' বলল সে। 'তুমি স্রেফ মানুষ, আর পাঁচজনের মতো। হয়তো তুমি একজন চিকিৎসক, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি একজন নারীও বটে, একজন অত্যন্ত সুন্দরী নারী। এবং তোমার দু'টি সত্ত্বারই প্রয়োজন নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট করা।'

একটু ইতস্তত করে বলল সোফিয়া, 'আমার মনে হয়, এখনি আমাকে আমার কেবিনে ফিরে যেতে হবে।'

জুড তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'বেশ তো তুমি যদি ক্লান্ত বোধ করে থাকো যেতে পারো।'

জুডের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে সোফিয়া জানতে চাইল, 'তা তোমার কি ইচ্ছে বলো?'

ধীরে ধীরে জুডের মুখে হাসি ফুটতে উঠতে দেখা গেলো। 'সেটা তো তুমি আগেই জেনে গেছো।'

❑ পাঁচ ❑

জেট ইঞ্জিনের একটা ক্ষীণ আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেলো ক্রেনির। টেলিফোনটা হাতে তুলে নিলো। 'আমরা এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নির্দিষ্ট সময়সূচী মতোই আমরা চলছি মিঃ ক্রেনি,' ফ্লাইট ডেক থেকে বলল ক্যাপ্টেন পিটার্স। 'সাড়ে-দশ ঘন্টা ধরে আমরা বিমানে রয়েছি। এখন আমরা দিল্লী, ইন্ডিয়ার কুড়ি হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। আশা করছি আটটা কুড়ি মিনিট নাগাদ আমরা পিকিং-এ পৌঁছে যাবো। আর সব কিছুই ঠিক-ঠাক চলছে।'

'ধন্যবাদ।' টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বিছানায়। শায়িত সোফিয়া তাকিয়েছিল জুডের দিকে। ওদের চার চোখের মিলন হতেই প্রথমে জুডই বলে উঠল 'সুপ্রভাত। ভালো ঘুম হয়েছিল তো?'

'জানি না,' উত্তরে বলল সোফিয়া। 'আমার মনে হয়, আমি যেন সব সময় স্বপ্ন

দেখছিলাম।'

তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল জুড। 'হ্যাঁ, স্বপ্ন আমিও দেখেছি, আমাদের মিলনের স্বপ্ন, দু'টি দেহ একটু একটু করে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। উঃ, কি মিষ্টি মধুর সেই স্বপ্ন!' জুডের ঠোঁট জোড়া নেমে আসে সোফিয়ার কাঁপা কাঁপা উষ্ণ ঠোঁট দু'টির ওপর। সেই মুহূর্তে তারা তাদের ইপ্সিত চুম্বনে পরস্পর চুম্বিত হলো, কেউ কাউকে ছাড়তে চাইল না বেশ কিছুক্ষণ। 'উঃ, তোমার দেহটা বড্ড ভারী, লাগছে, ওঠো,' সোফিয়া মুখে একট কপট কষ্টের ভাব প্রকাশ করতেই তাড়াতাড়ি তার বুকের ওপর থেকে উঠে বসল জুড। 'আমি দুঃখিত প্রিয়তমা। কফি খাবে?'

'আগে মুখ হাত-পা পরিস্কার করি? এতো বেশী যৌন গন্ধ পাচ্ছি, বিমানে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে অস্বস্তিবোধ করবো, ওই বিশ্রী গন্ধে অন্যের তো পরের কথা, নিজেরই গা গুলিয়ে উঠছে। তুমি পাচ্ছো না?'

হাসল জুড। 'হ্যাঁ পাচ্ছি বৈকি। তবে এই পাওয়ার মধ্যে থেকেই নতুন করে আবার, আর একবার যৌন উত্তেজনার আভাষ পাই বলেই গন্ধটা আমার খুব একটা খারাপ লাগে না। তা তোমরাও তো ভাল লাগা উচিত, আমরা দু'জনেই যখন একই ডালের পাখি, কি বলো?'

'হ্যাঁ, এটা কোনো ঠাট্টার ব্যাপার নয়,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'উত্তেজনায় আমার যৌন লালসা যেন তাড়াতাড়ি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।'

সোফিয়ার গাম্ভির্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল জুড। 'জানো ডাক্তার, এরকম ব্যাখ্যা আমি এর আগে কখনো শুনিনি।'

'হ্যাঁ,' বলল সোফিয়া, 'যেমন ধরা যাক, একটু আগে তুমি যখন ফোন করছিলে, তখন তোমার ওই অর্ধ-উত্থিত ইন্দ্রিয় দেখেই আমার শরীরের রক্ত কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল,' জুডের পুরুষাঙ্গ সোফিয়া তার এক হাতের মুঠিতে চেপে ধরে বলতে থাকে, 'আর তখন থেকেই আমার গভীর-গহ্বরে সিক্ত ধারা নিঃসৃত হতে থাকে।

'সেটা একটা সমস্যা,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'এখন আমি সেটা বুঝতে পারছি।'

'আমি জানি, এ এক মনস্তত্ত্বের ব্যাপার,' বলল সোফিয়া। 'কিন্তু এ সমস্যা, নিজেকেই সমাধান করতে হবে।'

'ডাক্তার, তুমি কি সেই সমস্যা এখনি সমাধান করতে চাও?'

'তুমি কি বলতে চাইছ, ঠিক বুঝতে পারছি না,' হতভম্ব হয়ে বলল সোফিয়া। 'আর কেনই বা তুমি আমাকে বারবার 'ডাক্তার' বলে সম্বোধন করছ? আমার একটা নাম আছে। আমি চাই, তুমি আমাকে সোফিয়া নামে ডাকো।'

সোফিয়ার মুখটা সে তার রিরংসার ফলার ওপর টেনে এনে গাঢ়স্বরে বলল, 'সোফিয়া সোফিয়া! তুমি কি জানো না, সুখ-তৃপ্তির সাগরে ভাসতে হলে অর্ধ-উত্থিত যথেষ্ট নয়?'

জুডের দিকে সরাসরি দৃষ্টি ফেলল সোফিয়া। 'এখন দেখছি সত্যি সত্যি আমাকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছ।'

'আহা, বোকার মতো লজ্জা করো না,' তাকে একটু আঘাত দেওয়ার জন্যই বলল

সে, জলে নামবে অথচ গায়ে জল লাগাবে না, তা কি কখনো হয়? নাও, নাও, আর ন্যাকামো করো না। অনেক হয়েছে,—' একটু থেমে জুড এবার তার শিশ্ন এক হাতে চেপে ধরে তার মুখের ওপর চেপে ধরল। 'যদি তুমি মিলনে সুখ পেতে চাও তাহলে তার আগে আমার এই অশান্ত পশুটাকে শান্ত করো, এর কাঠিন্য দূর করে দাও।'

এতক্ষণ চুপ করেছিল সোফিয়া। এবার সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলছ, যেন আমি একজন দেহ-পশারিনী!' কথা বলার পর তার দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর বাদল নামতে দেখা গেলো।

মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকিয়ে থেকে জুড তাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিলো এবং সোফিয়ার মুখটা নিজের মুখের কাছে তুলে নিয়ে এসে চুমু খেতে খেতে বলতে থাকল, 'না, সোফিয়া, একজন যৌনকর্মীর মতো নয়; স্রেফ একজন নারী হিসেবে, যাকে বহুদিন ধরে ....।

স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে নেমে জুডকে অনুসরণ করতে গিয়ে মেন ডেকে নেমে এলো সোফিয়া। 'কয়েক পা এগিয়েই আমাদের বিজনেস অফিস।' বলল জুড। মারলিন তার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়েছিল, আরো দু'জন লোক ছিলো সেখানে, প্রত্যেকেই তাদের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়েছিল, ডেস্কের ওপর রাখছিল দু'টি ডাটা এবং ওয়ার্ড-প্রসেসর স্ক্রীন। জুডকে দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াল মারলিন।

'কিছুক্ষন পরেই তোমাদের কাছে আসছি,' মারলিনের উদ্দেশে বলল জুড। তারপর স্টেয়ারকেস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এলো। 'প্রথমে গেস্ট লাউন্স, তারপর গেস্ট স্টেটরুম।'

সোফিয়ার কথা একটু রূঢ় শোনালেও মনে দাগ কাটার মতোন। 'এই বিমানে কতগুলো লোক আছে তোমার?'

'ফ্লাইট পারসোনেল, দশজন বিমান কর্মী এবং ক্যাপ্টেন, কেবিন পারসোনেল, সেফ এবং সেফ স্টুয়ার্ড সহ আরো ন'জন, পাঁচজন বিজনেস পারসোনেল, সেই সঙ্গে আমার একজন সহকর্মী, আমার সাজভৃত্য, তুমি এবং আমি সর্বমোট উনতিরিশজন। তবে আমাদের প্রয়োজন হলে এখানে এই বিমানে আমরা অনায়াসে একান্নজন শুতে পারি।'

মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়ে এসেছিল। সোফিয়া খুবই ক্ষুধার্ত। সে একবার তার স্টেটরুমে ঘুরে আসতে চাইল। জুড তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। মারলিন তার ডেস্কের সামনে উঠে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে জুড জিজ্ঞেস করল, 'এখন সকাল, না কি বিকেল?'

'ভারতবর্ষে এখন বিকেল চারটে, আমরা প্রায় বারো ঘন্টা বিমানে সফর করছি। তবে সফর শুরু হয়েছে গতকাল,' উত্তরে বলল মারলিন। 'এই হলো আজকের রিপোর্ট। জানেন তো আজ উইক-এন্ড, খুব বেশী খবর নেই। কেবল একটাই বড় খবর আছে। মালেশিয়া তাদের পাহাং রিভার ব্রীজ তৈরীর জন্য পঞ্চান্ন মিলিয়ান ডলারের ফরমাস দিয়েছে।

আমাদের দর অন্যদের থেকে বেশী থাকলেও নিরাপত্তার খাতিরে তারা ক্রেনি কন্সট্রাকশানকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে।'

'আর কোনো ভাল খবর আছে?' জানতে চাইল জুড।

'ডঃ সোফিয়ার বক্তব্য হলো, আপনার বক্তব্য সে এক বর্ণও বুঝতে পারেনি। কেবল জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপেরিমেন্ট এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের DNA প্রোজেক্টের ব্যাপারে তার কিছু জানা আছে, এর বেশী কিছু নয়। তাই সে আপনার কাছ থেকে আরো বিস্তারিত খবর জানতে চায়।

'ঠিক আছে, পরবর্তী উইক-এন্ডে আমি নিজে তার সঙ্গে দেখা করবো।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'যদি তোমার হাতে বাড়তি সময় থাকে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ডাইনিং রুমে চলে এসো। মেয়েটির সম্পর্কে তোমার ধারণার কথা আমি জানতে চাই।'

অতি সাধারণ মধ্যাহ্নভোজ।

খাওয়ার এক ফাঁকে মারলিনের দৃষ্টি আকর্ষন করল সোফিয়া। 'মনে হচ্ছে, আপনার খাওয়ার মধ্যে একটু বাছবিচার আছে।'

'হ্যাঁ, কোথাও ভ্রমনের সময় আমরা সবাই হাল্কা ধরনের খাবার খেয়ে থাকি,' উত্তরে বলল মারলিন। 'রিসার্চ ইনস্টিটুটে ডায়েটিসিয়ানরা আমাদের খাবারের প্রোগ্রাম এমনি করে থাকে যা খেয়ে আমরা সর্বাধিক শক্তি এবং কর্মদক্ষতা লাভ করতে পারি। আমাদের প্রতিদিনের খাবারে বেশী করে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ থাকে।'

'তাহলে মিঃ ক্রেনির বাড়তি ভিটামিন আর খনিজপদার্থ না নেওয়াই উচিত।'

'বিমানে আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা ফরমূলা থাকে।'

'তা সেটা কি ভাবে ঠিক করা হয়?'

'ফ্লোরিডা, বোকা র‍্যাটনে আমাদের একটা মেডিক্যাল সেন্টার আছে, সেখানে আমাদের সবার বাৎসরিক পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। সেই পরীক্ষার কাজ তিনদিনেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়।'

'মিঃ ক্রেনিরও?'

'হুঁ।'

জুডের দিকে ফিরে সোফিয়া বলল, 'তোমার পরীক্ষার রিপোর্টটা আমি একবার দেখতে পারি?'

'অবশ্যই। সবই কমপিউটারাইজড। সকালে প্লেন থেকে নেমে দেখাবো।' বলল জুড।

'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'সেটা আমার খুব কাজে লাগবে। একজন চিকিৎসক হিসেবে শুরুটা দেখছি খুব ভালো হবেই।! যাইহোক, এখন আমি খুবই ক্লান্ত জুড, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, নিতে পারি?'

'বেশ তো, বিশ্রাম নিতে চলে যাও।' তাকে অনুমতি দিয়ে জুড বলল, 'ভাবছি, আমারও একটু বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন।'

সোফিয়া চলে যাওয়ার পর মারলিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জুড জিজ্ঞেস করল, 'তোমার

কি মনে হয়?'

'মনে হয়, উনি খুবই স্পষ্ট বক্তা। কি চমৎকার ডাক্তার উনি, বলবার মতো ভাষা আমার জানা নেই।'

'সেটার ব্যাপারে এই রিপোর্ট আমাদের কিছু হয়তো আলোকপাত করতে পারে। যে মুহূর্তে সেটা আসবে আমকে জাগিয়ে তুলতে পারো।'

তার দিকে তাকাল মারলিন। মনে হচ্ছে, একটা কিছুতে আপনি যেন অস্বস্তিবোধ করছেন।'

'তার চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে নয়,' বলল জুড। 'এটা তার ঠান্ডা মেজাজের জন্য। একজন চিকিৎসক হিসেবে এটা তার পক্ষে অনেক কিছু। সচেষ্ট সে। সে যেন আরো অনেক বেশী কিছু।'

স্টেয়ারকেস পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল মারলিন। 'যখনি সেটা এসে পড়বে আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো।'

ঘন্টা দুয়েকেরও কম সময় পরে জুডের টেলিফোনটা বেজে উঠল। 'আমি আপনার কেবিনে যেতে পারি?'

'হ্যাঁ, আমি জেগেই আছি, তুমি অনায়াসে আসতে পারো।' বিছানা থেকে নেমে সে তার লাউন্সে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা পেরিয়ে সেই লাউন্সে এসে হাজির হলো মারলিন। তার হাত থেকে ফটোফ্যাক্সটা নিলো জুড।

'চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত পদার্থই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে,' বলল মারলিন। 'শেষ কয়েকটা লাইন কেবল আগ্রহ জাগায়।'

দ্রুত রিপোর্টটা পড়ে চলল জুড। মিঃ আই-এর রিপোর্টটা সত্য বলে এখনো প্রমাণিত হয়নি, আবার বলছি, সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। অ্যানড্রোপোভের নির্দেশে তাকে যে নিয়োগ করা হয়েছিল, এরকম একটা গুজব শোনা যায়। খবর সংগ্রহের জন্য অন্য সব সোর্সের সন্ধান করা হবে।'

মারলিন তাকাল তার দিকে। 'এটা যদি সত্য হয়, তাহলে ডঃ সোফিয়া কি চান আমাদের কাছ থেকে?'

জুড মাথা নাড়ল। 'আমাদের কাছ থেকে কিছুই চায় না সে,' বলল সে। 'সেটা কেবল জ্যাবিস্কিরই আগ্রহের কারণ হতে পারে। দারুণ স্মার্ট বেজন্মা এই মহিলা। কি ভাবে কিংবা কি সে করতে চায়, সে কথা সে কাউকেই জানাতে চায় না। এমনকি রুশরাও জানে না। আর তাই তো আমার পিছনে সোফিয়াকে লেলিয়ে দিয়েছে সে। এর থেকেই সব গোপন খরব বেরিয়ে আসবে।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয়না, স্েটা আমাদের কোনো কাজে আসতে পারে।'

হাসল জুড। 'আমরা কেবল খেলে যাবো। আমার ধারণা জ্যাবিস্কি যখন পুরোপুরি প্রস্তুত হবে, সে তখন বলটা আমাদের কোর্টে ঠেলে দেবে।

'আপনি কি সত্যি সেটা বিশ্বাস করেন?' জিজ্ঞেস করল মারলিন।

'হ্যাঁ,' বলল জুড। 'আমি সেই বয়স্কা মহিলার চোখে সেরকমই একটা ছবি দেখে এসেছি, আর তার হাতও স্পর্শ করেছিলাম। আমি তাকে অনুভব করেছিলাম। আমরা দু'জনে একসঙ্গেও ছিলাম।'

❑ ছয় ❑

''কোয়ালুডস এন্ড ইন্টারফেরন,'' বলল জুড। 'এর অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। 'এ যেন একটা অদ্ভুত সংযোজন।'

'না, এটা দেখে মনে হয় যে, এটা কখনই অদ্ভুত নয়,' লিমোসিনের পিছনের আসনে হেলান দিয়ে লি চুয়ান বলে উঠল, 'এখানকার এলাকা হার্ড কারেন্সি।' আমেরিকায় জন্ম হলেও লি চুয়ান মূলত চীনা। হংকং-এ ক্রেনি ফার্মাসিউটিকালের এশিয়ান সেলস ম্যানেজার। '১৯৪৪ সাল নাগাদ পশ্চিমী জগতে কোয়ালুড নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকা ইতিমধ্যে এই জিনিষ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। আমেরিকাও প্রচন্ড চাপে পড়ে লেমনেড উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

'সেক্ষেত্রে চীনারা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কি করে?'

'কারণ মনে হয় চীনারা আমেরিকান এবং ককেশিয়ানদের চেয়ে দমন-নীতির বিরুদ্ধে অনেক বেশী সোচ্চার। তাদের কাছে এই ড্রাগ খুবই কার্যকর। কারণ মানুষের দেহে এর রূপান্তর খুবই ধীরে ধীরে ঘটিয়ে থাকে। তাই তারা এই ড্রাগের চরম বিপর্যয়ের শিখরে উঠতে পারে না কখনো, আর সেই অভ্যাসটা আইনসম্মত।' এখানে একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে, 'চীনা সরকারের অভিমত হলো, তাদের দেশের জনগন আফিমের ধোঁয়া গলাধঃকরনের চেয়ে কোয়ালুড সেবন অনেক ভালো। তাছাড়া তাদের ধারণা আফিম এবং কাজ কখনো এক সাথে মিশে যেতে পারে না।'

'বিশ্বের অবশিষ্টাংশের মনোভাব তাদের অজানা নয়,' বলল জুড। 'তাই সারা বিশ্বে তারা ক্রেনি ফার্মাসিউটিকালের উৎপাদন ছড়িয়ে দিতে চায়। এতে আমাদের ব্যবসায়িক উন্নতির সম্ভাবনা যে প্রচুর, তাও আমি জানি। কিন্তু আমি আবার এও জানি যে, এ ব্যবসায় আমরা এগোলে বিপদ, আবার পিছলেও বিপদ—'

'কিন্তু আমি যতদূর আমাদের বন্ধুদের জানি,' লি চুয়ান বলল, 'আমরা ব্যবসা চালাই বা না চালাই তারা ঠিকই কোয়ালুড ড্রাগ রপ্তানি করবেই। এর থেকে প্রচুর টাকার গন্ধ তারা পেয়েছে।'

'ওদের কথা ছেড়ে দাও,' বাধা দিয়ে বলল জুড। সে তার লিমোসিন গাড়ির জানালা পথ দিয়ে বিমানক্ষেত্রে অপেক্ষারত বিমানটার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে বলে উঠল, 'জানি না সোফিয়া এখনো ঘুম থেকে জেগে উঠেছে কিনা।'

হাসল মারলিন। 'যদি আপনি তাকে রাতে বিরক্ত করে না থাকেন, তাহলে এতক্ষণে তার তো ঘুম থেকে জেগে ওঠা উচিত।'

'না, সেরকম কাজ আমি করিনি।' তার দিকে তাকিয়ে হাসল জুড। লি চুয়ানের দিকে ফিরে জুড আবার বলল, 'সোফিয়া যে একজন যুগোশ্লাভিয়ান ডাক্তার, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে আগেই বলেছি, মনে আছে তো?'

কোয়ালুডের ব্যাপারে জুডের সিদ্ধান্তের কথা শুনে লি চুয়ান একটু আহত হলেও শান্ত ভাবে মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'আমার ধারণা, তিনি নিজেকে আপনার কাছে যথেষ্ট ফলপ্রসূ বলে প্রমাণ করতে পারবেন।'

ওদিকে সোফিয়া তখন তার স্টেটরুমের অন্ধকারে ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জেগে উঠল। জেট প্লেনের ইঞ্জিনের সেই বিকট আওয়াজ নেই, তাই সে বুঝতে পারল, বিমান মাটিতে অবতরণ করেছে। সে তার পাশে রাখা ডিজিটাল ঘড়ির নীলাভ আলোর দিকে তাকিয়ে দেখল, তিনটে দশ। বিছানা থেকে নেমে ধীরে ধীরে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। বেশ কিছুক্ষণ পরে গরম জলে স্নান সেরে ছোট্ট বাথরুমের দরজা খুলতেই সে তার স্টেটরুমে একজন স্টুয়ার্ডেসকে দেখতে পেলো, মেয়েটি তখন তার বিছানা গোছগাছ করছিল পিছন ফিরে।

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ হতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলে উঠল, 'সুপ্রভাত ডক্টর। আমার নাম গিনি। এইমাত্র আপনার জন্য কমলালেবুর জুস আর কফি এনে রেখেছি।'

নাইট টেবিলের ওপর ট্রেটার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সোফিয়া বলল, 'ধন্যবাদ।' একটু ইতস্তত করে পরক্ষণেই সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমরা কি এখন পিকিং-এ?'

'হ্যাঁ ডক্টর।'

'মিঃ ক্রেনি কি বাইরে কোথাও গেছেন?'

'হ্যাঁ ডক্টর,' উত্তরে বলল গিনি। 'আশা করা যায়, চারটে নাগাদ তিনি এখানে ফিরে আসবেন।'

'পিকিং, শহরটা এর আগে আমি কখনো দেখিনি,' বলল সোফিয়া, 'তাই তোমার কি মনে হয়, বাইরে ঘুরে আসার মতো সময় আমি একটু পেতে পারি?'

হাসল গিনি। 'এ কাজের এটা একটা সমস্যা। অনেক জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু সেখানকার শহর ঘুরে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি কখনো। তাছাড়া মিঃ ক্রেনি ফিরে আসা মাত্র হংকং-এর উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হয়ে যাবো।'

'কিন্তু মিঃ ক্রেনি তো সে কথা আমাকে বলেননি!'

'তবে একটা খবর আপনাকে দিতে বলেছেন তিনি। আপনার পোশাকের আর জুতোর মাপ দিতে বলেছেন, এখান থেকে সেগুলো কেনাকাটা করতে হবে যাতে করে সেই সব পোশাক পরে আপনি হংকং-এ যেতে পারেন। তিনি আবার এও চান, আগামীকাল সান ফ্রান্সিককোয় রওনা হওয়ার আগেই যেন নতুন করে আপনি আপনার সম্পূর্ণ ওয়ারড্রোব পেয়ে যান।'

বিরক্তি প্রকাশ করল সোফিয়া। 'যথেষ্ট পোশাক আমার কাছেই রয়েছে।'

হাসল গিনি। 'মিঃ ক্রেনির নিজস্ব মতলব আছে। তিনি বলেন, আপনার এই অকর্ষনীয়

শরীরের সঙ্গে মানানসই একটা সুন্দর ওয়ারড্রোবের প্রয়োজন আছে।'

'সবার ক্ষেত্রেই কি পছন্দটা ওঁর এই রকম?'

'কেবল তিনি যাকে পছন্দ করেন,' বলল গিনি। 'আপনার তোয়ালেটা আমাকে দিন। আমার ভালো ধারণা আছে এ ব্যাপারে। আপনার শরীরের প্রতিটি অংশের নিখুঁত মাপ আমি ঠিক বলে দিতে পারবো আশাকরি।'

নিঃশব্দে সোফিয়া তার শরীরের ওপর থেকে তোয়ালেটা সরাবার অনুমতি দিলো। তার নগ্ন শরীরের দিকে মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকল পুরুষের চোখ দিয়ে দেখার মতো করে। 'অপূর্ব আপনার শরীরের গঠন।' কথায় কথায় বলল মেয়েটি তার শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপ নিতে গিয়ে। 'পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, বুকের মাপ সাইতিরিশ, কোমর পঁচিশ, নিতম্ব ছত্রিশ। জুতোর সাইজ সাত।'

'তোমাকে যথেষ্ট অভিজ্ঞা বলে মনে হচ্ছে,' বলল সোফিয়া।

'পোশাক আমার খুব পছন্দ,' বলল গিনি, 'সেই সঙ্গে সুন্দর রমণীর রমণীয় শরীরও।'

মেয়েটির দিকে তাকাল সোফিয়া, কিন্তু তার মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পেলো না সে। নগ্ন দেহ প্রদর্শনের অস্বস্তিটা কাটানর জন্য তোয়ালেটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে বলল সে, 'ধন্যবাদ।'

স্টেটরুমের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বলল গিনি, 'লাউঞ্জে থাকব। যদি আপনার কোনো প্রয়োজন হয় আপনার বিছানার পাশে টেবিলে রাখা কলিংবেলের বোতামটা টিপতে পারেন।'

'ধন্যবাদ,' বাইরে থেকে গিনিকে দরজা ভেজাতে দেখল সোফিয়া। তারপর দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে কমলালেবুর জুসে চুমুক দিলো সে।

কিছুক্ষণ পরেই গিনি তাকে খবর দেয়, জুড ফিরে এসেছে বিমানে, লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে। সোফিয়া তখন ইন্টারকাম মারফত জুডের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে, 'তুমি কি এখন একা? আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে চাই।'

'ঠিক আছে, এখনি চলে এসো লাউঞ্জে,' উত্তরে বলল জুড।

জুড তখন কোকাকোলার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। সোফিয়াকে লাউঞ্জে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল সে, 'ভালো ঘুম হয়েছে?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো।' পরক্ষণেই তার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'কেন এখনো তুমি আমাকে বেশ্যার মতো ব্যবহার করছ?'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'তোমার দেওয়া ওই নোংরা পোশাক আমি পছন্দ করি না,' রাগতস্বরে বলল সোফিয়া। 'আমার পোশাক যথেষ্ট ভালো।'

'হয়তো পূর্ব ইউরোপের পক্ষে ভালো হতে পারে, কিন্তু যেখানে তুমি যাচ্ছো, সেখানকার উপযোগি নয়। তাছাড়া তুমি যখন আমার সঙ্গে থাকবে, তোমাকে আমার মতো করে ভালো পোশাক তো পরতেই হবে!'

এবার সোফিয়া স্থির চোখে তাকাল জুডের দিকে। 'আমি একজন চিকিৎসক, খান্‌কি মডেল নয়!'

'তাহলে তুমি যুগোস্লাভিয়ায় ফিরে যেতে পারো,' বলল সে। 'যদি তুমি আমার সঙ্গে সুন্দরী মহিলার বেশে থাকতে না চাও, আমি তোমাকে চাই না। আমার বিশ্বাস, জ্যাবিস্কি তোমাকে দিয়ে যা করাতে চায়, সেরকম ডাক্তার আরো অনেক আছে।'

নীরব হলো সোফিয়া। জুড এবার সোনার শিশি ও চামচটা তুলে নিয়ে বলে উঠল, 'একটু কোকেনের নির্যাস নাকে টেনে নাও, অনেক সুস্থ বোধ করবে।'

হঠাৎ হেসে উঠল সোফিয়া। 'এখন বলো, কে একজন চিকিৎসককে খেলাচ্ছে?'

'তুমি একজন চিকিৎসক,' সোফিয়ার নাকে সোনার চামচটা চেপে ধরে জুড বলল, 'তুমি একজন চিকিৎসক। তাই যদি আমি তোমাকে একজন সুন্দরী মহিলার রূপে দেখতে চাই, আমাকে ক্ষমা করো।'

কোকেন সোফিয়াকে সতেজ করে তুলল। 'অনেক কিছুই তো আমি ভুলে গেছি জুড!'

'ঠিক আছে, এখন কাজের কথায় আসা যাক। তোমার ফরমাস মতো ঐই হলো আমার মেডিক্যাল চার্ট।' ডেস্ক থেকে একটা ফোল্ডার টেনে নিয়ে তার হাতে তুলে দিলো জুড।

সেই ফোল্ডারের ভেতরে কমপিউটার প্রিন্টের ওপর চোখ বোলাল সোফিয়া ঃ

জন্ম ঃ ২৫শে জুন, ১৯৩৪, নিউ ইয়র্ক, বিকেল ৫.০১ মিনিট।

জেনিওলজি ঃ

পিতা ঃ স্যামুয়েল টেলর ক্রেনি। মৃত্যু ঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, '৬২।

❑ সাত ❑

সেন্ট্রাল পার্কটা যেন একটা তুষারের সময় কার্পেটে মোড়ানো। জানালাপথে সেদিকে তাকিয়ে বলল বারবারা, 'তোমার বাবা বলতেন, নিউ ইয়র্কে এটাই নাকি সব থেকে সুন্দর দৃশ্য।'

তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল জুড। 'এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ ছিলেন আমার বাবা। তুমি তাকে ভালোবেসেছিলে?'

'হ্যাঁ,' তার উত্তরটা অতি সহজ সরল।

'তাহলে ওঁকে বিয়ে করার আগে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকতে গেলেন কেন?'

তার উত্তর আগের মতোই সহজ, সরল। 'আগে কখনো তোমার বাবা বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেননি বলে।'

'কিন্তু তুমি তো তাঁর সঙ্গে ছিলে?'

'তুমি কি মনে করো আমরা এক সঙ্গে শুয়েছিলাম?' প্রশ্নটা নিজে করে সঙ্গে সঙ্গে বারবারা আবার নিজেই উত্তর দিলো, 'না।'

বারবারার দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল জুড। 'আশ্চর্য, আমি তো সব সময় ভেবে

এসেছি, তুমি সেরকমই কিছু একটা করে থাকবে।'

'সবাই তাই মনে করে থাকে,' বলল সে। 'কিন্তু তোমার বাবার একটা নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ছিলো। 'ব্যবসার সঙ্গে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ কখনো মিশিয়ে ফেলেন নি।'

'তিনি বোকা মানুষ ছিলেন।'

'হতে পারে,' বলল বারবারা। 'এখন সব শেষ, তাতে কিছু এসে যায় না এখন আর। এখন কি ঘটতে যাচ্ছে তাই বলো?'

'সার্কাসের দৃশ্য ঘটতে চলেছে,' উত্তরে বলল জুড। 'বিশ্বের সব ধুরন্ধর লোক জমায়েত হতে চলেছে তাঁর অন্ত্যেস্টিক্রিয়ায় যোগদান করার জন্য। কেবল কেনেডি ছাড়া। প্রেসিডেন্ট কখনো তাঁকে পছন্দ করেননি। হয়তো তার বাবার চেয়ে আমার বাবার বেশী অর্থ থাকাটা তিনি মেনে নিতে পারেননি বলেই তিনি আমার বাবার মতবাদ মেনে নিতে পারেননি। সে যাইহোক, অন্ত্যেস্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহন করার জন্য ভাইস- প্রেসিডেন্ট জনসনকে পাঠাচ্ছেন। জনসন বাবাকে পছন্দ করতেন। তিনি সব সময় অর্থ এবং শক্তিধর লোকদের পছন্দ করে থাকেন।' একটু থেমে জুড বলতে থাকে, 'এই সব কারণেই আমি চাই না তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা হোক,' বলল জুড, 'আমি চাই, বাবাকে বোকা র‍্যাটনে রিসার্চ হসপিটালে পাঠানো হোক।'

'তাতে ভালো কিছু হবে?' জিজ্ঞেস করল বারবারা। 'ইতিমধ্যে ওর মৃতদেহ কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছে ওরা।'

'না, তারা তা করেনি,' বলল জুড। 'আমাদের রিসার্চ হসপিটালে তাঁর মৃতদেহ পাঠানোর ব্যবস্থা যে আমি করেছি, তারা তা জানে। সেখানে আমাদের আধুনিক টেকনোলজির ব্যবস্থা আছে। সেখানে আমরা জন্মগত ব্যাপারে তাঁর দেহের প্রতিটি কোষ পরীক্ষা করে দেখব, এবং সেই সঙ্গে তাঁর অসুখের কারণ আবিস্কার করার চেষ্টা করব।'

'কিন্তু তোমার বাবার ইচ্ছে খুবই স্পষ্ট ছিলো, তিনি চেয়েছিলেন—'

'তাঁর ইচ্ছাপূরনের বাধ্যবাধকতা এখন আর নেই। তিনি এখন মৃত। ওঁর মৃতদেহ এখন তোমার সম্পত্তি, ওঁর সেই মৃতদেহ নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো। সেটাই আইন। স্ত্রী হিসেবে তোমার আইনগত অধিকার আছে।'

'আর তাই কি তুমি আমার অনুমতি চাইছ?' জিজ্ঞেস করল বারবারা।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আর জুড তুমি,' নরম গলায় বারবারা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চাও?'

'আমি বেঁচে থাকতে চাই চিরদিনের জন্যে।'

'ঠিক আছে,' জুডের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বারবারা বলল, 'তোমার ইচ্ছে মতো কাজ আমি করব। এখন বলো কি করতে হবে?'

জুড তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ভাজ করা নথী বার করে বলল, 'এই কাগজটায় সই করতে হবে তোমাকে।'

কাগজটা দেখল বারবারা। 'তুমি জানতে, আমি রাজী হয়ে যাবো, তাই না?'

'হুঁ।'

'কিন্তু তুমি জানলেই বা কি করে?'

'কারণ আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি,' বারবারার চিবুকে চুমু খেয়ে বলল জুড।

জুডের দিকে তাকালে বারবারা। 'তোমার বাবার সঙ্গে তোমার অনেক মিল আছে, আবার ততখনি তফাতও আছে। তোমার কোনো নির্দিষ্ট ইচ্ছে নেই যা তোমার বাবার ছিলো। প্রতিটি ব্যবসা তিনি দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইতেন, আর তুমি? ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতোন।'

'আমার বাবা তাঁর ব্যবসায় যা উন্নতি করেছেন, তারপর আমার আর কিছু করার থাকতে পারে না। আর এই সব ব্যবসা তাঁর নিজেরই হয়ে থাকবে, তাই অহেতুক তাঁর ব্যবসায় মাথা ঘামিয়ে কি লাভ বলো?'

'আর তাই কি তিন বছর আগে যা করেছিলে,' বলল বারবারা, 'সেটা এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুড।

'তোমার বাবা তো প্রথমে খুবই মুষড়ে পড়েন। তারপর আমার মনে হয়, তোমার ব্যাপারটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।'

'আমার তাই মনে হয়,' বলল সে, 'সেই দিনটির কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে, উইক-এন্ড, সেইদিনই আমি M.I.T থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে আসি। আর সেই প্রথম আমি তাঁকে বলেছিলাম, র‍্যাটনে গবেষণার কাজ আমি শুরু করবো।'

'আর যেহেতু গবেষণার কাজে অর্থপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই তোমার বাবার সায় ছিলো না তাতে।'

'এক হিসেবে তাঁর ধারণা ঠিকই ছিলো,' বলল জুড। 'কিন্তু আমার গবেষণার কাজে বাধা দেননি তিনি।'

'হ্যাঁ, তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন,' বলল বারবারা, 'মনে আছে তোমার, তিনি বলেছিলেন, সেটা হবে সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার, আর সেটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন।'

সেইদিনটা ছিলো জুন মাসের। ধীরে ধীরে জুড তার বাবার অফিসে গিয়ে হাজির হলো এক সময়। তার বাবা তাঁর ডেস্কের সামনে বসেছিলেন। ক্লান্ত, বিষণ্ন। রোগাটে চেহারা তাঁর। দেখা মাত্র দারুণ ধাক্কা খেলো জুড, একি চেহারা হয়েছে ওঁর! তবে অত কষ্টের মধ্যেও তাঁর চোখ দুটি ছিলো উজ্জ্বল। জুড প্রথমে তার বাবার চিবুকে চুমু খেলো। তারপর বারবারার। এবং জর্জ গিটলিন, উপস্থিত তিনজন অ্যাটর্নি এবং অ্যাকাউন্টটেন্টদের সঙ্গে করমর্দন করল, সবাই তখন বসেছিল কনফারেন্স টেবিলের সামনে। জরুরী মিটিং ডেকেছিলেন তার বাবা, ক্ষমতা হস্তান্তরের মিটিং। ক্রেনি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের সমস্ত কোম্পানির সর্বোচ্চ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদে ভূষিত হবে জুড, তার বাবা তাঁর সব দায়-দায়িত্ব সত্ত্ব সঁপে দিতে চান তাঁর একমাত্র পুত্র জুডের ওপর। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় সব নথীপত্র প্রস্তুত, জর্জ গিটলিনের সামনে তার বাবা সই করবেন, এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে আজকের পর থেকে ক্রেনি গ্রুফ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক হবে জুড।

একটা অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছিল কনফারেন্স হলে। গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত সবাই তার বাবার দিকে তাকিয়েছিল। তার বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'রাজার মৃত্যু এখনো হয়নি,' শান্ত ভাবে বললেন তিনি। 'তবে তাঁর অবস্থা এখন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

কনফারেন্স রুম তখনো শান্ত, স্তব্ধ।

'আমি আমার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছি।' একটু থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। 'ক্ষমতা হস্তান্তর সব সময়েই কঠিন হয়ে ওঠে। সরকারী এবং বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানেই একই সমস্যা দেখা দেয়, যেমন দেখা গিয়েছিল আমার বাবার ক্ষেত্রে, যখন তিনি তাঁর সব ক্ষমতা আমাকে হস্তান্তর করতে গিয়েছিলেন। এখন থেকে আমার সমস্ত কোম্পানির পরিচালন ভার থেকে শুরু করে নতুন নতুন উৎপাদনের পরিকল্পনা করার দায়িত্ব, সবই তার হবে এখন থেকে। আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য যা একদিন আমার বাবার ছিলো, যা তিনি একদিন আমার হাতে অর্পণ করে গিয়েছিলেন, সেটা আজ আমি আমার ছেলের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি।' এই বলে তিনি এবার জর্জ গিটলিনের দিকে তাকালেন। 'পল, এখন সব কিছু তোমার ওপর নির্ভর করছে। সই-সাবুদ যা করার করিয়ে নাও তুমি।'

উঠে দাঁড়ালেন জর্জ গিটলিন। 'যতোটা সম্ভব চুক্তিপত্র আমি সহজ করে তোলার চেষ্টা করেছি। জুড তুমি আর বারবারা তোমরা দু'জনে চুক্তিপত্রগুলো সই করে দেবে। এ কাজের জন্য বেশ কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে। স্যামুয়েল, কাগজপত্র গুছিয়ে দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ, পারবো বৈকি,' বলল স্যামুয়েল। 'এবার তাহলে শুরু করা যাক।'

এই সময় বাধা দিলো জুড। 'দেখো ড্যাড, আমার মনে হয় আমার প্রস্তাবটা আগে শুনলে ভালো করতে।'

তার বাবা তার দিকে তাকালেন। 'না, আমি তোমার কোনো কথা আর শুনতে চাই না। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, সেটা হবে তোমার সন্তান-সম, তোমাকেই তার যাবতীয় যত্ন নিতে হবে।'

'ঠিক আছে ড্যাড,' জুড এবার জর্জ গিটলিনের দিকে তাকালো।

এরপর উকিল সব নথীপত্র তাদের সামনে মেলে ধরল। জুড এবং বারবারা সই করে দিলো এক এক করে। তিন ঘন্টা সময় লাগল সমস্ত কাগজপত্র সই করতে। বৃদ্ধ মিঃ ক্রেনিকে শেষ দিকে ক্লান্ত এবং ধূসর দেখাচ্ছিল। শেষ পৃষ্ঠাটা সই হয়ে যাওয়ার পর জুডের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার চিবুকে চুমু খেলেন। 'বৎস, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!'

টেবিলের সামনে এসে জুডের চিবুকে চুমু খেলো বারবারা। এই সময় জর্জ গিটলিন এবং অন্যেরা তার সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিনন্দন জানালো তাকে।

তাদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে জুড ধরা গলায় বলল, 'হয়তো অনেকেই আপনারা আমার পরিকল্পনাটা পছন্দ করবেন না, তবে বাবা যা বললেন, এখন এই শিশুটা আমার, তাই আমাকেই তার সব যত্নের ব্যবস্থা নিতে হবে।' একটু থেমে সে বলতে থাকে, 'প্রথমেই আমি আমাদের সমস্ত কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের পদ থেকে অবসর নিয়ে সেই সব লোকদের স্থলাভিষিক্ত করব, যারা আমার বিশ্বস্ত, তারা ছাড়া অন্য কেউ নয়।'

জর্জ গিটলিন মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'জুড, তোমার এই চিন্তাধারা খুবই ভালো।'

ম্লান হেসে তাঁর দিকে তাকাল জুড। 'আঙ্কেল পল, আপনার এই অনুমোদনের জন্য আমি খুশি,' বলল সে। 'আমার তালিকায় আপনার নামই আমি প্রথমে রেখেছি।'

❑ আট ❑

'তুমি পাবে বছরে এক মিলিয়ান ডলার,' বলল জুড।

'কিসের জন্য,' বলল বারবারা, 'আমার আর টাকার কি প্রয়োজন? তোমার বাবা ইতিমধ্যেই আমার জন্য একটা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে গেছেন। আমি বিত্তবান। তাছাড়া কানেকটিকাটে এবং পাম বীচে আমার অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে।'

'তুমি এখন বিধবা, তাই তোমার জীবনধারা বদলে যেতে বাধ্য। আমার বাবার পাশে থেকে তোমার একটা সামাজিক জীবন গড়ে উঠেছে। দেশের মানুষ বড় বিচিত্র। যে মুহূর্তে তারা আবিস্কার করবে টাকার অভাবে তুমি তাদের জন্য কিছুই করতে পারোনা, তারা তখন তোমার কাছ থেকে সরে যাবে।'

'তাদের আমার আর প্রয়োজন নেই,' বলল সে। 'আমি একলা থাকতে চাই।'

'কিন্তু বাবার সঙ্গে থাকার সময় তুমি তো খুবই সক্রিয় ছিলে, আর এখন একেবারে শূন্য?' বলল জুড, 'কেন, তোমার নিজস্ব একটা জীবন গড়ে তুলতে পারো না?'

রূপালি-নীল চোখ দু'টি তুলে তাকালো বারবারা। 'জানি না কি ভাবে নতুন জীবন আমি গড়ে তুলবো। বিয়ের আগে আর পরে তোমার বাবার সুবিধে মতো আমি আমার জীবনটা গড়ে তুলেছিলাম। ভেবেছিলাম তোমার বাবাকে বিয়ে করার পর বুঝি আমার জীবনে একটা পরিবর্তন আসবে। কিন্তু তা হলো কই? সেই তো তোমার বাবার সহকারীই রয়ে গেলাম। পরিবর্তনের মধ্যে তাঁর বাড়িতে এসে উঠলাম, আর পদবী বদলে গেলো, এই যা—'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি তাঁকে ভালবাসতে, বাসতে না?'

'হ্যাঁ,' উত্তরে বলল সে, 'আর আমার বিশ্বাস, তিনিও আমাকে ভালবাসতেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে না ছিলো সেক্স, না পেয়েছি সন্তানের মা হওয়ার সম্মান।'

জুড তার কৌচের মুখোমুখি একটা কৌচে বসে বলল, 'তুমি এখনো যুবতী। এখনো তুমি তোমার জীবনে সুখ খুঁজে পেতে পারো।'

'আমার বয়স এখন আটচল্লিশ,' দুঃখের সঙ্গে বলল বারবারা। 'আমার দিকে তাকিয়ে দেখো। আমার আকর্ষণ বলতে শুধু আমার টাকা। আর তোমার কথা মতো সুখ খুঁজতে গেলে আমাকে যুবতী মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।'

'ভুল করছ তুমি,' বলল জুড়। 'তোমার মুখ আর শরীর এখনো সুন্দর আছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই তোমার বয়স পনেরো বছর কমিয়ে দিয়ে স্রেফ তিরিশ বছরে নামিয়ে আনতে পারি আমরা।

হাসল বারবারা। 'কসমেটিক সার্জারি?' একটু থেমে সে আবার বলল, 'জীবন সম্পর্কে

আমি তো কিছুই জানি না। আমার মনে হয়, জীবনে একবারই মাত্র আমি যৌনসুখ উপভোগ করেছিলাম, একটা গাড়ির পিছনের আসনে, আমি তখন কিশোরী, আর আমি সেটা ঘৃনা করি এখনও।'

'অবশ্যই সেটা শোধরান যায়,' বলল সে।

'তুমি তোমার ঠিক বাবার মতো কথা বলছ,' বলল বারবারা। 'তোমার বাবা ঠিক এমন ভাবেই কথা বলতেন।'

হাসল জুড। 'তোমার মনে আছে, আমার বয়স যখন বারো, তখন কানেকটিকাটে বাড়ির লনের উইলো গাছ থেকে একবার পড়ে গিয়েছিলাম?'

হাসল বারবারা। 'উইলো গাছের ডাল নরম জেনেও কেন যে তুমি সেই গাছে চড়তে গিয়েছিলে তার কৈফিয়ত না দেওয়ার জন্য তোমার বাবা খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কেনই বা তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে না তখন?'

'গাছে চড়েছিলাম তোমার ঘরের খোলা জানালার দিকে নজর দেওয়ার জন্য, ঘরের ভেতরে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় তোমার পায়চারি করার দৃশ্য দেখার জন্য। তোমাকে নগ্ন দেখার মুহূর্ত থেকে আমি হস্তমৈথুন করতে শুরু করে দিই।'

'আমি বিশ্বাস করি না,' বলল বারবারা।

'এটা সত্য,' উত্তরে বলল জুড। 'আর আমার রাগমোচন হওয়া মাত্র গাছের ডালের ওপর থেকে হাত তুলে নিই। তাতেই আমি গাছ থেকে পড়ে যাই।'

হাসতে শুরু করে দিলো বারবারা। 'আমি কখনো ভাবিনি, কখনো দেখিনি এমন দৃশ্য।'

'খুব খারাপ,' দুঃখ করে বলল জুড। 'আমি এখন ভাবি, তুমি যদি আমার দিকে তাকাতে, আমার সেই হস্তমৈথুনের দৃশ্য দেখতে তাহলে আমার উত্তেজনা আরো বেড়ে যেতো।'

নীরব হলো বারবারা।

'সেদিনের কথা ভাবলে আজও আমার লিঙ্গরাজ কেমন কঠিন হয়ে ওঠে।' উঠতে যাচ্ছিল বারবারা, তার হাত চেপে ধরে তাকে কৌচের ওপর ঠেসে ধরে বলল জুড, 'বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেছেন, হতাশা মানুষকে পাগল করে তোলে।'

'আমি তো সেটা শুনিনি কখনো,' বলল বারবারা।

'ওখানে ঠিক ওই ভাবে বসে থেকে আমাকে লক্ষ্য করো।'

'না,' প্রতিবাদ করে উঠল বারবারা। 'সেটাই হাবে আসল পাগলামি। তখন তুমি যেমন বাচ্চা ছেলে ছিলে আর আমি সেই কিশোরোত্তীর্ণ মেয়ে যার নগ্ন দেহ তুমি লুকিয়ে গাছের আড়াল থেকে দেখতে সেরকমটি আমি আর নেই।'

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে উঠল জুড, 'কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। তুমি আর আমি আগের মতোই আছি। এখনো তুমি আগের মতোই সুন্দরী আছো।' এই বলে সে তার ট্রাউজারের জীপার খুলে নীরস গলায় বলল, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু লক্ষ্য করে যাও আমাকে।'

এক হাতের আঙুল দিয়ে বারবারার হাতে বিলি কাটতে থাকে এবং তার অপর হাতে তার উদাত্ত রিরংসার ফলাটা ক্রমশ ফুলে-ফেঁপে বড় হতে থাকে। দৃশ্যটা অনুভব করতে

গিয়ে বারবারার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম, তার দেহটা তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করছিলো, তার হাতের ঘর্ষনের ফলে তার রিরংসাদন্ডের ত্বক উন্মোচিত হয়ে লাল রক্ত-ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে দেখা গেলো। তার হাতের মুঠো ক্রমশ দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকল। আর তারপরেই তার গলা থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো, সেই সঙ্গে একটা হিস্‌হিস্ শব্দ। চোখ দু'টি তার অর্ধ মিলিত হলো, তারপরেই তপ্ত সুধা তার হাত ভর্তি হয়ে গেলো, কিছুটা ছিট পড়ল তার ট্রাউজারে।

তারপর জুডের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরাল বারবারা। মেঘে ঢাকা তারার মতো তার চোখ দুটি এখন ধীরে ধীরে আবার আগের মতো স্বাভাবিক রূপালি-নীল রঙে রূপান্তরিত হতে শুরু করল। কিছু সময় বারবারাকে নিরীক্ষণ করার পর ধীরে ধীরে জুড তার মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল, 'পনেরোটা বছর কেমন কমে গেলো, দেখলে?'

উত্তর দিলো না বারবারা।

'পরিস্কার করার জন্য কিছু দাও আমাকে,' বলল জুড। 'দেখছ, কি বিশ্রী নোংরা হয়ে গেছে আমার হাত আর—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে তার নাভির নিচের দিকে তাকাল।

বার-এর পিছন দিকে চলে গেলো বারবারা নীরবে এবং একটু পরেই একটা তোয়ালে হাতে নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল জুডের সামনে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে জুড বলল, 'তুমি নিজের হাতে পরিস্কার করে দাও।'

কথা না বলে বারবারা পরিস্কার করার কাজে মন দিলো। তার চোখে চোখ রেখে বলল জুড, 'আঃ, কি সুন্দর তুমি!'

'কিন্তু আমি তো নিজেকে বোকা মনে করছি। বোকা না হলে তোমার কথায় ভুলে —' কথাটা অসমাপ্ত রেখে জুডের নাভির নিচে সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিতে থাকে।

'না, তুমি বোকা নও।' বলল সে। 'তুমি এখন মুক্ত, যেমন আমি।'

তারপর নোংরা তোয়ালেটা টয়লেটে রেখে দু'গ্লাস স্কচ নিয়ে এসে একটা গ্লাস জুডের হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল , 'তুমি যেরকম বললে, কসমেটিক সার্জারি সত্যি সত্যি কাজ করবে তো?'

'হ্যাঁ,' উত্তরে বলল সে, 'এমন কি ফল ভালোও হতে পারে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল বারবারা, 'ঠিক আছে। এখন বলো কি ভাবে তার ব্যবস্থা আমি করব?'

'ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে,' জবাবে বলল জুড। 'বিমান তোমাকে বোকা র‍্যাটনে নিয়ে যাবে। সেখানে ডাক্তার তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

লন্ডন থেকে সান ফ্রান্সিসকোয় প্যান আমেরিকান বিমান উড়ে চলেছে। বিমানের ক্যাপ্টেন বিমান ভ্রমনের জন্য যাত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়ে মাইক্রোফোনে ঘোষণা করল, মিনিট বারোর মধ্যেই বিমান সান ফ্রান্সিসকোর মাটি স্পর্শ করবে। এরই ফাঁকে দু'পাশে গোল্ডেন গেট ব্রীজ এবং অকল্যান্ড বে ব্রীজের সৌন্দর্য দেখে নিতে যেন ভোলেননা যাত্রীরা, এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিলো ঘোষিকা।

জানালা পথে সেই সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার পর বারবারা তার হাতব্যাগ থেকে মিনি আয়নাটা বার করে তাকাতে গিয়ে অবাক হলো। কসমেটিক সার্জারির জন্য জুড তাকে বোকা র‍্যাটনে পাঠানর পর দু'বছর অতিক্রান্ত। আয়নায় তার মুখটা এখন লালিত্যে ভরে উঠেছে, বয়স এখন তার তিরিশে নেমে এসেছে। এই প্রথম নিজেকে একজন মহিলা হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে সে। দ্রুত মেক-আপ সেরে সে এবার ভাবতে বসল, এই দু'বছর না জানি জুডের কি রকম পরিবর্তনই না হয়েছে। খবরের কাগজে এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ক্রেনি ইন্ডাস্ট্রিজের বাড়বাড়ন্তর অনেক খবর সে পড়েছে। জুডের জন্য তার মনটা খুবই খারাপ হয়ে আছে। কতদিন, কতদিন দেখেনি তাকে! লন্ডনে ডরচেস্টার হোটেলে তারবার্তা এসে পৌঁছেছিল বিমানে ওঠার একটু আগে ঃ

''সান ফ্রান্সিসকোর বাইরে ক্রেনি সিটিতে ক্রেনি ইন্ডাস্ট্রিজের ওয়ার্ল্ড হেডকোয়ার্টারের দ্বারোদঘাটন যদি তুমি করো, খুব ভালো লাগবে। ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। তোমাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। ভালোবাসা জেনো, জুড।''

বিমান থেকে নামা মাত্র প্রথমেই দেখা হলো তার ফাস্ট এডির সঙ্গে। 'মিসেস ক্রেনি, আপনাকে দেখে খুবই খুশি হলাম।' এই বলে সে একগুচ্ছ গোলাপ এবং একটা খাম তুলে দিলো বারবারার হাতে।

তাকে প্রতিসম্ভাষণ জানিয়ে খামটা খুলে ফেলল সে। কার্ডের ওপর জুড নিজের হাতে লিখেছে ঃ ''বারবারা, ঘরে ফেরার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে। ভালোবাস রইল, জুড।''

তারপর মার্কাস মারলিনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলল ফাস্ট এডি, 'ইনি হলেন মার্কাস মারলিন, জুডের পারসোনাল অ্যাসিসটেন্ট।'

তার সঙ্গে করমর্দন করে বলল বারবারা, 'মিঃ মারলিন, আমি খুশি হলাম আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে।'

বিমানবন্দরের বাইরে একটা লিমুসিন গাড়ি অপেক্ষা করছিল। সোফার দরজা খুলে দিতেই উঠে বসল বারবারা। দ্রুত স্যাম্পেনের বোতল খুলে তার জন্য একটা গ্লাস ভর্তি করে তার হাতে তুলে দিলো এডি। 'আপনার প্রিয় ড্রিঙ্কস,' বলল সে।'

'মনে রাখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'সত্যি আপনাকে দারুণ ভালো লাগছে মিসেস ক্রেনি।'

মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বলল, 'ফাস্ট এডি, সত্যি আমি নিজে সুস্থবোধ করছি।' স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'জুড কেমন আছে?'

'তিনিও খুব ভালো আছেন ম্যাডাম,' বলল সে, 'কিন্তু তিনিও ঠিক তাঁর বাবার মতো হয়েছেন। সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকেন।' সামনের আসনে সোফারের পাশে বসল ফাস্ট এডি।

এই সময় মারলিন কাস্টমসের কাজ শেষ করে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। 'মিসেস ক্রেনি, আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

গাড়িতে উঠে মারলিন বলল, 'বিমান বন্দরের একেবারে শেষ প্রান্তে আমাদের সর্বাধুনিক মডেলের হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে, আপনার পছন্দ হবে।'

মিনিট পঁচিশ পরেই ক্রেনি সিটির মাটি স্পর্শ করবে হেলিকপ্টার। জুডের তৈরী শহর। ছ'শো অ্যাপার্টমেন্ট, একশো প্রাইভেট বাড়ি, বারোটা অফিস বিল্ডিং। তাছাড়া এই শহরে আছে স্কুল, শপিং সেন্টার এবং হাসপাতাল। নিউ ইয়র্ক ছেড়ে এখানে জুড তার নতুন কোম্পানির হেডকোয়ার্টার গড়ে তুলেছে জাপানি প্রতিষ্ঠান মিতসুবিশি, নিসান, আকাই, ন্যাশনাল প্যানাসনিক এবং সোনির ধাঁচে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য। তবে এ সবই জুডের একটা এক্সপেরিমেন্ট।

গাড়ি থেমে যায়। প্রথমে মারলিন গাড়ি থেকে নেমে বারবারার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। অপর হাত সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে প্রসারিত করে সে বলল, 'আমাদের প্রথম মডেলের হেলিকপ্টারে আপনার নাম থাকবে, এরকমই ইচ্ছে ছিলো মিঃ ক্রেনির।'

রূপালি রঙের হেলিকপ্টারের দিকে চোখ-ভরা জল নিয়ে তাকাল বারবারা। বড় বড় অক্ষরে হেলিকপ্টারের গায়ে লেখা ছিলো ঃ বারবারা ওয়ান।

❑ নয় ❑

বারবারা সুইটের সামনে এসে বলল, 'এ যেন একটা কলেজ ক্যাম্পাস। ওদের সবাইকেই বাচ্চা ছেলের মতোন দেখাচ্ছে। আমার মনে হয় না, কারও বয়স তিরিশের ওপর হবে না।'

হাসল জুড। 'আমি ছাড়া।'

হাসল বারবারাও। চাবি ঢুকিয়ে সে তার সুইটের দরজা খুলে ভেতরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করল জুডকে। তাকে অনুসরণ করল জুড। বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসাল বাববারা। তারপর অ্যাটাচড বার থেকে দু'গ্লাস স্কচ নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। দুজনে এ ওর দিকে মুখ করে কৌচের ওপর বসেছিল। মাঝখানে একটা সেন্টার টেবিল। টেবিলের ওপর স্কচের গ্লাস।

জুড তার গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'চীয়ার্স।'

'চীয়ার্স।' প্রত্যুত্তরে বলল বারবারা।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল জুড, 'এখন তোমার সম্পর্কে কিছু বলো, প্রায় বছর দুয়েক তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিলো না।'

'আমি এখন অনেক বদলে গেছি,' বলল বারবারা। 'আমাকে তুমি এখন যা দেখছ, তোমার পছন্দ হয়?'

মাথা নাড়ল জুড। 'এখন আমি বুঝতে পারছি, তুমি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তুমি তোমার নিজের। আর আগে তুমি যেন একটা স্যাটেলাইট ছিলে, বাবার দিকে ঘোরানো। একটু থেমে সে

আবার বলল, 'আমি কেন যে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছো? প্রথমেই তোমাকে বলে রাখি, তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।'

'আমাকে দরকার? তোমার পক্ষে আমি একটু বেশী বয়সী হয়ে যাচ্ছি, না?'

হাসল সে। 'স্পর্শকাতর।'

'ঠিক আছে,' বারবারা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মনে কি আছে?'

'ভিয়েতনাম যুদ্ধ জনসনকে বাক্সবন্দী করে ফেলেছে। তিনি নিজে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এ-যুদ্ধ থামবে না। এরই মাঝে অনেক, অনেক টাকা রোজগারের সুযোগ এসে গেছে আমাদের কাছে।'

'তা এর সঙ্গে আমাকে জড়ানর উদ্দেশ্য কি, তা তো এখনো বুঝতে পারলাম না।'

'জেনারেল কোনালিকে ন্যাটো থেকে ফিরিয়ে এনে প্রতিরক্ষা বিভাগে সমরাস্ত্র সংগ্রহের ইনচার্য করে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'বেশ তো, এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

হঠাৎ জুডের চোখ দু'টো ভাবলেশহীন হয়ে পড়ে।

'এক সময় শুনেছি, তার সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গতা ছিলো, তার বিছানায় তুমি শুয়েছিলে,' বলল জুড। 'বিছানায় এক সাথে অমন একজন লোকের সঙ্গে শুলে ঘুষের চেয়ে অনেক বেশী অস্ত্র বেচা যায়।'

'হ্যাঁ, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাকে বিয়ে করতে চায়,' বলল বারবারা অবশেষে।

'না, তাকে অমন কাজটি কখনো করতে দিও না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে। 'সেক্ষেত্রে তার ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।'

বারবারা তাদের খালি গ্লাসে ফিরে আবার স্কচ ঢালতে গিয়ে বলল, 'তোমাকে জানানর জন্য বলি, তাকে বিয়ে করার কোনো পরিকল্পনাই আমার ছিলো না। যাইহোক, ঠিক কি কি ধরনের জিনিষে তুমি আগ্রহী?'

সমরাস্ত্র বহনকারী হেলিকপ্টার। ক্রাইসলার গাড়ি, হগেস অ্যান্ড বেল, জেনারেল মোটরস, জ্যাকুজি এবং পিয়োজিও ইতিমধ্যেই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে।'

'আর এতে প্রচুর টাকা আসবে, এই তো?' বলল বারবারা।

'হ্যাঁ, বেশ কয়েক বিলিয়ান ডলার তো বটেই।'

'বেশ কয়েক বিলিয়ান ডলার?' বারবারা তার ড্রিঙ্ক শেষ করে বলল, 'সেটা ভালো বারবনিতার বেতন।'

উত্তর দিলো না জুড।

'তা তোমার সেই কল্পনার কি হলো?' জিজ্ঞেস করল সে। 'সেই যে সেই অসৎ কাজের স্বপ্ন দেখার কি হলো?'

'এখনো সেই স্বপ্ন দেখি বৈকি! কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্যবসাও তো দেখতে হবে?'

'তোমার বাবা যদি বলতেন আমি ইতস্তত করতাম না, কারণ আমি তাঁকে ভালোবেসে

ফেলেছিলাম, আর তাঁর ক্ষেত্রে আমি নিজেকে একজন বারবনিতাও ভাবতাম না।'

'আমরা আমাদের পথে, আমাদের নিজেদের কারণে সবাই বেশ্যা,' বলল জুড। 'ক্ষমতা, অর্থ, সেক্স, আদর্শ সবই জীবনের পণ্যদ্রব্য।'

'তুমি কি সত্যিই সেটা বিশ্বাস করো?' জিজ্ঞেস করল বারবারা।

মাথা নাড়ল জুড।

'তুমি ভুল করছ,' নরম গলায় বলল বারবারা। 'একটা অতি জরুরী ব্যাপার তুমি ভুলে গেছো?'

'কি সেটা?'

বারবারার চোখ দিয়ে অশ্রুর বাদল নামতে দেখা যায়। 'ভালোবাসা।'

মেডিক্যাল কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের ওপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোফিয়া বলল, 'তুমি যে কখনো বিয়ে করেছ কিংবা করোনি, এ ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি এখানে। কিন্তু, এতদিন বিয়ে করোনি কেন? সাধারণত তোমার মতো এতো বয়সে, বেয়াল্লিশ বছর বয়সে—'

'তা তুমিও তো বলেছো তোমার বয়স তিরিশ, এ বয়সে তোমার মতো মেয়ের তো অনেক আগেই বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। তা তুমি বিয়ে করলে না কেন?'

'আমার বিয়ে না করার একটা কারণ অবশ্যই আছে,' উত্তরে বলল সোফিয়া, 'আমার যা পেশা, আমার রুগীদের পাশে চব্বিশ ঘন্টা হাজির থাকা উচিত। তাই বিয়ে করার কথা ভাবিইনি।'

'সম্ভবত আমার কেসও তোমার মতো, তবু আমি বিয়েতে আপত্তি করিনি, আর তুমি?'

'এক এক সময় মনে হয়, আমার বিয়ে করা উচিত ছিলো, আমার ছেলে-মেয়ে হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু আমার সেই ইচ্ছে কখনো পূরণ হয়নি।' একটু থেমে সোফিয়া বলল, 'এই কমপিউটার রিপোর্টে দেখছি তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালোই আছে। তবে তোমাকে হাসপাতালে দিন তিনেকের জন্য ভর্তি করাতে হবেই।'

'বেশ তো পরের উইক-এন্ডে বোকা র‍্যাটনে ব্যবস্থা কর,' জুড বলল, 'যে ভাবেই হোক আমরা সেখানে উপস্থিত থাকছি।'

এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল, রিসিভারটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ শোনার পর বলল জুড, 'ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও তাকে।' তারপর সোফিয়ার দিকে ফিরে বলল সে, 'লি চুয়ান আসছে। ক্রেনি ফার্মাসিউটিক্যালের এশিয়ান সেলস ম্যানেজার।' সোফিয়া উঠতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বলল সে, 'যেও না, প্রথমে তার সঙ্গে মিলিত হও।'

কেবিনে এসে প্রবেশ করল লি চুয়ান। তার সঙ্গে সোফিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলো জুড। হাসল সোফিয়া। 'আপনার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ।'

'খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে,' সামান্য একটু মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল লি চুয়ান।

সোফিয়া তার স্টেটরুমে ফিরে গেলো অতঃপর। সোফিয়া কেবিন থেকে বেরিয়ে

যাওয়ার পর তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হওয়া মাত্র লি চুয়ান জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ওই ডঃ আইভানসিক কি যুগোশ্লাভিয়ান?'

'হ্যাঁ,' অবাক হলো জুড, 'তা আপনি জানলেন কি করে?'

'নামটা আমি শুনেছি। এক সময় মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে কাটিয়েছিল সে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সে তাঁর পাশেই ছিলো। তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের দলের চারজনের কাছ থেকে একটা গুজব রটেছিল সেই সময়, এই ডাক্তারই নাকি মাও-সে-তুংকে হত্যা করেছিল।'

জানালার দিকে তাকিয়ে জুড বলল, 'কমপিউটার চেক-আউটে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আমরা পাইনি।' লি চুয়ানের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে আরো বলল, 'মনে হয়, আমার জন্য আরো কিছু খবর তুমি সংগ্রহ করতে পারো।'

'ঠিক করে বলতে পারছি না,' লি চুয়ান হেসে উঠে বলল, 'ইতিমধ্যে সে যদি আপনাকে কোনো পিল বা ট্যাবলেট খেতে দেয়, খাবেন না।'

জুডও হাসল। 'আমার মনে হয় না, সে ব্যাপারে আমার কোনো সমস্যা দেখা দেবে।'

বিমান হংকং-এর মাটিতে অবতরণ করতেই জুড ক্রেনি তাড়াতাড়ি বিমান থেকে নেমে এলো। বিমান বন্দরে তার জন্য লিমুসিন গাড়ি অপেক্ষা করছিল তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ফার্স্ট এডি টেবিলে চেরি ও কোক রেখে গিয়েছিল। এই সময় লাউঞ্জে এসে হাজির মারলিন। কোলা ড্রিঙ্কে জুড যতক্ষণ না কোকেন মেশায়, অপেক্ষা করতে থাকল সে।

তার দিকে তাকাল জুড। 'টেলেক্স করে জানিয়ে দাও ডঃ আইভানসিকের নিরাপত্তা যেন আরো বেশী জোরদার করা হয়। ডাক্তার যে মাও-সে-তুং-এর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তার পাশে হাজির ছিলো, খবরটা কি ভাবে আমাদের কাছে চেপে রাখা হয়েছে, খবর নাও। আর তাদের এও বলো, লি চুয়ানের গতিবিধির ওপর তারা যেন কড়া নজর রাখে। আমার সন্দেহ, সে তার নিজের জন্য কোয়ালুড (মাদক দ্রব্যের) আদান-প্রদান করতে যাচ্ছে।'

তার দিকে তাকাল মারলিন। 'ঠিক আছে স্যার, আপনার আর কিছু বলার আছে?'

মাথা নাড়ল জুড। 'আমি এখন একটু শুতে যাচ্ছি,' বলল জুড। 'এখানকার লোহার কারবারি এস য়ুয়ান লিং-এর সঙ্গে আমার একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে গেছে লি চুয়ান। এ ব্যাপারে চুয়ানের কাছ থেকে খবর পেলেই আমাকে জাগিয়ে দিও।'

জুডের ইচ্ছে মতো সোফিয়া তার পোশাক কেনাকাটা করার জন্য হংকং-এর শপিং মার্কেটের একটা বিখ্যাত দোকানে গিয়ে হাজির হলো। ফরাসী সেলসগার্লেরা, তার মতো বিত্তবান খদ্দেরকে পেয়ে গর্বিত। তারা তাকে ফরাসী "ভোগ" ম্যাগাজিন সহ আরো কয়েকটা ম্যাগাজিন দেখাল পোশাক পছন্দ করার জন্য। তারপর তারা তাকে তাদের ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। একটু পরেই সোফিয়াকে একটা বিরাট ড্রেসিংরুমে দেখা গেলো। তার সঙ্গি ষ্টুয়ার্ডেস গিনিকে একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেলো।

সোফিয়া তখন পোশাকমুক্ত হচ্ছিল তার দেহের নিখুঁত মাপ দেওয়ার জন্য। পরনে শুধু ব্রেসিয়ার এবং প্যান্টি রেখে দিলো।

টেপ হাতে ম্যানেজার এগিয়ে এলে সোফিয়া এবার তার শেষ দুটি আবরণ-ব্রেসিয়ার এবং প্যান্টি দেহমুক্ত করে তার সামনে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করল। পেশাদারি ভঙ্গিমায় সেলসগার্ল তার দেহের মাপ নিলো। একটু পরেই দু'জন মহিলাকে ড্রেসিংরুমে রেখে চলে গেলো।

সোফিয়ার দিকে তাকাল গিনি। 'আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম, আপনার এমন একটা ফ্যান্টাস্টিক শরীর আপনার পোশাকের আড়াল থেকে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না।'

'ধন্যবাদ,' বলল সোফিয়া।

'আর এই জন্যই মিঃ ক্রেনি আপনাকে নতুন সাজে সাজাতে চেয়েছেন।'

হাসল সোফিয়া। 'আমার মনে হয় উনি ওঁর সব মেয়েবন্ধুদের জন্যই এরকম করে থাকেন।'

হাসল গিনি। 'সবার জন্য নয়। তবে এই প্রথম তিনি তাঁর ডাক্তারের জন্য নতুন পোশাকের ফরমাস দিলেন।

একটা প্রমাণ সাইজের আয়নায় নিজের নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়েছিল সোফিয়া। আর তার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল গিনি।

'একটা সত্যি কথা বলবেন?' গিনি জিজ্ঞেস করল। 'আপনি কি আপনার স্তন দুটো কখনো প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছিলেন?'

মেয়েটির চোখের ওপর স্থির দৃষ্টিতে তাকালো সোফিয়া। 'না, কখ্খনো নয়।'

'আমি বিশ্বাস করি না,' বলল গিনি। 'ও দুটো একেবারে নিখুঁত।'

আয়নায় তখনো তাকে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে সোফিয়া বলল। 'বিশ্বাস না হলে তুমি নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।'

মুহূর্তের জন্য একটু ইতস্তত করার পর গিনি তার একটা হাত সোফিয়ার পিঠের ওপর রেখে অপর হাতের মুঠোয় পালা করে তার স্তন দু'টো চেপে ধরল। আয়নায় তারা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। গিনির হাতের উষ্ণ স্পর্শে স্তনের বোঁটা দু'টো শক্ত হয়ে উঠছে। অনুভব করল সোফিয়া।

'এবার তো তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

ধীরে ধীরে তার বুকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল গিনি, 'হ্যাঁ।'

সেই মুহূর্তে ড্রেসিংরুমের দরজা খুলে যেতে দেখা যায়। অনেকগুলো মেয়েকে এক গাদা পোশাক হাতে নিয়ে ঢুকতে দেখেই গিনি তার চেয়ারে গিয়ে বসল।

❑ দশ ❑

লিমোসিন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো সোফিয়া এবং গিনি। 'আপনার কেবিনে সব কিছু রেখে দিয়েছি,' বলল গিনি।

'ধন্যবাদ,' হাসল সোফিয়া। তারপরেই তার কথায় স্নায়ু দুর্বলতা দেখা দিলো. 'তোমার কি

মনে হয়, এভাবে আমাকে তার পছন্দ হবে?'

হাসল গিনি। 'যদি তিনি পছন্দ না করেন, তাহলে তাকে পস্তাতে হবে। আমি বলছি, আপনাকে খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছে, চিন্তা বন্ধ করুন।'

ঢুকতে গিয়ে লি চুয়ানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো সোফিয়ার। 'ডক্টর, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুশি হলাম। ভালো মতো আপনার কেনাকেটা হলো তো?'

'হ্যাঁ, খুবই ভালো, ধন্যবাদ,' জিজ্ঞেস করল সে, 'মিঃ ক্রেনি কি বিমানে উঠে গেছেন?'

'হ্যাঁ, উনি এখন কেবিনে, আপনার জন্য এই বার্তাটা দিয়েছেন,' হাত বাড়িয়ে একটা চিরকুট সোফিয়ার হাতে তুলে দিয়ে সে আবার বলল, 'ডক্টর, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশী হলাম।' একটু থেমে সে এবার চীনা ভাষায় বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার যে আগেই দেখা হয়েছিল কখনো, এ কথা আমি কিন্তু মিঃ ক্রেনিকে বলিনি।'

তার দিকে তাকাল সোফিয়া। চুয়ানের চোখ দু'টো ভাবলেশহীন। 'ধন্যবাদ কমরেড,' চীনা ভাষাতেই উত্তর দিলো সে।

'সাঙ-এর সঙ্গে এক সময় আপনি যে কথা বলেছিলেন, আমি ওঁকে বলেছি। মনে হয়, তাতে আপনার প্রতি ওঁর বিশ্বাস আরো বেড়ে যাবে। যদি আপনি তাঁর মন্তব্য আমাকে জানান, আমি কৃতজ্ঞ হবো।'

'ঠিক আছে কমরেড, তাই করবো।'

'আশাকরি ডক্টর, আবার আমাদের দেখা হবে,' এবার সে ইংরেজীতেই বলল।

'আমিও তাই আশাকরি মিঃ লি চুয়ান,' সে-ও ইংরেজীতেই জবাব দিলো। 'আপনার সাহায্যের জন্য আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

লাউঞ্জ ছেড়ে তাকে চলে যেতে দেখার সময় গিনিকে তার লাগেজপত্তর বহন করে নিয়ে আসতে দেখল সোফিয়া।

সোফিয়ার বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল। 'হ্যাঁ,' নীরস গলায় উত্তর দিলো সোফিয়া।

'আমি দুঃখিত,' জুডের কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে। 'তোমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে না তোলার জন্য।'

'সে ঠিক আছে,' উত্তরে বলল সোফিয়া। 'ভালো কথা, সুন্দর সুন্দর পোশাক উপহার দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।' তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'ভালো বার্তা পেয়েছো?'

'হ্যাঁ, জানতে চাও নাকি?'

'বোলো না যেন তোমার সঙ্গে একজন ম্যাসাজ করার লোক আছে!'

'একজন নয় দু'জন আছে,' হাসতে হাসতে বলল জুড। আর তারা বেশ ভালোই। তারা কেবল হনলুলু পর্যন্ত যাবে, তারপর সেখান থেকে হংকং-এ ফিরে যাবে তারা। যাইহোক, এব্যাপারে তুমি পরে ভাবতে পারো। আমি তোমাকে নৈশভোজে ডেকে নেবো। তাড়ার কিছু নেই। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।'

উত্তর দেওয়ার আগেই ফোনটা কেটে গেলো। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে সে

তার নরম বিছানায় ততোধিক তার নরম দেহটা এলিয়ে দিলো।

সোফিয়ার কেবিনে গিনি কফি দিতে এলে সে তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে বলল, 'আজ তোমাকে কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে গিনি, কি ব্যাপার, কোনো গোলমাল?'

গিনির চোখের পাতায় জল টলটল করতে থাকে। 'দয়া করে ওঁর কাছে যাবেন না। অন্তত আজ রাতে তো নয়ই!'

'গিনি!' নরম গলায় বলল সে, 'ছেলেমানুষি করো না।

'প্লিজ,' প্রায় ভিক্ষে চাওয়ার মতো করে বলল গিনি। 'অন্য মেয়েদের মতো সে তোমাকে তার খেয়ালখুশি মতো ব্যবহার করুক, আমি তা চাই না। সে তোমাকে কখনোই তার নিজের করে নেবে না।'

'ছেলেমানুষ তুমি,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল সোফিয়া, 'তুমি বুঝবে না, প্রত্যেকেরই একটা আলাদা জগৎ আছে, কারোর না কারোর অতি আপনজন সে—'

'তার মানে তুমি তাকে ভালোবাসো না?' সোফিয়ার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করল গিনি।

'না,' বলল সোফিয়া, 'আমি তাকে কখনোই ভালোবাসিনি।' পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

তার চোখে চোখ রাখল সোফিয়া। 'সম্ভবত সময় হলেই জানতে—'

জানালায় সূর্যের তেজে তার চোখ জ্বলে যাচ্ছিল। চোখের পাতা বন্ধ করে রোদের তেজ থেকে রক্ষা পেলেও যন্ত্রণায় তার মাথা ফেটে যাচ্ছিল। উঠে বসল সে তার নিজের কেবিনে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। অদ্ভুত, কি করে সিঁড়ি ভেঙ্গে গতকাল ডিনারের পর সে যে তার কেবিনে ফিরে এসেছিল, কিছুই মনে পড়ে না তার। বাথরুমে ঢুকে অ্যাস্পিরিন ট্যাবলেটের সঙ্গে পাঁচ মিলিগ্রাম ভ্যালিয়াম গলাধঃকরণ করল সোফিয়া। তারপর আয়াস করে ঠান্ডা জলে স্নান করল। এবার তার মাথাটা একটু যেন পরিস্কার হতে শুরু করল। শাওয়ার থেকে সরে এসে গা-মোছার জন্য তোয়ালেটা হাতে নিয়ে প্রমাণ-সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়াতেই শিউরে উঠল সে। উঃ, এ কি দেখল সে? আয়নার সামনে নিজের নগ্ন দেহ, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। বুক থেকে শুরু করে নিচে পেট, পেটের নিচের, নিতম্ব পর্যন্ত কালচে-নীল রঙের কালশিরার দাগ থিক্‌থিক করছিল। অবিশ্বাস্য। তার চেয়েও আশ্চর্য তার দুই কুঁচকির চারপাশে খয়েরী রঙের কোঁকড়ান যৌনকেশ যেন অতি যত্ন সহকারে শেভ করা হয়েছিলো। তার কামলালসা এমনি উগ্র ছিল যে, মাউন্ট ভিসুভিয়াসের উদগ্র তার গোপনাঙ্গ দেখে মনে হয় যেন ক্ষতবিক্ষত, মুখটা রক্তের মতো-লাল গতকাল রাতে বুঝি-বা বহু ব্যবহৃত, আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে লাভা নিঃসৃত হলে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম।

ধীরে ধীরে তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তার কেবিনে গিয়ে ঢুকল। বিছানায় বসে গতকাল রাতে কি ঘটতে পারে, ভাববার চেষ্টা করতে থাকল সে। কিন্তু তার স্মৃতির খাতায় সবই শূন্য বলে মনে হলো।

চীফ স্টুয়ার্ড রাওলকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল সে, 'ঠিক কখন আমরা হনলুলুতে পৌঁছচ্ছি?'

'সেকি? ঘন্টা তিনেক আগেই তো আমরা হনলুলু ছেড়ে এসেছি ডক্টর।'

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল সোফিয়া, 'দয়া করে গিনিকে বলবেন আমার জন্যে কফি নিয়ে আসতে?'

'আমি দুঃখিত ডক্টর,' নীরস গলায় বলল সে, 'হনলুলুতে গিনিও নেমে গেছে। যাইহোক, আপনার জন্য এক কাপ কফি আমি পাঠানর ব্যবস্থা করছি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখার পরেই এক এক করে সব মনে পড়ল তার। সে যেন এক দুঃস্বপ্নের। ছোট ছোট দু'টি চীনা মেয়ে, যেন মটরশুঁটির দু'টি দানা, যমজের মতো দেখতে তাদের, আঙুলের ডগায় লাগানো ছিলো আফিমের সেই গুলি দু'টি। আর তারপরেই একটা সুন্দর মেঘের আবছায়া এবং রূপালি কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার চোখের দৃষ্টি। এবং ততক্ষণে সেই মটরশুঁটির দানার মতো ছোট ছোট মেয়ে দু'টির স্পর্শ তার দেহে একটা প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছিল, তার প্রতিটি স্নায়ুতে রক্তফুলের নেশা জাগিয়ে তুলেছিল, একটা উদগ্র কামনা তখন তার সারা দেহের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ছিল। তারপরেই তার দেহের সব উত্তাপ বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ল তার দেহের অভ্যন্তরে। তার রাগমোচন হলো একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। তার দেহটা অবসন্ন হয়ে পড়ল, চোখের সামনে একটা কালো অন্ধকারের পর্দা বুঝি নেমে এলো।

সেই অন্ধকার ভাবটাই পরবর্তীকালে তার দেহের জায়গায় জায়গায় একটা প্রচন্ড যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠল। বাকী রাতটুকু জ্ঞান ফিরে পাওয়ার জন্য সে তার স্নায়ুগুলোর সঙ্গে তুমুল লড়াই চালিয়ে গেছে। তারই মাঝে একবার চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে গিনির মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, তার চোখ দিয়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা আর রাগ ঝরে পড়ছিল তখন। দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছিল গিনি, এবং তারপরেই চাবুক পেটানর শব্দে গম গম হয়ে উঠেছিল, আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল তার মুখ দিয়ে। আর তখনি দরজা খুলে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায় গিনি। এবং জুড এসে ঘরে ঢোকে। তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে সোফিয়া, কিন্তু কোনো শব্দ বা আওয়াজ কানে গিয়ে পৌঁছেচ্ছিল না তার।

অনেক পরে জুডের কণ্ঠস্বর তার কানে এসে পৌঁছয়। 'বরফ, কোকেন আর ACTH অয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসো, শীগ্‌গীর!'

'যন্ত্রণা,' অস্ফুটে বলেছিল সোফিয়া তখন। 'প্রচণ্ড যন্ত্রণা।'

'এখনি সব কষ্ট, যন্ত্রণা নিরাময় হয়ে যাবে,' তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল জুড। তারপরেই একটা ঘন কালো অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল সোফিয়া। তারপরের কথা তার আর কিছু মনে নেই।

আজ সকালে দরজায় নক্ হতেই সোফিয়া সাড়া দেয়, 'ভেতরে এসো।' তখন সবে তার ঘুম ভেঙ্গেছিল।

ঘরে ঢুকে জুড জিজ্ঞেস করে, 'এখন কেমন বোধ করছ?'

'আমি আহত,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে উত্তর দেয় সোফিয়া। 'আমার থেকেও একজন ভালো ডাক্তার তুমি। গতকাল রাতে কি যে ঘটেছিল কিছুই জানি না।'

'আফিমের নেশায় তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে, তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার কেবিনে রেখে যাই আমরা।'

'ধন্যবাদ,' বলল সোফিয়া। 'আমি খুনও হতে পারতাম।'

'মেয়েটি খুবই জিদ্দি,' বলল জুড। 'সে যে এমন ভয়ঙ্কর মেয়ে কেউই আমরা জানতাম না। যাইহোক, তুমি যে সুস্থ হয়ে উঠেছ, তাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি।'

মুহূর্ত খানেক নীরব থেকে সোফিয়া আবার মুখ খুলল, 'তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'ঘন্টা চারেকের মধ্যেই আমরা সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছে যাব,' বলল জুড, 'সেখানে এমন একজন ডাক্তারকে আমি জানি, যে কিনা তোমার দেহের ওই কালশিরার দাগগুলো সারিয়ে তুলতে পারবে।'

সান ফ্রান্সিসকো বিমান বন্দর থেকে হেলিকপ্টারে চেপে ক্রেনি সিটিতে এসে তারা যখন পৌঁছল তখন সকাল এগারোটা। অনেক লোক ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল জুডকে অভ্যর্থনা জানানর জন্য।

প্রথমেই দীর্ঘদেহী, ধূসর চুলের একজন সৌম্য পুরুষ জুডের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, 'জুড!'

তার হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে আবেগ-কম্পিত গলায় বলে উঠল জুড, 'ঠিক সময়ে মিলিত হওয়ার জন্য তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ জিস।' তারপর সোফিয়ার দিকে ফিরে পরিচয় করিয়ে দেয় সে। 'সোফিয়া, ইনি হলেন ডঃ মারলো। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মারলো। হাউসটনে নাসা হাসপাতালে পোড়া এবং চর্মরোগের ইনচার্য ছিলেন ইনি। আর উনি হলেন ডঃ সোফিয়া আইভ্যানসিক।'

দু'জন ডাক্তার করমর্দন করল। 'এখন কেমন বোধ করছ ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল জিস।

'যন্ত্রণা হচ্ছে এখনো,' উত্তরে বলল সোফিয়া। 'তবে আমার মনে হচ্ছে, এ যন্ত্রণা ওপরে ওপরে।'

হাসল জিস। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমাকে আমার ক্লিনিকে নিয়ে যাবো। দু'একদিনেই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, দেখো!'

এরপর জুডের দিকে প্রশ্নচোখে তাকাল সোফিয়া। জুড তার সব প্রশ্নের উত্তর এক কথায় শেষ করল। 'আমি তোমাকে জিসের ক্লিনিকে পৌঁছে দিয়ে তবেই আমার অফিসে যাবো, কেমন?'

জুডের গাড়িতে সঙ্গী হলো ফাস্ট এডি এবং মারলিন।

মারলিনের দিকে তাকিয়ে জুড জিজ্ঞেস করল, 'গিনির সাইকো মেডিক্যাল রিপোর্টে তার গোপন মানিসিক রোগ কেন প্রকাশ পেলো না? যাইহোক, এখন আমি তার একটা সম্পূর্ণ টেস্ট রিপোর্ট চাই।'

উত্তর না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে ভাবল মারলিন। সে জানে জুডের একবার রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না। ভুল সে কখনো বরদাস্ত করে না, সে তখন মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যতক্ষণ না ভুল শুধরে নেওয়া হয়!

প্রসঙ্গ বদলাল জুড। 'জুডসন কন্সট্রাকশনে এস. য়ুথান লিং-এর ব্যাপারে লক্ষ্য করেছ?'

'হ্যাঁ। খুবই খুশি সে। ব্রীজ তৈরীর কাঠামো বদল করে কম শ্রমিকে কাজ করে বেশী মুনাফার কথা আপনাকে বলার জন্য অনুরোধ করেছে সে।'

'সে তো খুব ভালো কথা,' মাথা নেড়ে বলল জুড। 'আচ্ছা বারবারা কি অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করছে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

•

বারবারার ঠোঁটে চুমু খেয়ে জুড বলল, 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

হাসল বারবারা। 'তোষামোদি হচ্ছে? আমি একজন ষাটবছরের বৃদ্ধা।'

'আমি যদি বলি, না, তুমি তা নও,' বলল সে। 'অনায়াসে তুমি নিজেকে চল্লিশ বলে চালিয়ে দিতে পারো।'

'ধন্যবাদ,' বলল বারবারা। 'তবে আমি চাই, তুমি আমাকে একটা যৌথ পদবী দাও।'

'কেন, তুমি তো আমাকে বলেছ, তুমি পেয়ে গেছো!'

হাসল সে। 'গডমাদার।' হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলে উঠল সে, 'তোমার ব্যাপারে আমি খুব চিন্তিত।' একটু থেমে সে এবার জিজ্ঞেস করল, ' তোমার ওই যুগোস্লাভিয়ান ডাক্তারকে এখানে এনে খাল কেটে কুমির আনলে না তো?'

'এ খবর তুমি জানলে কি করে?'

'আমি তো বলেছি, আমি গডমাদার। ক্লিনিকে পাঠানো তোমার টেলেক্সবার্তা আমি দেখেছি। রাগ করো না, আর এও ভুলে যেও না, তুমি এক একান্নবর্তী পরিবারের একজন সদস্য।'

জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল জুড। 'সে যাইহোক, এখন কাজের কথায় আসা যাক, জ্যাক ম্যালোনি আমাকে বলেছে, আজকাল নাসা আদৌ কোনো সহযোগিতা করছে না। এদিকে হাগেসের ছ'টি স্যাটেলাইট তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে।'

'তা ঠিক,' বলল বারবারা। 'হাগেসে জেনারেল স্ট্রাইকার আমাকে বলেছে, সেগুলো কঠোর পাহারায় তালাবন্দী হয়ে পড়ে আছে। সে আমার একজন পুরনো বন্ধু।'

'ঠিক আছে, এই ছ'টির মধ্যে আমার ঠিক দু'টি চাই।'

'সেগুলো এক চুলও নড়ানো যাবে না।'

'তাই বুঝি!' একটু সময় কি ভেবে জুড বলল, 'তুমি তো জানো, হাগেসকে আমরা ওদের স্যাটেলাইটের জন্যে সেমিকন্ডাক্টার পাঠিয়ে থাকি। আর সেগুলো পাঠানো বন্ধ করলে

তাদের স্যাটেলাইট সম্পূর্ণ হতে পারে না। আকাশে উড়তেই পারে না। তাদের জানিয়ে দাও, সেগুলো এখনো প্রস্তুত হয়নি, আর কবে যে হবে তার ঠিক নেই।'

'এর ফলে তোমার বিরুদ্ধে চল্লিশ মিলিয়ান ডলার খেসারত দেওয়ার মামলা আনবে তারা।' তাদের কথার মাঝে বলে উঠল মারলিন।

'তাদের কথা ছেড়ে দাও!' খিঁচিয়ে উঠল জুড। তারপর বারবারার দিকে ফিরে বলল সে, 'গডমাদার, এবার তোমার কেরামতি দেখাও। তোমার বন্ধু জেনারেল স্ট্রাইকারকে জানিয়ে দাও, যদি সে দু'টি স্যাটেলাইট আমাদের দেয়, তবেই আমরা তাদের সেমিকন্ডাক্টার পাঠাবার ব্যবস্থা করব। আর এ-ব্যবস্থা হবে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের জন্য।'

'সে তো ব্ল্যাকমেলের সামিল,' বলল বারবারা।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' বলল জুড।

হাসল বারবারা। 'হাগেস সংস্থাকে আমি জানি। এর জন্যে কিছু সময় দরকার।' একটু থেমে বারবারা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ডাক্তারনির সঙ্গে দেখা করার একবার সুযোগ পেতে পারি?'

'ঠিক আছে, নৈশভোজে দেখা হতে পারে।'

'লাভলি,' এই বলে অফিস ছেড়ে চলে গেলো বারবারা।

'তোমার সৎমার সঙ্গে যে ডঃ মারলোর বিয়ে হয়েছিল তা আমি জানি না,' ফাস্ট এডি মার্ক হপকিন্স জুডের পেন্ট হাউসের দরজা খুলতেই বলল সোফিয়া।

'তা বছর ছ'য়েক তো হবেই,' স্যুইটে অনুসরণ করতে গিয়ে বলল জুড।

'তিনি একজন যুবতী,' বলল সোফিয়া।

মাথা নাড়াল জুড।

'আর ডঃ মারলো একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি।'

'জানি,' বলল জুড। 'আর তাইতো নাসা তাকে ছাড়তে চায়নি। কিন্তু তাঁর বয়স তখন সত্তর, তাই তিনি ঠিক করলেন আর নয়, এবং অবসর নিলেন।'

'তোমার মা নিশ্চয়ই একজন সুখী মহিলা।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি একজন সুখী মহিলা।' জুড তাকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে গেলো। ঘরের শেষ প্রান্তে একটা ওভ্যাল জ্যাকুজি ওয়ারলপুল বাথটাব ছিলো। বোতাম টিপতেই বাথটাবে জল পড়তে শুরু করে দেয়। সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করল সে, 'এই জল কি তোমার পক্ষে ভালো হবে?'

'যদি না খুব বেশী গরম হয়,' উত্তরে বলল সোফিয়া।

'তাহলে এসো, স্নান করা যাক,' বলল জুড।

সোফিয়ার আগেই বাথটাবে নেমে পড়ল জুড। মুখ ঘোরাতেই সোফিয়াকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলো সে। 'ডাক্তার খুব ভালো লোক,' বলল জুড। 'কালশিরার দাগগুলো সব প্রায় উধাও।'

'তিনি বলেছেন, আগামীকাল সব দাগ মিলিয়ে যাবে।' সাবধানে জলে একবার পা

ফেলে বলল সোফিয়া, 'চমৎকার।'

সোফিয়ার কাঁধে হাত রাখল সে। জুডের ঠোঁটে একটা হাসির ক্ষীণরেখা দেখতে পেলো সোফিয়া। 'কি ভাবছ?'

'তোমার ওই ছোট্ট মধুভান্ডটির কথা,' লোলুপ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে বলল জুড, 'এটা এখনো ঠিক বাচ্ছা মেয়ের মতোই রয়েছে?

'কেন, এটা কি বাচ্চার মতো দেখাচ্ছে?'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে। 'না, না বরং ওটা একটা দারুণ মোড় নিয়েছে, অন্তত তোমার এ বয়সের শরীরের ক্ষেত্রে। যে ভাবে তোমার ওটা ক্ষুধার্ত হয়ে—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে সোফিয়ার দিকে তাকাল সে।

সোফিয়াও তার দিকে তাকাতে গিয়ে পলক ফেলতে ভুলে যায়। 'ওখানে সাবান জল লাগানোর আগে তুমি কি চেখে দেখতে চাও?'

'এ তো ক্ষ্যাপাটে প্রশ্ন,' উত্তরে বলল জুড।

সোফিয়া তার পা দু'টো ফাঁক করে এক হাতে জুডের গলাটা জড়িয়ে ধরল, যাতে করে জুড তার নগ্ন দেহটা তার দেহের ওপর বিছিয়ে দিতে পারে।

❑ এগারো ❑

ফ্লোরিডার বোকা র‍্যাটনে ক্রেনি মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের ডঃ লী সওয়ার জুডের হসপিটাল বেডের পাশে বসেছিলেন। মাঝারি উচ্চতার মানুষ, টাক মাথা, ফিকে-নীল রঙের চোখ,তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'এক জায়গায় এই যে টানা তিনদিন ধরে রয়েছে, এ যেন বিশ্বাস করাই যায় না। আপনি কি বলেন মিঃ ক্রেনি?'

'কি বলবো জানি না।' জুড বলল, 'সোফিয়া কোথায়?'

'আপনার প্রতিটি মেডিক্যাল টেস্টের সময় হাজির থাকতে চান তিনি,' উত্তরে বললেন ডঃ সওয়ের। 'আপনার ফ্লোরের কাছাকাছি একটা স্যুইটে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

'ওঁর সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডঃ সওয়ের বললেন, 'অনেক ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। কিন্তু বুঝতে পারছি না, এতো খবর কেনই বা তাঁর দরকার? আর সব খবর পাঠানো হচ্ছে যুগোস্লাভিয়ায়।'

অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল জুড।

'জানি না এই লেডি ডাক্তারের সঙ্গে আপনি কি করেছেন,' বললেন ডঃ সওয়ের। 'কিন্তু ওঁকে আপনাকে বোঝাতে হবে, আপনি টার্জান।'

'আমি পরিশ্রান্ত,' বলল জুড। ' কেন, এই সব টেস্টের রিপোর্ট তার দরকার, কারণ কিছু বলেনি সে?'

'ডঃ জ্যাবিস্কির ফরমাস, কেবল এ কথাটাই তিনি বলেছেন।'

এই সময় সোফিয়া ঘরে এসে প্রবেশ করল। ডাক্তারের সাদা ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। 'এখন কেমন বোধ করছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ভালোই', বলল সে। 'আচ্ছা, এর আগে অন্য কাউকে এ ভাবে পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা করেছিলে?'

'হ্যাঁ, একজনকে,' উত্তরে বলল সোফিয়া, 'সাধারণত ডঃ জ্যাবিস্কির তত্ত্বাবধানে তাঁর ক্লিনিকে এই সব টেস্ট সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে তুমিই হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি। প্রথম জন ছিলেন মাও-সে-তুং।'

তার মুখের দিয়ে তাকাল জুড। 'তাঁর সঙ্গেও তুমি কি কাজ করেছিলে?'

'হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম। ডঃ জ্যাবিস্কির মতে মাও-সে-তুং তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির উপযুক্ত ছিলেন না। দিনে দু'বার, সকালে আর রাত্রে আমি তাঁকে ইন্টারভেনাস সিরাম ইনজেকশন দিতাম।'

'কি ধরণের সিরাম ছিলো, জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'জানি না। ডঃ জ্যাবিস্কি নিজে ছাড়া অন্য কেউ জানত না। ল্যাবরেটরিতে সেটার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু চীনারা কখনো সেটার ব্যাখ্যা করতে পারেনি।'

'এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়,' বললেন ডঃ সওয়ের। 'আর এ ধরণের কথা আমি পছন্দও করি না।' জুডের দিকে ফিরে তিনি এবার বললেন, 'কে বলতে পারে, ডঃ জ্যাবিস্কি আপনার ওপর এক্সপেরিমেন্ট করছেন না? এমনো হতে পারে, এর ফলে আপনার মৃত্যু ঘটতে পারে?'

ডাক্তারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সোফিয়া। 'শুনুন ডক্টর, ডঃ জ্যাবিস্কিকে আমি বেশ ভালো করেই জানি। তাঁর একমাত্র স্বপ্ন হলো, মানুষের জীবন দীর্ঘতর করা, কমিয়ে আনা নয়!'

'ঠিক আছে, এই মুহূর্তে আমি কয়েকটা টেষ্ট করাচ্ছি,' বলল জুড। 'আশাকরি, তাতে আমার জীবনহানির কোনো আশঙ্কা নেই।' তার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডঃ সওয়ের।

এই সময় তার বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে বলল সে, 'হ্যাঁ, আমি জুড কথা বলছি।'

দূরভাষে কথা বলছিল বারবারা। 'এই মাত্র জেনারেল স্ট্রাইকারের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি জানালেন, গত তিনদিন ধরে ফোন করছেন, কিন্তু কোন উত্তর পাচ্ছেন না। আগামী ৫ই এপ্রিল তাদের স্যাটেলাইট চালু করার কথা। সময় মতো আমরা ডেলিভারি দিতে পারছি না দেখে তাদের আইন দপ্তর ইতিমধ্যেই খেসারত দাবী করার জন্য কাগজপত্তর তৈরী করে ফেলেছে। অথচ এর উত্তর দিতে পারতেন কেবল বিল গে আর হাওয়ার্ড হাগেস নিজেই। গে এখন দেশের বাইরে, এবং হাগেস এখন অ্যাকাপুলকোয়। টেলিফোনে উত্তর তিনি দেননা কখনো। তাছাড়া আজ পর্যন্ত কেউই সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। যা কিছু কথা হয় বিল কিংবা তার লোকজনদের সঙ্গে।'

'তাহলে দেখছি, হাগেসের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে,' বলল জুড, ' ফোন করার

জন্য ধন্যবাদ। পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'গুড লাক,' বারবারা বলল, 'চুমু নিও।'

'তোমাকেও চুমু দিলাম।' এই বলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ডঃ সওয়ের দিকে ফিরে বলল জুড, 'অনুগ্রহ করে মারলিনকে একবার ডেকে দেবেন ডক্টর?'

একটু পরেই মারলিন ঘরে এসে ঢুকল। 'হ্যাঁ, বলুন স্যার।'

'এখনি আমাদের অ্যাকাপুলকোয় যাওয়ার জন্য বিমানের ব্যবস্থা করো। তারপর মেক্সিকো সিটিতে জেনারেল মারটিসকে ফোন করে বলে দাও, দশজন ফেডারেল সিক্রেট পুলিশের ব্যবস্থা করে রাখতে। তারা যেন অ্যাকাপুলকো বিমানবন্দরে আমার সঙ্গে দেখা করে। আর তাকে খবর নিতে বলো, অ্যাকাপুলকোর কোথায় হাগেস অবস্থান করছে? তুমি এখন যেতে পারো। দশ মিনিটের মধ্যেই আমি তোমার সঙ্গে গাড়িতে মিলিত হচ্ছি।'

মারলিন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সোফিয়ার দিকে ফিরল জুড। 'তুমি এখন বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারো। দিন দু'য়েকের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।'

'অ্যাকাপুলকোয় আমি কখনো যাইনি।'

'বেশ তো, তাহলে আমার সঙ্গে চলো,' বলল সে।

'কিন্তু কি পোশাক পরবো?'

হাসল জুড। 'অ্যাকাপুলকোয় তোমার বিকিনি পোশাকই দরকার।'

দীর্ঘদেহী একটি যুবক, পরনে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম, জুডের বিমান অ্যাকাপুলকোয় অবতরণ করতেই সে ওপরে উঠে এলো। জুডকে স্যালুট করে সে তার পরিচয় দিলো ঃ 'লেফটেনান্ট কর্ণেল আয়ালা।'

'আর আমি জুড ক্রেনি,' করমর্দন করে বলল সে।

'জেনারেল মার্টিসের পরামর্শদাতা আমি। আপনার প্রয়োজনীয় সব খবরই আমি সংগ্রহ করেছি। একটা ফাইল ফোল্ডার খুলে আমি এখানে সেটা ইংরিজীতে ভাষান্তর করে শোনাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ কর্ণেল,' বলল জুড। 'প্রধান লাউঞ্জে একটা ছোট্ট কনফারেন্স টেবিলের সামনে নিয়ে গিয়ে তাকে বসাল সে। 'আকাপুলকো প্রিন্সেস হোটেলের পুরো পেন্ট হাউস ফ্লোরটাই সেনর হাগেসের দখলে। অনেক ঘর। সব থেকে বড় ঘরটা, সমুদ্রমুখী যেটা, সেটাই সেনর হাগেসের ঘর। তাঁর পার্টির লোক সংখ্যা পনেরো। আমরা জানি তাদের মধ্যে চারজন মেক্সিকান নয়, এমনি কি হাগেসের পার্সোনাল ডাক্তারও নয়। সেনর হাগেস গুরুতর ভাবে পীড়িত এখন। কিন্তু তাঁর সেই পার্সোনল ডাক্তার এখন এখানে নেই। অথচ সে ছাড়া অন্য কোনো ডাক্তারকে দিয়ে তিনি তাঁর চিকিৎসা করাতে চান না। আগামীকাল ফিরছে সে।'

'হাগেসের লোকেরা কি অস্ত্রসজ্জিত?'

'তাদের মধ্যে কয়েকজন,' বলল কর্ণেল আয়ালা।

ফ্লোর প্ল্যানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জুড বলল, 'তাই বলে আমি কাউকে আঘাত

করতে চাই না। আমি হাগেসের সঙ্গে আমার ব্যবসা সংক্রান্ত দু'চারটে কথা বলতে চাই, তার বেশী কিছু নয়।'

'আমি বুঝতে পারছি সেনর। তা আপনি কি একা আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

'আমার সঙ্গে উনিও যাবেন,' সোফিয়ার দিকে ফিরে বলল জুড, 'উনি আমার চিকিৎসক। উনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।'

'তা আপনি যা ভালো বোঝেন সেনর।' নম্র গলায় বলল কর্ণেল আয়ালা।

এয়ারপোর্ট থেকে আঠারো কিলোমিটার দূরে সেই হোটেল। তারপর আরো এক মাইল গলফ্ কোর্স্ পেরিয়ে তবেই হোটেলের প্রবেশ পথে পৌছতে হলো।

গাড়িতে বসে জানালা পথে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল সোফিয়া, 'আঃ কি চমৎকার জায়গা। একদিন আমাকে এখানে আসতেই হবে ভালো করে জায়গাটা দেখার জন্য।'

হাসল জুড। 'এখানে আমার এক বন্ধুর ভিলা আছে। হয়তো পরে সেখানে আমরা উইকএন্ড কাটাতে পারি।'

ইতিমধ্যে তারা হোটেলের পার্কিং এলাকায় পৌছে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল হোটেলের প্রবেশ পথে। গেটম্যানকে সংক্ষেপে তাদের আগমনের খবরটা দিতেই নীরবে সে তাদের যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল। তারা তখন করিডর পথে এগিয়ে গিয়ে মালপত্তর নিয়ে পরিবহনের এলিভেটারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এলিভেটারে উঠে কর্ণেল আয়ালা বোতাম টিপল।

হাগেসের ঘরের সামনে একজন সৈনিককে ঘুমন্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখা গেলো। কর্ণেল আয়ালা সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে গেলো। জুড ও সোফিয়া তাদের অনুসরণ করল। একজন সৈনিক সেই ঘুমন্ত প্রহরীর সামনে এগিয়ে গিয়ে আলতো করে তার কাঁধ স্পর্শ করল। লোকটা ঘুম থেকে জেগে ওঠা মাত্র চমকে উঠল। তার সামনে উদ্যত কোল্ট পয়েন্ট ফরটি ফাইভের নল দেখেই তার চোখ দু'টি বিস্ফারিত হলো। কথা বলার চেষ্টা করল সে।

সঙ্গে সঙ্গে জুড বলে উঠল, 'শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে থাকো। কেউ তোমাকে আঘাত করতে যাবে না।'

লোকটা মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। জুড তাতে আশ্বস্ত করে বলল, 'আমরা কাউকে আঘাত করতে আসিনি। অন্যরা সব কোথায়?'

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল লোকটা, 'তাদের মধ্যে তিনজন যে যার ঘরে ঘুমচ্ছে। অন্যেরা শহরে গেছে। আজ ইংরিজী ছবি দেখানো হচ্ছে সেখানে।'

এবার হাগেসের ঘরের দিকে তাকিয়ে জুড জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কি এখন তাঁর ঘরেই আছেন?'

লোকটা মাথা নাড়ল।

'তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই,' বলল জুড।

'দেখা তো হবে না,' বলল লোকটা। 'তিনি অসুস্থ, তাছাড়া তিনি এখন ঘুমচ্ছেন।'

'তুমি আমাদের সেখানে নিয়ে চলো,' বলল জুড। 'আমাদের সঙ্গে এই মহিলা একজন চিকিৎসক।'

সোফিয়ার দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকাল সে, তার হাতের ডাক্তারের ব্যাগটাও দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াল সে। ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ করল তারা।

হাগাসের ছোট্ট অসুস্থ দেহটা দেখে নিজের চোখকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না জুডের। 'মিঃ হাগেস?' শান্ত গলায় ডাকল সে।

কোনো সাড়া-শব্দ নেই হাগেসের তরফ থেকে। আবার ডাকল জুড তার নাম ধরে, এবার অনেক জোরে।

'উনি জবাব দেবেন না,' প্রহরী মনে করিয়ে দিলো, 'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, উনি অসুস্থ। খেতে পর্যন্ত পারছেন না।'

সোফিয়ার দিকে তাকাল জুড। 'ওঁকে একবার পরীক্ষা করে দেখো।'

স্টেথিস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে সোফিয়া বলল, 'উনি অত্যন্ত দুর্বল।'

'ওঁর এই দুর্বলতার কারণ কি হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'আমার ধারণা, ওঁর দেহে ইউরেনিক বিষক্রিয়ার আভাষ দেখা দিতে শুরু করেছে।' তার দেহের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বলল সোফিয়া, 'ভালো করে তাকিয়ে দেখো, ওঁর দেহে সূচের কতো দাগ! ওঁর দেহ এখন প্রায় জলশূন্য। দেহে মাংস বলতে কিছু নেই, হাড় বেরিয়ে পড়েছে।'

'এই মুহূর্তে এখানে ওঁর চিকিৎসার কিছু করতে পারো না?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া, 'হাসপাতালে আমাদের যে সব যন্ত্রপাতি আছে, সেগুলো না পেলে কোনো চিকিৎসাই করা সম্ভব নয়।'

কিন্তু কোনো মতেই হাগেসকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। লোকটা বলল, 'হাগেসের কড়া হুকুম, তাঁর নিজস্ব ডাক্তার ছাড়া অন্য কাউকে তিনি তাঁর চিকিৎসা করাবেন না। আগামীকালই তাঁর সেই ডাক্তার স্টেটস থেকে ফিরে আসছেন।' মুহূর্তের জন্য লোকটার দিকে তাকাল জুড। তারপর কর্ণেল আয়ালার দিকে ফিরে বলল সে। 'চলুন, ফিরে যাওয়া যাক।'

চলে আসার আগে লোকটার হাতে দশ হাজার ডলারের বিল গুঁজে দিয়ে বলল, 'তুমি যে আমাদের দেখেছ, এই টাকাটা ভুলে যেতে সাহায্য করবে।'

ফ্লোরিডায় ফেরার পথে বিমানের লাউঞ্জে বসেছিল জুড। সোফিয়া সেখানে হাজির হতেই সে তাকে বলল, 'সেখানে যাওয়াটা আমাদের শুধু শুধু পন্ডশ্রম হলো।' তার দিকে একটা টেলেক্সবার্তা এগিয়ে দিয়ে জুড আরো বলল, 'স্ট্রাইকারের কাছ থেকে এইমাত্র জানতে পারলাম, আমাদের প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেছে।'

'কিন্তু লোকটা যে বেঘোরে মরতে বসেছে। ও ভাবে ওঁকে ফেলে আসাটা আমাদের উচিত হয়নি।' অনুযোগ করে বলল সোফিয়া।

'কে কাকে দেখবে?' প্রতিবাদ করে উঠল জুড। 'তাছাড়া, হয়তো এ ভাবেই সে বেঁচে থাকবে চিরদিন, কিংবা সত্যি সত্যি হয়তো মরতে চায় সে, কিন্তু মরবার মতো সাহস তার নেই।'

❑ বারো ❑

বিল্ডিংটা সবুজ আয়নার কাচে মোড়ান। ক্রেনি মেডিক্যাল সেন্টার থেকে একটা ব্লক পরেই। ফ্লোরিডা তখন সূর্যস্নাত। সূর্যের আলোয় ছোট পিতলের নেমপ্লেটটা চক্‌চক্ করে জ্বলছিল ঃ "ক্রেনি রিসার্চ নিউক্লিয়ার মেডিসিন প্রাইভেট।" রোবোটের মতো দুজন সশস্ত্র ইউনিফর্ম পরিহিত সিকিউরিটি গার্ড তালাবন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তাদের চোখ দু'টো ঢাকা ছিলো সবুজ সানগ্লাসে।

ড্রাইভওয়েতে ডঃ সওয়ের তার কনভার্টিবল গাড়িটা পার্ক করে রেখে বিল্ডিং-এর প্রবেশ পথে এসে হাজির হলো। তার ফটোসেনসিটিভ আইডেনটিটি প্লেটটা দেখাল। তারপরেই দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেলো।

ওপরের প্রধান ফ্লোরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। পুরো বিল্ডিংটা আন্ডারগ্রাউন্ডে তৈরী। এলিভেটারের সামনে আসতেই প্রহরী তাকে বলল, 'ডঃ জ্যাবিস্কি বলেছেন, নিচে ফোর্থ ফ্লোরে তিনি আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন।'

'ধন্যবাদ।' এলিভেটারে প্রবেশ করে নিচের ফোর্থ ফ্লোরের চার নম্বর বোতামটা টিপলেন ডঃ সওয়ের। এলিভেটার নিচে নামতে শুরু করল। এলিভেটার ফোর্থ ফ্লোরে নামতেই বেরিয়ে এলেন তিনি।

ডঃ জ্যাবিস্কি বসেছিলেন তাঁর ডেস্কের পিছনে। 'আপনার ডাক পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছি,' চিন্তিত ভাবে বললেন তিনি। 'তেমন কোনো গন্ডগোল হয়েছে নাকি?'

'না, না, কোনো গোলমাল হয়নি, ছোটখাটো রোগাটে চেহারার মহিলাটি বললেন, 'আমরা তাঁকে ইনসেন্টিভ কেয়ারে সরিয়ে দিয়েছি। ভাবলাম, আমরা যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গাবো, আপনি তখন হাজির থাকতে চাইবেন।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ডঃ সওয়ের। জ্যাবিস্কির উল্টোদিকের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন। হাঁতটা তাঁর কাঁপাচ্ছিল তখনো। 'এ যেন একটা পাগলামো। দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি ভাবতে শুরু করেছি, আমরা যেন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বনে গেছি।'

'হৃদয়ের দিক থেকে প্রতিটি চিকিৎসকই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন,' হাসলেন ডঃ জ্যাবিস্কি। 'ঈশ্বরের খেলা কেউ খেলতে চায় না এমন কেউ আছে নাকি আমাদের মধ্যে?'

'আমার ধারণা, কে যে আমাদের মধ্যে ঈশ্বর, আমরা সবাই জানি, জানি না?' জিজ্ঞেস করলন ডঃ সওয়ের।

হাসলেন ডঃ জ্যাবিস্কি। তাঁর বেড়াল-চোখে এবার আর কোনো কৌতুকের ছায়া পড়তে দেখা গেলো না। 'তিনি কি জুড ক্রেনি?'

হাসিতে ফেটে পড়লেন। 'ঈশ্বর তাঁকে হতেই হবে। জানি না, তিনি ছাড়া অন্য আর কাউকে ওই সর্বোচ্চ আসনে বসানো যায় কিনা!'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, 'সম্ভবত আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি প্রথম যখন কুড়ি, তারপরেই পঞ্চাশ মিলিয়ান ডলারের কথা বললেন, আমি তাঁকে বিশ্বাসই করতে পারিনি। আমি ভাবতেই পারিনি, পৃথিবীতে কারোর অতো টাকা আছে। আর তাঁর চোখের দিকে তাকাতে গিয়েই উপলব্ধি করলাম, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা নিয়ে তাঁর স্বপ্নের মধ্যে সব কিছু ধরে রাখতে চান, এবং অনৈতিকভাবে।'

'আর আপনার স্বপ্ন?'

'তাঁর স্বপ্নের ভাগীদার আমিও হতে চাই বৈকি!' তারপরেই ডঃ জ্যাবিস্কির কণ্ঠস্বরে একটা বিষাদের সুর ধ্বনিত হতে দেখা গেলো। 'আমাদের ক্ষমতার মধ্যে তাঁর স্বপ্নের সাফল্য কি আমরা অর্জন করতে পারি? সম্ভবত জ্ঞান ও বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়!' তাঁদের দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হলো। 'তাঁর মতো আমাদেরও উপলব্ধি করতে হবে, আমরা মানুষ, ঈশ্বরের মতোন নই।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডঃ সওয়ের।' এরপর ইচ্ছা করে তিনি তাঁদের ভাবান্তরের পরিবর্তন আনার জন্য বললেন, 'আসুন, দেখা যাক তিনি এখন কি করছেন! আমাদের এখন আরো নিচে নামতে হবে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা ওঁকে জাগিয়ে তুলব।'

নিচে অষ্টম স্তরে এলিভেটার তাদের নামিয়ে নিয়ে এলো।

কাচের দরজায় রূপালি অক্ষরে জ্বলজ্বল করছিল ঃ মনিটর রুম। দরজা খুলে যেতেই তাঁরা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর দেখা মনিটর রুম সব সময়েই ডঃ সওয়েরের মনে হয়, স্পেস ফ্লাইটের সময় নামা কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে অনেক মিল আছে সেটার।

ডঃ জ্যাবিস্কির দিকে তাকালেন ডঃ সওয়ের। 'উনি নিশ্চয়ই খুব ভালো স্বপ্ন দেখে থাকবেন।' বলে হাসলেন তিনি।

ডঃ জ্যাবিস্কি তখন প্রথম টেকনিসিয়ানকে ডেকে বললেন, 'ওঁর টেমপারেচার রিডিংটা দেখি? আর নিওরলজিস্ট এবং কার্ডিওলজিস্ট ডঃ অ্যাবলনকে এখনি ডেকে পাঠাও।'

দ্বিতীয় টেকনিসিয়ানকে ডেকে জুডের বডি টেমপারেচারের খোঁজ করলেন ডঃ জ্যাবিস্কি। উত্তরে বলল সে, 'ওঁর দেহের তাপ বাড়ছে আধ পয়েন্ট করে যেমন, ৯৫.৫। না, না, সঙ্গে শুধরে নিলো সে, 'এখন ৯৫.৬।'

'আমি এখনি ব্লাড কেমিস্ট্রি রিডিং চাই, প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো আমি খুঁটিয়ে দেখতে চাই।' কমপিউটার স্ক্রীনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে, সওয়েরের দিকে তাকালেন ডঃ জ্যাবিস্কি। 'উনি স্বপ্ন দেখছেন, ঠিক আছে,' বললেন তিনি, 'কিন্তু আলফা সেক্টারের গতিবিধি একটু যেন অস্বাভাবিক।'

'কি ঘটতে যাচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ সওয়ের। 'ওঁর পক্ষে সেটা বিপদ হতে পারে না তো?'

'না, আমার তা মনে হয় না,' স্ক্রীনের লেখাগুলো পড়তে গিয়ে বললেন তিনি। 'প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো স্বাভাবিক। ব্লাড কেমিস্ট্রির রিপোর্টে কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখা যাচ্ছে

না।' রিসিভার তুলে অ্যানেস্থিজিওলজিস্টকে ডেকে তিনি বললেন, 'রোগীকে আরো একটু অজ্ঞান করে রাখুন। আরো কয়েকটা পরীক্ষার ব্যাপার আছে, ওঁকে ঘুম থেকে জাগানর আগে পরীক্ষার কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে।'

'সোফিয়া এখন কোথায়?' সওয়ের জিজ্ঞেস করলেন। 'এখানে থাকতে পারেনি সে?'

'আমি তাকে কিছুদিন ছুটি দিয়েছি,' বললেন জ্যাবিস্কি। 'একটানা তিন বছর কাজ করার ধকল কম নাকি? বিশেষ করে শেষ গ্রুপের এক্সপেরিমেন্টগুলো খুবই ক্লান্তিকর।'

'এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

তাঁর দিকে তাকালেন 'আপনি যদি জানতে চান মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে কিনা,' প্রশ্নটা করে ডঃ জ্যাবিস্কি নিজেই উত্তরটা দিয়ে দিলেন, 'তাহলে বলবো, হ্যাঁ হয়েছে।'

'এখন সে কোথায় গেছে?'

'মেক্সিকোয়। অ্যাকাপুলকোয় যাওয়ার পর থেকে মেক্সিকোয় যাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল সোফিয়া।'

সোফিয়ার মেক্সিকোর যাওয়ার বাহানাটা ঠিক বোধগম্য নয় সওয়েরের কাছে। যদি সে সূর্য দেখার জন্য গিয়ে থাকে, তাহলে তো বোকা র‍্যাটনে বসেই দেখতে পেতো। হয়তো অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। তাই তিনি ঠিক করলেন, তার ওপর নজর রাখার জন্য মারলিনকে বলবেন।

জুড বিছানায় বসে ফোন করল মারলিনকে। 'ব্যাপার কি?' খিঁচিয়ে উঠল সে।

'আমরা দু'টি অদ্ভুত টেলিফোন কল পেয়েছি উদ্বোধনী কমিটির কাছ থেকে। রেগান তাঁর ব্যক্তিগত পার্টিতে আমাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চান।'

'বেশ তো তাদের বলো, পার্টিতে যোগ দিয়ে আমি বাধিত হবো। আর কোনো খবর আছে?'

'ব্রেজিলের ফাইনান্স সেক্রেটারি জানতে চায়, তাদের লুডউইগ প্রোজেক্টে আপনি অংশগ্রহণ করতে চান কিনা। বাজারে একটা গুজব, ডি.কে. আমাদের বাতিল করে দিতে চায়।'

মুহূর্তের জন্য কি ভেবে বলল জুড, 'এ ব্যাপারে আমাদের আরো বিশদ ভাবে খোঁজ-খবর নিতে দাও। তাদের বলে দিও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রেজিলে গিয়ে কিছু একটার ব্যবস্থা আমরা করবো। তবে তাকে বুঝিয়ে দিও, আমরা কেবল আলোচনা করার পরিকল্পনা করছি, এই প্রোজেক্টে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই।'

'হ্যাঁ স্যার,' বলল মারলিন। 'এদিকে সরকার যদি আমাদের প্রস্তাব মতো সাউথ এন্ড ওয়েস্ট সেভিংস এবং লোন অ্যাসোশিয়েসান এক করে দিতে রাজী হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্রেন ফাইনানসিয়াল সার্ভিসেসের মূলধন অনেক বেড়ে যাবে। দেড়শো ব্যাঙ্ক শাখা এবং লক্ষ লক্ষ ডলারের সম্পত্তি যোগ করলে কম করেও আটশো মিলিয়ান ডলার, তিরিশ দিনের মধ্যে আমরা হাতে পাচ্ছি। অবশ্য আমরা যদি চাই, তবেই স্যার।'

'ভালো কথা,' বলল জুড। 'মেক্সিকান সরকারের কাছ থেকে ফার্মাসিটিউকালের জন্য

ল্যাবরেটারি এবং ফ্যাক্টরি তৈরী করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া যায় তাহলে মেক্সিকোয় আমরা উৎপাদন শুরু করবো না। আর তাদের বলে দিও, আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ব্রেজিল কতোটা আগ্রহী।'

'ঠিক আছে, আমি আপনার উপদেশ মতো কাজ করবো,' বলল মারলিন।

'ধন্যবাদ,' বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল জুড। তারপরেই নার্সকে ডাকল সে। একটি নতুন মেয়ে এসে হাজির হলো, আগে কখনো তাকে দেখেনি জুড। লাল অগ্নিশিখার মতো চুল, নীল চোখ। 'কি তোমার নাম?'

'ব্রিজেট ও' ম্যালি।'

'আমি তৃষ্ণার্ত। আমার জন্যে কোকা-কোলা নিয়ে এসো।'

'দুঃখিত মিঃ ক্রেনি, অ্যারেঞ্জ কিংবা জল ছাড়া অন্য কিছু আপনাকে দেওয়া মানা আছে।'

'বেশ তাহলে অরেঞ্জ নিয়ে এসো।' মেয়েটির মুখে তখনো আরক্তিম ভাব দেখে জুড ডাকল, 'ব্রিজেট?'

বিছানার কাছে এসে বলল ব্রিজেট, 'হ্যাঁ, বলুন মিঃ ক্রেনি?'

'আমার যে শুক্রের একটা সমস্যা আছে, ওঁরা তোমাকে বলেছেন?'

তার চোখ গিয়ে পড়ল চাদরে ঢাকা জুডের কোমরের কাছে, যেখান থেকে পা দু'টো নিচে নেমে গেছে। 'হ্যাঁ মিঃ ক্রেনি।'

'ঠিক আছে, এবার তুমি আমার জন্যে অরেঞ্জ নিয়ে আসতে পারো।' ব্রিজেট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো অতঃপর।

জুড তার ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এদিকে তার পুরুষাঙ্গটি পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছিল এবং সেটা টান টান হয়ে যাওয়ার দরুন যন্ত্রণা হচ্ছিল। ব্রিজেট অরেঞ্জ জুস এনে দিলে তাতে চুমুক দিয়ে বলল সে, 'শুনেছি, একটা অপারেশানে এই রোগটা সেরে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ মিঃ ক্রেনি,' বলল সে, 'কিন্তু একবার অপারেশান হয়ে গেলে আগের অবস্থায় আর ফেরানো যায় না তখন। আপনার পুরুষাঙ্গ আর কখনো উত্থিত হবে না। এই অপারেশান কেবল চিরস্থায়ী এবং যন্ত্রণাদায়ক ঋজুতার কেসে হয়ে থাকে। এর পরেও কি আপনি এ ধরণের অপারেশান চাইবেন?'

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'এই মুহূর্তে খুবই যন্ত্রণা বোধ করছি। অসম্ভব দৃঢ় উঠেছে ও-টা। এখন আমি কি করব ব্রিজেট, তুমিই বলে দাও। আমি কি তাহলে আবার হস্তমৈথুন করব? আমার ও-টা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। রাগমোচনের সময় আমি দুশ্চিন্তায় পড়ব।' স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

তার বিছানার ওপর থেকে চার্টটা হাতে তুলে নিয়ে কি যেন লিখল ব্রিজেট । তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি। ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে আমি কিছু করতে পারি না।'

'রাখো তোমার ডাক্তারের কথা!' ক্রুদ্ধস্বরে বলল জুড। 'এই হাসপাতাল, এখানকার সব ডাক্তারদের কর্তা আমি। এখন তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, তোমার উন্নতি হবে।'

টেলিভিসান মনিটরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল মেয়েটি, 'টি.ভি'র পর্দায় আপনার গতিবিধির সব ছবি সর্বক্ষণ ভিডিওটেপ হয়ে যাচ্ছে।'

টি.ভি'র পর্দা এবং ক্যামেরার লেন্সের দিকে তোয়ালে ছুঁড়ে দিয়ে বলল জুড, 'এখন কেউ আর দেখতে পাবে না।' এই বলে সে তার হাঁটুর নিচে চাদরটা নামিয়ে দিলো। বন্য জন্তুরা যেমন খাঁচা থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে ওঠে ঠিক সেই ভাবে তার লিঙ্গরাজ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল।

মুহূর্তের জন্য একটু ইতস্তত করল মেয়েটি। তারপর সে বিছানায় উঠে একটা হাঁটু তার পাশে রেখে বাঁহাত দিয়ে তার লিঙ্গরাজ চেপে ধরল। অপর হাতের আঙুলগুলো দিয়ে বলয়ে বিলি কাটতে শুরু করল। জুডের চোখে চোখ রেখে নরম গলায় বলল মেয়েটি, 'হয়তো এতে আঘাত লাগতে পারে।'

জুডের রুপালি-নীল চোখের দৃষ্টি অনুভূতি শূন্য। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সে।

ধীরে ধীরে মেয়েটি তার নিম্নাঙ্গের ওপর চাপ ক্রমশ বাড়াতে থাকে। তার হাতের আঙুলগুলো সেখানকার স্নায়ুর ওপর বিলি কাটতে থাকে। তার হাতটা ওপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে ওপরে একটা ছন্দের ঝড় তুলে ওপরে উঠতে থাকে ঘন ঘন।

জুডের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি গাঢ়স্বরে তাকে সান্ত্বণা দেয়, 'লক্ষ্মী সোনা, আর খুব বেশী দেরী নেই, একটু পরেই তুমি তুষ্ট হবে।' আর তারপরেই তার কুঁচকি ভিজে উঠল রাগমোচনে। অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা গোঙানির আওয়াজ।

দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে ব্রিজেট বলে উঠল, 'এই মাত্র হয়ে গেলো জুড।'

'সত্যি সত্যি তুমি আমায় যৌনযন্ত্রনা থেকে মুক্ত করে দিলে?' অবিশ্বাসের সুরে বলল।

'হ্যাঁ জুড,' শান্ত গলায় বলল ব্রিজেড।

'আমি কৃতজ্ঞ।' বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল জুড।, 'যাইহোক, আমার তো ধারণাই ছিলো না, মুখ-মেহন কিংবা সহবাস ছাড়া এটা সম্ভব!'

এই প্রথম মেয়েটি হাসল। 'আমি কিন্তু কোনোটাই করিনি।'

বিছানায় উঠে বসে ডঃ জ্যাবিস্কির দিকে তাকাল জুড। 'কোনো গোলমাল?'

'না, খুব বেশী নয়,' শুকনো গলায় বললেন তিনি। 'সোনারস্ক্যান এবং পারস্ক্যান পরীক্ষা অনুযায়ী অন্যদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লাগানোর প্রোগ্রাম আপনার দেহ বেশ সাফল্যের সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছে। আর এ ভাবে এই প্রোগ্রামটা চালিয়ে যেতে পারলে আপনার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের বিচারে আপনার সম্ভাব্য পরমায়ু একশো-পঁচিশ বছর পর্যন্ত বেড়ে যাবে।'

'তাহলে আপনি কি মনে করেন, নিউক্লিয়ার লেজারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমরা আবার করব?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'না,' খোলাখুলি ভাবেই বললেন ডঃ জ্যাবিস্কি। 'এবার আমরা ভাগ্যবান। এরপর হয়তো আমরা হাইপথালামাস ধ্বংস করে ফেলতে পারি। আর সেক্ষেত্রে আপনি চিরকালের জন্য ঠান্ডা হয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ আপনার মধ্যে কোনো রকম দৈহিক উত্তেজনা থাকবে

না।'

তার চোখ দু'টি এখন রাতের আকাশের মতো স্বচ্ছ নীল দেখাচ্ছে। 'তাহলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, যার অন্বেষণ আমরা করছিলাম!'

'জেনেটিক কোডের ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবে জানার আগে বেশ সময় লাগবে বলেই আমার আশঙ্কা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ডঃ জ্যাবিস্কি।

'আমার যথেষ্ট সময় আছে। আপনিই তো বললেন, আমার পরমায়ু একশো-পঁচিশ বছর পর্যন্ত?' ডঃ জ্যাবিস্কির দিকে তাকিয়ে হাসল জুড, 'যাইহোক, এখন বলুন, এখান থেকে কবে আমি ছুটি পাচ্ছি?'

'কাল সকালে। দৈহিক দিক থেকে আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।' উত্তরে বললেন ডঃ জ্যাবিস্কি। 'তবে আপনার যত্ন আপনাকেই নিতে হবে।'

'কিন্তু সেক্সের প্রসঙ্গে কিছু বললেন না তো?'

'আজকের এই বাধ্যবাধকতা সাময়িক,' বললেন তিনি। 'তবে এর পর যেন মাত্রারিক্ত কিছু করবেন না। আর যদি তা করেন, আপনার ওই পুরুষাঙ্গটিই আপনার অকাল মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবে।'

'তাহলে বলুন, কি ভাবে আমি নিয়ন্ত্রণ করব?'

'কেন, যোগাশ্রয়ে। সেটা কেমন শোনায় আপনার কাছে?'

'ডাকিনীবিদ্যার মতো ডাক্তার,' বলল জুড।

'পটাশিয়াম বাইট্রেটের (সল্ট পিটার) থেকে ভালো।' উঠে দাঁড়ালেন ডঃ জ্যাবিস্কি। 'আপনি তো জানেন জুড, আমি আপনাকে পছন্দ করতে শুরু করেছি আর আপনার যত্নও নিতে চাই। আপনার স্বপ্ন আমিও দেখি.....'

মারলিনের ডেস্কে স্ক্রাম্বলার টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলেই বলল সে, 'হ্যাঁ আমি মারলিন কথা বলছি।'

দূরাভাষের অপর প্রান্ত থেকে পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। 'সিকিউরিটির জন ডি. বলছি। মেক্সিকো সিটির ফ্লাইটে আমাদের এজেন্ট ডঃ সোফিয়া আইভ্যানসিককে অনুসরণ করেছিলো। সেখান থেকে এয়ারো-মেক্সিকোর ফ্লাইটে হাভানায় পাড়ি দেয়। কিন্তু তার কিউবার ভিসা না থাকায় সোফিয়ার পিছু নিতে পারেনি সে।'

'হাভানায় আমাদের এজেন্টকে খবর দিয়ে বলো তিনজন লোক যেন হাভানায় তাঁর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। আমি চাই চব্বিশ ঘন্টা ধরে তার ওপর কড়া নজর রাখা হোক। প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর আমাকে রিপোর্ট করবে, বুঝলে?'

'হ্যাঁ স্যার। আর একটা কথা, আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, সোফিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য ভায়া এয়ার কানাডা হয়ে হাভানায় ছুটে আসছে লি চুয়ান।'

'ঠিক আছে, তার ওপরেও কড়া নজর রাখো।' মারলিন তাকে খবর দেয়, 'হংকং-এর রিপোর্ট, বছরে তিন মিলিয়ান ডলার কোয়ালুড রপ্তানির কন্ট্রাক্ট, যার পরিনাম প্রচুর কোয়ালুডের লেনদেন।'

'খবর আছে পনেরো মিলিয়ান ডলার ক্রেনি ফার্মাসিউটিক্যালের অ্যাকাউন্ট থেকে বাহামা এবং সুইজ্যারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এই সব অ্যাকাউন্টের মালিক কে বা কারা, জানবার চেষ্টা করছি।'

'আমার কাছে খবর আছে, একটা অ্যাকাউন্ট অবশ্যই লি চুনের, আর সম্ভবত অপর অ্যাকাউন্ট রেড চাইনিজ সরকারের। যাইহোক, খবরটা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে তার ডেস্কের কমপিউটার প্রিন্টআউটের দিকে তাকিয়ে দেখল মারলিন। হ্যাঁ, সবকিছুই ঠিক ঠিক রেজেস্ট্রিকৃত হয়ে গেছে। আর সেগুলো অন্য কেউ ট্যাপ করেছে কিনা জানবার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার কমপিউটার সেন্ট্রালে ফোন করে জেনে নিলো। না, সব কিছুই ঠিক আছে, রিপোর্ট করল সেখানকার ডাইরেক্টার।

অপরাহ্নের রোদের তাপে তেতে উঠেছিল হাভানা। বিমান থেকে নামা মাত্র সোফিয়ার শরীরটা ঝলসে উঠল। আগেই হোটেল বুক করা ছিলো তার নামে। এয়ারকন্ডিশন চালু হয়নি তখনো। বয় তার ঘরে লাগেজগুলো রেখে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকেই জানলাগুলো খুলে দিতেই এক ঝলক তপ্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে। তা হোক, ভেতরের ফার্নেসের আবহাওয়ার থেকে তো ভালো!

ধীরে ধীরে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সোফিয়া। প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে এক এক করে সে তার গা থেকে পোশাক খুলে ফেলল। আয়নার সামনে নিজের নগ্নমূর্তি দেখতে থাকে সে। স্তনদুটো একটু যেন ভারী হয়ে উঠেছে, খয়েরী স্তনাগ্র স্বাভাবিকের তুলনায় একটু যেন বেশীই পুষ্ট। ওদিকে তলপেটটা ফুলে উঠছে। বাথটবে সুগন্ধী পারফিউম জলের সঙ্গে মিশিয়ে ডুব দিলো সে। তার তপ্ত দেহ শীতল হতে সময় নিলো। দেহ তার শীতল এবং সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধে সুবাসিত হওয়ার পর বাথটব থেকে উঠে এসে সে যখন তার গাউনের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, ঠিক তখনি দরজার হাতল ঘোরানোর যান্ত্রিক আওয়াজ তার কানে ভেসে এলো। এবং গাউনটা গায়ে চাপানর আগেই দরজাটা খুলে গেলো। ঘরে প্রবেশ করে পিছন থেকে নিকোলাইকে দরজা বন্ধ করতে দেখল সোফিয়া। দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ চেহারা, কালো চুলে ধূসর রং লেগেছে। নীরবে সে তার নগ্ন দেহের দিকে তাকাচ্ছিল।

ড্রেসিং গাউনটা তখনো তেমনি তার হাতে ধরা ছিলো, দেহটা ঢাকবার জন্য কোনো রকমই চেষ্টা করল না সে। রুশ ভাষায় শুধু বলল। 'তুমি একটু আগেই এসে পড়েছ।'

'আচ্ছা সোফিয়া, চার-চারটে বছর কি খুব দীর্ঘ নয়?' লবি পেরিয়ে তোমাকে আসতে দেখে ঠিক করলাম, আর দেরী করবো না।'

'ঘর্মাক্ত অবস্থায় তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চাইনি, তাই এই মাত্র স্নান সেরে এলাম,' বলল সোফিয়া।

দু'হাত বাড়িয়ে সোফিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে সে চুমু খেলো। 'তোমার শরীরের যে কোনো ঘ্রানই আমাকে মাতাল করে তোলে।' তার ফিস্‌ফিস্ শব্দ সোফিয়ার কানে যেন মধু ঢেলে দিলো। সোফিয়াকে নীরব এবং অভিভূতশূন্য দেখাল। 'কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে?'

'না। প্রায় চারবছর,' বলল সোফিয়া, 'জানো নিকোলাই, এক মুহূর্তের জন্যও তোমার মুখ আমার চোখের আয়না থেকে সরে যায়নি।'

তার হাত দু'টো খসে পড়ল। 'তুমি আমার কথা ভাবো এখনো তাই না?' তবুও জিজ্ঞেস করল নিকোলাই। 'তোমার জীবনে কি অন্য কোনো পুরুষ এসেছে?'

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সাবধানে তার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে বলল সোফিয়া, 'ডেস্কের ওপর আমার এ্যাটাচিকেসটা পড়ে রয়েছে। ওটার মধ্যেই রিপোর্ট রয়েছে, পড়ে দেখতে পারো।'

'স্যাম্পেনের ফরমাস দিয়েছি,' বলল সে।

'সে তো খুব ভালো কথা।' বলল সোফিয়া, 'আর একবার ভালো করে স্নান করে আসছি। খুব বেশী দেরী করবো না।'

বাথরুমে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় সোফিয়া। তারপর মিষ্টি গন্ধে সুবাসিত বাথটবের জলে ডুবিয়ে দিলো তার নগ্ন দেহ। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া, বাথরুমে ঢুকতেই দরজায় দিকে দৃষ্টি ফেলল। দরজা পথে নিকোলাই তখন দাঁড়িয়েছিল নগ্ন অবস্থায়। এক হাতে তার স্যাম্পেন, এবং অপর হাতের মুঠোয় ধরা ছিলো তার উত্থিত লিঙ্গ। বাথটবের ধারে এগিয়ে গিয়ে সে নিজেকে নামিয়ে আনল সোফিয়ার মুখের ওপর এবং তার ওপর স্যাম্পেন ঢালতে থাকল। তার কণ্ঠস্বর কেমন কর্কশ শোনাল। 'এক সময় তুমি এই স্যাম্পেন খুবই ভালোবাসতে, আর ভালোবাসতে আমার এই বিদ্ধকরার যন্ত্রটা,' বলে সে তার হাতের মুঠোটা শিথিল করতেই আরো বেশী দৃঢ় হয়ে উঠল শিষ্ন। 'দেখি আমার এই খোকাটিকে তোমার মনে পড়ে কিনা। এখন এ দুটোই খেয়ে নাও তুমি।'

'না! না!' মৃদু চিৎকার করে উঠল সোফিয়া। সেই সঙ্গে সে তাকে তার বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

নিকোলাই তখন ভীষণ উত্তেজিত, আরক্তিম মুখ, বিদ্ধকারী প্রচন্ড-ভাবে উত্থিত তখন। নিকোলাই তখন সোফিয়ার মুখের ওপর প্রলম্বিত প্রায়, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটল। 'কুত্তী! বেশ্যা!' গর্জে উঠল নিকোলাই।

কাশছিল সোফিয়া, সোফিয়ার গাল ও চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে সুধা-নির্যাস। এবার নিকোলাই সোফিয়াকে জড়িয়ে ধরে বাথটবে ডুব দিলো। সোফিয়ার প্রসারিত দু'পায়ের মাঝখানে হাঁটু মুড়ে বসে সে, সোফিয়ার ভাসমান দেহটা সে কোমরের কাছে টেনে আনতে চাইল। নিকোলাই দেহের সর্বশক্তি দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করতেই সোফিয়া দু'পা দিয়ে তাকে ঠেলে দিল। নিকোলাই-এর দেহটা সরিয়ে দিতে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল। 'না! প্লিজ, না!'

'কেন, সুন্দরী, আজ তোমার অমৃতে অরুচী কেন?' খিচিয়ে উঠল নিকোলাই। 'তোমার এই পরিবর্তন কেন?'

'প্লিজ,' তখনো চিৎকার করছিল সোফিয়া। 'আমি যে গর্ভবতী, তুমি বুঝতে পারছ না?'

'তুমি গর্ভবতী?' সোফিয়ার দিকে স্থির চোখে তাকাল সে।

'হ্যাঁ। দশ সপ্তাহ।' নিকোলাই-এর চোখে চোখ রাখল সোফিয়া।

এক মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বাথটব থেকে উঠে এলো সে। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল নিকোলাই, 'তুমি শুধু কুশ্রী বেশ্যাই নও, তুমি একটি বোকা গর্দভ! কে তোমার ভাবী সন্তানের বাবা? না কি তাও জানো না?'

'জানি,' শান্ত গলায় বলল সে, 'জুড ক্রেনি।'

তার দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এক সময় নিকোলাই বলল, 'তোমার এ্যাটাচিকেসটা আমার অফিসে নিয়ে যাচ্ছি, রিপোর্টের ফটোকপি করে নিয়ে নৈশভোজের সময় ফেরত দিয়ে দেবো তোমাকে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আর হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে লি চুয়ানও যোগ দেবে।'

❑ তেরো ❑

গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল সোফিয়া। সাড়ে-আটটায় ঘুম ভাঙ্গল। বিছানা থেকে নেমে সে তার নগ্ন শরীরটা তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে ধরল। টেরেসের জানালায় চোখ পড়তেই সমুদ্রবীচের রাস্তাটা চোখে পড়ল তার। পোশাক পরে তৈরী হয়ে নিতে হবে, ভাবল সে, নিকোলাই আসবে, তার সঙ্গে নৈশভোজ সারবে সে। দ্রুত বাথরুমে গিয়ে আবার শাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। শরীরটা ঠান্ডা করে নিয়ে গায়ে একটা হাল্কা লিনেন স্যুট চাপিয়ে নিলো। তারপর বেডরুমে ফিরে এসে সবে মাত্র মেক-আপ শেষ করেছে, এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

নিকোলাই-এর ফোন। 'ঘুম ভেঙ্গেছে?'

'হ্যাঁ। সেই সঙ্গে পোশাক পরে তৈরী,' উত্তরে বলল সোফিয়া।

'খুব ভালো। মিনিট পনেরোর মধ্যেই তোমার ঘরে গিয়ে হাজির হচ্ছি। একটা রেস্তোরায় লি চুয়ানের সঙ্গে দশটায় মিলিত হবো।'

'চমৎকার,' এই বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখল সোফিয়া। অভূতপূর্ব মেক-আপ। মুখের ওপর থেকে চিন্তা উধাও। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ চিন্তিত। বিশেষ করে আয়নায় যা সে দেখল তাতেই স্তম্ভিত। আয়না কখনো মিথ্যে বলে না। কথাটা ভেবেই তার মাথায় যন্ত্রণা উঠে গেলো। ব্যাগ থেকে জুডের দেওয়া কোকেনের শিশি বার করে দু'দুবার নাকে লাগিয়ে শুঁকল সে। এখন সে আগের মতো স্বাভাবিক বলে মনে করল। আয়নায় তার মুখটাও এখন যথেষ্ট স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। চোখের দীপ্তিও উজ্জ্বল।

স্যাম্পেনের গ্লাসটা সোফিয়ার হাতে তুলে দিয়ে বিনীত সুরে বলল নিকোলাই, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি সোফিয়া। আমি বোকা অবিবেচক। কোন্ পরিস্থিতিতে তোমাকে কুমারী জননী হতে হচ্ছে, আমি উপলব্ধি করতে পারিনি।'

'সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয়,' বলল সে। 'আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা কাজ আছে। সেটাই অত্যন্ত জরুরী।'

সোফিয়ার গ্লাসে সে তার গ্লাসটা ঠেকিয়ে বলল, 'এটা তোমার সৌজন্যে। আমার জীবনে তোমার মতো আর কোনো নারীর আবির্ভাব ঘটেনি।'

স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নিকোলাই-এর দিকে তাকাল সোফিয়া। 'ওভাবে আমার দিকে তাকিও না, আর ওভাবে আমার সঙ্গে কথাও বলো না,' সোফিয়ার কণ্ঠে অনুরোধের সুর ধ্বনিত হলো।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিকোলাই। 'জানি এরকম করা আমার উচিত নয়। কিন্তু আমার যে হিংসে হয়, হিংসে এই কারণে যে তোমার ফেলে আসা দিনগুলির অধিকাংশ সময়ই তুমি ব্যয় করেছো জুডের সঙ্গে, আমার সঙ্গে নয়।'

'নিকি, শোনো নিকি,' নরম গলায় বলল সে। 'অমন করে তুমি ভেবো না। তুমি তো জানো, আমরা সবাই আমাদের কাজ করে যাচ্ছি, আর এটাই আমাদের পেশা, তার বাইরে কিছু নয়।'

'তার সম্পর্কের বাইরে তোমার কি আর কোনো অনুভূতি ছিলো না?'

'না, আমি তা বলিনি,' বলল সোফিয়া। 'অন্যদের থেকে তুমি আমাকে বেশী ভালো জানো। সে সময় আমি ভাবতাম, সর্বক্ষণ আমরা দেহ সংসর্গে লিপ্ত হব, বোধশক্তি থাকুক আর না থাকুক। এক এক সময় আমি ভাবি, খাবার কিংবা বাতাসের চেয়েও আমার শরীর সেটাই বেশী করে চাইছে। সেই সময় আমি যে ইন্সটিটুটে আবদ্ধ ছিলাম, তখন দিনে তিন-চারবার আমার দেহ ব্যবহার করতে হতো তখন সব সময় তোমার কথা আমার মনে হতো।'

হাসল নিকোলাই। 'আমাদের সেই প্রথম মিলনের কথা মনে পড়ে? আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি একজন নিম্ফোমানিয়াক। তুমি কখনো থামতে জানো না।'

হাসল না সে। 'আমার বয়স যখন খুবই কম আমি তখন ভাবতাম, ডাক্তাররা যতক্ষণ না বলতেন আমার যৌন-স্নায়ুগুলো বড্ড বেশী অস্বাভাবিক, তার আগে পর্যন্ত আমি কারোর মুখোমুখি হতে পারতাম না। প্রকৃত সুন্দরী যুবতী মেয়েরা কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না, এবং খুব কম মেয়েরই কচ্চিৎ রাগমোচন হয়ে থাকে। তাহলে দেখো নিকি, স্রেফ বলতে পারি, আমি যোগ্য নই। এই ধরো না, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে, আমার ইন্দ্রিয়সমূহ কেমন টান-টান হয়ে উঠছে, আর এখন সেখানে বাদল নামতে শুরু করেছে।'

'আমি তোমাকে স্পর্শ করতে চাই,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'না নিকি তা করো না,' বলল সোফিয়া। 'আমি এখন অন্যরকম। তখন যাকে তুমি দেখেছিলে, সেই মেয়ে আমি নই। তুমি যে আমাকে ভালোবাসো, আমি জানি। আমি বড় হয়ে গেছি।'

'না,' জোরালো ভাবে বলল সে। 'আমি এখনো তোমাকে ভালোবাসি, এমন কি আগের থেকেও বেশী। আর তুমিও যে আমাকে ভালোবাসো, তাও জানি। সেই লোকটা তার

অর্থ, তার ক্ষমতা, তার ড্রাগ, এবং তার লাইফস্টাইলকে কাজে লাগিয়ে তোমাকে ব্যবহার করেছে। সে কি তোমাকে কখনো বলেছে, সে তোমাকে ভালোবাসে, তোমাকে বিয়ে করতে চায়?'

নীরবে মাথা নাড়ল সে।

'সে তোমাকে ব্যবহার করছে, যেমন করে সে তার নিজের লাভের জন্যে, তার অনন্তকাল ধরে শক্তি সঞ্চয়ের খোঁজে অন্যদের সঙ্গে যে রকমটি ব্যবহার করে থাকে, ঠিক সেরকম ভাবে।' গভীর আন্তরিক ভাবে তার দিকে তাকাল নিকোলাই। 'ভালো না লাগলে বাচ্ছারা যেমন ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এক সময় সে-ও তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

'না, সেরকম মানুষ সে নয়,' জুডের পক্ষ নিয়ে বলল সোফিয়া। 'তার বিবেচনা আছে, আর তাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'মনে হচ্ছে, তুমি তাকে আড়াল করতে চাইছ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তুমি নিজেকে বিশ্বাস করানর জন্যই নিজেকে আড়াল করছ,' বলল নিকোলাই। 'তুমি যদি নিজেকে গর্ভবতী হতে না দিতে, আমি নিশ্চিত ও ভাবে তুমি কখনোই অনুভব করতে না।'

'হয়তো বা,' চিন্তিত ভাবে ভাবল সে। 'কিন্তু এটা কি? একটা গবেষণা, এটাই সব কিছু। একটা বিষয়ে আমার দেহটাকে ব্যবহার করার কাজে আমিই প্রথম বিজ্ঞানী নই। এই চিকিৎসা তাকে বন্ধ্যা করে দিতে পারে, এরকম একটা আশঙ্কা ছিলো বয়স্ক মহিলাদের।'

'আর তাই কি তার সঙ্গে দেহমিলনের ব্যাপারটা তুমি পছন্দ করে নাও।'

'না, সেরকম কিছু নয়। মেয়েটি তার কাছে থেকে শুক্রানু গ্রহণ করে এবং ডজনখানেক মহিলার ভ্রূণকোষে সেটা স্থাপন করে থাকে।'

'আর সব মেয়েরাই পরবর্তীকালে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। আর তাদের থেকে তুমি একজন সৌভাগ্যবতী,' বলল নিকোলাই। 'সে যাইহোক, এখন কি হবে?'

'পরের সপ্তাহ দশম সপ্তাহ হবে। প্রত্যেক গর্ভবতীকে ডেলিভারি করানো হবে।'

'তুমি তাতে রাজী হয়ে গেলে? কেন হলে? তুমি একজন ডাক্তার। অন্য একটা মেয়ের সন্ধান করতে তাদের কোনো অসুবিধেই হতো না। এ ব্যাপারে কেন তুমি নিজেকে জড়াতে গেলে?'

'কারণ আমার দেহের ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল ছিলো,' বলল সে। 'আগে যদিও আমি কখনো জন্মনিরোধক কোনো ট্যাবলেট খাইনি, তবু তা সত্ত্বেও আমার গর্ভ সঞ্চার হয়নি। দারুণ করিতকর্মা লোক জুড্, অবাক হতে হয়—'

'এখন তুমি সত্যকে স্বীকার করবে তো,' রাগে ফেটে পড়ল নিকোলাই। 'সত্যি সত্যি তুমি তোমার পেটে তার সন্তান ধারণ করতে চাও! অথচ বহু বছর ধরে আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, কেন তুমি আমার কাছ থেকে সন্তান চাওনি?'

তার চোখে চোখ রেখে বলল সোফিয়া, 'তুমি তো কখনো জিজ্ঞেস করোনি।'

•

সোফিয়ার রিপোর্টের ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে বলল নিকোলাই, 'ওই বয়স্কা মহিলা খুবই চতুর। আট বছর হয়ে গেলো, অথচ যদিও বা তিনি সেলুলার গর্ভসঞ্চার পদ্ধতি

ব্যবহার করে থাকেন, আমরা কিন্তু এখনো সেটা আবিষ্কার করতে পারিনি। তুমি পেরেছো?'

'না। আমি জানি না, কেউ কখনো জেনেছে কিনা তাও জানি না,' বলল সোফিয়া। 'আমি এখন ভাবছি, প্রজনন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর কিছুই জানা নেই। তাঁর আশা, ক্রেনি তার কমপিউটারের সব রকম সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে তাঁর জন্য সেটা আবিষ্কার করবেন তিনি।'

কাগজপত্তর রেখে দিয়ে হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে বলে উঠল নিকোলাই, 'তুমি যে রাশিয়ায় ফিরে যাচ্ছো, তিনি তোমাকে বলেছেন?'

সোফিয়ার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হলো, 'না। কিন্তু কেন?'

'কারণ তোমাকে ব্রেজনভের সঙ্গে দেখা করতে হবে। হয়তো তোমার গর্ভপাত হওয়ার পর কথাটা বলার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন।'

'তা হতে পারে,' বলল সোফিয়া। 'তা চেয়ারম্যানের সমস্যাটাই বা কি?'

'আমি কেবল গুজবের কথাই শুনেছি,' বলল নিকোলাই, 'ক্যান্সার, আবার কেউ কেউ বলে থাকে, ওঁর নাকি সেরিব্র্যাল হেমারেজ হয়েছে। তাই তার নার্সিং এবং চিকিৎসার জন্যই তোমাকে পাঠানো হচ্ছে তাঁর কাছে।'

'কিন্তু আমার এখানকার কাজের কি হবে?'

'এটা একটা অগ্রাধিকারের প্রশ্ন,' বলল নিকোলাই। 'আমাদের কাছে ক্রেনির চেয়ে ব্রেজ নভ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।'

চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'এই মহিলা অত্যন্ত চতুর। জানো নিকি, ব্রেজনেভের কাছে পাঠানোর মতো কম করেও আরো চারজন্য সহকারী ছিলো তাঁর। তা সত্বেও তাঁর কাছে আমাকে পাঠানোর একটাই উদ্দেশ্য, তাঁর আবিষ্কারের পদ্ধতি জানার সুযোগ কমিয়ে দেওয়া। ক্রেনি নিজেই তার ব্যবসা সংক্রান্ত সব কিছুই তার ক্যালিফোর্নিয়ায় কমপিউটার সেন্ট্রালে জমা করে রাখে। তবে তাঁর ফরমূলাটা যে কমপিউটারে সরবরাহ করা হয়েছে, আমি আশা করি না। তবে যদি করাও হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কমপিউটারের কোড নম্বরটা জানতে হবে। আর সেই কোড নম্বর জানে কেবল ক্রেনি নিজে, তার ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা মারলিন এবং কমপিউটার সেন্ট্রালের ডাইরেক্টর।'

সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল নিকোলই, 'সম্ভবত ওরা ছাড়াও আরো একজনের এই কোড নম্বর জানা থাকতে পারে। আর সেই লোকটি হলো লি চুয়ান। আর তাই তো সোফিয়া, আজ আমরা তার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি। সে আমাকে বলেছে, আমাদের সেটা সরবরাহ করতে পারে সে।'

'এর কোনো মানে হয় না,' বলে উঠল সোফিয়া। 'তাই যদি হয়, তাহলে কেনই বা সে আমাদের সঙ্গে অমন পর পর ভাব দেখাতে গেলো?'

'এর সঙ্গে পর পর ভাবের কোনো সম্পর্ক নেই,' মৃদু হেসে বলল নিকোলাই। 'তা না করলে কুড়ি মিলিয়ান ডলার লাভ করা, কম কি বলো?'

মারলিন ফোন করেছিল। কি একটা জরুরী ব্যাপারে সে দেখা করতে চায় জুডের

সঙ্গে। সাড়ে-আটটার সময় বোকা র‍্যাটনের অফিস থেকে আসছে সে। ফার্স্ট এডিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছে জুড তাকে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই ব্রিজেটকে ঘরে ঢুকতে দেখল। তাকে দেখা মাত্র জুড বলে উঠল, 'আমার হাত থেকে এই সব সূচগুলো সরিয়ে দাও, আর এই বিছানা থেকে সরিয়ে আমাকে স্নান করতে সাহায্য করো।'

'ডঃ জ্যাবিস্কির হুকুম ছাড়া আমি তা করতে পারি না,' উত্তরে বলল মেয়েটি।

'বেশ, তাহলে তাঁকেই ডেকে নিয়ে এসো,' হুকুম করল জুড।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ব্রিজেট। একটু পরেই ডঃ জ্যাবিস্কি ফোন করলেন। 'আপনার অনুরোধের কথা শুনলাম মিঃ ক্রেনি, খুব ভালো কথা। তবে যন্ত্রপাতিগুলো আপনার দেহ থেকে সরানর সময় আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই, আমি দেখতে চাই, আপনি সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দশ মিনিটের মধ্যেই আপনার ঘরে গিয়ে হাজির হচ্ছি। এরই ফাঁকে নার্স তার প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলবে।'

পর মুহূর্তে ব্রিজেট ঘরে এসে ঢুকল। তার হাতে তোয়ালে মোড়ানো একটা হাইপোডারমিক সূচ সহ ট্রে। 'চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন, এটা আপনার পুরুষাঙ্গে বিঁধানো হবে।'

তার কথায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল জুড। তার কোমরের ওপর থেকে ব্রিজেট চাদরটা সরিয়ে ফেলতেই জুডের অর্ধনগ্ন দেহটা প্রকাশ পেলো। মেয়েটি এক হাতের মুঠোয় জুডের শিষ্ন আবদ্ধ করল, পরক্ষণেই অ্যালকোহলের একটা শীতল আদ্র স্পর্শ অনুভব করল জুড, তারপর সামান্য একটু সূঁচ বিঁধানোর যন্ত্রণা।

'ইনজেকশনটা দিতে সময় লাগবে, স্থির হয়ে এই ভাবে শুয়ে থাকুন।'

'আমার এ-টা দেখতে গিয়ে বেশ মজা উপভোগ করবে, এই তো?'

হাসল ব্রিজেট।

'ধর্ষকামী,' বলল জুড। এক মুহূর্তের জন্য থেমে সে আবার বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমার ওই নরম হাতের স্পর্শে আমার ওটা কেমন কঠিন হয়ে উঠছে দেখেছ?'

আবার হেসে উঠল ব্রিজেট। সূঁচটা তুলে নিয়ে বোতামের আকারে একটা ব্যান্ড তার পুরুষাঙ্গে সূচ-বিঁধনো জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'কোনো উপায় নেই। আপনারই দোষ। আপনি খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাই অসময়ে কাজটা সারতে হলো। এখন ওটার যত্ন তো নিতেই হবে, কোনো ভাবেই উত্তেজিত করা চলবে না। এখন আমাকে অপকম্ম করতে বলছেন, তারপরেই হয়তো বলবেন,—' কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি।

বালিশে একবার গড়াগড়ি দিয়ে তার দিকে তাকাল জুড। 'ব্রিজেট,' তার মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'সব সময়েই জীবনের একটা আনন্দ বলে কথা আছে, জানো তো?'

'ওটা কিন্তু এখন প্রযোজ্য নয়,' তেমনি হেসে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, 'আমি বরং আপনার জন্য অরেঞ্জ জুস নিয়ে আসি।' দরজা বন্ধ করে ব্রিজেড চলে গেলো।

বিছানার ধারে বসেছিল জুড। ডঃ জ্যাবিস্কি তার ব্লাডপ্রেসার চেক করে বললেন,

'ভালো। একশো-কুড়ি, আশি।' তারপর নার্সের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় আরো কতকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকলেন। পরীক্ষার কাজ শেষ হলে তিনি সামনের টেবিলে রাখা কমপিউটারের স্যুইচটা অন্ করে দিলেন। নৃত্যের ভঙ্গিমায় কতকগুলো সবুজ এবং হলুদ রঙের রেখা পর্দায় ভেসে উঠতে দেখা গেলো। 'ওসব কি?' সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল জুড।

'রক্তের বিশ্লেষণ,' একটু থেমে ডঃ জ্যাবিস্কি বলে উঠলেন, 'খুব ভালো সাড়া পাওয়া গেছে আপনার মধ্যে।'

'তাহলে আমি এখন শাওয়ার সেরে নিতে পারি?'

'না,' সরাসরি তিনি বললেন, 'আমি চাই আপনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। ব্রিজেট আপনার দেহ স্পঞ্জ করে দেবে। তারপর আমরা আপনাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবো। আপনি হাঁটাচলা করার আগে টানা তিন সপ্তাহ এক নাগাড়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। আমি চাই না অহেতুক আপনি মাটিতে পড়ে যান।'

'আপনি একজন চিকিৎসক।'

'তাই আপনাকে বলি, আপনাদের সাক্ষাৎকারের সময় আমি আপনার পাশে থাকতে চাই।'

এক মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে শিশুর মতো আধো-আধো স্বরে বলে উঠল জুড, 'ঠিক আছে। আমি এখন নিজেকে শিশুর মতো ভাবতে শুরু করেছি। আর এও ভাবছি, প্রতি মুহূর্তে কেউ যেন আমার ওপর নজর রাখুক।'

'জুড, আমি কি ভাবছি বলে তোমার মনে হয় জানো?' এই প্রথম ডঃ জ্যাবিস্কি নরম এবং ভিজে ভিজে গলায় বললেন, 'তুমি যে এখন আমার কোলের শিশুর মতো হয়ে উঠেছ, ভাবতে কেমন রোমাঞ্চ লাগছে। এই মুহূর্তে এই পৃথিবীতে আমার মতো গর্বিত এমন কোনো মা নেই যে কিনা তোমার মতো এক শিশু সৃষ্টি করতে পারে।'

'আপনাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে,' বলল মারলিন।

হুইল চেয়ারে বসে জুড তার হসপিটাল বেডরুম থেকে বসবার ঘরে কনফারেন্স টেবিলের সামনে এসে হাজির হলো।

ঘরের এক কোণায় বসেছিলেন ডঃ জ্যাবিস্কি। তাঁর দিকে আঙুল তুলে জুড বলে উঠল, 'সব ঠিক, এখন আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি।'

মারলিন তার এ্যাটাচিকেসটা খুলে একটা কমপিউটার প্রিন্টআউট বার করল। সেটা জুডের সামনে টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'যদিও এখনো পর্যন্ত সব খবর আমি পাইনি, কিন্তু আমাদের কমপিউটার কোডের যে বিচ্যুতি ঘটেছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'এ কথা ভাববার এমন কি কারণ ঘটল তোমার?' অবাক চোখে তার দিকে তাকাল জুড।

'আগে সব সময় নির্ভুল প্রিন্টআউট পাওয়া যেতো। একটু ভুলও কখনো হয়নি। কিন্তু এখন অজস্র ভুলভ্রান্তি ঘটতে দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ হওয়ার এটাই আমার কারণ।'

'বেশ তো নম্বর বদলে দাও।'

'এ ব্যাপারে আপনি রাজী হওয়াতে আমি খুশি,' বলল মারলিন। 'ইতিমধ্যেই কমপিউটার সেন্ট্রালকে সেটা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু সেটা সরকারী ভাবে কার্যকারী করার জন্য আপনার একটা দস্তখত দরকার।' এই বলে একটা কাগজ এবং কলম জুডের দিকে এগিয়ে দিলো মারলিন।

কাগজটা সই করে জুড জিজ্ঞেস করল,'আর কিছু আছে?'

এরপর প্রিন্টআউটের ওপর এক নজরে চোখ বুলিয়ে মারলিন বলে চলল, 'আদালতের অনুমতি পাওয়ার পর সাউথ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন সেভিংস এবং লোন অ্যাসোসিয়েশানের হিসেব নেওয়া হয়েছে। শাখায় বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে চারজন কিউবিয়ান, পাঁচজন কলম্বিয়ান এবং দু'জন পেরুভিয়ান। এরা সবাই ভদ্রলোক বলে পরিচিত এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবসায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সবাই।'

সব শুনে বলল জুড, 'ব্যাঙ্কের নাম বদল করে ''সাউথ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন লন্ড্রি কোম্পানি'' রাখা উচিত। এবং এ-ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে।'

মারলিন হাসতে পারল না। একটু ইতস্তত করে বলল সে, 'বিজ্ঞাপনে আমাদের ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাতে আমাদের চারশো মিলিয়ান ডলারের ক্ষতি হতে পারে।'

'তাহলে তোমার পরামর্শটা কি বলো?' দুঃখের হাসি হেসে বলল জুড।

'বুদ্ধি করে অ্যাকাউন্টগুলো আমরা বন্ধ করে দিয়ে মালিকদের আমানত ফিরিয়ে দিলে ভালো হয়।'

'আমার বাবা এবং আঙ্কল পল বলতেন, যে পরিস্থিতির সমাধানের কোনো উপায় থাকে না, তার উন্নতি করার চেষ্টা কখনো করো না। কারণ অচিরেই দেখবে, তোমার কবর খননের সব আয়োজনই পাকা হয়ে গেছে তখন।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল জুড, 'তা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে?'

'ক্রেনি ফাইনানসিয়াল সার্ভিসেসের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্লারেন।'

'কৈফিয়ত চাও তার কাছ থেকে।' উত্তেজনা প্রশমনের জন্য এক মুহূর্ত নীরব থেকে সে আবার বলল, 'আমাকে আর কিছু জানানর আছে?'

'লি চুয়ান,' বলল মারলিন। 'আমাদের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সে তার নিজস্ব ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে।'

'তাকেও এক হাত নিয়ে নাও,' আবেগকম্পিত গলায় বলল জুড, 'তুমি কি এবার তৃতীয় কারোর নাম উল্লেখ করতে চাও?'

ডঃ জ্যাবিস্কি তখনো বসেছিলেন সেখানে। সেদিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গিয়েও ইতস্তত করলেন তিনি। সেটা লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ জ্যাবিস্কি। 'আমার অনুপস্থিতিতে আপনি এখন আর অসহায়বোধ করবেন না,' এই বলে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'না। আপনি থাকুন,' তাঁকে বাধা দিয়ে জুড বলে উঠল, 'আমি কিরকম একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়েছি, নিজের কানে শুনে যান।'

ডঃ জ্যাবিস্কি র দিক থেকে চকিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জুডের ওপর চোখ রেখে মারলিন বলল, 'সোফিয়া, হ্যাঁ, এই থার্ড পার্সন হলেন সোফিয়া। তিনি এখন হাভানায়। আর লি চুয়ান ও সেই সঙ্গে KGB-র তিন নম্বর নিকোলাই বোরোভনিক। সিকিউরিটি থেকে তাদের রিপোর্ট এখনো আসেনি।'

'ডাক্তারের দিকে তাকাল জুড। 'আপনার সহকারিণীর সঙ্গে KGB'র এই লোকটির ঘনিষ্টতার ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?'

''ওরা দু'জন একে অপরকে ভালোবাসত। এক সময় সোফিয়া বিয়ে করার জন্য সে তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ না হওয়াতে সোফিয়া তখন স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে যোগ দেয়।'

কৌতূহলী চোখে তাকালো জুড। 'সেক্ষেত্রে হাভানায় গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এতো সব ঝামেলা পোহাতে গেলো কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার ধারণা,' বললেন ডঃ জ্যাবিস্কি, 'তিনি হয়তো ব্রেজনেভের প্রসঙ্গে কিছু বলতে চেয়েছিলেন তাকে। সোফিয়ার পরবর্তী রোগী হতে চলেছেন তিনি।'

'তার মানে সে আর ফিরে আসছে না?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'ফিরে সে অবশ্যই আসবে।'

'কেন ডাক্তার?'

'একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আছে, যা কেবল সে একাই করতে পারে। অন্য কেউ নয়।'

'সে কি পরীক্ষা ডাক্তার?'

'একটা গর্ভপাত,' শান্ত ভাবে বললেন ডঃ জ্যাবিস্কি। এবং আরো বললেন, 'আর সেটা নিজের।'

স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকাল সে। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, তিনি একজন—'

'হ্যাঁ স্যার,' উত্তরে বললেন ডাক্তার।

'আচ্ছা, এ খবরটা সে আমাকে দিলো না কেন?'

'বলতে চায়নি সে।'

'কেন সে এটা করবে?' ডাক্তারের চোখের কোণায় একটা ছোট্ট আলোর রোশনাই দেখতে পেলো সে। 'আপনি অবশ্যই উত্তরটা জানেন।'

'আমি জানি। কিন্তু আপনি হুকুম করলেও কারণটা আমি বলতে পারবো না স্যার।'

'ডাক্তারের গোপনীয়তার জন্য, তাই কি?' বলল জুড।

'হ্যাঁ স্যার। আপনার এই বোধশক্তির জন্য ধন্যবাদ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুড। তার মুখে একটা বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

❑ চোদ্দ ❑

শহরতলী হাভানার একটা পুরনো বসতি এলাকার রেস্তোরাঁ। এই রেস্তোরাঁয় কাস্ত্রোর দেশের শতকরা প্রায় একশো ভাগ অভিজাত শ্রেণীর লোক এবং তাদের অতিথিদের আগমন ঘটে থাকে। পুরনো আমলের বড় বড় সব টেবিল, সোনা ও রূপোর কাঁটা-চামচ। টেবিলের ওপর সোনালি মোমবাতির মৃদু আলো। একান্তে নির্জনতার প্রয়োজন হলে মোমবাতিগুলো দেওয়ালের চোর-কুঠরিতে চালান করে একটা ছায়াকুঞ্জ রচনা করা যায়।

ছ'জনের একটা টেবিলের সামনে একমাত্র মহিলা সোফিয়া বসেছিল। তার দু'পাশে বসেছিল নিকি এবং লি চুয়ান। নিকির ঠিক পার্শ্ববর্তী স্থান KGB'র হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি কারপভ, সেখানকার রাশিয়ান দূতাবাসের প্রতিনিধি। সোফিয়ার টেবিলের ঠিক উল্টোদিকে বসেছিল তাদের অতিথি তরুণ কিউবান মেজর জেনারেল স্যান্টোজ গোমেজ। তার এবং লি চুয়ানের মাঝখানে বসেছিল ধূসর রঙের বিজনেস স্যুট পরিহিত ছোট-খাটো চেহারার চীনের বেসরকারী প্রতিনিধি ডয় সিন। অথচ কিউবায় চীনের কোনো সরকারী দূতাবাস ছিলো না।

মাঝরাতে নৈশভোজ শুরু, এখন সকাল প্রায় দেড়টা, ওয়েটার কফি নিয়ে এলো। এবার তারা মোমবাতিগুলো দেওয়ালের চোর-কুঠরিতে রেখে এলো নির্জনতা সৃষ্টি করার জন্য।

কফির কাপে একবার চুমুক দিয়ে লি চুয়ান প্রথমে বলতে শুরু করল ঃ 'কমরেডগণ, হয়তো আমার কথায় আপনারা ব্যথিত হতে পারেন। তবু কর্তব্যের খাতিরেই আমাকে বলতে হচ্ছে। এখানে ক্ষমতার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি আমরা। কিন্তু আজকের ক্ষমতা কিসের— শুরু করা যাক। সাম্যবাদ নয়, পুঁজিবাদ নয়, স্রেফ অর্থ। আর এখন এই অর্থ সঞ্চয়ের সব থেকে বৃহৎ উৎস হলো তেল ও গ্যাস। মধ্যপ্রাচ্য এবং OPEC ব্লকের দেশগুলোর শক্তির উৎস এগুলো। আর এই সব শক্তির অধিকারী না হয়েও আমেরিকা তার দূরদর্শিতার বলে সেই সব প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর দেশগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পেরেছে। এখন অন্য সব দেশগুলোও এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ আবিস্কার করে ফেলেছে। তবু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তা সত্বেও আমেরিকা এ-ব্যাপারে আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তার কারণ বলছি শুনুন, এখন প্রতিটি দেশ এই শক্তির সন্ধানে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। দুঃখের কথা হলো, এই শক্তি সঞ্চয়ের খেলায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদদের হাতে এই খেলার সব তাস রয়ে গেছে। সে যাইহোক, অন্য আর এক খেলায় আমরা তাদের পরাভূত করতে পারি। না, আমি কোনো সংঘর্ষে যেতে বলছি না, কিংবা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে হাত মেলাতেও বলছি না। এ খেলা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের, এ একটা রাজনৈতিক দাবার চাল বলা যেতে পারে। আমি যা বলতে চাইছি, এর সঙ্গে অর্থের বাস্তবতা কিংবা ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এ হলো মাদকদ্রব্য এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা। ষাট দশকে এই ব্যবসার প্রথম সূত্রপাত ঘটে আমেরিকায়। পরে পাশ্চাত্যে, তথা সারা ইউরোপে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও ঢালাও কারবার শুরু

হয়ে যায়। পছন্দ হোক চাই না হোক, সারা বিশ্বে এর প্রভূত আর্থিক আন থাকার দরুন এর মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে।'

এই বলে দীর্ঘ সময় ধরে নীরব হলো সে অন্যদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য।

অন্যেরা তখন বুঝে গেছে, এই পরিস্থিতির গুরুত্ব তাদের চেয়ে অনেক বেশী অবগত হয়েছে লি চুয়ান, তার কথার ওপর তাদের বলার কিছু নেই, তাই তারা নীরব থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল। এবং তার পরবর্তী ভাষণের অপেক্ষায় রইল। আরো কিছুক্ষণ তাদের মুখের ভাব উপলব্ধি করার পর লি চুয়ান আবার মুখ খুলল, 'ব্যাপারটা সহজ এবং দ্রুত করে তোলবার জন্য বলছি, একসময় এই মাদকদ্রব্যের জমায়েতটা নিয়ন্ত্রণ করত মাফিয়া গ্যাংস্টাররা। মধ্যস্থতা, দূর্নীতি এবং সংঘর্ষের রাজত্ব তখন সীমাবদ্ধ ছিলো সিসিলি এবং ফ্রান্সের মধ্যে। এরপর বিভিন্ন দেশ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে এক এক করে। এই পথে মুনাফাটা এতো বেশী হয়ে দাঁড়ায় যে, তখন নারী দেহের বেচা-কেনা এবং অন্য সব অবৈধ চোরাচালানের পুরনো ব্যবসায়ীরা আর তাতে তেমন আগ্রহবোধ করে না। তখন রাসায়নিক উৎপাদনকারীরা, অর্থনৈতিক বাজারের ভবিষ্যৎ প্রবক্তরা, হ্যাঁ এমন কি দুর্দশাগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতারা তখন এই মাদকদ্রব্যের ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে তাদের রাজনৈতিক যন্ত্রণা এবং চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তাই কমরেডগণ, আমি আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, এই পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারে আমরা এখন কি ভাবতে পারি?'

আবার সে টেবিলের চারদিকে তাকিয়ে রইল উপস্থিত সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার জন্য। কিন্তু কেউই সাড়া দিলো না। সে তখন আবার বলতে শুরু করল এইভাবে, 'কমরেডগণ, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা এখন একটা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের সংগ্রামে নৈতিকতার মৃত্যু হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন এখন শক্তি সঞ্চয় করা, শতাব্দীর পুরনো রাজনৈতিক শিকার হচ্ছে শ্রমিক আর কৃষকগোষ্ঠী। বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে তারা তাদের ন্যায্য পাওনার জন্য অনুযোগ করেও প্রত্যাখ্যাত। এ হেন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী ড্রাগ ব্যবসার সব কলকাঠি যখন আমরা জেনে গেছি, তখন আমার বক্তব্য হলো, কেন এই সহজ সুযোগটা আমরা হাতছাড়া করব? এতক্ষণ যা বললাম, দেশকে শক্তিশালী করার জন্য এর থেকে ভালো পথ আর কি হতে পারে, আপনারাই বলুন?'

জেনারেল স্যান্টোজ গোমেজ গাড়ির সামনের আসন থেকে পিছন দিকে ফিরে নিকি ও সোফিয়ার উদ্দেশে বলে উঠল, 'লি চুয়ান একটা বোকা লোক। আর বড্ড বেশী কথা বলে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আপনি কি মনে করেন, তার প্রস্তাবে কোনো গুরুত্ব আছে?'

'না,' উত্তরে বলল নিকি।

'লোকটা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, কারণ সম্ভবত সে লোভী এবং বোকা। আমি এখন ড্য় সিন-এর ব্যাপারে চিন্তিত। এর থেকে চীনারা একটা বড় রকমের

দুর্নাম রটাতে পারে। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে ফিডেলকে অবগত করানো উচিত।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি,' বলল নিকি। 'তবে খুব বেশী দেরী করা ঠিক হবে না। ডয় সিন তার জায়গায় ফিরে যাওয়া মাত্র তাদের লোকেদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। প্রথমে যারা এ ব্যবসায় নামবে, তারাই বেশী মুনাফা করবে।'

মাথা নাড়ল জেনারেল। 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' তার পাশের আসনে রাখা রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে বোতাম টিপল সে। একটা বোবা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে। একটা শব্দই কেবল উচ্চারণ করল সে, 'এখন।' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দাঁত বার করে হাসল সে। 'বিদ্রোহের আগে হাভানায় একটা শো দেখানো হয়, যা ছিলো ধনী আমেরিকানদের প্রিয়। এমন কি এ-ব্যাপারে হেমিংওয়েও বলেছিলেন, 'অবশ্যই বিদ্রোহ আসবে, আইন সম্মত ভাবে সেটা দমন করা হবে। তবে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোকদের জন্য সে সব সময়েই উন্মুক্ত। সম্ভবত আপনিও সেটা দেখতে চাইবেন।' সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'অবশ্যই সেটা একটা বেদনাদায়ক পর্ণোগ্রাফিক ছবি, কিন্তু সেটা একটা চক্রান্তমূলক ছবিও হতে পারে কমরেড ডক্টর। সম্ভবত সেটা দেখবার জন্য বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এ যেন পুঁজিবাদের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অধঃপতন।'

জেনারেলের দিকে ফিরে তাকাল সোফিয়া, তার মনে হলো, জেনারেলও তার সম্মতির প্রতিক্ষায়। 'কমরেড জেনারেল, সেক্ষেত্রে,' বলল সে, 'মধ্যবিত্ত সমাজের দুর্নীতির ব্যাপারে গবেষণার কাজ করার নিরীখে আমার মনে হয়, সেদিকে আমাদের নজর দেওয়াটা লাভজনক হবে।'

'ডক্টর, আমার মনে হয়, আপনি অবশ্যই তাতে বেশ মজা উপভোগ করবেন,' বলল জেনারেল। তার মুখের ওপর একটা সন্তুষ্টির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

একটা অবর্ণনীয় বিল্ডিং-এ ক্লাবটা। ক্লাবের ভেতরে প্রবেশ করল তারা। হোটেলের পরিচালক নৈশভোজের পোশাকে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাল জেনারেলকে। একটা ছোট ঝাড়বাতির আলো ঝুলছিল ছাদ থেকে।

থিয়েটারের ছোট প্রাইভেট বক্সের মতো একটা ঘরে গিয়ে নিচু ককটেল টেবিলের চারপাশে মৃদু ফিকে গোলাপী আলো জ্বলছিল। ককটেল টেবিলের দিকে তাকাল সোফিয়া। টেবিলের ওপর স্যাম্পেন, কঁন্যাক, স্কচ হুইস্কি, ভদকা এবং রামের বোতল সাজানো। বাতাসে ম্যারিজুয়ানাব গন্ধ মম করছিল। গ্লাস এবং আইস কিউবের পাশে থরে থরে সাজানো স্টারলিং সিলভার সিগারেট বক্স এবং জ্বলজ্বলে সাদা কোকেনের ডিশ দেখে কেউ অবাক হলো না। ছোট সোনার চামচ এবং স্ট্র দুই-ই ছিলো সেখানে।

হোটেল পরিচালকের দিকে তাকিয়ে জেনারেল ইশারা করতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো এবং তখনি দুজন যুবক দুটি স্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে ঢালতে থাকে এবং মেয়েরা রুপোর সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বার করে তাদের সামনে মেলে ধরে। পরে কোকেনের ডিশটা এগিয়ে দেয়।

একটা স্ট্র হাতে তুলে নিয়ে কোকেনের ডিশের ওপর একটা প্রান্ত রেখে অপর প্রান্তটা

নাকে ঢুকিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে সোফিয়া। তার ব্রেনের মধ্যে কোকেনের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। তাকে কোকেন নিতে দেখে হাসল জেনারেল এবং সে নিজে স্যাম্পেনের গ্লাস তুলে নিলো।

'একটু পরেই শো শুরু হবে,' বলল জেনারেল। 'তবে এই ফাঁকে, যদি আপনারা কেউ চান, আমাদের অ্যাটেনডেন্টরা আপনাদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করতে পারে।'

'কেন, এই তো আমি বেশ ভালোই আছি,' বলল সোফিয়া।

'আপনি যা ভালো মনে করেন,' হাসল জেনারেল। একটি যুবককে কাছে ডেকে এনে সে তার কোমরের ওপর থেকে কাপড়ের ছোট্ট আবরণটা তুলে ধরতেই জেনারেল বলে উঠল, 'ফ্যান্টাষ্টিক, তাই না? প্রতিটি যুবকের পুরুষাঙ্গ লম্বায় সতেরো সেন্টিমিটারের কম নয়। সেটা ইঞ্চিতে কত হয়?'

'জেনারেল, অঙ্কে খুব আমি খুব একটা ভালো নই,' বলল সোফিয়া। তার ব্রেনে তখন কোকেনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

হাসল জেনারেল। সে এবার একটি মেয়েকে কাছে ডেকে বলল, 'বেচারা ওই ছেলেটিকে একটা লিফট্ দাও যাতে করে আমরা তার প্রকৃত মাপটা চাক্ষুষ করতে পারি।'

যুবকটির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে মেয়েটি, আর ঠিক সেই মুহুর্তে দরজায় নক্ করার শব্দ শোনা গেলো।

হোটেল পরিচালক কক্ষে ঢুকে তার কানে ফিস্‌ফিসিয়ে কি যেন বলল, সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু পরেই ফিরে আসছি। আমার একটা টেলিফোন এসেছে। দয়া করে ওদের কাজ চালিয়ে যেতে দিন, বন্ধ করে দেবেন না।'

ওদিকে জেনারেল চলে যাওয়ার পর যুবক-যুবতী দু'জন তাদের খেলা চালিয়ে যেতে থাকে এমন ভাবে যে, জেনারেল যেন দেখছে। সোফিয়ার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে নিকি রুশ ভাষায় বলে উঠল, 'বিরক্তিকর। জানোয়ারদের মতোন।'

তার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'আমি জানি না,' আন্তরিক ভাবে বলল সে। 'যৌন ইচ্ছা থেকে আমি এখন সরে এসেছি।'

'তুমি একজন বেশ্যা,' রাগতস্বরে বলল সে।

'আমি সৎ,' বলল সোফিয়া। 'আমি অন্তত বলতে পারি, আমি কি অনুভব করি। তুমি যে এতে মুগ্ধ হও না, কিংবা উত্তেজিত হও না, এ কথা তুমি আমাকে বলতেই পারো না।'

'আমি লোহার মানুষ নই।'

'এখনো হওনি, কিন্তু হতে বেশী দেরী নেই,' নিকোলাইকে চিমটি কেটে বলল সে, 'তুমিও কিন্তু তপ্ত হয়ে উঠছ।'

'কুশ্রী,' বিড়বিড় করে বলল নিকোলাই।

'কেন এ কথা বললে? এই কারণে যে, আমি আমার দেহ দান করে থাকি, আমাদের দেহ পুরুষের ভোগ্য পণ্যের মতো। যা কিন্তু তোমরা পারো না। সম্ভবত সব পুরুষরাই ভন্ড অন্তত হৃদয়ের দিক থেকে তো বটেই,' দৃপ্ত গলায় বলল সোফিয়া। কিন্তু দরজাটা

শব্দ করে খুলে যেতেই দ্রুত সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সেই ম্লান আলোতেও জেনারেলের মুখে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছাপ দেখল উপস্থিত সবাই।

'ওরা মৃত!' চিৎকার করে বলে উঠল জেনারেল।

'কে কে?' টান টান হয়ে জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'লি চুয়ান এবং অন্যারাও!'

সোফিয়ার পাশে এসে শান্ত গলায় বলল নিকি, 'জেনারেল, আপনার লোকেরা খুবই দক্ষ।'

'না, আমরা তাদের খুন করিনি,' বলল জেনারেল। 'ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমার লোকেরা ঘটনাস্থলের ধারে-কাছে ছিলো না। তারা যখন রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসছিল তখনি তারা খুন হয়।'

'খুনীকে কেউ তখন দেখেছিল?' জিজ্ঞেস করল নিকি।

'না, এমন কি গুলির আওয়াজ পর্যন্ত কেউ শুনতে পায়নি। বন্দুকে সাইলেন্সার লাগানো ছিলো। গাড়ির চালক তাদের নিতে এসে তাদের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল।'

'সি.আই.এ.', বলল নিকি। 'আমরা শুনেছি, 'রাস্তার দু'দিকেই কাজ করত লি চুয়ান। আর সত্যি তাই যদি হয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আবিস্কার করে থাকবে, আমাদের হয়েও কাজ করত সে......সে যাইহোক। যেই তাকে হত্যা করে থাকুক না কেন, আমাদের উপকার সে করেছে। আমাদের অন্তত ব্যাখ্যা করতে হবে না।'

'তার মানে খুনী জানে, লি চুয়ানের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছিলাম। হয়তো পরে আমাদের পিছনেও তারা লাগতে পারে।' চিন্তিত গলায় বলল জেনারেল।

নিকি হাসল। 'ওরা জানে, আমরা কোন্ তরফের লোক!'

তাদের দিকে ফিরে সোফিয়া বলল, 'আমার কি হবে?'

নিকি মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার কোনো চিন্তার কারণ আছে বলে তো আমি মনে করি না। তোমার ওপর সি.আই.এ-র আদৌ কোনো আগ্রহ আছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না,' বলল সোফিয়া। 'আমি সি.আই.এ-র কথা ভাবছি না, আমার চিন্তা জুড ক্রেনিকে নিয়ে।'

'একটা অতি স্বার্থপর লোক সে। কিই বা করতে পারে সে?'

'নিকি, তুমি বোকামো করছো,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল সোফিয়া। 'ক্ষমতার প্রসঙ্গ উঠলে জুডের জন্যও চিন্তা করত লি চুয়ান। তোমার ধারণার অতীত সেই ক্ষমতা। যদি ধরা যায়, সি.আই.এ. তাকে খুন করেছে, তাহলে ধরে নিতে হবে সেটা জুড ক্রেনির হুকুমেই হয়েছে।'

নীরবে তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নিকি।

'আমার মনে হয় আমাদের হোটেলে পৌঁছনর জন্য বাড়তি দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করা উচিত তোমার,' বলল সোফিয়া। 'আগামীকাল সকালে মেক্সিকো সিটির বিমান ধরার জন্য আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

কমলালেবুর জুসে চুমুক দিয়ে নার্স ব্রিজেটের দিকে তাকালো জুড। 'দেখছ, এটি কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে?' এই বলে মেয়েটিকে দেখানর জন্য সে তার কোমরে নিচ থেকে চাদরটা সরিয়ে দিলো। 'একে ঠান্ডা করার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করো!'

'ওটা স্বাভাবিক পর্যায়ে আছে। কমলালেবুর জুসটা পুরো খেয়ে নিন, দেখবেন ওটা কেমন ঠান্ডা হয়ে গেছে।'

'কুত্তী হারামজাদী,' খিঁচিয়ে উঠল জুড। 'কেন তুমি বুঝতে চাও না, তুমি একজন মেয়ে, কেবল নার্স নও। আমার শরীরের যত্ন-নেওয়ার বদলে আমার দেহেরও একটু যত্ন নাও।'

'মিঃ ক্রেনি,' হাসল মেয়েটি। 'জানি না কি ভাবে আপনার সঙ্গে মোকাবিলা করবো। আপনি কি বেপরোয়া টিনএজ বয়, নাকি একজন নোংরা বৃদ্ধ লোক?'

'মনে করো না দু'টোই?' বলে হাসল সে।

'অপেশাদার!' ভাবলেশহীন গলায় বলল ব্রিজেট, 'আপনি যে একজনের রোগী তা নিশ্চিত হতে হবে আপনাকে।'

এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠতেই রিসিভারটা তুলে নিলো জুড।

'আমি মারলিন বলছি। কেমন আছেন স্যার?'

'ভালো, ডাক্তার বলেছে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আমাকে এখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে,' বলল জুড।

'এদিকে সিকিউরিটির খবর, লি চুয়ান মৃত। নৈশভোজের জন্য সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সিকিউরিটির লোক তার ঘরে ঢুকে অনেকগুলো জিনিষ আবিস্কার করেছে, তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হলো, আমাদের কমপিউটার সেন্ট্রালের অ্যাকসেস, কোড, যেটা সে কুড়ি মিলিয়ান ডলারে বিক্রী করতে চেয়েছিল।'

'ও একটা গর্দভ' খিঁচিয়ে উঠল জুড, 'অতো টাকা দিয়ে সেটা কেনার মতো গাধা কেউ নেই।'

'লোকটার বাস্তব অভিজ্ঞতা বলতে কিছু নেই,' বলল মারলিন। 'তার ট্রাভেল কেস থেকে পাওয়া অন্য সব কাগজ থেকে জানা যায়, আমাদের সাউথ অ্যান্ড ওয়েষ্টার্ন সেভিংস এবং লোনের সম্পূর্ণ প্রিন্টআউট কমপিউটার থেকে বার করে নিয়েছিল সে। এখন বুঝতে পারছ, কেন সে কমপিউটারের মধ্যে ডুবে থাকত। এখন আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, কি ভাবে সে আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে তার নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা সরিয়েছে।'

'তা কে তাকে খুন করল?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'সিকিউরিটির খবর, তার খুনীর সঙ্গে সোফিয়ার পুরনো বয়ফ্রেন্ডের যোগসাজস ছিলো।'

'আর সোফিয়ার খবর কি?'

'ও এখন সব থেকে ব্যস্ত। স্ক্র্যাম্বলার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সব দৃশ্য টেপ করে রেখেছি। অফিসে এলে আপনাকে টেপ চালিয়ে দেখাব।'

হাসল জুড। 'তুমি দেখছি আমার থেকেও নোংরা বুড়ো ভাম। সে যাইহোক, তার কমরেড ব্রেজনেভের নার্সিং করার ব্যাপারে খবর কি?'

'খবরটা সত্যি।' বলল মারলিন।

'তার মানে সোজা রাশিয়ায় চলে যাচ্ছে সে?'

'না, মেক্সিকো সিটির জন্য এয়ারো-মেক্সিকোর টিকিট বুক করেছে সে। আজ সন্ধ্যায় এখানে আসছে সে।'

'ঠিক আছে।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখল জুড।

বাথরুম থেকে বেরোতে গিয়ে সোফিয়া তার নগ্ন দেহটা চট্‌পট্‌ তোয়ালে দিয়ে ঢাকতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। একবার তো তোয়ালেটা অসাবধানতা বশতঃ তার হাত থেকে খসে পড়ে যেতেই সে তখন সম্পূর্ণ নগ্ন। অদূরে বসেছিল নিকোলাই। সেই মাত্র টেলিফোনটা রেখে দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে তার নিরাবরণ দেহের শোভা চাক্ষুস করছিল তারিয়ে তারিয়ে। সোফিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই বলে উঠল সে, 'তাড়াহুড়ো করতে হবে না। প্ল্যান বদলে গেছে। মেক্সিকোয় তুমি ফিরে যাচ্ছো না। দুপুরে এয়ারোফ্লোটের বিমানে আমরা মস্কোয় পাড়ি দিচ্ছি। আমরা তোমাকে ফিরে পেতে চাই সেখানে।'

'কিন্তু আমার গর্ভপাতের কি হবে?' বলল সোফিয়া। 'আগামীকাল সেটা হওয়ার কথা।'

'আর হবে না,' বলল সে। 'তারা তোমার সন্তান চায়।'

'সেটা পাগলামো,' বলল সে। 'আমরা জানি না সন্তান কিরকম হবে। তার বায়ো কেমিক্যাল ব্যবস্থায় অবৈধ ভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। বিকৃত শিশুর জন্ম হতে পারে।'

'তোমার শিশু কিরকম হলো না হলো, আমরা তা দেখতে যাবো না। আমাদের লক্ষ হলো, তাকে পাশ্চাত্য জগতের একজন অতি শক্তিশালী ব্যবসায়ীর একমাত্র উত্তরাধিকার হিসেবে দেখতে পাওয়া।'

'ব্যাপারটার ও ভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। এটা একটা স্রেফ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার মাত্র। আমার ভাবী সন্তানের সঙ্গে জুডের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'না, আর কোনো কথা নয়,' বলল নিকি। 'এটাই জীবনের ধর্ম। মৃত চীনা লোকটি কি বলেছিল মনে রেখো।'

'তবু একবার ভেবে দেখলে হতো না?'

'তার কোনো সুযোগ নেই সোফিয়া,' জোর দিয়ে বলল নিকি। 'ওপরওয়ালার হুকুম তোমাকে মানতেই হবে। আর না মানলে তার কি জরিমানা জানো তো?'

ব্রেসিয়ার লাগিয়ে লেসি বিকিনিটা অতঃপর চাপিয়ে নিয়ে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল সোফিয়া, 'কে আমাকে খতম করবে? নিকি তুমি?'

'হ্যাঁ, আমার প্রতি সেরকম হুকুমই আছে।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে ভালোবাসো,' নরম গলায় বলল সোফিয়া। 'সব সময় তুমি একথাই বলে থাকো, থাকো না?'

'সে কথা এখনো ধ্রুব সত্য। আর সব সময় তাই-ই হবে।'

'কিন্তু তুমি তোমার হুকুমকে ভালোবাসো নিকি।' সোফিয়া এবার তার রাগ আর চেপে

রাখতে পারল না। নিকিকে নীরব থাকতে দেখে সে আবার নিজের থেকেই বলল, 'তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসো না, তুমি ভালোবাসো তোমার দেশকে। এ সবের মূলে রয়েছে তোমার আকাঙ্খা, তোমার নিজস্ব ক্ষমতার লোভ!'

'এখন আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারছি নিকি। নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করলেও আমরা থেকে বড় বোকা কেউ নেই এই জগতে।' বলতে থাকে সে। 'এখন বেশ বুঝতে পারছি, আমাকে বিয়ে করার জন্য তুমি কখনোই একাটরিনাকে ডিভোর্স করার পরিকল্পনা করোনি। তাতে তোমার গোপন পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতো। কারণ তার বাবা কাউন্সিলের একজন উচ্চপদের অধিকারী এবং পলিটব্যুরের অত্যন্ত ঘনিষ্ট ব্যক্তি।'

'না, সোফিয়া আমার লক্ষ সেরকম ছিলো না,' অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ করার পর নিকি মুখ খুলল। 'বিয়েটা কোনো ব্যাপার নয়। আসল কথা হলো, ওরা তোমার সম্পর্কে সব কিছুই জানে। ওপরতলার কেউ তোমাকে গ্রহণ করতো না।'

সোফিয়া তার ব্যাগে জিনিষপত্তর গোছগাছ করে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে উঠল, 'আমি মেক্সিকোয় ফিরে যাচ্ছি নিকি। পারলে আমাকে তুমি খুন করো।'

বিরক্ত হয়ে বলল নিকি,' 'ওরকম তুমি ভাবতেই পারো না।'

'আর আমিও ভাবতে পারি না, তুমি আমাকে খুন করতে পারো।'

'আমি একজন সৈনিক, ভুলে যেও না। আর ওপরওয়ালার হুকুম মানাটাই সৈনিকদের ধর্ম। আমার কোনো পছন্দ নেই।' জ্যাকেটের পকেট থেকে ব্লু-ব্ল্যাক বেরেটা পিস্তলটা বার করে উঁচিয়ে ধরে বলল সে, 'যদি তুমি মস্কোয় আমার সঙ্গে ফিরে না যাও, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে—'

তার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ত্রস্ত হাতে সোফিয়া তার ব্যাগ থেকে সাইলেন্সার লাগানো বেরেটাটা বার করে প্রথম লক্ষেই নিকির বুক ঝাঝরা করে দিলো। দ্বিতীয় গুলিটা গিয়ে বিঁধল তার নাক বরাবর, তরমুজের মতো তার মুখটা দু'ভাগ হয়ে গিয়ে রক্তের ধারা নামল ক্ষতস্থান থেকে। নিকির ভারী দেহটা মেঝের ওপর পতনের শব্দ হলো। তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল সোফিয়া।

'নিকি, বেচারা নিকি,' নরম গলায় বলল সে। 'বোকা তুমি। জুড ক্রেনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে ছিল যা তুমি জানো না। সব সময় তার একটা পছন্দ বলে কথা আছে।'

'মিনিট চল্লিশের মধ্যেই আমরা মেক্সিকে সিটিতে অবতরণ করছি,' আবার ডেক কেবিনে প্রবেশ করে বলল মারলিন।

'ভালো,' তার দিকে তাকিয়ে বলল জুড। 'সোফিয়ার আর কোনো খবর আছে?' 'কোনো ঝামেলায় পড়েনি তো?'

'না, আমাদের পৌছনর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এয়ারো-মক্সিকোর ফ্লাইটে এসে পৌছচ্ছে সে। সিকিউরিটি টেপ থেকে জানতে পারি, নিক তাকে খুন করতে গিয়েছিল,' বলল মারলিন। 'কিন্তু কি ভাবে যে সে তাকে খতম করল, আমরা জানি না।'

'আমি জানি,' বলল জুড। 'সে আমার ছোট ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছিল।'

'যার মধ্যে সাইলেন্সার লাগানো পয়েন্ট-থারটি এইট রিভলবারটা ছিলো?'

জুড মাথা নেড়ে সায় দিলো। 'কিন্তু সেটা তো পায়ে হেঁটে তার সেই ছোট ব্যাগে যেতে পারে না। অথচ হাসপাতাল থেকে ফিরে দেখলাম, সেটা আমার ঘরে নেই।'

'মেয়েটি মনে হয়,' বিজ্ঞের মতো মারলিন বলল, 'দারুণ বিপজ্জনক। তা আপনি সোফিয়ার ব্যাপারে কি স্থির করলেন?'

'ভাবছি, তার সঙ্গে আরো কথা বলা দরকার।'

'কিন্তু সে যখন এয়ারপোর্টে এসে পৌছবে, নির্ধারিত সূচী মতো আপনাকে তখন মেক্সিকো সিটিতে প্রেসিডেনসিয়াল প্যালেসে হাজির থাকতে হবে। সেখানে ক্রেনি ফার্মাসিটিউকালের ব্যাপারে কমার্স সেক্রেটারির সঙ্গে মিটিং আছে আপনার। তারপর লোপেজ পোর্টিলোর সঙ্গে আপনার মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা আছে। সেখান থেকে সোজা এয়ারপোর্টে, বিকেল চারটেয় আমাদের ব্রেজিলের পথে রওনা হতে হবে। অতএব সোফিয়ার কাছে আপনার যাওয়া চলবে না,' বলল মারলিন।

❑ পনেরো ❑

প্রেসিডেন্ট কথা দিয়েও মিটিং-এ এলেন না। তরুণ অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল জুডের। আলোচনার ফল তেমন ফলপ্রসু কিছু নয়, বরং মেক্সিকোয় ক্রেনি ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি স্থাপনের ব্যাপারে তিনি যে অস্বাভাবিক প্রস্তাব দিলেন তা কখনোই গ্রহনীয় নয়। তিরিশ মিলিয়ান ডলারের মধ্যে তাঁরা মাত্র পাঁচ মিলিয়ান ডলার ফাইন্যান্স করে মোট আয়ের পঞ্চাশ ভাগের অধিকারী হতে চান। অর্থাৎ মেক্সিকোয় নতুন ব্যবসা করতে এসে ঋণগ্রস্ত হয়ে যেতে হবে ক্রেনি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজকে। তাই সরাসরি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জুডকে ফিরে যেতে হচ্ছে। বিকেল চারটেয় ব্রেজিলগামী বিমান ধরতে হবে তাকে। 'আপনাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে আমি সত্যিই দুঃখিত। খবরটা আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট কার্টার শুনলে ক্ষুন্ন হতেন। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা যায় না মিঃ মিনিস্টার।'

'কিন্তু আর একটা মিটিং-এ ফিরে আসবেন তো?'

'হ্যাঁ সেনর মিনিস্টার, যদি আমি আহূত হই, অবশ্যই আসব,' বলব জুড।

'তার জন্যে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।' এই সময় তার টেবিলের টেলিফোনটা বেজে উঠল। জবাব দিলো সে স্প্যানিশ ভাষায়। তারপর মাউথপীসটা হাত দিয়ে ঢেকে জুডের দিকে ফিরে বলল, 'বিমান বন্দরে কিউবান পুলিশের অনুরোধে ইমিগ্রেসান পুলিশ ডঃ সোফিয়া আইভানসিক নামে একজন মহিলাকে আটক করে রেখেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে হাভানায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। সে বলেছে, সে নাকি আপনার অতিথি, সেই সঙ্গে আপনার একজন কর্মচারিণীও বটে। আমেরিকার সঠিক ভিসা সহ আপনার বিমানের সহযাত্রিণী ছিলো সে।'

তার দিকে তাকাল জুড। 'হ্যাঁ, ডঃ আইভানসিক আমাদের মেডিক্যাল রিসার্চের একজন

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টাফ। যদি আপনি আপনাদের ইমিগ্রেসান অফিসকে বলে তাকে আমার বিমানের আরোহিনী করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন, আমি খুব খুশি হবো আর তাদের বলবেন, তার জন্যে আমি দায়ী থাকব।'

'কিন্তু কিউবান পুলিশ তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছে।'

'সে তো কিউবায়। মেক্সিকোয় নয় নিশ্চয়ই?'

মিনিষ্টার মাথা নাড়ল। 'না, মেক্সিকোয় নয়।'

'সে তো এখনো মেক্সিকোর এলাকায়, তাই নয় কি? তাই সেখানে কোনো কিউবান পুলিশের পক্ষে তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা আইনত তাদের নেই স্যার। আমেরিকা এবং যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে এক বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী ডঃ আইভানসিক আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। এ অবস্থায় আপনারা যদি কিউবার কাছে আপনাদের সার্বভৌম্যতা বিকিয়ে দেন, বলাবাহুল্য আমাদের দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে বাধ্য। এছাড়া আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ, আমার এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখার জন্য দয়া করে আপনার অফিসে আপনি আপনার প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করুন।'

ফোনে কথা বলার আগে মন্ত্রীমহাশয় একবার জুডের দিকে তাকাল তারপর ফোনে জরুরী কথা সেরে বলল, 'সেনর ক্রেনি, আপনার কথা মতো কাজ হবে। ইমিগ্রেসান পুলিশকে বলে দিয়েছি, প্রয়োজনীয় দেহরক্ষী সহ তাকে যেন দশ মিনিটের মধ্যে আপনার বিমানে তুলে দেওয়া হয়।'

'ধন্যবাদ সেনর মিনিস্টার।'

হাসল মন্ত্রীমহাশয়। 'মিঃ ক্রেনি, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। হাবার্ডবিজনেস স্কুল থেকে আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, তাই না?'

মাথা নাড়ল জুড, 'হ্যাঁ।'

'আমিও,' একগাল হেসে মিনিস্টার তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আশাকরি একদিন আপনি আমার পদমর্যাদার কূটনৈতিক খেলায় চাল দেবেন, আর তখন আমার অবস্থা হবে আপনার মতো।'

'সেরকম ইচ্ছে আমারো হয় স্যার।'

'আচ্ছা মিঃ ক্রেনি, আপনার খেলায় আপনি কি কখনো জয়ী হয়েছেন?'

'হারা কংবা জেতার লক্ষ আমাদের নেই। আমরা সব থেকে ভালো কিছু করার চেষ্টা করে থাকি তাই না মিঃ মিনিস্টার, আপনাকেই বরং অভিনন্দন জানানো উচিত।'

বাদামী রঙের ধোঁয়ায় মেক্সিকো সিটির আলোগুলো তখন নিরুদ্দেশ। একটু পরেই বিমানটা যথেষ্ট উঁচুতে উঠে আসার দরুন রৌদ্রস্নাত নীলাকাশ সামনে ভেসে উঠল তখন। জানালা পথে চোখ মেলে প্রাকৃতিক শোভা দেখে জুড তখন তন্ময়। 'মিঃ ক্রেনি, আপনার কমলালেবুর জুস আর ওষুধের পিল,' ব্রিজেটের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলো সে।

একটু পরেই ডঃ সওয়ের এবং মারলিন তার কেবিনে এসে ঢুকল। 'সোফিয়ার খবর কি?' জানতে চাইল জুড।

'চমৎকার আছে,' বললেন ডঃ সওয়ের। তারপর জুডের চোখের ভাবলেশহীন দৃষ্টি দেখে মারলিনের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আপনি ওঁকে বলেননি?'

তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জুড জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি তার ব্যাপারে কথা বলছেন?'

'কেউ একজন সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার দিয়ে সোফিয়াকে হত্যা করতে চেয়েছিল। খুব একটা ভালো টারগেট ছিলো না। যাইহোক, তার হাতের মাংসল জায়গায় গুলিটা লেগে বেরিয়ে যায় বলে এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেছে মেয়েটি। আপনার চিন্তার কিছু নেই,' সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিলেন ডঃ সওয়ের।

'সে এখন কোথায়?'

'তার কেবিনে ঘুমচ্ছে,' বলল ডাক্তার। 'অনেক রক্ত ঝড়েছে। আমি তাকে দু'বোতল রক্ত দিয়েছি। দশ বারো ঘন্টা ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'খুব ভালো কাজ হয়েছে,' বলল জুড। 'এখন আমি হাভানার খবর জানতে চাই।'

উত্তরে মারলিন বলতে থাকে ঃ 'বোরোভনিকের কাগজপত্তর ফেরত পেতে চান ভদ্রমহিলা। আমি সেগুলো পড়েছি। সাউথ অ্যান্ড ওয়েষ্টার্ন সেভিংস এন্ড লোনের সব গচ্ছিত টাকা কিউবান সরকারের অনুমতির একটা অংশ। আমাদের সরকারও এর মধ্যে আছে। তাছাড়া ট্রেজারি, FDIC, IRS কাস্টমস, FBI এবং CIA, এরা সবাই মধুলোভি মৌমাছির মতো ঝাঁক বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

'এখন এর থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি বলো?' জানতে চাইল জুড।

'সাউথ অ্যান্ড ওয়েষ্টার্ন সেভিংসের সব অ্যাকাউন্টস বন্ধ করে দিতে হবে।'

কোনো রকম ইতস্তত না করেই জুড হুকুম করল, 'তাই করো।'

'এতে আমাদের সব টাকাই জলে যাবে,' বলল মারলিন।

'টাকাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ আমাদের বোকামো যা আমি চাই না। আর কিছু বলার আছে?'

'প্রত্যেক মেয়ের ডাক্তারি পরীক্ষা হয়ে গেছে, ফলাফল খুবই ভালো,' বললেন ডঃ সওয়ের। 'আইনসম্মত ভাবে তাদের কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করে নেওয়া হয়েছে। ছ'মাস পরেই প্রচুর প্রতিযোগী মা ও শিশুর ফসল আপনি তুলতে পারবেন। ইবন সৌদের পরে অন্য কেউ এতো ফসল তুলতে পারেনি।

ন'শোর ওপর তার সন্তান ছিলো,' বলল জুড।

'তার মতো সব কিছু আপনি পেতে পারেন না। এতেই সন্তুষ্ট থাকুন। এক্ষেত্রে একটা মেয়ে অন্য মেয়ের ছেলের বাপ কে জানে না। বেশী লোভ করলে জানাজানি হয়ে যেতে পারে।'

'একজন মহিলা কিন্তু জানে, সে হলো ডঃ সোফিয়া।'

মাথা নাড়লেন ডঃ সওয়ের। 'এ ব্যাপারে ডঃ জ্যাবিস্কির সঙ্গে আলোচনা করেই সোফিয়ার গর্ভপাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে সে জেনে যাবে, কোনো অবৈধ সন্তানকেই সূর্যের আলো দেখতে না দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।'

'খুব ভালো।' মারলিনের দিকে ফিরে জুড জিজ্ঞেস করল, 'ক্রেনি আইল্যান্ড রিমোটের কাজ কতদূর?'

'ইতিমধ্যেই ক্রেনি কন্সট্রাকসন প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়েছে। বছর দু'য়েকের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে, খরচ পড়বে কম-বেশী চল্লিশ মিলিয়ান ডলার।'

এই সময় জুডের কেবিনে ঢুকে ব্রিজেট তাদের উদ্দেশে বলে উঠল 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি দুঃখিত, আমার রোগীর নৈশভোজের সময় হয়ে গেছে। আপনারা এখন আসতে পারেন।'

সবাই চলে যাওয়ার পর ব্রিজেট বলল, 'মিঃ ক্রেনি, সানফ্রান্সিসকো থেকে আপনার মা ফোন করেছিলেন আপনি তখন ঘুমচ্ছিলেন।' বলা মাত্র আবার ফোন বেজে উঠল। জুড রিসিভারটা তুলে নিলো।

'কে বারবারা?'

'তোমার সঙ্গে শেষ কথা বলেছি ছ'সপ্তাহ আগে। কেমন আছে বলো?'

'ভালো আমি কখনো থাকি নাকি? আমার কথা থাক,' উত্তরে বলল জুড, 'তুমি আর জিস কেমন আছো?'

'আমরা ভাল আছি। তুমি সত্যি ভালো আছো তো?'

'হ্যাঁ বারবারা। খুব ভালো। জিসকে আমার ভালোবাসা জানিও। আর তোমার জন্যে রইল একটা দীর্ঘ চুম্বন।'

'তোমাকেও দিলাম উষ্ণ দীর্ঘ চুম্বন,' বলল বারবারা। 'তাহলে ওয়াশিংটনে আমাদের দেখা হচ্ছে। বাই—'

ফোনটা রেখে দিয়ে মার্বেলের বাথটবে উঠে দাঁড়াল জুড। তারপর এক হাতে বোতাম টিপতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ব্রিজেট। 'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সে।

জুড তখন সম্পূর্ণ নগ্ন। সে তার কোমরের নীচে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'এদিকে তাকিয়ে দেখো, এটা এতো বেশী শক্ত হয়ে উঠেছে, এটাকে ঠান্ডা করতে না পারলে আমার অস্বস্তি কমবে না।'

'ওটার অমন হতচ্ছাড়া দশা হলো কি করে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'ফোনে আমার সৎমায়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম,' বলল সে, 'তাঁর কথা শুনলেই আমি কেমন উত্তেজনা বোধ করি, আমার দেহ টান টান হয়ে ওঠে। আমার ধারণা, এখনো তার মধ্যে সেই সম্মোহন শক্তিটা অটুট আছে।'

মৃদু হেসে তার দিকে তাকাল ব্রিজেট। 'আপনি অজাচারী বিকৃত কামলালসায় ভরপুর,' হেসে বলল সে। 'ঠান্ডা জলে ভালো করে স্নান করে নিন। দেখবেন ওটাও আস্তে আস্তে কেমন ঠান্ডা হয়ে গেছে।'

❑ ষোলো ❑

'ডেলটা নদীর উপকূল থেকে আমরা এখন দশ মাইল দূরে অবস্থান করছি মিঃ ক্রেনি,' কেবিনের স্পীকারের মাধ্যমে বিমানের ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর জুডের কানে ভেসে এলো। আর তখনি ওষুধের ট্রে হাতে তার কেবিনে প্রবেশ করল ব্রিজেট। তার কাছ থেকে একটা পিল হাতে তুলে নিয়ে কমলালেবুর জুস দিয়ে পিলটা গলাধঃকরণ করল সে। তারপর ব্রিজেটের উদ্দেশে বলল, 'এ কাজে তোমার একঘেয়েমি লাগে না?'

'এটাই তো আমার কাজ,' বলল সে। 'ডঃ আইভানসিক ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন।'

'আমি তাকে দেখতে যেতে চাই,' বলল জুড।

'আপনি কেন তাঁর কাছে যাবেন?' বাধা দিয়ে বলল ব্রিজেট, 'দরকার হলে তিনিই আপনার কাছে আসবেন তাঁর মেক-আপ হয়ে গেলেই।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তার প্রতি তোমার ঈর্ষা আছে।'

'না, তা কেন হবে?' তীব্র ব্যাঙ্গোক্তি করে বলল ব্রিজেট, 'মা হওয়ার পক্ষে ওঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে।' এই বলে সে তার কোমরটা এমন ভাবে দুলিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো যা সে আগে কখনো লক্ষ করেনি। জুডের মনে হলো, সে যেন ইচ্ছে করেই তার দাবী প্রতিষ্ঠা করে গেলো, সোফিয়ার থেকে তার দেহটা অনেক বেশী রমণীয়।

মারলিনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল সে, 'সাউথ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ব্যাঙ্কের শেষ পরিস্থিতিটা কি বলো?'

'প্রতিটি সরকারী এজেন্সি যে তাদের পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা আপনি ভেবে নিতে পারেন। এর থেকে একটা প্রশ্ন আপনাকে বিহ্বল করে তুলতে পারে, এর সঙ্গে আপনার সব থেকে বড় পার্টনার কাস্ত্রো জড়িত রয়েছেন।'

দুঃখের সঙ্গে বলল জুড, 'বুঝতে পারি না, সব রাজনীতিবিদরা কেনই বা ব্যবসায়ী হতে চায়?'

'সারাটা রাত আমি আমার চোখের পাতা দু'টো এক করতে পারিনি, এখন আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চললাম স্যার।' কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

আর ঠিক তখনি সোফিয়া এসে ঘরে ঢুকল। 'এসো সোফিয়া,' জুড তার ড্রিঙ্কের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলল।

সোফিয়া তার চেয়ারের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিচু হতে তার চিবুকে চুমু খেলো। 'মাই ডীয়ার, তুমি এখন ভালো আছো তো?'

'হুঁ। কিন্তু—'

' তোমার কোনো কিন্তু হওয়ার প্রয়োজন নেই,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল জুড। 'আমরা পরস্পরের বন্ধু, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি।' একটু থেমে সোফিয়া আবার বলল, 'আমার দেরী দেখে তুমি হয়তো ভাবলে, আমি বুঝি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো, সত্যিই সেরকম কিছু আমি ভাবতে পারি?'

'না,' একটুও ইতস্তত না করে জবাব দিলো সোফিয়া।

'ঠিক বলেছো,' বলল জুড। 'কিন্তু ডাক্তার তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটু কোকেনের নির্যাস নাকে টানবে নাকি?' এই বলে ফাস্ট এডির দিকে তাকাল জুড। সেই সময় কোকেন ভর্তি সোনার শিশিটা হাতে নিয়ে তার কেবিনে এসে হাজির হয়েছিল সে। ফাস্ট এডি তাকে সাহায্য করল কোকেনের নির্যাস ভর্তি সোনার চামচটা তার নাকের সামনে তুলে ধরে। জোরে জোরে কয়েকবার নিয়ে সোফিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এটা আমার খুব উপকারে লাগল। জুড ক্রেনি, তুমি যেন এক অদ্ভুত মানুষ। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, চিরদিন বেঁচে থাকবে তুমি?'

'চিরদিন বেঁচে থাকার কথা কখনো তো বলিনি, আমি কেবল অমরত্ব লাভের কথা ব্যবহার করেছি মাত্র।'

'ওই একই কথা হলো। আর তোমার স্বার্থেই বলছি, আমিও তাই আশাকরি।' মুহূর্তের জন্যে থেমে সোফিয়া আবার বলল, 'তোমার ওই নতুন নার্সটি আমাকে পছন্দ করে না।'

'সেটা কোনো ব্যাপার নয়।'

'তুমি নিশ্চয়ই তার সঙ্গে সহবাস করছ?

'না, আমার কাছে তার দেহটা তেমন আকর্ষণীয় নয়, যেমন তোমারটা'। ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বলল জুড।

'আগামী সপ্তাহে আমি গর্ভপাত করাতে যাচ্ছি। কিন্তু তোমার সন্তানকে আমি আমার পেটে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম ক্রেনি, দশমাস দশদিন ধরে।'

'কিন্তু আমি যে চাই না,' সরাসরি জবাব দিতে গিয়ে বলল জুড। 'আমরা সবাই জানি, এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট বই কিছু নয়, তার এভাবেই চলবে সোফিয়া।'

'কিন্তু তুমি মারা গেলে তোমার চিহ্ন বলতে কি থাকবে?'

'ভয় নেই আমি মরবো না। আর যদিই বা মরি, আমার হারাবার কিছু থাকবে না।'

'আর আমিও মরতে চাই না,' গভীর আবেগ নিয়ে বলল সোফিয়া।

'তুমি মরবে না।'

'কিন্তু তুমি তো ওদের জানো না। তাদের বিশ্বাস, আমি নাকি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকটা করেছি। এ কথা তারা কখনো ভুলতে পারবে না। আজ না হয় কাল ঠিক আমাকে খতম করে ফেলবে তারা।'

'তোমাকে আমি হারাতে দেবো না,' বলল জুড। 'আমেরিকায় তাদের নজর থেকে তোমাকে লুকিয়ে রাখার অনেক জায়গা আছে। তাই তুমি মরতে পারো না। তাছাড়া তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ভুলে যাচ্ছো, তোমাকে তাদের একান্ত প্রয়োজন।'

'কিসের জন্য?' তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল সোফিয়া।

হাসল জুড। 'ব্রেজনেভ তোমার পরবর্তী রোগী। তুমি কি মনে করো পলিটব্যুরোর এতজন তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যর খুলি উড়িয়ে দিয়েছো বলে তোমার মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসককে তারা খতম করে ফেলবে? না KGB'র অ্যানড্রোপোভ অতো বোকা লোক নন। তারা তাদের স্বার্থেই মানে ব্রেজনভের বিকল্প নেতা ঠিক করার জন্য কম করেও

দু'বছর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে, সেই সঙ্গে তোমাকেও তারা বাঁচিয়ে রাখবে তাঁর চিকিৎসার জন্য।'

জুডের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল সে, 'তুমি সেটা বিশ্বাস করো?'

'আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।' বলল জুড। 'তাছাড়া পলিটব্যুরোর সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি আছে ক্রেনি ইন্ডাস্ট্রিজের।'

সম্পূর্ণ এক নতুন শহর এই ব্রাসিলিয়া, এমনি নতুন যে, তার হৃৎপিন্ডের স্পন্দন এখনো শুরু হয়নি। বড় বড় রাস্তা, আধুনিক বিল্ডিং।

কনফারেন্স বসেছিল বাইশ তলা বিল্ডিং-এর একটা বিরাট কক্ষে। ব্রাজিলিয়ান প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যানের ঠিক বিপরীত দিকে বসেছিল জুড ক্রেনি, আর তার দু'পাশে বসেছিল মারলিন এবং ডঃ সওয়েরে। ব্রাজিলিয়ান চেয়ারম্যানের পাশেও ছিলো তার দুই সহযোগী। প্রায় প্রত্যেকেই পরিস্কার ইংরিজীতে কথা বললেও, ব্রাজিলিয়ান চেয়ারম্যানের কথার সুরে কেমন যেন জার্মান ভাষার একটা ক্ষীণ টান শোনা যায়। 'ডঃ স্কোয়েনবার্ন,' জুড বলল, 'আমার কাছে একটা নির্ভূল খবর আছে, এই প্রোজেক্টে মিঃ লুডউইগ আধ-বিলিয়ান ডলার বিনিয়োগ করেছে।'

চেয়ারম্যান ডঃ স্কোয়েনবার্ন মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দেয়।

তার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে জুড জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আমার কাছ থেকে কি আপনি আশা করছেন?'

ডঃ স্কোয়েনবার্নের ইন্দো-জার্মান সুরের কথাগুলো এবার যেন একটু স্পষ্ট হলো। 'সত্যি কথা বলতে কি মিঃ ক্রেনি, এই প্রোজেক্টে আপনাদের নিশ্চয়ই অন্য আর একটা প্রস্তাব আছে, তা না হলে কেনই বা আমাকে এখানে আহ্বান করলেন?'

'হ্যাঁ, সেটা একান্ত গোপনীয়। দেওয়ালেরও কান আছে, জানেন তো? আজকের এই আলোচনার কথা বাইরের কেউ যেন না জানতে পারে, দেখবেন,' এই বলে ডঃ স্কোয়েনবার্ন তার কাজের কথাটা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল। 'আমি আপনাদের ক্রেনি ফার্মাসিউটিকাল্স-এর ব্যাপারে কথা বলতে চাই। আমাদের দেশে এই ইন্ডাস্ট্রিটা খুবই দুর্বল। আপনাকে খোলাখুলি ভাবেই বলি তাহলে, ইতিমধ্যে আমরা অনেককেই অনুরোধ করেছি, যেমন হফম্যান লা রোচ, বায়ার কেমিক্যাল ওয়েল্টগেস্যাক্ট, কিন্তু তাদের প্রস্তাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

'ডু পন্ট? মোনোসান্টো? এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'হয়তো তারা আগ্রহী। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কার্টারের মানবাধিকার নীতির প্রশ্নে তারা চিন্তিত। তাদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, সবশেষে ক্রেনি ইন্ডাস্ট্রিজের নাম উঠেছে?' জুড বলল, 'তা আমাদের দিকে আপনারা কি করাতে চান?'

সরাসরি জুডের দিয়ে তাকিয়ে ডঃ স্কোয়েনবার্ন বলেই ফেলল, 'নিউক্লিয়ার মেডিসিন।'

কি ভেবে জুড শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করল, 'জার্মানি?'

মাথা নাড়ল চেয়ারম্যান। 'যুদ্ধের পর বহু জার্মান বৈজ্ঞানিকরা এখানে পালিয়ে এসেছিল। আপনি তো জানেন, জার্মানির আত্মসমর্পনের পর চুক্তি অনুযায়ী কোনো ব্যাপারেই সেখানে নিউক্লিয়ার ইন্ড্রাস্ট্রি গঠন করা যাবে না। ব্রেজিলে সেরকম কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই তারা এখানে পালিয়ে এসে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। আজ ব্রেজিলে দু'দুটি ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টেশন থেকে ব্রাসিলা, রিও এবং সাও পাওলোয় আমাদের উৎপাদন সরবরাহ করা হচ্ছে। আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিজে জার্মানি ছাড়াও বহু আমেরিকান এবং ফরাসীরাও আছে।'

'আপনাদের নিউক্লিয়ার বোমা আছে?' জুড জিজ্ঞেস করল।

'না। তবে ইচ্ছে করলে বানাতে পারি। কিন্তু আমার তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।'

'এবং আমারও!' বলল জুড। 'তা আমাকে দিয়ে আপনি কি করাতে চান?'

'লুডউইনেগর ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে চার মাইল দূরে অ্যানডিসের মালভূমি এলাকায় একটা মৃত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। সেই আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে তিনশো মিটার নিচে আমরা একটা নিউক্লিয়ার জেনারেটার তৈরী করেছি। আমি ভেবে রেখেছি, আপনি সেখানে নিউক্লিয়ার মেডিসিন তৈরীর সব সুযোগ-সুবিধে পেতে পারেন। সেখানে আপনাকে তিন বিলিয়ান ডলার বিনিয়োগ করতে হবে। জায়গাটা খুবই গোপনীয় এবং সেখানে কোনো অনধিকার প্রবেশকারীর যাতায়াতের সুযোগ নেই। আর সেই কারণেই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে জানাডু। আমার এই প্রস্তাবে আপনি রাজী হয়ে যান।'

উঠে দাঁড়াল জুড। 'পরে এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।' করমর্দনের জন্য সে তার হাত বাড়িয়ে দেয়। 'ধন্যবাদ ডঃ স্কোয়েনবার্ন।'

'এ যাত্রায় অক্টোপাসের মতো আমি জড়িয়ে পড়েছি,' ব্রিজেট তার হাতে পিল এবং কমলালেবুর রসের জুস তুলে দিলে ডঃ সওয়েরে উদ্দেশে জুড বলল, 'ওরা আমার কাছ থেকে তিন বিলিয়ান ডলার পেতে চায় এ সব লোক দুর্নীতির আশ্রয় নিতে চায়।'

'তাহলে কি ধরে নিতে পারি, ডঃ স্কোয়েনবার্নের সঙ্গে এই চুক্তিতে আপনি আবদ্ধ হতে চান না?'

'অবশ্যই তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছি,' জোর দিয়ে বলে উঠল জুড।

'কিন্তু প্রয়োজনীয় মেসিন ও যন্ত্রপাতি তো আমেরিকা থেকে আনতে দেবেন না কার্টার!' মনে করিয়ে দিলেন ডঃ সওয়ের।

'এ ব্যাপারে ফ্রান্সকে গাধা বানাবো। তাদের দেশকেই মেসিনপত্তরের ফরমাস দেবো। সাধাসিধে হলে চলবে না, একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করুন। যদিও ফ্রান্স এবং আমেরিকা ও অন্য আরো আনবিক শক্তির উৎস দেশগুলির মধ্যে উৎপাদন-বিরোধী চুক্তি হলেও টাকার গন্ধ পেলে আমাদের প্রয়োজনীয় মেসিনপত্তরের যোগানের একটা পথ কেউ না কেউ ঠিক খুঁজে বার করবেই। এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। যাইহোক, এখন আমি একটু স্ফূর্তি করতে চাই ডাক্তার। জীবনটা বড্ড একঘেয়েমী লাগছে। তাছাড়া ইপানেমা থেকে আগত মেয়েগুলোর গান শুনে মনে হয়েছে তারা আমার এই একঘেয়েমী দূর করে

দিতে পারে। এমন কি আপনারও ভালো লাগতে পারে। এই মুহূর্তে আপনি যে একজন চিকিৎসক ভুলে যান। আসুন, এই ফূর্তির আনন্দোৎসবে আমার সঙ্গে যোগ দিন।'

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ডঃ সওয়ের, 'আপনাকে যে একটু সতর্ক হতে হবে, কথাটা ভুলে যাবেন না যেন।'

'আজ রাত্রের পর কাল সকাল থেকে,' হাসতে হাসতে বলল জুড, 'এই মুহূর্তে আমার গর্জে ওঠা ভেতরের পশুটাকে তো ঠান্ডা করি!'

'আমার কাছে তুমি কেন আসছ না প্রিয় জুড আমার?' হাঁ করে তার অর্ধনগ্ন শরীরটার দিকে তাকিয়ে বলল সিলভিয়া। 'তোমার ওই সুখ-কাঠিটা, উঃ কি ভীষণ শক্ত হয়ে উঠেছে, দেখে আমার কুঁচকির যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠেছে।'

অন্য দু'টি মেয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল। একজন বলল, 'একজন পুরুষের ওটা যে অতো শক্ত হয়ে উঠতে পারে, আমি কখনো দেখিনি!' অন্যজন বলল, 'ওটা যেন স্টীল পাইপের মতো সোজা চলে যায়। তাতে যন্ত্রণা অনুভব করলেও একটা কেমন স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি।'

আর জুডও তাদের উপভোগ করতে গিয়ে একটু পরেই কোকেনের প্রভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন সে মেয়েগুলোকে বলল, 'আজ আর নয়, তোমরা হয়তো এখন ফিরে যেতে চাও। পরে এক সময় হলে আমাদের সবার ভালো হয়।'

তার দিকে তাকিয়ে বলল সিলভিয়া, 'কিন্তু তোমারটা এখনো শক্ত হয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে আমরা তোমাকে ঠকাচ্ছি।'

'না, না, ওটা কিছু নয়,' প্রতিটি মেয়ের চিবুকে চুমু খেয়ে তাদের প্রত্যেককে এক হাজার ডলার দিয়ে বিদায় দিলো জুড সেদিনকার মতো।

একসঙ্গে পরপর চার চারটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে দৈহিক সংযোগের ফলে জুডের শারীরিক অবস্থা ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। ডঃ সওয়ের, ডঃ সোফিয়া আইভানসিক, নার্স ব্রিজেট ছুটে এলো তার সেলুনে। জুডকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন দেখালেও তার পুরুষাঙ্গ তখনো পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ডঃ সওয়ের ভ্যালিয়াম এবং মরফিয়া ইন্টারভেনাস ইনজেক্সান দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইলেন। অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতেও তার কষ্টের একটুও লাঘব হলো না।

তারই মাঝে কষ্টের হাসি হেসে জুড বলল, 'ওধুধে কাজ হবে না, আমার প্রস্রাব আটকে গেছে, কিডনিতে যন্ত্রণা হচ্ছে। এখন একমাত্র উপায় হলো, আমার এটা নরম করে তোলা। একমাত্র চোষনেই সেটা সম্ভব।' এই বলে ব্রিজেটের দিকে তাকালো সে। 'একমাত্র ওই পারবে আমার যন্ত্রণার উপশম করতে।'

ব্রিজেট কোনো উত্তর দিলো না। তবে জুডের ইচ্ছা মতো কাজে লেগে গেলো সে। তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জুড বলতে থাকে। 'জানি না তোমার সেই হাসপাতালে

কিরম অভিজ্ঞতা আছে, তবে আমার মতো এতো বড় একটা যন্তর নিশ্চয়ই এর আগে কখনো দেখনি তুমি!'

'বড়াই করো না,' বিরক্ত হয়ে বলল ব্রিজেট, 'আমি এমন কিছু কিছু দেখেছি, যেগুলোর কাছে তোমারটা নেহাতই শিশুর মতো দেখায়।'

ওদিকে সোফিয়া বলে উঠল, 'ফ্যান্টাস্টিক। আমার তো ওটার প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।'

ব্রিজেটের উদ্দেশে জুড বলল, 'অন্তত একজন আমার প্রশংসা করে।'

'তা উনি তো করবেনই, আমি ভালো করেই জানি সেটা,' জুডের কুঁচকির ওপর থেকে মুখ তুলে নীরস গলায় বলল ব্রিজেট। 'তা কাজটা ওঁকে দিয়ে করালেই তো পারতেন।'

'এখন কেমন বোধ করছেন মিঃ ক্রেনি?' দু'টি মহিলার অর্ন্তদ্বন্দ্বের অবসান ঘটানর জন্য তাদের কথার মাঝে বাঁধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডঃ সওয়ের।

'ভালো,' উত্তরে বলল জুড, 'এখন মনে হচ্ছে আমি প্রস্রাব করতে পারি।'

'বোতল নিয়ে এসো নার্স,' বললেন ডঃ সওয়ের। স্টেটরুম ছেড়ে চলে গেলো ব্রিজেট।

একটু পরে বাথরুম করার পর ঘুমে ঢলে পড়ল জুড। স্টেটরুম থেকে বেরিয়ে জুডের সেলুনে এসে সুখবরটা দিলো ব্রিজেট এবং আবার গিয়ে ঢুকল জুডের স্টেটরুমে ডঃ সওয়েরের নির্দেশে।

ডঃ সওয়েরের দিকে তাকিয়ে সোফিয়া বলে উঠল, 'অদ্ভুত মেয়ে এই ব্রিজেট। ভাবতে অবাক লাগছে, এই কেসের বিশেষজ্ঞ হলো কি করে সে?'

হাসলেন সওয়ের। 'হয়তো সে তার ছেলেবেলায় গাড়ির পিছনের আসনে বসে তার বয়স্ক পুরুষ সঙ্গীকে হস্তমৈথুনের সাহায্যে তৃপ্তি দিয়ে থাকবে।'

হাসল মারলিন। কিন্তু তাদের সেই হাসির বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না সোফিয়া।

হঠাৎ সোফিয়ার উদ্দেশ্যে মারলিন বলে উঠল, 'এদিকে আপনার ব্যাপারে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে ম্যাডাম। আমাদের সিকিউরিটির খবর, হঠাৎ আমাদের এলাকায় কিউবানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমাদের সন্দেহ, তারা আপনাকেই খুঁজছে।'

'এরকমই আশঙ্কা আমি করেছিলাম,' বলল সোফিয়া। 'এমন কি এ ব্যাপারে জুডকে বলেও ছিলাম।'

'জানি,' বলল মারলিন। 'আর তাই তো তিনি আমাকে আপনার জন্য একটা নতুন পরিকল্পনা করতে বলেছেন। সেই মতো আপনার নতুন পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, সবকিছুই তৈরী করে ফেলেছি। একজন সিকিউরিটি অফিসারের স্ত্রী হিসেবে এই বিমানে ভ্রমণ করবেন আপনি। এখান থেকে ডালাস পর্যন্ত এই বিমানে যাবেন। ডালাস থেকে আমেরিকান এয়ারলাইন্সে ওয়াশিংটন। সেখানকার একটা শহরতলীর হাসপাতালে অন্য নামে আপনারা গর্ভপাতের সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। পরে জুড সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন। ঠিক আছে?'

'জুড আমাকে ছেড়ে যাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই না?'

'যদি তিনি আপনাকে ত্যাগ করবেন বলে মনে করতেন, তাহলে মেক্সিকোতেই আপনাকে ফেলে আসতেন তিনি,' উত্তরে বললেন ডঃ সওয়ের। 'কিন্তু ওভাবে কোনো খেলা তিনি খেলেন না।'

সতেরো

'এটা লেজারের সাহায্যে মাইক্রোসার্জারি,' শান্ত ভাবে বলল ইউরলোজিস্ট ডঃ ওরিন। 'চোখের রেটিনা স্থানান্তরের কারিগরি ব্যবস্থার মতো আর কি।'

একটু সময় নীরব থেকে ডঃ সওয়েরের দিকে ফিরে তাকাল জুড। 'আপনার কি মনে হয়?'

'এ ব্যাপারে যুগোস্লাভিয়ায় ডঃ জ্যাবিস্কির সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমরা দু'জনেই একমত, এ অপারেশান সম্পূর্ণ নিরাপদ, আপনার অন্য কোনো প্রোগ্রামের ক্ষতি করবে না। আপনার দেহের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো পরিবর্তনও ঘটবে না।'

'শুধু তাই নয় মিঃ ক্রেনি,' ডঃ ওরিন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'আপনি আগের মতো একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যাবেন। একটা ছোট্ট মাইক্রোশিপ, একটা আলপিনের মাথার মতো দেখতে, যা কিনা টাইটেনিয়াম থেকে তৈরী। আপনার পুরুষাঙ্গ স্নায়ুযন্ত্রের অর্ন্তভুক্ত করা হবে, এর ফলে আনবিক চিকিৎসার দরুন আপনার যে সব স্নায়ুর ক্ষতি হয়েছে, সেগুলো মেরামত হয়ে যাবে। বলা যায়, স্রেফ উৎপাদিত স্নায়ু আমরা আপনার শরীরের একটা বিশেষ অঙ্গে স্থাপন করতে যাচ্ছি। এতে আপনার সুবিধে হবে, আপনার পুরুষাঙ্গের উত্থান স্বাভাবিক হবে, রাগমোচন এবং বীর্যপাতও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে চিরকালের জন্য।'

'একবার বীর্যপাতের সময় থেকে কতক্ষণ পরে আবার আমার পুরুষাঙ্গ উত্থিত হবে?'

হাসল ডঃ ওরিন। 'সেটা আপনার ওপর নির্ভর করছে মিঃ ক্রেনি। কি ভাবে এবং কার সঙ্গে আপনি সহবাসে লিপ্ত হতে যাবেন, আগাম আমি বলি কি করে বলুন?'

ডঃ ওরিন ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ডঃ সওয়েরের দিকে তাকিয়ে শ্লেষের সুরে বলল, 'আমার দেহের প্রথম অংশের অমরত্ব নির্ভর করবে আমার দেহের নিম্নাংশ, অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের ওপর।'

পরদিনই ইউরলোজিস্ট ডঃ ওরিন তার দেহে মাইক্রোসার্জারির ব্যবস্থা করলেন।

আমেরিকায় ব্রিজেটের এই প্রথম আগমন। নিউ ইয়র্ক বিমান বন্দরে অবতরণ করতে গিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে বাচ্ছা মেয়ের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে উঠল, 'বিশ্বাস করতে পারছি না, এটা সত্যি ফিল্মের কোনো দৃশ্য নয় তো।'

জুড তার সেই উচ্ছ্বাস দেখে তাকে খুশি করার জন্য বলল, 'ওয়াশিংটনে রেগানের উদ্বোধনী বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার আগে আমরা এখানে দু'দিন থাকছি। ছুটি নিয়ে তুমি নিউ ইয়র্ক ঘুরে দেখতে পারো।' তারপর মারলিনের দিকে ফিরে বলল সে, 'ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা আমাদের অফিসে গিয়ে পৌঁছচ্ছি, ভুলে যেও না মারলিন, তোমার কোনো

ছুটি নেই!' বলে হাসল জুড।

নির্ধারিত মিটিং শুরু হওয়ার মিনিট পনেরো আগে, অর্থাৎ পৌনে-এগারোটার স অফিসে এসে হাজির হলো জুড।

'হ্যালো সন।' বাবার প্রমাণ সাইজের ছবির দিকে তাকাতেই তার অবচেতন মনে ব র চিরাচরিত আহ্বানের প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেলো সে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও প্রতি-সং ণ জানালো, 'হ্যালো ফাদার। তোমার ইচ্ছে মতো কোনো কিছুই বদলায়নি। এটা তোমার পৃথিবী। আমাদের দু'জনের গড়া পৃথিবী। তুমি ছাড়া এ পৃথিবী কখনোই গড়া যেতো না।'

এরপরেই তার বাবার প্রতিধ্বনি আর শোনা গেলো না। পরমুহূর্তেই তার বাবার টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিলো জুড। 'মা!' হেসে উঠল সে।

'এটা অফিস। এখনে মাতা-পুত্রের কোনো স্থান নেই মিঃ ক্রেনি। তুমি বরং আমাকে বারবারা বলেই সম্বোধন করো, অবশ্য তুমি যদি ইচ্ছে করো তবেই!'

একটু পরেই তার সৎমা এসে তার অফিস ঘরে প্রবেশ করল। 'বারবারা!' চিৎকার করে জুড তাকে জড়িয়ে ধরল দু'হাত দিয়ে।

তাকে চুমু খেয়ে হেসে উঠল বারবারা। 'জুড!'

অফিস ঘরের ভেতরে তাকে টেনে নিয়ে এসে জুড বলল, 'এক মুহূর্তের জন্যে আমার কেমন মনে হয়েছিল তখন, আমি যেন আবার বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছি।'

জুড তার বাবার মতো ছোট কনফারেন্স টেবিলের মাঝখানে চেয়ারম্যানের টেবিলে বসেছিল মধ্যমনি হয়ে। তার ডান পাশে বারবারা এবং বাঁ-পাশে আঙ্কল পল। বারবারার পাশে মারলিন, আঙ্কল পলের পাশে দু'জন অ্যাটর্নি। একজন সেক্রেটারি, একজন স্টেনোটাইপিস্ট বসেছিল।

'এবার আমরা বিজনেসের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করতে পারি,' বললেন আঙ্কল পল। 'সাউথ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ব্যাঙ্ক আমাদের ঝামেলায় ফেলবে। সেদিনের উদ্বোধনী বক্তৃতার পরেই সরকার আমাদের ডাকেন বিশেষ শুনানীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য।'

'তারা আমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না,' বলল জুড। 'মনে রাখবেন, এই সরকারকে আমরাই গদিতে বসিয়েছি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারবে না।'

'রাজনীতিতে সত্যের কোনো স্থান নেই মিঃ ক্রেনি,' বললেন আঙ্কল পল।

'তাহলে আপনি কি করতে বলেন?'

'আমাদের ভালো বন্ধুরা আছে। আমরা তাদের কাজে লাগাতে পারি। এখন জনগণকে জাগাতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়াবার ইন্ধন জোগাতে হবে। তবে তার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতে হবে।'

'টাকা কিসের জন্য?' জুড বলল, 'অসময়ে খরচ করার জন্যই তো।' একটু থেমে সে বলল, 'আমার জন্যে ভালো কি খবর আছে বলুন!'

'ভালো নয়, আবার খারাপও নয়,' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে আঙ্কল পল বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, ব্রেজিল তাদের আনবিক যন্ত্রপাতি আমাদের এক বন্ধুদেশের কাছ থেকে কিনেছে। সে যাইহোক, আমাদের সামরিক বিভাগের ধারণা, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ব্রেজিল ঠিক আমাদের পাশেই দাঁড়াবে।

'বেশ, তাহলে ব্রেজিলের সঙ্গে আমরা চুক্তি করব।'

'আর মেক্সিকোর ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন পল।

'তাদের সঙ্গেও ব্যবসায়িক চুক্তি হবে আমাদের।'

'মিটিং-এর ইতি টানার আগে আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই,' বললেন আঙ্কল পল, 'চল্লিশ মিলিয়ান ডলার খরচ করে ক্রেনি দ্বীপ তৈরী করাটা স্রেফ পাগলামো। বিশেষ করে জানাড়ু প্রোজেক্ট তৈরী না হওয়া পর্যন্ত এক কি দু'বছর অপেক্ষা করলে কেমন হয়?'

'সময়টা জরুরী, টাকা নয়। ক্রেনি দ্বীপের কাজ চালিয়ে যেতে হবেই!' টেবিলের চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে জুড বলল, 'আর কোনো বিষয়ে আলোচনা করার আছে?'

'না, তেমন জরুরী কিছু নয়,' বললেন পল। 'তবে একটা খবর দিয়ে রাখি, যুগোস্লাভিয়ান ডাক্তারের ব্যাপারে তোমার পরামর্শ মেনে নিয়েছে রাশিয়ানরা এবং তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।'

'তাহলে আজকের মিটিং-এর সমাপ্তি ঘটানো যাক এখানেই,' বলল জুড, 'ধন্যবাদ।'

'এভাবে হঠাৎ মিটিং শেষ করার কোনো মানে হয়?' বললেন পল। 'তাছাড়া আমি এখনো আমার হুইস্কির বোতল শেষ করে উঠতে পারিনি।'

'আমি বলি কি, আপনি বরং বোতলটা একটা ডগি ব্যাগে করে বাড়িতে নিয়ে যান,' বলল জুড।

আঙ্কল পল মধ্যাহ্নভোজ সারতে তাদের নিয়ে এলেন দি ফোর সিজনস রেস্তোরাঁয়। গ্রীণ পুলের ধারে বারবারা এবং জুড একটা টেবিলের সামনে বসল। বারবারার পাশে বসল তার স্বামী জিস এবং জুডের পাশের আসনটি দখল করলেন আঙ্কল পল। তাদের পরিচিত বয় পল কোভি এবং টম মারগিটা খাবারের ফরমাস নিয়ে চলে গেছে।

স্কচের গ্লাসে তারা যখন চুমুক দিচ্ছিল, তখন ধূসর রঙের ইউনিফর্ম পরিহিত একজন অ্যাটেনডেন্ট মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে জুডের কাছে এসে বলল, 'মিঃ ক্রেনি, আপনার ফোন।'

তার হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে জুড মাউথপীসে মুখ রেখে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ক্রেনি কথা বলছি।'

'শুনুন জুড,' ডঃ জ্যাবিস্কির পরিচিত কণ্ঠস্বর দূরভাষের মাধ্যমে তার কানে ভেসে আসে। 'মারলিনের কাছ থেকে খবর নিয়ে আপনাকে একটা বিশেষ প্রয়োজনে ফোন করছি।'

'তা আপনি এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'JFK বিমানবন্দরের প্যান আমেরিকান টার্মিনাস থেকে কথা বলছি। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার খুবই জরুরী।'

'ঠিক আছে, ওখানেই অপেক্ষা করুন, আমি আপনাকে আধঘন্টার মধ্যে ওখান থেকে তুলে নিচ্ছি।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে অনুণয় করে বলল, 'মাপ করবেন, আপনাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারতে পারছি না। একটা জরুরী ব্যাপারে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।'

'তাহলে তোমার সঙ্গে কি নৈশভোজে দেখা হবে?' বারবারা জানতে চাইল।

'জানি না,' উত্তরে বলল সে। 'যাইহোক, পরে তোমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবো।'

লিমোসিন গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে প্যান আমেরিকান টার্মিনাসের দিকে ছুটে গেলো জুড। ঠিক দরজার সামনে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ডঃ জ্যাবিস্কি। তাঁর চিবুকে চুমু খেয়ে তাঁর ব্যাগ দুটো তুলে নিয়ে বলল, 'ডঃ জ্যাবিস্কি আমার সঙ্গে আমার গাড়িতে আসুন।' গাড়িতে উঠে জুড তার সোফারকে বলল, 'ফিফথ্ অ্যাভিনিউর অ্যাপার্টমেন্ট।' তারপর চালকের আসনের পিছনে কাচের শাটার টেনে দিলো, যাতে করে তাদের আলোচনার কথা সোফার না শুনতে পায়।

'হয়তো পরে আর সময় পাবো না,' ছোট-খাটো চেহারার ডাক্তার জ্যাবিস্কি বলতে থাকেন, 'সোফিয়াকে মস্কোয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আজই রাতে এয়ারোফ্লোইট ফ্লাইটে পাড়ি দিচ্ছি আমরা। অনেক কথাই বলার ছিলো আপনাকে। ঠিক কোথা থেকে শুরু করবো বুঝতে পারছি না।'

'বেশ তো এক এক করেই বলতে থাকুন,' বলল জুড।

তাঁর তামাটে চোখের দৃষ্টি নরম হলো। 'আমার ক্যান্সার হয়েছে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। কখন আমার বেঁচে থাকার শেষ ঘন্টা বাজে, কে জানে?'

'আমি দুঃখিত।' ভিজে গলায় বলল জুড।

'না, না, এতে দুঃখ পাওয়ার কি আছে? জীবনটা আমি বেশ ভালো ভাবেই উপভোগ করেছি। আপনি হয়তো ভাবছেন, আমার বয়স ষাটের কিছু বেশী হবে। কিন্তু আসলে আমার বয়স বাহাত্তর।'

নীরব রইল জুড।

সিগারেটে টান দিয়ে তিনি আবার বলতে থাকেন, 'আমার গবেষণার কাগজপত্তর রুশদের হাতে তুলে দিতে চাই না। বেশীর ভাগ ফাইল এই দু'টো ব্যাগের মধ্যে আছে। টেপ, মাইক্রোফিলম্, এবং নোটবুক সব কিছুই। আমার দৃঢ় ধারণা, আমার নিজস্ব কোডগুলো আপনি আপনার কমপিউটারে সেই সব সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারবেন। আমার ইচ্ছে, এগুলো যত্ন সহকারে পাহারা দিয়ে রাখবেন এবং জনগনের স্বার্থে বিবেচনা সহকারে ব্যবহার করবেন, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়!'

মাথা নেড়ে তাঁকে আশ্বস্ত করে টেলিফোনটা তুলে নিলো জুড। দুটো নম্বর ট্যাপ করল সে। অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেলো, 'ক্রেনি অ্যাভিয়েসান।'

'আমি জুড ক্রেনি বলছি,' বলল সে। 'মিনিট বারোর মধ্যে ওখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছি। আমার একটা জেট ফ্যালকন চাই। ল্যাংলে ফিল্ড, ওয়াশিংটনে যাতায়াতের জন্য। দুজন যাত্রী যাবে, আর ফিরে আসবে তিনজন।'

'ঠিক আছে মিঃ ক্রেনি। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে জুড জিজ্ঞেস করল,' 'ব্রেজনেভের মৃত্যুর পর সোফিয়ার কি হবে?'

'জানি না। আমার আশা শুধু তারা জানুক, আমার কাজের ব্যাপারে সোফিয়া যথেষ্ট জানে, এবং তাকে তার কাজ করতে দেবে। আমি চাইব, সে যেন আপনার সঙ্গে কাজ করার জন্য আপনার কাছে ফিরে যায়। কিন্তু এ-ইচ্ছের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।'

'আপনাকে আমি হারাবো,' শুকনো গলায় বলল জুড।

'জুড ক্রেনি, আমিও তোমাকে হারাবো,' বললেন তিনি। 'তোমার মতো দ্বিতীয় পুরুষ আমার জানা নেই।' জুডের হাতের ওপর হাত রাখলেন তিনি। সে হাত বড় নরম, ছোট এবং ভঙ্গুর। 'বৃদ্ধাও প্রেমে পড়তে জানে,' বললেন তিনি।

জুড তাঁর হাতটার ওপর ঠোঁটের স্পর্শ রেখে বলল, 'যা কিনা চিরদিন সুন্দর রাখে।'

প্যান আমেরিকান টার্মিনালের এয়ারোফ্লোট যাত্রী লাউঞ্জে দাঁড়িয়েছিল তারা। যাত্রীদের বিমানে ওঠার লাল সংকেত-আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেলো। ছোট-খাটো ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকাল জুড। এক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনবার তাঁকে চুমু খেলো জুড। দু'বার দু'গালে, এবং তৃতীয় চুমু তাঁর ঠোঁটে। 'আপনি মহান মহিলা।'

'জুড ক্রেনি, তুমি সৌভাগ্যবান হও,' বললেন ডঃ জ্যাবিস্কি। 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার স্বপ্ন সফল হোক।' এই বলে দরজা পথে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তিনি চলে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেলে রাখল জুড। তারপর সোফিয়ার দিকে ফিরে তাকাল সে।

সোফিয়াও তাকিয়েছিল তার দিকে। তার ঠোঁট কাঁপছিল। তার দু'চোখের কোলে জল টলটল করছিল। 'আমি দুঃখিত, আমি তোমার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম,' বলল সোফিয়া।

'এ তো ভালই হয়েছে,' উত্তরে বলল জুড।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সোফিয়া, 'তোমার সঙ্গে আমার আবার কখনো দেখা হবে তো?'

'আমি তাই মনে করি। হ্যাঁ সত্যিই তাই মনে করি,' বলল জুড। 'আমার কাছে তোমার একটা বিশেষত্ব আছে। আমি সত্যি আশা করি একদিন আবার আমাদের দেখা হবেই।' দু' হাত বাড়িয়ে জুডের গলা জড়িয়ে ধরে সোফিয়া তাকে চুমু খেলো। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি জুড। সত্যি আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।' এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলো সোফিয়া।

সোফিয়া তার চোখের আড়াল হতেই জুড তার গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। সোফার

যাত্রী আসনের দরজা খুলে দিয়ে বলে উঠল, 'মিঃ ক্রেনি, যুবতী মেয়েটি এটা আপনার জন্যে রেখে গেছেন।' এই বলে একটা খাম তার হাতে তুলে দিলো সে।

জুড পিছনের আসনে হেলান দিয়ে সোফিয়ার চিঠিটা পড়তে শুরু করল ঃ

জুডের জন্য—

মনে রেখো। জীবন বাঁচার জন্য।

অমরত্ব, ইতিহাসের জন্য।

ভালোবাসা জেনো, সোফিয়া।

আবিস্কার ১৯৮৩-১৯৮৪

❑ এক ❑

ঘমুক্ত নীলাকাশ, ঝলমলে রোদে উদ্ভাসিত। 'ওই যে ওখানে।' কপটারের জানালা পথে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন ডঃ সওয়ের 'ক্রেনি দ্বীপ।'

'এ যে দেখছি বিরাট!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল সোফিয়া। 'আমি যেরকম ভেবেছিলাম তার থেকেও বড় দেখছি।'

'হ্যাঁ, দ্বীপটা বারো মাইল লম্বা, আট মাইল চওড়া,' বললেন ডঃ সওয়ের।

'আর তাই কি সেখানে বসবাস করার পরিকল্পনা করেছে জুড?'

মাথা নাড়লেন সওয়ের। 'বেশী দিনের জন্য নয়। তবে এরই মধ্যে আমার মনে হয়, এই দ্বীপের পরিকল্পনা ডঃ জ্যাবিস্কির, তাই না?' বলল সোফিয়া। 'ওই বৃদ্ধার পাগলামি শেষ দিকে চরমে উঠে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর দিন আমি তাঁর কাছে যাই। আমাকে তিনি বলেছিলেন, 'জুড চিরদিন বেঁচে থাকবে। তার প্রয়োজন মতো সব জ্ঞান আমি তাকে দিয়েছি। হ্যাঁ, জুডের কাছে বেঁচে থাকার সব সরঞ্জামই আছে।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার এই জ্ঞান শুধু জুডকে না দিয়ে সারা বিশ্বের মানুষকে দিলেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, জুডকে আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি, সে আমার উপদেশের সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু অন্যেরা! বড় অবিশ্বাসী আর স্বার্থপর। তারা সেটা তাদের ক্ষমতা এবং লোভের জন্য ব্যবহার করবে। আর তারপরেই তিনি চোখ বুঁজে ফেলেন, আর খোলেননি।'

'সেই রাতেই কি আপনি জুডের সঙ্গে যোগাযোগ করেন?'

'না, তিন বছর আগে নিউ-ইয়র্ক বিমানবন্দরে সে আমাকে বিদায় জানানর পর তার সঙ্গে আমার আর কথা হয়নি।'

'তাহলে ডঃ জ্যাবিস্কির মৃত্যুর খবর সে জানল কি করে?'

'জানি না,' বলল সোফিয়া। 'তবে শুনেছি রুশ পলিটব্যুরোর ভেতরের লোকজনের সঙ্গে তার বেশ দহরম-মহরম আছে। হয়তো খবরটা সে তাদের কাছ থেকেই পেয়ে থাকবে।'

'হ্যাঁ, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই,' ডঃ সওয়ের তার কথা সমর্থন করলেন। 'সারা বিশ্বের মানুষজনদের সঙ্গে জুডের নেটওয়ার্ক বেশ ভালই।'

'আমিও সেটা বিশ্বাস করি,' বলল সোফিয়া। 'বাংলাদেশে থাকার সময় তার বার্তা পেয়েই আমি সেটা উপলব্ধি করেছিলাম। কারণ ব্রেজনেভের মৃত্যুর পর আমি কোথায় যেতে পারি, সে খবর কেবল KGB-ই জানত। আর সে খবর জুড সংগ্রহ করেছিল KGB'র ভেতরের লোকের কাছে থেকে। আর KGB-ও জেনে গেছে আমি এখন কোথায় চলেছি। প্রয়োজন হলেই তারা আমাকে ডেকে পাঠাবে।'

এই সময় কপটার পাইলটের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আমরা এখন নর্থ হেলিপ্যাডে অবতরণ করতে যাচ্ছি। সেখানে ফাস্ট এডি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবে।'

'এই দ্বীপের পূর্বে ন'মাইল দূরে উপসাগরের জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে' এয়ার কন্ডিসন্ড ল্যান্ডরোভার গাড়ির চালকের আসন থেকে বলে উঠল ফাস্ট এডি। 'শীতকালেও এখানকার জল গরম থাকে। ভারতীয় উপজাতির বাস এখানে। তারা এটাকে পবিত্র বলে ভূষিত করে থাকে।'

'খুব মজার ব্যাপার তো,' তাকে খোঁচা দেওয়ার জন্য সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'তা তোমরা এটাকে কি বলো?'

দাঁত বার করে হাসল ফার্স্ট এডি। 'একঘেয়ে।'

গাড়ি চলছিল একটা সরু রাস্তা দিয়ে। জানালা পথে তাকিয়ে সোফিয়া বলল, 'তার মানে এটা তোমার পছন্দ নয়?

'না।'

'আর মিঃ ক্রেনি? তিনি কি ভাবেন?'

'তিনি কিছুই বলেন না। তাই তাঁর মনের কথা আমি জানি না।'

রাস্তার মোড় ঘুরতেই একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল ফাস্ট এডি। 'এটা আপনার থাকবার জায়গা। এই দ্বীপে এরকম বারোটা গেস্ট কটেজ আছে।'

'তার কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'এখনো ভেবে নিতে দেখি,' হাসল ফার্স্ট এডি। 'তাই আমার ধারণা, পুরোপুরি বদলে তিনি যাননি।' গাড়ি থেকে নেমে সে বলল, 'আসুন, আপনার জায়গাটা দেখিয়ে দিই।'

তারা এগিয়ে যেতেই সামনের দরজা খুলে সাদা জ্যাকেট পরিহিত একজন ব্ল্যাকম্যান বেরিয়ে এলো, তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল একজন ব্ল্যাক লেডি, কালো হলেও রীতিমতো আকর্ষনীয়া, তার পরনে ধূসর ব্লাউজ এবং স্কার্টের ওপর একটা পরিস্কার সাদা অ্যাপ্রন।

'এরা হলো আপনার হাউজম্যান ম্যাক্স, আর তার স্ত্রী মেই, আপনার রাধুনী-কাম পরিচারিকা।' তারপর তাদের দিকে ফিরে ফাস্ট এডি বলল, ' তোমাদের অতিথি ডঃ

আইভানসিক। ওঁর লাগেজপত্তর বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাও।'

একটা বিরাট বসবার ঘর। ডাইনিং রুম ও বেডরুমে যাওয়ার একটা সিঁড়ি দেখতে পেলো সোফিয়া।

'রাত ন'টায় নৈশভোজ। ম্যাক্স আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবে।'

'অন্য আর কোনো অতিথি আসবে?'

'না। কেবল মিঃ ক্রেনি আর আপনি।'

'আর ডঃ সওয়ের?'

'ছ'টার সময় তিনি মেনল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছেন।'

ঘরির দিকে চকিতে একবার তাকাল সোফিয়া। সাড়ে-তিনটে।

'তাড়া-হুড়োর কিছু নেই ডক্টর। ধীরে সুস্থে এলেই চলবে। একটু ঘুমিয়েও নিতে পারেন। অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ঘুমিয়ে সতেজ হয়ে নিন।'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'ধন্যবাদ।'

জগিং স্যুট এবং স্নিকারে জুডকে মানিয়েছিল বেশ। ডঃ সওয়েরকে ইশারায় বসতে বলে ফোনে সে বলতে থাকে, 'ব্যাঙ্কের কথা চুলোয় যাক। অ্যাটর্নিকে বলে দাও ডিক্রীর সম্মতি পত্রে আমরা দস্তখত করতে রাজী।'

মারলিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। 'কিন্তু সে তো দু'শো মিলিয়ান ডলারের প্রশ্ন!'

'তবু কম খরচে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যাবে,' উত্তরে জুড বলল, 'তা না হলে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে বোকা বোকা প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বছরে পর বছর ধরে কতো মূল্যবান সময় অপচয় করতে হবে, সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ?'

'কিন্তু নস্টারডামস বলেছেন, ফাইনানসিয়াল ইনস্টিট্যুসানের ক্ষেত্রে এ-বছরটা খারাপ যাবে।'

হাসিতে ফেটে পড়ল জুড। 'ডেভিড রকফেলারকে কতকাল তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, খবর নাও আগে।'

'ওখান থেকে কতোদিনে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন বলুন?' জিজ্ঞেস করল মারলিন।

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব,' উত্তরে বলল সে, 'মাস তিনেকের মধ্যে ফেরার চেষ্টা করবো।' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ডঃ সওয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'বাংলাদেশে কি করছিল সোফিয়া, বলেছে সে?'

'না, কিছুই বলেনি,' উত্তরে সওয়ের বললেন, 'তা এ ব্যাপারে আপনার এমন কৌতূহল কেন?'

'বৃদ্ধা ডঃ জ্যাবিস্কি তাঁর গবেষণার কিছু কিছু নথীপত্র আমাকে দিয়েছেন। তাই আমার অনুমান, বাকী কাগজপত্তর তিনি নিশ্চয়ই সোফিয়াকে দিয়ে থাকবেন আমার সঙ্গে কাজ করার জন্য। ভারতীয় উর্দু ভাষায় লেখা তাঁর নোটগুলো, যা আমরা এখনো পর্যন্ত ভাষান্তর করতে পারিনি। তিনি একজন সন্ন্যাসী স্বামীজীর নাম উল্লেখ করে গেছেন, এক সময়

যিনি ভারতেরই একটি অংশে থাকতেন, কিন্তু এখন সেটা পাকিস্তান, তথা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সেই সব নোটে মহাঋষি রাজ নৈবুহরের উক্তির উল্লেখ আছে! ''মানুষের অমরত্ব লাভ কেবল তখনি সম্ভব, যখন তার অন্তরের শান্তি তার শারীরিক পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়।'' সম্ভবত এই কারণেই ডঃ জ্যাবিস্কি আমাকে এই দ্বীপটার সংস্কার করতে বলেছিলেন।'

'তা আপনি কি মনে করেন, বাকী কাগজপত্তর সোফিয়া সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন?'

হাসল জুড। 'সে যদি সেগুলো বাংলাদেশে পেয়ে থাকে, সেটা হবে অভুতপূর্ব। মহাঋষি আগেই চলে গেছেন।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, তিনি মৃত?'

হাসল জুড। 'না আরো ধনী হয়েছেন। তিনি সেই মহাঋষি যিনি সান বারনাডিনো পর্বতমালায় দু'হাজারেরও বেশী ছাত্র নিয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বসেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় মালিবুর উত্তরে প্রচুর জমি সংগ্রহ করে রেখেছেন তিনি। আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মতো তাঁর দেখা পাওয়া খুবই মুশকিল। তবে আমার মনে হয়, সোফিয়া তাঁর দেখা পেয়ে থাকবে। শুনেছি, এই মহাঋষির আবার যুবতী বধূদের ওপর একটু দুর্বলতা আছে, যদিও এ ব্যাপারে কোনো জনশ্রুতি নেই। আমার মনে হয়, তাঁর বয়স সত্তরের মতো হবে, তবে তাঁর দাবী, তাঁর বয়স এক হাজার বছর।'

'বড় মজার ব্যাপার তো,' বললেন সওয়ের। 'তাহলে বাংলাদেশে সোফিয়া কি করছিল বলে আপনার মনে হয়?'

'ওর যা স্বভাব, দেহ বিলিয়ে দেওয়া!' উত্তরে বলল জুড। 'তবে জিজ্ঞেস করবো তাকে।'

'হ্যাঁ জুড ক্রেনি, আপনি একজন বিশেষ শ্রেণীর মানুষ,' বললেন ডঃ সওয়ের। 'আর এই পৃথিবীকে আপনি অনেক কিছুই দিতে পারেন।'

'কিন্তু আমার যে অনেক বয়স হয়েছে। অনেক, অনেক খেলাই তো খেললাম, আর সে সব খেলায় যে বড্ড একঘেয়েমী লাগে।'

'কতই বা বয়স আপনার? বড় জোর পঞ্চাশ! আর আপনি না অমরত্ব লাভের চেষ্টা করছেন?' ডঃ সওয়ের বললেন, 'জীবন শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, দেশের জন্য, দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হওয়ার জন্য এবং কিছু দেওয়ার জন্য।'

'আপনি যে একজন দার্শনিক, দার্শনিকসুলভ কথা বলবেন এভাবে, ভাবতেই পারিনি কখনো।' শুকনো গলায় মন্তব্য করল জুড।

'দার্শনিকতা নয়, এ আমার বাস্তব উপলব্ধি,' বলল জুড। 'আপনাকে আমার একান্ত প্রয়োজন, আমার পাশে, আমার পিছনে, আমার কাজে অংশ নেওয়া, আমাকে প্রেরনা দেওয়া, এসবই আমি যে চাই। আপনাকে ছাড়া আমি যে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে পারবো না।' একটু থেমে তিনি আবার নরম গলায় বলতে থাকেন, 'শুধু আমি একা নই, বারবারা, মারলিন এবং অনেকেই আমার মতো ভেবে থাকে—'

বাধা দিয়ে বলে উঠল জুড, 'আর মাত্র তিনটে মাস অপেক্ষা করুন। কোন্ পথে

আমি যাবো, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই সময়টা আমার খুবই প্রয়োজন। সেটা আপনি আমাকে দিতে পারেন না?'

'এর জন্য আমরা অনেক অপেক্ষা করেছি, তাই আরো তিনমাস অবশ্যই অপেক্ষা করতে পারবো,' বললেন সওয়ের।

'এর বাইরে যে অন্য আর কোনো পৃথিবী আছে, আমার তা জানা নেই,' বলল সোফিয়া। 'মনে হচ্ছে, আমরা যেন অন্য এক জগতে বিচরণ করছিলাম।'

তার বিছানার পাশে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ডঃ সওয়ের, সোফিয়াকে বুকে বালিশ জড়িয়ে বিছানায় পরে থাকতে দেখলেন।

'এ আর এক পৃথিবী,' বললেন সওয়ের। 'জুডের পৃথিবী।'

নীরবে এক মুহূর্ত তাঁকে লক্ষ করল সোফিয়া, তারপর নিজেকে সে আবরণ মুক্ত করতেই তার নগ্ন দেহটা সওয়েরের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এই বয়েসও তার দেহ কতো সুন্দরই না রেখেছে, ভাবলেন তিনি। বিছানা থেকে নেমে তাঁর দিকে তাকাতে গিয়ে লজ্জা পেলো সোফিয়া। ত্রস্ত হাতে সিল্কের পোশাকে সে [illegible]গ্ন দেহটা ঢাকা দিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আমার সঙ্গে চা খাওয়ার [illegible] একটু সময় করে নিতে পারবেন?'

মাথা নাড়লেন ডঃ সওয়ের। রিসিভার তুলে ম্যাক্সকে চায়ের ফরমাস দিলো সোফিয়া। রিসিভার নামিয়ে রেখে সওয়েরকে সঙ্গে নিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বসল তারা।

'আপনি কি মনে করেন, ঘরে আপনার টেপ ফিট করা আছে?' জিজ্ঞেস করলেন সওয়ের।

'হ্যাঁ। শুধু টেপ নয়, সেই সঙ্গে ঘরটা ভিডিও-স্ক্যান্ডও করা আছে।' বলল সোফিয়া। 'এ আমার অনুমান। জুডের জায়গায় আমি যদি হতাম, আমিও তাই করতাম। সম্ভবত এই ব্যালকনিও কভার করা আছে।

'আপনার কি মনে হয়ে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে?'

'হ্যাঁ কিংবা না, ঠিক বলতে পারছিনা। আপনি তো একজন ডাক্তার, আমি চাই আপনি তাঁকে খুব কাছ থেকে নিরীক্ষন করে আপনার মতামত জানাবেন।'

'কেন, আপনিও তো তার চিকিৎসক,' বলল সোফিয়া, 'আপনার থেকে আমি বেশী ভালো বুঝবো, এ কথা আপনার কেনই বা মনে হলো? আমার থেকে আপনার অনেক বেশী দিনের পরিচয়, তাই—'

'দেখুন, এই দ্বীপে তিনি চলে আসার পর থেকে টেলিফোনে এবং কমপিউটার প্রিন্টআউটের মাধ্যমে তাঁর শারীরিক টেস্টের রিপোর্ট থেকেই সব কিছু আমি জেনেছি, এর বাইরে তার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগই ছিলো না।'

'শেষ প্রিন্টআউটের একটা কপি আপনার কাছে আছে?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

তিনি তাঁর কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে সোফিয়ার হাতে তুলে দিলেন। দ্রুত সেই রিপোর্টের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোফিয়া বলল, 'বড়

মজার ব্যাপার তো। এই রিপোর্ট তার সব কিছুই স্বাভাবিক দেখছি। তা সত্ত্বেও তার ব্যাপারে আপনি কেন এতো চিন্তিত বলুন তো?'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। এর আগে তাঁর মধ্যে কখনো একঘেয়েমী দেখেনি। কিন্তু এখন কোনো কিছুতেই তাঁর আর আগ্রহ দেখতে পাই না।'

'এক্ষেত্রে তার একজন সাইকিয়াট্রিস্টের প্রয়োজন, আমাকে নয়,' বলল সোফিয়া।

'হতে পারে,' উত্তরে তিনি বললেন, 'কিন্তু একমাত্র আপনাকেই বিশ্বাস করা যায়।' তার চোখে চোখ রেখে তিনি আরো বললেন, 'সাহায্য করবেন?'

'জানি না কতখানি সাহায্য আমি করতে পারবো, কিন্তু আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো।' বলল সোফিয়া।

মাথা নাড়লেন সওয়ের। 'আমাদের একমাত্র ইচ্ছে হলো, ওঁকে এই জগতে ফিরিয়ে আনা। আমার ধারণা, ওঁর যে অমরত্ব লাভের ইচ্ছে, সেটা ওঁর আর এক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত বহন করছে।'

ডঃ সওয়ের চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই, একটা বড় ড্রেস বক্স হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল পরিচারিকা মেই। 'ডক্টর, আপনার জন্য মিঃ ক্রেনি এটা পাঠিয়েছেন।'

বাক্সটার দিকে তাকিয়ে সোফিয়া বলে উঠল, 'আমার হয়ে ওটা তুমি দয়া করে খুলবে?'

'হ্যাঁ ডক্টর।' এই বলে সোফিয়ার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে সে আবার বলল, 'এটাও আপনার।'

খামটা খুলল সোফিয়া। কার্ডের এক দিকে তার নাম ছাপার অক্ষরে লেখা। অপর প্রান্তে তার হাতে লেখা একটা চিঠি ঃ ''তোমার জন্যে এটা কিনে এনেছিলাম কিন্তু তোমাকে এটা দেওয়ার আগেই তুমি চলে গেলে। আশাকরি এবার আর খুব বেশী দেরী করিনি জুড।''

তার চিঠি পড়ার ফাঁকে বাক্সটা খোলা হয়ে গিয়েছিল। পোশাকটা হাতে তুলে নিলো সোফিয়া। সাদা সিল্কের একটা ইভনিং গাউন। কাঁধ থেকে থাই পর্যন্ত ঝুল। 'চমৎকার,' বলল সোফিয়া। 'কিন্তু এটা এতো ছোট যে, আমার মনে হয় না, আমার গায়ে ফিট করবে।'

'তা একবার পরেই দেখুন না ডক্টর,' পরিচারিকা বলল। 'যদি কোনো অদল-বদল করতে হয়, হয়তো সেটা ম্যাক্স করে দিতে পারবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল সোফিয়া, 'একটু অপেক্ষা করো।' বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সে, দরজাটা খোলা রইল। সেই খোলা দরজা পথে একটু পরেই তার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো পরিচারিকার উদ্দেশে ঃ 'এতো ছোট যে, এটা আমি কাঁধ থেকে কিছুতেই নামাতে পারছি না।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই পরিচারিকা বলে উঠল, 'ও ভাবে গাউনের ভেতরে পা ঢুকিয়ে ওপর দিকে তুলে ধরুন।' তার নির্দেশ অনুসরণ করল সোফিয়া। গাউনটা

তার গায়ে এতো আঁটো হয়ে চেপে বসল যে, প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো, এ যেন তার গায়ের দ্বিতীয় একটা চামড়া। তার স্তনের বোঁটা দু'টো যেন পোশাকের আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, তার নিটোল গোল নিতম্বের খাঁজটা এতো বেশী স্পষ্ট যে, নারীর শালীনতা হানি করার মতো। আয়নায় পরিচারিকাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল সে, 'অত্যন্ত আঁটো এটা, একটু চলাফেরা করলেই ফেটে পড়বে। না, না, এ আমি পরতে পারি না। এতে আমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখাবে।'

'কিন্তু মিঃ ক্রেনির যে পছন্দ হবে,' বলল পরিচারিকা।

সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন চোখে তাকাল, 'এ কথা তোমার কেন মনে হলো?

'গত ন'মাস ধরে আপনার বসের কি পছন্দ, কি অপছন্দের কথা আপনি তো জানেন না।'

'কেন এখানে অন্য মেয়ের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

একটু ইতস্তত করে পরিচারিকা। বলতে কোথায় যেন বাধা।

'তুমি আমাকে খোলাখুলি বলতে পারো,' তাকে অভয় দিয়ে বলল সোফিয়া। 'আমি তাঁর একজন চিকিৎসক, যদিও আমি একজন নারী। তাছাড়া আমি নিশ্চিত, ফাস্ট এডি নিশ্চয়ই তোমাকে আমার কথা বলে থাকবে।'

'হ্যাঁ, বলেছে বৈকি।'

'তাহলে আমি যা জানতে চাই বলো,' বলল সোফিয়া। 'এ আমার শুধুই কৌতূহল নয়, খবরটা জানার আর একটা বিশেষ কারণ আছে। মিঃ ক্রেনির বর্তমান অবস্থা এবং আচার-আচরণ নিরীক্ষণ করে আমার মতামত জানাতে বলেছেন ডঃ সওয়ের। এ ব্যাপারে যতোটা সম্ভব ওঁকে সাহায্য করতে হবে।'

এ কথায় কাজ হলো। মুখ খুলল পরিচালিকা। তবে মুখ না তুলেই, বাথরুমের মেঝের দিকে চোখ রেখে সে এবার অকপটে স্বীকার করল। 'প্রতি সপ্তাহে মেনল্যান্ড থেকে কম করে তিনটি মেয়ে এখানে আসত মিঃ ক্রেনির জন্য। সাধারণত তারা এক কি দুই সপ্তাহ থাকত এখানে, তারপর ফিরে যেতো তারা। পরের সপ্তাহে আবার তিনটি নতুন মেয়ে আসত। আগের মেয়েরা কখনো আর ফিরে আসত না।'

মুহূর্তের নীরবতা। 'আর তাদের প্রত্যেককেই কি এই একই ধরণের পোশাক তিনি দিতেন?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম, আর একই রঙের, সাদা রঙের। এসব পোশাক প্যারিস থেকে আনা হতো। এক সঙ্গে দু'ডজন করে।' একটু থেমে সে এবার অনুরোধের ভঙ্গিমায় বলল, 'ম্যাডাম, এই যে আপনাকে সব খুলে বললাম, এ কথা যেন বসকে কখনো বলবেন না।'

'না, কাউকেই বলবো না, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।' তারপর জুডের দেওয়া পোশাকটা ছেড়ে নিজের পোশাক পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো সোফিয়া।

'তাহলে এ পোশাক আপনি পরছেন না?' জিজ্ঞেস করল পরিচারিকা।

চোখ তুলে তার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'ওটা পাট করে রেখে দাও,' বলল সে।

'স্নান করার পর একটু বিশ্রাম করে ঠিক করবো এটা পরবো কিনা। যাইহোক, পরে তোমাকে ডেকে পাঠাবো। এখন তুমি যেতে পারো।'

'ধন্যবাদ ডক্টর।' ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পরিচারিকা।

মাথাটা ভীষণ ঘুরছিল সোফিয়ার, পড়ে যাবে। ফাস্ট এডির নির্দেশ মতো ড্রেসিং টেবিলের মাঝের ড্রয়ার থেকে কোকেনের শিশি বার করে ছিপি খুলল সে। তারপর দু'দুবার শিশির মুখে নাক লাগিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতেই তার মাথাটা পরিস্কার হয়ে গেলো।

এবার সে জুডের পাঠানো ড্রেস বক্সের মধ্যে থেকে কার্ডটা টেনে বার করল। কার্ডের তারিখ অনেকদিন আগেকার তবে কখনোই তিন বছর আগের নয়, যখন তার সঙ্গে সোফিয়ার শেষ সাক্ষাত হয়েছিল। অথচ জুডের চিঠির তারিখ আজকের। তাহলে? কেনই বা সে এমন মিথ্যে বলতে গেলো? ডঃ সওয়ের ঠিকই বলেছেন। জুড বদলে গেছে। আগে কখনো জুড মিথ্যে বলত না, না তার কাছে, না অন্যের কাছে।

বিছানার ধারে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল সে। ধীরে ধীরে জুডের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা মনে করার চেষ্টা করল। তাকে নিয়ে অনেক রকম এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। মনে হয় সেগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটা তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে থাকবে। ব্যাপারটা হলো, সেটা সে জানে না। সম্ভবত কেউ জানতেও পারবে না। এমন কি জুড নিজেও জানতে পারবে না কখনো।

বাড়িটা যেন একটা গুহা, পলকাটা দেওয়ালে আলোর প্রতিফলন রাশিরাশি হীরের দ্যুতির মতো ঝলমলে, রাতের অন্ধকারে যেন দিনের আলো এনে দিলো। ধীরে ধীরে থেমে গেলো লিমোসিন গাড়িটা। ফাস্ট এডি এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'আসুন ডক্টর। আমি আপনাকে মিঃ ক্রেনির অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাবো।' ফাস্ট এডি তাকে ডান দিকের দরজা পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে এলো। রিসেপসনিস্টের দিকে তাকিয়ে বোতাম টিপতেই দরজা খুলে যায়। সামনেই এলিভেটার। তারা এলিভেটারের ভেতরে ঢুকতেই ফাস্ট এডি বোতাম টিপলো। এলিভেটার ওপরে উঠতে থাকে। রিসেপসনিস্টের অদ্ভুত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে সোফিয়া যতক্ষণ না নিচে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

সোফিয়া ফিরে তাকাল ফাস্ট এডির দিকে। 'আচ্ছা, আমাকে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে?' রিসেপসনিস্ট কেমন যেন কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল।'

'সে আপনার ওই পরনের পোশাকের জন্যে,' উত্তরে বলল সে। 'আপনার রঙিন পোশাক দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকবে সে, কারণ এখানে সবাই সাদা পোশাক পরে থাকে।'

'কারণ?'

'মিঃ ক্রেনির পছন্দ। তাঁর ধারণা, সাদা পোশাকের মধ্যে একটা অতি পবিত্র ভাব আছে। তাছাড়া তিনি মনে করেন, এতে রঙের ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা থেকে বিরত করা যায় সবাইকে।'

'আর তাই কি তিনি আমাকে সাদা পোশাক পাঠিয়েছিলেন?'

'জানি না কি পোশাক তিনি আপনাকে পাঠিয়েছিলেন।' উত্তরে বলল সে।

সোফিয়া জেনে গেছে, ফাস্ট এডি তার কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে না। কাচের দরজা দিয়ে পরবর্তী ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'এ ফ্লোর কিসের?'

'যোগাযোগ, ব্যবসা সংক্রান্ত তদারকি অফিস এবং কমপিউটার সেকশান,' বলতে থাকে সে। 'নিচে যে ফ্লোরে প্রথম এখানে আপনি পা রাখেন, সেটা হলো ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্ট এবং বসবাসের কোয়ার্টার। মাটির তলায় প্রথম বেসমেন্টে থিয়েটার এবং রিক্রিয়েশান রুম, দ্বিতীয় বেসমেন্ট আর ফাইনাল বেসমেন্টে আছে বিল্ডিং রক্ষনাবেক্ষনের জন্য যন্ত্রপাতি। মিঃ ক্রেনির অ্যাপার্টমেন্ট একেবারে থার্ড অর্থাৎ টপ ফ্লোরে। সেখানে তাঁর সব কিছুই আছে। বেডরুম, বাথরুম, জিমনাসিয়াম, বসবার ঘর, ডাইনিং রুম, কিচেন, বার, লাইব্রেরি, এবং তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত অফিস।'

'এক দিক থেকে,' একটু নীরব থেকে বলল সোফিয়া, 'ঠিক বিমানের মতো, কেবল আকারে বিরাট বড়, এই আর কি।'

'হ্যাঁ, সেরকমই আর কি,' বলল ফাস্ট এডি, 'এ এক অদ্ভুত জগতে আপনি প্রবেশ করতে যাচ্ছেন।'

এলিভেটার থেকে বেরিয়ে আসতেই অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর থেকে সেতারের আওয়াজ ভেসে এলো। ফাস্ট এডি তাকে লাইব্রেরির বার-এ বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবেন?'

ওয়াই ক্যাবিনেটের দিকে চোখ ফেরাল সোফিয়া। থরেথরে মদের বোতল সাজানো, নানা ব্র্যান্ডের। তবে সে তার প্রিয় ব্র্যান্ডের ফরমাস দিতে গিয়ে বলল, 'স্টারকা ভদকা।'

ভদকার গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে খোলা জানালার দিকে তাকালো সোফিয়া। শ্বেত-শুভ্র পূর্ণ চাঁদের হাট বসেছে, দূরে সমুদ্রে তার বেচাকেনা প্রত্যক্ষ করল সে। অপূর্ব! এতো অপূর্ব যেন একটা ছবির মতো দেখতে, সত্যি বলে মনে হয় না।'

এই সময় স্পিকারে জুডের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'শুভ সন্ধ্যা।'

'শুভ সন্ধ্যা,' যন্ত্রচালিতের মতো প্রতি সম্ভাষণ জানালো সোফিয়া। তারপর ঘরের চারদিকে তাকাল, কেবল নিঃসীম শূন্যতা। 'আমার কথা তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?'

'হুঁ।'

'কতোদিন, কতোদিন তোমায় দেখিনি,' বলল সে। 'আমি তোমাকে দেখতে চাই।'

'আমি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।'

'এটা উচিত নয়,' বলল সোফিয়া।

'আমার পাঠানো পোশাক পরে এলে না কেন?'

'সেটা যে খুবই ছোট্ট, আমার গায়ে ঠিক ফিট করল না,' বলল সে। 'হয়তো তিন বছর আগে হলে সেটা ফিট করতো, কিন্তু এখন নয়। তা তোমার কি খুব দেরী হবে?'

'না, খুব বেশী দেরী হবে না।' স্পীকারে একটা ক্লিক শব্দ হলো। তারপরেই সেতারের ঝঙ্কার শোনা গেলো। হঠাৎ তার খুব খিদে পেলো। এক টুকরো টোস্ট মুখে তুলে নিলো এবং দ্বিতীয়বার গ্লাসে মদ ঢালল বসবার ঘরে আসার আগে।

কৌচ থেকে উঠে দাঁড়াল। মাথাটা হাল্কা মনে হচ্ছে। 'মনে হচ্ছে, আমি একটু মাতাল

হয়ে উঠেছি,' বলল সোফিয়া।

মৃদু হেসে জুড তাকে চুমু খেলো। সোফিয়ার কনুই ধরে বলল সে, 'তাহলে তুমি বরং আবার বসে পড়ো।'

কৌচে বসে তার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে সোফিয়া বলল, 'খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে, সেই সঙ্গে তোমার বয়সও যেন অনেক কমে গেছে।'

'আর তোমাকেও তো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।' বলল জুড।

'ওই একটু ওজন যা বেড়েছে,' বলল সে। 'আমার খাবারে প্রোটিনের চেয়ে কার্বোহাইড্রেটই বেশী ছিলো। তার কারণ বাংলাদেশে নানান ধরনের খাবার তুমি দেখতে পাবে না। মূলত ভাতই সেখানকার প্রধান আহার।' বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উঠতেই সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমি যে বাংলাদেশে গেছি, এটা তুমি আবিস্কার করলে কি করে?'

'খুবই সোজা,' উত্তরে বলল সে। 'বাংলাদেশের যে হাসপাতালে তুমি কাজ করতে, সেখান থেকে ক্রেনি ফার্মাসিউটিকালস ওষুধের অর্ডার পায়, তাতে তোমার নাম লেখা ছিলো।'

'তাই বুঝি?' বলল সোফিয়া। 'এখন তুমি আমার সঙ্গে কেনই বা দেখা করতে চাইলে?'

'কতকগুলো ফাইল চাই তোমার কাছ থেকে। ডঃ জ্যাবিস্কি আমাকে কিছু নথীপত্র দেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালের আগে তাঁর গবেষণার কোনো রেকর্ডই আমার কাছে নেই।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। তাঁর মৃত্যুর আগের দিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন, সব কাগজপত্রই তিনি তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন।'

'তাহলেও কিছু নথীপত্র তিনি অন্য কোথাও রেখে গিয়ে থাকবেন,' বলল জুড। 'এখনো তার উত্তর আমরা পাইনি।'

'সেকথাও তিনি আমাকে বলেছিলেন। আবার তিনি আমাকে এও বলেছিলেন, তিনি তোমাকে সব যন্ত্রপাতি দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য সেই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যেই বাকী উত্তরগুলো তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে।'

'সব বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু উত্তর শূন্য।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া। 'পোড়-খাওয়া বৃদ্ধা!'

'তার মানে কি বলতে চাও তুমি?'

'উনি আমাদের সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। তুমি, আমি, এমন কি অ্যানড্রোপভকেও। কবর থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি হয়তো হাসছেন এখন। জুডের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'বুঝতে পারলে না? হাজার হোক, তোমার সঙ্গে কাজ করার জন্য অবশিষ্ট থেকে গেছি একমাত্র আমিই!'

'আর তাই কি তুমি বাংলাদেশে গিয়েছিলে আমার জন্যে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে?'

'আংশিক ভাবে,' বলল সে। 'তাছাড়া আরো একটা কারণও ছিলো, রাশিয়া এবং যুগোস্লাভিয়া থেকে আমাকে বার করে দিতে চেয়েছিল অ্যানড্রোপভ।'

'কারণ মাও-এর যে ভাবে মৃত্যু হয়েছিল ব্রেজনেভও ঠিক সেই ভাবে মারা গেছে, এই জন্যে?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল সে।

'ওদের দু'জনের কারোরই মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই।'

'কিন্তু অ্যানড্রোপভ কি সে কথা জানে? মাও মারা যাওয়ার সময় তুমি তার কর্তব্যরত চিকিৎসক ছিলে। আর ব্রেজনভের মৃত্যুর সময়েও তুমি তার চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলে। এখন আমাদের খবর মতো অ্যানড্রোপভও অসুস্থ। কিন্তু অন্যদের অসুখের সময় সে যেমন তোমাকে ডেকেছিল, নিজের অসুখে সে তোমাকে আহ্বান জানায়নি। সম্ভবত তোমার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে সে।'

'জানি না, সে কি ভাবছে না ভাবছে,' শান্ত সংযত ভাবে বলল সোফিয়া।

'অনেকদিন আগে ডঃ জ্যাবিস্কি আমাকে বলেছিলেন,' বলল জুড, 'তাদের সময়ে সবাই মারা যাবে। তাদের জীবনের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তবু তা সত্বেও তিনি আমাকে অন্য রকম বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন,' বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

মৃদু হেসে সোফিয়া তার অসমাপ্ত কথার জের টেনে বলল, 'হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, তিনি যেখানে সাফল্য পাননি, তুমি সেখানে সফল হতে পারো।'

এই সময় ঘরে ঢুকে ফার্স্ট এডি জানিয়ে দিলো, 'নৈশভোজ তৈরী।'

ডাইনিং রুমটা খুব একটা বড় নয়, মাঝারি আকারের। একটা মাত্র আলো ঝুলছিল সিলিং থেকে। জুডের মুখোমুখি একটা টেবিলের সামনে বসেছিল সোফিয়া। জানালা দিয়ে দূরের সমুদ্রে তখনো চাঁদের হাঁট বসে থাকতে দেখল সোফিয়া। স্বল্প আলোকে ঘরের মধ্যে একটা মায়াময় পরিবেশে রচনা হয়েছিল তখন। হেসে বলল সে, 'দৃশ্যটা যেন একটা ছায়াছবির মতো দেখাচ্ছে।'

হাসল জুড। 'একজন সেট ডিজাইনারকে দিয়ে ডাইনিং রুমটা সাজিয়েছি। সব ব্যাপারেই আমি একটা নাটকীয় আমেজ অনুভব করতে চাই। সাধারণত সব ডাইনিংরুমই কেমন নীরস বলে আমার মনে হয়, যেন সেখানে শুধুই খেতে যাওয়া। কিন্তু আমি চাই, সেখানে একটা রোমাঞ্চকর তৃপ্তি অনুভব করতে।'

'সেটা আমি কখনো ভাবিনি,' বলল সোফিয়া। 'চমৎকার।'

'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'আশাকরি নৈশভোজও তোমাকে তৃপ্তি দেবে।'

নৈশভোজের প্রতিটি খাবার একেবারে আমেরিকান। সেদিনই সকালে মেক্সিকোর উপকূল থেকে বাগদা চিংড়ি আনা হয়েছিল। ফরাসী মদ। এক কথায় অপূর্ব আয়োজন।

জুডের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, লোকেরা খাবার খেতে এতে আনন্দ উপভোগ করে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্লেটের দিকে তাকাতে গিয়ে সে দেখল, খুব কম খাবারই খেয়েছে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাতে গিয়ে বলল সে, 'গতকাল এই সময়ে বাংলাদেশে ছিলাম, আর আজ এখানে। এ যেন আর এক পৃথিবী।'

'স্বাগত জানাই তোমাকে।' উঠে দাঁড়িয়ে বলল জুড। 'লাইব্রেরিতে কফি আর মদ খাওয়া যাবে 'খন। এখন ওঠা যাক।' লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে সোফিয়াকে চেয়ার এগিয়ে দিতে গিয়ে জুড নরম গলায় বলল, 'সত্যি, এখনো তুমি অপরূপা সুন্দরী রয়েছ।'

'তাই নাকি? আমি তো নিজের সৌন্দর্যের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম,' বলল সোফিয়া। 'আমি তো এখন ভাবতে বসেছি, সুন্দর সুন্দর শিশুর কাছে আমি বুড়ি হয়ে গেছি।'

'সে আর এক ধরনের কিছু হবে,' বলল সে। 'আমার কাছে তুমি একজন কেবলি নারী। অত্যন্ত সুন্দরী এবং তোমার রূপ এখনো আমাকে উত্তেজিত করে তোলে। ওরা হচ্ছে শিশু, আর ওরা ওদের খেলা খেলছে।'

স্টারকা ভদকা পান করার পর মুহূর্তের জন্য নীরব হবে সোফিয়া। 'এখন তোমার আর কিছু বলার আছে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল জুড, 'জানি না। শুধু এটুকু জানি, আমরা এখন পরস্পরের কাছে একটু অস্বস্তিতে আছি। অনেকটা আমরা যেন এ ওর কাছে কিছু আড়াল করতে চাইছি, আগে আমরা যেমন করতাম, সেরকম যোগাযোগ আমরা আর করছি না।'

'তা সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?' সোফিয়া জিজ্ঞেস করল। 'এটা তো ঠিক, দীর্ঘদিন ধরে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যই বোধহয় এই অস্বস্তিবোধ।'

'তা হতে পারে, কিন্তু আমার যে ভীষন ভয় করে সোফিয়া।'

'ভয়? তুমি তো তোমার চাহিদা মতো সব কিছুই পেয়ে গেছো, তবু এখনো তোমার ভয় কেন?' জিজ্ঞেস করলো সোফিয়া।

'তোমাকেই আমার ভয়,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'তোমার জ্ঞান, আমার সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া, এ সবই আমাকে ভীতগ্রস্ত করে তুলেছে। আর একটা ভয় হলো, তুমি উত্তর জানো, কিন্তু আমি জানি না। পৃথিবীতে অন্য কেউই জানে না।'

কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জুড, জানালার দিকে মুখ করে বলল, 'এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না সোফিয়া। সেই বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক বছর তুমি কাটিয়েছে, সম্ভবত তুমি জানো, কিন্তু স্বীকার করতে চাইছ না।' এবার তার দিকে ফিরে তাকাল সে। তার কণ্ঠস্বর কেমন রূঢ় শোনাল। 'মহাঋষি রাজ নৈবুরকে তুমি জানো?'

'না।'

'কেন, তার সন্ধানে তুমি বাংলাদেশে যাওনি?'

'না,' বলল সোফিয়া। 'আমি তার নাম পর্যন্ত কখনো শুনিনি।'

'কিন্তু জ্যাবিস্কি জানতেন। তাঁর ফাইলে সেই মহাঋষির নাম উল্লেখ করা আছে।'

'হতে পারে, কিন্তু তার নাম তিনি কখনো আমার কাছে উল্লেখ করেননি।'

এই সময় দরজা খুলে যায়। দরজার ওপার থেকে একটি সুন্দরী যুবতী ট্রে হাতে গুটি গুটি পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। মাথা নেড়ে সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর জুডের দিকে তাকাল। ট্রেটা টেবিলের ওপর রেখে মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে বসল মেয়েটি। তার নাম অ্যামারিস্থ। 'মিঃ ক্রেনি,' বলল মেয়েটি, 'আপনার জন্যে ড্রিঙ্কস তৈরী করব? নাকি আপনি আমাকে অপেক্ষা করতে বলেন?'

'আগে আমাদের অতিথির যত্ন নাও,' রুক্ষ গলায় বলল জুড।

মেয়েটি মাথা নিচু করে নীরবে একটা গ্লাসে স্টারকা ভদকা ঢালল, তারপর কোকেনের শিশিটা সোফিয়ার দিকে এগিয়ে দিলো।

'বৎসে, আমিও অপেক্ষা করতে পারি,' কেমন যেন মায়া হলো সোফিয়ার, মেয়েটির দিকে নরম গলায় বলল।

সোফিয়ার ঠিক বিপরীত কৌচে ফিরে এসে বসল জুড। সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'হতাশা, বুঝলে যেদিকে তাকাই না কেন কেবলি হতাশা। 'কোনো উত্তর দিলো না সোফিয়া।

মেয়েটির দিকে ফিরে বলল জুড, 'উঠে দাঁড়াও।'

মেয়েটি তার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নৈশভোজে সাধারনত মেয়েরা যেমন সুন্দর নম্র পোশাক পরে থাকে, মেয়েটির পোশাক তেমন নয়, পরনে সাদা সিল্কের স্ট্রেপলেস, যার নিচ থেকে তার নগ্নতা প্রকাশ পাচ্ছিল।

'অ্যামারিস্থের বয়স মাত্র সতেরো,' বলল জুড। 'ওর শরীর অত্যন্ত সুন্দর, এর আগে কখনো এমনটি দেখিনি। ওর নগ্ন দেহটা দেখতে চাও?'

তার চোখে চোখ রাখল সোফিয়া। ভাবলেশহীন তার চোখের চাহনি। 'তুমি যদি মনে করো—' কথাটা অসমাপ্ত রাখল সে।

তার চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই মেয়েটির উদ্দেশে বলল জুড,' অ্যামারিস্থ, তোমার পোশাকটা খুলে মেঝের ওপর ফেলে দাও।'

মেয়েটি তার পোশাক আলাগা করতেই সেটা তার দেহ থেকে খসে মেঝের ওপর পড়ে গেলো। সে তখন সম্পূর্ণ নগ্ন। মেয়েটির দিকে তাকাল সোফিয়া, মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিক্রমার পর মনে হলো, জুড ঠিকই বলেছে। হাতির দাঁতের মতো শ্বেতশুভ্র তার স্তনজোড়া। ভারী নিতম্ব, পা দু'টি সুডৌল।

'ঘুরে দাঁড়াও অ্যামারিস্থ,' বলল জুড। 'তুমি যে কতো সুন্দরী। মহিলাটিকে উপলব্ধি করতে দাও।' মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। সোফিয়ার হাস্যরত ঠোঁটের ওপর মেয়েটি তার ঠোঁট রেখে চুষলো।

'অ্যামারিস্থ মেয়েদেরই বেশী পছন্দ করে থাকে,' বলল জুড। 'এখানে তুমি যতদিন থাকো, রাখবে নাকি ওকে?'

'আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারলাম না জুড!' পাল্টা প্রশ্ন করে বসল সোফিয়া। 'তুমি কি মনে করো, মেয়েটি আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছে?' তার চোখে চোখ রেখে বলল সোফিয়া। 'অবশ্যই সে আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছে বটে, তবে এখানে সে একা নয়, তুমিও রয়েছো। তোমার স্ল্যাক্সের নিচের অংশটা স্ফীত হয়ে উঠতে দেখেছি, তাহলেই বুঝতে পারছো। আমার উত্তেজনার কারণ তুমিও!' এই বলে উঠে দাঁড়াল সে। হাত তুলে সোফিয়া তার পোশাকের গিঁট খুলতেই সেটা মেঝের ওপর খসে পড়ল। নিচে সাদা পোশাকের পোশাকটা তার দেহে আঁটো হয়ে বসেছিল, তার স্তনের বোঁটা দু'টো সেই আঁটো পোশাক ভেদ করে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। একটা হাত সে তার ভিজে কুঁচকির ওপর রেখে জুডের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাইল। 'এখানে এসে স্পীকারের মাধ্যমে তোমার কণ্ঠস্বর শোনার পর থেকেই আমার রাগমোচন হতে শুরু করছিল।' তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল জুড, কথা বলল না। সোফিয়া তখন নিজের থেকেই আবার বলতে থাকল, 'জুড, তুমি কি এই জন্যেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল? এখনো আমার ওপর তোমার প্রভাব বিস্তার করে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাও?'

জুড তার মাথাটা ধরে আদরের ভঙ্গিমায় ঝাঁকাতে গেলে বাধা দিলো সোফিয়া। 'শোনো জুড, তোমাকে জবাব দিতে হবে, যেদিন থেকে আমরা মিলিত হয়েছি, তুমি আমাকে তোমার কেনা মেয়েদের থেকে বেশী করে ক্রীতদাসী হিসেবে ব্যবহার করেছো, বলো কেন ?'

'আর তুমিও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো,' উত্তরে বলল জুড, 'অন্য কোনো পুরুষের কাছে তুমি যাওনি?'

'আমি কখনো তা অস্বীকার করিনি,' রাগতস্বরে বলল সোফিয়া। 'অন্যদের থেকে তুমি বেশ ভালো করেই জানো যে, আমার সেক্সের প্রয়োজন একটু বেশী, কিন্তু যে পুরুষের জন্য আমি আমার সেক্স খরচ করি দরাজ হাতে, তাকেও আমি সম্পূর্ণ নিজের মতো করে পেতে চাই। আর সে কথা তুমি তো বেশ ভালো করেই জানো, তোমার কাছে ফেরার জন্যই নিকিকে আমি খুন করেছিলাম। আর তোমারি অনুরোধে আমি যে সদূর বাংলাদেশ থেকে এখানে ছুটে এসেছি, তোমাকে ভালবাসি বলেই, এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

সোফিয়ার চোখের কোনায় জল চিক্‌চিক্ করতে দেখল জুড। তার মনটা কেমন দুর্বল হয়ে উঠল! সোফিয়ার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে গাঢ় স্বরে বলল সে, 'আমি দুঃখিত। মনে হয়, এখন তোমার একটু ঘুমের প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ,' বলল সোফিয়া, 'তোমার পাশে না শুলে ঘুম আমার কিছুতেই আসবে না।'

'কিন্তু আমার এখনকার শোয়ার ব্যবস্থা দেখলে হয়তো তোমার পছন্দই হবে না,' বলল সে। 'দু'পাশে দু'টি মেয়েকে নিয়ে আমি শুয়ে থাকি। এ হলো চীনা আদব-কায়দা। সেই মেয়ে দু'টি হলো ইং এবং ইয়াং। অতএব বুঝতেই পারছো, এ হেন পরিস্থিতিতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে তোমার দেহের গতিবিধি তখন কি হবে!'

'কেন, প্রথমেই আমরা গা ভাসিয়ে দেবো, এ ওর দেহের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারি না? তুমি আমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারো না?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'সাধারনত আমি তা করি না,' উত্তরে বলল সে। 'বরং মেয়ে দু'টি তখন পরস্পর প্রেম প্রেম খেলা করে, যাকে তুমি সমকামিতা বলতে পারো। আর তাদের সেই উদ্দাম উৎসাহ দেখতে দেখতে আমার চোখে ঘুম নেমে আসে।'

'তারপর কি হয়?'

'পরে যখন আমার ঘুম ভাঙ্গে, আমার দেহ তখন সতেজ হয়ে ওঠে।'

'আর মেয়েগুলো?'

'তাদের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহে তখন রাজ্যের ঘুম নেমে আসে, ঘুমিয়ে সারাটা দিন তারা কাটিয়ে দেয়,' বলল সে।

'কিন্তু তাহলে তুমি কখনই বা সহবাসে লিপ্ত হও?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'বিছানায় শুতে যাওয়ার আগে।'

'কিন্তু এখন তো তুমি আর বিছানায় নেই।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় সে। আমারিঙ্গের দিকে ফিরে তাকায় সে। 'আমাদের জন্যে XTC পিল তৈরী করো।'

ককটেল টেবিলের পাশে মেঝেতে বসে বলল মেয়েটি, 'মিঃ ক্রেনি, আমার জন্যে একটা তৈরী করবো প্লিজ?'

প্রশ্ন চোখে সোফিয়ার দিকে ফিরে তাকালো জুড।

নগ্ন মেয়েটির দিকে তাকালো সোফিয়া। সুন্দরী সে। মেয়েটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে চকিতে একবার জুডের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'হ্যাঁ, ওকে অনুমতি দাও। হয়তো তোমার জন্যে আমরা দু'জন ইং আর ইয়াং-এর একটা নতুন জুটি আবিস্কার করবো।'

❑ দুই ❑

সোফিয়া তখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। হঠাৎ চোখ মেলে কৌচের ওপর উঠে বসল সে। একটা অস্পষ্ট ধূসর আলোয় ছেয়ে যাচ্ছিল দিগন্ত তখন। সোফিয়া কথা বলার আগেই অ্যামারিন্থ মেঝের ওপর উঠে বসে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করে থাকতে বলল। সোফিয়া মাথা দুলিয়ে তা দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলো ঘরের চারপাশে, জুড অনুপস্থিত সেখানে মেঝের ওপর থেকে সে তার পোশাকটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তেমনি ঠোঁটে আঙুল রেখে নিঃশব্দে তার কাছে এগিয়ে এসে তার হাতে হাত রেখে অ্যামারিন্থ তাকে বার পেরিয়ে অন্য আর একটা ঘরে নিয়ে এলো। ঘরটা ছোট্ট, গোপন কক্ষের মতো। জানালাগুলো যেন একটা পিরামিড। জানালার পাশে একটা পদ্মফুলের আকারে একটা প্লাটফর্মের ওপর বসেছিল জুড। তার দিকে তাকাল সোফিয়া। সে তখন নিশ্চল, যেন নিঃশ্বাসও পড়ছিল না তার। তার চোখ দুটি খোলা, তবু আকাশে যে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, সে খেয়াল তার নেই। তার হাত ধরে তেমনি নিঃশব্দে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আর একটা ঘরে নিয়ে এলো সোফিয়াকে। একটা সংলগ্ন বাথরুমের সামনে এসে অ্যামারিন্থ ফিসফিসিয়ে বলল, 'আসুন, সুগন্ধি জলে অবগাহন করে আমরা সতেজ হয়ে উঠি।'

ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিচু গলায় সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'আর জুড, তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন তো?'

'না,' উত্তরে অ্যামারিন্থ বলল, 'প্রভু এখন আকাশের গ্রহ নক্ষত্রে বিচরণ করছেন। যখন সূর্যের আলোয় তিনি তাঁর চোখ দুটি বন্ধ করবেন, তখনি তিনি তাঁর বিছানায় ফিরে আসবেন এবং ঘুমবার চেষ্টা করবেন। তখন ইং এবং ইয়াং তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর রাগমোচন সম্পন্ন করবে, তাঁর ভেতরের সব উত্তেজনা, মানসিক অস্থিরতা দূর করে একটা ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু আমরা যে সারারাত ধরে তাঁর সঙ্গে বিপরীত সহবাসে লিপ্ত হলাম, তাতে কি তিনি তৃপ্ত হননি?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'হ্যাঁ, খুবই তৃপ্ত হয়েছেন,' বলল অ্যামারিন্থ। 'কিন্তু তিনি নিজে যে ভাবে তৃপ্ত হয়ে থাকেন, সেটা সে ভাবে হয়নি।'

মেয়েটির চোখে চোখ রাখল সোফিয়া। 'তার মানে তুমি বলতে চাও, তখন তাঁর রাগমোচন হয়নি?'

মেয়েটি চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হয়েছে বৈকি, তবে তাঁর নিজস্ব পথে নয়।' মেয়েটি আরো বলল, 'আপনি হয়তো ঠিক বুঝতে পারছেন না, এই ভাবেই তিনি তাঁর শক্তি সঞ্চয় করে থাকেন, এবং তার পৌরুষ সংরক্ষন করে থাকেন।'

'তাহলে কেনই বা তিনি সরাসরি সহবাসে লিপ্ত হতে অনীহা প্রকাশ করেন?' সোফিয়া এখন উপলব্ধি করতে শুরু করল, যেন একটা শিশুর সঙ্গে কথা বলছে সে।

'আমাদের তৃপ্তির নির্যাস তিনি নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েই তৃপ্ত হন,' বলল সে।

মেয়েটির দিকে তাকালো সোফিয়া। 'তুমি বাকি মেয়েদের পছন্দ করে থাকো, জুড আমাকে সেইরকমই বলেছে। কিন্তু কেন? আর তোমার মতো অন্য মেয়েরাও কি তাই চায়?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় অ্যামারিস্থ।

'এর থেকেও বেশী চাহিদা তোমাদের নেই?'

'না,' উত্তরে অ্যামারিস্থ বলল, 'আমাদের প্রভুকে তৃপ্তি দিয়েই আমরা খুশি।'

একটা মুহূর্তের জন্য নীরবতা। 'আমার নিজের কটেজে ফিরে গেলে এখন ভালো হয়,' অবশেষে বলল সোফিয়া।

'বেশ তো যা ভালো বোঝেন,' আলামারি থেকে একটা টেরিক্লথের বাথরোব বার করে সোফিয়ার হাতে তুলে দিলো অ্যামারিস্থ তার পরার জন্য। তারপর বলল সে, 'আসুন, আমি আপনার গাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

পরদিন দুপুর আড়াইটের সময় জানালা পথ দিয়ে প্রখর সূর্যের রশ্মি চোখে পড়তেই সোফিয়া সঙ্গে সঙ্গে রিসিভারটা তুলে নিয় ম্যাক্সকে ফোন করল।

'হ্যাঁ ডক্টর, আপনার জন্যে দু'টো বার্তা আছে,' বলল ম্যাক্স। 'আপনার ঘুম ভাঙ্গলেই মিঃ ক্রেনি আপনাকে ফোন করতে বলেছেন। ওঁর ফোন নম্বর এক। আর ডঃ সওয়ের আপনাকে তাঁর রিসার্চ সেন্টারের অফিসে ছ'টার সময় যেতে বলেছেন।'

'ধন্যবাদ ম্যাক্স,' বলল সে। 'কফি পান করার পরেই মিঃ ক্রেনিকে ফোন করবো।

অর্ধেক কফি চুমুক দেওয়ার পর জুডের ফোন নম্বর ডায়াল করল সোফিয়া। দূরভাষের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে জুডের কণ্ঠস্বর, 'শোনো সোফিয়া, তোমার পড়ার জন্য জ্যাবিস্কির ফাইলের ব্যবস্থা আমি করছি। সবটাই টেপে সংরক্ষিত। তোমার পছন্দ মতো যে কোনো ভাষায় শুধু নয় মূল কপিগুলোও পেতে পারো তুমি, যা কিনা তাঁর নিজের হাতে লেখা।'

'আমি মূল কপিটাই চাই,' বলল সোফিয়া। 'সেই সঙ্গে আমি ইংরিজী কপিটাও চাই।'

'বেশ তো সে সবই আমাদের হেপাজতে আছে। তোমার জন্য আমাদের কাছে নোটও আছে। তাছাড়া তাঁর গবেষণার বিরুদ্ধে আমার উপলব্ধি সহ কয়েকটা মন্তব্যও আছে, প্রয়োজন হলে সেটাও তুমি দেখে নিতে পারো। তা কখন শুরু করতে চাও বলো?'

'সে তো খুবই সহায়ক হবে। তুমি যদি মনে করো কাল সকাল থেকেই শুরু করতে পারি।'

'বেশ, তোমার গবেষণার জন্যে একটা আলাদা অফিসের ব্যবস্থা করে রেখেছি,' বলল জুড।

'ধন্যবাদ। আর একটা কথা,' একটু থেমে সোফিয়া বলল, 'তিন বছর হলো তোমাকে শেষ বারের মতো পরীক্ষা করেছিলাম। যদি তোমার মনে থাকে তাহলে বলি, আমি একজন চিকিৎসক। আমি তোমার একটা দেহগত পরীক্ষা চালাতে চাই এই কারণে যে, তোমার অগ্রগতি কতোটা হয়েছে, সেটা আমার জানা দরকার।'

'ডঃ জ্যাবিস্কির নোট থেকে সেই পরীক্ষার ফলাফলের কোনো তফাত পেতে পারো বলে তোমার মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এখনি ঠিক বলতে পারছি না,' উত্তরে বলল সে। 'হয়তো সে সব কিছুই নয়। কিন্তু অপর পক্ষে, তোমার মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে, তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার ওপর আলোকপাত হতে পারে।'

'আমার ব্যাপারে তুমি কমপিউটারে যা পেতে চাও, ডঃ সওয়েরে কাছে সে সব খবর সংগ্রহ করা আছে।'

'সে যাইহোক, আমি নিজের চোখে দেখে বুঝতে চাই।'

দৃঢ়স্বরে বলল জুড, 'আমার মনে হয় না, এর কোনো প্রয়োজন আছে।'

'দুঃখিত জুড, আমাকে তা করতেই হবে।'

'না,' সংক্ষিপ্ত উত্তর তার। এর পরেই টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একটু অপেক্ষা করে সোফিয়া আবার তার ফোন নম্বর ডায়াল করল। 'মিঃ ক্রেনিকে লাইনটা দেবেন, প্লিজ!'

'দুঃখিত ডক্টর, এখন তাঁকে পাওয়া যাবে না।'

'বেশ, ওঁকে একটা খবর দেবেন?'

'নিশ্চয়ই ডক্টর।'

'ওঁকে বলবেন, আমার মনে হয়, আমার পক্ষে ওঁকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তাই আমি আমার নিজের কাজে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

একটু পরেই জুড নিজের থেকে ফোন করল। 'তুমি একটা কুত্তী।'

'হতে পারি,' বলল সোফিয়া। 'কিন্তু আমি একজন চিকিৎসক হওয়ার খাতিরে আমাকে নিজের পথে চলতে হবে। এ ব্যাপারে তোমার চিন্তা করা উচিত। এই ফাঁকে আমি ডঃ সওয়েরকে বলছি, তিনি যেন এখানে এসে আমাকে সাহায্য করেন। তিনি তোমার বন্ধু এবং একজন চিকিৎসকও বটে। এখন তোমার ব্যাপার তুমি সিদ্ধান্ত নাও।'

'কাল সকালে তিনি এখানে আসছেন,' বলল জুড।

'ভালো। তাহলে আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?'

'কিসের জন্যে?'

'দৈহিক পরীক্ষা করার আগে যদি আমরা তোমার রক্ত এবং মূত্র পরীক্ষার কাজটা

সেরে নিতে পারি, তাতে সময় বাঁচবে।'

'ঠিক আছে, ছ'টার সময় চলে এসো। তোমার অফিসটাও দেখিয়ে দেবো তখন।'

'ভালো, আর একটা কথা, সেই সাদা পোশাক আর আমাকে পড়তে হবে না তো?'

'তা তুমি যদি শাড়ি না পরার প্রতিশ্রুতি দাও তো—'

'প্রতিশ্রুতি দিলাম,' বলে হাসল সোফিয়া।

'তুমি এখনো কুত্তীই রয়ে গেছো।'

'যাইহোক, আমি তোমাকে ভালোবাসি,' এই বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো সোফিয়া।

ডঃ সওয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সোফিয়া। 'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বলল সে, 'শারীরিক দিক থেকে উনি ঠিকই আছেন। তবে একটা ছোট্ট ব্যাপার আমাকে বড্ড খোঁচা দিচ্ছে, EEG'র ইলেকট্রিক এনার্জির রিডিং গত বছরের থেকে কম বলেই মনে হচ্ছে। যদিও সেটা অতি ক্ষুদ্র, তবু ওঁর ব্রেনে এনার্জি আউটপুট দৃঢ় ভাবে কম। তবে কি আমরা ওর স্ক্যান করাবো?'

'আমার তা মনে হয় না,' উত্তরে বললেন সওয়ের। মাস তিনেকের মধ্যেই এই দ্বীপে তাঁর অবস্থানের বর্ষপূর্তি হতে যাচ্ছে, আর তখনি তিনি বোকা র‍্যাটনে ফিরে যাবেন বলে স্থির করেছেন।'

একটু সময় নীরব থেকে কমপিউটারের বোতাম টিপল সোফিয়া। গত বছরের EEG রিডিং-এর সঙ্গে নতুন রিডিং-এর সুপার-ইমপোজ করল সে। আরো একটা বোতাম টিপল সে, রিডিং-এর একটা অংশ পর্দায় বড় আকারে প্রতিফলিত হতে দেখা গেলো। 'ওটা আলফা রিডিং। দেখুন, মাঝের রেখায়, সেটা কেমন ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।'

'মেড-রিসার্চের কমপিউটারে আমরা ওটা স্থানান্তর করব। তারপর দেখি নিউট্রোলোজিস্টরা এ ব্যাপারে কি চিন্তা-ভাবনা করেন।'

'হয়তো সহায়ক হতে পারে,' বলল সোফিয়া। 'কিন্তু আমার ধারণা, স্ক্যান করলে আরো বেশী নিশ্চিত হওয়া যায়।'

'তা আপনি কিসের সন্ধান করছেন বলুন তো? জিজ্ঞেস করলেন ডঃ সওয়ের।

'জ্ঞানের চেয়ে এটা আরো বেশী অনুভূতিলব্ধ,' বলল সে। 'মনে রাখবেন, আপনিই আমাকে বলেছেন, মিঃ ক্রেনি তাঁর একঘেঁয়েমি-জনিত বিরক্তি এবং নিঃসঙ্গতা বোধের কথা আপনাকে বলেছিলেন। এর প্রমাণ আমি পেয়েছি তাঁর সান্নিধ্যে যারা এসে থাকে, অন্তরঙ্গ মুহূর্তে পরস্পরের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা অভাববোধ থেকে যায়, এমন কি শারীরিক দিক থেকেও!'

'সেক্স?' জিজ্ঞেস করলেন সওয়ের।

'হ্যাঁ। শারীরিক দিক থেকে ওঁর বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও, ভেতরে ভেতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন না। এমন কি ড্রাগেও তাঁকে প্রভাবিত করা যায় না।'

'ডক্টর, আপনি কি জানেন, এক এক সময় ড্রাগে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে?'

'না, আমি ঠিক আক্ষরিক অর্থে ড্রাগের কথা এখানে বলছি না,' বলল সে। 'আর

সেই কারণেই আমি অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের কথা বলছি। আমি একজন নারী। আমি জানি একজন পুরুষ কখন সহবাস কামনা করে, আর কখনই বা তিনি সহবাসে লিপ্ত হতে চান? সেটা একই ক্রিয়া কলাপ, কিন্তু সেটা ভিন্ন ধরনের।'

'সেটা বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে,' বললেন সওয়ের। 'ওঁর ক্ষেত্রে এটার তফাত ঘটতে পারে। ওঁর একটা এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, ওঁর মনের দৃঢ়তা দিয়ে ওঁর বন্ধ্যাত্ব নিয়ন্ত্রন করা। আর এর থেকেই দেখা যায় যে, বন্ধ্যাত্ব থেকে তিনি তাঁর অক্ষমতা আলাদা করে ফেলতে পারেন, এমন কি রাগমোচনের সময় বীর্যপাত ঠেকিয়ে রাখতে পারেন তিনি। আপনি তো জানেন, সব কিছুর ভিত্তিই তিনি স্পর্শ করতে চাইছেন ঃ মেডিক্যাল, ফিজিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল, মেটাফিজিক্যাল, যোগা, সেই সঙ্গে মনটাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য তান্ত্রিকের আশ্রয় নেওয়া কোনো কিছুই বাদ দিচ্ছেন না তিনি।'

'সে তো ভালোই,' বলল সে। 'পুরুষমানুষের মাথাতেই তৃপ্তির বিকাশ ঘটে থাকে, তার পুরুষাঙ্গে নয়। আমি জানতে চাই, তাঁর ব্রেনে কি ঘটছে। তাই আমি মনে করি, স্ক্যান আমাদের কিছু ক্লু দিতে পারে।'

'এখনি আমরা কিছুই করতে পারি না,' বললেন সওয়ের। 'ওঁর জন্যে আমাদের অপেক্ষা তো করতেই হবে।'

কমপিউটার স্ক্রীনের স্যুইচ অফ করে দিয়ে বলল সোফিয়া, 'সে যাইহোক, যদি এটা কোনো সান্ত্বনার ব্যাপার হয়ে থাকে, ওঁর সঙ্গে আমার শেষ শারীরিক মিলনের সময় থেকে একটা পুরোদিনও অতিবাহিত হয়নি এখনো। অতএব মনে হয়, একটা কিছু কাজ এখনো হয়ে চলেছে, অবশ্য সে কাজ যে কি আমরা তা জানি না।'

এই সময় জুড এসে ঘরে প্রবেশ করল। তাদের দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'সন্তুষ্ট?'

'আমি তাই মনে করি,' উত্তরে বলল সোফিয়া। 'শারীরিক কোনো ত্রুটি আমরা দেখতে পাইনি' কিন্তু আমি এখনো তোমার মাথার ব্যাপারে আরো কিছু জানতে চাই। শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না,' পলকপতহীন চোখে তার দিকে তাকালো জুড।

'EEG'র রিপোর্টে তোমার মস্তিষ্কের আলোড়ন বিদ্যুত গতির মতো।'

'সেটা কি স্বাভাবিক নয়?' জিজ্ঞেস করল সে। 'হাজার হোক, আমার সব শারীরিক ক্রিয়াকলাপ মন্থর করে ফেলেছি।'

'সে আমি জানি না,' বলল সোফিয়া। তার চোখে চোখ রেখে আবার বলল, 'তোমার কি রকম মনে হচ্ছে? আগের মতো তুমি কি এখনো নিজেকে খুব আগ্রহী বলে মনে করো? আমার মনে হয় না, কয়েকটা ব্যাপারে আগের মতো তুমি আর তেমন আগ্রহী নও।'

'সত্যি কথা বলতে কি ও সব ব্যাপারে আমি আর আগ্রহী নই,' খোলাখুলি ভাবেই বলল সে। 'আগে আমি টাকার পিছনে কতোই না ছুটেছি, ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছি, এখন সে সবে একঘেঁয়েমি লাগে। আমি এখন যা করছি, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং

অনেক বেশী রোমাঞ্চকর। আমি বুঝে গেছি, চাইলে যে কেউ টাকা রোজগার করতে পারে। আমি তা চেয়েছি, আর যে টাকা আমি সঞ্চয় করেছি, তা কেউ পারবে না। তাই এ ব্যাপারে নিজেকে প্রমাণ করার আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার। অনুরূপ ভাবে মেয়েরাও, সেক্স আমার কাছে এখন একই ব্যাপার। তাদের নিয়ে অনেক খেলাই তো খেলেছি, আর নয়। এখন আমার একটাই প্রয়োজন, আমার শারীরের কলকব্জা কোনো রকমে চালু রাখলেই হলো।'

সওয়েরের দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষনেই আবার জুডের দিকে ফিরে সোফিয়া বলল, 'ভালোবাসা?'

'সে তো আবেগের ব্যাপার? তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল সোফিয়া। 'আমার মনে হয়, সেটা তোমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, শারীরিক এবং মানসিক দু'দিক থেকেই।'

'তুমি আমাকে বোকা ভেবেছ?' ডঃ সওয়েরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল জুড, 'আপনি কি ভাবেন?'

হাত তুলে উপরের দিকে তুলে সওয়ের বলে উঠলেন, 'বলতে পারবো না। আপনারা দু'জনেই এখন আমার মাথার ওপরে অবস্থান করছেন।'

সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল জুড। 'আমি কিন্তু অন্য রকম মনে করছি,' বলল সে। তোমার মতো গভীর ভাবে আমি অনুভব করতে পারি না। তবে আমি নিজের মতো করে অনুভব করতে পারি। আমার মতো করে বোঝবার চেষ্টা করো। আমি চিরজীবন বেঁচে থাকতে চাইছি, আর তা যদি সত্য হয়, আমাকে তাহলে এই কথাটাই ভাবতে হবে, তোমরা সবাই অস্থায়ী। তাই অবশ্যই তোমাদের কারোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা উচিত নয়, কিংবা ঘনিষ্ঠতা করা উচিত নয়, কারণ কুড়ি, কিংবা একশো, অথবা তারও বেশী বছর পরে তোমরা চলে যাবে, আর অন্যদের সঙ্গে আমি কিন্তু থেকে যাবো অনন্তকাল ধরে।'

'তার মানে তুমি তোমার মনোভাব গোপন করতে চাও, কারণ যাদের তুমি ভালোবাসো তাদের হারাবার ভয় আছে তোমার।' বলতে গিয়ে সোফিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

'হতে পারে,' চিন্তা করে বলল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুড। 'সম্ভবত ভালোবাসা অমরত্ব লাভেরই একটা অংশ। তুমি যাদের ভালোবাসো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তোমাকে মরে যেতে হবে।'

সোফিয়া কোনো রকমে তার চোখের জল সংবরণ করে বলল, 'তোমার যদি ছেলে-মেয়ে থাকত, তাদের সঙ্গে তুমি বেঁচে থাকতে।'

'কিন্তু আমি যে বাঁচব না,' আক্ষেপ করে বলল সে। 'যেমন আমার বাবা বাঁচেননি। কিন্তু আমি যে বেঁচে থাকতে চাই সোফিয়া।'

কমপিউটারের বোতাম টিপতেই পর্দায় ভেসে ওঠে জুডের জীবনপঞ্জী। সেদিকে স্থির দৃষ্টি রেখে নরম গলায় বলল সোফিয়া। 'কমপিউটারের হিসেব মতো তোমার পরমায়ু একশো-তিরিশ বছর। তার মানে তোমার বর্তমান উনপঞ্চাশ বছর গড়পড়তা মানুষের

একত্রিশ বছর আয়ুর সমান। অথচ আসলে তোমার আয়ু ছিলো চুয়াত্তর, যা তোমার বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। একটা ক্ষেত্রে তোমাকে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে ডঃ জ্যাবিস্কি বলতে গেলে তোমাকে হত্যাই করে বসেছেন। দীর্ঘসূত্রতার দরুন তুমি তোমার শারীরিক কর্ম ক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলতে বসেছ।'

'যদি আমাকে মরতেই হয়,' বলল সে, 'কবে, কখন মরবো সেটা কোনো ব্যাপারই নয় আমার কাছে। আমি এখন অনন্তকালের সন্ধানে।'

'অনন্তকাল বলে কিছুই নেই,' খোলাখুলি ভাবেই বলল সোফিয়া, 'এমন কি অন্য কোনো গ্রহ-তারাতেও!'

এক মুহূর্ত কি ভেবে জুড বলল, 'তোমার অনুরোধ মতো শারীরিক পরীক্ষা আমি দিয়েছি। এখন জ্যাবিস্কির নোটগুলো আগামীকাল থেকে পড়ে দেখবে?'

'হ্যাঁ, কাল সকাল থেকেই শুরু করবো।'

'ভালো। রাত নটায় নৈশভোজে আসছ তো?'

'হুঁ। ধন্যবাদ,' উত্তরে বলল সোফিয়া, 'চলি এখন।'

ডঃ সওয়েরেরও চলে যেতে উদ্যত হলেন। তাদের থামিয়ে দিয়ে জুড বলে উঠল, 'যাওয়ার আগে আপনারা দু'জনেই একটু ড্রিঙ্ক করে যান।'

কমলালেবুর জুস পান করছিল জুড। আর যথারীতি বরফ মেশানো স্কচের গ্লাসে ডঃ সওয়েরকে চুমুক দিতে দেখা গেলো, এবং সোফিয়ার বরাদ্দ সেই স্টারকা ভদকা। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই রিসিভার তুলে কয়েক মুহূর্ত কানে রেখে তারপরেই সওয়েরের হাতে তুলে দিয়ে বলল সে, 'আপনার অফিসের ফোন।'

রিসিভার নিয়ে অস্ফুটে বললেন তিনি, 'হ্যাঁ, আমি ডঃ সওয়ের কথা বলছি।'

অপর প্রান্ত থেকে তাঁর সেক্রেটারি অনুণয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত ডক্টর। আর না করেও উপায় ছিলো না। ভাবলাম, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই ফোন করলাম। ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে কেউ একজন ফোন করে জানতে চাইছিল, ডঃ আইভানসিক আমাদের কাছে আছেন কিনা। তবে আমি তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি, না, তিনি এখানে নেই। তাছাড়া, সে আরো জানতে চায়, কোথায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। আমি তাকে বলে দিয়েছি, তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই, তাই বলতে পারবো না, তিনি এখন কোথায়। তখন সে আপনাকে চাইল। আমি বলে দিয়েছি, আপনি এখন বাইরে বাইরে ঘুরছেন, কাল সকালের আগে অনেকে অফিসে ফিরছেন না। ঠিক করিনি স্যার?'

'খুব ভালো করেছো,' রিসিভার নামিয়ে রেখে জুডের দিকে তাকিয়ে সওয়ের বললেন, 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট সোফিয়াকে খুঁজছে।'

'আশ্চর্য!' এই বলে সোফিয়ার দিকে ফিরে জুড জিজ্ঞেস করল, 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট কেন যে তোমার প্রতি এমন আগ্রহী, এর উদ্দেশ্যে কি জানো?'

'এটা তোমার সরকারের ব্যাপার,' উত্তরে বলল সোফিয়া। 'আমার সম্পর্কে তোমার

সরকার কি ভাবছে না ভাবছে, আমি জানি না। এমন কি আমার সরকার আমার ওপর নজর রাখছে কি রাখছে না, তাও আমি জানি না। তবে এখানে এলে ইমিগ্রেসানের লোকেরা আমার কাছে জানতে চায়, আমি কোথায় অবস্থান করতে যাচ্ছি, উত্তরে বলি আমার গন্তব্যস্থল এখন ক্রেনি মেডিক্যাল সেন্টার, বোকা র‍্যাটন, ফ্লোরিডা।'

'ঠিক। স্টেট ইমিগ্রেসান ডিপার্টমেন্টের কাজ হলো পরে তোমার বক্তব্য মিলিয়ে দেখা। আমার সন্দেহ হয়, তাই যদি হয়, তাদের মধ্যে তুমি হয়তো একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকতে পারো, সেটা আমাকে এখন যাচাই করে দেখতে হবে।'

নৈশভোজ সারার পর সোফিয়া তার চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। 'খুব ভালো খাওয়া হলো। এবার উঠি ঘুমতে হবে।'

'তোমার কি মনে হয় ঘুম আসবে?' জুড জিজ্ঞেস করল।

'চেষ্টা করবো,' উত্তরে বলল সোফিয়া। 'আর যদি ঘুম না আসে তখন একটা পিল খেয়ে নেবো।'

'বিরক্ত হয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সোফিয়া, 'সত্যি তা নয়, এখন তোমার সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জেনে গেছি, বিষয়টার ব্যাপারে তোমার যে বিস্তারিত ভাবে জানার আর কোনো আগ্রহ নেই, সেটাও এখন আমার কাছে অজানা নয়।'

'তুমি রাগ করলে না তো?'

'না। একবার তুমি আমাকে বলেছিলে না আমেরিকানবাদ, ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ধরনের উত্তেজনার রকম-ফের।''

'সেটা আমার লাইন নয়,' বলল সে, 'সেটা ফাস্ট এডির!' আমি এখনো আগ্রহী। সঙ্গম এখনো আমার নেশা, এখনো আমি ভালোবাসি গা ভাসিয়ে দিতে, আর এখনো আমাকে সেই ইচ্ছেটাই পূরণ করতে হবে।'

'বেশ তো অ্যামারিস্থ—' বলতে শুরু করে সে।

'আমি তাকে চাই না,' জুডকে বাধা দিকে বলল সোফিয়া। 'আমি তোমাকে চাই।'

'কিন্তু অ্যামারিস্থ অত্যন্ত গুণী,' বলল জুড। 'সে তার দু'টো নরম হাত এবং একটা হাতের মুঠোয় সে তোমার অনেক কিছু ভরিয়ে দিতে পারে, এমন কি যে কোনো পুরুষের চেয়ে সে তোমার আরো গভীরে প্রবেশ করতে পারে।'

'না, ধন্যবাদ,' বলল সে। 'সে কাজ আমি আমার ভাইব্রেটার দিয়ে সেরে নিতে পারি। তাছাড়া আমার পিল তো রয়েছেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জুড। সোফিয়ার চিবুকে চুমু খেয়ে সে তার একটা হাত নিজের মুঠোয় আবদ্ধ করে বলল, 'এসো আমি তোমাকে তোমার গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।'

জুড তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র টেলিফোনটা বেজে উঠল। কন্ট্রোল প্যানেলের

বোতামটা টিপতেই দেওয়ালে লাগানো মাইক্রোফোনের স্পীকারটায় একটা ক্লিক শব্দ হতেই স্বাভাবিক গলায় বলে উঠল সে, 'ক্রেনি কথা বলছি—'

'ঘুম ভাঙ্গালাম না তো?' বলল মারলিন।

'না, না আদৌ নয়,' উত্তরে জুড বলল, 'এখন এখানে সবে তো এগারোটা বেজেছে।'

'ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা আমরা মিটিয়ে ফেলেছি,' বলল মারলিন। 'আগামীকাল ট্রান্স আটলান্টিক পাঁচশো মিলিয়ান ডলার ট্রান্সফার করছে। পরের দিনই তারা ব্যাঙ্ক অপারেশানের কতৃত্ব গ্রহন করছে।'

'বিচার বিভাগ মনোনীত করেছে?'

'সব কাজই শেষ। চারশো মিলিয়ান ফাউন্ডেসানে পাঠানর ব্যবস্থা করছি। আপনার বাকী একশো মিলিয়ান ডলার আপনি আমাদের কি করতে বলেন?'

'এর ওপর আমার দেও কর কতো?'

'আপনাকে কিছুই দিতে হবে না,' উত্তরে বলল মারলিন। 'এর পিছনে আপনার ব্যক্তিগত দু'শো বিলিয়ান ডলার লোকসান হয়ে গেছে।'

এক মুহূর্তের জন্য কি ভাবল জুড। 'ঠিক আছে। 'আমার ব্যক্তিগত ঋণ হিসেবে পঁচিশ মিলিয়ান ডলার ক্রেনি মেডিক্যালে ট্রান্সফার করে দাও, আর অবশিষ্ট পঁচাত্তর বিলিয়ান সমান ভাগে সুইজ্যারল্যান্ড এবং বাহামাতেআমার পারসোনাল অ্যাকাউন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দাও।' একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু বলার আছে?'

'ক্রেনি ইনজিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকসানের জন্য মিতসুবিশি হেভী ইন্ডাস্ট্রিজ দেড়-বিলিয়ান ডলার অফার করেছেন।'

'আমাদের বর্তমান অ্যাসেট কতো?'

'তিন বিলিয়ান ডলার। তাদের অফারের দ্বিগুন।'

একটু চিন্তা করে জুড বলল, 'তাদের বলে দাও দু'বিলিয়ান ডলারের বিনিময়ে তারা আমাদের ফার্মটা পেতে পারে।'

'এরকম বলবেন না স্যার,' বলল মারলিন। 'আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, আপনি এখন সব কিছু থেকে দায়মুক্ত হতে চান।'

'হয়তো তাই। আমার কাছে টাকার আর কোনো গুরুত্ব নেই। আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আমার আছে।'

'কিন্তু মিতসুবিশির অফার গ্রহণ করলে এক বিলিয়ান ডলার লোকসান হবে আপনার।'

ধৈর্য সহকারে সব শোনার পর জুড বলল, 'তিন বিলিয়ান ডলার পেলে আমাদের দেও করের যে বোঝা হবে, সেটাও কম কি? তার থেকে এই ভালো। এর ফলে আমরা আমাদের কিছু দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে পারবো। হয়তো আমরা তখন জীবনটাকে আরো ভালো ভাবে উপভোগ করতে পারবো।'

'ঠিক আছে,' ক্ষুন্ন মনে বলল মারলিন। 'মিতসুবিশির কাছে আপনার প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দেবো।'

'ধন্যবাদ,' বলল জুড। 'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি,' বলল মারলিন।

শয়নকক্ষের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জুড। রাতের সমুদ্রের দিকে তাকালো সে। চাঁদ তখন একটু একটু করে আকাশের ওপর উঠে গিয়েছিল। তখন তার মনে হলো, তার শরীরের ভেতরের সব কিছু যেন নিচে নেমে আসছে।

তার মনে হলো, একজোড়া পায়ের শব্দ ঘরের ভেতরে এগিয়ে আসছে। তারপর সেই শব্দ তার পাশে এসে থামল, দু'টি নরম হাত তাকে তখন পোশাকমুক্ত করতে থাকল। সরু সরু হাত দু'টো যেন তার নগ্ন দেহটা জড়িয়ে ধরল। তার কঠিন শিশ্ন এমনি দীর্ঘায়ত হয়ে ওঠে যে, সেটা তখন মেঝের ওপর থেকে মাত্র দেড়ফুট ওপরে অবস্থান করছিল। ঘরের আলোটা স্তিমিত, মোমবাতির আলোর মতো মিটমিট করছিল। সরু সরু আঙুলগুলো তার চোখের পাতাগুলোর ওপর বুলিয়ে চোখ বন্ধ করে দিতে চাইছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখের মতো আলোটা তার চোখের পাতার ওপর দপদপ করছিল তখনো, একটু পরেই পায়ের শব্দটা ঘর থেকে উধাও হয়ে গেলো। সে তখন নীরব, একা, নিঃসঙ্গ।

সে তখন তার দেহের অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করল। তার শিশ্নটা তখন নেতিয়ে পড়েছিল, তার কুঁচকির টান ছিলো না তখন ফুসফুসের ওপর তার বুকের ওঠা-নামা শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিল। একটু পরেই সে যেন তার চেতনা হারিয়ে ফেলল, শক্তিহীন হয়ে পড়ল। এবং তারপরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে অন্তহীন রাতের কোলে। তার পরিক্রমা শুরু হলো একটা গ্রহ থেকে আর একটা গ্রহে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।

পরদিন জানালা পথে সূর্যের আলো চোখে পড়তেই ঘুম ভেঙ্গে গেলো সোফিয়ার, তখন সাড়ে-ছ'টা। টয়লেটে যাওয়ার আগে ফোনে ম্যাক্সকে আঙুর, ডিমের অমলেট, বেকন এবং একটা বড় কফির পটের ফরমাস দিয়ে গেলো সে।

ব্রেকফাস্টের পরে ফোনটা বেজে উঠতেই রিসিভারটা হাতে তুলে নিলো। 'সোফিয়া!' অপর প্রান্ত থেকে ডঃ সওয়ের বলে ওঠেন, 'আশাকরি আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিইনি।'

'না, না, আগেই আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে।'

'আমার চেষ্টার সুফল পেয়েছি, যা খুবই আগ্রহ জাগানর মতো,' বললেন সওয়ের। 'একই সময়ে গত পাঁচ বছরের স্ক্যানের ওপর আমি EEG মিশ্রন ঘটিয়েছে। সেগুলো গণিতে রূপান্তর ঘটিয়েছি। এরপর সেগুলোকে আমরা কমপিউটার গ্রাফিকে তৈরী করেছি। আর সেগুলো দেখতে ঠিক মূল স্ক্যানের মতো। আমরা গতকাল যেরকমটি করেছিলাম, ঠিক সেইরকম প্রক্রিয়ায় EEG করেছি। সেগুলো খুবই আগ্রহের সঞ্চার করেছে সোফিয়া।'

'সেগুলো দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে।

'হ্যাঁ, আপনিও দেখতে পারেন,' বললেন তিনি। 'আপনার ঘরের টেলিভিসান সেট খুলুন, সেণ্ট্রাল কমপিউটারের সঙ্গে যুক্ত সেটা। এই নম্বরগুলো পাঞ্চ করুন : ৭৪৮, ৬১, ০১১, ৯৫৩। পেলেন?' সোফিয়া লাইনে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে

থাকলেন তিনি।

'পেয়েছি, কিন্তু স্ক্রীনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

'বেশ এই শব্দটা টাইপ করুন ঃ কমপিউট্রাক।'

এবার স্ক্রীনটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, পেয়েছি,' বলল সোফিয়া। 'এখন আমি কিসের জন্যে তাকাব?'

'পুরনো স্ক্যানের ওপর এই নতুন জিনিষটা আমি সুপার ইমপোজ করতে যাচ্ছি। শেষ ট্রাকের ওপর নীল রঙের ছোট্ট ট্রাকের ওপর নজর রাখুন।'

'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনি কি বলতে চাইছেন, জুডের ব্রেনটা বড় হতে পারে?' তার কথায় অবিশ্বাসের সুর।

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই। তবে ওঁর ব্রেনের ওজন দু'গ্রামের মতো বেড়ে যেতে পারে। আর সেটা যদি সত্য হয়, এর ব্যাখ্যা হলো, স্পন্দনের গতি শ্লথ হয়ে যাওয়া। আসলে উনি ওঁর স্নায়ুকোষগুলো বেশী করে ব্যবহার করছেন, তাই চাপ সামলানর জন্য ওঁর আরো বেশী স্নায়ুকোষের প্রয়োজন। তবে আমাদের সতর্ক হতে হবে, মনে রাখতে হবে, এটা এখনো একটা কমপিউটার গ্রাফিক পর্যায়, সত্যিকারের কিছু নয়। কিন্তু একটা চিন্তা আমার মনে উদয় হয়েছে। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, মিঃ ক্রেনির নিজস্ব মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের কিছু অংশ থেকে ইনজেকসান তৈরী করে ডঃ জ্যাবিস্কি তাঁর সেলুলার থেরাপি কম্বিনেসানে ইনজেকসানের সূচ ফুটিয়েছিলেন?'

'আমার জানা নেই,' বলল সে। 'এই প্রক্রিয়াটা তিনি নিজে গোপন রেখে থাকবেন। তাঁর কাজ প্রত্যক্ষ করার অনুমতি তিনি কাউকে দিতেন না।'

'এটা একটা অনুমান কিংবা ভাবনা বলতে পারেন, প্রায় স্বগোক্তি করার মতো করে বললেন সওয়ের। 'যাইহোক, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁর ওপর আমি একটা স্ক্যান করতে চাই।'

'বেশ তো, এটা ওঁকে দেখাই,' বলল সোফিয়া। 'হয়তো তিনি রাজী হয় যেতে পারেন।'

'পরে কখন ওঁর সঙ্গে দেখা করার আশা রাখেন আপনি? জ্যাবিস্কির টেপের ওপর গবেষণা করতে শুরু করছি। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে এটা তাঁকে দেখাবো।'

এবার কমপিউটারের স্ক্রীনে একটা শূন্যতা নেমে এলো। 'শুভ কামনা করি,' দূরভাষে সওয়েরের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'ধন্যবাদ,' সোফিয়া বলল, 'আপনার জন্যও আমি শুভকামনা প্রার্থনা করছি।'

জুডের চোখের পাতায় সূর্যের আলো এসে পড়েছিল। বিছানা থেকে না উঠেই চাখে মেলে মাথাটা ঘোরাতেই মেয়েগুলোকে মেঝের ওপর তার পাশে বসে থাকতে দেখল সে। এবং তারা প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল, 'সুপ্রভাত স্যার।'

'সুপ্রভাত,' ধীরে ধীরে বলল জুড।

সোনালী রোদে ঝলমল করছিল মেয়েগুলোর নগ্ন দেহ। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো তারা।

শান্ত ভাবে বিছানায় পড়ে রইল জুড। পরমূহূর্তেই তার মনে হলো, তার দেহটা কাঁপছে। নড়ল না সে তার চোখও ফেরাল না।

স্ট্র্যাপলেস সাদা পোশাকে তার দিকে তাকাল অ্যামারিস্থ. তার চোখে গভীর দৃষ্টি এবং ভিজে-ভিজে। আর একবার কেঁপে উঠে মেয়েটির দিকে তাকাল সে।

'তুমি অনেক উঁচুতে ভ্রমন করে এসেছো. তোমার যাত্রাপথ বরফে ঢাকা ছিলো, তাই তুমি এমন ভাবে কাঁপছ,' বলল অ্যামারিস্থ। 'এসো, আমার ভেতরের আগুন দিয়ে তোমাকে তপ্ত করে তুলি।'

নিঃশব্দে অ্যামারিস্থের চোখে চোখ রাখল সে। সে দেখল অ্যামারিস্থ তার উত্থিত শিশ্ন তার এক হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অপর হাতের আঙুল দিয়ে চারপাশে বোলাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তেমনি নীরব রইল সে।

'খাড়াই তালগাছের মতো এখন তোমার ক্ষমতা তুঙ্গে, আমার আঙ্গুলগুলোর বেষ্টনে এটা এখন বিস্ফোরণের অপেক্ষায়,' জুডের কোবাল্ট-ব্লু চোখ দুটির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বলল অ্যামারিস্থ, 'প্রভু, দয়া করে তোমাকে সেবা করার অনুমতি আমাকে দাও।'

কথা বলল না জুড।

আর কোনো কথা নয়, অ্যামারিস্থ এবার তার কাজে মন দিলো। এবার তার পোশাকটা পা থেকে কোমর পর্যন্ত তুলে অর্ধনগ্ন দেহে বিছানায় উঠে তার দেহের দু'পাশে দু'টো পা ছড়িয়ে হাঁটু মুড়ে বসল। তখনো সে তার হাতের মুঠোয় জুডের শিশ্ন চেপে ধরে তাকে তার গভীরে প্রবেশ করার কাজে নির্দেশ দিতে থাকে। তার কোমরটা তখন উন্মত্তের মতো উত্তোলিত। 'প্রভু! প্রভু!' তার আর্ত চিৎকার শোনা যায়। 'আমাকে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরো। দয়া করে আমাকে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরো!'

তারপরেই জুডের চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে তার ভুল ভেঙ্গে গেলো। ভাসা ভাসা চোখ জুডের, তার দিকে নজরই নেই তখন। সে তখন বেশ বুঝতে পেরে গেছে, কোনো ভাবেই সে তাকে উত্তেজিত করতে পারেনি, তার সব চেষ্টা তখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত। 'প্রভু, এ তুমি কি করলে প্রভু। পুরুষের ধর্ম তুমি পালন করলে না? আমার নারী জীবন তুমি এ ভাবে ব্যর্থ করে দিলে?' চোখের জলে তার চিবুক ভেসে গেলো। ধীরে ধীরে জুডের ওপর থেকে নেমে এলো সে। তখন জুডের সেই কাঠিন্য আর নেই, তালগাছের সেই খাড়াই ভাবটা তখন হারিয়ে গেছে, প্রবল ঝড়ে বৃক্ষ-পতনের মতো অবস্থা তখন। অ্যামারিস্থ তার বিছানার পাশে বসে হতাশ গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত প্রভু, তোমাকে খুশি করতে না পারার জন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।'

তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে জুড এবার তার কপালে চুমু খেয়ে নরম গলায় বলল, 'বৎসে, তুমি কেন দুঃখিত হতে যাবে, তুমি আমাকে যথেষ্ট ভাবে খুশি করেছো। বরং আমিই তোমাকে খুশি করতে পারলাম না। তোমার নারীদেহ অনুর্ব্বরই থেকে গেলো।' তারপর বিছানার ওপর উঠে বসে অ্যামারিস্থকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে সে আরো বলল, 'আমার স্নানের আয়োজন করো। জলে তুমি আমি দু'জনে এক সাথে বাচ্ছা ছেলে-মেয়ের মতো জল কেলি করবো।'

'কিন্তু প্রভু, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, কখনো তুমি আমার মধ্যে প্রবেশ করলে না, কেন বলো তো?

'তাতে কি এসে যায় বৎসে, এই তো ভালো!' তার বুকের মধ্যে অ্যামারিস্থের পুরুষ্টু স্তনজোড়া নিষ্পেষিত করতে করতে বলল সে। 'কেন জানো, সেই ভাবটাকে যদি আমি প্রশ্রয় দিই, মৃত্যু আমাকে রেহাই দেবে না।'

'জানো প্রভু, আমাদের মাটিতে,' বলল অ্যামারিস্থ, 'আমরা বিশ্বাস করি, শিশুদের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।'

'এ আর এক জগত, আর এক দেশ,' ধীরে ধীরে বলল সে।

জুড তার প্রাইভেট অফিসে ঢুকেই তার ডেস্কের ওপর কমলালেবুর জুসের গ্লাস দেখতে পেলো। তখন বেলা এগারোটা। তার মুখটা কেমন থমথমে, ঘর্মাক্ত। এমন কি তার সাদা জগিং স্যুটে ঘামের দাগ দেখা যাচ্ছিল। কমলালেবুর জুসে চুমুক দিয়ে সে তার কমপিউটারের বোতাম টিপতেই কমপিউটার সেন্ট্রাল থেকে কয়েকটা জরুরী বার্তা পর্দায় ভেসে উঠতে দেখা গেলো ঃ মারলিন, সিকিউরিটি কন্ট্রোল ডাইরেক্টার, ডঃ সওয়ের, তার মা বারবারা, ব্রেজিলের ডঃ স্কোয়েনবার্ন।

আরো দু'টো নম্বর পাঞ্চ করল সে। প্রথমেই স্কোয়েনবার্নকে আহ্বান করল। তালিকায় তাঁর নামটাই সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কলটা তার নিজস্ব ক্রেনি স্যাটেলাইট মারফত স্থাপিত হল। পর্দায় ডঃ স্কোয়েনবার্নের মুখ ভেসে উঠতে দেখা গেলো। 'ডঃ স্কোয়েনবার্ন?' জিজ্ঞেস করল সে।

জার্মান ডক্টর মৃদু হেসে বললেন, 'মিঃ ক্রেনি, আপনার জন্য একটা ভালো খবর আছে। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টার এখন প্রায় তৈরীর মুখে। নির্ধারিত সময়ের দু'সপ্তাহ আগেই চালু হয়ে যাবে।'

'আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন ডক্টর,' বলল জুড, 'তা ঠিক কখন সেটা সম্পূর্ণ হবে বলে মনে হয়?'

'এখন থেকে দু'মাস, খুব বেশী হলে দশ সপ্তাহ পরে,' বললেন ডঃ স্কোয়েনবার্ন। 'এই সময়ের মধ্যে বাকী সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। বকেয়া কাজের মধ্যে অন্যতম হলো, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টারের চারপাশে উঁচু উঁচু গাছগুলোর যত্ন নিতে হবে এমন ভাবে, যাতে করে সেটা চাপা পড়ে যায়, দূর থেকে কেউ সেটার অস্তিত্ব বুঝতে না পারে।'

'ঠিক আছে, দেখবেন আমি ছাড়া অন্য কেউ যেন তাতে অগ্নি সংযোগ না করে।' বলল জুড। একটু সময়ের জন্য বুঝতে কেমন ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো দেখালো। 'জানাডু, প্রোজেক্ট,' প্রায় নিজের মনে বলল সে। 'আজ প্রায় তিন বছর হলো।'

'ঠিক বলেছেন মিঃ ক্রেনি,' উত্তরে বললেন স্কোয়েনবার্ন। 'জানাডু নামের তাৎপর্য আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। তারপর কবিতাটি পড়ে বুঝতে পারলাম। কিন্তু আপনার স্বপ্ন কুবলাই খানের থেকেও শ্রেষ্ঠ।'

'এখন থেকে সাপ্তাহিক রিপোর্ট আমাকে পাঠাতে হবে।'

'অবশ্যই মিঃ ক্রেনি।' নিজের মতন হাসলেন স্কোয়েনবার্ন। 'এই প্রোজেক্ট যে এখানে রয়েছে, কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। বিশ্বে এটা একটা সব থেকে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার এনার্জি প্ল্যান্ট আমাজান জঙ্গলের গভীরে গড়ে উঠছে, যার হদিশ কেউ পাবে না। মিঃ ক্রেনি, আপনার উদ্ভাবনী শক্তিতেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর এও বিশ্বাস হয় না, এত বড় এটা প্ল্যান্ট এমনি স্বয়ংক্রিয় যে সেটা চালনা করার জন্য কেবল মাত্র একজন লোকেরই প্রয়োজন হবে।'

'আপনার নিজের প্রতিভা এবং কাজকে অমন ছোট করে দেখার চেষ্টা করবেন না ডঃ স্কোয়েনবার্ন। হয়তো আমার মতো একদিন সারা বিশ্ব এর প্রশংসা করবে,' বলল জুড।

'ধন্যবাদ মিঃ ক্রেনি,' এই বলে একটু ইতস্তত করলেন ডঃ স্কোয়েনবার্ন।

জুড আবার নিজের থেকেই বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার কদর জানাতে গিয়ে বলল, 'আজ সকালে আপনার সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পাঁচ মিলিয়ান ডলার ট্রান্সফার হয়ে যাবে। আমি যখন রিঅ্যাক্টর চালু করার জন্য বোতাম টিপবো, তখন আরো পাঁচ মিলিয়ান ডলার পাবেন।'

'ধন্যবাদ মিঃ ক্রেনি,' কমপিউটারের পর্দায় ডঃ স্কোয়েনবার্নকে প্রায় নতজানু হয়ে যেতে দেখা গেলো।

'গুডবাই ডঃ স্কোয়েনবার্ন,' বলল জুড।

এর পরেই সিকিউরিটি কন্ট্রোলের বোতাম টিপলো জুড। লোকটা সব সময় সতর্ক থাকে। 'স্যার। আপনি একটা অসুবিধেয় পড়েছেন?'

'ঠিক আছে, বলে যাও জন, আমি শুনছি।'

'আমাদের লেডি ডক্টর আবার ঝামেলায় পড়েছে,' বলল জন, 'যুগোস্লাভিয়া, চায়না এবং কিউবানদের ভাড়া করা মাফিয়া আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার মানে লেডি ডাক্তারের এখন কঠিন সময় যাচ্ছে।'

'বুঝতে পারছি জন, কিন্তু এখন কেন? বাংলাদেশে সে প্রায় তিন তিনটে বছর ছিলো, সেই সময় তারা চাইলে যে কোনো সময়ে তাকে তারা খতম করতে পারতো।'

'আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, তাদের ধারণা, টপ সিক্রেট কিছু নথীপত্র চুরি করে থাকবে সে। সম্প্রতি সেই নথীপত্রগুলো উধাও। উধাও হওয়া নথীপত্র সেই সব, আমার অন্তত সেই রকম অনুমান।'

'তবে কি সেই নথীপত্রের ফাইল, যেটা ডঃ জ্যাবিস্কি আমাকে দিয়েছিলেন?' বলল জুড।

'না সেগুলো নয়। সেই ফাইলের কথা তারা জানে। আমার ধারণা আপনি সেই ফাইলের একটা অংশ মাত্র পেয়ে থাকবেন। আপনাকে সেই ফাইল দেওয়ার সময় ডঃ জ্যাবিস্কিকে তারা বাধা দেয়নি এই আশা করে যে, ডঃ আইভানসিককে আপনি তাঁর কাছে ফেরত পাঠানর ব্যবস্থা করবেন।'

একটু সময় চুপ করে থেকে বলল জুড, 'বাকী নথীপত্রগুলো গেলো কোথায়?'

'আমার মনে হয়, সেগুলো আইভানসিকের কাছে আছে। তা না হলে আপনার ওই লেডি ডাক্তারের ওপর কেনই বা তারা এতো রেগে যাবে?' মুহূর্তের জন্য থেমে জন আবার বলল, 'আমার মনে হয়, ক্রেনি দ্বীপে নিরাপত্তা আরো কঠোর করা উচিত। কারণ এই দ্বীপে তাঁকে খুঁজে বার করতে খুব বেশী দেরী তাদের হবে না।'

'ডঃ সওয়ের জানেন?'

'না, তিনি এখনো এ খবর পাননি,' বলল জন। 'আপনি আমার বস, তাই আপনাকেই প্রথম খবরটা দিলাম।'

'ভালো। খবরটা তাঁকে দিও না,' বলল জুড। 'আমি তাঁকে নার্ভাস হতে দিতে চাই না।'

'ঠিক আছে স্যার,' বলল জন। 'আর ক্রেনি দ্বীপে নিরাপত্তার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবো?'

'আমি চাই, প্রতিদিন দ্বীপের আকাশে চব্বিশ ঘন্টা ধরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হেলিকপ্টার উড়ে বেড়াক, সমুদ্রে আটটা স্পীড লঞ্চ ছড়িয়ে দাও, আর দ্বীপের মাটিতে আমাদের সব থেকে ভালো কুড়িটা বন্দুকবাজদের নিয়োগ করো, সাত-দিন পালা করে পাহারা দেবে তারা, বুঝলে?'

❑ তিন ❑

দূরভাষে সোফিয়ার কণ্ঠস্বর মোটেই মৃদুভাষ বলা যায় না, রুক্ষ, ক্রুদ্ধ। 'সেই বৃদ্ধা কুত্তী আমাদের সবাইকে ফাঁসিয়ে গেছে সে।'

তার কানের কাছে দূরভাষে জুডের ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর। 'তা এর মধ্যে নতুনত্বই বা কি আছে?'

'তোমার নিরুত্তাপ কথা শুনে মনে হচ্ছে,' বলল সোফিয়া, 'হয়তো আমার বক্তব্য তুমি ঠিক অনুধাবন করতে পারোনি। সব কিছুর উত্তর পাওয়ার পরিকল্পনাই ছিলো না তার।'

'আমি বোকা নই, সে কথা আমি জানি। আর কেন যে তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি, বুঝতে পারছো না? ভেবেছিলাম, কিছু কিছু উত্তর তোমার জানা আছে। রাশিয়ান ফাইল থেকে কিছু টপ সিক্রেট নথীপত্র তুমি চুরি করো নি?'

'তুমি জানলে কি করে?'

'এখন সেটা না জানা কোনো ব্যাপার নয়,' বলল জুড। 'প্রাচ্যের অর্ধেক দেশ এখন তোমার পিছু নিয়েছে। আমার আশ্রয় ছাড়া তোমার এখন নিরাপদ জায়গা বলতে কিছু নেই।'

'এই কথাটাই কি স্টেট তোমার কানে ঢুকিয়েছে?'

'আংশিক ভাবে। এখন বলো, তোমার ফাইলগুলোর খবর কি?'

'পাবে,' উত্তরে বলল সোফিয়া, 'কিন্তু সেগুলোই যথেষ্ট নয়। তৃতীয় একটা ফাইল

অবশ্যই থেকে যায়। আমার অনুমান, সেটা যে কোথায় থাকতে পারে আমি জানি।'

'আমাকে বলো,' দরাজ গলায় বলল জুড। 'কার কাছে?'

'তোমার ফাইলে একজন ভারতীয়র উল্লেখ আছে। অথচ তা তার রাশিয়ান ফাইলে সে কখনো উল্লেখ করেনি। ১৯৫৩ সাল থেকে পরবর্তী সময়ের সব কিছুই তোমার ফাইলে কভার করা আছে। রাশিয়ানদের কাছে তোমায় ফাইলের সব কিছু থাকলেও ভারতীয়র উল্লেখ বলতে কিছু নেই। তাদের ফাইলে উল্লেখ করতে হলে ১৯৪৪ সালে ফিরে যেতে হয়, যখন তারা একটা জার্মান এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাবরেটারি দখল করে বসে, ডঃ জ্যাবিস্কি তখন সেখানে কাজ করতেন।'

'জার্মানদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন?' অবাক হলো সে।

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বলল সে। 'তা এতে অবাক হওয়ার কি আছে? কেন তোমার লোকেরা জার্মান রকেট বিজ্ঞানীদের ধরে তোমার স্টেটে নিয়ে আসেনি?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' অধৈর্যভাবে খোঁচাটা হজম করে বলল সে, 'তা তুমি আমাকে কি বলার চেষ্টা করছ বলো?'

'রাশিয়ানরা তাঁর নিজস্ব এবং অন্য কিছু নথীপত্র পেয়ে থাকবে। কিন্তু যে ভাবেই হোক, ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সালের নথীপত্রের সন্ধান তারা কখনো পায়নি। তিনি তাদের বলেছিলেন, সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীকে, যাকে নাজিরা অনার্য বলে মনে করতো। কিন্তু আমি মনে করি, রাশিয়ানরা সেখানে যাওয়ার আগেই ফাইল সমেত তার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন সেখানে। আমার আরো মনে হয়, সেই ভারতীয় বিজ্ঞানী স্টাফ ডাক্তার ছিলেন না। যে ভাবেই হোক, ডঃ জ্যাবিস্কির নিজের এক্সপেরিমেন্টের সাফল্য কামনা করে থাকবেন তিনি। আর সেই কারণেই তিনি তাঁকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।'

'অন্যাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল?'

'যে সব রাশিয়ান ফাইলগুলো থেকে আমি অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্টের তালিকা করেছিলাম, সেই সব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সেগুলোও কবরস্থ করা হয়।' একটু সময়ের জন্য কি ভেবে বলল সে, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, তিনি ছিলেন একজন শক্ত মহিলা। তবে সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা অসাধারণ প্রতিভাও ছিলে বৈকি! আর একমাত্র তোমাকেই তিনি বিশ্বাস করতেন।'

'কিন্তু সর্বোত ভাবে নয় বলেই আমার মনে হয়,' বলল জুড। 'তা না হলে অসম্পূর্ণ ফাইল আমাকে দিতেন না তিনি।'

'মনে হয়, কিছু ফাইল রাশিয়ানদের হাতে চলে যায়। আর তিনি জানতেন না, কিসের প্রয়োজনে সেই ফাইলগুলো তারা ব্যবহার করবে। তিনি মনে করতেন পৃথিবীতে একমাত্র তোমাকেই সেই শক্তির সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত বলে বিশ্বাস করা যায়।' এখানে একটু থেমে সে আবার বলল,' 'এখন তোমার কি বলার আছে বলো?'

'এর আগে আমার কাছে পৌঁছনর চেষ্টা তুমি কেন করোনি?'

'হ্যাঁ, একবার আমি করেছিলাম বৈকি! কিন্তু তখন আমার হাতে যথেস্ট সময় ছিলো

না তাই তোমার সন্ধান পাইনি। আমাকে ফিরে যেতে হয়েছিল। তখনো আমি ব্রেজনেভের চিকিৎসক। তাঁর মৃত্যুর পর আমাকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। একটা চিলিড্রেনস ক্লিনিকে শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যের ওপর গবেষণার কাজ করার জন্য। তারপর তোমার বার্তা পাওয়ার দিনই মাঝ রাতে বাংলাদেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছি। আর যদি আমি পরদিনের জন্য অপেক্ষা করতাম, তা হলে তারা তোমার বার্তার খবর পেয়ে যেতো, এবং আমাকে খতম করে ফেলত। তাদের কাছে আমি এমনি প্রয়োজনীয় ছিলাম।'

কথা বলতে গিয়ে শেষ দিকে বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল সোফিয়াকে। তেমনি ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'মনে হয় যা বলার সবই আমি বলে ফেলেছি। এখন আমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারি। এমন কি যদি আমার অসময়ে মৃত্যুও হয়, এইসব ফাইল থেকে তুমি তোমার উত্তরগুলো পেয়ে যাবে অতি সহজেই।'

'তোমার জীবতকালেই ফাইলগুলো আমি দেখতে চাই,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল জুড। 'এখন তোমাকে আমি আর হারাতে চাই না সোফিয়া।'

'সত্যি, সত্যি তুমি তাই মনে করো প্রিয়তম?' সোফিয়ার কণ্ঠ থেকে একটা আবেগ কম্পিত উচ্ছ্বাস ঝরে পড়তে দেখা যায়।

'কেন, এ কথা আমি তোমাকে আগে কখনো বলিনি?' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল সে। 'এখন তোমার অফিসঘরে গিয়ে কাজ শুরু করে দাও। আর শোনো, যতক্ষণ না আমার গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো, দরজা খুলো না।'

টেলিফোনের একটা যান্ত্রিক আওয়াজ তার কানে বাজতেই ধীরে ধীরে রিসিভারটা তুলতে যাবে সোফিয়া, তখনই দরজায় মৃদু টোকা মারার শব্দ তার কানে ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হলো সে, হাতব্যাগ খুলে বিশেষ ভাবে তৈরী স্নাব-নোজড্ ম্যাগনাম বার করে দু'হাতে চেপে উঁচিয়ে ধরল সে। 'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ডক্টর, আমি ম্যাক্স।' দরজা ভেদ করে তার কণ্ঠস্বর ঘরে প্রবেশ করল। 'শুনুন ম্যাডাম, মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেওয়ার জন্য মিঃ ক্রেনি আপনাকে তাঁর অফিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।'

ঘরের দরজা খুলে যায় অতঃপর। আগন্তুককে তার কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে দেখল সোফিয়া, মনে হলো কিছু একটার সন্ধান করছে সে, আর সেটা যে কি হতে পারে তার অজানা থাকার কথা নয়। ওদিকে সোফিয়ার হাতে বন্দুক দেখা মাত্র লোকটার মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। সেটাই তার প্রথম এবং শেষ দেখা। অত্যন্ত ভারি ক্যালিবারের বুলেট তাকে দরজা পথ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল করিডরে। তার সাদা কোট চুঁইয়ে বুকের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকল। তার দেহটা মুহূর্তের জন্য একবার কেঁপে উঠতে দেখা গেলো, এবং তারপরেই এলিভেটারের দরজার সামনে মেঝের ওপর তার ভারি দেহটা আছড়ে পড়ল। একটা বিস্ফোরণের মতো বুলেটের আওয়াজটা করিডরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকল।

তখনো অফিসেই দাঁড়িয়েছিল সোফিয়া, বন্দুকটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল তার হাতে।

ওদিকে করিডরে সম্মিলিত কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ তার দিকে এগিয়ে আসছিল। আর তারপরেই এলিভেটারের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেলো।

প্রথমে এলিভেটার থেকে বেরিয়ে এলো ফাস্ট এডি, তার হাতে বড় সাইজের কোল্ট রিভলবার। হাঁটু মুড়ে মৃত ম্যাক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপরেই সিকিউরিটি গার্ডরা ছুটে এলো। তাদের সবার পিছনে পিছনে এলো জুড।

জুডও ম্যাক্সের মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর সোফিয়ার দিকে এগিয়ে গেলো। সোফিয়ার মুখের থমথমে ভাবটা তার দৃষ্টি এড়াল না। সে তার হাতটা সোফিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলো এবং তার হাত থেকে ম্যাগনামটা তুলে নিলো নিজের হাতে। 'ভেবেছিলাম, আমরা বুঝি তোমাকে রক্ষা করতে পারলাম না,' নরম গলায় বলল সে।

তার দেহের মধ্যে একটা টান টান ভাব, চোখ থেকে ভয় উধাও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, 'শোনো জুড, যদি আমরা চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকতে চাই, আমার ধারণা, এই ভাবেই আমাদের চলতে হবে।' কথা বলতে গিয়ে তার ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'ওরা কিন্তু আমার পিছনে ঘুরছে না,' বলল জুড।

'জীবনের ধারা বদলে দেওয়ার ক্ষমতা বুলেটের আছে,' বলল সোফিয়া। 'তাই প্রত্যেককেই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতেই হয়।'

ম্যাগনামের ব্যারেলটা ওপর দিকে তুলে বুলেটগুলো জুড তার হাতের তালুতে পড়তে দিলো। সেখানে চারটি বুলেট এবং দু'টি খালি কার্তুজ ছিলো। বুলেটগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে বলল সে, 'এই বন্দুকটার সব কিছুরই একটা বিশেষত্ব আছে। এটা তুমি কোথথেকে পেয়েছো?'

'KGB'র কাছ থেকে' উত্তরে বলল সে। 'বছর দশেক আগে পাওয়া, কিন্তু আজই প্রথম ব্যবহার করলাম।'

বন্দুকটা ফেলে দিয়ে সে তার জ্যাম্পস্যুটের পকেটে বুলেটগুলো চালান করে দিলো। করিডর তখন সিকিউরিটি গার্ডে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ফাস্ট এডির দিকে তাকিয়ে বলল জুড, 'চলো আমার অফিসে ফিরে যাওয়া যাক।' সোফিয়াও অনুসরণ করল তাদের।

এলিভেটারে প্রবেশ করে বোতাম টেপার আগে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সিকিউরিটি গার্ডের উদ্দেশে বলে উঠল জুড, 'তোমাদের মধ্যে সেকসান চীফ কে?'

'আমি মিঃ ক্রেনি,' ধূসর চুলের বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী লোকটি জবাবে বলল, 'অফিসার কারলিন আমার নাম।'

'অফিসার কারলিন, এ সব জঞ্জাল তাড়াতাড়ি সাফ করে ফেলুন। তারপর ডঃ আইভানসিকের কটেজে একটা টিম পাঠিয়ে ওঁর সব জিনিষপত্তর আমার অ্যাপার্টমেন্টে আনার ব্যবস্থা করুন।'

'হ্যাঁ স্যার, তাই করবো,' উত্তরে বলল কারলিন। 'আমি দুঃখিত মিঃ ক্রেনি। আগে থেকে আমাদের কাছে কোনো সতর্কবার্তা ছিলো না।'

'না অফিসার কারলিন, এটা তোমার কোনো দোষ নয়,' বলল জুড। 'যাইহোক,

সিকিউরিটি কন্ট্রোলের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি আলোচনা করবো।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি মিঃ ক্রেনি,' শান্তভাবে বলল সিকিউরিটি ডাইরেক্টার জন, 'এই দ্বীপ ছেড়ে আপনাকে চলে যেতেই হবে। এ অবস্থায় এখানে আপনাদের নিরাপত্তার রক্ষার আর কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না।'

লাইব্রেবিরর চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো জুড। জনের পাশে বসেছিল মারলিন। সোফিয়া এবং ডঃ সওয়ের একটা কৌচে এবং বার কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফাস্ট এডি। জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়াল জুড রাতের আকাশ দেখবার জন্য। নীল সমুদ্রের ওপর একটা ঘন কালো আস্তরন, চাঁদটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল মেঘের আড়ালে।

'জানি না, ওই দু'জন লোক কি করেই বা আমাদের সিকিউরিটি স্ক্রীনটাকে ধোঁকা দিলো,' জন বলতে থাকে। 'কটেজে তাদের ব্যবহৃত কোনো জিনিষই পাওয়া যায়নি। আমাদের অনুমান, তারা তাদের হাভানার লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। FBI'র ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেকর্ড থেকে জানা যায়, দশবছর আগে আমেরিকায় পাঠানো উদ্বাস্তুদের হাতের ছাপের সঙ্গে তাদের হাতের ছাপ সনাক্ত করা গেছে।' ক্ষমা চাওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় তার চোখে মুখে।

তার পানে তাকাল জুড, ভাবলেশহীন দৃষ্টি। 'এখানে আমার আরো তিন মাস থাকা দরকার।'

সোফিয়া উঠে দাঁড়িয়ে তাকালো জুডের দিকে। 'তাহলে আমাকে ফিরে যেতে দাও,' বলল সে। 'ওরা আমাকেই চায়। আমি চলে গেলে তোমার ব্যাপারে ওরা আর মাথা ঘামাতে আসবে না।'

'ভুল করছো তুমি,' প্রতিবাদ করে উঠল জুড। 'তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলে তুমি যে এখানে আসবে, এ খবরে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করার অনেক আগে থেকেই কেন তারা এই দ্বীপে তাদের গুপ্তচর ছড়িয়ে দিতে গেলো? তাই এর থেকে আমার পরিস্কার ধারণা, হয় তারা আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের কিংবা একসঙ্গে দু'জনকেই খতম করতে চায়।'

'মিঃ ক্রেনির সঙ্গে আমি একমত,' জুডকে সমর্থন করতে গিয়ে বলল জন। 'আর একটা কথা ডক্টর, ব্যাপারটা আপনার এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেছে।'

'এমন কি যদি আমি আমার সব ফাইল তাদের হাতে তুলে দিই?' বলল সোফিয়া।

'তাহলেও তারা কি ভাববে জানেন?' বলল জন। 'সব ফাইল তারা ফেরত পায়নি, কিছু ফাইল আপনি রেখে দিয়েছেন আপনার নিজের কাছে।'

এবার সোফিয়া হতাশ হয়ে জুডের দিকে ফিরে তাকালো। 'আমি দুঃখিত জুড।'

'এর জন্য তোমার দুঃখিত হওয়ার কি আছে?' তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল জুড। 'ভুলে যেও না, আমিই তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি।' তারপর ডঃ সওয়েরের দিকে ফিরে তাকালো সে। 'সমস্ত যন্ত্রপাতি জানাডুতে স্থানান্তর করতে কতো সময় লাগতে পারে?'

এক মুহূর্ত কি ভেবে সওয়ের বললেন, 'এখানে যন্ত্রপাতিগুলো খুলে ফেলতে দু'সপ্তাহ,

এক সপ্তাহ স্থানান্তর করতে, তারপর জানাডুতে সেগুলো আবার নতুন করে সাজাতে আরো দুই কি তিন সপ্তাহ লাগতে পারে।'

'তার মানে দেড় মাস?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'

'জানাডু?' হতবাক সোফিয়া জুডের দিকে তাকাল।

'সময় হলেই তোমাকে সব খুলে বলবো,' সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করল জুড। 'এই দ্বীপটা গড়ে তোলার সময় জ্যাবিস্কির পরামর্শ ঠিক হয়নি। তিনি তাঁর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে এখানে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর স্থাপন করতে বলেছিলেন এই ভেবে যে, তাঁর নিজের ক্লিনিকের মতো উপকূল থেকে তিন মাইল দূরে থেকে এখানকার গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা যথেষ্ট ভাবে রক্ষা করা যাবে। কিন্তু তাঁর ধারণা যে কতো ভুল এখন বোঝা যাচ্ছে প্রথমে ওঁর মতো আমিও ভুল করেছিলাম।'

'আর তাই কি তুমি আর একটা কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছিলে?'

নীরবে মাথা নেড়ে জনের দিকে ফিরল সে। 'তাহলে আরো দু'সপ্তাহ এখানে আমাদের থাকা উচিত?'

'না, কখ্খনোই নয়!' দৃঢ়স্বরে বলল জন। 'এখান থেকে আপনাকে চলে যেতেই হবে, তবে খুব গোপনে। কেউ যেন জানতে না পারে, কবে, কখন, কোথায় আপনি গা ঢাকা দিচ্ছেন!'

'আর বিজনেসের কি হবে?' তাদের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল মারলিন।

'আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো। এরই মাঝে মেডিক্যাল এবং ততসংলগ্ন কোম্পানিগুলো ছাড়া অন্য যাবতীয় সব কোম্পানির কাজ-কারবার অবশ্যই গুটিয়ে ফেলতে হবে।'

'আপনি কি এ ভাবে চার বিলিয়ান ডলার উড়িয়ে দিতে চাইছেন?' মারলিন জিজ্ঞেস করল।

'একজন মৃত ব্যক্তির কাছে চার সেন্ট আর চার বিলিয়ান ডলারের মধ্যে তফাতটা কোথায়?' উত্তর দিয়ে জুড এবার জনের দিকে ফিরে বলল, 'কাজ শুরু করে দিন, আগামীকালই এই দ্বীপ ছেড়ে আমি চলে যেতে চাই। এখান থেকে আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল হবে ওয়াশিংটন ডিসি। হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করাটাই এখন আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'আপনার ওপর আমি একটা CAT স্ক্যান করাতে চাই,' ডঃ সওয়ের বললেন। 'তার ব্যবস্থা ওয়াশিংটনে করা যেতে পারে। মাত্র দশ মিনিট সময় লাগবে।'

'ঠিক আছে আমার ওপর প্রয়োজনীয় সব টেস্ট আর এক্সপেরিমেন্ট করিয়ে নিও।'

'ভালো,' বলল সোফিয়া। 'মনে হচ্ছে তুমি তোমার নিজের ওপর অনেক এক্সপেরিমেন্ট করিয়েছ।'

জুড তার ঘড়ির দিকে তাকাল। 'এখন রাত একটা। মনে হয়, এখন আমাদের সবার বিশ্রাম নেওয়া দরকার। কাল সকাল সাতটায় আবার আমাদের দেখা হচ্ছে, কেমন?'

অন্যরা সবাই জুডকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলেও সোফিয়া এবং ফাস্ট এডি লাইব্রেরিতে রয়ে গেলো। 'ফাস্ট এডি তোমাকে তোমার ঘরটা দেখিয়ে দেবে।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল সোফিয়া। 'মেয়েগুলোর কি হবে?'

'তারা তাদের ঘরে ফিরে যাবে।'

'কিন্তু অ্যামারিন্থ? সে তোমাকে ভালোবাসে।'

সোফিয়ার চোখ চোখ রেখে বলল জুড, 'আমাদের নিজেদের বেঁচে থাকার অনেক সমস্যা। বাড়তি বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

'বাড়তি বোঝা?' সোফিয়া অবাক হল। 'সেও তো মানুষ! বিপদে পড়লে প্রথমে তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে, কারণ সে নির্দোষ এবং তার নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই এখানে।'

'খুব দুঃখ পাবে সে। তার বোঝবার ক্ষমতা নেই। কাঁদবে সে।'

তার নীল চোখের দৃষ্টি আরো গভীর হলো। ভাবলেশহীন চোখে সোফিয়ার সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হলো। 'আর যদি আমি তার মৃত্যুর কারণ হই, আমার কান্না তার থেকেও বেশী হবে তখন।'

দূরদর্শনের পর্দায় স্থির দৃষ্টি রেখে বারবারা বলে উঠল, 'সময় যেন তার জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমি জানি তার বয়স এখন উনপঞ্চাশ, কিন্তু তাকে এখন দেখাচ্ছে ঠিক চল্লিশের মতোন।'

সোফিয়ার দৃষ্টিও স্থির নিবদ্ধ পর্দার ওপর। 'শারীরিক দিক থেকে হয়তো তার বয়স কম দেখাচ্ছে, কিন্তু তার ভেতরটা সম্পূর্ণ আলাদা, মানসিক এবং মনস্তত্ত্বের উভয় দিক থেকেই।'

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করার দৃশ্য লক্ষ করল বারবারা। তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে হোয়াইট হাউসের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। আর তখনি সাংবাদিক এবং ক্যামেরাম্যান ঘিরে ধরল জুডকে।

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এটা আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার,' সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলল সে। 'কোনো বিজনেসের ব্যাপার আমাদের আলোচনা হয়নি।'

'আপনার ক্রেনি ইনজিনিয়ারিং অ্যান্ড কন্সট্রাকসান কোম্পানি জাপানিদের কাছে বিক্রী করে দেয়া এবং অন্য সব কোম্পানির কাজ করবার গুটিয়ে ফেলা, এ সব ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেন নি?'

'না,' উত্তরে বলল জুড। 'আর প্রেসিডেন্টও এ ব্যাপারে তাঁর কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি। এসব ব্যাপার দেখাশোনা করার ভার আমি আমার লিগাল ডিপার্টমেন্ট এবং জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।'

'শুনেছি, আপনার ব্যবসাপত্তর সব গুটিয়ে ফেলার জন্য,' আর একজন সাংবাদিক বলল, 'ফাইন্যানসিয়াল কমিউনিটি খুবই উদ্বিগ্ন।'

'কিন্তু কেন যে তারা উদ্বিগ্ন, কারণ বুঝতে পারছি না আমি। সব কোম্পানির মালিক

আমি নিজে, কারোর কাছ থেকে আমি ঋণ নিইনি। তাছাড়া, আমার ব্যবসা উঠে গেলে স্টক মার্কেটের ওপর কোনো রকম প্রভাবও পড়বে না, কারণ একশো ভাগ শেয়ারই আমার এবং আমাদের পরিবারের।

'কিন্তু আপনার কোম্পানিগুলো তো খুবই লাভজনক ব্যবসা ছিলো,' ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল,' তাহলে কেনই বা আপনি বিক্রী করে দিতে চাইছেন?'

'কেন বিক্রী করছি, শুনবেন?' বলল জুড। 'আমি ক্লান্ত, ব্যবসা আর চালাতে পারছি না। আমি এখন দায়মুক্ত হতে চাইছি, অবসর নিতে চাইছি, যাতে করে আমি আমার নিজের মতো করে নিজের পথে চলতে পারি।'

'আপনার কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে?' একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল।

'অনেক অনেক পরিকল্পনা আছে,' উত্তরে বলল জুড। 'তবে আগের কাজ আগে সারতে দিন তারপর আমার পরবর্তী পরিকল্পনার কথা ভেবে দেখবো। ধন্যবাদ।' এই বলে সারিবদ্ধ সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে সে তার অপেক্ষারত লিমোসিন গাড়িতে উঠে পড়ল। তারপরেই গাড়ি চলতে শুরু করলো ড্রাইভওয়ের পথে।

দূরদর্শনের পর্দা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বারবারা বললল 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, কিছুই সে বলেনি তাদের।'

'কাউকে কিছুই বলেনি সে,' বলল সোফিয়া। 'এমন কি মারলিন এবং ডঃ সওয়েরকেও।'

টেবিলের ওপর রাখা ক্যাসেট এবং নোটবুক ভর্তি ছোট্ট বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বারবারা জিজ্ঞেস করল, 'এগুলোই কি তোমার সঙ্গে আনতে বলেছিল সে?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় সোফিয়া।

তার চোখে চোখ রেখে বারবারা জিজ্ঞেস করল, 'শিশুটির ব্যাপারে তাকে বলার কথা তুমি ভাবছ না?'

'তাকে আমার খুব ভয় হয়। জানলে সে কি ভাববে সেই নিয়ে আমার ভীষণ আশঙ্কা। তার মাথায় কখন কি ঘটছে কেউ জানে না। হয়তো সে এখন তার মাথার ভারসাম্য হারানোর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'হয়তো ওই শিশুই তার মধ্যে পরিবর্তন এনে দিতে পারে।'

'আমার বলতে ভয় করছে,' বলল সোফিয়া। 'আপনি বলবেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বারবারা। 'খারাপ, খুবই খারাপ ব্যাপার। সুন্দর ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি। বাবার মতোই তার চোখ দু'টি সমুদ্র নীল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া। 'হয়তো সময় হলেই জুড বুঝতে পারবে।'

তার কথায় সময় নিয়ে বলল বারবারা, 'তুমি কোথায় যাচ্ছো, জুড কিছু বলেছে?'

'না, সে আমাকে কিছু বলেনি,' উত্তরে বলল সে। 'আমি শুধু জানি, সিকিউরিটির লোক এসে আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে।' একটু থেমে সোফিয়া জানতে চাইল, 'আচ্ছা, সে কি আপনাকে জানাডুর কথা কখনো বলেছে?'

'জানাডু?' সোফিয়ার কথাটাই পুনরাবৃত্তি করল বারবারা। 'ওহো, লিজার কোম্পানি যেখানে হোটেল বিল্ডিং তৈরী করছে?'

'হোটেল নয়,' বলল সোফিয়া। 'ডঃ সণ্ডয়েরের সঙ্গে জুডের আলোচনা শুনে তোমার মনে হয়েছে, একটা ল্যাবরেটারি গড়ে উঠছে সেখানে। কিছু ইকুইপমেন্ট ক্রেনি দ্বীপ থেকে পাঠানোর কথা।'

'তাহলে আমি জানি না,' বলল বারবারা।

তাদের আলোচনায় বাধা পড়ল টেলিফোন বেজে উঠতেই। ইণ্টারফোনের মাধ্যমে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল, 'ডাক্তারের লিমোজিন গাড়ি এসে পৌঁছেছে।'

'ধন্যবাদ,' বারবারা বলল, 'এখনি সে নিচে নেমে যাচ্ছে।'

চলে যেতে গিয়েও একটু ইতস্তত করল সোফিয়া। 'আমার ছেলের ফটো আছে আপনার কাছে?'

নীরবে মাথা নাড়ল বারাবারা। তারপর একটা ছোট ডেস্কের ড্রয়ার থেকে রূপোর ফ্রেমের ফটো বার করে সোফিয়ার হাতে তুলে দিলো সে। খুব কাছ থেকে ফটোটা দেখল সোফিয়া। 'খুব বড় হয়ে গেছে সে,' অস্ফুটে বলল।

'মনে রেখো ওর বয়স এখন প্রায় তিন,' বারাবারা বলল। 'তবে বয়সের তুলনা.. একটু বড় দেখাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে উজ্জ্বলও বটে!'

'ঠিক জুডের মতোই দেখতে হয়েছে আমার খোকা।' একটা চাপা আবেগ বেরিয়ে এলো সোফিয়ার গলা থেকে।

'তার বাবাকে তোমার বলা উচিত।'

'তাহলে সে আমাকে তখনো ক্ষমা করবে না,' উত্তরে বলল সোফিয়া। 'বিশেষ করে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আপনার সঙ্গে যখন হাত মিলিয়েছি। আসলে এ ছেলের জন্ম দিতে চায়নি জুড।'

ফটোটা ফেরত দিতে গেলে বারবারা বলে উঠল, 'তুমি এটা তোমার কাছে রেখে দিতে পারো। আমার কাছে আর একটা আছে।'

মাথা দুলিয়ে বলল সোফিয়া, 'আমার কোনো গোপনতা নেই। জুডের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার মতো কোনো জায়গা আমার নেই। পরে কোন এক সময় আমাদের ছেলের কথা তাকে বলবো। তবে কোনো মতেই এখন নয়।'

ক্যাসেট এবং নোটবুকের ছোট বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে কোনো রকমে সংযত গলায় বারবারা বলল, 'আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই, তাকে জড়িয়ে ধরে তার চিবুকে চুমু খেলো বারবারা। মুহূর্তের জন্য তারা পরস্পর তাদের চোখের জল বিনিময় করল।

এদিকে দু'হাতে অশ্রুসিক্ত মুখ ঢাকতে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল বারবারা, 'ঈশ্বর, তুমি করুণাময়। ওদের সাহায্য করো। আমাদের সবাইকেই সাহায্য করো।'

সোফিয়ার লিমোসিন গাড়ির আগে ও পরে দু' দুটো গাড়ি তাকে আড়াল করে নিয়ে ছুটে চলেছে ওকল্যাণ্ড এয়ারপোর্টের দিকে। অন্য দিকে সোফিয়ার ডান ও বাঁ-পাশে যথাক্রমে ব্র্যাড ও লেন্স বসেছিল।

'আমার নাম ব্র্যাড,' সোফিয়ার সঙ্গে তার সহকারী লেন্সের পরিচয় করিয়ে দেয় ব্র্যাড, আমার পার্টনার লেন্স। লস্ অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত আপনার সঙ্গে বিমানে থাকবো।'

'আমরা কি সেখানে যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'আসলে আমরা অণ্টারিওয় নামবো। কারণ লস্ অ্যাঞ্জেলেসে ট্রাফিক জ্যাম খুব বেশী থাকে।' সোফিয়ার হাতে ফাইল আর ক্যাসেটের বাক্সটা দেখে সে আবার বলল, 'বিমানে ওঠার সময় ওগুলো গাড়িতেই রেখে যাবেন। ওগুলো অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

'খুব ভালো,' বলল সোফিয়া। এই সময় গাড়িটা ব্রীজের দিকে এগিয়ে গেল।

ওকল্যাণ্ড এয়ারপোর্টে গাড়ি থামলে ব্র্যাড তাকে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন।'

জানালা পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিতে গিয়ে সোফিয়া দেখল, সিকিউরিটি গার্ডের ছোড়াছড়ি। তাদের দৃষ্টি পড়েছিল অপেক্ষারত বিমানটির দিকে। তার দু'জন সিকিউরিটি গার্ড গাড়ি থেকে নেমে পরস্পর আলোচনা করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন মই বেয়ে বিমানের ভেতরে উঠে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে উধাও হয়ে গেলো। একটু পরে বিমানের প্রবেশ পথের সামনে হাজির হয়ে ব্র্যাডের উদ্দেশ্যে সংকেত জানালো।

'এখন আমরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে বিমানে উঠতে পারি,' গাড়ির দরজা খুলে সোফিয়াকে আহ্বান জানালো ব্রাড।

মই বেয়ে বিমানে উঠে একটা ছোট্ট কেবিনের প্রথম আসনে বসল সোফিয়া। তার চোখের সামনে জানালা। এসকর্ট গাড়ির দু'জন সিকিউরিটি গার্ড লিমোসিন গাড়ির পিছনের আসনে গিয়ে বসল। এদিকে বিমানের ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই লিমোসিন গাড়ি চলতে শুরু করল। পরমুহূর্তেই হ্যাঙ্গার থেকে রানওয়ের দিকে বিমানটা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল।

বিমান আকাশে উড়তেই একটু একটু করে সানফ্রান্সিসকো শহরের আলোগুলো পিছু হটতে থাকল। ক্লান্ত সোফিয়া আসনের পিছনে হেলান দিয়ে তেমনি ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণে আমরা সেখানে পৌঁছাবো?'

'তা প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তো বটেই,' উত্তরে বলল ব্র্যাড।

'তারপর সেখান থেকে আমি কোথায় যাবো?'

'তা তো জানি না,' বলল ব্র্যাড। 'আমাদের ওপর হুকুম আছে সেখানে অন্য আর এক সিকিউরিটি দলের হাতে আপনাকে সঁপে দেওয়া।'

জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বুঁজে বসে রইল সে। একটু পরে সে তার হাতে সূচ ভেদ করার মতো একটা চিনচিনে যন্ত্রণা অনুভব করতেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল এবং তার চোখ দু'টি বিস্ফারিত হলো। ব্র্যাডের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতে গেলো সে, 'কি ব্যাপার?'

'ঘাবড়াবেন না,' নরম গলায় বলল সে। 'আপনার ঘুমের ব্যবস্থা করা, এই আর কি।'

আর তারপরেই সত্যি সত্যি ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল সে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল সোফিয়া। প্রথমে তার চোখের সামনে একটা আবছায়া ভাব, তারপরেই দ্রুত সব কিছু পরিস্কার হয়ে গেলো। জানালার ফ্রেমে ঝলমলে রোদ্দুর। নার্স তার কাছে এগিয়ে আসার আগেই পরিচিত গন্ধটা নাকে লাগতেই সে বুঝে গেলো একটা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে সে।

নার্স একজন জাপানী মেয়ে, রোগা ছিপছিপে চেহারা। পরনে সাদা ইউনিফর্ম, চকচকে কালো এলায়িত চুলগুলোর ঢল নেমেছিল তার কাঁধের পাশ দিয়ে। 'সুপ্রভাত,' তার কথায় আমেরিকান সুর। তার বিছানার পাশে রাখা রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল মেয়েটি, 'ডঃ ওয়ালটন, আপনার রোগিনী ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন।'

তারপর সোফিয়ার দিকে ফিরে বলল সে, 'ভয় পাবেন না। মনে করুন আপনি আপনার বন্ধুদের মধ্যেই রয়েছেন।' একগাল হেসে নার্স আবার বলল, 'ঠান্ডা পাইনআপেল জুস খেলেই আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।' এই বলে রেফ্রিজারেটারের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

নার্স ঠিকই বলেছে। পাইনআপেল জুস পান করতেই তার শরীরটা কেমন ঝরঝরে হয়ে উঠল। নার্সের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'বাথরুমটা কোথায়?'

বাথরুমের দরজা খুলে নার্স বলল, 'ডঃ ওয়াল্টন মিনিট দশেকের মধ্যেই সার্জারি করবেন। তার আগে আপনি স্নান সেরে নিতে পারেন।

বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াতে গিয়ে তখনো তার পা দুটো কাঁপছিল। কাঁপা কাঁপা পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে বাইরে তাকাল সে। অদূরে শ্বেতশুভ্র ফেনিল সমুদ্র বীচ। বীচের ধারে সারি সারি আকাশ ছোঁয়া ইমারত। নার্সের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখন কোথায়? সান্টা মোনিকায়?'

'এখনো সান্টা মোনিকা থেকে অনেক দূরে আপনি,' নার্সের কথার টানে আমেরিকান সুর ধ্বনিত হলেও তার হাসিটা কিন্তু জাপানীদের মতো। 'এটা কি সান্টা মোনিকার মতো দেখতে?'

'জানি না। সান্টা মোনিকায় তো কখনো যাইনি।'

হেসে দূরে একটা পাহাড়ি উপত্যকার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল নার্স, 'ওই যে সমুদ্রের ধারে পাহাড়টা দেখছেন, ওটা ডায়মন্ড হেড।'

'হাওয়াই?' সোফিয়ার গলায় বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হয়।

'হনলুলু,' জাপানী মেয়েটি বলল। আসলে আপনার ঘরটা ওয়েইকিকি বীচের ঠিক মাঝখানে।'

'ওহো তাই বুঝি!' সোফিয়া এবার জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আমি কতদিন আছি?'

'চার্টের রেকর্ড মতো গতকাল রাত দুটোয় আপনি এখানে ভর্তি হয়েছেন।' ছোটখাটো চেহারার জাপানী নার্সটি বলল, 'নাইট ডিউটির নার্সের মুখ থেকে শুনেছি, এখানে ভর্তি হওয়ার সময় আপনি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন।' মৃদু হেসে সে আবার বলল, 'মনে হয় কোনো ভ্রমণরত পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন মিসেস ইভান্স।'

তাকে মিসেস ইভান্স বলে সম্বোধন করায় মেয়েটির দিকে অবাক চোখে তাকাল সোফিয়া। অবশ্য এ-ব্যাপারে তাকে কোনো প্রশ্ন না করে বলল সে, 'আমার মনে হয়

এখন আমার স্নান করা দরকার।'

'বেশ তো তাই করুন। এর মধ্যে আপনার জন্য ব্রেকফাস্টের ফরমাস দিয়ে আসি। ডিমের ওমলেট, বেকন, টোস্ট, আর কফি।'

'কফির পরিমাণটা যেন অনেক বেশী হয়,' বলল সোফিয়া, 'আর খুব কড়া হওয়া চাই, কেমন?'

জাপানী মেয়ের হাসির কলকল শব্দ আবার ধ্বনিত হলো। 'জানেন মিসেস ইভান্স, কড়া কফিতে আমরা বিশেষজ্ঞ। কোনা কফি, সারা বিশ্বের কড়া কফি যা কেবল এখানে এই হনলুলুতে উৎপাদন হয়ে থাকে।'

দরজায় নক্ করার শব্দ হলো। সোফিয়া তখন কফির তৃতীয় কাপে চুমুক দিচ্ছিল। নার্স দরজা খুলতেই ডঃ ওয়াল্টন বলে উঠল, 'জেনি, তুমি ... একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারো,' একটা চেনা চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো সোফিয়ার কানে। 'মিসেস ইভান্সের সঙ্গে কথা বলার পরেই তোমাকে ডেকে পাঠাবো।'

ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো ডাক্তার। তারপর সোফিয়ার দিকে ফিরে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ইভান্স, রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?'

'ব্রাড?' অবাক চোখে তার দিকে তাকাল সোফিয়া।

ডঃ ওয়াল্টন,' উত্তরে বলল সে।

'সে তো তোমার ছলনা,' একটু বুঝি বা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল সোফিয়া। 'আমি শিশু নই। আমাকে বলা উচিত ছিলো।'

'আমরা ভেবেছিলাম, আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রোগিনী হিসেবে স্ট্রেচারে করে এখানে আনলে আপনার শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়ানো যাবে এবং আপনার নিরাপত্তার দিকটা দৃঢ় করা যাবে। আর এই সব কারণেই এই ছলনার আশ্রয় নেওয়া হয়।'

'আমাদের তাতে কিছু এসে যায় না,' বলল সোফিয়া।

'জানি। কিন্তু মিঃ ক্রেনি নয় আপনিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই আপনার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের বন্ধুদের ওপর বর্তায়। আর তারা যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে।'

'তুমি কি সত্যিই একজন চিকিৎসক, নাকি শুধুই একজন সিকিউরিটি এজেন্ট?'

'সত্যিই আমি একজন চিকিৎসক,' হাসতে হাসতে বলল সে, 'তবে সময় সময় একজন সিকিউরিটির লোকের ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়।'

'ঠিক আছে, আমাকে নিয়ে তোমরা কি করতে চাও বলো?'

'তাহলে সহজ ভাবেই ব্যাখ্যা করি আমেরিকান সরকার প্রতিরক্ষা এবং বিচার-বিভাগের সহায়তায় একটা বিশেষ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছে। তাদের প্রয়োজনে এই প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককেই তাদের পরিচয় গোপন করতে হয়, নতুন পরিচয়ে পরিচিত হতে হয়, যেমন আপনাকে করতে হবে। মিসেস মেরিসা ইভান্স, এই প্রোগ্রামে আপনাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে।'

'আর আমাদের বন্ধু কি এই ব্যবস্থা করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কি ভাবে? এটা তো সরকারী প্রোগ্রাম।'

'ওঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে,' বলল ব্র্যাড। আর এই প্রোগ্রাম সার্ভিসেসের জন্য আপনি যে সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত, এ ব্যাপারে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে সরকার একমত।'

জানালার দিকে চোখ রেখে সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'আমার জন্য যে নতুন পরিচিতির ব্যবস্থা তোমরা করেছো, সে ব্যাপারে যদি আর একটু খোলসা করো, ভালো হয়।'

'আমরা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বদলে ফেলেছি, শারীরিক, ব্যক্তিত্ব এবং এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য সব রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। শুধু প্রসাধনের মাধ্যমে কাউকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দেওয়া যায় না। যেমন আপনার হাত নাড়া, পা ফেলা, আপনার কথা বলার ধরন, এ সবই বদলে ফেলে নতুন করে সম্পূর্ণ অন্য ঢঙে আপনাকে সাজাতে হবে। এমন কি আপনার পুরনো অভ্যাসগুলোও বদলাতে হবে। সব শেষে আমরা আপনাকে এমন একটা পরিবেশে নিয়ে যাবো, যেখানে আপনি নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে পারবেন সম্পূর্ণ নিরাপদে, এখন আপনার সামনে যে সব বিপদের ঝুঁকি রয়েছে, সেসব থেকে আপনি মুক্ত হতে পারবেন।'

মুখ না ফিরিয়েই সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে আমি কি কখনো আমার ফেলে আসা জীবনে আর ফিরে যেতে পারবো না? যাদের আমি কখনো যত্ন নিয়েছি কিংবা ভালোবেসেছি, তাদের কাছে ফিরে যেতে পারবো না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আর যদি আমি অন্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না চাই? যদি আমার বর্তমান পথ বদলাতে না চাই?'

'আপনি তো আর বন্দিনী নন,' বলল সে। 'ওই দরজা পথ দিয়ে আপনার যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, এখানে আমরা আপনার জীবনের যে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, অন্যত্র সে দায়িত্ব আমাদের থাকবে না।'

নীরবে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে সোফিয়া। 'এমন কি আমাদের বন্ধুও পারবে না? এরকম কথা সে বলেছে নাকি?'

'তাঁর কথা আমি বলতে পারি না, 'উত্তরে সে বলে, 'আমি কেবল আমাদের প্রোগ্রামের কথাই বলতে পারি।'

'মনে রেখো আমি একজন ডাক্তার, 'ধীরে ধীরে বলতে থাকে সোফিয়া।' সারাটা জীবন একজন চিকিৎসক হিসেবে রোগীদের চিকিৎসা করে তাদের সুস্থ করে তুলেছি, এই আমার জীবনের মূল স্বপ্ন। আর তোমাদের প্রোগ্রাম যদি আমার সেই স্বপ্নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার জীবনের নিরাপত্তার কোনো অর্থই হয় না, তার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।'

একটু সময়ের জন্য নীরব থেকে ব্র্যাড বলল, 'আমি আপনাকে বুঝি ডক্টর। কিন্তু এই প্রোগ্রামটা বাতিল করার আগে ভালো করে একবার চিন্তা একবার করে দেখুন। জীবনে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর দিক যে আছে, আপনি তা অস্বীকার করতে পারেন না।'

'আমার জন্য নয়, ' দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে উঠল সোফিয়া।

'ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আপনার,', বলল সে। 'তবে আপনাকে সাহায্য করার অনুমতি আমাকে দিন। সম্ভবত তাতে আপনার মত বদল হতে পারে।'

'কি ভাবে?'

'এখন আপনাকে যেমন দেখতে, এ ভাবে পাবলিক প্রোগ্রামে হাজির হলে, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, তিন দিনের মধ্যে আপনার প্রতিপক্ষ আপনাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে। তাই আমার পরামর্শ হলো, আপনার মুখে এবং শরীরের কোনো কোনো অংশের একটু কসমেটিক পরিবর্তন আনা একান্ত প্রয়োজন। যেমন আপনার চোখ এবং নাকে পরিবর্তন আনা। তারপর আপনার দীর্ঘ সোনালী চুল ছোট করে ছেঁটে কোঁকড়ান চুল করে তুলতে হবে। শুধু তাই নয়, চুলের রঙ পাল্টে ফেলতে হবে, সোনালী থেকে লাল বাদামীতে। এর পর আপনার পরিচিতি বদল করার জন্য নতুন নামে আপনার পাসপোর্ট, পুরনো ক্রেডিট কার্ডের বদলে একটা ভালো ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে হবে, আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স বদল করে দিতে হবে।'

'যদি আমি তোমাদের প্রোগ্রামে যোগ দিতে রাজী না হই?'

'আপনার কাজের নমুনা আমি কিছু কিছু জানি,' উত্তরে সে বলল। 'আমি আপনাকে শ্রদ্ধাও করি। আপনি একজন সত্যিকারের চিকিৎসক। আর সেই জ্ঞান, সেই প্রতিভা যদি আপনার জীবনের নিরাপত্তার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়, সেটা কম আপশোসের কথা নয়।'

'ধন্যবাদ ব্র্যাড,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল সে। 'এ সব করতে কতদিন সময় লাগবে?'

'দশ দিন, হয়তো তারও কম লাগতে পারে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল সোফিয়া। 'ঠিক আছে, কবে থেকে শুরু করবে?

'কাল সকাল থেকে।'

উত্তর ম্যালিবুর প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের ছোট্ট একটা বীচ, প্যারাডাইস কেভ। উইকএন্ড এবং ছুটির দিনগুলোতে বীচের দিকে সেই ছোট্ট নোংরা রাস্তাটা গাড়িতে গাড়িতে জ্যাম হয়ে ওঠে, এখানকার প্রধান আকর্ষণ ফেনায়িত সমুদ্র-তরঙ্গ এবং সূর্যালোক। ভ্রমণার্থীদের মধ্যে কিছু মাঝবয়সীরা থাকলেও অধিকাংশই যুবক-যুবতী। ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁয় ভিড় উপচে পড়লেও যুবক-যুবতীদের তাতে মাথা ব্যাথা নেই। সঙ্গে করে খাবার নিয়ে আসে তারা, তাদের প্রধান আকর্ষণ সমুদ্রের ফেনায়িত তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে সাঁতার কাটা।

শনিবারের দুপুর, তখন প্রায় তিনটে বাজে। প্রেমিক-প্রেমিকারা ব্যস্ত তখন তাদের নিজস্ব একটা গোপন আস্তানার খোঁজ করার জন্য। আকাশে শঙ্খচিলের চিৎকার, সামুদ্রিক মাছের সন্ধানে তারা ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে, মাছের সন্ধান পেলেই তারা নেমে আসছে নিচে সমুদ্রেবীচে ডানা গুটিয়ে।

আরো একটা শব্দ ভেসে এলো আকাশ পথে। একটা হেলিকপ্টারের রোটারের শব্দ। শব্দটা শোনা মাত্র নগ্ন যুবতীরা যে যার নিবরাবরণ দেহে জড়িয়ে নিলো বিকিনি এবং টপলেস, তাদের উন্মুক্ত স্তনদ্বয় ব্রার আড়ালে ঢেকে ফেলল। তারপরেই আকাশ পানে তাকাল তারা। হেলিকপ্টারের এক দিকে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিলো : চার্চের শাশ্বত

জীবন। বক্তা তাদের বার্তা পাঠিয়ে দিল নিচের বীচে লাউডস্পীকার যোগে : চার্চের শাশ্বত জীবন তোমাকে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আর তারপরেই হেলিকপ্টারটা চোখের আড়াল হয়ে গেলো।

বীচের দৃশ্য আগের মতো আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আগের মতো তারা আবার নিরাবরণ হলো। টপলেস মেয়েদের স্তনগুলো আবার উর্দ্ধমুখী হলো, সূর্যের আলোয় বাদামী রঙের স্তনবৃন্তগুলো আঙুরের মতো ঝকঝকে হয়ে উঠল। একটা রক শেলটার থেকে অদৃশ্য একটা কণ্ঠস্বরে অভিযোগ শোনা গেলো! 'তুমি যেন আমার সারা মুখে আবর্তিত হচ্ছো।'

আর একজনের গাঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে আসে : 'তোমার মাথাটা ঘোরানো উচিত হয়নি।'

'কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম, ওটা একটা পুলিশ কপ্টার,' মেয়েলী নাকি কান্নার মতো শোনাল সেই কণ্ঠস্বর।

পাহাড়ের গায়ে চড় মারার শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো। আর এই ভাবেই বীচ তার স্বাভাবিক ভাবটা ফিরে পেলো।

একটা পঞ্চাশ ইঞ্চি টেলিভিসন পর্দার সামনে গোল হয়ে বসেছিল জুড, ফাস্ট এডি এবং জন। তাদের পায়ের নিচে ভিডিও ক্যামেরার তার। ক্যামেরায় টেলিস্কোপিক জুম লাগানো।

ভিডিও ক্যামেরার অপারেটার চিৎকার করে বলে উঠল, 'কপ্টার মাটিতে নামছে। ফটো তোলা বন্ধ করে দেবো?'

'এগিয়ে যাও', বলল জুড। তারা সবাই দূরদর্শনের পর্দায় দৃশ্যগুলো পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

হেলিকপ্টারের মোটরের সুইচ বন্ধ হয়ে গেলো, রোটরের আওয়াজ ধীরে ধীরে একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। কেবিন থেকে মই বেয়ে নিচে নামার সময় এক যুবকের গানের সুর ভেসে এলো মাইক্রোফোনে। তাকে অনুসরণ করল দুজন দীর্ঘদেহী যুবক। তখনো হেলিকপ্টারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন মহাঋষি। অবশ্য পরমুহূর্তেই তিনিও নীচে নেমে এলেন সেই দড়ির মই বেয়ে। সেই যুবক দুটির থেকে আরো বেশী লম্বা তিনি। নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে যুবক-কণ্ঠে গান শুনছিলেন তিনি।

'ছবিটা খুলে দেখাও,' বলল জুড। ' মেয়েগুলোকে আমি দেখতে চাই।'

বড় পর্দায় ছবিটাও রীতিমতো বড় হয়ে দেখা দিলো। চোদ্দটি মেয়ে, তাদের পরনে বেগুনি রঙের সিফন শাড়ি। প্রত্যেকের মাথায় একটা করে সাদা ফুলের কুঁড়ি গোঁজা। এবং প্রত্যেকের হাতে ফুলের ঝুড়ি। তাদের মিষ্টি গলায় একটা গানের কলি ঝংকৃত হচ্ছিল! 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ .....'

মহাঋষি তখনো হেলিকপ্টারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নরম গলায় বলে উঠলেন : 'বৎস, আমি তোমাদের কাছে শান্তি ভিক্ষা করছি।'

মেয়েগুলো তাঁর উদ্দেশে নতজানু হয়ে বলে উঠল, 'সব শান্তিই পরমপিতার কাছ থেকে আসে।' তারাও একই সুরে বলে উঠল, 'সব শান্তিই আসে পরমপিতার কাছ থেকে।'

মহাঋষি তাদের প্রনাম গ্রহণ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলেন। এবার মেয়েরা তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে তাদের ঝুড়ি থেকে ফুল ছড়াতে থাকে তাঁর চলার পথে। দু'জন যুবক তাঁকে অনুসরণ করে চলে।

'সে কি ওখানে রয়েছে?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'হ্যাঁ, তিনি তো সেখানেই রয়েছেন!' বলল জন। তারপর ক্যামেরাম্যানের দিকে ফিরে বলে উঠল সে, 'ডানদিকের সারিতে মধ্যমণি মেয়েটির ওপর ক্যামেরার লেন্স ফেলো।'

পর্দায় মেয়েটির অবয়ব ভরে ওঠে সম্পূর্ণ ভেসে। বেশ সুন্দরী সে, কিন্তু অনেকটা অন্য সব মেয়েদের মতোই দেখতে। 'সব মেয়েই প্রায় একই রকম দেখতে, এই মেয়েটিই যে সে কি করে বুঝবো?'

'লক্ষ্য রাখুন,' বলল জুড।

মেয়েটি একটু নড়ে চড়ে উঠতেই তারা নজর রাখল তার ওপর। তার মাথা থেকে একটা ফুল ঝরে পড়ল। হাঁটু মুড়ে ফুলটা কুড়িয়ে সে তার মাথায় গুঁজতে গিয়ে ক্যামেরার মুখোমুখি হওয়ার জন্য যেন ইচ্ছে করেই মুখটা ঘোরাল।

'হ্যাঁ, ওই তো সে!' বলল জন। তার গলায় কোনো রকম উচ্ছ্বাস নেই। সহজ ভাবেই বলল সে, 'আমি জানতাম, সে ওখানে থাকবেই। আমাদের সংগ্রহে সম্ভবত অ্যালানই সব থেকে ভালো মেয়ে।'

'তা ওকে পেলে কোথ্থেকে শুনি?'

'নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগ থেকে। তারা ওকে ডেস্কের কাজ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়েটির পছন্দ নয়। ও চায় ওর কাজে বিশেষ উত্তেজনা থাকা চাই। তাই ও আমাদের কাছে চলে আসে।'

'সে কি যুবতী,' জিজ্ঞেস করল জুড।

'যেমন দেখাচ্ছে, ঠিক ততটা যুবতী সে নয়?' বলল জন। 'পঁচিশ বছর বয়স তার।'

'ওই হলো আর কি।' এই বলে রিসিভার তুলে নিয়ে পাইলটকে বলল জুড, 'বিমানটাকে আমাদের মূল কেন্দ্রে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

লস্ অ্যাঞ্জেলেস্ এয়ারপোর্টের কাছে সেঞ্চুরি বুলেভার্ডের ওপর নতুন বিল্ডিং। জানালাবিহীন কনফারেন্স রুম। দেওয়ালের গায়ে শাশ্বত জীবনের চার্চের এটা মানচিত্র। চার্চের চারপাশে বিস্তীর্ণ জায়গা, বিরাট সম্পত্তি। একটা কাঠের লাঠি সেই মানচিত্রের ওপর লক্ষ্য করে জায়গাটার বর্ণনা দিতে থাকে জন।

সব শোনার পর জুড জিজ্ঞেস করল, 'গেট দিয়ে আমরা প্রবেশ করতে পারি না?'

'খুব একটা সহজ নয়। কুড়ি ফুট উঁচু তিনটি গেট পেরিয়ে তবে মূল ভূ-খন্ডে প্রবেশ করা সম্ভব। আর প্রতিটি লোহার গেটের সঙ্গে আছে বৈদ্যুতিক তার জড়ানো। তাই গেট পেরুতো গিয়ে শতকরা একশো ভাগ জীবনের ঝুঁকি থেকেই যায়। এছাড়া ম্যালিবুর পুলিশ এবং দমকলবাহিনী সব সময়েই সতর্ক, তারা জানে কি করে বহিরাক্রমণ ঠেকাতে হয়! মহাঋষি জেনে গেছেন তাঁর নিভৃত বিশ্রামের স্থান আইনের দিক থেকেই কতোই না সুদৃঢ়।

বলাবাহুল্য, স্থানিয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ।'

'তাহলে কি ভাবেই বা সেখানে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করছ তুমি?' জানতে চাইল জুড। 'প্যারাসুটের সাহায্যে?'

'না,' উত্তরে বলল জন। 'প্রথমত, বিমানের যান্ত্রিক আওয়াজ শোনা যাবে। তারপর প্যারাসুট নামাতে গেলে অনেক নিচে বিমান নামাতে হবে, যা এখানে সম্ভব নয়।'

'তাহলে বিকল্প উপায়?'

'ইঞ্জিনবিহীন বিমানে ঝুলে পড়া।'

'মতলবটা ভালো,' বলল জুড।

'এরকম দশজন উড়ন্ত বৈমানিক আমার হাতে আছে, তারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছে, কাজটা তারা সম্পন্ন করতে পারবে।'

'যদি প্রয়োজনীয় বাতাসের সাহায্য না পায়?'

'এক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীন যুদ্ধপদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। সেই সময় পাথর কিংবা তীর নিক্ষেপের জন্য যেভাবে গুলতি ব্যবহার করা হতো, এক্ষেত্রেও ইঞ্জিনবিহীন ছোট ছোট বিমান নিক্ষেপ করার জন্য দুটি ক্যাটাপুল্ট তৈরী করে রেখেছি।' বলল জন। 'পরবর্তী সমস্যা মহাঋষির নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে। একটা ব্যাপারে আমরা ভাগ্যবান। তিনি কোনো আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অন্য অস্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি দেন না। কিন্তু তাঁর সব লোকই ব্ল্যাক বেল্টের অধিকারী এবং মার্শাল আর্টে দক্ষ তারা। এছাড়া রাতে বারো থেকে পনেরোটি শিকারী কুকুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে। তবে অনুপ্রবেশকারীদের হত্যা করার জন্য ট্রেনিং দেওয়া হয়নি সেই কুকুরগুলোকে, তাদের কাজ হলো কেবল আটক করে রাখা এবং নিষ্ক্রিয় করে রাখা।।'

'এ সব তো প্লাস পয়েন্ট,' বলল জুড। 'কিন্তু মাইনাস পয়েন্ট কি আছে?'

'পরিস্কার আকাশ। সহজেই আমরা দৃষ্টিগোচর হতে পারি। তাই আমাদের এখন প্রয়োজন ঘন কুয়াশা এবং হাল্কা মেঘের। সব শেষে যদি না আমরা কুকুরগুলো এবং প্রহরীদের মুখ বন্ধ করতে পারি, তাহলে আমাদের দেখা মাত্র তারা সতর্ক করে দেবে, আমরা তখন ধরা পড়ে যাবো।'

'কিন্তু কি ভাবে তাড়াতাড়ি তাদের মুখ বন্ধ করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল জুড।

এই সময় একটা অদ্ভুত ধরনের লং-ব্যারেল্ড হ্যান্ডগান দেখিয়ে বলল জন, 'এর থেকে পরপর বারোটি ঘুমপাড়ানি বুলেট বের হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। প্রতিটি বুলেটের আঘাতে সে মানুষ হোক, কিংবা জানোয়ারই হোক ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হবে, সে ঘুম চার ঘণ্টারও বেশী হতে পারে, এবং ঘুম ভাঙ্গার পরেও আরো দু'ঘণ্টা ঝিমিয়ে থাকবে।

সিকিউরিটির লোকের দিকে তাকিয়ে জুড বলল, 'ধরো সব কিছুই যদি ঠিকঠাক চলে, তারপর কি হবে?'

আপনি তখন একশো গজ দূরে একটা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে থাকবেন। তখন আমরা বিনা বাধায় গেট খুলে দেবো, এবং প্রেসিডেন্টের মতো বুক ফুলিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে আসবেন। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর। আবহাওয়ার পূর্বাভাস,

পাঁচদিন আকাশ পরিস্কার থাকবে। কিন্তু জায়গাটা পারস্য উপসাগরের। যে কোনো সময়ে যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ওলট-পালট করে দিতে পারে।'

'অভিযানের একদিন আগে আমাকে খবর দিতে পারবে?'

'সম্ভবত পারবো,' বলল জুড। 'কিন্তু কেন বলুন তো?'

'প্রায় দশদিন ছুটিতে থাকছে সোফিয়া। ভেবেছিলাম, তার কাছে গিয়ে দেখা করবো।'

'তাহলে নতুন করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা সাজাতে হবে.' বলল জুড।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' বলল জুড। 'এই ভাবেই খেলাটা চলবে।'

দরজায় টোকা পড়ল। 'মিসেস ইভান্স।' জুড়ের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল সে।'

'এক মিনিট,' উত্তর দিয়ে সে তার মেকআপে শেষ টান দিয়ে নিলো। তারপর আয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। জুডকে যে সে চিনতে পেরেছে, সেটা সে তার মুখে প্রকাশ না করে বলল, 'হ্যাঁ, বলুন?'

তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন চোখে হাসল জুড। 'মিসেস ইভান্স? আমি বোধহয় ভুল করেছি। আপনি কে জানতে পারি?'

'জুড!' এবার সে হেসে ফেলল। জুড়ের হাতে ধরা দিয়ে সে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমু খেলো তাকে। 'মশাই, এখন তুমি আমাকে চিনতে পারলে তো?'

'না চিনে উপায় আছে?' হাসতে হাসতে বলল জুড। তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল সে, 'ওহো ঈশ্বর, তুমি কতো না সুন্দর হয়ে উঠেছ। তারা যাই করুক না কেন, তারা তোমার মূল্যবান জিনিষ নিশ্চয়ই আহরণ করতে পারেনি। চমৎকার।'

'তুমি আমাকে হাসিও না, ' হাসি চাপবার চেষ্টা করে বলল সে, 'এখনো পর্যন্ত তারা আমাকে কোনো ভাবেই ব্যবহার করতে পারেনি।'

হাসল জুড। 'প্রথমত তুমি একজন নারী।'

নীরবে মাথা নাড়ল সে। সে বেশ ভালো করেই জানে, জুড কি বোঝাতে চাইছে।

উঠে গিয়ে রেফ্রিজারেটার থেকে টাটকা দু'গ্লাস পাইনআপেল জুস বার করে নিয়ে এলো সোফিয়া।

'চীয়ার্স।'' এ ওর গ্লাস স্পর্শ করে চুমুক দিলো জুসের গ্লাসে।

হঠাৎ জুড়ের মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ডঃ সওয়ের এখন আমার সব চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে চান।'

' কেন, কিছু বলেছেন?'

'আমার ব্রেনের স্ক্যান করে দেখা গেছে, ফুসকুরির মতো অংশটার বৃদ্ধি এখন অনেক কমের দিকে, আগের পুরো জায়গার তুলনায় আধ মিলিমিটারের থেকেও কম। অতএব এর থেকেই বোঝা যায় যে. চিকিৎসকদের দুশ্চিন্তা মতো সেটা টিউমার নয়।'

'তোমার কোনো শারীরিক যন্ত্রণা নেই তো?'

'না।'

'কোনো যৌন সমস্যা?'

'না।'

'তোমার চিন্তাধারায় শ্লথ গতি আসেনি তো?'

'ঠিক তার উল্টো,' বলল সে। 'বরং সেটা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুত হয়েছে। এক এক সময় এক একটা চিন্তা আমার মাথার মধ্যে এতো দ্রুত উদয় হয়ে যে, আগের ভাবনার সমাধান করার আগেই পরের ভাবনাটা এসে চাপা দিয়ে দেয় আগেরটাকে, আমি তখন হাঁপিয়ে উঠি।'

'ঠিক এখনকার মতো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি না, তুমি ঠিক কি বলতে চাইছ।'

'এখন তুমি আমাকে কি রকম দেখছো?' আরো পরিস্কার করে বলল সে, 'কিংবা কসমেটিক পরিবর্তনের আগে আমি যেমন দেখতে ছিলাম, এখনো কি ঠিক সেরকমটিই আছি?'

তার দিকে তাকাল জুড। 'সব সময় তোমাকে একই রকম দেখতে লাগে।'

'চোখ বন্ধ করে আমার চেহারার বর্ণনা দাও,' হঠাৎ বলে উঠল সে।

' তোমার উচ্চতা পাঁচ ফুট আট কিংবা নয় ইঞ্চি, ওজন একশো তিরিশ। লম্বা সোনালী চুল, ধূসর রঙের চোখ। পুরুষ্ট স্তন, উনচল্লিশ কি চল্লিশ, উত্থিত স্তনবৃন্ত, কোমর ছাব্বিশ কিংবা সাতাশ, নিতম্ব আটতিরিশ কিংবা উনচল্লিশ...।'

'খুব ভালো কথা,' তাকে বাধা দিয়ে বলল সে 'এখন চোখ খুলে আমার বর্ণনা দাও।

একটা বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল জুড। 'আদৌ তুমি তো ওরকম দেখতে নও। প্রথমেই বলি তোমার বাদামী রঙের ছোট ছোট চুল, বাদামী চোখ।' তার কণ্ঠে হতাশার সুর। 'কেন আমার ওরকম মনে হলো?'

'আসলে তুমি এতক্ষণ তোমার স্মৃতি রোমন্থন করছিলে,' ব্যাখ্যা করে বলল সে। 'যা তুমি দেখেছ তা বলোনি।'

একটু সময়ের জন্য চুপ করে থেকে বলল সে, 'এটা কি খারাপ লক্ষণ?'

'না, খুবই স্বাভাবিক। আমাদের মগজে যা ঢুকে যায়, সেটাই আমরা মনে করে থাকি। স্মৃতির পরিবর্তন করে বাস্তবে ফিরে আসতে একটু সময় লাগবে বৈকি!'

'কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম, আমার চিন্তা শক্তি আগের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগামী হয়েছে,' বলল জুড।

'সম্ভবত তুমিই ঠিক', বলল সে। 'তবে আমার নতুন রূপ তোমার স্মৃতিতে এখন যে ভাবে গেঁথে গেছে তাতে মনে হয় যে, তোমার পুরনো স্মৃতি এখন তোমার মন থেকে সম্পূর্ণ উধাও। এখন তুমি যদি চোখ বন্ধ করো, সম্ভবত তোমার মধ্যে নতুন করে একটা উপলব্ধি হবে, আমার এখনকার সঠিক চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে তুমি।'

এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে থাকার পর আবার চোখ মেলে স্বীকার করল সে, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

'হতেই হবে। ভুলে যেও না, তুমি এখনো মানুষই আছো।'

'আমি কি সব সময়েই সেরকম থাকবো?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'সম্ভবত থাকবে,' সায় দিয়ে বলল সে। 'যদি না তুমি অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকো। এরপর তুমি আবিষ্কার করবে, তোমার স্মৃতি শক্তি হারানোর অনেক পথ খোলা আছে, কিংবা তোমার মস্তিষ্কের ওপর বাড়তি চাপ অনুভব করবে।'

স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে জুড জানতে চাইল, 'তবে কি আমার মস্তিষ্কের বৃদ্ধি পাওয়াটাই এর কারণ? আর এর জন্যই কি আমার মস্তিষ্ক অনেক অনেক স্মৃতি মজুত রাখার ভান্ডার কিংবা ব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে?'

জুডের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হলো। 'জানি না। কিন্তু আমি তা মনে করি না। জীববিজ্ঞান এবং মানুষ বৈজ্ঞানিকের মতে বহু বছরের ক্রমবিবর্তনই পরবর্তীকালে মানুষের মস্তিষ্কের ফসল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্ক যে বদলে যেতে পারে, আমরা তা কখনো জানতে পারিনি। যাইহোক, একটা কথা মনে রেখো, একটু নীরব থেকে সে আবার বলতে থাকে, 'মানুষের করোটির একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যেই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ ঘটে থাকে। এবং হাড় কখনোই প্রসারিত হয় না। সেই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রেখো,' মস্তিষ্কের আকারের সঙ্গে মানসিক শক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। একটা গরুর মস্তিষ্ক মানুষের চেয়ে অনেক বড়।'

'তাহলে আমার ব্যাপারে তোমার কি বক্তব্য বলো?'

'ডঃ সওয়েরের সঙ্গে আমি একমত,' সব শেষে বলল সে। 'তোমার চিকিৎসা বন্ধ থাকতে দাও। অন্তত এই অবস্থার কারণ না জানা পর্যন্ত।'

'সওয়ের চান, বোকা র‍্যাটনের হাসাপাতালে আমি ফিরে যাই।'

'সেটার একটা মানে আছে,' বলল সে।

'কিন্তু আমার সময় নেই।'

'তোমার এই না যাওয়ার সঙ্গে জানাডু এবং ডি এন এ কেমিক্যাল সেল-ইঞ্জিনীয়ারিং প্রোজেক্টের কোনো সম্পর্ক আছে?'

'চালাক-গাধার ভান করো না,' সরাসরি বলল সে। তবে তার কথায় রাগের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। 'আমি তো তোমাকে বলেছি, ঠিক সময়ে আমি তোমাকে বলবো।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বোকা র‍্যাটনে ফিরে যাবে না, তাহলে তুমি এখন কি করবে জানতে পারি?'

'মহাঋষির সঙ্গে দেখা করার মতলব করছি,' বলল জুড।

'আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই, তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাই।'

'তুমি যদি তা করো, তাহলে তোমার ছদ্মবেশ প্রকাশ হয়ে পড়বে।'

'কিসের ছদ্মবেশ? আমি তাদের আগেই বলে দিয়েছি, তাদের প্রোগ্রামে আমি আগ্রহী নই। আমার পেশাগত কৌতূহল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো আমরা যা সন্ধান করছি, সে ব্যাপারে সেই মহাঋষির জ্ঞান থাকতে পারে।'

'আর সেই জ্ঞান লাভের বিনিময়ে তোমাকে তোমার প্রাণ বিসর্জন দিতে হতে পারে,' বলল জুড।

'তোমাকে বলে রাখি জুড, চিরদিন বেঁচে থাকার আগ্রহ আমার নেই।'

সেই মুহূর্তে জুডকে কেমন ভাবলেশহীন দেখাল। 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমি স্বার্থপরের মতো তোমার সঙ্গে ব্যবহার করেছি, এই সত্যটা এখন আমি উপলব্ধি করতে শুরু করেছি।

'তুমি ওরকম ভাবছ কেন?' নরম গলায় বলল সে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তুমি যদি না আসতে, আমি নিজেই তোমার কাছে গিয়ে হাজির হতাম।'

❑ চার ❑

তাদের মধ্যবর্তী টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটা ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিলো সে। 'মিসেস ইভান্স।'

'ডঃ ওয়াল্টন,' জবাবী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাষে। 'আপনার বন্ধুটি এখনো আপনার ওখানে রয়েছেন?'

'হুঁ।'

'ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' বলেই সে আবার জিজ্ঞেস করল, ' কেন, কোনো গোলমাল?'

'জানি না। তবে এই মাত্র ফাস্ট এডি আমার অফিসে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। তার ধারনা, তারা বোধহয় আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'ঠিক আছে, লাইনটা ওঁকে দিচ্ছি।'

রিসিভারটা তার হাত থেকে নিয়ে বলল জুড। 'হ্যাঁ, বলো?' এক মুহূর্ত দূরভাষের কথা শুনে সোফিয়ার দিকে ফিরে বলল সে, 'জানলার সামনে গিয়ে দেখো তো, লিমোসিন গাড়ি থেকে প্রায় পাঁচটা গাড়ির পরে একটা সাদা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে কিনা।'

জানালার সামনে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে সোফিয়া বলল, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

'ভ্যানের গায়ে কিছু লেখা আছে?'

'আইল্যান্ড লন্ড্রি', উত্তরে বলল সোফিয়া।

'জানালার কাছ থেকে সরে এসো।' তারপর রিসিভারে মুখ রেখে বলল সে। 'আইল্যান্ড লন্ড্রি। এ নামে তোমার কোনো লন্ড্রি জানা আছে?'

'তাদের নাম কখনো শুনিনি,' বলল ব্র্যাড। 'আমরা ওয়াইকিকি ব্যবহার করি। ফাস্ট এডি আরো বলছিল, আপনি এলিভেটারে যাওয়ার পরেই দু'জন লোক লবিতে এসে হাজির হয়, আর তারা এখনো ঘোরাফেরা করছে সেখানে।'

'যতো সব ঝুট-ঝামেলা।'

'ওদের একটু দাওয়াই দিয়ে দেবো নাকি?' ব্র্যাড জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, সেটাই তো আমাদের পথ পরিস্কারের এক মাত্র উপায়,' বলল জুড। 'তা ওদিককার খবর কি? বিমান ছাড়ার সময় তো হয়ে এলো।'

'আমাকে আরো মিনিট পনেরো সময় দিন,' এই বলে ফোনটা কেটে দিল সে। সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি দুঃখিত।

'কেন, কিসের জন্যে?'

'কারণ আমি নিজেই নিজের আইন ভঙ্গ করেছি। তোমার নিরপত্তার খাতিরে আমি সবাইকে হুকুম করেছিলাম, আমার কাছে কেউ যেন তোমাকে নিয়ে না আসে। অথচ নিজেই আমি তোমার কাছে চলে এলাম।'

'এর জন্যে দুঃখ করার কি আছে,' বলল সোফিয়া। 'এ ঘটনা ঘটতই, আজ না হয় কাল, নয়তো পরশু।'

ছোট খাট চেহারার জাপানী নার্স ব্র্যাডের পাশে দাঁড়িয়ে জুডের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার নাকে ব্যান্ডেজ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'টেপ লাগিয়ে দাও জেনি,' বলে উঠল সে।

জুডের নাক থেকে চিবুকের হাড় পর্যন্ত সার্জিকাল টেপ দিয়ে জড়ানোর পর নার্স জিজ্ঞেস করল, 'দেখুন ডক্টর, ঠিক আছে?'

ব্র্যাড পরীক্ষা করে জুডকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে আপনার?'

'নাকটা একটু আড়ষ্ট লাগছে, এই যা।'

এবার সোফিয়ার দিকে ফিরে জেনি বলে উঠল, 'এবার আপনার পালা মিসেস ইভান্স।'

তার দিকে তাকিয়ে সোফিয়া বলল, 'কেন, আমি তো ভেবেছিলাম, মেক-আপ নেওয়া শেষ হয়ে গেছে।'

'সার্জারির দিক থেকে শেষ হলেও,' হেসে বলল নার্স, 'কিন্তু তারপরেও সম্পূর্ণ করার জন্য কিছু টাচ-আপ অবশিষ্ট থেকে যায়। যেমন আপনার হাত-পা....,

আগত্যা জাপানী নার্সের তাগাদায় শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেও সোফিয়াকে বাথরুমে ঢুকতে হলো।

পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে মেক-আপ করার পর প্রমাণ সাইজের আয়নায় নিজের নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে অবাক চোখে জেনির দিকে তাকালো। 'মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমাকে হলুদ রঙে চুবিয়েছ!'

মুচকি হেসে জাপানী নার্স বলল, 'ঠিক জাপানী মেয়ের মতো। কিন্তু তার জন্যে চিন্তা করবেন না। পায়ের মেক-আপে আপনার গায়ের রঙ একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। চামড়ার রঙ হবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের।'

সোফিয়া যখন বাথরুম থেকে ফিরে এলো জুড তখন ঘরে একা। সোফিয়ার পিছন পিছন এলো নার্স জেনি, তার হাতে ডাক্তারি ব্যাগ। 'একটু পরে আবার ফিরে আসছি মিসেস ইভান্স,' বলল জেনি। 'আমি আপনার পোশাক আনতে যাচ্ছি, ফাইনাল মেক-আপ নিতে গিয়ে যদি আমার প্রয়োজন হয় বলবেন।'

'মনে হয় তার আর দরকার হবে না, আমি নিজেই কাজটা সেরে নিতে পারবো।' বলল সোফিয়া। তারপর ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে গিয়ে সোফিয়া আয়নায় দেখল, অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে জুড। সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল সে, কোনো গোলমাল টোলমাল?'

'তোমাকে যখন দেখি, মনে হয় যেন অন্য এক মানুষ তুমি।'

'ওটা রঙের খেলা।

'সে যাইহোক, আগে তোমার মেক-আপ শেষ করো,' প্রায় কর্কশ গলায় বলল সে। 'আমরা এখন প্রায় রওনা হওয়ার মুখে।' বলেই রিসিভার তুলে ব্র্যাডের নম্বর ডায়াল করল সে। 'ভ্যালেরি অ্যান কি এসে পৌঁছেছে?'

'হ্যাঁ, এই মাত্র ফাস্ট এডি তাকে নিয়ে এলো লবিতে। আমার অফিসে এলেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।'

'কে এই ভ্যালেরি অ্যান?' জুড রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই প্রশ্ন চোখে তার দিকে তাকাল সোফিয়া।

'আমার বিমানের একজন স্টুয়ার্ডেস। তুমি তার স্থলাভিষিক্ত হবে। বিমানে একজন অতিরিক্ত মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, কেউ আঙুল তুলে দেখাক, সে ঝুঁকি আমি নিতে চাই না,' বলল জুড।

'তা এই মেয়েটির কি হবে?'

'এখানে কয়েকদিন থাকবে সে, তারপর একটা কমার্শিয়াল বিমানে সে তার ঘরে ফিরে যাবে।' এই বলে জানালার সামনে গিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলে সে আবার বলল, 'ভ্যানটা এখনো সেখানেই রয়েছে।'

'এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপারও তো হতে পারে, পারে না?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'না, আমি জানি তা নয়,' বলল সে। 'তুমি যখন বাথরুমে ছিলে, আমরা ভ্যানের নম্বরটা চেক করে জেনেছি, ওটা জাল নম্বর।'

এই সময় দরজায় নক্ করে জাপানী নার্স ঘরে এসে ঢুকল। সোফিয়ার পুরনো পোশাক এবং হাতব্যাগ বিছানার ওপর রেখে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ইভান্স, আমি কি আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি?'

'আমার মনে হয়, আমি নিজেই পারবো।'

বাধা দিলো জুড। 'মিস, আপনি এখানে থাকলে ভালো হয়। আরো কিছু পরিবর্তন আমরা করতে পারি।'

পরমুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকল ব্র্যাড। স্টুয়ার্ডেসের ইউনিফর্ম পরিহিতা একটা কালো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাকে অনুসরণ করল ফাস্ট এডি। মেয়েটির চোখ দুটি যেন জীবন্ত এবং বুদ্ধিদীপ্ত, টিকোল নাক, ঠোঁটজোড়া একটু মোটা এবং চওড়া। জুডের নাকে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখল মেয়েটি।

'তাড়াতাড়ি আমার চেক-আপ করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ ভ্যালেরি অ্যান,' বলল জুড।

'আপনি তো আমার বস, মিঃ ক্রেনি, তাই না?, জিজ্ঞেস করল ভ্যালেরি অ্যান।

জুড মাথা নেড়ে, সোফিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বলল সে, 'মিসেস ইভান্স!'

'হ্যাঁ, ভ্যালেরি অ্যান,' সাড়া দিলো সোফিয়া।

'তোমার ইউনিফর্মটা ওঁকে দাও ভ্যালেরি,' বলল জুড, 'যাতে করে উনি আমার সঙ্গে বিমানে ফিরে যেতে পারেন।'

'তা না হয় দিলাম, ইউনিফর্মটা কোনো সমস্যা নয়,' বলল ভ্যালেরি। 'কিন্তু কালো মেয়ে আর সাদা মেয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। যেমন ওর মুখ, গলা ইত্যাদি এখনো যথেষ্ট সাদা দেখাচ্ছে, রঙ বদলাতে হবে , তারপর আমাদের ঠোঁট মোটা এবং চওড়া, এটারও মেক-আপ দিতে হবে।',

এ ব্যাপারে ব্র্যাডের দিকে তাকাল জুড, তাকে কেমন যেন অসহায় বলে মনে হলো। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত জেনি তাদের মুশকিল আসান করতে এগিয়ে এলো। 'আমার মনে হয়, এ সবের ব্যবস্থা আমি করতে পারবো।'

তখনো সোফিয়ার সিল্কের পোশাক ভ্যালেরি অ্যানের পরনে শোভা পচ্ছিল। জানালার সামনে গিয়ে নার্স জেনির উদ্দেশে বলল সে, 'যে কোনো মুহূর্তে তাঁরা বেরিয়ে আসবেন।'

পরমুহূর্তেই তার পিছন থেকে জেনি বলে উঠল, 'ওই তো ওরা বেরিয়ে এসেছেন।'

প্রথমেই ফাস্ট এডিকে লিমোসিন গাড়ির দরজা খুলতে দেখল তারা। তবে সর্বপ্রথম গাড়িতে উঠল জুড, তারপর সোফিয়া, সোফিয়ার পাশে বসল ব্র্যাড। সব শেষে এক রকম লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠল ফাস্ট এডি। পরমুহূর্তেই গাড়ি চলতে শুরু করল।

'ওঁরা চলে গেছেন,' জেনি তার জায়গায় ফিরে এসে বলল। ভ্যালেরি তাকে অনুসরণ করল। তারপর তারা রেফ্রিজারেটার থেকে হোয়াইট ওয়াইন বার করে পান করার ফাঁকে জুড ক্রেনিদের প্রসঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠল।

মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভ্যালেরি বলে উঠল, 'তোমার ডক্টর রীতিমতো আকর্ষণীয়, কি বলো? ব্ল্যাক গার্লদের সম্পর্কে ওঁর কি নাক সিঁটকানো ভাব আছে?'

জাপানী মেয়েদের মতো মুচকি হেসে বলল জেনি, 'না, আদৌ নেই। কিন্তু তেমন সুবিধে তুমি করতে পারবে না।'

'হয়তো মিষ্টি কথায় ওঁকে দারুণ পছন্দ করে থাকে,' বলল জেনি। 'কিন্তু কোনো সুযোগ নেই।'

'তা সুযোগ করে নিতে কতক্ষণ?' ভ্যালেরি তার শার্টের দুটো বোতাম খুলে দিতেই তার কালো স্তন দুটি অনেকখানি উন্মুক্ত হয়ে গেলো জেনির চোখের সামনে। মেয়ে হয়েও অন্য মেয়ের স্তন দেখার লোভটা সংবরণ করতে পারল না সে। এ ব্যাপারে তার বন্ধুরা ঠাট্টা করে তাকে সমকামী বলে থাকে। করুক, তাতে তার কিছু এসে যায় না। তার ধারণা, যা কিছু ভালো, দেখতে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়। ভ্যালেরি স্তনজোড়া বেশ তারিয়ে তারিয়ে দেখতে গিয়ে জাপানী মেয়ের মতো মুচকি হেসে বলল, 'এই ভাবে ওঁকে তুমি আকর্ষণ করবে?'

'যদি বলি তাই?'

'না, তাতেও সম্ভব নয়। এমন কি তুমি তোমার সম্পূর্ণ নগ্ন দেহটা তাঁর সামনে তুলে ধরো, তাহলেও তিনি তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করবেন না।'

'বেশ তো দেখা যাক বরফ গলে কিনা!' দেখা যাক কি রকম অদ্ভুত পুরুষ তিনি!'

'তা তোমার বসও তো কম অদ্ভুত নন!' বলল জেনি।

'হ্যাঁ, সত্যি উনি অদ্ভুতই বটে,' স্বীকার করল ভ্যালেরি।

'ওর সঙ্গে কখনো শুয়েছ?'

'না,' উত্তরে বলল ভ্যালেরি,' বরফের মতো শীতল উনি, কোনো উত্তাপ নেই। এক এক সময় অবাক হয়ে ভাবি, মিসেস ইভান্সের মধ্যে উনি কি যে দেখেছেন। তিনি তো আর যুবতী নন।'

'হয়তো বয়স্কা মহিলাই ওঁর পছন্দ,' মুচকি হাসল জেনি।

'চুলোয় যাক ওঁর পছন্দ-অপছন্দর কথা,' বিরক্ত হয়ে বলল ভ্যালেরি। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বলল সে, 'আমি এখন কি করি, বোনকে আমি কথা দিয়েছি, এই উইক এন্ডে শাশ্বত জীবনের চার্চের আশ্রমে তার সঙ্গে মিলিত হবো। অথচ আমি এখন হাওয়াইয়ে আটকা পড়েছি। তবে কি আমি এখন লস্ অ্যাঞ্জেলসে তাকে ফোন করে জানিয়ে দেবো, আমি যেতে পারছি না?'

'নিশ্চয়ই!' বলল জেনি। 'তবে এখান থেকে সরাসরি ডায়াল করো।'

ব্র্যাডের নির্দেশ মতো লিমোসিন গাড়ি ছুটে চলেছে পুরনো রাস্তা দিয়ে। ছোট্ট অ্যাপারচার দিয়ে ব্র্যাড দেখল, তাদের পিছনে পিছনে সেই সাদা রঙের ভ্যানটা অনুসরণ করছে। বিরক্ত হয়ে ব্র্যাড বলল, 'জানালা পথেই যখন ভ্যানটাকে দেখা যাচ্ছে, তখন এই অ্যাপারচারের দরকার কি।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'ওরা মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করছে। দেখা যাক, আমরা ওদের চ্যানেল ট্যাপ করতে পারি কিনা।' এই বলে অটোমেটিক ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যান্সপন্ডারে চাপ দিলো সে। একটু পরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'ইউরেকা! ইউরেকা! ইউরেকা! আমি ওদের চ্যানেল ট্যাপ করতে পেরেছি।' স্পীকারের সুইচটা অন করে দিতেই একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো তারা : 'আমি তোমাকে বলছি, গাড়িতে কোনো বাড়তি মহিলা নেই! কেবল মাত্র বিমান থেকে আসা কালো মেয়ে স্টুয়ার্ডেসকে দেখা যাচ্ছে।'

আর একজনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। কিন্তু তার কথাগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথমজনের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেলো। 'জানি না, কেন যে সে মেয়েটিকে ডেকে পাঠিয়েছে। হয়তো এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে মেয়েটিকে দিয়ে সে তার কাম চরিতার্থ করিয়ে নিতে চায়। হয়তো সে তার বুকে মুখ রেখে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে চায়। তোমাকে আগেই বলেছি, তার নাকে একটা বিরাট ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে। হয়তো সেখান থেকেই সে তার নাকে ব্যান্ডেজ বেঁধে এসে থাকতে পারে। সে একজন সুপরিচিত ধুরন্ধর লোক।'

'লোকটাকে খতম করে ফেলো!' রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল ফার্স্ট এডি। 'এসো, ওদের উড়িয়ে দেওয়া যাক!'

জুড তার হাত তুলে বলল, 'আগে ওদের সব কথা শুনতে দাও।'

'ঠিক আছে,' প্রথমজনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে স্পীকারে, 'আমি ফিরে যাচ্ছি। খবর আপাতত এখানেই শেষ।' একটু পরেই ভ্যানটা তাদের গাড়ি অতিক্রম করে দ্রুত চলে গেলো।

'ওরা চলে গেছে,' একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল জুড। ফার্স্ট এডির উদ্দেশে

বলল সে, 'আমাদের খেলনাগুলো এবার হাত থেকে নিচে নামিয়ে রাখো। তবে সতর্ক থেকো।' এই বলে জুড তার নাকের ওপর থেকে ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলতে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাড তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ওটা আপাতত রেখে দিন। এয়ারপোর্টে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে ওদের লোক থাকতে পারে।'

আকাশে তখন বিমান ভাসে, ওদিকে টেবিলের সামনে বসেছিল জুড, তার মুখে কথা নেই। জানালায় সোফিয়ার দৃষ্টি স্থির, আর দ্বীপের চারপাশে বৃত্তাকারে চক্কর দিচ্ছিল বিমানটা উঁচুতে ওঠার জন্য। শেষ অপরাহ্ণের আলো এসে পড়েছিল জানালার ওপর। সূর্যের সোনা রোদে এখন নিচের সব কিছু ছেয়ে গেছে, খেত-খামার, পাহাড় পর্বত সব কিছু। 'চমৎকার!' অস্ফুটে বলে উঠল সোফিয়া।

সোফিয়ার দিকে তাকাল জুড। তাকে যেন নিঃশব্দে একটা হতাশা গ্রাস করছিল তখন। 'আমি আমার কেবিনে চললাম। ডিনারের জন্য তৈরী হলে রাউলকে খবর দিও। আমার খিদে নেই, খাবো না।' তারপর লাউঞ্জের ভেতর দিয়ে জুড তার কেবিনের দিকে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেলো, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

ফাস্ট এডিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সোফিয়া বলে উঠল, 'বড্ড তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসছে।'

'আমরা রাতের দিকে এগিয়ে চলেছি' বলল সে। 'সকাল ন'টায় আমরা সান ফ্রান্সিসকোয় অবতরণ করবো। বসের নির্দেশ মতো আপনার নিরাপত্তার খাতিরে বিমানের ক্রু বদল করে আবার যাত্রা শুরু হবে।' এখানে একটু থেমে একটা বড় জীপার লাগানো সুটকেস তার টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'এর ভেতরের সব কিছুই বস আপানার জন্য পাঠিয়েছেন।'

জীপার টানতেই জিনিষগুলো টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, চেকবুক, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এসবই সোফিয়ার নামে। এমন কি পাসপোর্ট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সেও তার নাম। তাছাড়া একশো ডলার বিলে ভর্তি একটা ওয়ালেট।

'এই ওয়ালেটে পাঁচ হাজার আছে,' বলল ফাস্ট এডি।

'চমৎকার,' বলল সোফিয়া। 'এখন আমাকে কি করতে হবে শুনি?'

'কাজটা খুবই সহজ। সান ফ্রান্সিসকো শহরে ক্রু বাস আপনাকে নামিয়ে দেবে। কয়েকটা ব্লক হেঁটে যাবেন। তবে নজর রাখবেন, কেউ যেন আপনাকে অনুসরণ না করে। আর যদি দেখেন কেউ তা করছে পাসপোর্টে ফোন নম্বর আছে ফোন করে ঘটনাস্থল জানিয়ে দেবেন। সিকিউরিটি আপনাকে তুলে নিয়ে আসবে। চিন্তা করবেন না। তারা আপনাকে ঠিক চিনতে পেরে আপনার নাম ধরে ডাকবে।'

'মিসেস ইভান্স?'

'হুঁ।'

'যদি তারা আমাকে রক্ষা করতে না পারে?'

একটা পয়েন্ট টোয়েন্টিফাইভ ক্যালিবারের অটোমেটিক টেবিলের ওপর রেখে সে বলল,

'তাদের বুলেটবিদ্ধ করে পালিয়ে আসবেন সেখান থেকে। তারপর আবার সিকিউরিটিকে ফোন করবেন।'

একটু নীরব থেকে সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'তারপর আমি কি করবো?'

'তারপর? তারপর একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গিয়ে নগদ টাকায় আপনার কিছু পোশাক এবং একটা সুটকেস কিনবেন। সেখানকার টয়লেটে ঢুকে স্টুয়ার্ডেসের পোশাক বদল করে বাইরে বেরিয়ে এসে ইউনিফর্মটা একটা ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। তারপর কাছাকাছি একটা ভাড়াগাড়ির অটোস্টেশনে গিয়ে মাঝারি সাইজের একটা গাড়ি ভাড়া করে ইউ, এস, ৫ হাইওয়ের ধরে লস্ অ্যাঞ্জেলসের উদ্দেশে গাড়ি চালাবেন যতক্ষণ না মারিনা ডিল রী পৌঁছন, সেখান থেকে মারিনা সিটি ক্লাব হোটেলে। সেখানে আপনার জন্যে একটা ঘর বুক করা আছে।' একটু থেমে ফাস্ট এডি বলতে থাকে, 'পরিকল্পনা মতো সব যদি ঠিক ঠিক চলে, দুপুরের দিকে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন। এখন আপনার কেবিনে নৈশভোজ সেরে নিন। পরে যথা সময়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।'

বিমান যাত্রায় তিন ঘণ্টা অতিবাহিত। রাত গভীর, তবুও সোফিয়ার চোখে ঘুম নেই। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে লাউঞ্জে এসে রিসিভারটা তুলে নিলো সে।

কয়েক মুহূর্তে পরে দূরভাষে স্টুয়ার্ডসের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'হ্যালো?'

'মিঃ ক্রেনি কি ওখানে আছেন?'

'না মিসেস ইভান্স,' উত্তরে বলল মেয়েটি। 'তিনি তাঁর স্টেটরুম থেকে আর বেরোননি।'

'ধন্যবাদ,' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে জুডের স্টেটরুমের সামনে এসে দরজায় নক্ করল সে। 'তুমি কি জেগে আছো?' ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

তার কণ্ঠস্বর যেন একটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরল : 'ভেতরে এসো।'

সোফিয়া দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই তার দিকে না ফিরেই জুড বলে উঠল, 'শুয়ে পড়ো।' তার কণ্ঠস্বর তখনো প্রতিধ্বনির মতো শোনালো।

সোফিয়া নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছো তো?'

হঠাৎ জুডের কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনালো : 'আমি তোমার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হতে চাই!'

কোনো কথা বলল না সোফিয়া। নীরবে আধো আলো, আধো-অন্ধকারে তার ছায়ামূর্তির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সে। বলে কি জুড?

দ্রুত মই থেকে নেমে জুড তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে তখন সম্পূর্ণ নগ্ন। নরম লালচে আলোয় তার দিকে তাকাতে গিয়ে সোফিয়া দেখল, তার উত্থিত শিষ্ন অস্বাভাবাকি ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বর প্রায় ক্রোধে ভরা। 'তুমি তো এই রকমই চাইছিলে, তাই না?'

চোখ বন্ধ করে জোরে জেরে মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'না, না........।' তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায় তার ওপর জুড ঝাঁপিয়ে পড়া মাত্রা। তার মনে হলো, জুড যখন তার মধ্যে প্রবেশ করছিল, সে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছিল। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটল, জলপ্রপাতের মতো তার ভেতরে যেন স্রোত বইয়ে দিলো।

নিদারুণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, তারপর সোফিয়ার দেহের ওপর আছড়ে পড়ল, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল।

সোফিয়ার ঠোটের ওপর থেকে তার জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'অ্যামারিনু মৃত।' একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিড়বিড় করে বকে চলে সে, 'তুমি না বলেছিল, ও কাঁদবে? কাদলে তবু ভালো ছিলো, যন্ত্রণায় অন্তত বেঁচে তো থাকত। কিন্তু এ ও কি করল? শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল?'

এতক্ষণ সোফিয়া নীরব ছিলো। এবার সে ধীরে ধীরে জুডের বেদনা-কাতর মুখটা তার বুকের ওপর চেপে ধরল। 'আমি দুঃখিত প্রিয়তম।' তার সঙ্গে কান্না জুড়ে দিয়ে সে আবার বলল, 'প্লিজ, ব্যাথা পেও না প্রিয়তম!' সোফিয়ার তৃষিত ঠোটজোড়া নেমে এলো জুডের ঠোটের ওপর। চুম্বন অতি দীর্ঘায়িত হলো।

ঘুম ভাঙ্গতেই সোফিয়া দেখল, সে চলে গেছে। উঠে বসে তাকাল, দেওয়াল ঘড়িতে সকাল সাড়ে-ন'টার ইঙ্গিত। জানালার সামনে গিয়ে রোদ্দুরে চোখ পিটপিট করে তাকাল নিচের দিকে, সেখান থেকে প্রায় একশো গজ দূরে জুডের সঙ্গে দ্রুত পায়ে হেলিকপ্টারে উঠতে দেখল ফাস্ট এডিকে। হেলিকপ্টারটা তার চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত তার দৃষ্টি পড়ে রইল মেঘমুক্ত নীলাকাশে। তারপর সরু সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো সে তার কেবিনে।

গতকাল রাতে জুডের অমন অস্বাভাবিক ব্যবহারে সে যুগপত বিস্মিত এবং অসন্তুষ্টও বটে। এর আগে তার সম্পর্কে এরকম মনোভাব হয়নি কখনো। বুঝতে পারে না, সে তাকে এরকম ভাবতে শিখিয়েছে, নাকি এটা তার নিজস্ব ধারণা।

রাওউল লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। 'সুপ্রভাত মিসেস ইভান্স।'

'সুপ্রভাত,' প্রতি সম্ভাষণ জানাল সে। 'মিঃ ক্রেনি আমার জন্যে কোনো বার্তা কি রেখে গেছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি দুঃখিত মিসেস ইভান্স। না, কোনো বার্তা রেখে যাননি।'

'ঠিক আছে,' হাসবার চেষ্টা করল সে। 'আমিও আশা করিনি।'

'তবে আপনার জন্য ফাস্ট এডি একটা খাম রেখে গেছে,' এই বলে খামটা সোফিয়ার হাতে তুলে দিয়ে গ্যালির দিকে চলে গেলে সে।

খামের মধ্যে একটা রুপোর চামচ সহ একটা কোকেনের শিশি, সেই সঙ্গে একটা ছোট্ট চিরকূট। দ্রুত সেটা পড়ে চলে সে। 'এটা স্রেফ আপনাকে চাঙ্গা করে রাখার জন্য। এফ.ই.।' নিজের মনে হেসে বসে পড়ল সোফিয়া কফির অপেক্ষায়।

ক্রেনি সিটির মধ্যমণি একজিকিউটিভ বিল্ডিং-এ জুডের অফিসটা নিউইয়র্কে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া তার বাবার অফিস থেকে অনেক তফাত, সব দিক থেকেই, আধুনিক আসবাবপত্তর থেকে অফিস সাজানো গোছানো সব ব্যাপারেই।

এহেন অফিসে হঠাৎ বারবারা, পল গিটলিন, ডঃ সওয়ের এবং মারলিনের উপস্থিতি দেখেও সে তার বিস্ময়ের ভাবটা গোপন করে গেলো। অবশ্য একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ

না করে পারল না সে, আর সেটা প্রকাশ পেলো তার প্রথম উক্তিতেই : 'ডাইরেকটরদের মিটিং ডেকেছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না।'

'আমি দুঃখিত,' মুখ কাচুমাচু করে বলল মারলিন, 'ভেবেছিলাম, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা কিসের এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুনি?' জুড তার ডেস্কের সামনে বসে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো।

পলের দিকে ফিরে বলল মারলিন, 'মিঃ গিটলিন, সম্ভবত আপনি এর ব্যাখ্যা করতে পারেন।'

'আঙ্কল পল?' জুড জিজ্ঞেস করল। 'আপনি কিছু বলুন!'

'তোমার জন্য ব্যাপারটা আমি সহজ করে তোলার চেষ্টা করছি' এই বলে তিনি শুরু করলেন, 'দেখো, তুমি তোমার ইচ্ছে মতো ক্রেনি ইণ্ডাস্ট্রিজ গ্রুপ তুলে দিতে পারো না। পুরো প্রতিষ্ঠানটাই অত্যন্ত জটিল এবং একটা ব্যবসার সঙ্গে আর একটা ব্যবসা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান ঠুনকো ডিসের মতো ভেঙ্গে চুড়মাড় করে দিতে পারো না তুমি।'

'কিন্তু সেটার মালিক আমি নিজে, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, আমি তা অস্বীকার করছি না,' উত্তরে পল বললেন। 'কিন্তু তোমার দায়িত্ব বলে একটা কথা আছে। যেমন ধরো, সরকারের সঙ্গে তোমার প্রতিষ্ঠানের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি হয়েছে। সে সব চুক্তির কাজ তুমি অন্য কোনো কোম্পানির হাতে তুলে দিতে পারো না। কঠোর নিরাপত্তার খাতিরে সেই কোম্পানি সরকারের অনুমোদিত নয়। যেমন ধরো ক্রেনি এয়ারোস্পেস এবং এয়ারক্র্যাফট, ক্রেনি কমপুক্র্যাফ্‌ট, ক্রেনি মাইক্রোক্র্যাফট ক্রেনি লেজরোক্র্যাফট, এ সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ তুমি ছাড়া অন্য কেউ সরকারকে সাপ্লাই দিতে পারে না।'

'তাহলে কোন্‌গুলো আমি বিক্রী করে দিতে পারি?' জানতে চাইল জুড।

'লেজার ইন্ডাস্ট্রিজ,' শুকনো গলায় বললেন পল, 'হোটেল, মনোরঞ্জনের জিনিষপত্তর, বাড়ি এবং থিয়েটারের কেবল, পাবলিশিং কোম্পানি, মোসন পিকচার প্রোডাকসন, এই সব?'

'তার মানে আপনি বলতে চান, যে সব কোম্পানি লোকসানে চলছে সেগুলো?' বিরক্ত হয়ে বলল জুড। 'এ সবের কি দামই বা পাবো? এগুলো বিক্রী করতে অসুবিধে আছে।'

'বেশ তো, এ সব ছাড়া ক্রেনি ল্যান্ড ডেভেলপমেণ্ট, ক্রেনি ফাইনানসিয়াল সার্ভিস, এ ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলো বিক্রী করে দায়মুক্ত হতে পারো তুমি।'

দীর্ঘ সময় ধরে নীরব থেকে অবশেষে বলল জুড, 'কেবলমাত্র মেডিক্যাল এবং বায়লজি ইনজিনিয়ারিং গ্রুপ রেখে দিতে আগ্রহী।'

'সেটা কোনো সমস্যা হবে না,' বললেন পল। 'কিন্তু অন্য ব্যবসাগুলো, যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে তুমি মোটা টাকা মুনাফা পাচ্ছো, কেনই বা সেগুলো বেচতে যাচ্ছো?'

'আমি ক্লান্ত, তাই রেহাই পেতে চাই,' অবশেষে জুড তার মনের কথাটা বলেই ফেলল। 'আমি এখন জানাডুতে স্থিতি হতে চাই।'

'সে তো তোমার আর এক স্বপ্ন,' বললেন পল। 'প্রথমে ক্রেনি দ্বীপ, আর সেটা গড়ে ওঠার আগেই তুমি এখন স্থান পরিবর্তন করতে চাইছ জানাডুতে। জানো ক্রেনি দ্বীপের খরচ কতো পড়েছে?' এখন জানাডুর জন্য খরচ পড়বে তার বিশগুণ।

'সে সব আমার টাকা। ফাউন্ডেসানের একটা পেনিও আমি খরচ করিনি। সব সময়েই আমি আমার পকেট থেকে খরচ করেছি।'

'এ ব্যাপারে আমরা কোনো অভিযোগ নেই,' বললেন অ্যাটর্নি। 'এখন আমি বলতে চাইছি জানাডুর পিছনে অযথা টাকা অপব্যয় করা হবে।'

'আপনার আর কিছু বলার আছে?' ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল জুড। তারপর মরলিনের দিকে ফিরে বলল যে, 'সে সব প্রতিষ্ঠান বিক্রী করার অনুমতি পেতে পারি, সব বিক্রী করে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। এর পরেও আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার?' সে আবার জিজ্ঞেস করল পলকে।

'একটা প্রশ্ন,' জুডের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন তিনি, 'তোমার অবসর নেওয়ার, পর ব্যবসা কে দেখবে?'

'কেন, ডঃ সওয়ের মেডিক্যাল করপোরেশনের দায়িত্ব নিতে পারেন,' আর বাকী সব মারলিন অনায়াসেই চালাতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। ও শুধু আমার কর্মচারীই নয়, বন্ধুও বটে।'

এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বারবারা। 'আমি কিন্তু দুঃখিত জুড,' বলল সে। 'আমার মনে হয়, তুমি যা করছো তা ভুল। এক হিসেবে অনৈতিকও বলা যায়। তুমি তোমার দায়িত্ব তোমার বন্ধুদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছো। আমি নিজে সেটা আদৌ পছন্দ করি না। আর আমি এও মনে করি না, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি সেটা মনোনীত করতেন।'

তার চোখে চোখ রেখে জুড বলল, 'আমার বাবা মৃত। তাঁর জীবিত থাকার সময় তিনি কি ভাবতেন, সেটাই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখন আর নয়। এখন আমার জীবনে আমার সিদ্ধান্তই সঠিক বলে আমি মনে করি।'

মুহূর্তের জন্য জুডের দিকে তাকিয়ে সে তার জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল জুড, 'আর কেউ চলে যেতে চান?' কেউ কোনো জবাব দিলো না। সে তখন অ্যাটর্নির দিকে ফিরে বলল, 'ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। আমি ওঁকে পাগল বনে যেতে দিতে চাই না।'

'কেন, তুমি নিজেই বলো না,' বললেন পল। 'উনি তোমার মা, আমার নন।'

রিসেপশন রুমের একেবারে এক প্রান্তে বারবারাকে চোখে রুমাল মুছতে দেখল সে। 'বারবারা, আমি দুঃখিত,' আর্দ্র গলায় বলল সে। 'আমি তোমার মানসিক বিপর্যয় ঘটাতে চাইনি।'

'শোনো জুড, সত্যি সত্যি আমি তোমার ওপর রাগ করিনি,' তার কণ্ঠস্বর কেমন যেন নীরস শোনাল। 'আমি এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছি, কি বোকাই না তুমি!'

'এর একটাই কারণ, এই ব্যবসা আমি আর চালাতে চাই না।'

'না, সেটাই শেষ কথা নয় তোমার,' জুডের কথায় কান না দিয়ে বলল সে। 'তোমার এতো দিনের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জলাঞ্জলি দিয়ে তুমি এখন নতুন নতুন স্বপ্নের ঘোরে তন্ময় হতে চাইছে। তোমার খেপাটে স্বপ্ন জুড।'

'না, মোটেই খেপাটে স্বপ্ন নয়,' প্রতিবাদ করে উঠল জুড। 'প্রতিদিন একটু একটু করে সেই স্বপ্নের খোলস ছাড়িয়ে আমি এখন বাস্তবের মুখোমুখি হতে চলেছি।'

'আর সেই সঙ্গে প্রতিদিনই তুমি একটা না একটা কিছু হারাচ্ছ,' বলল বারবারা। 'স্রেফ টাকাই নয়, সেই সঙ্গে ক্ষমতাও। তোমার যা কিছু আছে, সবাই যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদের সবাইকে তুমি হারাতে বসেছ। এমন কি আমি যা বলছি, তা তুমি কিছুতেই বুঝতে চাইছ না।'

'আমি জানি, আমি কি চাই।'

'না, তুমি জানো না,' নরম গলায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল বারবারা। 'তুমি এখন ভয়ঙ্কর স্বার্থপর হয়ে উঠছ। তোমার বাবাও স্বার্থপর ছিলেন, তবে সে ব্যবসার ব্যাপারে। কিন্তু তারই মধ্যে থেকে তোমাকে, তোমার মাকে, এবং সময় সময় আমাকে ভালোবাসার জন্যে ঠিক সময় করে নিতেন। কিন্তু কারোর জন্য ভালোবাসার সময় করে নেওয়ার তাগিদ তোমার ভেতরে নেই।'

'আমি আমার বাবার মতো নই, এমন কি তাঁর মতো করে অনুভব করার তাগিদও আমার নেই।' ঈষৎ উষ্ণ গলায় বলল জুড। 'আর কেনই বা করবো বলো? বিনিময়ে অন্যদের কাছ থেকে কিউ বা পেয়েছি আমি? নিজের জন্য কিছুই নয়। তাই তাদের জন্য আমি কি করতে পারি?'

'তোমার, হ্যাঁ তোমার নিজের স্বার্থে তোমার অতি কাছের কোনো আপনজনের কথা কি তুমি ভেবে দেখেছ কখনো?' শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল বারাবারা। 'যেমন সোফিয়ার কথা?'

'তার সম্পর্কে আমার যা কিছু ভাবনা, সে সবই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য, আর এক আবিষ্কারের জন্য,' বলল সে।

'ভুল, সবই তোমার ভুল ধারণা। হয়তো শুরুটা সেই ভাবেই থাকবে, কিন্তু যে ভাবে তুমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, সে পথ ঠিক নয়। জানো, সে তোমাকে ভালোবাসে?'

কথাটা শোনা মাত্র কোনো কথা না বলে স্থির চোখে বারবারার দিকে তাকিয়ে রইল জুড।

'যদি সে তোমাকে ভালই না বাসত,' নিজের থেকেই আবার বলল বারবারা, 'তাহলে সে তোমার সন্তানের জন্ম দিতো না কখনো, তোমার জন্য তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখত না সে।'

'সোফিয়ার ছেলে আছে?' তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমার ছেলে? আমাকে কেন বলা হলো না।?'

'কারণ সে তোমাকে ভয় করতো,' উত্তরে বারবারা বলল 'সে তার ছেলেকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়নি।'

'আমি বিশ্বাস করি না,' রাগতস্বরে বলল জুড। 'যদি সেটা সত্য হয়, এতদিন কোথায় সে তাকে লুকিয়ে রেখেছিল বলো?'

'আমার কাছে,' ধীরে ধীরে বলল সে, 'আর নিঃসন্দেহে সে তোমারি ছেলে জুড। ঠিক তোমার মতোই দেখতে হয়েছে সে। এমন কি তার চোখ দু'টিও ঠিক তোমারি মতো, তোমার মতোই সমুদ্র-নীল তার চোখ।'

ঠোঁট দুটো চেপে ধরে বলল জুড, 'সে আমার ছেলে নয়। ডঃ জ্যাবিস্কির কৃত্রিম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল সে। তার সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ। ডঃ সওয়ের আমাকে বলেছিলেন, যাতে সে অসময়ে মৃত সন্তান প্রসব করে তার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু সেটা যখন ব্যর্থ হলো তখন সোফিয়ার গর্ভপাত করানর ব্যবস্থা হয়েছিল।'

'এ ব্যাপারে আমি সবই জানি। সোফিয়াও আমাকে বলেছিল, গর্ভপাত করাতে চায় না, কারণ জ্যাবিস্কির পরীক্ষা-নিরীক্ষার অংশীদার হতে চায়নি সে। জ্যাবিস্কি চেয়েছিলেন, ব্যাপারটা সে-ই নিয়ন্ত্রণ করুক, যার জন্য তিনিও চেয়েছিলেন, তোমার এবং সোফিয়ার মিলনে স্বাভাবিক ভাবেই গর্ভবতী হোক সে।'

'তা তুমি এই ছেলেটিকে নিয়ে কি করেছিলে?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'সে তোমারি ছেলে। আমরা ঠিক কাজই করেছি। আমরা তাকে গ্রহণ করেছি। তার যত্ন নিয়েছি। আর আমরা তাকে ভালোবাসি।'

'তোমরা ছাড়া আর কে জানে?' জিজ্ঞেস করল জুড। 'পল, সওয়ের?'

'না, কেউ জানে না,' উত্তরে বলল বারবারা। 'কেবল সোফিয়া, জিস আর আমি। তোমার ছেলের জন্ম-বৃত্তান্ত, সবই গোপন স্থানে রাখা হয়েছে যাতে করে কেউ জানতে না পারে।'

'তাতে কিছু এসে যায় না,' সব শেষে সে তার মনের কথাটা বলেই ফেলল, 'সোফিয়া যদি আমার হেপাজতে থাকতো, তা হলে এ ছেলেকে আমি কখনোই পৃথিবীর আলো দেখতে দিতাম না। এখন আমি আমার নিজের মতো করে আমার জীবন গড়তে চাই।'

কৌচ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চোখ রেখে বারবারা নরম গলায় বলল, 'জুড, তোমার জন্যে আমার খুবই দুঃখ হয়।' তারপর পিছন ফিরে আর না তাকিয়েই রিসেপসান রুম ছেড়ে চলে গেলো সে।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ইউনিট নির্দিষ্ট সময়ের তিন সপ্তাহ আগেই চালু করার জন্য প্রস্তুত। খুশিরই কথা, এ কৃতিত্বের জন্য সব থেকে বেশী প্রশংসা প্রাপ্য ডঃ সওয়ের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে কেমন যেন একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা গেলো। তাঁকে গভীর ভাবে নিরক্ষণ করার পর জুড জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কোনো ঝামেলায় পড়েছেন?'

'ওই বেজন্মা জার্মানটা,' উত্তরে বললেন সওয়ের। 'অযথা যেখানে-সেখানে নাক গলাচ্ছে সে। তার কাজ ছিলো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টার ইউনিটটি সম্পূর্ণ করা। এখন আমি শুনেছি, সে নাকি মেডিক্যাল ল্যাবোরেটারি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। শুধু কি তাই, এও শুনেছি, সেলুলার থেরাপি রেফ্রিজারেসন ইউনিটের ব্যাপারেও প্রশ্ন করছে সে।'

'বোধহয় রিঅ্যাক্টার ইউনিট চালানর জন্য আমাদের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করা আছে কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছে সে,' বলল জুড।

'হাঁ,' তাকে সমর্থন করে বললেন সওয়ের। 'কিন্তু নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ইউনিট নিয়ে বড়ই কৌতূহল তার। যেমন সে জানতে চাইছে, এই রিঅ্যাক্টর ইউনিট কিসের প্রয়োজনে লাগবে। এই সব কারণেই আমি তাকে আর বিশ্বাস করি না। তাই আমি চাই, ক্রেনি দ্বীপে নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় হোক।'

'ঠিক আছে,' বলল জুড। 'তার ব্যবস্থা আমি এখনি করছি।' এই বলে টেলিফোনে সিকিউরিটির লাইনের বোতামটা টিপে সিকিউরিটি ডাইরেক্টার জনের কণ্ঠস্বর শুনেই বলল সে, 'আমরা মিনিট চল্লিশেকের মধ্যেই LAX-এ অবতরণ করছি।'

'ঠিক আছে স্যার, আমরা প্রস্তুত, আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'আর শোনো, পথে মিসেস ইভান্সকে তুলে নিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে, তাই করবো স্যার।'

'আর একটা কথা,' বলল জুড, 'ডঃ স্কোয়েনবার্নের ওপর নজর রাখবে। তার কাজকর্মে আমরা সন্তুষ্ট নই।'

'ভালো কথা' এরপর সওয়েরের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'আটল্যাণ্টায় যাওয়ার কি ব্যবস্থা করছেন?'

দাঁত বার করে তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডঃ সওয়ের। 'এখন আমি ক্রেনি মেডিক্যালের প্রেসিডেন্ট, তাই না?'

'হ্যা ঠিক তাই,' উত্তরে বলল জুড।

'প্রেসিডেন্ট কখনো ব্যবসায়িক বিমানে যাতায়াত করে না।' বলে হাসলেন সওয়ের। 'মাটিতে CI অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

হাসল জুড। 'আপনি বড্ড দ্রুত সব কিছু শিখে ফেলছেন।' 'সেটা আমাদের সর্বাধুনিক 707।'

মাথা নাড়লেন সওয়ের। তখনো তিনি হাসছিলেন। 'দেখা যাচ্ছে, আমি একজন ভালো শিক্ষক পেয়েছি।'

দিনের শেষে ধূসর রঙের মেঘগুলো কেমন কালচে হতে শুরু করেছে। রাস্তা থেকে মাঠে নেমে এলে, লিমোসিন জায়গাটা একটা পাহাড়ী উপত্যকার পাদদেশ, অদূরে ইঞ্জিনবিহিন বিমান অবতরণের রানওয়ে। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল জুড। জন এবং একজন অপরিচিত লোককে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল সে।

'মিঃ, ক্রেনি,' বলল জন, 'ইনি হলেন মার্ক ডেভিডসন, 'এঞ্জিনবিহীন বিমান এবং প্যারাস্যুট স্কুলের ডাইরেকটার।'

খুব একটা লম্বা নয় ডেভিডসন, কিন্তু চওড়া কাঁধের লোকটি বেশ শক্তিশালী বলেই মনে হলো।'

'এ যে দেখছি, আমার জীবনে এই প্রথম একটা মস্ত বড় কৌতূহল,' বলল মার্ক ডেভিডসন।

'হ্যাঁ, আমি কৌতুকই ভালোবাসি,' আন্তরিক ভাবে বলল জুড। 'কোনোভাবেই আমি এটাকে যুদ্ধে পরিবর্তিত করতে চাই না। মনে রাখবেন, কোনো খুন-জখম নয়, এমন কি আত্মরক্ষার জন্যও নয়।'

'না মিঃ ক্রেনি, কোনো খুন নয়। আমরা জানি, আমাদের কি করতে হবে।' উত্তরে বলল ডেভিডসন, 'স্যার, এ কাজের জন্যে আমাদের যন্ত্রপাতির সঙ্গে ট্রেনিং সম্পূর্ণ।'

'ভালো', চকিতে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল জুড। 'আপনি কি মনে করেন এই সময়টা উপযুক্ত হবে?'

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ডেভিডসন বলল, 'আমাদের একটা ভালো সুযোগ আছে। যদি অভাবনীয় ভাবে বাতাস না আসে, আশাকরি রাত দশটা নাগাদ আমরা আমাদের শুভ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো।'

'সেটা আমাদের সৌভাগ্য।' জনের দিকে ফিরে জুড জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ইভান্সের কি ব্যাপার?'

'তাঁকে তুলে আনার জন্য গাড়ি পাঠানো হয়েছে,' উত্তরে জন বলল, 'আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এখানে এসে পড়বেন।'

'ভালো।' বলল জুড, 'আঃ, মাটিতে পাখির মতো ডানা মেলে বিমানটা নেমে আসবে, সে কি সুন্দর দৃশ্য দেখতে হবে, তাই না? আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানেন মিঃ ডেভিডসন?'

'জানি স্যার, সেটাই তো আসল টেকনিক,' উত্তরে বলল সে। 'আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠতে আমার খুব ভালো লাগবে। তবে সেটা সম্ভব কেবলি আমাদের মূল অপারেশানের পরে কোনো এক সময়ে।'

'আমি সেই কোনো এক সময়ের কথা বলছি না,' বলল জুড। 'কেন এখনি সম্ভব নয়?'

স্থির চোখে তার দিকে তাকাল ডেভিডসন।'না স্যার, সেরকম সম্ভাবনার কথা আপনি ভাবতে পারেন না। কারণ সেই সব কলাকৌশল শেখার বা দেখার মতো সময় এখন আপনি আর পাচ্ছেন না। এই স্বল্প সময়ে আপনার কৌতূহল কি মিটবে? তাছাড়া—' জুডের সেই ইচ্ছেটা এড়ানর জন্য জনের দিকে তাকাল ডেভিডসন।

জন তার মনের কথা উপলব্ধি করে তাকে সাহায্য করার জন্য তার পাশে এসে দাঁড়াল। জুডের উদ্দেশে সে তখন বলে উঠল, 'ব্যাপার কি জানেন স্যার, এক এক সময় বসের পক্ষে সব কৌতূহল মেটানো সম্ভব নয়। আর সেটা সম্ভব নয় এই কারণে যে, এখানে আপনার ক্ষেত্রে একটা দায়িত্ববোধের প্রশ্ন থেকে যায়, 'একটু থেমে বলল 'এখন বরং আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে আমাদের অপারেশানের পরিকল্পনা দেখাবো।'

সব কারিগরি ব্যবস্থাগুলো দেখে জুড তখন রীতিমতো বিস্মিত। সে তার চোখ থেকে গগ্‌লসটা সরিয়ে এবার ডেভিড্‌সনের দিকে ফিরে বলল, 'আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমি বলি কি, সব কিছু ভেবে-চিন্তেই আপনি করেছেন, কোনো ত্রুটিই রাখেননি।'

'ধন্যবাদ স্যার,' বলল ডেভিডসন।

হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল জুড। ঘন কুয়াশার জায়গাটা দ্রুত ছেয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের কাছে কুয়াশা যেন আরো বেশী ঘনিভূত হচ্ছে। তখন রাত প্রায় এগারোটা। তার পাশে এসে দাঁড়াল ডেভিডসন। 'সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়েই আমাদের অপারেশন শুরু করতে পারবো,' বলল সে।

মাথা নেড়ে জনের দিকে ফিরে বলল জুড়, 'কিন্তু মিসেস ইভান্স তো এখনো পর্যন্ত এলো না? অথচ তুমি বললে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে এখানে এসে পৌছচ্ছে।'

'চিন্তা করবেন না স্যার,' বলল জন। 'ফাস্ট এডির সঙ্গে আরও দু'জন ভালো লোক আছে। ঠিক সময়েই তিনি এখানে এসে হাজির হবেন দেখবেন।'

এরপর তারা অপারেশান ঘরে ফিরে গেলো। মানচিত্রে পাঁচ-তারা চিহ্নিত স্টার হাউসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল জন। 'অ্যালান বলেছে, স্টার হাউসের ঠিক মধ্যস্থলের একটা ঘরে মহাঋষি থাকেন। তাঁর ঘরের পর্দার রঙ বিভিন্ন রকমের। আজকের রঙ লাল। সেখানে দর্শনার্থীদের আগমন ঘটে ঠিক দশটায়।'

'প্রতিটি পর্দার আড়ালে দু'জন করে প্রহরী থাকে,' বলল জন। 'এর অর্থ হলো ঘরে-বাইরে দু'জায়গাতেই আমাদের মোকাবিলা করতে হবে প্রহরীদের সঙ্গে। তাই কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। আপনার যাওয়ার আগে সাতজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে দু'টি গাড়ি রওনা হয়ে যাবে সেখানে।

মাথা নেড়ে বলল জুড, 'আর এ সব অপারেশন যখন চলবে, তখন তোমার সেই মেয়েটি কোথায় থাকবে?'

'গেটের সামনে, আমাদের জন্যে গেট খুলে দেবে সে।'

'সেখানে দু' দু'জন সশস্ত্র প্রহরী থাকবে,' বলল জুড, 'তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার পরিকল্পনা কি জানতে পারি?'

হাসল জন। 'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, রীতিমতো সুন্দরী মেয়ে সে। তার পরিপূর্ণ যৌবন ফেটে পড়ছে। সেই মেয়ে গেটের কাছে যাবে শীতল-পাথরের মূর্তির মতো সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে। সেই যৌবনবতী মেয়ের নগ্ন দেহ দেখে এমন কোনো প্রহরী নেই যে কিনা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সেখানে কি ঘটছে না ঘটছে দেখতে যাবে। যে মুহূর্তে দরজা খুলে যাবে, দু'টি গ্যাস ভর্তি কাচের আপেল সে নিক্ষেপ করবে গার্ডহাউসের দিকে। দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই সেই গ্যাসের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। গেট খুলতে তার সময় দরকার মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড। আমাদের গাড়ির মধ্যে প্রথম দু'জন ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট। তারাই এলার্ম সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করার ভার নেবে। আর সেই সময়ের মধ্যে আমরা অনায়াসে কমপাউণ্ডের ভেতরে পৌছে যাবো। তারপর অ্যালান আমাদের পথ দেখিয়ে আমাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে।'

'আশাকরি সেই মেয়েটি তখনো পর্যন্ত নগ্ন-মূর্তির বেশে থাকবে?' প্রশ্ন করে হাসল জুড।

জন কিন্তু হাসল না। বরং গম্ভীর গলায় বলল সে, 'না স্যার, মেয়েটির জন্য আমরা একটা জাম্পস্যুট তৈরী করে রেখেছি।'

এই সময় অপারেশান ঘরের সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। সোফিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো ফাস্ট এডি। 'এত সময় লাগল তোমার, কি ব্যাপার?' রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেই করল জুড।

'আর বলেন কেন স্যার,' অসহায় ভাবে বলল ফার্স্ট এডি, 'মনে হয়, নারী-চরিত্র যে কি, আমি বোধহয় কোনোদিনও জানতে পারবো না। জানেন, শেষ পর্যন্ত কোথায় আমি ওঁকে আবিষ্কার করি? বিউটি পার্লারে।'

কঠোর দৃষ্টিতে সোফিয়ার দিকে তাকাল জুড। একটা কথাও বলল না সে।

সোফিয়া কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'জানো জুড, একটা চমৎকার পরচুলা আবিষ্কার করেছি, কালো কুচকুচে, তোমার এটা পছন্দ হয়েছে?'

'তোমাকে ঠিক ম্যারিনা ডেল বে বারের মেয়েদের মতো দেখাচ্ছে।'

'একেবারে খাঁটি আমেরিকানদের মতো?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' মাথা নেড়ে বলল জুড। 'এসো, এখন তৈরী হয়ে নাও। যে কোনো মুহূর্তে আমরা রওনা হতে পারি।' সোফিয়ার একটা হাত সে তার হাতের মুঠোয় ধরে আবার বলল, 'চলো, গাড়িতে ফেরা যাক।'

তার কাছে এসে ডেভিডসন বলল, 'সময় হয়ে গেছে স্যার। দশটা বাজে।'

'গুডলাক,' বলল জুড।

শেষ বিমানটা আকাশে ঘন কুয়াশার আড়ালে ঢেকে গেলে গাড়িতে উঠে বসল জুড। 'এবার যাওয়া যাক,' অন্যদের বলল সে। 'মিনিট পাঁচিশের মধ্যে আমরা পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হচ্ছি।'

❑ পাঁচ ❑

গেটটা আংশিক খোলা ছিল। আগেই দুটো গাড়ি গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আর তাদের পিছনে এসে লিমোসিন গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে জুড হেঁকে উঠল, 'কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

'আর বলেন কেন স্যার,' উত্তরে জন বলল, 'গেটে যে কম্বিনেসান লক থাকবে। আগে থেকে বুঝতে পারিনি। একটা লক খোলার পর গেটটা দু'ফুট সরানো গেছে, সেটা হলো সেণ্টার ট্র্যাক। কিন্তু দু'ফুট দূরে বহিরাগত ট্রাকটা খোলা যাচ্ছে না। ইলেকট্রিনিক বিশেষজ্ঞরাও ব্যর্থ।

'আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে,' বলল জুড, 'গেটটা উড়িয়ে দাও।'

'বেশ তো করে দেখুন, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে ক্যালিফোর্ণিয়া পুলিশ আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে।' একজন বিশেষজ্ঞ ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল পিছন থেকে। জুডের দিকে ফিরে জন বলে উঠল, 'অপর গেটটা খোলার কোনে উপায় নেই। কারণ সেখানে সেফ্‌টি লক লাগানো আছে, সেটা ভাঙ্গতে গেলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে।'

'এই গেটের দু'ফুট খোলা জায়গা দিয়ে আমরা ঢুকে যেতে পারি,' বলল জুড। 'তাহলে বাইরে গাড়ি রেখে চলো হেঁটে যাওয়া যাক ভেতরে।'

গার্ডহাউস পেরিয়ে আসার পরেই অ্যালান তার জাম্পসুটের জীপার টানতে টানতে হাজির হলো তাদের মাঝে। 'আমি দুঃখিত কাজটা সারতে গিয়ে একটু দেরী হয়ে যাওয়ার জন্যে। কাজটা যে খুবই কষ্টকর, আগে আমার আন্দাজ করা উচিত ছিলো।'

'সে যাইহোক, আপাতত এখানকার কাজ শেষ,' বলল জন। 'এখন ভালো ভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত।' এই বলে সে তাদের দু'জন সহকারীর দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা দু'জন মিঃ ক্রেনির খুব কাছে কাছে থাকবে। আমি চাইনা, ওঁর যেন কোনো অনিষ্ট হয়।'

তারপর কাল বিলম্ব না করে ড্রাইভওয়ের দিকে ছুটতে শুরু করল তারা। ড্রাইভওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছলে কালো জাম্পসুট পরিহিত বহু লোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে হাজির হলো। তাদের কাছে ডেভিডসনও ছুটে এলো। 'আপনাদের দেরী হয়ে গেছে,' জনকে বলল সে, 'কি হয়েছিল?'

'গেটগুলো খোলা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের কাছে।' পাল্টা প্রশ্ন করল জন, 'তা আপনার ভেতরে ঢোকার পথ করলেন কি করে?'

'আমাদের কাছে ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। অবশ্য কমপাউণ্ডের ভেতরে অন্যেরাও আছে, কিন্তু আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করার নির্দেশ ছিলো আমাদের ওপর।'

'ভালো,' বলল জন। তারপর অ্যালানোর দিকে ফিরে বলল সে, 'এখন কোন্ পথ দিয়ে আমরা যাবো?'

অ্যালান তখন তাকে বুঝিয়ে দিলো, কোথায় তাদের ক'জন লোক থাকবে, এবং কখন তার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেলে পরবর্তী অভিযানের জন্য এগিয়ে যাবে। 'আর যে মুহূর্তে আমরা এগিয়ে যাবো, ঠিক তখনি আপনারা যে যার কাজের জন্যে তৈরী হয়ে যাবেন। সবাই বুঝেছেন তো?' কেউ কোনো কথা বলল না। সে তখন জুডের উদ্দেশে বলল, 'স্যার, এবার আপনার খেলা দেখানর পালা।'

মাথা নেড়ে জুড বলে উঠল, 'ও.কে. ঠিক আছে, এবার যাওয়া যাক।'

তারা বাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই ফ্লাড লাইটগুলো জ্বলে উঠল, সেখানে তখন দিনের আলোর মতো আলোকিত হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হুড়োহুড়ি, তৎপরতা শুরু হয়ে গেলো সেখানে।

'খতম করে ফেলো ওদের,' চিৎকার করে উঠল জুড।

অদূরে একটা বিরাট দৈত্যের মতো লোককে দেখিয়ে ইঙ্গিতে তাকে চুপ করে থাকতে বলল অ্যালান। ওদিকে একটা শিকারী কুকুর তার ল্যাজ নাড়তে নাড়তে চিৎকার করছিল এমন ভাবে যেন সে তার শিকারের সন্ধান পেয়ে গেছে। অ্যালনই প্রথমে দরজার কাছে ছুটে গিয়ে সেটা খুলে দিলো। তারপর প্রায় নিঃশব্দে মার্বল পাথরের মেঝের ওপর পা রাখল তারা। সামনেই একটা লাল পর্দা, পর্দাটা ঈষৎ সরিয়ে অপর প্রান্তে উঁকি মারল সে। তার দেখাদেখি জুডও। মহাঋষির পিছন দিকটা দেখতে পেলো সে। সেই মহাঋষির চারপাশে পদ্মফুলের আকারে তাঁকে ঘিরে বসেছিল ষোলো থেকে কুড়িটি যুবতী মেয়ে, ভক্তিভরে তারা তাদের গুরুর দিকে তাকিয়েছিল।

নীরবে হাত নেড়ে জুড তার সিকিউরিটির লোকদের ইঙ্গিত করল গুরুকে ঘিরে ফেলার

জন্য। তাদের তৎপর হতে দেখেই সে তখন পর্দা সরিয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়াল। দু'পা এগোতেই হঠাৎ সে অনুভব করল কে যেন তার বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্‌ফিসিয়ে বলছে, 'সোজা হয়ে দাড়াও! যদি প্রতিরোধ করেন, আপনি খুন হবেন না বটে, তবে আপনাকে পঙ্গু করে দেওয়া হবে।'

ঘটনার আকস্মিকতায় টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পরে যায় জুড। তারপরেই একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে এলো : 'মিঃ ক্রেনি,' ধীরে ধীরে মহাঋষি তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে আমি অপেক্ষা করছি।'

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে কিনা কে জানে, তাঁকে তার চেয়েও অনেক বেশী লম্বা দেখাচ্ছিল। তারপর সেই মেয়েগুলোর দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। ভীতবিহ্বল চোখে তারা তাদের গুরুর দিকে তাকাল। তারা তখন সেখান থেকে পালাবার মতলব করছিল, কিন্তু কোন্ পথ দিয়েই বা পালাবে, তারা তা জানত না। তাদের সেই মনোভাব বুঝতে পেরে গুরুদেব বলে উঠলেন, 'বৎসে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এদের কাছ থেকে তোমাদের অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নেই। এঁরা এসেছেন আমার বন্ধু হিসেবে, জ্ঞান সঞ্চয় করার জন্য।'

মেয়েরা তখন আগের মতো পদ্মফুলের আকারে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। মহাঋষি তখন জুডের উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'আপনি যদি আপনার অনুচরদের এখান থেকে চলে যেতে বলেন ভালো হয়, তাহলে নির্জনে আমরা আলোচনা করতে পারি। আমরা এখানে সবাই জেনে গেছি, অন্তহীন অতীত থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আমাদের জীবনের পরিক্রমা, আর সেই প্রবাহের মধ্যে অনিচ্ছুকদের স্থান হতে পারে না।' তারপর মঞ্চ থেকে নেমে জুডের কাছে এসে বললেন তিনি, 'আমাদের এখন অনেক কিছু আলোচনা করার আছে বৎস।'

'হ্যাঁ, জানি।' বলল সে।

'কিন্তু এখন যে আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন বৎস, কম করেও ছ'ঘন্টা বিশ্রামের জন্য আমাকে যে সময় দিতে হবে। তার মানে আগামীকাল সূর্যোদয়ের আগে আপনার সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারবো না। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার কথার খেলাপ হবে না।'

'হ্যাঁ, আমি আপনাকে জানি,' বলল জুড।

'আপনি দেখছি অত্যন্ত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক,' বললেন গুরু। 'আপনি তো আমার বড় বোনকে জানেন!'

'জ্যাবিস্কি,' মাথা নাড়ল জুড। 'অবশ্যই।'

'আমার বোন অত্যন্ত দক্ষ। তবে এ সবই আমি আলোচনা করবো কাল সকালে। এখন আমাকে অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে।'

উঠে দাঁড়ালেন মহাঋষি। 'আমার দু'পাশে দু'টি যুবতী নারী থাকলে বিশ্রামের আমেজটা যেন অনেক বেশী করে অনুভব করি। ইন আর ইয়াং নামে মেয়ে দু'টি সেই ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।'

তাঁর কথাগুলো নীরবে শুনল জুড।

'শুনেছি, আপনি আপনারও নাকি সেই রকম একটা ভারসাম্যের প্রয়োজন হয়। ইচ্ছা করলে এই রকম সাহায্য আপনাকেও আমরা করে দিতে পারি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জুড, 'ধন্যবাদ। এ সময় আমি ও সব চিন্তা করি না। আজ রাতে আমি কেবল নিজের মধ্যেই অনুসন্ধান চালাতে চাই।'

'আপনার যা ইচ্ছা,' উত্তরে বললেন মহাঋষি। 'আমার বন্ধুরা আপনার ঘরটা দেখিয়ে দেবে।'

একই চৌহদ্দির মধ্যে হলেও মূল বাড়ি থেকে আলাদা গেস্টরুমটা। ছোট্ট বাড়ি। ততোধিক ছোট্ট ঘরগুলো। আসবাবপত্রের বালাই নেই। একটা ছোট্ট খাট, একটা চেয়ার, একটা কাঠের আলমারি। এ্যাটাচড টয়লেটে সাওয়ার নেই। ঘরে টেলিফোন কিংবা রেডিও নেই। ঘরের রঙ সাদা। দেওয়ালে কোনো ছবি নেই।

এ হেন ঘর দেখে ফাস্ট এডি বলে উঠল, 'এর চেয়ে আপনার গাড়ির পিছনের আসনে অনেক বেশি আরাম করে বিশ্রাম নিতে পারতেন।'

'অভিযোগ করো না,' বলল জুড। 'আমরা মানিয়ে নেবোখন।'

'কি ভাবে?' বলল ফাস্ট এডি। 'ওই যুবতীদের মধ্যে আমি কয়েকজনের চোখের ভাষা পড়ে দেখেছি, ওরা আপনাকে সঙ্গ দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু তার প্রস্তুতির জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন, এ রকম একটা ছোট্ট ঘরে, বিশেষ করে আপনার ওই ছোট্ট খাটে সম্ভব নয়।'

'যদি ইচ্ছে থাকে, উপায় একটা নয় একটা ঠিক বেরিয়ে যাবেই,' বলে হাসল জুড। 'হয়তো সে তোমাকে তার ঘরে আহ্বান জানাবে, তার শয্যায় সে তোমাকে তার শয্যা-সঙ্গী-করতে চাইবে!'

'সে তো দিবা-স্বপ্ন দেখার মতো,' বিমর্ষ গলায় বলল ফাস্ট এডি। 'এখানকার এতো সব প্রহরী, শিকারী কুকুর, এদের দৃষ্টি এড়িয়ে সে কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমার সুখ নামে কাঠিটা তাদের মতো রসবতী মেয়েদের কাছে অত্যন্ত ছোট্ট। তাই আমি তাদের সুখ দিতে গিয়ে বরং বিরক্তির কারণ হয়ে উঠব তখন।'

এই সময় সোফিয়াকে সেখানে আসতে দেখে ফাস্ট এডি তাকে জায়গা করে দিলো জুডের ঘরে প্রবেশ করার জন্য। ঘরে ঢোকা মাত্র সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ?'

'কেন, কি ব্যাপারে?' পাল্টা প্রশ্ন করে তার দিকে তাকাল জুড।

'জ্যাবিস্কির ওই ভায়ের ব্যাপারে। তুমি কি বিশ্বাস করো, সত্যি সে তার ভাই হতে পারে?'

'না বিশ্বাস করার কি কারণ আছে এর মধ্যে?'

'আশ্চর্য!' বলল সোফিয়া। 'আমরা তার নাম কখনো শুনিনি। অথচ সে আমাদের সব কিছুই জানে।'

'তোমার মন কি বলছে বলো তো?' জুড জিজ্ঞেস করল।

'একমাত্র অ্যান্ড্রোপোভ ছাড়া আমাদের কথা অন্য কারোর জানার কথা নয়।'

সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে তার চোখে পলক পড়ে না। 'তোমার কি মনে হয়, রাশিয়ার হয়ে কাজ করছে সে?'

'জানি না। তবে এটুকু জানি, আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না। হয়তো সে সরাসরি পলিটব্যুরোর কেন্দ্রীয় কমিটির হয়ে কাজ করছে।'

'তুমি কি বলছ জানি না,' বলল জুড। 'FBI এবং IRS সবাই যে তাকে পেতে চায়, এ সব কথা সিকিউরিটি আমাকে বলেছে।'

এই সময় ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল ফাস্ট এডি। 'আমি হিসেব করে দেখলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, 'আমাদের বিমানের স্টুয়ার্ডেস ভ্যালেরি অ্যানকে মনে আছে আপনার? এই মাত্র তার বোনের সঙ্গে মিলিত হলাম। একটু আগে দেখা ওই মেয়েগুলোর মধ্যে সে ছিলো একজন, ভ্যালেরির থেকে শতগুনে দেখতে ভালো সে।'

তারা তাকে একটা কথা বলার আগেই ঘর ছেড়ে চলে গেলো সে। তারপর সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল জুড, 'তাহলে এই কারণেই বোধহয় মহাঋষি আমাদের আশা করছিল।'

'সম্ভবত তাই হবে,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল সোফিয়া। 'আমি এখনো ভয়ার্ত।'

'কাল সকালের আগে পর্যন্ত কিছুই ঘটবে না,' বলল জুড। 'তাই আমি বলি কি একটু ঘুমবার চেষ্টা করো।'

তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল সোফিয়া। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার সঙ্গে থাকলে তুমি কি কিছু মনে করবে?'

জুড তার সেই ছোট্ট বিছানার দিকে সোফিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ওই বিছানায়?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'মেঝেতে শুতেও আমার কোনো আপত্তি নেই।'

সেই ছোট্ট বিছানায় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই চোখ মেলে ঘরের মেঝের দিকে ফিরে তাকালো সোফিয়া। আর তখনি সে দেখতে পেলো মেঝের ওপর বসে আছে জুড, তার পা দু'টো আড়াআড়ি ভাবে ছড়ান। সোফিয়ার চোখে চোখ রেখে বলে উঠল সে, 'সুপ্রভাত।'

'তুমি কি সারা রাত ওভাবেই বসে ছিলে?' তার দিকে বিস্ময় ভরা চোখে তাকাল সোফিয়া। মাথা নেড়ে সায় দেয় জুড।

'ওরকম করা উচিত হয়নি তোমার। এই ছোট্ট বিছানায় তোমার জায়গা করে নিতে পারতাম।'

'কি ভাবে?'

'কেন, আমার শরীরটার ওপর!' বলে অর্থপূর্ন হাসি হাসল সোফিয়া। 'তাতে তুমি আরামে ঘুমতে পারতে, আর অনেকদিন পরে আমিও সুখ পেতাম।'

'তাই নাকি?' তার চোখে চোখ রেখে জুড জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে স্নান করবে নাকি?'

'যদি সেখানে আমাদের দু'জনের এক সঙ্গে জায়গা। আমার সেটা খুব ভালো লাগবে।'

'তাহলে এসো,' উঠে দাঁড়িয়ে সোফিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো জুড। 'আশাকরি জায়গা ঠিক করে নিতে পারবো। তা না হলে, একটু আগে তুমি যে ভাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রাত কাটাতে চাইছিলে, সেই ভাবে......'

জুডের অসমাপ্ত কথাটা না বোঝবার বয়স নয় সোফিয়ার। লজ্জায় তার চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। চাদরের নিচে হাত দু'টো প্রসারিত করে সে তার নগ্ন দেহটা নাইট গাউনের আড়ালে ঢাকার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল অতঃপর।

শাওয়ারের জল বরফ-ঠান্ডার মতো। শীতে কাঁপছিল সোফিয়া। 'ওঃ যীশু!' হাঁ করে নিঃশ্বাস নিলো সে।

জুড তাকে টেনে নিয়ে তার বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল। 'আমার কিন্তু ভালো লাগছে।'

'খুব!' তার মুখের দিকে তাকিয়ে সোফিয়া বলল, 'জুড, আমি তোমাকে এখনো ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

হাসল জুড। 'এর মধ্যে বোঝবার কিছু নেই। আমি তো নিজেকে বোধশক্তিহীন বলে মনে করি।'

সোফিয়া তার কোমরের নিচে জুডের কঠিন জিনিষটা অনুভব করল। 'চমৎকার,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল সে জুডের বুকে মুখ রেখে।

দু'হাতে সোফিয়ার হাঁটু দু'টো ধরে তাকে তার পায়ের আঙুলগুলোর ওপর ভর করে দাড় করিয়ে দিলো জুড। 'ওঃ ঈশ্বর!' তার ভিতরে সামান্য একটু প্রবেশ করতেই অস্ফুটে চিৎকার করে উঠে সুখের জানান দিতে গিয়ে সোফিয়া বলে উঠল, 'তোমারটা এখনো এতো শক্ত রয়েছে?'

তার চোখে চোখ রেখে জুড নিচু গলায় বলল, 'কেন, এরকমই তো তুমি চাইছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, এটা আমি খুব ভালোবাসি,' গাঢ়স্বরে বলল সোফিয়া, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমি আমার মধ্যে চিরদিনের জন্য ধরে রাখতে চাই।' সোফিয়ার নগ্ন শরীরটা তখন থরথর করে কাঁপতে থাকল, তখন তার ক্ষমতা শেষ হয়ে আসছিল। 'ওঃ ঈশ্বর! এরই মধ্যে আমার যে হয়ে এলো!'

এবার সে দু'হাত দিয়ে তার কোমরের সঙ্গে সোফিয়ার নিতম্ব এমন জড়িয়ে ধরল যে, জুডের আদেশটা যেন কেমন কর্কশ শোনাল। 'আগের মতো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার সে ক্ষমতা আমার আর নেই। আর এতো তাড়াতাড়ি শেষও করতে চাই না।'

ওদিকে সোফিয়া তখন তাকে দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটের কাছে মুখ নিয়ে গেলো তাকে চুমু খাওয়ার জন্য। 'আমার প্রেমিকপ্রবর,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল সে, 'আমার সুন্দর প্রেমিক।'

'সোফিয়া!' জুডের কণ্ঠস্বরে গভীর বিস্ময়। 'আমার মধ্যে কি যে ঘটতে যাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাকে যে আমি এতো গভীর ভাবে ভালোবেসে ফেলেছি, কই আগে তো কখনো বুঝিনি। তোমাকে ছাড়া আমি যে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবো না সোফিয়া! কেন, কেন আমার এমন হলো সোফিয়া?'

তার প্রতি জুডের এতো প্রেম, এতো ভালোবাসা যে জমে ছিলো, সেটা সে যে আজ তার মধ্যে এ ভাবে উজাড় করে দিতে চাইবে আগে তো ঘূর্ণাক্ষরেও কখনো বোঝেনি সে। সোফিয়া বেশ বুঝতে পারে, তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে শুরু করছে।

হয়তো বা জুড,' নরম গলায় বলল সোফিয়া। 'হয়তো তুমি প্রেমে পড়েছ।'
প্রায় রাগত ভাবে সোফিয়াকে দেওয়ালের গায়ে ঠেসে ধরল জুড। 'না।' রুক্ষ গলায় বলল সে, 'না! আমি প্রেমে পড়তে পারি না। আমার অনুমতি নেই।'
সোফিয়া তখন অনুভব করল, সেই মাত্র, তার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাল সে এবং সে-ও তখন সুখের চরম প্রাপ্তির মুখে। সোফিয়া তখন জুডের ঠোঁটে তার উষ্ণ ঠোঁট-জোড়া চেপে ধরল শক্ত করে। 'ভালোবাসা কারোর শাসণ মানে না,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল সে।
তারা দু'জনে তখন এ ওর দেহের মধ্যে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে রইল যতক্ষণ না তাদের দেহটা ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ে। এক সময় জড়াজড়ি করে মেঝের ওপর ফোয়ারার জলে ডুবে গেলো তারা। বরফ-ঠাণ্ডা জল বয়ে যেতে থাকল তাদের তপ্ত দেহের ওপর দিয়ে।

মহাঋষির লাইব্রেরি ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বুকসেল্‌ফে ঠাসা বই। আসনে বসেছিলেন তিনি। লম্বা চুলগুলো মেয়েদের খোঁপার মতো করে বাঁধা, দাড়িগুলো সুন্দর করে আঁচড়ান। আসনের ওপর পা দু'টো আড়াআড়ি ভাবে রেখে বসেছিলেন তিনি। জুড এবং সোফিয়াকে লাইব্রেরি ঘরে পৌঁছে দিয়ে মহাঋষির নির্দেশে ফাস্ট এডি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই তিনি তাঁর আসনের আর একটা বোতাম টিপতেই ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। মহাঋষির পাশেই একটা আসনে বসল জুড এবং তার পাশে সোফিয়া।
ঘরে ঢোকা মাত্র কেমন অবাক চোখে মহাঋষিকে দেখছিল জুড। 'এ যেন রূপকথার পাখির মতোন। নিজে নিজে আগুনে পুড়ে মরে সেই ভস্মরাশি থেকে মানবদেহের রূপ নিয়ে তাঁর পুনর্জন্ম ঘটেছে। ঠিক যেমন দলাই লামার মৃত্যুর পর মুহূর্তেই আর এক দলাই লামার জন্ম হওয়ার মতোন।'
কোনো কথা বলল না দলাই লামা। তার চোখে চোখ রেখে জুড বলল, 'গতকাল, রাত্রে আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আপনি তো সেই লোক নন।'
ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। 'কথাটা সত্য। আমার বাবা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আপনি একজন অত্যন্ত মনোযোগী লোক।'
'যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আমি কেবল আপনার বাবার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।'
'যে কোনো মুহূর্তে আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি।' এই বলে তিনি তার আসনের আর একটা বোতাম টিপল। বুককেসের সম্পূর্ণ দেওয়ালটা অপসারিত হতেই ওপারে একটি অতি সুসজ্জিত ঘর তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখা গেলো। সেখানে চন্দনকাঠের একটা ডেস্কের পিছনে বসেছিলেন মহাঋষি। তাঁর পরনের পোষাকটাও একটা চিরাচরিত ঐতিহ্য বহন করছিল। সাদা স্যুট, শার্ট এবং টাই, মাথায় একটা সাদা সিল্কের পাগড়ি। মহাঋষি চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, 'মিঃ ক্রেনি, ডঃ আইভানসিক!'
উঠে দাঁড়িয়ে বলল জুড, 'উনি কি আপনার ছেলে? নাকি পোষ্য পুত্র?'
'ও আমার ছেলে, আবার আপনার ভাষায় সে পোষ্যপুত্রও হতে পারে,' উত্তরে মৃদু

হেসে বললেন মহাঋষি। 'কিন্তু তাতে কি এসে যায় বলুন, জগতের সবাই তো আমার সন্তান। নিজের ঔরসজাত না হলে কি কেউ কারোর ছেলে হতে পারে না?'

'স্যার, আমি আপনার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্যে এসেছি,' বলল জুড। 'দর্শন বিনিময়ের জন্যে নয়।'

'ওই একটা হলো,' বৃদ্ধ ঋষি বললেন, 'আপনি দেখছি ঠিক আমার বোনের মতোই। তারও বিশ্বাস ছিলো কেবল বিজ্ঞানে, মানুষের ভেতরের আত্মায় বিশ্বাসী ছিলো না সে।'

'কিন্তু আপনার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার অনুমতি তো আপনি নিজেই দিয়েছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমিই তার প্রথম হাতেখড়ি,' বললেন মহাঋষি। 'আর সেই প্রথম জানলাম, বিজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বিজ্ঞানই শেষ কথা নয়। শেষ দিকে সে আমাকে বলেছিল, তার সব সাধনালব্ধ জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী হবেন আপনি।' একটা চামড়ায় বাঁধান নোটবুক তার হাতে তুলে দিয়ে মহাঋষি বললেন, '১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তার লেখা এই নোটবই।'

কালি ও পেন্সিলে লেখা নোট বই-এর পাতা ওল্টাতে গিয়ে জুড বলল, 'এতো দেখছি জার্মান ভাষায় লেখা!'

'হ্যাঁ, নাজী বন্দী শিবিরে থাকায় সময় রাতে অতি গোপনে এই নোটগুলো লিখেছিল সে।'

'তার মানে তিনি কি তাদের হয়ে কাজ করতেন?'

'আমরা সবাই তাদের হয়ে কাজ করেছিলাম,' একটুও ইতস্তত না করে তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, 'এছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না। হয় তাদের হয়ে কাজ করতে হবে, তা না বলে মৃত্যু অনিবার্য।'

সোফিয়ার হাতে নোটবুকটা তুলে দিয়ে মহাঋষির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল জুড, 'তারা সেখানে কি কাজ করত? মানে তাদের গবেষণার বিষয় কি ছিলো জানতে পারি?'

'দীর্ঘজীবি হওয়ার ওপর গবেষণা আর কি। নির্দেশটা ছিলো ফুয়েরারের। তিনি এবং থার্ড রাইখের এক হাজার বছর বেঁচে থাকার কথা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, '১৯৪৪-এর গ্রীষ্মের শেষে আমরা সবাই তখন জেনে গেছি, যুদ্ধে জার্মানি হারছে। আর তখনি একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে সর্বত্র, এমন কি বন্দী শিবিরেও। কারণ হিটলারের হুকুম, সমস্ত নথীপত্র পুড়িয়ে ফেলতে হবে, এবং সেই সব এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে যারা যারা জড়িত, তাদের সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে।

কিন্তু আমার বোন সেই অন্যায় হুকুমের প্রতিবাদ করেছিল। আমার মা ছিলেন ভারতীয়, বাবার দ্বিতীয়া স্ত্রী, সেই হিসেবে আমার গায়ের কালো চামড়ার দরুণ আমার বোন আমাকে একটা ব্রিটিশ সেনাদলের হাতে তুলে দেয়। তারপর সে নিজে একজন চাষীর বেশে উত্তরাখন্ড পথে রাশিয়ায় প্রবেশ করে, তার কাছে তার রাশিয়ান মায়ের একটা পরিচয়পত্র ছিলো। আর তারপরেই আমরা এ ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। অন্তত এই ভাবে আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন তো বেঁচে গেছি।'

'তা আপনার ওপর কি ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি চালিয়েছিলেন জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'সে নিজের ওপর যে পরীক্ষা চালিয়েছিল, ঠিক সেই রকমই আর কি,' উত্তরে বলল সে। 'সেটা ছিলো সেলুলার থেরাপি ধরনের।'

'এই নোটবুকে সেই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ লেখা আছে?'

'কিন্তু আমার তো মনে হয়, মানুষের সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি একটা নতুন ধরনের উপায় আবিস্কার করেছিলেন, যা কিনা মানুষের জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং-এর প্রচন্ড অগ্রগতির ফলে তাঁর পদ্ধতিটা এখন বাতিলযোগ্য। ইতিমধ্যে আমরা ল্যাবোটারিতে মানুষের বহু কোষের বিস্তার ঘটিয়েছি, যা কিনা আসল কোষ থেকে কোনো তফাত খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'তার মানে আপনি কি বলতে চান,' বৃদ্ধ ঋষি বললেন, 'জীবনের গোপন রহস্য আপনি আবিস্কার করেছেন?'

'এখনো নয়,' বলল জুড, 'তবে একদিন না একদিন ঠিক আবিস্কার করবই। তবে এর থেকে কি আপনার মনে হয়, আপনার বোনের চেয়ে আমাদের এই পদ্ধতিটা উপলব্ধি করা কি খুব কষ্টকর?'

'আমি তো আগেই বলেছি, আমার বোনের অনেক মত আর পদ্ধতি আমি মেনে নিতে পারিনি।' মহাঋষি বলতে থাকেন : 'তার নোটবুকে এমন অনেক জিনিষ আছে যা বুঝতে খুবই অসুবিধে হবে। সম্ভবত আপনি আগেই তার যে সব নোটগুলো পেয়েছেন, সেগুলো থেকে একটা পরিপূর্ণতা পাওয়া যেতে পারে। তারপর তা থেকে আমরা তার চিন্তা-ভাবনা এবং আবিস্কারের ব্যাপারে একটা আভাষও পেয়ে যেতে পারি।' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পরে মহাঋষি বলতে থাকেন, 'যদিও আমি এখন বৃদ্ধ, তবুও আমি সাধ্য মতো আপনাদের কাজে সাহায্য করতে পারি। আর আমার, বোনের কাজ এবং স্বপ্ন কি ছিলো, বড্ড জানতে ইচ্ছে হয়।'

বৃদ্ধ মানুষটির দিকে তাকাল জুড। 'এখানে আমাদের কাজ করার বিরুদ্ধে আপনার কোনো আপত্তি আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'তাহলে আমরা আমাদের গবেষণার ইউনিট এখানেই গড়ে তুলব।' সোফিয়ার দিকে ফিরে বলল জুড, 'প্রস্তাবটা মন্দ নয়। তাছাড়া, অন্য কোথাও থেকে এখানে তুমি অনেক বেশী নিরাপদে থাকতে পারবে।'

'আর তুমি কোথায় থাকবে?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'অন্য আরো কাজ আমাকে করতে হবে,' বলল জুড। 'তবে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে যাবো। তুমি তোমার কাজ শেষ করা মাত্র আমরা মিলিত হবো।'

উঠে দাঁড়ালেন মহাঋষি। 'ধন্যবাদ, আশাকরি আপনার কাজে শান্তির সন্ধান পাওয়া যাবে।' একটু থেমে সে আবার বললেন, 'এখন আশা করছি, আমার বিশ্রাম নেওয়া দরকার।'

'ধন্যবাদ।'

একটা হাসির সূক্ষ্মরেখা ফুটে উঠল মহাঋষির ঠোঁটে। 'দেখছি, কিছু কিছু হিন্দি শব্দের অর্থ আপনি জানেন। ইংরিজিতে 'গুরু' শব্দের অর্থ হলো টিচার। হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় বলল সে, 'শান্তি এবং সত্য।'

'আপনার বাবা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ,' মহাঋষির ছেলেটি তখনো আসনে বসেছিল, তার দিকে ফিরে বলল জুড। 'আচ্ছা, ওঁর বয়স কতো জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই মিঃ ক্রেনি,' সঙ্গে সঙ্গে বলল যুবকটি, 'এ জগতে তাঁর অবস্থান অনন্তকাল।'

❑ ছয় ❑

সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ছ'হাজার মিটার ওপর দিয়ে সদ্য নির্মিত ক্রেনি VTol বিমান উড়ে চলেছে X-আকারের ডানা মেলে। অদূরে শ্বেত-শুভ্র বরফে ঢাকা আন্দিজ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বিমান-চালক টিম বলে উঠল, 'এত সুন্দর বিমান আমরা ফ্লোরিডায় কখনো দেখিনি।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছো।' জুড বলল।

'যদি দেখা যায়, প্রতিরক্ষা দপ্তর এ ধরনের ছ'শো বিমান না নেয়, তাহলে বুঝতে হবে, তাদের মতো গর্দভ আর কেউ হতে পারে না।'

'না, না, বিমানগুলো ওরা নেবেই,' পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে জুড বলল, 'আমরা প্রায় এসে গেছি, তাই না?'

'আর পাঁচ মিনিট,' বলল পাইলট। 'খুব বেশী হলে দশ মিনিট।'

পাইলট টিমের উদ্দেশে বলল জুড, 'জানাডু রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে দাও, আমি পাহাড়ী উপত্যকায় না নেমে বরং মৃত আগ্নেয়গিরির গর্তের মুখে নামছি।'

দশ মিনিট পরে VTol বিমান সোজা মৃত আগ্নেয়গিরি গহ্বরের বিরাট গর্তে নেমে এলো এলিভেটারের মতো। একটু পরে জুডই প্রথমে সিঁড়ি বেয়ে নামল। ডঃ সওয়ের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে। 'বিশ্বের সব থেকে উঁচু মালভূমি জানাডুতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

তাঁর হাতটা জড়িয়ে ধরল জুড। ডঃ সওয়েরের পিছনে ডঃ স্কোয়েনবার্নকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করতে গেলে বলল সে, 'স্বাগতম মিঃ ক্রেনি।'

'এখানে বড্ড ঠাণ্ডা, চলুন এখান থেকে সরে পড়া যাক,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল সওয়ের।

তারা তাকে অনুসরণ করতে থাকে অতঃপর। বিরাট বিল্ডিং। এগিয়ে গিয়ে বিরাট স্টীলের দরজাটা খুলে দিলো সওয়ের।

'দু'সপ্তাহ,' সওয়ের তাঁর খুঁশির ভাবটা চেপে রাখতে পারলেন না। 'আমরা এটা মাত্র দু'সপ্তাহে তৈরী করেছি।'

'হ্যাঁ মিঃ ক্রেনি, ঠিক তাই,' জার্মান ডাক্তার আরো বলল, 'এখন সব কিছুই আপনার

জন্যে প্রস্তুত। কাল সকালে বোতাম টিপলেই নিউক্লিয়ার জেনারেটারে তাপ সৃষ্টি হতে থাকবে।'

'মেসিন বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই তো?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'না, আপাতত সে সম্ভাবনা নেই। এরকম নিখুঁত প্ল্যান্ট এবং মেসিনারি এর আগে কখনো কোথাও তৈরী হয়নি।' জার্মান ভদ্রলোক কৌতূহল প্রকাশ করল, 'কিন্তু কেন আপনি এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো?'

'আমি স্রেফ নিশ্চিত হতে চাই,' উত্তরে বলল জুড। 'হাজার হোক, আমি আমার নিজের জীবনের ওপর বাজী ধরেছি বলে।'

'মেসিন কাজ করবে,' অবশেষে একটু কঠিন সুরেই ডঃ স্কোয়েনবার্ন বলল, 'তবে আপনার জীবনের কোনো প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি না।'

'তাহলে কাল সকাল সাতটায়.....' অনেকটা হুকুমের মতো করে বলল জুড।

জার্মান ডাক্তারকে কেমন একটু হতভম্বের মতো দেখায়। 'মিঃ ক্রেনি?' সওয়েরের দিকে তাকাল জুড। 'আমি এখন স্নান করতে চললাম। রাতে নৈশভোজে আবার মিলিত হচ্ছি, কেমন?'

অতি সাধারণ নৈশভোজ। তবে ডঃ স্কোয়েনবার্নের হাসিতে খুশির আমেজ প্রকাশ পাচ্ছিল। 'একজন ভালো বাবুর্চি সভ্যতার একটা ছোট-খাটো প্রতীক বলা যায়।'

হাসল জুড। 'ডক্টর, আপনি যে একজন দার্শনিক, সত্যি এর আগে কখনো আমি উপলব্ধি করিনি।'

'দর্শনের উৎপত্তিস্থল মানুষের পেট, মাথা নয়,' জার্মান ডাক্তার বলল।

জুড আর স্কচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে জার্মান ডাক্তারের উদ্দেশে বলল, 'ডক্টর, আপনি আপনার অগ্রগতিতে খুশি তো?'

'হ্যাঁ, অত্যন্ত খুশি মিঃ ক্রেনি।' তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো ডঃ স্কোয়েনবার্ন। 'আগামীকাল কর্তব্যরত শেষ ক্রুরও কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর কেবল টেকনিসিয়ানরা থেকে যাবে। তবে তিন মাস পরে তাদেরও আর প্রয়োজন হবে না।'

'সে তো খুব ভালো কথা,' বলল জুড। 'তাহলে তো আপনার প্রশংসা করতে হয়। এত তাড়াতাড়ি কেউ যে এই প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ করতে পারে, আমার ধারনাই ছিলো না।'

গর্বের সঙ্গে হাসল জার্মান ডাক্তার। 'এখন আমি আগামীকাল সকালের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

'এবং, আমিও.....' বলল জুড।

তখন বেলা এগারোটা। অনেকগুলো ঘর, একটা ছোট অ্যান্টিচেম্বার পেরিয়ে অবশেষে ডঃ সওয়ের জুডকে ল্যাবরেটারিতে নিয়ে এলো। দু'জন টেকনিসিয়ান অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। 'ইনি হলেন মিঃ জুড ক্রেনি,' ডঃ সওয়ের পরিচয় করিয়ে দেন তাদেরকে। তাদের পোশাক এমনি অদ্ভুত যে, তারা নারী কি পুরুষ, বুঝতে অসুবিধে হলো জুডের।

যাইহোক, তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে সওয়ের বললেন, 'মিঃ বোর্নি এবং মিঃ পেসন।'

জুডের দিকে ফিরে বললেন সওয়ের, 'এই মুহূর্তে আমরা ছ'শো চব্বিশটা ব্যাটারির শক্তির অধিকারী, এগুলো চার ঘন্টা অন্তর রিলে প্রথায় কাজ করে যাচ্ছে। জেনারেটার চালু হওয়া মাত্র ব্যাটারির লাইন স্বয়ংক্রিয় ভাবে অফ্ হয়ে যাবে।' চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেখছিল জুড। তার সেই দৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ করে ডঃ সওয়ের জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু আপনি দেখতে চান?'

মাথা নেড়ে জুড বলল, 'মগজের বহিরাংশের কোষগুলো দেখতে চাই।'

টেকসিয়ানের দিকে তাকালেন ডঃ সওয়ের। সঙ্গে সঙ্গে তারা কমপিউটারের বোতাম টিপতেই একটা টেবিল দেওয়ালের দিকে সরে যেতে থাকে। হঠাৎ সেটা থেমে পড়ল। রোবোটের একটা হাত কোষ-ব্যাঙ্কের দিকে প্রসারিত হলো, ড্রয়ারের ডালাটা টানবার জন্য অনেকক্ষণ থেমে রইল এবং সেটা মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখা হলো অতঃপর। বিরাট স্ক্রীনের স্যুইচটা টিপল একজন টেকনিসিয়ান। একই সঙ্গে ল্যাবরেটারির সব আলোগুলো নিভে গেলো। স্ক্রীনের একেবারে ওপরে ইনডেক্স নম্বরগুলো প্রতিফলিত হলো। এক সেই নম্বরের আদ্যাক্ষর হলো "C"।

জুডের উদ্দেশে সওয়ের বললেন, 'এখানে বলে রাখি "C" হচ্ছে ক্লোন, অর্থাৎ কৃত্রিম, এবং অপরটি হলো আসল।

দীর্ঘক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইল জুড, এবং তারপর মুখ খুলল। 'এ দু'টোর মধ্যে কোনো তফাত তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'না, তা নেই বটে,' ডঃ সওয়েরও তাকে সমর্থন করে বললেন। 'তবে সেটা বাইরে থেকে দেখতে সেরকম মনে হয়। জানি সে দু'টোর ক্ষমতা ঠিক একই ধরনের কিনা।'

'কিন্তু হতেই তো হবে,' জোর দিয়ে বলল জুড। 'দুটোই প্রায় একই ধরনের।

'না, আপনি ঠিক একই রকমের বলতে পারেন না।'

প্রশ্ন চোখে তাঁর দিকে তাকাল জুড।

'আমরা জানি, এ সবই ঈশ্বরের লীলাখেলা, তিনিই সৃষ্টিকর্তা,' দার্শনিকের মতো বললেন ডঃ সওয়ের। 'মানুষের যা আছে, তা এখনো অনুমেয়।'

'এখানে দু'টো ব্যাপারে অসুবিধে আছে,' বলল ফাস্ট এডি। 'প্রথমত, আপনি বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না, বোতলবন্দী হয়ে পড়ে থাকতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, এখানে কোনো সুন্দরী রমণীর মুখ দেখতে পাবেন না।'

হাসল জুড।

'আপনি হাসছেন স্যার,' ব্যাপারটায় আরো গুরুত্ব দিয়ে ফাস্ট এডি বলল, 'আপনি যে এখানে এসে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবেন, এটা তো আর ভাবা যায় না। তাছাড়া সব সময় আমি আশা করি, আপনার প্রসাদ পেয়ে আমি ধন্য হবো।'

'এ ব্যাপারে আমি দুঃখিত,' তেমনি হেসে বলল জুড। 'ভেবে দেখ, আমি কেমন বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি।'

'মিঃ ক্রেনি, আপনি কখনোই বৃদ্ধ হচ্ছেন না,' জোর দিয়ে বলল ফার্স্ট এডি। 'আসলে আপনি একঘেয়েমিতে ভুগছেন। আপনার মাথায় এখন অন্য কিছু খেলছে। আপনার জীবনে এখন খরা চলছে।'

'যাইহোক, এই খরা ভাবটা আগামীকালই কেটে যাবে,' বলল জুড। 'মহাঋষিকে সঙ্গে নিয়ে কালই সোফিয়া এখানে এসে হাজির হচ্ছে। আর মহাঋষি সঙ্গে করে এক ডজন মেয়ে নিয়ে আসবে। তাদের ছাড়া এক পাও নড়তে পারেন না তিনি।'

'এখানে আর কে, কে আসছেন?' জানতে চাইল ফার্স্ট এডি।

'ফ্লোরিডা থেকে সওয়েরও মার্লিন, রিও থেকে ডঃ স্কোয়েনবার্ন ফিরে এসেছেন। আগামীকাল রিঅ্যাক্টার চালু হতে যাচ্ছে।'

'সে একটা বিরাট উৎসবের দিন, কি বলেন?'

'আমিও তো তাই মনে করি,' উত্তরে বলল জুড।

'ডঃ আইভানসিকের সঙ্গে আপনার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠছে। আমি এখন ভাবতে শুরু করেছি,' ফার্স্ট এডির চোখে ধূর্ত চাহনি।

'এটা আমাদের কাজের সম্পর্ক,' জুড তার নিজস্ব মনোভাব গোপন করে বলল, 'ডাক্তার আবার আমাকে চেক করার পরিকল্পনা করছে।' একটু থেমে তার দিকে প্রশ্ন চোখে তাকাল জুড। 'কেন তোমার এ কথা মনে হলো বলো তো?'

'এই লেডি ডাক্তারকে আমি জানি। আপনার ব্যাপারে তাঁর একটা উষ্ণ আকর্ষনবোধ আছে। উনি আপনার মগজ ধোলাই করে ছাড়বেন।' একটা অদ্ভুত হাসি হেসে জুড তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়।

তার মন্তব্যটা ঠিক মেনে নিতে পারে না, এবং প্রতিবাদে কি যেন বলতে যায় সে কিন্তু ততক্ষণে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল ফার্স্ট এডি। তাই অগত্যা অরেঞ্জ জুসে শেষ চুমুক দিয়ে টয়লেটে ঢুকল সে স্নানের জন্য।

টয়লেটের ভেতর থেকেই জুড তার টেলিফোনের ঘন্টা বাজার আওয়াজ শুনতে পেলো সে তখন তোয়ালে দিয়ে গা মুছছিল। রিসিভারটা সে তার হাতে তুলে নেয়। 'স্যার, আপনার মায়ের ফোন।'

ডাইরেক্ট লাইনের বোতাম টিপল সে। 'বারবারা?' বলল সে।

তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছে সে। 'জু-জড, তুমি এখন কোথায়?'

'জানাডুতে,' উত্তরে বলল সে। 'কি ব্যাপার, কোনো গোলমাল-টোলমাল?'

'বেবী অপহৃত,' কাঁপা কাঁপা গলায় যতটা সম্ভব দ্রুত বলার চেষ্টা করল সে। 'পার্ক থেকে বেরিয়ে নার্স তাকে গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি দুজন লোক তার পথ আগলে ধরে আমাকে ভূলুণ্ঠিত করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় বেবীকে এবং নার্সের হাতে একটা চিরকূট রেখে পালিয়ে যায়।'

'সেই চিরকূটটা তোমার সামনে আছে?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল জুড।

'হ্যাঁ,' এই বলে সেটা পড়তে শুরু করল বারবারা। 'আমি জানি, কে তার বাবা-

মা। তারা যদি আমার শর্তে রাজী হয়, তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না।' এই পর্যন্ত বলে থামল বারবারা।

'মনে আছে, তুমি একদিন বলেছিলে, শিশুটির ব্যাপারে বাইরের কেউ জানে না,' বলল জুড।

দূরভাষে তার কান্নার শব্দ ভেসে আসে। 'শোনো জুড, প্রথমে সেরকমই আমি ভেবোছলাম।'

'এ ঘটনা কতক্ষণ আগের?'

'হয়তো ঘণ্টা দু'য়েক হবে, তবে তার বেশী নয়।'

'সিকিউরিটির জনকে খবর দিয়েছ?'

'এখনো দিইনি।'

'তাহলে এখনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করো। এ কাজের তদন্ত চালানর জন্য কতকগুলো লোক সঙ্গে করে নিয়ে আসবে সে।' একটু থেমে জুড আবার বলতে থাকে, 'যদি সেই সব লোকগুলোর সম্পর্কে নার্সের কাছে কোনো খবর থাকে কিংবা তারা কেমন দেখতে, সিকিউরিটির লোকদের বলতে বলো।'

'আর সোফিয়া? আমি ভাবছি, তাকে খবরটা দেওয়া উচিত।'

'এ ব্যাপারে যা করার আমি করবো,' বলল জুড। 'এখন শান্ত ভাবে চুপচাপ থাকো। তারা বলেছে, তারা আমাকে তাদের শর্ত দেবে তাই আমি তোমাকে কথা দিতে পারি, বেবী আমাদের নিরাপদেই থাকবে। যাইহোক, এখন ট্রাঙ্কুলাইজার নিয়ে আরাম করো। কোনো খবর থাকলে তোমাকে জানাবো। আর অনুরূপ ভাবে তুমিও আমাকে জানিও। বাই—' রিসিভার নামিয়ে রেখে সিকিউরিটিকে ফোন করল জুড।

'হ্যালো জন,' দূরভাষে তার গলার আওয়াজ পেতেই বলল জুড, 'সোফিয়া আর মহাঋষি কি লস্ অ্যাঞ্জেলস্ ছেড়ে এসেছে?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টা পাঁচেক আগে তো বটেই,' বলল জন।

'শোনো জন, যে কোনো মুহূর্তে আমার মা তোমাকে ফোন করতে পারেন। তিনি তোমাকে একটা ব্যাপারে বিস্তারিত খবর দেবেন। সেই মতো তোমাকে দেখতে হবে, সব কিছু ভালো করে চেক করা হয়েছে। CIA-তে তোমার পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে দাও। রাশিয়ান এজেন্টদের মধ্যে বিশেষ কোনো তৎপরতা দেখা দিয়েছে কিনা খোঁজ নাও। যেমন ধরো অপহরণের ব্যাপার, তবে এবার কোনো গুপ্তচর বৃত্তির কেসে নয়, কিন্তু ঘটনাটা একটা তিন বছরের শিশুকে কেন্দ্র করে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি।'

'ঠিক আছে। ও হ্যাঁ, ডঃ স্কোয়েনবার্ন সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর পেলে? আমার কি মনে হচ্ছে জানো? এ ব্যাপারে লোকটা জড়িত।'

'কিন্তু আমাদের রেকর্ডে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।' বলল জন। 'স্রেফ গতানুগতিক ব্যাপার। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর নিউক্লিয়ার সিম্পোসিয়ামে যোগ দেওয়া, যেমন জার্মানি, জাপান ইত্যাদি। এর মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই। সারা বিশ্ব থেকে তারা

বিজ্ঞানীদের নিয়ে আসে। এমন কি রাশিয়া থেকেও!'

'সে কখনো ইস্ট বার্লিনে গেছে বলে তোমার মনে হয়?'

'হ্যাঁ, দুবার গেছে। কিন্তু সে তো কেবল বাসভর্তি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে নিয়ে।'

'তবুও,' এক মুহূর্তে কি ভেবে জুড বলল, 'মোসাদকে একবার ফোন করে দেখ। ইজরাইলি সিক্রেট সার্ভিসগুলো একেবারে বেজন্মা। তারা তাদের জোট-বন্ধনের দেশগুলোর কাছ থেকে গোপন খবর সংগ্রহ করে অন্য দেশে বেমালুম পাচার করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না।'

'একটা খুব ভালো কথা বলেছেন স্যার। এ ব্যাপারটা আমি খতিয়ে দেখছি।'

'ঠিক আছে, এই অপহৃত শিশুটির ব্যাপারে খবর নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি জানাবে, কেমন!' এই বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে। তারপর ফাস্ট এডিকে তার ঘরে ডেকে পাঠাল।

ফাস্ট এডি ঘরে ঢুকতেই জুড তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাছে কতগুলো সুইডিশ ক্ষেপনাস্ত্র আছে?'

জুডের দিকে অবাক চোখে তাকাল ফাস্ট এডি। 'এক ডজন। কেন, আপনি কি কোনো গোলমালের আশঙ্কা করছেন বস?'

'বলা তো যায় না, কখন কোন্ বিপদ আসে। সে যাইহোক, আমাদের কাছাকাছি কোনো জায়গায় সেগুলো রাখার ব্যবস্থা করো।'

'ঠিক আছে। আর কিছু বলবেন?'

'স্লীভ গান, পয়েন্ট টোয়েন্টিফাইভ অটোমেটিক?'

'দুটো,' উত্তরে বলল ফাস্ট এডি। 'আমাদের দু'জনের একটি করে, এই তো?'

'ভালো,' বলল জুড। চেরি কোকে চুমুক দিয়ে বলল সে। 'এখন থেকে যে মুহূর্তে নতুন কোনো অতিথি আমার কাছে আসবে, তৈরী হয়ে আমার পাশে পাশে থেকো তুমি।'

'ঠিক আছে বস, আমি আপনার পাশে এমন বোকার মতো ভান করে থাকবো, যাতে দেখে মনে হয়, আমি একটা গর্দভ বই কিছু নই।'

তখন মাঝরাত, তার বিছানার পাশে সিকিউরিটি টেলিফোনটা বেজে উঠল। 'মিঃ ক্রেনি, আমি জন কথা বলছি, আপনার জন্যে কিছু জরুরী খবর আছে। আপনি জেগে আছেন তো?'

'হ্যাঁ, বলে যাও,' বলল জুড।

'যদিও আমরা কিডন্যাপারদের সম্পর্কে কিছু জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে একটা খবর আছে, সানফ্রান্সিসস্কো থেকে মন্ট্রিলে উড়ে যাওয়ার একটা ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক বিমানে দু'জন লোককে একটি তিন বছরের শিশুকে সঙ্গে নিয়ে উঠতে দেখা গেছে। তারপর মন্ট্রিল থেকে হাভানার পথে তাদের কিউবিয়ান বিমানে উঠতে দেখা গেছে। হাভানায় আমাদের একজন অপরারেটিভের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, সেখানকার এয়ারপোর্ট সীল করে দেওয়া হয়েছে। গুজব হলো, একজন রাশিয়ান গুপ্তচর

নাকি এর সঙ্গে জড়িত।'

'তোমার কি মনে হয়, আমরা তাদের আটক করব সেখানে?'

'সন্দেহ আছে। খুবই ঝুঁকি আছে। তবে মোসাদের কাছ থেকে আমরা কিছু বিস্ময়কর খবর পেয়েছি। আমাদের ডঃ স্কোয়েনবার্নের রিওতে থাকার কথা, কিন্তু তিনি এখন ক্যারাকাসে আছেন। আমাদের কাছে খবর আছে, তাঁর কাছে দু'টো টিকিট রয়েছে, একটা তাঁর নিজের জন্য, এবং অপর টিকিটটা পাঁচ বছরের নিচের একটি শিশুর জন্য।'

'তা তাদের রিওতে আটক করলে কেমন হয়?'

'সেখানকার লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি,' বলল সে। 'এমন কি মোসাদ, যে কিনা আমাকে সাহায্য করতে পারে, তার অফিসে খবর নিয়ে জেনেছি, সেখানে দু'জন মহিলা ছাড়া অন্য কেউ নেই।'

'তাহলে তো দেখছি, এটা নিজেদের হাতেই মোকাবিলা করতে হবে,' বলল জুড। 'ছেলেটিকে তারা যে এখানেই নিয়ে আসছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

'মাঝ রাতে সেনাবিভাগের একজন লোককে আপনার কাছে পাঠাতে পারি,' বলল জন।

'সেটাও খুব দেরী হয়ে যাবে। চিন্তা করো না। আমরা নিজেরাই মোকাবিলা করবো।' ফোনটা রেখে দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করল জুড। শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোল টাওয়ারে ফোন করল সে।

'শোনো, আমি মিঃ ক্রেনি কথা বলছি, আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে মালভূমিতে সমস্ত হেলিকপ্টার সরিয়ে দেওয়া হোক। আর আমি চাই, একমাত্র VTOL প্লেনটা আগ্নেয়গিরির মুখের কাছাকাছি কোথাও থাকুক। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ মিঃ ক্রেনি।'

'আর দেখ, কোনো বিমান যদি সেখানে অবতরণ করতে চায়, অনুমতি দিও না, তাদের সোজা বলে দেবে মালভূমির উপত্যকায় চলে যেতে। এমন কি এ নির্দেশ ডঃ স্কোয়েনবার্নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।'

'বুঝেছি স্যার।'

'আর যদি কোনো বিমান সেখানে নামতে চেয়ে বেতারবার্তা পাঠায়, তার নাম এবং তার বিমানে কতজন আরোহী আছে, সে খবরটা আমার চাই। আমি চাই না কোনো বিমান আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে ঘোরাফেরা করুক, বুঝলে?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি, মিঃ ক্রেনি, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।'

জুডের চোখে সারা রাত ঘুম ছিলো না। আশ্চর্য, যে ছেলেকে সে তার নিজের সন্তান বলো স্বীকৃতি দিতে চায়নি, যাকে সে জন্মের আগেই সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, অথচ তার অপহরণে এমনি কাতর হয়ে পড়েছে সে এখন যে, তার রাতের ঘুম উধাও। জানালা পথে ভোরের ধূসর আলো যতক্ষণ না দেখতে পেলো, সে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সে দিকে।

মালভূমির উপত্যকায় ৭০৭ বোয়িংয়ের সিঁড়ি বেয়ে একে একে নিচে নেমে আসতে থাকে তারা। সোফিয়ার কাঁধে হাত রেখে বৃদ্ধ মহাঋষি নেমে আসতে থাকে, তাঁর পিছনে দুজন দেহরক্ষী। কিছুক্ষণ পরে আরো তিনজন দেহরক্ষীকে দেখা গেলো। সব শেষে কয়েকজন যুবতীকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখা গেলো, সংখ্যায় তারা সাতজন।

'দেহরক্ষীদের কথা তারা তো কখনো বলেনি,' বলল ফাস্ট এডি।

'বৃদ্ধ সে, বয়স অনেক হয়েছে,' যুক্তি দেখায় জুড। 'সম্ভবত তাদের সাহায্য তার দরকার।'

ফাস্ট এডি নীরবে টেলিভিসনের পর্দায় চোখ রেখে চলে। 'আর ডাক্তারনিকে খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না। তাকে কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছে।'

'সম্ভবত ঠাণ্ডা লেগে থাকবে,' এবারেও তার হয়ে ওকালতি করল জুড। তবে মনে মনে স্বীকার করল সে, ফাস্ট এডির কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই সোফিয়াকে একটু যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ফাস্ট এডির দিকে ফিরে বলল সে, 'তুমি ওদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিও। আর সোফিয়া একটু স্থিতি হলে ডেকে দিও।' বলল জুড। 'আমি এখন নিউক্লিয়ার জেনারেটার রুমে যাচ্ছি। যে কোনো মুহূর্তে সেটা চালু হতে পারে।'

'আপনি আমাকে আপনার পাশে পাশে থাকতে বলেছিলেন, মনে আছে?' বলল ফাস্ট এডি।

'এখন তেমন কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না।'

'ঠিক আছে বস।' জুডের দিকে তাকাল সে। 'স্লীভ গান আপনার কাছে আছে তো?'

'হুঁ।' জুড তার হাতের ছোট অটোমেটিকটা দেখাল তাকে। 'ঠিক আছে, তুমি এখন তোমার কাজে যেতে পারো।'

এলিভেটারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পর্যবেক্ষন ডেকে এসে দাঁড়াল জুড। আগ্নেয়গিরির মুখে বৃত্তাকারে সেই ডেস্ক, তিনশো মিটার নিচে জেনারেটার। একটা উঁচু টুলের ওপর বসেছিল স্কোয়েনবার্ন, তার দৃষ্টি পড়েছিল ইন্সট্রুমেন্টের ওপর। আর তার পাশে মোহিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল মারলিন এবং সওয়ের।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই জার্মান ডাক্তার বলে উঠল, 'মিঃ ক্রেনি, আপনি একেবারে শেষ মুহূর্তে এলেন। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে জেনারেটার থেকে বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসবে।'

নীরবে তার দিকে এগিয়ে গেলো জুড। ডিজিটাল ডায়ালে সেকেন্ডের কাঁটা তখন লাফিয়ে নিচে নামতে থাকে,—২৫,২৪,২৩...। অটোমেটিক পাওয়ার ট্রান্সফারে সারকিট আলোর রঙটা তখনো লাল দেখাচ্ছিল। কাচের জানালা দিয়ে জেনারেটারের দিকে তাকাল জুড। সাদা পোশাকের টেকনিসিয়ানরা তখন সেখান থেকে চলে আসছিল। এদিকে সেকেণ্ডের কাঁটাটা তখন একটানা নিচের দিকে নেমে চলেছে,—পনেরো, চোদ্দ, তেরো, বারো.....।

প্ল্যাটফর্মের অপর দরজা খুলে যেতেই টেকনিসিয়ানরা বেরিয়ে এলো। কেউ কোনো কথা বলছে না, সবার লক্ষ্য সেই জেনারেটারের দিকে। কিন্তু মেসিনের কোনো সারা-

শব্দ নেই। কেবল সেই ছোট্ট ডিজিটাল কাউন্টারের টিক্‌টিক্‌ শব্দ ভেসে আসছিল, এগারো, দশ, নয়.....।

ডঃ সওয়ের তাকালেন জুডের দিকে এবং হাত তুলে দাঁড়লেন। তাঁর দেখাদেখি মারলিনও তাই করল। তাদের দিকে তাকিয়ে জুডও মৃদু হেসে হাত তুলল।

পাঁচ, চার, তিন, প্রতিটি টিক্‌ টিক্‌ শব্দ বাতাসে ভেসে আসে এবং তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। দুই, এক, জিরো। আর সঙ্গে সঙ্গে সার্কিটের আলো লাল থেকে সবুজে রূপান্তরিত হলো। টেকসিয়ানরা হাততালি দিয়ে তাদের উল্লাস প্রকাশ করল।

জুডও হাততালি দিয়ে জার্মান ডাক্তারের দিকে তাকাল। 'অভিনন্দন জানাই ডঃ স্কোয়েনবার্ন।'

হাত বাড়িয়ে জুডের সঙ্গে করমর্দন করে বলল সে, 'আমিও আপনাকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিঃ ক্রেনি।'

সওয়ের এবং মারলিনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল জুড। 'তিন বিলিয়ান ডলার। প্রচুর লাভ হবে।'

অফিসে এলো ফার্স্ট এডি। 'ওরা সবাই স্থিতি হয়ে বসেছে,' জুডের উদ্দেশে বলল ফার্স্ট এডি। 'আমি ভেবেছিলাম, মহাঋষি তাঁর প্রহরীদের অস্ত্র বহন করার অনুমতি দেবেন না।'

'তা ঠিক,' বলল জুড।

'কিন্তু তারপরেও কোথাও যেন একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে,' বলল ফার্স্ট এডি। 'তার প্রতিটি লোকের হাতে একটা করে উজি মেসিন অটোমেটিক দেখা গেছে।'

'সোফিয়ার সঙ্গে কথা বলেছ?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'না, পারিনি। একটি মেয়ে বলল, 'তাঁর শরীর খারাপ, শুয়ে আছেন।' আরো বলল ফার্স্ট এডি, 'কিন্তু কথাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। কারণ আমার দিকে তিনি এমন নির্লিপ্ত ভাবে তাকালেন, দেখে মনে হলো, তিনি যেন আদৌ আমাকে চেনেন না।'

'হয়তো সে অসুস্থ,' বলল জুড। 'ডঃ সওয়েরকে ডেকে বলছি, তিনি যেন তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখেন।' এই বলে রিসিভারটা সে তুলতেই ডঃ স্কোয়েনবার্ন তার অফিসে এসে হাজির হলো। তারপরেই মহাঋষিকে দেখা গেলো 'হ্যাঁ, তারপর!'

'আমি জুড ক্রেনি,' নিজের পরিচয় দিয়ে বলল জুড। 'শুনলাম সোফিয়া অসুস্থ। ভাবছি ডাক্তারকে বলবো, তাকে একবার দেখে আসার জন্য।'

'কিন্তু আমার মনে হয়, তার দরকার হবে না,' মহাঋষির কণ্ঠে আশ্বাসের সুর ধ্বনিত হতে দেখা গেলো। ঠাণ্ডার সঙ্গে উনি লড়াই করছেন। মনে হয়, অনেক দিন হলো ঠাণ্ডাটা ওঁর লেগেছে।'

'হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক তাঁর কাজে লাগতে পারে,' বলল জুড। ইন্টারনাল স্ক্রীনের

বোতাম টিপল সে চটপট। মহাঋষির মুখটা ভরে গেলো পর্দায়। অটোমেটিক ফোকাসটা ঘুরিয়ে দেয় জুড। আর তখনি পর্দায় মহাঋষির পাশে বিছানার ওপর সোফিয়াকে বসে থাকতে দেখা গেল।

'মনে হয়, কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে সে,' উত্তরে বলল মহাঋষি।

'বেশ, ভালো হলেই আমাকে খবর দেবেন।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখল জুড অতঃপর।

তার কথা বলার আগেই স্কোয়েনবার্ন মুখ খুলল। 'আপনি জানেন, কে ওই মহাঋষিটি?'

'আপনিই বলুন,' স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল জুড।

'KGB'র লোক,' উত্তরে বলল স্কোয়েনবার্ন। 'ওকে অনেকদিন থেকে আমরা জানি, কিন্তু এতো কাছ থেকে কখনো দেখিনি।'

'আপনি বললেন, "আমরা" জানি,' বলল জুড। 'আমরা বলতে আপনি ছাড়া আর কারা?'

'মোসাদ,' বলল স্কোয়েনবার্ন। 'অবশ্য আমি তাদের এজেন্ট নই, কিন্তু তাদের সঙ্গে অনেকবার আমি কাজ করেছি। এমন কি সেই আইসম্যানের ব্যাপারেও। KGB তাকে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের থেকে আমরা এগিয়েছিলাম।'

'ওসব কথা ছেড়ে দিন,' কাজের প্রসঙ্গ তুলল জুড। 'আপনার কি মনে হয় মহাঋষির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোফিয়া কাজ করছে?'

'ওই মেয়েটিকে আমি জানি না।'

এই সময় জুডের দিকে তাকিয়ে ফার্স্ট এডি বলে উঠল, 'সে যে সে ধরনের মেয়ে আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, তারা তার কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকবে।'

জুডের কাছে এগিয়ে এসে ডঃ সওয়ের জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আমরা কি করব?'

'প্রথমেই আমি চাইব, আপনি আর মারলিন এখান থেকে চলে যান।

'জাহান্নামে যাওয়ার মতো!' জিজ্ঞেস করল মারলিন।

'তোমার পছন্দ বলে কিছু নেই,' বলল জুড। 'তোমাকে আর সওয়েরকে ছাড়া ক্রে[illegible] ইন্ডাস্ট্রিজ রসাতলে চলে যাবে।'

তারপরেই কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করল জুড। 'CI-2-তে তেল ভরা হয়েছে?'

'হ্যাঁ মিঃ ক্রেনি।'

'তাহলে সেটা এখনি ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হও।' রিসিভার নামিয়ে রেখে তাদের দিকে তাকাল জুড। 'ঠিক আছে, চলে যাও, তোমাদের দু'জনের দায়িত্ব অনেক।' তারপর তাঁর দিকে ফিরে আবার বলল, 'ডাক্তার, আপনিও চলে যান। এটা আপনার যুদ্ধক্ষেত্র নয়।'

'এটা কি জাহান্নামে যাওয়া নয়!' বলল স্কোয়েনবার্ন। 'গত কুড়ি বছর ধরে আমার আত্মীয় স্বজনরা রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টা করছে।'

'তা হলে ক্যারাকাসে কার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল জুড।

'সুইজারল্যাণ্ড থেকে আমার স্ত্রী ও ছেলে সেখানে এসেছিল। ছেলেটির একটা অপারেশানের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া, আপনার মতো এই

রিঅ্যাক্টার প্ল্যান্টটা আমাদের সন্তানের মতোন।'

মারলিন এবং সওয়েরের দিকে ফিরে জুড বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা এখন যেতে পারো। তোমরা আকাশে উড়লেই প্রতি দু'ঘন্টা অন্তর আমরা খোঁজ নেবো।'

নীরবে তারা দু'জন জুডের সঙ্গে করমর্দন করল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ফাস্ট এডির দিকে ফিরে বলল জুড, 'বিমান পর্যন্ত ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও। দেখ, তারা যেন অবশ্যই বিমানে ওঠে। আমি চাই না তারা করিডরে কোথাও লুকিয়ে থাকুক।'

টেলিভিসানের পর্দায় চোখ রাখল জুড, কন্ট্রোল টাওয়ারের ক্যামেরার লেন্স তখন মালভূমি উপত্যকার দিকে । তখন C1-2 বিমান রানওয়েতে চলতে শুরু করেছিল। একটু পরেই সেটা ভাসতে থাকল আকাশে পাখির মতো ডানা মেলে। তারপরেই রানওয়ের আর একটা বিমান চোখে পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল টাওয়ারের খবর নিলো, 'ওটা কার বিমান?'

কন্ট্রোল টাওয়ার বলার আগেই ডঃ স্কোয়েনবার্ন উত্তর দিলো, 'ওটা আমার। এই বিমানে টেকনিসিয়ানরা রিওয় ফিরে যাচ্ছে।'

তারপরেই কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে উত্তর এলো, 'রিওয় যাওয়ার জন্য ওটা B-737 স্যার।'

· 'ঠিক আছে, আর কোনো বিমান কি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে?'

'কেবল দু'টি হেলিকপ্টার এবং এই মাত্র শেষ পার্টিকে নিয়ে 737 বিমান এসে পৌঁছল এখানে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখার পরেই ফাস্ট-এডি অফিসে এসে হাজির হলো। 'ওরা চলে গেছে,' বলল ফাস্ট এডি।

'ঠিক আছে,' এই বলে পার্সোনেল ডাইরেক্টারকে ফোন করল জুড। 'মিঃ ক্রেনি বলছি। এখানে আমাদের ক'জন কর্মচারী আছে বলতে পারো?'

'কমপিউটার দেখে বলছি স্যার,' একটু পরেই উত্তর দিলো সে। 'সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশজন।'

'ওরা কি সশস্ত্র?'

'না স্যার, ওদের কাজ কেবল স্টাফ এবং অতিথিদের গতিবিধি রেকর্ড করা। ওরা সিকিউরিটি গার্ড নয়।'

'তাই বুঝি!' বলল জুড। 'ঠিক আছে, নিঃশব্দে জরুরী প্রয়োজনে ওদের এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য সতর্ক থাকতে বলো।'

'ঠিক আছে মিঃ ক্রেনি, আমি জ্যাক সোমের, সিকিউরিটি সেন্ট্রালের লোক, এবং সশস্ত্র। আমার সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলবেন স্যার।'

'ধন্যবাদ, এখন আপাতত তুমি তোমার ডেস্কের সামনে থাকো। পরে প্রয়োজন হলে আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।' রিসিভার নামিয়ে রেখে ফাস্ট এডি এবং ডঃ স্কোয়েনবার্নের দিকে তাকাল। 'আমার ধারনা, যদি সোফিয়াকে ডোপ দেওয়া হয়ে থাকে,

যতক্ষণ না তার মাথাটা পরিস্কার হচ্ছে, মহাঋষি আমাদের সঙ্গে কখনোই যোগাযোগ করবে না। সে আমাদের বোকা বানিয়েছে। আমাদের ফাঁদে ফেলা হয়েছে। যাইহোক, এখন বলো কতলোক তুমি ম্যালিবুতে পাঠাতে পারবে, এখনি!'

'বাইশ থেকে তেইশজন,' বলল জন।

'আমার মনে হয়, শিশুটি সেখানেই আছে,' বলল জুড। 'আর এই ভাবেই সোফিয়াকে প্রলুব্ধ করে সে তার কাজ হাসিল করতে পারে।'

'আপনি কি আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন?' জিজ্ঞেস করল জন।

'হ্যাঁ, হেলিকপ্টার ব্যবহার করো। তোমাদের পথে যেই বাধা সৃষ্টি করুক না কেন উড়িয়ে দেবে তাদের। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিও আমার অনুমান ঠিক না ভুল।'

'ঠিক আছে, আমরা কাজ শুরু করছি,' বলল জন।

ঘন্টা খানেক পরে ফোন করল মহাঋষি। 'মিঃ ক্রেনি, এখন সোফিয়া অনেকটা ভালো বোধ করছে। সম্ভবত এখন আমরা মিলিত হতে পারি।'

'অবশ্যই!' বলল জুড। 'ধরুন যদি আমি আপনার স্যুইটে দেখা করি, তাহলে পরে সেখান থেকে আমি আপনাকে জানাডুতে নিয়ে যেতে পারি। সদ্য নির্মিত নিউক্লিয়ার জেনারেটর এবং কৃত্রিম সেল-ক্লোন ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে পারি, আপনার খুব ভালো লাগবো, দেখবেন। মিনিট খানেকের মধ্যে আপনার কাছে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে ডঃ স্কোয়েনবার্নও থাকবে। এই পুরো প্ল্যান্টটা তারই তৈরী, আর আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে জবাব দিতে পারবে সে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখেই দ্রুত ফাস্ট এডির দিকে ফিরে বলল জুড, 'এখনি কন্ট্রোল টাওয়ারে গিয়ে কম করে চারটে মিসাইল তৈরী রাখতে বলো, আর আমার পরবর্তী ডাকের জন্য সেখানে অপেক্ষা করো।' তারপর ডঃ স্কোয়েনবার্নের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞে করল, 'বন্দুক কি করে ব্যবহার করতে হয় জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি বৈকি।'

'তোমার স্লীভ গানটা ওঁকে দিয়ে দাও,' ফাস্ট এডির উদ্দেশে বলল জুড। 'সেই সঙ্গে কি করে সেটা ব্যবহার করতে হয়, দেখিয়ে দাও।'

এই সময় জ্যাককে ফোন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে থাকে জুড : 'শোনো জ্যাক, আমি আর ডঃ স্কোয়েনবার্ন এখন মহাঋষির কাছে যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো প্রথমে জেনারেটার প্ল্যাটফর্মে, সেখান থেকে ল্যাবরেটারিতে। সম্ভব হলে টেলিভিশন পর্দায় আমাদের ওপর নজর রেখো। যদি দেখ আমাদের টেকনিসিয়ান কিংবা অন্য লোকদের বিপদ হতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্যত্র নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তবে আমার কিংবা ডঃ স্কোয়েনবার্নের যদি কোনো বিপদ দেখ, কিছু করতে যেও না। এই মুহূর্তে আমাদের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি,' বলল জ্যাক।

ফাস্ট এডির দিকে ফিরে বলল জুড, 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

মহাঋষির একজন দেহরক্ষী দরজা খুলে দেয়। ঘরের ভেতরে এগিয়ে গেলো জুড, ডঃ স্কোয়েনবার্ন তাকে অনুসরণ করল। তাকে দেখে মহাঋষি বলে উঠলেন, 'আপনার শান্তি হোক।'

হাসল জুড। 'এবং আপনারও, আপনি যে আমার গুরু।'

পাশের ঘর থেকে সোফিয়া এসে হাজির হলো সেখানে। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জুড তাকে জড়িয়ে ধরে তার চিবুকে চুমু খেলো। তার মুখটা অদ্ভুত শান্ত দেখাচ্ছিল। 'সোফিয়া, তুমি এখন ভালো বোধ করছ তো?'

'অনেক ভালো। মনে হয়, ফ্লুর মতো কিছু হয়ে থাকবে।'

'হয়তো এখন বিছানায় শুয়ে থাকলে আরো আরাম পেতে পারো তুমি,' বলল জুড। 'কোনো তাড়া নেই। কাল সকালে আমরা আবার মিলিত হতে পারি।

তার মনে হলো, কথাটা শুনে সোফিয়ার চোখের ঈশান কোণে বুঝি বা একটু ভয়ের আর্তি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। পরক্ষণেই মহাঋষির দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে সোফিয়া বলে উঠল, 'না, না তা হবে কেন? সত্যি বলছি, এখন আমি অনেক সুস্থবোধ করছি।'

মাথা নাড়ল জুড। ডঃ স্কোয়েনবার্নের দিকে তাকিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় জুড, 'ইনি হলেন ডঃ স্কোয়েনবার্ন। উনি ছাড়া এই প্ল্যান্ট তৈরী কখনোই সম্ভব হতো না।'

প্রথমে সোফিয়া এবং পরে মহাঋষির সঙ্গে করমর্দন করে ডঃ স্কোয়েনবার্ন গদগদ হয়ে বলল, 'আমি গর্বিত।'

'যদি আপনি প্রস্তুত থাকেন, ডঃ স্কোয়েনবার্নকে আমরা অনুসরণ করতে পারি।'

'মিঃ ক্রেনি, যদি কিছু মনে না করেন,' মহাঋষি বলে উঠলেন, 'অন্য এক সময় আমরা নিউক্লিয়ার জেনারেটর দেখতে পারি না? আমরা বরং ল্যাবরেটারিতে বেশী আগ্রহী। আমার মনে হয় সোফিয়া বেশী ঘোরাঘুরি করলে বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে।'

এ কথায় স্কোয়েনবার্নের অসন্তুষ্টি জুডের দৃষ্টি এড়াল না। জেনারেটার তার ছেলের মতোন। কিন্তু তবু কেন জানি না, জার্মান ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। কঠিন সুরে বলে উঠল সে, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!'

তারপর নীরবে সে তাদের ফ্লোর এলিভেটারের দিকে নিয়ে গেলো। ছোট্ট এলিভেটারটা মহাঋষির দেহরক্ষীদের ভীড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে গেলো। সেই ভীড়ে অন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে সোফিয়ার হাত স্পর্শ করতেই জুড অনুভব করল, তার হাতটা বরফের মতো ঠাণ্ডা।

ল্যাবরেটারিতে প্রবেশ করার আগে জুড বলে উঠল, 'এখানে প্রবেশের আগে স্নান সেরে আমাদের সার্জিকাল ইউনিফর্ম পড়তে হবে, হাতে রাবার গ্লাভস এবং মাথায় সার্জিকাল টুপি—'

'এতো সব ঝামেলার বদলে ল্যাবরেটারির জানালা দিয়ে দেখায় উপায় নেই?'

চকিতে জুডের দিকে তাকাতেই মাথা নাড়ল সে। ডঃ স্কোয়েনবার্ন তখন উত্তরে বলল, 'করিডরের বাইরে জানালাগুলো ডাবল-প্লেট কাচে মোড়ানো আছে।'

'তার চেয়ে টেকনিসিয়ানদের ডেকে বলছি, টেলিভিসানের পর্দায় কোষ সংস্কৃতি যেন দেখান হয়,' জুড পরামর্শ দিলো।

জুডের কথা মতো পর্দায় সত্যিকারের কোষ এবং কৃত্রিম কোষ, এই দু'ভাগে প্রতিফলিত হতে দেখা গেলো। মহাঋষিকে গভীর আগ্রহ সহকারে চোখ পিটপিট করে তাকাতে দেখা গেলো। কিন্তু জুড লক্ষ্য করল, সোফিয়ার মধ্যে তেমন আগ্রহ নেই। এই সময় সোফিয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি একবার বাথরুমে যেতে পারি?'

'দাঁড়াও,' জুড বলল, 'আমি তোমাকে বাথরুমের দরজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি,' এই বলে উঠে দাঁড়াল সে।

ফিরে এসে কৌচে বসে মহাঋষিকে জুড জিজ্ঞেস করল, 'জানাডুর ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়?'

'এ যেন এক অভূতপূর্ব সংযোজন,' উত্তরে বলল মহাঋষি।

ইতিমধ্যে বাথরুম থেকে ফিরে এসেছিল সোফিয়া। তার দিকে তাকাল জুড। তার চোখ দুটো পরিস্কার এবং এখন বেশ সতর্ক। মহাঋষির ঠিক পাশেই বসেছিল সে।

'এখন,' বলল জুড, 'সেই সব নোটগুলো থেকে আমরা কি আবিস্কার করেছি, আলোচনা করা যাক।'

সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে মহাঋষি তখন বললেন 'আমার মনে হয়, আমার চেয়ে সোফিয়া ভালো করে ব্যাখ্যা করে পারবে।'

জুডের দিকে তাকাল সোফিয়া। 'আমরা যতখানি জেনেছি, সত্যি কথা বলতে কি, ডঃ জ্যাবিস্কির নোটে তার থেকে খুব বেশী জানা সম্ভব হয়নি। এই প্রথম আমাদের উপলব্ধ জ্ঞান হলো, ডঃ জ্যাবিস্কি তাঁর সেলুলার থেরাপির কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানর জন্য মানুষের ভ্রূণ ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে মানুষের কোষ তথা ভ্রূণের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যান। তবে তাঁর কাছে প্রধান সমস্যা ছিলো, কয়েকটি বিষয়ের সংখ্যা অযথা বেশী হওয়ার দরুণ এই সব কোষের ইনজেকসান মানুষের দেহে অসহনীয় হয়ে ওঠে। অনেক ভ্রূণেই দেখা যায়, প্রয়োগের সময় হত্যার সামিল হয়ে গেছে।'

'তাহলে সেটা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাড়তি কোনো সংযোজনের কাজ কি করতে পারে? এই খবরটা আমরা ইতিমধ্যে নিজেরাই সংগ্রহ করেছি।' বলল জুড।

'আর সেই কারণেই তো তোমাকে DNA জেনেটিক কারিগরি অগ্রগমনের কাজ চালু রাখতে বলা হচ্ছে, এই ভাবেই কৃত্রিম মানুষের কোষ তথা ভ্রূণের-সৃষ্টি করা যেতে পারে, যার অসময়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম থেকে যায়,' বলল সোফিয়া।

পালা করে তাদের দিকে তাকাল জুড। 'ভালো কথা, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, এ ব্যাপারে আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। অমরত্ব লাভের যাত্রাপথ আমরা শুরু করে দিয়েছি। মানুষ এখন অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে।'

'বাঃ, তাই নাকি? এ ব্যাপারে আপনার আবিস্কারের ফরমূলায় আমি খুবই আগ্রহী,' নম্রভাবে বলল মহাঋষি।

হাসল জুড। 'এ আমার নিজস্ব, একেবারে একার। অন্য কাউকে সেটা ভাগ দেওয়ার কথা আমি ভাবিনি।'

'আমার মনে হয়, আপনার ভাবা উচিত। জগতের কাছে আপনি ঋণী,' অসতর্ক ভাবে বললেন মহাঋষি।

শব্দ করে হাসল জুড। 'কারোর কাছে কোনো কিছুর জন্যে আমি ঋণী নই।'

'আমি আপনার সঙ্গে এক মত হতে পারছি না,' এবার যেন একটু কঠিন সুরেই বললেন মহাঋষি। 'এর ওপর আপনার ছেলের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে।'

'আমার কোনো ছেলে-টেলে নেই।'

'কেন, যে ছেলে সোফিয়া দশমাস দশদিন পেটে ধরেছিল?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মহাঋষি।

'সেটা তার কেবল নিজের ছেলে,' সরাসরি অস্বীকার করল জুড। 'তার জন্যে আমি দায়ী নই।'

তার চোখে স্থিরদৃষ্টি ফেলে বললেন মহাঋষি, 'এ সব খেলা এখন বন্ধ করা যাক।'

'কিন্তু আমি তো খেলা শুরু করিনি।

মহাঋষি মুহূর্তখানেক নীরব থেকে বললেন, 'মাত্র একটা টেলিফোন, আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির মৃত্যু।'

রিসিভারটা তাদের সামনে কফির টেবিলের ওপর রেখে নির্লিপ্ত গলায় জুড বলল, 'আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে তার দেহরক্ষীরা তাদের মেসিন পিস্তল বার করল। তেমনি দৃঢ়স্বরে বললেন মহাঋষি, 'সেই সঙ্গে সোফিয়াকে হত্যা করার জন্যও আমরা প্রস্তুত। শুধু সে নয়, তার সঙ্গে তার আর এক শিশুরও মৃত্যু হবে, যাকে সে বহন করছে, যে এখনো পৃথিবীর আলো দেখেনি।'

সোফিয়ার দিকে স্থির চোখে তাকাল জুড। 'কথাটা কি সত্যি?'

সোফিয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। 'হ্যাঁ।'

'বোকা তুমি', চিৎকার করে উঠল জুড।

'লক্ষ্মীটি জুড,' সোফিয়া মিনতি জানায়, 'দয়া করে ফরমূলাটা ওঁকে দিয়ে দাও।' ওটা এমন কিছু জরুরী নয়।'

'আমার কাছে অবশ্যই জরুরী,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জুড।

'ওঁরা যদি সেটা পেয়েও যায়, তবু সেটা তো তোমার কাছেই থেকে যাবে।

হাসল সে। 'সত্যি তুমি একটি বোকা গর্দভ। কেন তুমি বুঝতে পারছ না, যে মুহূর্তে উনি ফরমূলাটা হাতে পাবেন, তখন আমরা সবাই মৃত। উনি আমাদের সেই ফরমূলার অংশীদার হিসেবে মেনে নিতে পারবেন না।'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিলো জুড।

'মিঃ ক্রেনি' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল জন।

'হ্যাঁ জন,' উত্তরে বলল জুড।

'আমাদের অনুমানই ঠিক। শিশুটিকে আমরা পেয়েছি। সে এখন ভালোই আছে। সে এখন তার ঠাকুমার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য কাঁদছে।'

'ধন্যবাদ জন,' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মহাঋষির দিকে তাকাল জুড, তার ঠোঁটে খুশির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'আপনার একটা হুমকি ব্যর্থ হয়েছে।'

তার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। 'এখনো অন্যেরা আমাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে।' তাঁর দৃষ্টি ফিরে চলে তাঁর দেহরক্ষীদের ওপর। তারা সামান্য একটু নড়ল-চড়ল। তাদের বন্ধুকের আওয়াজটা ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল। শ্বোয়েনবার্নের বুকটা তাদের গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হতেই চেয়ারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর চেয়ার সমেত তার ভারী দেহটা মেঝের ওপর ভূলুণ্ঠিত হওয়ার শব্দ হলো।

মহাঋষিকে কেমন অদ্ভুত নির্বিকার ও নিস্তেজ দেখাল। তবে তাঁর কথায় দৃঢ়তা প্রকাশ পেলো। 'এর থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমার কথা মতো কাজ করতে আমরা প্রস্তুত। পরবর্তী বুলেট সোফিয়ার জন্য। অবশ্য যদি আপনি ফরমূলাটা আমার হাতে তুলে না দেন.....,

সোফিয়ার দিকে তাকাতে গিয়ে সে দেখল, ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে, মুখে কথা নেই, চাপা ঠোঁট। তার কেমন মায়া হলো। মহাঋষির দিকে ফিরে সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমার কাছে ফরমুলাটা আছে বটে, তবে সেটা অত্যন্ত জটিল এবং সেটা তোলা আছে কমপিউটার সেন্ট্রালে।'

'আপনি সেটা এখানে স্থানান্তর করতে পারেন, পারেন না?' বৃদ্ধ জানতে চাইল।

'হ্যাঁ পারি।'

বন্দুকের নল সোফিয়ার দিকে তাক করা। 'তাহলে তাই করুন,' হুকুম করলেন মহাঋষি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমপিউটার ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলো জুড। একজন দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে তাকে অনুসরণ করলেন বৃদ্ধ। অপর দেহরক্ষী সোফিয়াকে আগলে রাখল। কমপিউটারের স্যুইচ টিপে কমপিউটার সেন্ট্রালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করল জুড। পর্দায় সবুজ আলো দেখা দিলো।

অ্যাকসেস কোডে টাইপ করল জুড : "DNA HCC ENG. PROJ. FORM."

'এর অর্থ?' জিজ্ঞেস করলেন মহাঋষি।

"DNA হিউম্যান সেল ক্লোন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোযেক্ট ফরমূলা,' উত্তরে বলল জুড।

'এর একটা কপি করতে পারেন?'

'হ্যাঁ,' এই বলে টেপ মেসিনের দিকে আঙুল দেখাল জুড। 'প্রথমে "ON" বোতামটা টিপে তারপর "COPY" বোতামটা টিপলেই ফরমূলা কপি হয়ে আসবে।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'পৌনে চার ঘন্টা।'

'গতি বাড়িয়ে দিতে পারেন না?' মহাঋষি জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, তবে একটা অক্ষরের সঙ্গে আর একটা অক্ষর জড়িয়ে যাবে, পড়তে পারবেন না।'

'ঠিক আছে, আপনার মতো করে কাজ করুন।'

ওদিকে টেলিভিসান পর্দায় ভয়ার্ত সোফিয়ার মুখটা ভেসে ওঠে। অপর দেহরক্ষীকে তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তার অটোমেটিক পিস্তলের নলটা সোফিয়ার পিঠে ঠেকান। যদি জুড তার কথার খেলাপ করে, মহাঋষির নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের পিস্তল গর্জে উঠবে, তখন ডঃ স্কোয়েনবার্নের মত অবস্থা হবে সোফিয়ার।

সোফিয়ার জীবন এখন অনিশ্চিত; তবু সেই অবস্থায় জুডের গাঢ় নীল চোখের ওপর তার দৃষ্টি স্থির। 'সত্যি আমাদের ছেলে নিরাপদে আছে?'

'হুঁ। জনের কথা তুমি শুনেছ? এতক্ষণে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সে নিশ্চয়ই বারবারার কাছে সান ফ্রান্সিসকোর পথে রওনা হয়ে গেছে।'

ধীরে ধীরে শ্বাস নিলো সে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' ফিসফিসিয়ে বলল সোফিয়া।

জুড নীরব। কমপিউটার পর্দায় তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ, কালির লেখাগুলো অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য। মহাঋষির দিকে ফিরে তাকাল সে। 'জানি না, এই লেখাগুলো আপনি বুঝতে পারবেন কিনা।'

'হয়তো আমি পারবো না,' বলল বৃদ্ধ, 'তবে আমাদের বিজ্ঞানীরা পারবে।'

'হয়তো পারবে,' ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে ডঃ স্কোয়েনবার্নের মৃতদেহর দিকে তাকাল। 'ওঁকে হত্যা করে কি লাভ হলো আপনার?'

'ওই ইহুদি ডাক্তার?' বৃদ্ধ বললেন, 'ওকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে জানি। ওর মৃত্যুর প্রয়োজন ছিলো। আর এও হতে পারে, আমরা শুধু খেলার ছলে খেলছি না, সেটা আপনাকে বোঝাবার জন্যই এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ আমাকে করতে হয়েছে।'

এবারেও জুড নীরব। চকিতে একবার পর্দার দিকে তাকাল। 'আমার ধারণা, এই একই ভাবে সত্যিকারের মহাঋষিকে আপনি শেষ করেছিলেন?'

'বছর ছয় আগে হতো,' বলল, যাকে ঋষি। 'তার বোন কখনো জানতে পারেনি, একজন মৃত ব্যাক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিল সে।' চকিতে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মহাঋষি, 'আর কতো সময় লাগবে?'

'প্রায় মিনিট চারেক।'

'তাহলে কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগযোগ করে ওদের বলুন, আমাদের বিমানটা যেন রানওয়েতে রাখা হয়, আর বিমানের খোলা দরজার সামনে একটা স্বয়ংক্রিয় মই লাগান থাকে। তারপর এলিভেটারের সামনে ইঞ্জিন চালু অবস্থায় একটা ল্যান্ড রোভার গাড়ি রেখে চালককে চলে যেতে হবে।'

এক মুহূর্ত মহাঋষির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে জুড তার আজ্ঞা পালন করল।

ইতিমধ্যে টেপের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কমপিউটার বন্ধ করে দিলো জুড। 'টেপটা বার করে আনুন,' বললেন মহাঋষি।

রেকর্ডার থেকে টেপটা বার করে মহাঋষির হাতে তুলে দিলো জুড।

টেপ কেসের মধ্যে সেটা চালান করে দিয়ে মহাঋষি হুকুম করলেন জুডকে, 'দরজা খুলে দিন।'

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো জুড। দরজার ওপারে তাদের জন্যে আরো তিনজন দেহরক্ষী অপেক্ষা করছিল।

'আগে মহিলা,' সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে মহাঋষি বলল। 'তারপর আপনি।'

সোফিয়াকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে দেখল জুড। তার দিকে তাকাল। 'আশাকরি ঈশ্বর আমাদের ওপর নজর রাখছেন। এখন আমরা কেবল নিজেদের মধ্যে যেন শান্তি রাখতে পারি।'

ওদিকে টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারটা হাতে তুলে নেয় জুড। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ফাস্ট এডি ফোন করছিল। 'স্যার, সব কিছুই তৈরী।'

'সব কিছুই তৈরী?' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ফাস্ট এডির কথাটাই পুনরাবৃত্তি করল জুড।

'তাহলে মেয়েটিকে অনুসরণ করুন,' বলল মহাঋষি। 'আমরা সবাই এক সঙ্গে এলিভেটার পর্যন্ত যাবো।'

এলিভেটারের সামনে অপেক্ষা করছিল ল্যাণ্ড রোভার। অদূরে 707 বিমান দাঁড়িয়েছিল, দরজা খোলা, স্বয়ংক্রিয় মই ঝুলছিল মাটিতে।

বৃদ্ধ এলিভেটার থেকে বেরিয়ে এসে জুড এবং সোফিয়ার উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা দু'জন যদি প্রাণে বেঁচে থাকতে চান, হাত তুলে আমাদের সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে চলুন।'

গাড়ির সামনে পৌঁছতেই, দ্রুত লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন মহাঋষি। একজন দেহরক্ষী তেমনি লাফ দিয়ে তার পাশে গিয়ে বসল, তার হাতে উদ্যত অটোমেটিক পিস্তল। বাকী দেহরক্ষীরা জুড এবং সোফিয়াকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে গাড়ির পিছনের আসনে গিয়ে বসল। ওদিকে ল্যাণ্ড রোভার চলতে শুরু করল। মাটিতে একবার ঘুরপাক খেয়ে প্রহরীদের দিকে তাকাল, তারা হাতের অটোমেটিক পিস্তল তাদের দিকে তাক করে বসেছিল। জুড তার হাতের স্লীভ গান তুলে সোফিয়াকে আড়াল করে ট্রিগার টিপল। মনে হলো, তাদের মধ্যে একজনের বুকে গুলি লেগে থাকবে, কারণ পিছনের আসনে ঢলে পড়েছে সে। ল্যাণ্ডরোভার তখন তাদের কাছ থেকে প্রায় একশো গজ দূরে। অপর দেহরক্ষী তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। জুড দ্রুত সোফিয়াকে আড়াল করে সরে দাঁড়াল সেখান থেকে।

আর তারপরেই ATW মিসাইল ছোঁড়ার হুইসিল শুনতেই বাতাসে অদ্ভুত আলোড়ন অনুভব করল জুড, সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। ল্যাণ্ড রোভারের দিকে তাকিয়ে সোফিয়াকে আরো কাছে টেনে নিলো সে। এই সময় একটা আগুনের পিন্ড তাদের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যেতে দেখা গেলো। তারপর আর একটা মিশাইলের আওয়াজ। আর একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। মিশাইলটা আঘাত করল সেই অগ্নিপিণ্ডটাকে। সেটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

সোফিয়াকে মাটি থেকে তুলে দাঁড় কবিয়ে জুড তাকে সঙ্গে নিয়ে এলিভেটারের দিকে ছুটতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে ফার্স্ট এডি তার লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'বস, আপনি ঠিক আছেন তো?' জিজ্ঞেস করল ফাস্ট এডি।

'হ্যাঁ, ঠিক আছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জুড।

'আমাকে বোকা বানাবেন না,' হেসে বলল ফার্স্ট এডি। 'এ যেন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছেন আপনি।'

পরদিন সকালে মহাঋষির মেয়েগুলোকে বিমানে উঠতে দেখল ফাস্ট এডি। টেলিভিসান পর্দায় সেই দৃশ্যটা দেখে সে বলে উঠল, 'ওই সব মেয়েগুলোর মধ্যে থেকে একটাকেও মনের মত পেলাম না।'

'অতো লোভ ভাল নয়,' হাসতে হাসতে বলল জুড।

এই সময় নক্ করার শব্দ হলো দরজায়। ফাস্ট এডি দরজা খুলে দেয়। 'ভেতরে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই ঘরে ঢুকে জুডের সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমি দুঃখিত,' বলল সে।

'দুঃখ করার কিছু নেই,' উত্তরে বলল সে। 'সব কিছুই ঠিক ঠিক চলেছে আমার পরিকল্পনা মতো, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে যাচ্ছি।'

'না কিছুতেই তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না,' বলল সোফিয়া, 'যেমন পারেনি হাগেস। এখানে তোমার সব কিছুই আছে, সব কিছুই তুমি করেছ। কিন্তু তোমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে আসছে না। এমন কি তুমি যদি এখানে একা একা থাকতে চাও—চিরদিনের জন্যে তুমি বেঁচে থাকতে পারো না, সে তুমি যতোই চেষ্টা করো না কেন। তোমাকে একা একা মরতে হবে।'

চুপ করে থাকে জুড।

তার চোখে চোখ রেখে সোফিয়া বলল, 'বিদায় জুড ক্রেনি, বিদায়। তোমার সম্পর্কে তোমার সন্তানদের সব বলব।'

তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে জুড জিজ্ঞেস করল, 'বিদায় বলছ কেন?'

'কেন, অন্যদের সঙ্গে আমাকেও কি চলে যেতে হচ্ছে না?'

'সে কথা আমি বলিনি,' বলল জুড। 'তোমার জন্য টেপটা আমি মুছে দিয়েছি। তোমার জন্যে ল্যাবরেটারির বিদ্যুৎ আমি অফ করে দিয়েছিলাম সেই সময়। তারপর জানাড়ুতে ক্রেনি ইন্ডাস্ট্রিজ নিউক্লিয়ার মেডিসিন রিসার্চের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, এই রিসার্চ সেন্টার ডঃ স্কোয়েনবার্নের নামে হবে। আর এখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও?'

'আমি তা বলিনি,' বলল সোফিয়া, তার চোখে জলের বিন্দু দেখা গেলো।

'তাহলে অপেক্ষা করো,' সোফিয়ার হাত ধরবার জন্য জুড তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো। 'একটু অপেক্ষা করো, আমরা এক সঙ্গে বাড়িতে ফিরে যাবো।'

অনুবাদ ☐ সৌরেন দত্ত

নেভার লিভ মি

শেষ থেকে শুরু

মধ্যাহ্নভোজ সেরে ফিরে যখন অফিসে এলাম, তখন ঠিক দুপুর আড়াইটে। প্রবেশ পথে দরজাব সামনে আমার সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। 'সেই কন্ট্রাক্টগুলো উকিলবাবুর কাছ থেকে এসেছে?' সপ্রশ্নচোখে তাকালাম তার দিকে।

মাথা দুলে ওঠে মেয়েটির, 'সেগুলো আমি আপনার ডেস্কের উপরে রেখে দিয়েছি ব্র্যাড।'

অতঃপর আমি আমার অফিসঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম. ডেস্কের পিছনে বসে সেগুলো হাতে তুলে নিলাম। আঙ্গুল দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাই। ঘন টাইপে কারণগুলো যথার্থ উত্তেজনাপূর্ণ এবং যে কারণেই হোক না কেন তার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। অনেকগুলো সময়ের সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে। আমি নাচার কিন্তু সেগুলো পড়তে শুরু করা মাত্র একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির আমেজ যেন আমার হৃদয়ের সকল দুয়ার খুলে উন্মোচনের অপেক্ষায়। এ যেন নৈশভোজের পর ব্র্যাণ্ডির থেকেও ভালো, অনেক ভালো।

ছন্দময় দূরভাষের কোলাহলটা কানে আসতেই আমি গ্রাহক যন্ত্রটা তুলে নিই, তখনো আমার দৃষ্টি পড়েছিল কনট্রাক্টের সেই কাগজটার উপরে। 'পল রেমি ওয়াশিংটন থেকে ফোন করছেন,' আমার সেক্রেটারি ফিস্‌ফিসিয়ে শুধালো, যেন এইমাত্র বৃষ্টি হয়ে গেলো এক পশলা, সেই শব্দের রেশ তখনো আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।

'ঠিক আছে,' কথাটা বলে বোতাম টিপলাম বাইরের লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। 'পল,' আমার খুশির আমেজটা ডানা মেলে দেয় আমার কথার তালে তালে, মাউথপীসে মুখ রেখে অসমাপ্ত কথাটা শেষ করি, 'কন্ট্রাক্টটা এখন আমার হাতের মুঠোয়—

'ব্রাড!' তার কণ্ঠস্বর কেমন কর্কশ শোনালো, কথার মধ্যে বাধা দেওয়ার মনোভাব। সেই মুহূর্তে আমার কেন জানি না মনে হলো তার মধ্যে কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই, তা না হলে হঠাৎ আমার বুকটা অমন কেঁপে উঠবে কেন ভয়ে!

'হ্যাঁ পল, তুমি যেন কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে, বলো কি বলতে চাও?'

তার কথাগুলো আমার মাথায় যেন আগুন জ্বালিয়ে দিলো। 'এলেন আত্মহত্যা করেছে!'

'না—না পল!' আমার হাত থেকে কন্ট্রাক্টটা খসে পড়ে যায়, কাগজের লাটগুলো কিছু ডেস্কের উপরে, কিছু বা মেঝের উপরে ছড়িয়ে পড়ে। আমার বুকের উপরে মনে হচ্ছিল কে যেন তখন ভারি পাথর চাপা দিয়ে পালিয়েছে। দু-দুবার আমি মুখ খোলার চেষ্টা করলাম, প্রতিবারই ব্যর্থতায় পেয়ে বসলো আমাকে।

ক্লান্ত বিষণ্ণ শরীরটাকে চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিলাম। ঘরের নির্জনতা আমাকে যেন অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলছিল চারদিক থেকে। মুদিত নয়ন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর। এলেন, শব্দ করে কান্নার শক্তিটাও যেন আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম তখন! নিঃশব্দে আমার মনের সব জ্বালা-যন্ত্রণা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে— এলেন, এলেন, এলেন।

অবশেষে মরিয়া হয়ে জোর করে কথা বলার চেষ্টা করলাম। আমার কণ্ঠনালি রুদ্ধ হয়ে আসছিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর আমার নিজের কানেই কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছিল। 'কেমন,

কেমন করে ও আত্মহত্যা করলো পল? আর কখনই বা?'

'গতকাল রাত্রে।' দূরভাষে তার তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'ঘুমের বড়ি খেয়ে--'

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। অনুভবে মনে হলো, আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে একটু একটু করে। 'কেন ও নিজেকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে নিঃশেষ করে ফেললো পল?' উত্তরটা আমার অজানা ছিলো না তবু কি ভেবে মনের তাগিদে প্রশ্নটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'কেন, ওকি কোন চিঠি লিখে রেখে গেছে?'

'কোন চিঠি নয়। কোন চিরকূট নয়। কিছুই নয়। কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না, কেন ও ওভাবে আত্মহত্যার পথটা পেছে নিতে গেলো?'

দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে একটা স্বস্তির পদধ্বনি যেন আমি শুনতে পেলাম তখন। কাঁপা কাঁপা ঠোঁট দুটি অপ্রিয় কথার জাল বোনার হাত থেকে বিরত থাকার প্রচেষ্টা আমার মধ্যে তখন দারুণ ভাবে সক্রিয়। তবু সব সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে আমার কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কেমন কঠিন শোনালো, 'এ এক ভয়ঙ্কর মানসিক আঘাত পল।'

'এ আঘাত আমাদের সবার কাছে ব্র্যাড,' ভিজে ভিজে গলায় সে বলে, 'বিশেষ করে সবাই যখন তার হয়েই কাজ করছিল। এই তো মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এডিথ বলছিল, কতই না সুখী এলেন। আর একটা উল্লেখযোগ্য খবর সে দিতে গিয়ে বলেছিল, এলেন আবার নিজেকে নূতন করে খুঁজে পেয়েছে অপরের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে, অনেকদিন পর তার শুকনো ঠোঁটে হাসির পরশ লেগেছে।'

'জানি, আমি জানি,' ক্লান্তস্বরে বলি, 'হ্যাঁ, আমি সব জানি বৈকি।'

'হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম ব্র্যাড,' বললো সে, 'তুমি এলেনের এতোই প্রিয় ছিলে যে, ও ওর মনের মণিকোঠায় তোমাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে চাইতো। এডিথের কাছে ও সব সময় বলতো, ওর কাছে তুমি নাকি এক চমৎকার পুরুষ।'

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম তার কথার মধ্যে বেদনার সুরটা মনকে দোলা দিয়ে যায় যেন। তার মুখ আমাকে বন্ধ করতেই হবে, তা না হলে সে আমাকে খুনও করতে পারে। 'আমার ধারনা ওর মতো চমৎকার মেয়ে বোধহয় হয় না।'

'আমার যা করার সব করেছি ব্র্যাড,' সে আমাকে আশ্বস্ত করে বলে, 'আমরা সবাই অবাক হয়ে ভেবেছি, সব কিছু অনায়াসে মোকাবিলা করার অতো সাহস ও কোত্থেকে পেলো? এখন আমি বুঝতে পারি, এর উত্তর আমরা কোনদিনও পাবো না।'

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ধীরে ধীরে একটা যন্ত্রণা নিঃশব্দে মুচড়ে উঠছে আমার বুকের মধ্যে। আগে যা কিছু ঘটে গেছে সে সব যেন কিছুই নয়। এখন থেকে এ যন্ত্রণা আমাকে একাই বয়ে বেড়াতে হবে। ধীরে ধীরে চোখের পাতাদুটো বন্ধ করে সব কিছু ভাববার চেষ্টা করলাম। ওরা কোনদিনও জানতে পারবে না, কিন্তু আমি জানি। আমি জানি অনেক, অনেক কিছু।

'তা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কখন সম্পন্ন হচ্ছে?' যন্ত্রচালিতের মতো আমার নিজের প্রশ্ন নিজেই শুনলাম।

'পরশু' প্রত্যুত্তরে সে বলে। কবর দেবার জায়গার নামটাও বললো সে। এবং সময়, 'সকাল এগারোটায়,' আরো সে বলে, 'ও ওর স্বামী এবং পুত্র কন্যাদেব পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হবে।'

'ঠিক আছে, আমি যাবো সেখানে', আমি বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা করবো। ইতিমধ্যে, যদি কিছু করার থাকে তো আমি করতে পারি।'

'না ব্র্যাড সাধ্যমতো সব কিছু করা হয়েছে। এখন ওর জন্যে করার আর কিছু বাকী নেই।'

তারপর পল নীরব হলো। দূরভাষে তখন মৃত্যু ভাসে। গ্রাহকযন্ত্রটা আমি নামিয়ে রাখলাম, তখনো তার কণ্ঠস্বর যেন আমার কানে বাজছিল। বসে পড়লাম, চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়ানো। যেদিকে দু'চোখ যায়, ডেস্কে, মেঝে সর্বত্র কাগজ আর কাগজ। যন্ত্রবৎ নিচু হয়ে কাগজগুলো আমি কুড়োতে যাই হঠাৎ তখন আমায় দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর বাদল নামে।

দরজা খোলার শব্দ হলো, কিন্তু আমি সেদিকে তাকাতে পারলাম না। আমার সামনে তখন দাঁড়িয়েছিল মিকি। তার নরম হাতের কোমল স্পর্শ আমি অনুভব করলাম। তার শান্ত সংযত কণ্ঠস্বর আমাকে মোহিত করে তোলে, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত ব্র্যাড?'

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াই, তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি জানো?'

মাথা দোলায় মিকি। তাকে আহ্বান করার আগেই সে আমাকে বলেছিল, শান্ত নরম কণ্ঠস্বর তার, 'এ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।' মিকি তার মোম নরম হাতটা মেলে দেয় সামনের দিকে, সে হাতে মদের পাত্র। রঙিন গ্লাসে মিকির ছায়া কাঁপে। গ্লাসটা তার হাত থেকে নিয়ে চুমুক দিই, ভিজে ঠোঁটে মিকিকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে দেখি অবশিষ্ট কাগজগুলো মেঝের উপর থেকে সযত্নে কুড়িয়ে রাখছে সে। গ্লাসের শেষ ফোঁটাটা গলাধঃকরণ করার পর মিকির দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখি মেঝের উপর থেকে বাকী কাগজগুলো তোলা হয়ে গেছে তার। প্রশ্ন চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল সে তখন।

'ঠিক আছে, ওগুলো এখানে রেখে যাও। পরে অবসর সময়ে কাগজগুলো দেখবো।'

ডেস্কের উপর কাগজগুলো রেখে দরজার দিকে পা বাড়ায় মেয়েটি, আমি তখন তাকে ডাকলাম, 'শোনো মিকি, বাইরে থেকে কোন ফোন এলে কিংবা কেউ দেখা করতে এলে সবাইকে বলে দিও আমি নেই। কিছুক্ষণ আমাকে পাওয়া যাবে না।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় মেয়েটি এবং দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে চলে যায়। আমি তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার সামনে এসে দাঁড়াই এবং আমার দৃষ্টি চলে যায় সুদূর আকাশ পানে।

মেঘযুক্ত শীতের নীল আকাশে মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মতো টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের আনাগোনা। শহরের ধূসর সাদা বাড়িগুলোর ঠিকানা আকাশে হারিয়ে যাওয়াটা আজকাল আর কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। নতুন নতুন আকাশ ছোঁওয়া বাড়িগুলো যেন সারি সারি পিঁপড়ার বাসা।

এ জানার কৌতূহল আমার অনেক দিনের। এখন বুঝতে পারছি মূল্য কতো। কিছুই নয়। বাস্তবিক কিছুই নয়। এর মূল্য সাধারণ মানুষের কাছে কিছু নয়, তবে বিশেষ মানুষের কাছে অসাধারণ।

ও আর নেই, কথাটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, বিশ্বাস করা যায় না, অবিশ্বাসে দারুণ যাতনা। কখনো মনে হচ্ছে এই তো একটু আগে ওর উষ্ণ ঠোঁট আমার ঠোঁটের নিচে স্পর্শ সুখে কামনার আগুন জ্বালিয়েছিল, ওর সুরেলা কণ্ঠস্বর যেন এখনো আমার কানে গুঞ্জন তুলে চলেছে।

এলেন! ওর নামটা আমি চিৎকার করে উচ্চারণ করলাম। আগে এই খানিক আগেও ওর মৃত্যুর ঠিকানাটা তখনো জানা যায়নি, ওর নামটা কি নরম, কি মিষ্টিই না শোনাতো তখন, কিন্তু এখন ওটা যেন তীব্র কষাঘাতের মতো আমার কানে বাজছে। এলেন, এ তুমি কি করলে?

দূরভাষে শব্দ হতেই ভীষণ বিরক্ত হলাম, ওই শব্দ শুনলেই এখন কেমন আতঙ্ক হয়। যাই হোক, অনিচ্ছা সত্বেও অলস হাতে গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিই। 'আমি তো তোমাকে বলেইছিলাম, ফোন এলে আমাকে ডাকবে না।' আমি বেশ বুঝতে পারি, আমাব কথায় একটা অসহিষ্ণুতার প্রকাশ নিজের কানেই শ্রুতিকটু লাগে।

'কিন্তু আপনার বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, ব্র্যাড,' কৈফিয়তের সুর ধ্বনিত হয় মিকির কথায়।

'ঠিক আছে,' দরজার দিকে আমার দৃষ্টি চলে যায়।

সেই মাত্র ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি, অস্বাভাবিক এক জড়তা তাঁর চালচলনে। বাবার হাঁটার ধরনই এরকম। একমাত্র গাড়ীর পিছনের সীটে হেলান দিয়ে বসে থাকার সময় বাবাকে হাসি খুশি দেখায়। তাঁর গভীর কালো চোখ দুটি কি যেন খুঁজে ফেরে আমার দিকে তাকিয়ে। সেই অদম্য কৌতূহল ভাষায় প্রকাশ পায় তাঁর ঠোঁটে। অনেক প্রশ্নের একটা প্রশ্ন, 'শুনেছো তুমি?'

'হ্যাঁ,' আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, 'পল আমাকে ফোন করেছিল একটু আগে।'

'আসার পথে গাড়ীর রেডিয়োয় খবরটা শোনামাত্র তোমার কাছে ছুটে এলাম।'

'ধন্যবাদ!' পায়ে পায়ে কখন যে লিকার ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে একটা বোতল বার করে নিলাম খেয়াল নেই। 'আমার জন্যে ভেবো না, আমি ঠিক আছি, ঠিক থাকবো।' দুটি গ্লাসে মদ ঢেলে একটা গ্লাস বাবার হাতে তুলে দিই, অপরটিকে ঠোঁটে রাখি। বেশ খানিকটা মদ গলাধঃকরণ করে বাবার দিকে ফিরতেই দেখি গ্লাস হাতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি, মদ বুঝি ভুলে গেছেন। অথচ এমনটি হওয়ার কথা নয়, কোন সময়েই মদে অরুচি হয় না তাঁর। অথচ আজ তিনি যেন মদ খেতে ভুলে গেছেন। 'তুমি কি করবে ঠিক করলে?' বাবার পরবর্তী প্রশ্ন।

'জানি না। অথচ পলের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি ভেবেছিলাম আমি সেখানে যাবো, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যেতে পারবো না। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না।'

তাঁর সন্ধানী চোখ তখনো আমাকে খুঁজে ফিরছিল। 'কেন, কেন এ কথা বলছো তুমি?'

একটু সময়ের জন্য আমার দৃষ্টি স্থির হলো তাঁর মুখের উপর, তারপর ফেটে পড়লাম, 'কেন, আমার থেকে তুমি তো বেশ ভালোই জানো, কেন জানো না? কারণ বলতে গেলে আমিই ওকে একরকম খুন করেছি। ওর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে আমি যদি ট্রিগার টিপতাম, মনে হয় সেটা বোধহয় আরো ভালো হতো, হতো না?' চেয়ারের উপরে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলাম। পিছনে ক্যাবিনেট।

তিনি আমার ঠিক বিপরীত দিকে বসলেন। 'জানলে কি করে তুমি?'

জ্বলন্ত চোখে তাকালাম তাঁর দিকে, 'এ কথা আমার মনে হলো এই কারণে, আমি ওকে ভালোবাসতাম, কিন্তু আমি ওকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলাম, ওকে কখনো ছেড়ে যাবো না। ও আমার কথা বিশ্বাস করেছিল এই কারণে যে, ও আমাকে গভীরভাবে ভালোবেসে ছিল বলে এবং ও কখনো ভাবেনি, আমি ওকে ছেড়ে আসতে পারি। আমার সব ভালোবাসা, সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে আমি ওকে ছেড়ে আসাতে, ওর তখন পৃথিবীতে থাকার বলতে কিছুই আর রইলো না, কারণ আমি ওর সব কিছু, ওর চোখে একটা বিরাট পৃথিবী হয়ে গিয়েছিলাম। সেই পৃথিবীটাই যখন আর থাকলো না, বেঁচে থেকে কি লাভ ওর বলুন?'

ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমার দিকে চোখ মেলে দিলেন তিনি। অবশেষে তিনি তাঁর কৌতূহলটা আর দমন করতে পারলেন না, বলেই ফেললেন, 'সত্যি তুমি সেটা বিশ্বাস করো?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

একটু সময়ের জন্য কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর এক সময় তিনি মুখ খুললেন, 'তাহলে তো ওর কাছে শেষ বারের মতো যাওয়া উচিত তোমার। শান্তি যদি পেতে চাও, ওর মধ্যেই তোমার সব সুখ শান্তি নিহীত আছে। এ দিনটা চলে গেলে আর ফিরে আসবে না।'

'কিন্তু ড্যাড, আমি কি করে তা করি বলো?' বুকের ভিতরটা আমার কেমন হাহাকার করে উঠলো।

'হ্যাঁ, তোমাকে পারতেই হবে,' তাঁর কথায় দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট, 'কারণ তুমি আমার পুত্র বার্নাডি। তোমার প্রতি আমার অনেক দুর্বলতা আছে, এ আমার দোষই বলো আর গুণই বলো, কিন্তু তুমি তো আর কাপুরুষ নও। হয়তো কাজটা একটু কঠিন, কিন্তু ওর সান্নিধ্যে গেলে শান্তি পাবে তুমি, ও মৃত হলেও!'

ড্যাড চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করতেই আবার আমি একা হলাম, জানালা পথে তাকালাম। শীতের অন্ধকারটা ইতিমধ্যেই দিনের আলোকে ঢেকে দিয়ে একটা কালো পর্দা টেনে দিয়েছে। এমনি এক রাতের অন্ধকারে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে আমি ওর সঙ্গে প্রথম মিলিত হই। নতুন করে আজ আবার সেই স্মৃতির পাতাগুলো হাতরে ওল্টাই।

সেই সময় এবং এখন, এই সময়টুকুর মধ্যেই উত্তরটা কোথাও লুকিয়ে আছে, আমাকে খুঁজে বার করতে হবে।

❑ প্রথম অধ্যায় ❑

আয়নার প্রান্ত-সীমায় ওর চেহারাটা প্রতিবিম্বিত, দাড়ি কামাতে গিয়ে আমার চোখদুটো চুম্বকের আকর্ষণের মতো স্থির হলো আয়নার সেই অংশটায়, পলক ফেলতে ভুলে গেলাম। বাথরুমের দরজা উন্মুক্ত, ওর বিছানার ছবিটা চিত্রবৎ স্থির, আয়নায় অকম্পন। বিছানায় বসেছিল ও। স্বচ্ছ নাইট-ড্রেসের নিচে ওর দুধ-সাদা কাঁধ দুটি স্পষ্ট প্রতিফলিত। লালচে-বাদামী রঙের দীর্ঘ কুন্তলরাশি জলপ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ছিল ওর কাঁধের উপরে দুরন্ত হাওয়ায়। পোশাকে শালীনতার ছাপটা স্পষ্ট, ভালো লাগে, গর্বে মন ভরে যায়। এই মুহূর্তে ওর দিকে তাকালে কেউ ভাবতেও পারবে না, তিন সপ্তাহ পরে আমাদের বিবাহিত জীবনের কুড়িটা বছর আমরা পিছনে ফেলে আসতে চলেছি।

হ্যাঁ, কুড়িটা বছর। আমাদের বিবাহিত জীবনের ফসল দুটি সন্তান, উনিশ বছরের একটি পুত্র এবং একটি ষোড়শী কন্যা। তবু আজও ওকে কিশোরীর মতো দেখায় যেন। স্লিম ফিগার। ওর ব্রার সাইজ আজও বত্রিশ, কুড়ি বছর আগে বিয়ের সময় যা ও ব্যবহার করতো। তখনকার মতো এখনো ওর ধূসর চোখের রঙ উজ্জ্বল, ভাস্বর, ভরাট কোমল মুখ। এমন কি লিপস্টিক বিহীন মুখ আজও সুন্দর, মিষ্টি ত্বক, উষ্ণ ও তাজা। আগের নিটোল গোল চিবুক আজ ঈষৎ চাপা হলেও সারা মুখে একটা প্রশান্তির ছায়া, পবিত্রতার ছাপ যেন স্পষ্ট।

আমি ওকে বিছানা থেকে নেমে শরীরটা ঢিলেঢালা গাউনের আড়ালে ঢেকে ফেলতে দেখলাম। গাউনের আড়ালে ওর শরীরটা আজও আগের মতোই রমণীয় এবং কামনা জাগায়। একটু পরেই আয়না থেকে ওর ছবিটা হারিয়ে যায়, আমি আবার দাড়ি কামানোয় মনোনিবেশ করি নিজেকে। দাড়ির ওপর হাত বুলোই। এখনো খসখসে ভাবটা যায় নি। দুবার দাড়ি না কামালে আমার ত্বক মসৃন হয় না। দ্বিতীয়বার দাড়ি কামানোর সময় হঠাৎ আমি উপলব্ধি করলাম, আমার কণ্ঠে গুঞ্জন।

আয়নায় আমার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে অবাক হয়ে আমি তাকিয়ে থাকি। দাড়ি কামানোর সময় সাধারণতঃ আমার কণ্ঠে গুঞ্জন কিংবা গানের কলি কখনো ভেসে ওঠে না। কারণ দাড়ি কামাতে গিয়ে আমি সুখ পাই না, বরং বিরক্ত লাগে। উপায় থাকলে দাড়ি রাখতাম মনীষীদের মতো।

দাড়ি কামানোর ব্যাপারে অভিযোগ করলে মারজা হাসে এবং রসিকতা করে বলে, 'মাটি খোঁড়ার কাজ নিলেই তো পারো। তোমার চেহারাটা সেই ভাবেই গড়া!'

এর জবাব আমার জিভের ডগায় লেগে থাকে সব সময়। ইচ্ছে করলে আমি ওর কথার জবাবে অনেক কিছু বলতে পারি আবার বাধাও ছিলো অনেক। সেই সব বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে উঠে আমি আবার ভাবতে বসি। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মানুষের আকৃতি, গতি প্রকৃতি কিংবা মুখের ভাব দেখে কখনোই সঠিক

করে বলা যায় না, লোকটা অমুক, লোকটা ভালো নয় খারাপ--এই ধরা যাক না কেন আমি লোকটা কিরকম? আমার মুখটা বড় রুক্ষ্ম, মুখের কোথাও এতটুকুও কমনীয়তার আভাস নেই, রসকষহীন পুরুষ। অত্যধিক পরিশ্রমের দরুন মাঝে মাঝে আমাকে বড় বেশি রুক্ষ লাগে। কিন্তু আমার তো মনে পড়ছে না গত দু'চারদিন সে রকম পরিশ্রম আমি করেছি। এমন কি বাগান পরিচর্যা করার জন্য একবারও আমি হাত ওঠাইনি এ ক'দিন।

আবার আমি দাড়ি কামাতে শুরু করলাম, তখনো আমার ঠোঁটে সেই গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়। এ আমার কিসের আনন্দ, কিসের জাগরণ ভেবে পাই না, যেমন ভেবে পাই না, এই বয়সেও আমার মনে উচ্ছাস জাগতে পারে। অবশ্য এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ সেটা আমার বুঝতে অসুবিধে হয় না। বিয়ের কুড়ি বছর পরেও বয়স্ক স্ত্রীকে কিশোরীর মতো দেখতে, কথাটা ভেবে যদি এই গুঞ্জন উঠে থাকে, উঠুক না কেন? প্রেম তো চিরন্তন, যেমন চিরন্তন পুরুষের চোখে নারীর রূপ।

আফটার-শেভ লোশন মুখে মেখে চুলে চিরুনি বোলাই। আমার মাথায় এখনো যথেষ্ট চুল, বয়সের তুলনায় বিরল নয়, এটুকুই যা সান্ত্বনা, যদিও গত পাঁচ বছরে অর্ধেক চুল প্রায় ধূসর রঙে রাঙায়িত।

শয়নকক্ষে ফিরে এসে দেখি ঘর ফাঁকা। তবে বিছানার দিকে তাকাতেই নজরে পড়লো পরিষ্কার শার্ট, টাই, গেঞ্জি, আণ্ডারওয়ার যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মনে মনে হাসলাম। মার্জা আমার পছন্দের কথা বেশ ভালো করেই জানে, পোষাক হলেই হলো, সে ময়লাই হোক, কিংবা পরিষ্কারই হোক। মার্জা তাই আমার পছন্দের ওপর ঝুঁকি নিতে চায়নি বোধ হয়। তাই নিজের পছন্দ মতো এই বয়সেও আমাকে ধোপদুরস্ত বাবু সাজাতে চায়। কথাটা ভাবলেও হাসি পায়। আমি চিৎকার করে বলতে যাই, এ সব কি আমার এখনো শোভা পায় মার্জা? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে শেষে? আমি জানি এর উত্তর ও কি দিতে পারে? ও বলবে, তোমার তো রুচি বলতে কিছু নেই। কিন্তু কিসে সে কি তোমাকে মানায় সে দেখার ভার আমার, তোমার নয়! আমায় নাকি ভদ্রলোকের মতো সেজে গুজে থাকতে হবে বাড়িতেও! আমার অভ্যাসটা তাই বদলাতে হয়েছে আর এর প্রয়োজনও ছিলো বৈকি!

আগে ঠিক এমনটি আমার মনে হয়নি কখনো। কেবল গত নয় দশ বছর থেকে আমি আজকাল নিজের থেকে আমার পোশাকের দিকে নজর দিয়ে থাকি। এর কারণ অবশ্যই ছিলো। আমি এখন সাধারণ নাগরিক নই। আমি এখন জনসংযোগ অধিকর্তা, বছরে তিরিশ গ্র্যাণ্ড মাইনে। প্রেস এজেণ্টের কাজে ইস্তফা দিয়েছিলাম কবেই, মেডিসন এভিনিউ-এর উপর বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ির একটা ফ্ল্যাট আমার জন্য সংরক্ষিত ছিলো।

পোশাক বদল করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, মারজাই ঠিক। ভালো পোষাক যে কোন বয়সের মানুষকে বদলে দিতে পারে, বিশেষ করে বয়স্ক লোকের বয়স কমিয়ে দিতে বাড়তি সাহায্য করে থাকে। আয়নায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, নিমেষে আমার মুখের সব মলিনতা, সব রুক্ষতা

বুঝি বা উধাও হয়ে গেছে, বা ঠিক উধাও নয় বলা যেতে পারে ঢাকা পড়ে গেছে মারজার পছন্দ করা পোষাকের আড়ালে। এবং আমাকে দেখে মনে হবে এখন আমার উপর নির্ভর করা যায়। অর্থাৎ আমি এখন একজন দায়িত্বশীল পুরুষ।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে আবার দেখা হলো মারজার সঙ্গে। আগেই ও টেবিলে এসে বসেছিল, হাতে একটা চিঠি, চিঠি পড়ার ভঙ্গিমাটা ওর ভারী সুন্দর, মনোরম। এই মুহূর্তে আমার মনে হলো, ওর সব কিছুই যেন আমার কাছে অতি প্রিয়, অতি রমণীয়। রমণীর রমণীয় মন জানা তখন আমার হয়ে গেছে। আমি ওর কাছে গিয়ে মুখ নিচু করে ওর চিবুকে আলতো করে চুমু খেলাম। 'সুপ্রভাত খুকুমণি,' হাসতে হাসতে শুধোলাম ওকে।

'শুভ প্রভাত, ব্র্যাড,' চিঠির উপর থেকে চোখ না তুলেই বলল ও আমাকে।

ওর কাঁধের উপর দিয়ে আমি আমার সন্ধানী দৃষ্টিটা ছুঁড়ে দিই সেই চিঠিটার উপরে। হাতের লেখাটা চেনা চেনা মনে হলো। 'ব্র্যাড?' আমার চোখে অনেক প্রশ্ন। তার মানে ব্র্যাড ব্রাউন জুনিয়র। কলেজের প্রথম বার্ষিকীর ছাত্র। এক সময় প্রতিদিন একটি করে চিঠি লিখতো, পরে সেটা কমিয়ে এনে সপ্তাহে একটি করে চিঠি লিখতে শুরু করে সে।

মারজা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

অতঃপর আমি আমার টেবিলের সামনে গিয়ে বসলাম। লেবুর জলের গ্লাসটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিতে গিয়ে আমি শুধোই, 'কি লিখেছে সে?'

এবার মারজা চিঠির উপর থেকে ওর ধূসর রঙের চোখ দুটি তুলে নিয়ে রাখলো আমার মুখের উপরে। গভীর আয়ত চোখ। 'পরীক্ষায় সে গড়পড়তা আশি নম্বর পেয়েছে। কেবল অঙ্কে একটু কাঁচা সে এই যা।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসি। 'তা এর জন্যে তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। সে চিন্তা বোধহয় আমার আরও বেশি হতো, কলেজ গেলে।'

এক চুমুকে খাওয়ার মতো লেবুর রসটা আমি গলাধঃকরণ করে নিই তাড়াতাড়ি। আমার মনটা তখন পড়েছিল ব্রেকফাস্টের টেবিলে, চিকেন এবং ডিমের দিকে দৃষ্টি আমার নিবদ্ধ ছিলো।

বিশেষ দুটি জিনিসের উপর আমার দারুণ লোভ ছিলো ছেলেবেলা থেকে। ব্রেকফাস্টে ডিম এবং সকালে কাডিয়ার চপ। দুটি জিনিসই বিলাসবহুল। আমার বাবা যখন নিউ ইয়র্কে চলে যান, আমার তখন বয়স খুব অল্প। ষাট বছর তাঁর বয়স হয়ে গেলো, এখনো তিনি নিউ ইয়র্কে। খুব বেশি দিন ওঁর সঙ্গ আমরা পাইনি। তিনি কেবল আমাকে দিয়ে একবার তাঁর একটা ছ্যাকরা গাড়ি কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিচিত্র মানুষ তিনি। মা মারা যাওয়ার পর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। থার্ড এভিনিউ-এর দিকে ফিরেও আর মুখ দেখাতে চান না তিনি।

অথচ, মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, বাবা ঠিক এমনটি ছিলেন না, বরং এর ঠিক উল্টোটাই ছিলেন তিনি। মা'র কাছ থেকে তিনি নড়তেই চাইতেন না। রেল রোডের ধারে সেই থার্ড এভিনিউ-এর ফ্ল্যাটে মা'র চারপাশে, কোন কাজ না থাকলেও শুধু শুধু ঘুরে বেড়াতেন তিনি। আসলে মাকে তিনি তাঁর চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। আমি জানতাম,

মাকে তিনি কতোই না ভালোবাসতেন। তাই আমাদের আপত্তি করার কিছু ছিলো না।

'ছোট ছেলের এতো কি লেখার থাকতে পারে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার ধারণা ছিলো, কলেজের ছেলেরা সাধারণতঃ বার বার টাকা চেয়ে বাবা-মাকে উত্যক্ত করে তুলে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে ব্র্যাড আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা পয়সাও চায়নি।

আমার দিকে তাকাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলো মারজা। ওর চোখ দেখে মনে হলো, বেশ অসুবিধেয় পড়েছে ও। চিঠিটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ও বলে, 'চিঠির একেবারে শেষ দিকে লিখেছে ব্র্যাড, সে নাকি ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। পরীক্ষার শুরু থেকেই ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসে আছে বাছা, কিছুতেই সারছে না। আহা'—মারজার গলায় উদ্বেগের ছোঁওয়া। 'বেচারি!'

প্রসঙ্গটা হাল্কা করার জন্য আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। 'তুমি কিছু ভেবো না, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে জুনিয়র,' আমি ওর আস্থা ফিরিয়ে আনতে বললাম, 'ওকে লিখে দাও ও যেন এখুনি কোন ভালো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে।'

'ডাক্তার দেখাবার ছেলে নয় ব্র্যাড,' মারজা হতাশ সুরে বলে, 'তুমি তো জানো, ও কিরকম ছেলে!'

'হ্যাঁ, জানি বৈকি,' আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'সব বাচ্ছা ছেলেরাই এরকম হয়ে থাকে। তবে ঠাণ্ডা তেমন কিছু নয়। তুমি দেখো, ও ঠিক তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে জেনি এসে হাজির হলো ব্রেকফাস্টের টেবিলের সামনে। অভ্যাস মতো আজও তাকে ব্যস্ত দেখালো। 'ড্যাড, এখনো তোমার ব্রেকফাস্ট শেষ হয়নি?' প্রশ্ন চোখে তাকালো জেনি।

তার পানে তাকিয়ে আমি হাসলাম। জেনি আমার বড় আদরের মেয়ে। বাড়ির স- -কে ছোট সে। সে ঠিক তার মাঁর মতো হয়েছে। সব কিছুতেই তাড়া।

'কিন্তু আমার তো এখনো কফি খাওয়া হয়নি?'

'কিন্তু ড্যাড, আমার স্কুলের যে দেরী হয়ে যাবে।' অনুযোগ করে জেনি।

কৌতূহলী চোখ নিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলি, 'সারা সকালে যথেষ্ট বাস চলে এ-সময়। আমার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না।'

জেনি আমার হাতের ওপর হাত রাখলো। নিচু হয়ে আমার চিবুকে চুমু খেলো। ষোড়শী কন্যার তার বাবাকে চুমু দেওয়ার মধ্যে একটা আলাদা মানে থাকে। 'কিন্তু ড্যাড, তুমি তো জানো, তোমার সঙ্গে স্কুলে যেতে আমি কিরকম পছন্দ করি!'

আমি হাসলাম। আমি জানি, সে আমাকে প্রভাবিত করতে চাইছে তার কথার মাধুর্যে। আমি অসহায়, আমি নিরুপায়, ঠিক এই কথাটা আমি শুনতে চাইছিলাম ওর মুখ থেকে। 'হ্যাঁ জানি বৈকি, আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাই বলে।' আমি তার পিঠ চাপড়ে আদর করি।

'ভুলে যেও না ড্যাড, আমি তোমার মনের কথা স্পষ্ট পড়তে পারছি। আমি জানি, কেন তুমি এখান ছেড়ে যেতে চাও না, সে কার জন্যে?' জেনির ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হবে সে যেন তার মা'র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবতীর্ণ আমার সামনে। আমি যেন মা মেয়ের মনের মানুষ।

মারজার দিকে অসহায় চোখে তাকালাম। ও এতোক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিল, আর মিটিমিটি হাসছিল। ও জানে, কি ঘটতে যাচ্ছে। 'এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করবো বলো তো?' মুখে একটা কৃত্রিম অসহায় ভাব ফুটিয়ে তুলে মারজার উদ্দেশ্যে কথাটা বললাম।

ওর ঠোঁটে সেই শান্ত মিষ্টি হাসিটা তখনো লেগেছিল। তেমনি শান্ত স্বরে ও জবাব দেয়, 'তুমি যা করবে ভেবেছিলে সেটা অনেক দেরী হয়ে গেছে,' হাসতে হাসতে মারজা বলে, 'এখন আর কোন উপায় নেই, ওকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

অগত্যা তাড়াতাড়ি কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ি। 'ঠিক আছে তথাস্তু!'

জেনি তখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। 'ড্যাড, আমি তোমার টুপি আর কোটটা নিয়ে আসছি।' একটু পরেই আমি তার ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

'ব্র্যাড, আজ রাতে সকাল সকাল ফিরছো?'

মারজার দিকে ফিরে তাকাই। 'বলতে পারি না,' প্রত্যুত্তরে বললাম, 'লোহা লক্করের কারবার। মোটা টাকার কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে হয়তো ফেঁসে যেতে পারি। তবে খুব চেষ্টা করবো তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে।'

মারজা উঠে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু খাই ওর চিবুকে। নরম মসৃণ ত্বক। ও ওর ঠোঁট দুটো তুলে ধরে আমার ঠোঁটের সামনে। গোলাপের পাপড়ির মতো সুন্দর মিষ্টি ওর ঠোঁট দুটি। বিশ বছর আগের সেই স্বাদ আজও যেন অম্লান।

'তোমার শরীরটা ভেঙ্গে পড়ছে প্রিয়তম,' মুখটা সামান্য একটু সরিয়ে নিয়ে মারজা গাঢ় স্বরে বলে, 'অতো পরিশ্রম তুমি কেন করো বলো তো?'

'না, আর করবো না শ্রীমতী,' ওর ঠোঁটে আবার একটা নিবিড় চুম্বন দিলাম। চুম্বন দীর্ঘায়িত হলো এবার, যতক্ষণ না বিস্বাদ লাগলো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দুজোড়া উষ্ণ ঠোঁট মিলে গিয়ে একাকার হয়ে গেলো।

তারপর একসময় বিচ্ছিন্ন হতেই কানে ভেসে এলো গাড়ীর হর্ণের শব্দ। জেনি বোধহয় গাড়ী বার করলো গ্যারাজ থেকে। ভারী দুষ্টু, জানে ওর অনুপস্থিতিতে এ-সময় আমরা স্বামী স্ত্রী কি করতে পারি। সেই কথাটা ভেবেই ইচ্ছে করে ও আমাদের আনন্দ সুখে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইছে।

অতএব মারজার নিবিড় আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়তেই দেখি, জেনি দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপারে। ঠোঁটে মিঠি মিঠি হাসি। হাসিটা মনে করিয়ে দেয়, ও সব জেনে গেছে, আমরা এতক্ষণ কি অবস্থায় ছিলাম।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলি, 'তোমার মাম্মিকে জানো তো? আজও ও সেই ছোট্ট খুকুটি আছে যেন।'

জেনি নিঃশব্দে হাসে তখনো। আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম, 'কুড়ি বছর আগে হলে আমি তোমাকেই বিয়ে করতাম।'

❑ দ্বিতীয় অধ্যায় ❑

অক্টোবরের শুকনো হাওয়ায় আমার সারা শরীর জ্বালা করছিল গাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে। শরৎ বিলম্বিত। এ ঋতু আমার প্রিয়। এই মাস সবুজের মাস। যে দিকে তাকাও কেবলি সবুজ বনান্তর, সবুজ প্রান্তর, দু'চোখে সবুজ রঙের খেলা শুধু, অবুঝ মনটা সবুজ রঙের হোলি খেলতে সদাই ব্যস্ত। কিন্তু মন আমার টানে লাল, বাদামী এবং সোনালী রঙের দিকে, আজও এই বয়সেও। এই রঙগুলো আমার গর্ব, আমার মনে উষ্ণতা আনে, আমাকে বাঁচার পথ দেখায়।

গাড়ীর পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি, অবাক হয়ে জেনির দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল সে। তার পাশে বসতে গিয়ে এই প্রথম আমার চোখে পড়লো জেনির প্রায় নিরাবরণ বক্ষ। 'এ সময় বুক খোলা জামা পরলে কেন?' আড়চোখে তার বুকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি। এবং তাকে দেখিয়ে আমি পাশের আসন থেকে টপকোটটা তুলে নিয়ে ওর গায়ে চাপালাম।

'ছিঃ ড্যাড,' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে মুখরিত হলো সে। 'পোশাকে পরিবর্তন না আনলে আধুনিক হয়ে কি লাভ বলো? তাছাড়া এই গরমে—'

'কিন্তু জেনি,' আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিই, 'গ্রীষ্ম তো বিদায় হয়ে গেছে কবেই।'

এ্যাক্সিলেটারে চাপ দেয় জেনি, গাড়ীটা একটা যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে দুলে ওঠে, একটু পরে সে গীয়ার বদলায়, গাড়ীর চাকাগুলো দ্রুত ঘুরতে থাকে। গাড়ীর চলার গতির তালে জেনি তার উত্তর খোঁজে। এ এক অদ্ভুত প্রশ্নর মুখোমুখি হয়েছে জেনি। এ যেন এক ধৈর্যের খেলা। কৈশোর আর বার্ধক্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব। 'আচ্ছা ড্যাড, এতো তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছো কেন বলতো?'

আমি প্রায় হেসেই ফেললাম কথাটা শুনে। আমি তাকালাম জেনির দিকে। সে তখন নিবিষ্ট মনে গাড়ী চালাচ্ছিল, তখন তাকে গাড়ী চালানোর নেশায় পেয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে জিভ বার করে অদ্ভুত একটা শব্দ করছিল সে। রাস্তার কোন বাঁক এলেই তার মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে ওঠে।

গাড়ীর স্পীড বাড়ায় সে এ্যাক্সিলেটারে চাপ দিয়ে। চকিতে স্পীডোমিটারের দিকে তাকাই। স্পীডোমিটারের কাঁটাটা তখন চল্লিশ পেরিয়ে উর্দ্ধমুখি। সতর্ক হলাম, 'পাটা তোমার আস্তে চাপো জেনি।'

উইণ্ডস্ক্রীনের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে এবার আমার চোখের উপর রাখলো মুহূর্তের জন্যে। তার চোখের ভাষা আমার অজানা নয়, আমি তার চোখের ভাষা স্পষ্ট পড়তে পারি এবং আমার মনে হয়, সে যদি মুখর হতো, সে অনেক ভালো ছিলো, অন্তত মুখের

ভাষায় অতোটা নিষ্ঠুর হতে পারতো না সে। সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, সত্যি আমি অনেক বুড়িয়ে গেছি। জেনির মতো যুবতী মেয়েদের মনের জোর আমি হারিয়ে ফেলেছি কবেই। আমার উচিত হয়নি জেনির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা। নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হলো, নিঃশব্দে রাস্তার উপর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলাম আমার অপরাধী মুখের ছবিটা জেনির চোরা চোখের চাউনি থেকে আড়াল করার জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে এখন অনেক হাল্কা বলে মনে হলো। জেনি ঠিকই বলেছে, আধুনিক হতে গেলে অতো ঢাক-ঢাক কিসের, কি দরকার মিথ্যে আবরণের আড়ালে দেহের সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখার। জেনির ধারণা, নারীর শরীরের আর এক নাম ফুল। ফুল কি কখনো ঢেকে রাখে কেউ? ফুলের ধর্মই তো হলো পাপড়ি মেলে দেওয়া। তাহলে নারীই বা কেন তাদের শরীরের পাখনা মেলে দেবে না? কেন নিজেদের উন্মোচন করবে না পুরুষদের দূষিত দৃষ্টির সামনে। এর মধ্যে তেমন কোন পাপবোধ দেখতে পেলো না সে। জেনি তার চোখের ভাষা দিয়ে তার মনের কথাটা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। আমি বোকা, তাই প্রথমে বুঝতে পারিনি, যখন বুঝলাম, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর তখনি নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হলো আমার। তারপর সে কিন্তু একটা কথাও বলেনি। ধীরে ধীরে তার চোখ দুটো যখন আমার মুখের উপর ফিরে এলো, দেখলাম সারা মুখে তার কোথাও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সেই একই নির্লিপ্ত ভঙ্গি, অথচ পূর্ণায়ত হাসি-হাসি চোখদুটো ঠিক যেন কথা কইছে। হঠাৎ সে মুখর হলো এবার এবং তার কণ্ঠস্বর দারুণ চমক জাগালো আমার মনে।

'তোমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে মাকে কি উপহার দিচ্ছো ড্যাড?' তার দুষ্টুমিতে ভরা হাসি-হাসি চোখ দুটোয় বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে যেন, 'এ ব্যাপারে সত্যি তোমার পছন্দের তারিফ করতে হয়।' জেনি এমন ভাবে কথা বললো, যেন সে তার প্রেমিকের কাছ থেকে কোন উপহার পাওয়ার প্রত্যাশায় উন্মুখ। 'বেশি দিন তো হাতে নেই, চার সপ্তাহের কম সময়—'

'হ্যাঁ,' অস্ফুটে বললাম, 'দেখি ভালো কি চিন্তা করা যায়।' অবশ্য মনে মনে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম কি দেবো, 'হয়তো তুমি তোমার মায়ের পছন্দের কথা জানো।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দেয় জেনি, 'আহা আমি কেন জানতে যাবো, সে চিন্তা তো তোমার। আমার কৌতূহল তাই—'

'তা তোমার কি কৌতূহল শুনি?' আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিশোরী মেয়ের মনে বাবা-মার বিবাহিত জীবনের আশা-আকাঙখা, প্রত্যাশা সম্বন্ধে ঠিক কি ধারণা হতে পারে।

ট্রাফিক আলোর জন্য গাড়ী থামালো জেনি। এবং আমার চোখে চোখ রেখে বললো, 'না, বিশেষ কোন কৌতূহল নয়,' হাসলো সে। 'তবে কেন জানি না আমার মনে হলো, শেষ মুহূর্তে মাম্মিকে তুমি নিশ্চয়ই চমকে দেবে—'

সামনে কোন আয়না ছিলো না, নিজের মুখ দেখার বালাই নেই, তবু কেন জানি না আমার মনে হলো, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার মুখ উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত

হয়ে উঠলো। আমি ভাবতেই পারিনি কিশোরী মেয়ের চোখের দৃষ্টি এতো প্রখর। 'সত্যি আমি এখনো ভেবেই উঠতে পারিনি, তোমার মাম্মির জন্যে কি আনবো।'

আমার মুখের উপর জেনির দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। 'আদৌ তোমার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। কি ড্যাড, আছে তোমার?'

হঠাৎ আমার ভীষণ রাগ হলো জেনির উপর তার কথা বলার ধরণ দেখে। 'এক মিনিট জেনি,' আমি বলালম, 'তুমি তো জানো, আমি কি রকম ব্যস্ত মানুষ। সব ভাবনা আমি ভাবতে পারি না। তাছাড়া, তোমার মাম্মিকে তো দুনিয়ার সব জিনিষ দিলে ভালো হয়। তুমিই বলো, তোমার মাম্মির জন্যে কি আনা যায়?'

ট্রাফিকের সবুজ সংকেত দেখে নড়েচড়ে বসলো জেনি। ফিরে আবার গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে শুধোয় সে, 'নিশ্চয়ই ড্যাড,' তার গলার আওয়াজটা কেমন শুকনো দেখালো, 'মাম্মির চাহিদা অনেক। একটা নতুন ফ্রিজ, গ্যাস-স্টোভ, কাপড়কাচা মেসিন। আচ্ছা ড্যাড, মাম্মির পছন্দ মতো কোন জিনিষ কখনো কি তুমি উপহার দিয়েছো?'

আমি তখন একরকম মরিয়া হয়ে নিজের কন্যার কাছে প্রকাশ করে ফেললাম, স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, আমার স্ত্রীর মনের খবর আমি নিজে জানি না। লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, 'যেমন উদাহরণ স্বরূপ?'

'ফারের কোট,' উত্তরটা জেনির মুখে লেগেই ছিলো যেন।

'ফারের কোট?' আমি অবাক হয়ে তাকে বলি; 'ও কি তাই চায়?' আমার কথায় অবিশ্বাসের ছোঁওয়া, 'কিন্তু ও যে সব সময় বলে, ফারের কোট ও চায় না।'

'ড্যাড, তুমি কি বোকা?' জেনি হেসে ওঠে শব্দ করে, 'কোনো মেয়ে ফারের কোট চায় না এ কখনো হতে পারে?' তেমনি হাসতে হাসতে বলতে থাকে সে, 'সত্যি বলছি, মা তোমার মধ্যে কি যে দেখেছিল কে জানে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, প্রেম সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ, কিংবা প্রেম কাকে বলে, আদৌ তুমি তা জানো না।'

এ কথা শোনার পরেও আপনা থেকেই আমার মুখে হাসি ফুটে উঠলো কেন জানি না। একবার আমি ভাবলাম, জেনিকে জিজ্ঞেস করি প্রেম সম্বন্ধে তার কতটুকুই বা জ্ঞান হয়েছে, না, পরমুহূর্তেই আমার মত বদলে ফেলি। ষোড়শী মেয়েকে এ ধরণের প্রশ্ন করা ঠিক নয়, বিশেষ করে সে যখন সব জেনে বসে আছে ইতিমধ্যে, তাছাড়া জেনি এবং আমার মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটা তো আছেই! এই সব কথা ভেবে আমি গম্ভীর হয়ে বলি, 'তাহলে তুমি বলছো, তোমার মাম্মির জন্যে ফারের কোট কিনে আনবো?'

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। ইতিমধ্যে স্কুলের কাছে এসে পড়েছিল জেনি, গাড়ীর গতি কমালো, এক সময় গাড়ীর চাকাগুলো স্থির, নিশ্চল হলো।

'বেশ, তাহলে আমি তাই করবো।'

'ড্যাড, সত্যি তুমি ঠিক অতোটা খারাপ নও,' দরজা বন্ধ করে জানলার ওপর ঝুঁকে পড়লো জেনি। অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসে জেনি।

মুখটা জেনির মুখের খুব কাছে নামিয়ে এনে আমি অস্ফুটে বলি, 'ধন্যবাদ।'

জেনি আমার কাঁধের দুপাশে হাত রাখে। তার আধফোটা ঠোঁট আমার চিবুক স্পর্শ

করে। 'বাই ড্যাড।'

অফিসে এসে পৌঁছলাম এগারোটায়। মন আমার খুশিতে উপচে পড়ছিল। ডন আশ্বাস দিয়ে বলেছে, মারজার জন্যে ভালো কিছু করার আন্তরিক চেষ্টা সে করবে। গত গ্রীষ্মে তার কাছ থেকে মারজা একটা পোষাক বানিয়েছিল, তাই মারজার দেহের মাপের জন্যে ভাবতে হলো না। আমি জানি ডনের হাতে পড়লে মারজার ফারের কোট অবশ্যই ভালো হবে।

অফিসে ঢুকতেই মিকি শুধোয়, 'কোথায় ছিলেন বস?' আমার টুপি এবং কোটটা হাতে নিয়ে সে আরো বলে, 'সারা সকাল ধরে ওয়াশিংটন থেকে পল আপনাকে ফোন করছিলেন অনবরত।'

'কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলাম,' অফিস ঘরে প্রবেশের আগে তার কৌতূহল মেটালাম। মিকি আমাকে অনুসরণ করতেই আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম।

'কি চান তিনি?'

'তিনি কিছু বলেননি,' প্রত্যুত্তরে সে বলে, 'তিনি আপনার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে চান, শুধু এই কথাটাই তো বললেন।'

'বেশ তো তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে দাও, এখনি!' আমার ডেস্কের সামনে বসতে গিয়ে বলি, 'চেষ্টা করে দ্যাখো যতো তাড়াতাড়ি তাঁর ফোন পাওয়া যায়।' সুইংডোর ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মিকি। সে চলে যাওয়ার পর আকাশ পাতাল ভাবতে থাকি, কি চায় পল? আমার যতদূর ধারণা, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বেশ ভালোই বলা যেতে পারে। পল এখন সরকারী আমলা। ক্ষমতা অনেক। তবে সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার অযথা বেশি করে না সে। খুব প্রয়োজন না হলে পল নিজের পদমর্যাদার কথা জাহির করতে চায় না।

ঠিক এই রকম একজন মানুষকে আমার খুব প্রয়োজন ছিলো। পলকে আমার পছন্দ তাই। আজ আমি যে অবস্থায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি, এ অবস্থায় আমাকে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হতো না, যদি না পলের জন্যে...এক হিসেবে এর জন্যে সে অবশ্যই দায়ী বলা যেতে পারে। সে অনেক কথা, অনেক ঘটনা, মনে করতে হলে ফিরে যেতে হয় যুদ্ধের সেই অনিশ্চিত দিনগুলিতে।

যুদ্ধবাজ লোক নই বলেই বোধহয় সৈন্যবিভাগের প্রতিটি শাখাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আমাকে বাতিল করে দিলো। শেষ পর্যন্ত ওয়ার প্রোডাকসন বোর্ডের প্রচার বিভাগে আমার চাকরি স্থিতি হলো অন্তত কিছু দিনের জন্য। আর সেখানেই আলাপ পলের সঙ্গে। সে ছিলো সেখানকার চীফ ইনচার্য।

সেই থেকে আমাদের দুজনের বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে। পলের একটা ভালো ব্যবসা ছিলো, সেটা বিক্রী করে ওয়াশিংটনে আসে সে ভাগ্য ফেরানোর জন্য। আর আমি কাজ করতাম একটা পিকচার কোম্পানীতে। শুনেছি ওয়াশিংটনে এ সব কাজের জন্য বেতন অনেক বেশি। সেই লোভে ছুটে যাই সেখানে।

যুদ্ধ শেষে পল একদিন তার অফিসে আমাকে ডেকে পাঠায়, 'এখন তুমি কি করবে

ব্র্যাড?'

আমার মনে আছে, সেদিন আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলাম, 'চাকরির চেষ্টায় আছি।'

'চাকরি? চাকরিতে ক'টাকা পাবে?' পলের কথায় তাচ্ছিল্যের সুর ধ্বনিত হয়। 'নিজে ব্যবসা করবে বলে ভেবেছো কখনো?'

'ও তো বিরাট ব্যাপার!' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'ব্যবসা আমার দ্বারা হবে না। ব্যবসা করতে হলে অনেক টাকার দরকার, কিন্তু অতো টাকা আমার কোথায়?'

'আমি ঠিক ওভাবে চিন্তা করিনি,' পল বলেছিল, 'ব্যবসা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, 'জন-সংযোগ,' পাবলিসিটি অফিস। এমন অনেক ব্যবসায়ী আছে, যারা তাদের পণ্য সামগ্রী বিক্রির দায়িত্ব তুলে দেয় সেই সব পাবলিসিটি এজেন্টদের হাতে। সেই রকম একটা এজেন্সি অফিস তোমাকে খুলে বসতে হবে। এর জন্য অবশ্য ছোটখাটো একটা জায়গা তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে। হ্যাঁ, সেই জায়গাটা যেন জনবহুল কোন স্থানে হয়।'

সেই শুরু। পলের প্রস্তাবটা যেন আমার কাছে স্বপ্নের মতোই মনে হয়েছিল প্রথমে। সেই সুন্দর স্বপ্নটা একদিন বাস্তবে রূপায়িত হলো, ছোট্ট অফিস, এক কামরার। মিকি আমার সেক্রেটারি। আমরা দুজনে শুরু করি অফিস। আর আজ! বিরাট অফিস, কুড়ি-পঁচিশ জন কর্মচারী। পলের দৌলতেই এই জম-জমাট। পলের অনেক বন্ধু। তার বন্ধুদের আবার অনেক বন্ধু আছে, সবাই আমাকে সাহায্য করতে চায় কিছু না কিছু কাজ দিয়ে।

দূরভাষের শব্দ হতেই গ্রাহক যন্ত্রটা আমি তুলে নিই দ্রুত। মিকির মিষ্টি কণ্ঠস্বর আমার কানে যেন মধুবর্ষণ করলো। 'ব্র্যাড, মিঃ পল রেমির ফোন, উনি কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।'

বাইরের ফোনে কথা বলার জন্যে বোতাম টিপেই বলি, 'হ্যাল্লো পল, কি খবর ও-দিককার?'

পলের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ আমি শুনতে পাই স্পষ্ট। তারপরেই তার সেই চিরাচরিত অবজ্ঞার সুর শুনতে পাই তার পরবর্তী কথায়, 'ওদের দিয়ে কিছু হবে না ব্র্যাড—'

অসমাপ্ত উত্তর। তার মানে আমি বুঝি। আমি বুঝি ওর হতাশ মনের ভাষা। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দ্রুত আমার কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে, 'এতো তাড়াতাড়ি আশা তুমি ছেড়ে দিও না বস। এ কথা তুমি কখনো আর বলো না।'

হেসে উঠলো পল। তারপর হঠাৎই ওর কণ্ঠস্বর কেমন গম্ভীর শোনায়, 'শোনো ব্র্যাড, তুমি আমার একটা উপকার করতে পারো?'

'হাঁ, পল, কেন পারবো না? তোমার জন্যে আমি প্রাণও দিতে পারি।' আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বলি, 'হুকুম করো, আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে তোমার হুকুম মানবো। বলো কি করতে পারি তোমার জন্যে?'

'তুমি তো জানো এডিথকে। ওর সেই অনেক দাতব্যের মধ্যে এটা আর এক খয়রাতির ব্যাপার।'

এডিথ তার স্ত্রী। ভারি মিষ্টি মেয়ে এই এডিথ। ভীষণ খেয়ালি, বড় ছটফটে মেয়ে সে। এর আগে আমি তার অনেক পরিকল্পনার রূপ দিয়েছি। বন্ধু পলের কথা ভেবে

আমি কিছু মনে করিনি, বরং আমি সেটা নিজের কর্তব্য বলে মনে করেছি। সে আমার অনেক উপকার করেছে। তাই আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'নিশ্চয়ই পল, আমি খুব খুশি হবো। বলো, কি করতে হবে?'

'কি করতে হবে নিজেই আমি জানি না ব্র্যাড,' পলের উত্তরটা আমার কানে ভেসে আসে, 'এডিথ আমাকে যা বললো, তা এই রকম ঃ আমি যেন তোমাকে খবর দিয়ে বলি, মিসেস হরটেন্স ই. স্কুয়েলার নামে এক ভদ্রমহিলা আজ অপরাহ্নে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এবং তিনিই তোমাকে সব খবর দেবেন, শুনেছি এরকমই কথা আছে।'

'ঠিক আছে পল,' ভদ্রমহিলার নামটা এনগেজমেণ্ট প্যাডে লিখে রেখে বললাম, 'আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো।'

'হ্যাঁ, আর একটা কথা ব্র্যাড,' পল বলে, 'এডিথ তোমাকে সাবধান করে দিতে বলেছে, মেয়েটির সঙ্গে তুমি যেন একটু ভালো ব্যবহার করো।'

পঞ্চাশোর্দ্ধ এডিথ মনে করে তার সব বন্ধুরাই 'মেয়ে', মহিলা সে বলে না ইচ্ছে করে। আমি জানি কেন সে তার বন্ধুদের 'মহিলা' বলে সম্বোধন করে না। নারীর সেই চিরন্তন স্বভাব, বয়স গোপন করার প্রবণতা। বন্ধুদের উদাহরণ দিয়ে এডিথ আজও জাহির করতে চায়, এখনো সে মহিলা হয়নি, সে 'মেয়ে'। এবং যুবতী বলা বাহুল্য। বিচিত্র নারী, তার চেয়েও বিচিত্র বোধহয় তাদের মন। তবু কেন জানি না এডিথের এই ছেলেমানুষি ভাবটা আমার ভালো লাগে, ভালো লাগে তার বয়সের এই লুকোচুরি খেলা। কেমন যেন মায়া হয় তার ওপর। সত্যি, ওরা কতো অসহায় এই একটা ব্যাপারে!

'ঠিক আছে পল, এডিথকে বলো, ও যেন চিন্তা না করে,' পলকে বললাম, 'আমি ওর বন্ধুর সঙ্গে ভি. আই. পি'র মতো ব্যবহার করবো।'

হাসে সে। 'ধন্যবাদ ব্র্যাড। তুমি তো জানো, এ-সব কথা এডিথের কাছে কত অর্থবহ।'

'জানি,' দ্রুত উত্তর আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'আমার ওপর তুমি আস্থা রাখতে পারো।'

তারপর মামুলি কথাবার্তা সেরে গ্রাহক যন্ত্রটা ক্রেডেলের ওপর রেখে দিই। অতঃপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেই চিরকুটটার ওপর, হরটেন্স ই. স্কুয়েলার। কি অদ্ভুত সব নাম, এই নামের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় ভুরিভুরি ওয়াশিংটনে, আর নামের মতোই বিচিত্র তাদের চেহারা, তার চেয়েও বিচিত্র বোধহয় তাদের আচরণ, যার প্রকাশ প্রায় নিরাভরণ আবরণে। তবে এডিথের ভাষায় সেই মেয়েটিকে দেখার সৌভাগ্য আমার এখনো হয়নি। তাই ওয়াশিংটনের মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণাটা নয় এখানে মুলতুবিই থাক এখন। কলিংবেলে চাপ দিলাম।

একটু পরেই মিকি আমার অফিস ঘরে প্রবেশ করলো, তার হাতে শর্টহ্যাণ্ডের প্যাড এবং পেন্সিল। 'এসো, এবার একটু কাজ করা যাক।' আমার দিকে তাকিয়েছিল মিকি, চোখে চোখ পড়তেই বললাম, 'আজ সকালে তুমি অনেক সময় অপচয় করেছো।'

❑ তৃতীয় অধ্যায় ❑

পড়ন্ত বিকেলে ঘড়ির কাঁটাগুলোর বয়স তখন সবে সাড়ে চার, ক্রাইস এবং আমি আমাদের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনারত, ইন্টারকমে আওয়াজ হতেই আমি উঠে গেলাম আমার ডেস্কের সামনে, তাড়াতাড়ি সুইচ টিপতেই আমার বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর ধ্বণিত হলো, ' তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম বাইরের কোন কল এলে আমাকে দিও না মিকি,' বলেই স্যুইচটা আবার অফ করে দিই। নিজের জায়গায় ফিরে এসে শুধোই, 'হ্যাঁ, হিসেবটা কোথায় এসে থেমেছিল ক্রাইস?'

স্টীল ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। তাকে বেশ খুশি দেখাচ্ছিল। টাকার কথা হলেই সব সময় তাকে বেশ খুশি-খুশি দেখায়।

'সপ্তাহে একবাব চারশো কাগজে,' সে তার স্বভাব সুলভ গলায় বলে 'পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ ডলার-এর ওপর শতকরা কুড়ি ভাগ হিসেবে আমাদের কমিশন বাবদ অঙ্কটা দাঁড়ায় এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার। এর পর আছে আর্টের কাজ, কপি করানোর খরচ, মেক-আপ ইত্যাদি বাবদ সপ্তাহে এক হাজার ডলার, তার মানে বছরে বাহান্ন হাজার ডলার।'

'চমৎকার, অতি চমৎকার,' তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, কাজটা আমরা সামলাতে পারবো তো? গতবারের মতো ভরাডুবি হবে না তো?'

শান্ত চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকালো সে। 'না, এবার আর সেই আগের ভুলটা হবে না।'

'গুড বয়,' হাসতে হাসতে তার পিঠ চাপড়ে বললাম, 'এসো, এখন শ্যাম্পেনে চুমুক দেওয়া যাক।

দেওয়াল বোর্ডের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। সেখানে প্রথম সিরিজের বিজ্ঞাপনগুলো টাঙ্গানো রয়েছে। দশটি বিজ্ঞাপন। সব বিজ্ঞাপনগুলোই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রুচির মাধুর্যে ভরা।

ওদিকে দরজা খোলার শব্দ কানে ভেসে আসতেই চকিতে ফিরে তাকালাম সেদিকে। আমার কাছেই আসছিল মিকি। আমি ভেবেছিলাম, বোধহয় আমাকে আর বিরক্ত করতে আসবে না।'

'কিন্তু না এসে উপায়ও ছিলো না,' মিকি আমার উপর রাগ করে বলে, 'মিসেস স্কাইলার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ব্র্যাড।'

'মিসেস স্কাইলার?' ভাবলেশহীন চোখে তাকালাম তার দিকে, 'কে তিনি?'

ভিজিটিং কার্ডের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিকি বলে, 'মিসেস হরটেন্স ই. স্কাইলার' কার্ডটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলে, 'তিনি বলছিলেন, আপনার সঙ্গে তাঁর নাকি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিলো।'

তার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে তাকালাম, ভদ্রমহিলার কার্ডটা আকর্ষণ করার মতো নয়, মামুলি ছাপাখানায় ছাপা তাঁর নাম। কার্ডটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলি, 'কোন

এ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা ছিলো বলে তো আমার মনে পড়ছে না। তাছাড়া এই সময়টা আমি ক্রাইসের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখি, ওর সঙ্গে একান্তে নিভৃতে আলোচনা করার জন্যে।'

কেমন অদ্ভুত চোখে তাকালো মিকি কার্ডটা ফেরত নিতে গিয়ে। সেই সঙ্গে সে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে আমি ওঁকে কি বলবো?'

কাঁধ ঝাকুনি দিলাম। 'তাঁকে তুমি যা খুশি বলতে পারো। আমি শহুরের বাইরে চলে গেছি, কিংবা জরুরী কনফারেন্সে আটকে আছি, এরকম কিছু একটা বলে দিতে পারো। মোদ্দা কথা হলো, তাঁকে আমি এড়াতে চাই। আমার হাতে এখন অনেক দরকারি কাজ, সেগুলো সারতে হবে।' ইতিমধ্যে আমি আবার দেওয়াল-বোর্ডের দিকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

চলে যেতে গিয়ে মিকি ফিরে তাকায় আবার, 'তিনি বলছিলেন, সেই স্বল্প সময়ের নোটিশে আপনি হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না। কিন্তু কাল সকালেই ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। হয়তো তিনি জানতে চাইবেন, কখন আপনার সুবিধা মতো সময় হবে।'

ওয়াশিংটন থেকে আসছেন ভদ্রমহিলা? এখন আমার খেয়াল হলো, এই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই এডিথ রেমির কাছ থেকে আসছে। দ্রুত মিকির দিকে ফিরে, বললাম, 'তা একথা তুমি আমাকে প্রথমে বলোনি কেন? আজ সকালে তাই পল আমাকে ফোনে বলেছিল এই মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ছিঃ ছিঃ কি অন্যায় ব্যাপার বলো তো! যাকগে, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে গিয়ে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখো ওঁকে। কথায় কথায় এই দেরী হওয়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিও। আমাদের কাজের কথা শেষ হলেই তোমাকে আমি ডেকে পাঠাবো, কেমন?'

মিকির চোখ থেকে সেই অদ্ভুত ছায়াটা সরে গিয়ে একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'ঠিক আছে বস,' বলেই সে দ্রুত অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ক্রাইসের দিকে ফিরে তাকালাম, 'আজ তাহলে আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক,' একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'বাকিটা কাল সকালে—'

'প্ল্যানটা বুঝে নিতে খুব বেশি সময় তোমার লাগবে না। দুটোর সময় ম্যাট ব্র্যাডি এবং কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার আগেই আমাদের বাকি আলোচনা শেষ হয়ে যাবে বলে মনে হয়।'

আমি আমার ডেস্কের দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম। পায়ের ছন্দের তালে তালে আমার মুখ চলে, 'আমি অসহায় ক্রাইস, আমি যদি জড়িয়ে পড়ি, আসলটা নিয়ে আমি আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে মার খেতে পারবো না, নকলের আশ্রয় আমাকে নিতেই হবে তখন। আজকের দিনে সাধুগিরিতে সুনাম জুটতে পারে, কিন্তু পয়সার মুখ দেখা যায় না। তাছাড়া আগেও আমি এরকম করেছি, আজ এটা নতুন কিছু নয়।

ডেস্কের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে, তার মুখে অসম্মতির ভাব ফুটে ওঠে, 'কিন্তু এই ছেলেরা দারুণ তুখোড়। তাই বলছিলাম কি—'

স্তব্ধ বিমূঢ়ের মতো বসে পড়ি, দৃষ্টি আমার পড়ে থাকে ক্রাইসের মুখের উপরে। বেচারা!

'তোমার অতো চিন্তা কিসের ক্রাইস?' তাকে আমি বোঝালাম, 'হাজার হোক তারাও তো মানুষ, নয় কি? আমাদের মতোই মানুষ তারা, আমাদের মতোই তো তাদের হাত আছে, মুখ আছে, পা আছে, আছে আমাদের মতো তাদের আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা। আমাদের মতোই তারা টাকার পিছনে ছোটে, নারীর প্রতি আসক্ত, মদের নেশায় বিভোর। আমাদের মতো তারাও লোক দেখানো গায়ে পোশাক চড়ায়, আবার সেই পোশাকই একটা বেশ্যার কাছে কীসের তাড়নায় কেমন নির্লজ্জের মতো খুলে ফেলে অনায়াসে। প্রত্যেকের মনেই চাহিদা আছে, আর সেই চাহিদার ভিন্ন রূপ ভিন্ন মানুষের কাছে। অতএব তাদের চাহিদা কি আগে সেটা জেনে নাও, তাহলেই দেখবে কত সহজে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। এর থেকে সহজ আর কিছু হতে পারে না বোধহয়।'

ইন্টারকমের স্যুইচটা টিপতেই ভয়ে তাকে কুঁকড়ে যেতে দেখলাম। আমার ভীষণ হাসি পেলো, তার অমন দুরাবস্থা দেখে। বেচারা ক্রাইস। অসময়ে কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছে। যুগ পাল্টাচ্ছে, হাওয়া বদলাচ্ছে, যুগের সঙ্গে তাল রেখে প্রয়োজনে নিজেকে বদলাতে হয়, মনে হয় এমন সহজ কথাটা তার বোধগম্য নয়, সে এখনো সেই মান্ধাতা আমলের আদবকায়দা, পুরনো ফ্যাসানের জগতে আজও তার অম্লান বিচরণ, বিচরণের ক্ষেত্রে সে যতো মনোরম এবং সহজলভ্য হোক না কেন, অন্তত ব্যবসার খাতিরে তাকে তার মনোভাব যে ভাবেই হোক না কেন বদলাতেই হবে, এই সত্য কথাটা কিছুতেই সে বুঝতে চায় না। আমার মনে আছে, সেই প্রথম আমার মনে জ্ঞান সঞ্চয়ণ, নাকি পাকে-চক্রে ভূত হয়ে গিয়ে তাদের খপ্পরে পড়া কে জানে। মনে হয় সেই প্রথম সে শুনে থাকবে, আমি আমাদের খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্যে মেয়ে সরবরাহ করে থাকি। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের পাচার করার ব্যবস্থা করি। খবরটা প্রথম শোনার পর আড়চোখে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, তার চোখ মুখের রঙ পাল্টে কেমন যেন একটু রক্তিম হলো। আমার ভীষণ হাসি পেয়েছিল সেদিন তার অসহায় অবস্থা দেখে। তার যা বয়স তাকে ছেলেমানুষ বলা যায় না, অথচ কথাটা শোনার পর তার হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, নারী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আনাড়ি সে, বিশ্বরূপ দর্শন এখনো হয়নি তার। অথচ যা বয়স, তার মতো বয়সের ছেলে অনেক অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়ে বসে আছে। তার মতো বয়সের ছেলে নিঃসংকোচে বলে দিতে পারে তার প্রেমিকার গোপন অঙ্গে কোথায় একটা ছোট্ট সবুজ জরুল আছে। কিন্তু ক্রাইস কেন তাদের ব্যতিক্রম! সে প্রশ্নের উত্তর আজো আমি পাইনি। যাই হোক, সেই চিন্তাটা আপাততঃ দূরে সরিয়ে রেখে আমি আমার সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিই, 'মিকি, এবার তুমি সেই ভদ্রমহিলাকে পাঠিয়ে দিতো পারো।'

স্পীকারের মাধ্যমে হঠাৎ আমার কানে ভেসে আসে। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। 'হ্যাঁ কি যেন বললেন ব্র্যাড?' অবিশ্বাস্য ভাবে তার কণ্ঠস্বর আমার কানে তখনো প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

'আমি বলেছি, ভদ্রমহিলাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারো এখন। আচ্ছা মিকি, বিকেলের পর থেকে তোমার কি হয়েছে বলো তো? তুমি কি কালা হয়ে গেলে, নাকি অন্য কিছু—?'

তার নিচুস্বরে কথাগুলো একরকম চাপা হাসির মতো শোনালো যেন, 'আচ্ছা আপনি কি এর আগে ওঁকে কখনো দেখেননি?'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিই, 'আর আজকের পর আশাকরি তার সঙ্গে আবার কখনো দেখা হবে বলে মনে হয় না।'

এবার সত্যি সত্যি হাসির আওয়াজে সারা ইন্টারকম যেন ফেটে পড়লো। 'দিনে অন্তত দশবার আপনি আপনার সিদ্ধান্ত বদলে থাকেন। এক্ষেত্রে যদি না তা করেন, তাহলে পরের বার সত্যি সত্যি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, আপনি যখন বলবেন, নারীসঙ্গ আপনি ত্যাগ করেছেন।'

ইন্টারকমের স্যুইচ অফ করার শব্দ হতেই ক্রাইসের দিকে তাকালাম, 'আসছেন তিনি।'

তার ঠোঁটে অস্পষ্ট হাসি, দরজার দিকে এগিয়ে যায় সে নিঃশব্দে। দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই সেটা ধীরে ধীরে খুলে যেতে দেখা যায়। দ্রুত এক পাশে সরে যায় সে পথ করে দেওয়ার জন্যে।

মিকির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো আমার কানে। 'এই পথে মিসেস স্কাইলার!'

মিকি দরজা পথে আসতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। ক্রাইস তার পাশ কাটিয়ে অফিসের বাইরে চলে গেলো অতি সন্তর্পণে। যাওয়ার আগে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল সে, তার ওরকম চাহনি আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

তারপর সে এলো। আমি জানি ক্রাইসের সেই হাসির কি অর্থ হতে পারে। আমার মুখের হাবভাবে কিসের প্রকাশ ছিলো কে জানে, মৃদু হেসে মিকি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। ডেস্কের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে আমি শুধোই, 'মিসেস স্কাইলার,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার পরিচয় দিলাম, 'আমি ব্র্যাড রোয়ান।'

আমার হাতে হাত রেখে হাসলো সে, 'মিঃ রোয়ান, আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি খুব খুশি।' সুরেলা নরম গলায় সে বলে, 'আপনার সম্বন্ধে এডিথ আমাকে অনেক বলেছে।' তার সুরেলা কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে।

আমার অজান্তে কখন যে আমার চোখ দুটি স্থির হয়েছিল মেয়েটির দিকে খেয়াল নেই। এর আগে আমার এই চোখ বিদ্ধ হয়েছে অনেক সুন্দরী নারীর দেহের উপরে। এক সময় আমি এক চলচ্চিত্র কোম্পানিতে কাজ করতাম, সেই সূত্রে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা আমার সঙ্গিনী হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীর সেরা সুন্দরী হিসেবে দাবী করতে পারে। এটা ছিলো আমার কাজের একটি অঙ্গ, এবং তাদেরও। তাই তারা আপত্তি করতো না। আমি তাদের নিজের খুশি মতো ব্যবহার করতাম, যখন খুশি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিতাম। কিন্তু এই মেয়েটি যেন তাদের থেকে বিশেষ ব্যতিক্রম।

আমি অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর হাঁটার সতেজ ছন্দময় ভঙ্গিমা আমার খুব ভালো লাগলো। একরাশ উজ্জ্বল বাদামী পশম-নরম চুল আলস্যে কাঁধের উপর লুটোপুটি খাচ্ছিল হাওয়ায়। গাঢ় নীল প্রায় বেগুনী রঙের চোখ দুটি উজ্জ্বল ভাস্বর, বড় বড় চোখের মণি দুটোয় ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে হয়। মুখটা ঠিক গোল নয়, ডিম্বাকৃতি, হাসলে গালে টোল পড়ে, চিবুক ঠিক চৌকো নয় তবে খুঁত নেই বলা যেতে পারে, টিকোল নাক, সব চেয়ে সুন্দর ওর পাতলা দুটি ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল আহ্বানের অপেক্ষায়,

শ্বেতশুভ্র দাঁতগুলো ডেন্টিস্ট কিংবা টুথপেস্টের চমকদার বিজ্ঞাপনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

অজান্তে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়লো, অবচেতন মনে ওর সুন্দর উষ্ণ ঠোঁট দুটি লেহন করতে থাকলাম যেন। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, অপরিচিতা ও, প্রথম সাক্ষাতের সময় আমার আর একটু সংযত হওয়ার কথা, তাছাড়া ও তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ঠোঁটের কোণায় শালীনতার বেড়া দিয়ে হাসি ফুটিয়ে তুলে একটা চেয়ার ওর জন্যে টেনে বললাম, 'দয়া করে এই চেয়ারটায় বসুন।'

সন্তর্পণে চেয়ারে বসার পর ও হাঁটুর চারপাশে খাটো ঘাগরা ঠিক করে নিলো। আমি আমার ডেস্কের পিছনে ফিরে গিয়ে বসলাম একটু আগের আমার সেই স্বাভাবিক ভাবটা ফিরিয়ে আনার জন্যে।

আমি ওকে এই প্রথম খুব কাছ থেকে দেখলাম। ও তখন ওর হাত থেকে গ্লাভস খুলছিল, ধবধবে সাদা পাতলা হাত, পালিশ করা নখ। বাঁ হাতের অনামিকায় বিরাট আকারের হীরের আংটিটা ছাড়া বাড়তি অলংকার বলতে আর কিছু ছিলো না।

'পল আপনার কথা বলেছিল, আপনি আমার এখানে আসতে পারেন,' স্বাভাবিক হতে চাইলেও আমি নিজেই নিজের কথায় কেমন জড়তা অনুভব করলাম, 'কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি ঠিক আশা করিনি আপনাকে। সে যাই হোক, এখন বলুন মিসেস স্কাইলার, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?'

ও আবার হাসলো। ওর সাদা দাঁতের উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরময়, তখন মনে হলো ঘরের মধ্যে অন্য আলোগুলো যেন ম্লান ধূলি-মলিনতার আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। 'আমি এসেছিলাম এলেনের ব্যাপারে আপনাকে সান্ত্বনা দিতে।'

এলেন! স্বগতোক্তি করলাম।

আবার ও হাসলো, সাদা দাঁতের উজ্জ্বলতায় আবার ঘরের আলোগুলো ম্লান হলো, এক ঝলক বিদ্যুৎ যেন খেলে গেলো ঘরের মধ্যে। 'জানেন, হরটেন্সকে আমি কখনো পছন্দ করতে পারিনি।' ওর স্বচ্ছ নীল বেগুনী চোখের মণিদুটো আন্তরিক আবেগে চিকচিক করে উঠলো, 'সেজন্যে তাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবো না।'

কি জানি কেন আমার হাসিটা স্বাভাবিক করে তুলতে পারলাম না তখনো পর্যন্ত, 'আমি জানি আপনি কি বলতে চাইছেন। আমি খৃস্টিয়ান বার্নার্ড। সবাই আমাকে জনি বলে ডেকে থাকে।'

সোনার কেস থেকে ওকে একটা সিগারেট বার করতে দেখে আমি ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে সিগারেট ধরাতে সাহায্য করলাম। সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া বার করলো ও।

আমি আবার চেয়ারে ভালো করে হেলান দিয়ে বসলাম। তখনো আমি নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারছিলাম না।

বড় বড় চোখ করে ও আবার তাকালো আমার দিকে। 'এডিথ বলছিল, আমি যেন

আপনার ওপর একটু নজর দিই, কারণ—' মিষ্টি হাসি ওর ঠোঁটে ফুটে উঠলো যেমন করে গোলাপ তার পাঁপড়ি মেলে দেয় প্রভাতের প্রথম আলোয়—'কারণ এই পৃথিবীতে আপনিই একমাত্র পুরুষ যে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

এবার আমার ধৈর্যের সব বাঁধ ভেঙে গেলো, আমি আর নিজেকে একটু আগের আমার কাজের মধ্যে ধরে রাখতে পারলাম না। আমিও ওর হাসির সাক্ষী হলাম। আমি আবার স্বাভাবিক হতে থাকলাম। এবার আমি আমার স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যেন ফিরে পেলাম। আমি আবার যেন আমার তলাকার মাটি ফিরে পেলাম, সেই উপলব্ধিটা আমি যেন এই প্রথম অনুভব করতে পারলাম। আমি আবার আগের মতো স্বাভাবিক হলাম, আমার পুরনো ইচ্ছেগুলো ডানা মেলতে শুরু করলো। আবার আমি ওর চোখে চোখ রাখলাম। আমার মনে হলো, আমি বোধহয় অন্য কাউকে আশা করছিলাম। আমি কখনো ভাবতেই পারিনি, এডিথের মেয়েটি, এডিথের কার্বন কপি হতে পারে। ভেবেছিলাম, অন্য মেয়ে ও, অন্য মন ওর। আমার সেই ভুলটা ভাঙতেই ওকে শুধোলাম, 'কেমন করে?'

'আমাদের স্থানীয় কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছি আমি, কমিটির কাজ হলো শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আমার ধারণা, এ ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার রূপ এবং প্রচারের ব্যবস্থা আপনি করতে পারবেন। যার সুফল আমরা আন্তরিক ভাবে আশা করি।' ওর নীল বেগুনী চোখ দুটি আমার চোখে স্থির হলো, ওর চোখে অনেক আশা, অনেক প্রত্যাশা।

হঠাৎ আমার মনে একটা ঘৃণাবোধ জেগে উঠলো। এডিথের মেয়েদের মধ্যে ও একজন, ও কি চায় সেটা বোধহয় ও নিজেই জানে না ভালো করে। ওর কাছে একটা জিনিস খুবই জরুরী, সেটা হলো সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে নিজের প্রচার। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর বলে মনে হলো।

জানি না ওর কথার মধ্যে কি জাদু ছিলো, বুঝতে পারি না, আমার অবচেতন মন কি করে হঠাৎ সায় দিয়ে বসলো ওর সপক্ষে। অথচ ও যে সমাজের মেয়ে, তারা প্রায় সবাই একই ধরণের। সেখানে কোন শ্রেণী বিচার নেই। এসব মেয়েরা প্রচার-মুখি, যে কাজই ওরা করুক না কেন, সে কাজ ভালো আর মন্দ হোক, গ্রহণ কিংবা বর্জন হোক না কেন, ওরা চায় ওদের কাজের প্রচার। কাজের চেয়ে প্রচারই ওদের কাছে বড়। আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম।

'ঠিক আছে মিসেস স্কাইলার, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে আপনাকে সাহায্য করবো,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম, 'আমার সেক্রেটারির কাছে আপনার নাম ঠিকানা লিখে যান, আপনাদের সংস্থার কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাকে ওয়াকিবহাল করবেন মাঝে মাঝে, দেখবো সেই সব খবর কিভাবে উপযুক্ত জায়গায় প্রচার করা যায়।'

হঠাৎ ওর নীল বেগুণী চোখের তারায় বিস্ময় ঘনিয়ে ওঠে। ওর চোখের ভাষা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, আমাদের আলোচনা এমন এক রূঢ় অনিশ্চিতের পথে পরিসমাপ্তি ঘটবে, এটা ও বোধহয় আশা করেনি। তাই ও স্তব্ধ বিস্ময়ে জানতে চাইলো, 'মিঃ রোয়ান, এর বেশি আপনি কি আর কিছু করতে পারেন না?'

রাগত চোখে আমি ওর দিকে ফিরে তাকাই। ওর মতো নকল সমাজসেবিকাদের দেখে দেখে আমি আজ ভীষণ ক্লান্ত, বুঝি-বা একটু বিরক্ত। এই সব সংস্থার নাম শুনলেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। 'আচ্ছা মিসেস স্কাইলার, এটাই তো আপনি চাইছিলেন, চাইছিলেন না?' হয়তো আমার কথায় মনের ভাবটা প্রকাশ পেলো, 'যাইহোক, লিখিত প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে পারি না, তবে যতদূর সম্ভব, আমরা আপনাদের কাজের ভাগীদার হতে প্রস্তুত। এটাই তো আপনারা চান, তাই নয় কি?'

হঠাৎ ও মুখ বন্ধ করলো। ওর নীল চোখ দুটো আরো গাঢ় হলো, নীল চোখের তারায় শীতল ছায়া। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় ও। আধপোড়া সিগারেটটা অ্যাস্ট্রেতে গুঁজে দিয়ে চেয়ারের ওপর থেকে ও ওর পকেট বুকটা তুলে নেয় তেমনি নিঃশব্দে। তারপর আমার দিকে তাকালো। চোখের মতোই ভয়ঙ্কর থমথমে ওর মুখ। ওর কণ্ঠস্বর আমার মতোই বিরক্তিতে ভরা, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন মিঃ রোয়ান। এ কাজের মাধ্যমে আমি আমার ব্যক্তিগত প্রচারের আশা করিনি। এর থেকে অনেক বেশি প্রচার আমি পেয়েছি। তবে আপনার কাছে এসেছিলাম, আগামী জানুয়ারীতে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে একটা আলোচনাচক্রের প্রচারের জন্যে। এ কাজ আমি গ্রহণ করেছিলাম কেবল একটি কারণে, আমি জানি এমন কঠিন কাজে কোন স্ত্রী কিংবা মা তাদের সংসার ছেড়ে এগিয়ে আসবে না, তাছাড়া আমি তা চাইও না?' কথাটা শেষ করে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ও।

আমি ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে অবাক হয়ে ভাবি। ওর অভিমানে ভরা মুখের অবয়ব মুহূর্তের জন্যে আমার কঠিন মনটাকে দোলা দিলো। আমি বেশ বুঝতে পারি, একটু একটু করে আমার মনটা কেমন দুর্বল হয়ে উঠছে। ওর নাম মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে, 'মিসেস ডেভিড ই. স্কাইলার!' এখন আমি সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারি। নীরবে আমি নিজেকে ধিক্কার দিই। মনে পড়ে গত বছর প্রতিটি খবরের কাগজের পাতা জুড়ে পরিবেশিত হয়েছে খবরটা। মনে পড়লো কিভাবে ও ওর দুটি যমজ সন্তান এবং স্বামীকে অসময়ে হারিয়েছিল।

দরজা খোলার আগেই আমি ওর হাতটা চেপে ধরলাম। দরজার ওপর ঝুঁকে পড়লাম, ওর পথ অবরোধ করে। আমার দিকে তাকালো ও। ওর চোখে জল চিকচিক করছিল, রাগ কি অভিমানের অশ্রু ঠিক বোঝা গেলো না।

'মিসেস স্কাইলার!' আমার অনুতপ্ত হৃদয় তখন ওর বেদনায় ক্ষতবিক্ষত। বিনীত সুরে বললাম, 'এই সবজান্তা অক্ষমকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন না? আমি ভীষণ দুঃখিত।'

ওর আয়ত চোখ দুটি আবার স্থির হলো আমার চোখে দীর্ঘক্ষণ। ওর নীল চোখের তারায় শিশির বিন্দুর মতো জল তখনো চিকচিক করছিল। তারপর একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসলো। নিজের সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করলো। হাতটা ওর অসম্ভব কাঁপছিল সিগারেটটা ঠোঁটের মধ্যে রাখতে গিয়ে। সিগারেট ধরাতে সাহায্য করলাম ওকে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' সিগারেটের ধোঁয়ায় ওর চোখের জল তখনো স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছিল, 'আমি ভেবেছিলাম আর পাঁচটা মেয়েদের মতো আপনিও বুঝি নামের মোহে ছুটছেন।'

তখনো ও অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। বোধহয় ও বিশ্বাস করতে পারছিল না, আমি মন থেকে বলছি কিনা। ওর দ্বিধা তখনো যায়নি, আমি যদি আবার রূঢ় হই বা আবার কোন কঠিন কথা ওকে শুনিয়ে দিই, সে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না বোধহয়। ওর বেদনাহত নীল চোখের জল দেখে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল, ওকে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সযত্নে ওর সেই চোখের জল মুছিয়ে দিই, আমার হাতের স্পর্শে ওর সব বেদনা দূর করে দিই। আমি বেশ ভালো করে জানি, ওর ঐ বেদনার কথা আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

ধীরে ধীরে শান্ত গলায় ও বলে, 'মিস্টার ব্র্যাড, সত্যি যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারি।'

❑ চতুর্থ অধ্যায় ❑

ফোনটা বেজে ওঠে। ক্রাইসের ফোন। 'গতমাসের নীট লাভ-লোকসানের একটা হিসেব এইমাত্র পরীক্ষা করে দেখলো হিসাবরক্ষক,' বললো সে।

এলেনের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে ফিরে তাকালাম।

'এক মুহূর্তের জন্যে আমাকে ক্ষমা করো,' মৃদু হেসে বললাম, 'বিজনেস।'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' মাথা নেড়ে সায় দেয় সে।

'ঠিক আছে, তারপর কি বলো?' গ্রাহযন্ত্রে মুখ রেখে বলি, 'লাভের কথাটা আগে বলো।'

'ট্যাক্স দেওয়ার আগে লাভ একশ হাজার আর ট্যাক্স দেওয়ার পর নয়,' দূরভাষে ক্রাইসের শুকনো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'ভালো, এবার লাইনটা দয়া করে ছেড়ে দাও।'

'হাতে তোমার সময় আছে?' তার কথায় ব্যাঙ্গের সুর ধ্বনিত হয়।

ঠাণ্ডা গলায় বলি, 'হ্যাঁ সময় আছে বৈকি!'

অতঃপর সে লাভ ক্ষতির হিসাব-পত্র দিয়ে যেতে থাকে রীলে প্রথায়। আমি কোন মনোযোগ দিই না। আমি তখন এলেনকে দেখছিলাম।

এলেন তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দেওয়ালের নিচে। দেওয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপনের খসরাগুলো দেখছিল সে। তার এমন আগ্রহ দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। হঠাৎ সে পিছন ফিরে তাকাতেই তার চোখের সামনে পড়লাম, ও হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে।

বিনিময়ে আমিও হাসলাম। ডেস্কের সামনে ফিরে এসে সে আবার চেয়ারে বসলো। অবশেষে ক্রাইসের সঙ্গে কথা শেষ করে গ্রাহকযন্ত্রটা আমি নামিয়ে রাখলাম। তারপর এলেনের দিকে ফিরে বলালাম, 'আমি দুঃখিত।'

'ক্ষমা চেও না,' বললো সে, 'আমি বুঝেছি।' দেওয়াল-বোর্ডের দিকে তাকালো সে ড্রইংগুলো দেখার জন্যে। 'বিজ্ঞাপনের খসরাগুলো কেমন যেন অস্বাভাবিক। বিক্রীর কথা কোথাও উল্লেখ নেই। কেবল স্টীলের বিবরণ।'

'হ্যাঁ, এ বিজ্ঞাপনের প্রচার এরকমই হওয়া উচিত।' আমি বললাম 'এটু বিশেষ বিজ্ঞাপনের প্রচারের ধরনই এমন, অ্যামেরিকান স্টীল ইন্সটিটিউটের হয়ে এই বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা আমরা করেছি।'

'অ্যামেরিকান স্টীল ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞাপন?' মৃদু চিৎকার করে ওঠে এলেন।

'তুমি চেনো এই সংস্থাটাকে?'

'হ্যাঁ চিনি বৈকি! গত দু'সপ্তাহ ধরে আমি এর নাম শুনে আসছি,' সে বলে। তার কথা শুনে আমি তো স্তব্ধ, হতবাক। মেয়েটি বলে কি? 'আমার কাকা ম্যাথিউ, ব্রেডি ঐ সংস্থার চেয়ারম্যান। দু'সপ্তাহ হলো তাঁর বাড়িতে আমি এসে উঠেছি।'

আনন্দে আমি শিষ দিয়ে উঠলাম। শুনেছি, লোকটা নাকি এক সময় জলদস্যু ছিলো, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার মগজে। তেমনি নিষ্ঠুর, রূঢ় প্রকৃতির লোক সে। ক্রাইস তাকে ভীষণ ভয় করে, তার মুখের ওপর কথা বলার সাহস সে পায় না। আর সেই লোকটাই এলেনের কাকা? কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

এলেন হাসতে শুরু করে দিলো। 'কি ভাবছেন বলুন তো? আপনার মুখে চিন্তার একটা অদ্ভুত ছাপ পড়েছে। কি ব্যাপার?'

এক মুহূর্তের জন্যে আমি তার চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে বুঝে নিয়েছি, এই মেয়েটি সৎ, এ আমাদের কাজে আসতে পারে। আমার মনের এই ভাবটা প্রকাশ পায় আমার কথায়, 'আমি ভাবছিলাম, কি আশ্চর্য, ভাগ্য যেন আমার ওপর অসীম দয়া করার প্রতীক্ষায়। অফিসের বাইরে আমি হয়তো দু'একবার আপনার পিছনে ধাওয়া করেছিলাম। সে তো অন্য মন নিয়ে, আজ আর অস্বীকার করবো না, আমার সেই মনটা এই মুহূর্তে ভেঙে রেণু রেণু হয়ে গুড়িয়ে গেছে। আপনার প্রকৃত মূল্যায়ন এই মাত্র হলো আমার কাছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ম্যাট ব্রেডি আপনার কাকা! এখন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, এবার স্টীল একাউন্টের বকেয়া টাকা অনায়াসে উদ্ধার করা যাবে।'

'কেন, আপনি কি মনে করেন, এই পরিচয়টা পাওয়ার পর আমার মধ্যে কোন তফাৎ অনুভূত হতে পারে?' প্রশ্ন করে তাকালো সে, তার মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেলো।

'আহা—', আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'আপনার নয় আমার, আমি যদি আপনার কাকা হতাম, আমি যদি ম্যাট ব্রেডি হতাম, তাহলে আপনার মাধ্যমে অনেকে আমার কাছে তাদের আর্জি পেশ করতো, এবং বলা বাহুল্য সবার আবেদনই আমি তখন মঞ্জুর করে দিতাম।'

এলেনের ঠোঁটে হাসি আবার ফিরে আসে। 'তাহলে আপনি আমার কাকাকে চেনেন না,' সে বলে, 'ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন বালাই নেই তাঁর কাছে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি,' আমি বললাম। কিন্তু বললাম না, এর থেকেও খারাপ

মন্তব্য আমি শুনেছি তার কাকার সম্বন্ধে যা তাকে বলা যায় না।

'কিন্তু আমার কাছে চমৎকার লোক তিনি, আমি তাঁর খুব ভক্ত।' দ্রুত বলে গেলো এলেন।

নিজের মনেই হাসলাম আমি। চমৎকার স্বভাবের লোক ম্যাট ব্রেডি, এ যেন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। গতবার বাজার মন্দার সময় ছোট ছোট স্টীল কোম্পানিগুলোকে যে ভাবে উনি আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে তাদের গ্রাস করে ফেলেছেন, সেটা কোন সভ্য সমাজে বরদাস্ত করা যায় না।

ডেস্কের ওপর রাখা নোটটার দিকে আমার দৃষ্টি পড়লো। 'আমাদের নিজেদের সমস্যায় ফিরে আসার পক্ষে এটা যথেষ্ট। এই যে সব পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি, এগুলোর বাস্তব রূপ্ দেওয়ার অসুবিধে কোথায় জানেন? এইসব ভাগ্য ফেরানোর কাহিনী শুনতে শুনতে জনগণ ক্লান্ত বুঝিবা বিরক্ত, তারা আর নতুন করে এসব বাজে পুরনো বস্তা পচা কাহিনী শুনতে চায় না। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন এলেন, আপনার যদি সাহস থাকে, তাহলে জনগণের কাছ থেকে মার খেলেও আমরা সেই আঘাতটা সহ্য করতে পারি। পারবেন আপনার সহযোগিতার হাতটা প্রসারিত করতে?'

ধীরে ধীরে ওর মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। এমন দৃঢ়তা আমি এর আগে,অন্য কোন মেয়ের মুখে দেখিনি। সোজা আমার চোখে চোখ রেখে তেমনি দৃঢ়স্বরে সে বললো, 'যে কোন সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত।'

'সে তো খুব ভালো কথা,' সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'তাহলে সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনার একটা সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করবো। আপনি আপনার নিজের কাহিনী বলে যাবেন তাদের কাছে। সহজ সরল ভাবে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কাহিনী।'

ওর চোখের তারায় ছায়া নামে ঘন হয়ে, সেই ছায়াঘন ছায়ায় একটা অস্পষ্ট বেদনার ছবি থিরথির করে কাঁপতে থাকে। এরকম বেদনামধুর মুখের ছবি আমি এর আগে কখনো দেখিনি! আবেগের ঘোরে আমি ওর হাতটা স্পর্শ করার জন্যে হাত বাড়ালাম ধীরে ধীরে। আমার হাতের ওপর হাত রাখলো ও, চঞ্চল হাতটা ওর কি ঠাণ্ডা, ওর বুকের কাঁপন তখন ওর হাতে পায়ে, ঠোঁটে, মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, আমি ওর ভাবভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, যে কোন মুহূর্তে আমার উষ্ণ স্পর্শে ওর সব দৃঢ়তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। পাগলের মতো মত্ত আবেগে আমি ওকে বুকের কাছে টেনে নিলাম। এলেন নম্র-লতার মতো স্বেচ্ছায় আমার বুকের মধ্যে ধরা দেয়। জিভের উষ্ণ নিষ্পেষণে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে প্রচণ্ড উত্তাপ, আর সমাচ্ছন্ন সেই মগ্ন তন্ময়তায় আমার চোখের পাতাদুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে। 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না,' পাখীর মতো ওর নরম বুকটা আমার বুকের সঙ্গে মিশে ছিলো, ভয়ার্ত পক্ষীছানার দুরুদুরু বুকের স্পন্দন আমি অনুভব করছিলাম, ওর সেই ভয়টা দূর করতে তাড়াতাড়ি আমি ওকে শুধোই, 'অন্য আরো উপায় অবশ্য আছে। সেই উপায়গুলো আমরা খুঁজে বার করবো এলেন। হ্যাঁ, শুধু তোমার জন্যে।'

এক সময় এলেন আমার দৃঢ় আলিঙ্গন শিথিল করে সরে দাঁড়াতেই আমি বিহ্বল বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ও ততক্ষণে চেয়ারের ওপরে বসে পড়েছিল, হাতটা ওর কোলের ওপর ছড়ানো। পলক-পতনহীন চোখে তাকালো ও, 'হ্যাঁ, তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। তুমি ঠিকই বলেছো ব্রাড, সেটাই সব থেকে ভালো পথ।'

সত্যি ওর সাহস আছে, মনের দৃঢ়তা আছে। 'ম্যাট ব্রেডির ভাইঝি আর লজ্জার তোয়াক্কা করে না।'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা বলছো তুমি।' আমি ওর সান্নিধ্যে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখি, এবার ও আর আমার হাত সরালো না। বরং আমার হাতটা ও ওর কাঁধ থেকে নামিয়ে এনে ওঁর বুকের ওপর চেপে ধরলো। ওর উষ্ণ বুকের উত্তাপ আমার শীতল হাতে একটা হাল্কা আমেজের পরশ এনে দেয়।

সেই আমেজটা বেশিক্ষণ আমি উপভোগ করতে পারলাম না, ইণ্টারকমে আওয়াজ হতেই আমি সন্ত্রস্ত হয়ে স্যুইচ অন করে দিই। 'হ্যাঁ, কি খবর বলো?'

মিকির কণ্ঠ ভেসে আসে গ্রাহকযন্ত্রে, 'এখন সাড়ে-ছ'টা বস, আজ রাতে আমার একটা বিশেষ ডেট আছে। আমাকে কি আপনার এর পরেও দরকার হবে?'

কব্জি উল্টিয়ে ঘড়ি দেখতে গিয়ে নিজের ওপর ভীষণ রাগ হলো। এতো দেরি হয়ে গেছে অথচ আমি খেয়াল করিনি। ছিঃ ছিঃ। 'হ্যাঁ মিকি, তুমি এখন যেতে পারো,' আমি তাকে বলি, 'বাকী কাজটুকু আমি নিজেই সেরে নিতে পারবো।'

'ধন্যবাদ বস,' মিকির কণ্ঠস্বরে ভালোলাগার সুর ধ্বনিত হয়, 'দশ পাউণ্ডের একটা বিল আপনি আপনার ডেস্কের ওপর রেখে যেতে পারেন। শুভরাত্রি।'

স্যুইচ অফ করে এলেনের দিকে ফিরে তাকালাম। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল ও তখন। দুষ্টুমি ভরা সে হাসি।

'আমি বোধহয় তোমাকে দেরী করে দিলাম ব্র্যাড,' এলেনের অনুযোগ উচ্চারিত হয়।

'তার জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই এলেন।' আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলি, 'বোধহয় এর জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম, কি তুমি করছিলে না?'

'কিন্তু,' এলেন আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলে, 'আমার সময়ের কোন বাধা নেই এখন। কিন্তু তোমার যে নৈশভোজের দেরী হয়ে গেলো ব্র্যাড! বাড়িতে তোমার স্ত্রী তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। সে যদি—'

'না, না মারজা সে রকম মেয়ে নয়, ও কিছু মনে করবে না।' প্রত্যুত্তরে আমি বলি, 'এ ব্যাপারে ও অভ্যস্ত।'

এলেন ওর হাত ব্যাগটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে বলে, 'তবু বোধহয় আমার এখন চলে যাওয়াই উচিত।' হাতব্যাগ থেকে লিপস্টিক বার করে ঠোঁটে লাগাতে থাকে ও সযত্নে।

আমি ওকে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে থাকি। একটু আগে আমি ওর ঐ ভিজে ঠোঁটের স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম, আঃ কি মিষ্টি আর কি উষ্ণ, তার রেশ বুঝি এখনো লেগে

আছে আমার ঠোঁটে, সেই আমেজে আমার হৃদয়টা এখনো ভরে আছে যেন। এই মুহূর্তে ওকে কাছছাড়া করতে মন চাইছিল না। অথচ ওকে বেশিক্ষণ ধরে রাখাও সম্ভব নয়, এ আমি বেশ ভালো করেই জানি। ওর ঠোঁটের সেই মধুর স্পর্শ পাওয়ার লোভে আমি আমার নিজের মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম, 'কিন্তু আমাদের কথা তো এখনো শেষ হয়নি এলেন?' ও তখন চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল। 'তাছাড়া তুমি তো কালই আবার ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছো।'

ও ওর মিনি আয়নার ওপরে থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো, 'কিন্তু আসছে সপ্তাহেই আমি তো ফিরে আসছি আবার,' লিপস্টিকটা টিউবে পুরে রাখতে গিয়ে ও আবার বলে, 'তখন না হয় বাকী কথা শেষ করা যাবেখন।'

'তখন হয়তো এই মনটা আর থাকবে না এলেন,' নিজের কানেই কথাটা কেমন অদ্ভুত শোনালো, নিজেকে আমি ওর কাছে বড় বেশি প্রকাশ করে ফেললাম। কে জানে ও কি ভাবলো। ওর মনের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে ওর মুখের দিকে তাকালাম কথাটা শেষ করা মাত্র।

আশ্চর্য এলেনও আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন জরীপ করছিল, ওর করুণ চোখের অভিব্যক্তি আমাকে দারুণ চঞ্চল করে তুললো। ওর কথাতেও সেই করুণ সুরটা প্রতিধ্বনিত হলো যেন, 'লক্ষীটি, আমাকে তুমি বলে দাও, আমি কি করবো!'

কি করুণ মিনতি ওর। প্রতি মুহূর্তে ওর সান্নিধ্যটা আমার কাছে ক্রমশঃ যেন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। আরো কিছু সময় ওকে ধরে রাখার জন্যে বললাম, 'তোমার কোন এনগেজমেণ্ট না থাকলে এসো না, এক সঙ্গে দুজনে বাইরে কোথাও নৈশভোজ সেরে আসি।' দ্রুত আমি আমার কাজের কথাটা সেরে নিতে চাইলাম, 'তারপর ফিরে এসে বাকী আলোচনাটুকু সেরে ফেললে কেমন হয়?'

এলেন আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। বড় বড় হয়ে ওঠা নীল বেগুনী রঙের স্বচ্ছ চোখের মণির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওর চোখ দুটোই যেন কথা কইছে, মুখে কিছু বলে দিতে হচ্ছে না। মেয়েদের চোখের ভাষা পড়তে পড়তে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি এখন এলেনের চোখের ভাষা পড়ে বলে দিতে পারি, ও এক বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে। ও ভাবছে, আমার স্ত্রীর কথা, আমার সংসারের কথা, আমার ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু কেন ও বুঝতে চাইছে না, আমার ভবিষ্যতের সঙ্গে ওর ভবিষ্যতও একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে আজ। বেলাশেষের নরম রোদ পিছলে যাওয়া ওর নরম বাদামী চুলগুলো যখন হাওয়ায় আছড়ে পড়ছিল আমার বুকে, আমার হাতটা যখন ওর টানটান বুকের ওপর বিলি কাটছিল তখন!

ধীরে ধীরে ওর বাদামী চুলগুলো দুলে উঠলো, 'আজ এই পর্যন্তই থাক ব্র্যাড। আমার মনে হয় আজ এর বেশি আমাদের না এগোনই উচিত।' ম্লান বিষণ্ণ সুর ধ্বনিত হলো ওর কথায়, 'আমি চাই না আজ শুভ সন্ধ্যেটা তোমার নষ্ট হোক। ইতিমধ্যেই আমি অনেক দেরী করিয়ে দিয়েছি তোমাকে।'

আমি এবার অধৈর্যা হয়ে উঠলাম, 'কেন, এসব কি তোমার ভালো লাগে না এলেন?'

ওকে কাছে আকর্ষণ করতে যাই। ঠোঁট নামাবার আগেই ও আমায় বিছিন্ন করে দূরে সরে গেলো। চেয়ারের ওপর থেকে ও ওর ফারের জ্যাকেটটা তুলে নিলো অতঃপর।

'ভালো লাগা না লাগার কথা নয় ব্র্যাড।' নীল চোখ মেলে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই নামিয়ে নিলো ও। ওর চোখের কোণায় অশ্রুকণা জমে উঠেছিল, অনেক চেষ্টা করেও চোখের জল ও রোধ করতে পারলো না। ভিজে ভিজে গলায় ও উত্তর দিলো, 'ভালো লাগা না লাগার প্রশ্ন নয় ব্র্যাড। কেন তুমি বুঝতে চাইছো না, এর জন্যে মনের যথেষ্ট প্রস্তুতি থাকা দরকার, আর চাই সময় এবং সুযোগের। সেই শুভক্ষণটির জন্যে ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা তো আমাদের করতেই হবে। কেন, পারবে না?'

নীরবে মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিয়ে এবার আমি ওকে ফারের জ্যাকেটটা পড়তে সাহায্য করলাম। তাতে ও কোন অপাত্তি করলো না, বরং আবার সরে এসে আমার গা ঘেঁষে আমাকে সুযোগ করে দিলো ওর শরীরের শেষ মিষ্টি ঘ্রাণটুকু নিঃশ্বাস ভরে নিতে। 'ঠিক আছে,' বললাম বটে তবে মুখের হাবভাবে আমি বুঝিয়ে দিলাম, আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই। শেষবারের মতো ওকে অনুরোধ করলাম, 'তাহলে অন্তত একটু শ্যাম্পেন খেয়ে যাবে না?'

চকিতে আমার দিকে ফিরে তাকালো ও, সোজাসুজি আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি করে বল্‌তো তুমি কি চাইছো ব্র্যাড?'

আমার চোখের ভাষা তখন যাই হোক না কেন, আসলে আমি কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ওকে ড্রিংক করার আহ্বান জানাইনি। সেই কথাটা ওকে বোঝাবার জন্যে বলি, 'আমি কোন কিছুরই প্রত্যাশা করছি না এলেন। মেয়েদের জন্যে মদ খাওয়ার ব্যবস্থা যে কারণে সাধারণ পুরুষেরা করে থাকে, সত্যি করে বলো তো তুমি কি আমাকে তাদের দলে ফেল্‌তে চাইছো?'

ওর মুখের হাসিটা কখন যে উধাও হয়ে গিয়েছিল, আমি খেয়াল করিনি। ওর কণ্ঠস্বর শুনে সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

'কেন অকারণ ওসব কথা ভাবতে যাবো বলে? এখনো পর্যন্ত তুমি তো তাদের মতো তেমন কোন আচরণ করোনি।'

আমার মুখে এক ঝলক রক্ত চলকে উঠলো, 'সত্যিই আমি তাহলে সে রকম কিছু নই! তুমি আমাকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করোছো তো?

তখনো ও আমাকে নিরীক্ষণ করছিল, আমাকে বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। 'তাহলে আমাকে ঘিরে কেন তোমার এই আকুলতা ব্র্যাড?'

ওর এ ধরণের কথায় কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করলাম। এ যেন কোন কিশোরীর কাছ থেকে ডেট চেয়ে কিশোরের নিরাশ হওয়ার মতো। প্রসঙ্গটাকে পাল্টাবার চেষ্টা করলাম, 'কারণ তুমি আমার এখানে আসার সময় আমি তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলাম, তার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমার সেই রূপটা আসল রূপ নয়। সেটা প্রমাণ করার জন্যেই আমি তোমাকে—'

আমার কথায় কি ছিলো কে জানে, তবে ওর মুখের রঙ বদলাতে দেখলাম, আগের

থেকে অনেক বেশি সহজ হয়ে ও কথা বললো, 'তোমাকে তা করতে হবে না ব্র্যাড,' শান্তভাবে ও আবার বলে, 'ইতিমধ্যে সেই প্রমাণটা তুমি আমার সামনে রাখতে পেরেছো।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

'শুভরাত্রি ব্র্যাড,' নিজের থেকেই ও বলে, 'এবং ধন্যবাদ।'

আমি ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। হাল্কা রোগা রোগা হাত, হাতের চামড়া মখমলের মতো মোলায়েম। ওর নরম হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলি, 'শুভরাত্রি এলেন।'

'সোমবার আমি ফিরে আসছি, তখন আবার আমরা মিলিত হতে পারি,' হাসতে হাসতে এলেন বলে, 'অবশ্য তোমার যদি সুবিধে হয় তবেই।'

'কেন হবে না, যে কোন সময়ে তুমি চলে আসতে পারো,' ওর হাতটা তখনো আমার হাতের মুঠোয় আবদ্ধ। আমি আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় এবং লোমকূপে ওর উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করছিলাম।

ধীরে ধীরে এলেন ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো আবার। আড়ালে মুখ লুকালো ও অতি সন্তর্পণে। কিন্তু এসব সত্বেও আমার চোখকে ও ফাঁকি দিতে পারলো না। ওর চোখের জল আমার চোখের তারায় ধরা পড়লো। তারপর একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

আমি এতক্ষণে নির্নিমেষ চোখে লক্ষ্য করছিলাম ওকে। দরজার হাতলে ওর হাতটা পৌঁছনোর আগেই আমি ওকে ডাকলাম, 'সোমবার যদি তুমি তাড়াতাড়ি আসো, মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ রইলো।'

একটু থেমে ও এবার আমার দিকে ফিরে তাকালো, 'কোথায়?'

'একটার সময় এখান থেকে আমাকে তুলে নিতে পারো।'

'এটা কি ডেট?' হাসি চেপে শুধোয় ও।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে কেবল ওকে অনুসরণ করলাম, ওর গমনপথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে চলে গেলো ও। ওর প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধটা তখনো আমার নাকে লেগেছিল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতেই সেই মিষ্টি গন্ধটা মিলিয়ে গেলো। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলাম, মারজাকে খবর দিতে হবে আটটার সময় নৈশ্যভোজে ওর সঙ্গে মিলিত হচ্ছি আমি।

বাড়ি ফেরার সময় সারাটা পথ আমার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইলো এলেনের চিন্তায়। ওর কথা আমি যতো ভাবি, ততোই যেন রাগ হতে থাকে। এ আমার কি হলো? এমন কিছু সুন্দরী দেখতে ও নয়। ওর মতো সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে আমি এর আগেও এসেছি, কিন্তু কই অন্য কেউ তো ওর মতো আমার মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটে যায়নি। ওর দেহটা তেমন সেক্সিও নয়। তাছাড়া ওর প্রতি এই যে আমার এতো আকর্ষণবোধ, এর মধ্যে ওর শরীরের নাম-গন্ধ কোথাও নেই। তবে কেন এতো উতলা হওয়া আমার?

ডিনারের টেবিলে ওর সম্বন্ধে সব কথা খুলে বললাম মারজাকে, কিছুই গোপন করলাম না, গোপন করলাম না আমার দুর্বলতার কথা। এবং সেই সঙ্গে ওর প্রতি গোড়ার দিকে দুর্ব্যবহারের কথাও আমি মারজাকে বললাম।

আমার সব কথা মনোযোগ দিয়ে নিঃশব্দে শুনে গেলো মারজা। তারপর আমার বলা শেষ হতেই ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও।

'এ তোমার কিসের দীর্ঘশ্বাস ফেলা মারজা?' সঙ্গে সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বেচারী,' ধীরে ধীরে মারজা বলে, 'অসুখী মহিলা।'

আমি ওর দিকে অবাক চোখে তাকালাম! ও যেন অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে আনলো আমাকে। মারজার সান্নিধ্যে কি জাদু ছিলো কে জানে, অনেকক্ষণ পরে আমার মনে হলো, আমার জীবনে এলেন কেউ নয়, আমার মনে কোথাও এতটুকু স্থান হতে পারে না ওর কেবল ওর জন্যে একটু দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া।

এখন নিজেকে আমার অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হলো। মনটা আমার এখন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। এলেন আমার মন থেকে মুছে গেছে, সে জায়গায় মারজা এখন আপন মহিমায় বিচরণ করছে সদম্ভে, নিজের অধিকারে। এলেনকে ভোলার হয়তো এটাও একটা বড় কারণ। শয্যাপাশে মারজাকে সান্নিধ্যে পেয়ে আমার নবলব্ধ ধারণাটা আরো বদ্ধমূল হলো যেন।

কিন্তু আমার ধারণা যে কতো ভুল সেটা আমি টের পেলাম সোমবার যে মুহূর্তে এলেন আমার অফিসে পা দিলো।

❑ পঞ্চম অধ্যায় ❑

সোমবারের সকাল। অন্যদিনের থেকে একটু আগেই অফিসে চলে এলাম। মারজা অবাক চোখে তাকিয়েছিল আমার দিকে অফিসে আসার সময়। আমি ওর সেই অবাক চোখের ভাষা বুঝেছিলাম, অলক্ষ্যে ওর হাসিটাও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে এ নিয়ে আমি বেশি মাথা ঘামাইনি। আমার মনে তখন একটাই চিন্তা, এলেন আসবে তো? ওর সঙ্গে আজ একটার সময় মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করবো। সেই আনন্দে আমি তখন বিভোর।

সকালের ডাকে আসা চিঠিগুলোর ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে নিজের মনেই হাসি। সত্যি আমি কি বোকা! নিজের বয়সের কথা ভেবে নিজেই চমকে উঠি। আজ এই যে আমার উচ্ছ্বাস, এলেনের জন্যে গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করা তেতাল্লিশ বছর বয়সে কি মানায় আমাকে?

মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন নারী একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে তার জীবনে, প্রেম-ভালোবাসা, মিলনেচ্ছু হৃদয়ে নারীর প্রয়োজন যখন একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে পুরুষের জীবনে, মিলন-পিয়াসী নারীও তখন তার দেহের নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রতীক্ষারত তার মনের মানুষের কাছে সব কিছু উজাড় করে দেয়। কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট বয়েস আছে, যৌবনে, তেতাল্লিশ বছরে নয়। তেতাল্লিশ বছর বয়সটা রোমান্সের নয়, নারীদেহ ভোগ করার নয়, এ বয়সে অন্য কিছু চিন্তা করার। এ মনোভাব আমার মতো বয়সের অনেক পুরুষের মধ্যে আমি দেখেছি। কিন্তু তেতাল্লিশ বছর বয়সে সেক্স

এবং রোমান্স জীইয়ে রাখাটা রীতিমতো সময়, সামর্থ এবং শারীরিক শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। বরং মনটাকে তুমি কর্মব্যস্ত রাখতে পারো। ব্যবসা তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

আমি শুনেছি অ্যামেরিকানদের জীবনে সেক্সের একমাত্র বিকল্প ব্যবসা। বয়সের ভারে নুইয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ তার শক্তি সামর্থ অনুযায়ী ব্যবসার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে থাকে। তবে ব্যবসা চালাতে গিয়ে পুরুষ যে একেবারে যন্ত্রে পরিণত হয়, ঠিক তা নয়। তাহলে সে জীবন হয়ে ওঠে এক যন্ত্রণাময় জীবন, সেটা কারোর কাম্য নয় নিশ্চয়ই। তাই কি ব্যবসায়ীরা জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্যে তাদের সেক্রেটারি হিসেবে মনোনয়ন করে থাকে তম্বী সুন্দরী যুবতী। আর এই কারণেই কি বেশির ভাগ স্ত্রীদের জীবন অসুখী হয়ে ওঠে? তবে বিবাহিত জীবনে সেটা একটা আকস্মিক ঘটনা। এসব আমার বেশ ভালোই জানা আছে। এখনো আমাকে একজন স্মার্ট যুবকের মতোই দেখায়, আমি আমার সীমিত ক্ষমতার কথা জানি। তাছাড়া আমি জানি এলেন ম্যাট ব্রেডির ভাইঝি, অতএব ওকে কোন বাজে ঝামেলায় ফেলার ইচ্ছে আমার কখনোই হতে পারে না।

তখন প্রায় একটা, মধ্যাহ্নভোজের কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ইণ্টারকমের যান্ত্রিক আওয়াজটা হতেই অধৈর্য হয়ে আমি বোতাম টিপলাম।

'মিসেস স্কাইলার এসেছেন,' কথাটা আমার কানে দীর্ঘক্ষণ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে।

দ্রুত নিঃশ্বাস নিয়ে আমি উত্তর দিই, 'ঠিক আছে, ওকে পাঠিয়ে দাও এখানে।'

মিনিট খানেক আগেও এলেনের চিন্তা আমার মনে ছিলো না, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ও যেন আমার সারা মন জুড়ে বসলো। এখন আমি দরজা খুলে ওর ঘরে ঢোকার পথ চেয়ে বসে আছি। এই সামান্য সময়টুকুও আমি যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। মনে মনে ভাবছিলাম, ও আসুক, তাড়াতাড়ি আসুক, এসে দরজা খুলে ঘরে ঢুকুক। ডেস্কের চারপাশে ঘুরতে থাকি, কিন্তু এক সময় দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই দেখি, ও ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে আছে।

আমি ভেবে রেখেছিলাম, আগের বারের মতো প্রথম সাক্ষাতের সময় যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তি আমি আর ঘটতে দেবো না। না, আর তা ঘটতে দেবো না। আমি জানি, আজ ও কি মন নিয়ে এসেছে, কি মন নিয়ে আমি ওর আসার অপেক্ষায় বসে আছি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো ও, একটা কথাও আমি বলতে পারলাম না।

'হ্যালো ব্রাড!' নিচু গলায় হলেও ওর উষ্ণ কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম।

মুহূর্তের জন্যে আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম। তারপর এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত স্পর্শ করলাম। 'এলেন!' ওর নরম ঠাণ্ডা আঙ্গুলগুলো আমার হাতের মুঠোয় আগুন জ্বালিয়ে দিলো যেন। 'এলেন!' ওর নামটা পুনরাবৃত্তি করলাম, 'তুমি আবার ফিরে আসাতে আমি খুব খুশি এলেন।'

হাসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল এলেন এবং কিছু একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়েই ওর মুখের কথা মুখেই আটকে গেলো। ওর চোখে ছায়া ঘনিয়ে উঠতে দেখা গেলো।

'আমি দুঃখিত ব্র্যাড,' হাতটা সরিয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে ও বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ খেতে যেতে পারবোনা।'

'কেন পারবে না?' হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেললাম।

এলেন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'আগে আমার একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিলো, কথাটা সেদিন আমার একদম খেয়ালই ছিলো না। সেই কথাটা বলতেই আজ আমি তোমার কাছে ছুটে এলাম।'

বিহ্বল বিস্ময়ে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। নিরুত্তাপ, নিস্তেজ ওর নীল বেগুনী চোখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না। একটা শীতল প্রবাহ যেন আমার সারা শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেলো। পরমুহূর্তে হঠাৎ আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো এলেন?' সরাসরি আমি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম।

কোন উত্তর দিল না ও।

একলাফে এগিয়ে গেলাম আমি ওর দিকে। 'তোমার যদি এনগেজমেণ্টই থেকে থাকে, আমাকে তুমি ফোনে জানাতে পারতে।' রূঢ়স্বরে বলি, 'ন্যাকামো করে সশরীরে এখানে আসার কোন মানে থাকতে পারে না। শহরে টেলিফোন বুথের কি এতই অভাব?'

এবারও কোন উত্তর না দিয়ে দরজা পথে এগিয়ে গেলো ও। আমার তখন ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ছুটে গিয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে আমার দিকে ফেরালাম। 'কেন আমাকে তুমি মিথ্যে কথা বলছো?' আমি ওর চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করি।

ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে, 'বিশ্বাস করো ব্র্যাড, আমি মিথ্যে বলছি না।' নিচু গলায় কোন রকমে বললো ও, 'তোমাকে মিথ্যে করে কিছু বলার দুঃসাহস আমার এখনো হয়নি।'

আমি ওর কথায় কোন কান দিলাম না। তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কিসের ভয় এলেন বলতে পারো?'

হঠাৎ এলেনের মুখটা কেমন কঠিন হয়ে উঠলো। ওর চোখে এখন আর এক বিন্দু অশ্রুও নেই। মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করে ও আমাকে তাড়া দেয়,—'আমাকে যেতে দাও ব্রাড,' ওর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে আমার কানে, 'আমি কি যথেষ্ট কষ্ট পাইনি?'

ওর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, চোখের জল আমার সব অভিযোগ সব রাগ ভুলিয়ে দিলো নিমেষে যেন। ধীরে ধীরে ক্লান্ত পায়ে আমার ডেস্কের পিছনে এসে চেয়ারে বসলাম। একটু পরে ওর দিকে ফিরে আবার আমি তাকালাম। 'ঠিক আছে এলেন,' আমি বললাম, 'তুমি চাইলে যেতে পারো।'

আমার দিকে তাকিয়ে ও ইতস্ততঃ করে, 'ব্র্যাড, আমি দুঃখিত।'

'আমি কোন উত্তর দিলাম না। অপসৃয়মান এলেনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করলো ও। তারপর শূন্যে দৃষ্টি মেলে ভাবলাম, এলেনই ঠিক। এ নিয়ে আর কোন তর্ক চলে না। আমার মনে হলো, এলেনের মতো মেয়েকে কোন কিছুর বিনিময়ে ধরে রাখা যায় না, ও যেন ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। একমাত্র মরুভূমির মরীচিকার সঙ্গেই ওর তুলনা করা যায়।

অবসাদ কাটাতে একটা সিগারেট ধরাই। এ একরকম ভালোই হলো, শুরুতেই সব সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেলো। তেতাল্লিশ বছর বয়সে যৌবনের স্বপ্ন দেখাটা বাতুলতা।

কোনক্রমে দিনটা প্রায় শেষ করে এনেছিলাম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে, টেলিফোনটা বেজে উঠতেই গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিলাম।

'পল রেমি ফোন করছেন বস,' মিকির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাসে।

'ঠিক আছে, লাইনটা দাও,' একটু পরে পলের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই বলি, 'কেমন আছো পল?'

'চমৎকার ব্র্যাড,' প্রত্যুত্তরে পল বলে, 'আজ রাতে নৈশভোজে আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই,' তার প্রস্তাবে এত দ্রুত রাজী হয়ে যেতে নিজেই নিজের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠি। 'তা মহাশয় কোত্থেকে ফোন করা হচ্ছে শুনি?'

'আমি এখন এই শহরেই আছি,' আমার কথা শুনে হাসলো ও। 'চীফের জন্যে আমাদেব কোম্পানির দোষ ত্রুটিগুলো নৈশভোজের আলোচনায় শুধরে নিতে চাই। এডিথও এসেছে আমার সঙ্গে কিছু কেনাকাটা করার জন্যে। ন'টার প্লেনেই আবার ফিরে যাচ্ছি।'

'অপূর্ব,' আমার কণ্ঠস্বরে যতোটা সম্ভব আন্তরিকতা ফুটিয়ে বলি, 'ধরো যদি ছ'টা কুড়ির সময় দেখা করি? তারপর নৈশভোজে আলোচনা সেরে আমি তোমাকে গাড়ী চালিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবো, কেমন!'

'ঠিক আছে, তাহলে ওখানেই দেখা হচ্ছে।'

গ্রাহকযন্ত্রটা রেখে দিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। অপরাহ্নে সন্ধ্যায় আলো-আঁধারী লুকোচুরি খেলা চোখে পড়লো। আজ যেন একটু তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামলো। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। এখন আমার একমাত্র চিন্তা, ঘরে ফিরে গিয়ে কি করে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দেওয়া যায়। তবে তার আগে একটা কাজ আমাকে করতে হবে।

কথাটা মনে হতেই আমি গ্রাহকযন্ত্রটা আবার হাতে তুলে নিলাম বাড়িতে ফোন করার জন্যে। মারজার কণ্ঠস্বর শুনে বললাম, 'খুকুমনি আজ রাতে নৈশভোজের জন্যে বাড়ি ফিরতে পারছি না। পল এখন শহরে, ওর সঙ্গে নৈশভোজের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দেবে?'

'না তা বোধহয় সম্ভব নয়,' মারজা উত্তরে বলে, 'জেনির সঙ্গে নৈশভোজ সেরে আজ একটু তাড়াতাড়ি বিছানায় আশ্রয় নেবো ভাবছি। তোমার তো এখন সময় খুব ভালো যাচ্ছে বলে মনে হয়।'

'ঠিক আছে খুকুমণি, তাহলে এখন ছাড়ছি। বাই—'

আমার ডেস্কে ফিরে এসে এস্টিমেটগুলোর ওপর শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিয়ে সই করলাম। এগুলো ক্রাইসের অফিসে পাঠাতে হবে। ঘড়িতে তখন ছ'টা বাজে। অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

রাতে ঠাণ্ডা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল, ঠাণ্ডা হাওয়া ছুঁচের মতো গায়ে বিঁধছিল যেন। হাঁটা পথেই চলে এলাম ম্যাডিসনে ফিফটি-সেকেণ্ড স্ট্রীটের সেই রেস্তোরাঁয়।

রিসেপসনিস্ট মেয়েটি ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে স্বাগত জানিয়ে আমাকে খবর দিলো,

'মিঃ রোয়ান, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন মিঃ রেমি। হ্যাঁ, ঐ পাশ দিয়ে যান—আঙ্গুলটা সে ডান দিকে তুলে ধরলো।

টেবিলের দিকে এগোতেই আমাকে দেখতে পেয়ে পল উঠে দাঁড়ালো। এডিথ তার ডান পাশে বসেছিল। পলের সঙ্গে করমর্দন করার পর এডিথের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। 'সত্যি আমাদের এই সাক্ষাৎকার যেন আশ্চর্যজনক, তাই না এডিথ?' আমি বললাম, 'আপনি শহরে এসেছেন, খবরটা আগে দেননি বলে মারজা খুব রাগ করবে।'

হাসলেন এডিথ, 'এখানে আসার কোন ঠিক ছিলো না ব্র্যাড। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, 'তবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো।'

'তাই বুঝি,' বসতে গিয়ে বললাম, 'আপনার বয়স যেন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।'

আবার তিনি হাসলেন, 'বৃদ্ধ ব্র্যাডের মতো,' আমি জানি বয়স কমের কথা বললে তিনি খুব খুশি হন, সব বয়সের সব মেয়েদের যেমনটি হয়ে থাকে।

এক সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়লো, চার আসনের টেবিলের একটা আসন তখনো শূন্য। প্রশ্ন চোখে পলের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে কারোর যেন আসার কথা?'

পলকে বাধা দিয়ে এডিথ বলেন, 'হ্যাঁ ঐ আসছে সে।'

আমার কাঁধ বরাবর পলকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। এবং সেই অবস্থায় সে উঠে দাঁড়াতে গেলো। তার দেখাদেখি আমিও পিছন ফিরে তাকালাম।

আমার মনে হয়, সেই মুহূর্তে এক সঙ্গে আমাদের দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো। ওর সেই নীল বেগুনী চোখের তারা দুটো হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হয়ে আবার মিলিয়ে গেলো। এক মুহূর্তের জন্যে একটু ইতস্ততঃ করে ও আবার হাঁটতে শুরু করলো আমাদের টেবিলের দিকে।

কাছে এসে ও ওর ডানহাতটা মেলে দেয় আমার দিকে, 'মিঃ ব্র্যাড' শান্ত নম্র কণ্ঠস্বর, 'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে ভালোই হলো।'

আমি ওর হাতটা স্পর্শ করলাম। আমার হাতের মুঠোয় ওর সেই হাতটা ভয়ঙ্কর কাঁপছিল, সেই ভাবে হাত ধরা অবস্থায় ওকে আমার পাশের খালি চেয়ারটায় বসতে সাহায্য করলাম। এডিথ সেই দৃশ্যটা দেখে হাসতে থাকেন, মজা উপভোগ করেন। 'শেষ মুহূর্তে এলেন আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হয়েছিল। তারপর আমার সঙ্গে কেনাকাটা করার জন্যে ও মার্কেটে যায়। ওর পছন্দের তারিফ করতে হয়। নিউ ইয়র্কের অর্ধেক জিনিষ আমরা বোধহয় কিনে ফেলেছি।'

'আশা করি নৈশভোজের খরচের টাকাটা তুমি আমার জন্যে রেখে দিয়েছো নিশ্চয়ই।' পল রসিকতা করলো।

এডিথ ফিসফিসিয়ে কি যেন বললো পলকে, কিন্তু উত্তরটা আমি শুনতে পেলাম না। সেই সময় বিল্ডিংটা যদি আমার মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়তো কিছু বলার ছিলো না। আমি তখন সব কিছু ভুলে এলেনের দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর ধোঁয়াটে নীল বেগুনী চোখে করুণ বিষণ্ণতার ছায়া। লাল ঠোঁট দুটো ঈষৎ কাঁপছিল। আমার তখন একটাই চিন্তা, আমি যদি ওর উষ্ণ ঠোঁটে একটিবার চুমু খেতে পেতাম, কি ভালোই না হতো।

❑ ষষ্ঠ অধ্যায় ❑

ঠিক আটটার সময় আমরা যখন কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিচ্ছিলাম, ক্যাপ্টেন আমাদের টেবিলের সামনে এসে বলে, 'মিঃ রোয়ান, আপনার গাড়ী এসে গেছে।'

'ধন্যবাদ!' অফিস ছাড়ার আগে গ্যারাজে ফোন করে বলে দিয়েছিলাম, গাড়ীটা এখানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। পলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ প্রস্তুত।' পল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো।

ওদিকে এডিথ তখন শেষ বারের মতো প্রসাধনপর্ব শেষ করেছিলেন। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এলেনের দিকে তাকালাম।

'বিমানবন্দর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গেলে কেমন হয়?'

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায় এলেন, 'আমি একাই আমার আস্তানায় ফিরে যেতে পারবো। আমি খুব ক্লান্ত। তবু তোমার লিফট দিতে চাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ মিঃ রোয়ান।'

'এলেন, এসো আমাদের সঙ্গে,' এডিথ ওকে বোঝায়, 'দশটার মধ্যে ব্র্যাড তোমাকে হোটেলে ফিরিয়ে দেবে। মুক্ত হাওয়া তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

এলেন এবার আমার দিকে তাকালো। তখনো ওর সেই ইতস্ততঃ ভাবটা কাটেনি।

'ঠিক আছে,' নীল বেগুণী চোখে নীল দ্যুতি এলেনের, 'আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

বিমান বন্দরে যাওয়ার পথে মেয়েরা পিছনের আসনে বসলো, আমি এবং পল সামনের আসনে। আমার দৃষ্টি পড়ে থাকে প্রতিনিয়ত রেয়ারভিউ আয়নার উপরে। এলেন আড়চোখে আমাকে দেখছিল। মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছিলো ও। তারপর আমি আয়নার দিকে তাকাতেই ও আবার আমাকে দেখল অতি সন্তর্পণে।

এলেনকে দেখার ফাঁকে ফাঁকে পলের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা সেরে নিচ্ছিলাম। তবে মন আমার পড়েছিল এলেনের ওপরে। প্রায় সারাটা পথ ওর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম আমি। আমার সারা মন জুড়ে এলেন, কেবলি এলেন, অন্য কোন ভাবনা স্থান পেলো না। আমার মনের আকাশে এলেন তখন চাঁদের হাট বসিয়ে দিয়েছিল। বিমানবন্দরে যখন পৌঁছলাম, তখন ন'টা বাজতে দশ। গাড়ী থেকে নেমে আমরা সবাই বিমানবন্দরের প্রবেশ-পথ পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। আমরা পরস্পর বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। এডিথকে প্রতিশ্রুতি দিলাম এলেনকে বলবো ও যেন কাল ওঁকে ফোন করে। তারপর পল এবং এডিথ প্রবেশ-পথ পেরিয়ে প্লেন ধরার জন্যে এগিয়ে গেলো, আর এলেন এবং আমি গাড়ীতে ফিরে এলাম।

আমরা কেউ কথা বললাম না। ওর জন্যে নিঃশব্দে আমি দরজা খুলে দিলাম, তারপর আমি চালকের আসনে গিয়ে বসলাম ওর পাশে। গাড়ীতে স্টার্ট দিতে যাবো, ও আমার হাতটা চেপে ধরলো।

'একটু অপেক্ষা করো,' এলেন বলে, 'ওদের প্লেন ছাড়া পর্যন্ত।'

উইণ্ডশীল্ড দিয়ে উদাস নয়নে তাকিয়েছিল ও আকাশ পানে।

'কি ব্যাপার, তোমার কি শরীর খারাপ এলেন?'

'না, না তা নয়,' ও তাড়াতাড়ি বললো,' 'নিরাপদে ওঁদের আকাশে উড়ে যেতে দেখতে চাই।'

'ওঁদের সম্বন্ধে তুমি দেখছি খুব বেশি চিন্তা করো, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি ওদের খুব ভালোবাসি,' সরল উত্তর, 'জানি না আমার জীবনে সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটার পর ওঁরা আমার পাশে এসে না দাঁড়ালে কি ঘটতো!'

বিমানের ইঞ্জিন গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা সিগারেট ধরালাম। বিমানটা নীল আকাশের সীমাহীন নিঃসীম কালো আঁধারের মধ্যে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা চুপ করে থাকলাম। তারপর এক সময় এলেন ফিরলো আমার দিকে। ওর ঠোঁটে আধো হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'হ্যাঁ, এবার তুমি স্টার্ট করতে পারো।'

কিন্তু আমি নড়লাম না। সিগারেটের আলোয় আমি ওর মুখ দেখলাম। ওর চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছিল।

এলেনও তাকিয়েছিল আমার দিকে, ওর ঠোঁট থেকে হাসিটা তখন উধাও। 'তোমাকে আবার যে দেখতে পাবো, আমি আশা করিনি।' ফিসফিসিয়ে বললো ও।

'আমিও তো আশা করিনি,' উত্তরে আমি বলি, 'তুমি কি দুঃখিত?'

একটু সময়ের জন্যে ও কি যেন ভাবলো, তারপর বললো, 'সত্যি এর কোন উত্তর নেই। আমি নিজেই জানি না, আমার মনের কি অবস্থা।'

'আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝি বৈকি!'

'তোমাদের বোঝাটা আলাদা', এলেন দ্রুত বলে, 'তোমরা পুরুষ। পুরুষদের চিন্তা অন্যরকম। আমরা আমাদের ভাবনা যেভাবে গুরুত্ব দিই, তোমরা পুরুষরা ঠিক ততোটা গুরুত্ব দিতে পারো না।'

'তাই, কি?' জানলা গলিয়ে আধপোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ওর কাঁধের ওপর হাতটা রাখলাম সযত্নে। 'না, ঠিক তা নয় এলেন, তোমাদের ব্যাথাটা কোথায় আমরা জানি বৈকি! আমরা না থাকলে তোমরা যে কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারো না, পারো কি?' আমার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ওকে চুমু খেলাম।

ওর ঠোঁট নড়লো না তবু মনে হল স্থির ছিলো না, ঠাণ্ডা না হলেও তবে উষ্ণও নয়; ওর ঠোঁট দুটো পাল্টা আমাকে চুমু না দিলেও আমার প্রতীক্ষায় থরথর করে কাঁপছিলো যেন।

ওর ঠোঁট থেকে আমার ঠোঁট তুলে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। নির্নিমেষ চোখে ও আমার দিকে তাকিয়েছিল।

'সেদিনের পর থেকে তোমাকে চুমু খাওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু তোমার কাছ থেকে তেমন করে সাড়া তো পেলাম না।'

সিগারেটকেস থেকে একটা সিগারেট বার করলো ও। সিগারেট ধরাতে সাহায্য করলাম

আমি ওকে। এক মুখ ধোঁওয়া ছেড়ে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ও বললো, ' ডেভিড যখন জীবিত ছিলো, আমি তখন অপর কোন পুরুষের দিকে তাকাতাম না, আর সে-ও অন্য কোন নারীর দিকে ভুলেও চোখ ফিরিয়ে তাকাতো না।'

কথা বলতে পারলাম না, বিহ্বল বিস্ময়ে আমি ওর বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ।

'যুদ্ধের সময়,' নিজের থেকেই ও আবার বলতে শুরু করলো, 'আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। তুমি তো জানো, তখন ওয়াশিংটনের মানুষ কি চাইতো? তখন তুমি সেখানেই ছিলে, নারী তার সঙ্গীর অনুপস্থিতিতে, পুরুষ তার সঙ্গিনীর সঙ্গ হারিয়ে কি নোংরা জীবনই না যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তাদের সেই ভাবধারায় আমার মনে এতোটুকু আঁচড়ও পড়েনি। বরং তাদের সেই বীভৎস রূপ দেখে আমার মনটা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

তখনো নীরবে আমি ওকে স্থির চোখে লক্ষ্য করতে থাকি।

'সেই মনটা আজও আমি সযত্নে জীইয়ে রেখেছি।' ধীরে ধীরে বললো ও। এবার ও আমার দিকে সরাসরি তাকালো, অবিচল, অনুভূতিশূন্য ওর মুখ।

আমি স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, ওর স্বপ্নালু দৃষ্টি আমার চোখের তারায় মিশে একাকার হয়ে গেলো। 'তুমি কি এখনো তোমার স্বামীকে ভালোবাসো?' জিজ্ঞেস করলাম।

ধীরে ধীরে চোখের পাতা নামিয়ে নেয় ও। ওর কণ্ঠস্বরে বেদনার ছায়া। 'এটা কি কোন প্রশ্ন হলো? ডেভিড তো এখন আর নেই।'

'কিন্তু তুমি তো এখনো আছো,' হয়তো আমার কথাটা একটু নিষ্ঠুরের মতো শোনালো, 'তুমি এখনো পূর্ণ যুবতী, সন্তানের মুখ দেখোনি এখনো, যা তোমার দরকার—'

'তোমরা পুরুষরা,' আমাকে বাধা দিয়ে ও বলে, 'সবাই এক, ছেলেমেয়ে চাওয়া মানেই তো মিলনের আকাঙ্ক্ষা। মেয়েদের দেহ উপভোগ ছাড়া অন্যভাবে তাদের ব্যবহার করতে জানো না তোমরা।' ম্লান হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায় ওর ঠোঁটে, 'তুমি কি মনে করো সেটা এতই জরুরী?'

'ভালোবাসা মানুষের জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না।' প্রত্যুত্তরে আমি বলি, 'আর ছেলেমেয়ে হওয়া তো ভালোবাসারই ফসল, আর সেই ফসল তো প্রত্যেকেরই প্রয়োজন, নয় কি?'

ওর দৃষ্টি আমার ওপর স্থির হলো তার মানে তুমি কি আমায় ভালোবাসো?' ওর কণ্ঠস্বরে সন্দেহের ছোঁওয়া।

ও আমাকে ভাবনায় ফেলে দিলো। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললাম, 'জানি না, হয়তো তোমাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু আমি ঠিক জানি না।'

'তাহলে তুমি সঠিক কি বলতে চাইছো ব্র্যাড?' আবেগে ওর গলা কাঁপছিল, 'কেন তুমি আমার সঙ্গে আন্তরিক হতে পারছো না—কেন তোমার নিজের সঙ্গে এই লুকোচুরি খেলা—বলো, সত্যি করে বলো তো কি তুমি চাও?'

আমি ওর সন্ধানী দৃষ্টির সামনে আমার দৃষ্টি মেলে রাখতে পারছিলাম না। আমি কি তবে ধরা পড়ে গেছি ওর কাছে? লুকোবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষে বলেই ফেললাম, 'এই মুহূর্তে আমি যেটুকু জানি, বলতে পারি তোমাকে আমি আমার একান্তে কাছে পেতে চাই এলেন!' এক অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে ডুবে রইলো ও, এক সময় ওর দিকে ফিরে তাকাতেই দেখি ওর হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা পুড়ে ছাই, আগুনের স্পর্শেও ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। 'জানো এলেন, তোমাকে প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকেই মনে মনে আমি তোমাকে কামনা করে এসেছি। জানি না এ কিসের জন্যে, কেমন করে আর কেনই বা? তবে আমি একটা কথাই শুধু জানি তোমাকে আমি চাই, এ চাওয়া আমার জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াকে ছাপিয়ে গেছে যেন। কেন এমন হয় বলতে পারো এলেন?' আমি ওর হাত স্পর্শ করার জন্যে এগিয়ে যাই।

ওর মুখ স্থির, অচঞ্চল। 'ব্র্যাড', কণ্ঠস্বর অতি শান্ত।

মুখটা নামিয়ে এনে আমি ওর আধফোটা ঠোঁটের ওপর আমার ঠোঁট দুটো মিলিয়ে দিয়ে চুমু খেলাম। এবার আর ওর ঠোঁট দুটো স্থির রইলো না, নিস্তেজ ঠাণ্ডা বলেও মনে হলো না, ওর ভিজে, নরম দু'ঠোটের প্রান্তে টের পাই উত্তপ্ত আগুনের ছোঁওয়া, টের পাই আমার ঠোঁটের নিচে ওর উত্তপ্ত ঠোঁট দুটো অসম্ভব কাঁপছে, বাড়ছে আমার রক্তের উত্তাপ তখন। এর আগে এভাবে কেউ আর আমার চুমুর সাড়া দেয়নি। এবার আমি ওর কাঁধের দুপাশে হাত রেখে ওকে আরো কাছে টেনে নিলাম, দম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চুম্বন স্থির হয়ে রইলো।

বেশ বুঝতে পারি এলেন এখন সম্পূর্ণ করে নিজেকে আমার হাতে সঁপে দিতে চায়, পা দুটো সীটের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ও ওর মাথাটা আমার হাতের মধ্যে এলিয়ে দেয়। অদ্ভুত একটা উষ্ণতার আবেশে ওর চোখের পাতাদুটো আপনা থেকেই বুজে আসে। 'ব্র্যাড!' ফিসফিসিয়ে তাকালো ও এক সময়।

আমি ওকে আবার দ্রুত চুমু খেয়ে বললাম, 'হ্যাঁ এলেন বলো কি বলছিলে?'

ও আমার ঠোঁটে ওর নরম ঠোঁটের পরশ বুলিয়ে বলে, 'আর পাঁচজনের মতো আমরা হতে চাই না ব্র্যাড। এমন কিছু করো না যাতে তোমাকে পরে অনুশোচনায় ভুগতে হয়।'

গভীর দৃষ্টি ফেলে ওর দিকে তাকালাম। ওর আয়ত মুখে কি গভীর প্রশান্তির ছায়া, চোখে না দেখলে বুঝি বোঝা যায় না। অনেক, অনেকক্ষণ মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে কথা হারিয়ে ফেলি। এক সময় খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি বলি, 'এখনো পর্যন্ত তুমি তো কেবল আমার কথাই শুনলে, কই তোমার সম্বন্ধে একটা কথাও তো বললে না? তুমি কি চাও বলো?'

'আমি যা চাই, তোমার চাওয়ার মতো ততোটা উল্লেখযোগ্য নয় ব্র্যাড,' শান্ত সংযত উত্তর ওর, 'আমার থেকে অনেক বেশি তোমাকে হারাতে হবে।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার বলার কিছুই ছিলো না।

আবার ও আমার দিকে চোখ মেলে তাকালো, 'তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত ব্র্যাড? তুমি তাকে ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ, ভালোবাসি বৈকি!' সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম। বাতাসে আমার কথার প্রতিধ্বনি তেমন না হওয়াতে আমি আরো বললাম, 'পরস্পরের মধ্যে যদি বোঝাপড়া তেমন না থাকে, সে বিয়ের ধারাবাহিকতা টেনে নিয়ে যাওয়ার সার্থকতা কোথায়?'

'তাহলে আমাকে তুমি পেতে চাইছো কেন ব্র্যাড?' শান্ত ভাবে এলেন বলে, 'তুমি কি ক্লান্ত? এটা কি তোমার কোন নতুন অভিযান? নাকি নতুন কিছু জয়ের জন্যে?'

অবাক চোখে আমি ওর দিকে তাকাই, 'আমার ওপর তুমি ঠিক সুবিচার করছো না এলেন। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, কেন আমার এই খেয়াল হলো, আমি নিজেই জানি না, তোমাকে কি বোঝাবো! আমি এও জানি না, একজন পুরুষ অপর এক নারীর সংস্পর্শে এলে, তাদের মনে কেন এতো দাপাদাপি, ভালোবাসার আড়ালে কেন তারা এমন তীব্র ভাবে জ্বলে ওঠে? মেয়েদের সান্নিধ্য নিয়ে খুব একটা মাথা আমি ঘামাইনি এর আগে। তুমি তো জানো আমার ব্যবসার কাজে আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়, সময় কোথায়?'

'আমি জানি আমি তোমাকে চাই; আর আমাকে দেওয়ার কিছু আছে তোমার; কিন্তু তোমার জন্যে আমার জানি না কি থাকতে পারে দেওয়ার! কি করে আমি জানলাম আমাকে প্রশ্ন করো না, কারণ আমি কোন উত্তর দিতে পারবো না। আমি বলবো না, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না, কারণ একা আমি অনায়াসে থাকতে পারি। কারোর কোন সাহায্য ব্যাতিরেকেই আমি যে কোন কাজ করতে পারি, কারণ আমি জানি আমাকে সেটা করতেই হবে। ব্যাস এটুকুই আমি জানি।'

'জীবনটা অনেক নৈরাশ্যের। একজনের সমস্যা আর একজনের সমস্যার সঙ্গে মিল নাও থাকতে পারে। তবে এই মুহূর্তে তোমাকে সান্নিধ্যে পেয়ে আমার কি মনে হয় জানো, তোমাকে একান্তে কাছে না পেলে কোন কাজেই আমি বোধ হয় মন বসাতে পারবো না।'

ওর আধ ফোঁটা ঠোঁটে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে ওঠে। 'ব্র্যাড, তুমি সৎ, তোমার মনে কোন পাপ নেই বলেই এ কথা বলতে পারলে। অন্য পুরুষেরা অন্য মতলব নিয়ে আসে আমার কাছে।'

'আমাদের সমাজে সততা অত্যন্ত বিলাসিতা, এবং বিলাসবহুল।'

'তা হয়তো হবে,' এলেন ওর সোনার সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরায়, ওর চোখে সিগারেটের ধোঁয়াটা একটা অদ্ভুত ব্যঞ্জনা এনে দেয়, 'তুমি আমাকে বরং আমার ঘরে পৌঁছে দাও ব্র্যাড।'

নিঃশব্দে আমি গাড়ী ঘোরাই অতঃপর। আসার পথে কেউ আমরা একটা কথাও বললাম না। ওর হোটেলের সামনে গাড়ী থামিয়ে ওর চোখে চোখ রাখলাম, 'এলেন, তোমার সঙ্গে আবার কি আমি দেখা করতে পারি?'

এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয় এলেন। 'জানি না ব্র্যাড, জানি না আমাদের আবার দেখা করাটা ঠিক হবে কিনা!'

'তুমি কি আমাকে ভয় করো?'

সঙ্গে সঙ্গে ও মাথা নাড়লো। 'তুমি একজন অদ্ভুত মানুষ ব্র্যাড। না, তোমাকে আমি ভয় পেতে যাবো কেন?'

'আমার প্রেমে পড়ে যাবে বলেই কি তুমি ভয় পাচ্ছো?' আবার আমি প্রশ্নচোখে ওর দিকে তাকালাম।

'না, তোমার প্রেমে পড়তে আমি ভয় পাই না ব্র্যাড,' সরাসরি উত্তর দেয় ও, 'আমি কোন কিছুতেই ভয় পাই না।' গাড়ীর দরজা খুলে নেমে দাঁড়ায় এলেন। আয়ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো, 'কিন্তু ব্র্যাড, তুমি বরং একটু ভেবে দ্যাখো। আমার মতো তুমি মুক্ত নও, পরে অসুবিধেয় পড়তে পারো তুমি।'

'সে দুশ্চিন্তা আমার,' সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'তাহলে তোমার সঙ্গে আমি আবার দেখা করবো তো?'

'আমি যা বললাম তাই করো ব্র্যাড,' নম্রভাবে ও বলে, 'আমার কথাটা তুমি একবার ভালো করে ভেবে দেখো।'

'বেশ, ভাববার পরেও যদি মনে হয় আমি তোমাকে দেখতে চাই,' নাছোড়বান্দার মতো আমি বললাম, 'তখন কি করবো?'

কাঁধ দুটো ঈষৎ ঝাঁকিয়ে ও বলে, 'এখন আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। তখন ভেবে দেখবো।' তারপর ও যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে বলে, 'শুভরাত্রি ব্র্যাড।'

'শুভ রাত্রি এলেন।' অপসৃয়মান এলেনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়ার আগেই হোটেলের লবিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো ও।

❑ সপ্তম অধ্যায় ❑

গ্যারাজের দরজা বন্ধ করে কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়লো তখন এগারোটা। আমাদের শয়ন কক্ষে আলো দেখে কেমন যেন একটু অস্বস্তি হলো। এই প্রথম আমার ইচ্ছে হলো, মারজা যেন আমার জন্যে অপেক্ষা না করে। সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার এ কথাও মনে হলো এ আমার মনের ভুল। রাত এগারোটায় মারজা আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে না। এতো তাড়াতাড়ি ও কখনো ঘুমোতে যায় না। দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াই, একটা সিগারেট ধরাই তারপর।

নিজেকে বিশ্লেষণ করার এই উপযুক্ত সময়। এলেন ঠিকই বলেছে ভালো করে আমার ভেবে দেখা উচিত। আচ্ছা আমি ওর কাছ থেকে কি আশা করতে পারি? আজ পর্যন্ত যা আমি মারজার কাছ থেকে পেয়েছি তাতেই যদি পরিতৃপ্ত হয়ে থাকি তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই। মেয়েরা মেয়েই, সব মেয়েই এক। নিজেকে আমি বোঝাই, ব্র্যাড তোমার কি অভাব? তিরিশ হাজার ডলারের বাড়ি, এক লক্ষ ডলারের বিজনেস ক্যাপিটাল, দুটি সন্তান এবং সুন্দর মিষ্টি একটি স্ত্রী, কিসের অভাব তোমার? সব কিছুই তো তুমি পেয়েছো, তোমার জীবনে পূর্ণতা এসেছে। এর পরেও তুমি পরিবর্তন চাও? কেন, কেন তুমি কি এখনো মনে করো কোন কিছুর অভাব আছে তোমার?

কিন্তু একজনকে আমার বারবার মনে পড়ে, যার কথা আমার মনকে দোলা দিয়ে যায় প্রতিনিয়ত। সে এলেন। ওর মুখ। ও যেন আমার স্বপ্নে দেখা ছবি। ওর মতো সৌন্দর্যময়ী নারী আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। ওর নীচু গলায় মিষ্টি কণ্ঠস্বর এখনো যেন আমার মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। একাকিনী ও। আমিও ছিলাম একাকী একদিন, বড় ভয়াবহ বড় মর্মান্তিক সেই দিনগুলি। ওর ভয় আমার সেই দিনগুলিকে। তাই বোধ হয় ও আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়।

তবু আমি জানি ও আমাকে পছন্দ করে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। আমি এও জানি, যে আমাকে পছন্দ করবে সে প্রথম সাক্ষাতেই। তা না হলে কেউ কোনদিনও আমাকে চাইবে না। এলেনও ঠিক তাই করেছিল। আমি জানি, প্রথম সাক্ষাতের সময়ে আমি ওর সঙ্গে খুব একটা ভালো ব্যবহার করিনি, তা সত্বেও ও এক পাও নড়েনি, আমার মন না গলা পর্যন্ত। আজকের মতো প্রথম দিনেই আমি যখন ওর ঠোঁটে চুমু খাই সেই একই উত্তেজনা, আমি অনুভব করেছিলাম ওর দেহের পরশ পেয়ে। একবার নয় দু'বার, তারপর তৃতীয়বার ও নিজের থেকেই আমাকে চুমু দেয়। আমি ওকে যে ভাবে চেয়েছিলাম ও ঠিক সেই ভাবেই আমাকে দিয়েছিল। ওর ঠোঁটে যে উত্তাপ আমি অনুভব করি, ওর চোখে আমি যে কামনার আগুন দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন তাতে আমার মনে হয়েছিল, আমার বয়স যেন অনেক কমে গেছে। যৌবনের মাদকতায় আমি যেন এক উন্মাদ।

কিন্তু এই বয়সে শিউরে উঠলাম, কেউ যদি জানতে পারে? এই কারণেই আমি তখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, আমার পরিচিত লোকেদের থেকে আমার কোন তফাত নেই। আমি জানি না, এ আমার পছন্দ নাকি অপছন্দ।

'হ্যালো, তুমি!' আমার পিছন থেকে মারজা নরম সুরে শুধোয়, 'কি করছো?'

আমার কাঁধের ওপর ওর নরম হাতের স্পর্শটা অনেক কিছু বোঝাতে চাইছিল যেন; যেন নতুন করে ও বলতে চাইছিল, তুমি যা পাওনি আমি তোমাকে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত, তোমার কোন অভাবই আমি রাখবো না। পিছন না ফিরেই আমি ওর হাতটা স্পর্শ করার জন্যে হাত বাড়াই। আমি ওর হাতটা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলি, 'ভাবছি।'

ওর পোষাকের খস্‌খস্‌ শব্দ আমার কানে আসে। 'তুমি কি কোন সমস্যায় পড়েছো ব্র্যাড?' ওর কথায় সহানুভূতির ছোঁওয়া। আমার ঠিক নিচে সিঁড়ির একটা ধাপে বসলো মারজা। 'আমাকে বলতে যদি না পারো তোমার মাকে বলো। হয়তো তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

চকিতে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। সোনালী চুলে ঢাকা মুখে শান্ত নিবিড় ছায়া একটা অদ্ভুত ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছিল যেন। ওর এই ভাবটা আমার খুব প্রিয়। ভাবতে ভালো লাগে, আমার কথা ও খুব মন দিয়ে শোনে, অন্তত শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু এটা এমনি একটা ব্যাপার যা আমি ওকে এই মুহূর্তে বলতে পারি না, যা আমার একান্ত নিজের ভাবনা নিজেকেই সমাধানের একটা সূত্র খুঁজে বার করতে হবে।

'না সোনামণি কোন সমস্যা তো আমার নেই,' ধীরে ধীরে আমি বলি 'এই এখানে বসে একটু ভাবছিলাম, শহরের বাইরে কোথাও বেরিয়ে আসলে ভালো হয়।'

মারজা উঠে দাঁড়ায়, ও আমাকে ওর কাছে টেনে নেয়, 'তার মানে তুমি হলে প্রকৃতি প্রেমিক! কিন্তু সোনামণি ভুলে যেও না গ্রীষ্ম কবেই বিদায় নিয়েছে, এভাবে এখানে বসে থাকলে তোমার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তার চেয়ে ঘরের ভেতরে এসো তোমার কফি তৈরি করতে করতে পল এবং এডিথের সঙ্গে তোমার নৈশভোজের গল্প শুনবো।'

বসার ঘর দিয়ে মারজাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বলি, 'মিসেস স্কাইলারও আমাদের সঙ্গে ছিলো,' আমি বললাম, 'আমি ওদের এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলাম, ফেরার পথে মিসেস স্কাইলারকে ওর হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এলাম।'

হঠাৎ মারজার চোখে অমঙ্গলের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। 'ওয়াশিংটনের এই সব বিধবাদের চিন্তা তোমার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও,' দাঁতে দাঁত চেপে ও বলে, 'ওরা তোমার মতো যুবকদের মাথা চিবিয়ে খায়।'

'ওর জন্যে আমি দুঃখ অনুভব করি,' কোন কিছু না ভেবেই আমি নিজের সমর্থনে বলি।

পরিহাসের ছলে ও হেসে বলে, 'অন্য এক বিধবার প্রতি অতো দরদ দেখিও না। তোমার স্ত্রী এবং দুটি সন্তানের দায়িত্ব তোমার ওপরে, ভুলে যেও না।'

'কথাটা তোমার মনে না করিয়ে দিলেই চলতো মারজা,' একটু গম্ভীর হয়েই বললাম, 'আমি কখনোই তা ভুলবো না।'

আমার কথার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো যা হয়তো মারজার মনকে নাড়া দিয়ে থাকবে, ওর ঠোঁট থেকে হাসিটা নিমেষে মিলিয়ে যায়, কমে যায় চোখের উজ্জ্বলতা। আমার কাছে এসে মারজা ওর আয়ত চোখের ছায়া ফেলে আমার মুখের ওপর। 'আমি জানি ব্র্যাড, তুমি কখনো ভুলবে না,' শান্ত স্বরে ও বলে। দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ও আমার গালে ওর ঠোঁট বুলোতে বুলোতে বলে, 'আর সেই জন্যেই আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

ভোরের গাঢ় আরক্তিম একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে আমার শয়ন কক্ষে। লাল বিশাল সূর্যটা গনগনে আগুনে তেতে ওঠার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই ছাদের দিকে তাকালাম উদ্দেশ্যবিহীন-ভাবে। এ যেন আমার ঘর নয়, ভালো করে তাকাতে গিয়ে আমার মনে হলো, ঘরটা মারজার।

ধীরে ধীরে মাথাটা ফেরালাম। আমার পাশেই বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েছিল ও, চোখের পাতা দুটো খোলা। আমার চোখে চোখ পড়তেই হাসলো ও। প্রত্যুত্তরে আমিও হাসলাম।

ফিসফিসিয়ে কি যেন বললো ও, কিন্তু আমি ওর কথা শুনতে পেলাম না। 'কি বললে?' নিস্তব্ধ প্রভাতে বন্ধ ঘরের ভিতরে আমার কথাটা গম গম করে উঠলো।

'প্রেমিক যুবক,' মৃদুভাষে ও বলে, 'কথাটা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

মনে পড়ে সেই স্বপ্নময় রাতের কথা।

মারজা ওর দুহাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, তারপর আমার মুখটা ওর বুকে চেপে ধরে শুধোয়, 'তুমি আমার আশ্চর্য সুন্দর প্রেমিক ব্র্যাড,' ওর আধ ফোটা ঠোঁট দুটো আমার কানের কাছে মৌমাছির গুঞ্জন তুলতে থাকে, 'মনে পড়ে তোমার সেই সব কথা?'

একটা চাপা বেদনায় আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। কথা আমার হারিয়ে যায়। অন্য নারী অন্য মন, সে আর এক জীবনের হাতছানি, ক'জন স্বামীই বা মনে রাখে তার স্ত্রীদের তখন? সেই অবিশ্বাসী মন নিয়ে বিবাহিত জীবনের জের টেনে রাখাটা বোধ হয় মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মারজা ওর নরম হাত দিয়ে আমার চুলে বিলি কাটে, আমার কানে মারজা ওর ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিসিয়ে আবেগে ওর মনের কথা ব্যক্ত করে যাচ্ছিল। কিছু কথা আমি শুনছিলাম আবার কিছু শোনার ভান করছিলাম।

জেনির পাশে গিয়ে বসি গাড়ীর দরজা খুলে। দরজার পথে দাঁড়িয়েছিল মারজা। 'তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করো ব্র্যাড,' তারপর ও ওর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আজ রাতে নৈশভোজের জন্যে তোমার বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে।'

'হ্যাঁ সকাল সকাল আজ বাড়ি ফিরবো, আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম, মনে পড়ে।'

জেনি গাড়ীতে স্টার্ট দিয়েই স্পীড তুলতে থাকে। একটা বাঁকের মুখে কোন রকমে মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা এড়ালো জেনি। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আমার। 'একদিন না একদিন তুমি ঠিক দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসবে দেখছি।'

আমার দিকে তাকিয়ে জেনি হাসে, 'সহজ হওয়ার চেষ্টা করো ড্যাড।'

'বরং তুমি একটু সংযত হওয়ার চেষ্টা করো মামণি।'

সামনে ট্রাফিক। যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে ব্রেক কষে আমার দিকে ফিরে তাকালো ও। 'আমি কি বলেছিলাম ভেবে দেখেছো?'

'কি ব্যাপারে?' বোকার মতো অভিনয় করি, যেন আমি কিছুই জানি না।

'বিবাহ বার্ষিকিতে মাকে উপহার দেওয়ার কথা,' বেশ ধৈর্যের সঙ্গেই জবাবটা দিলো ও।

'তোমার মাকে উপহারটা দিলেই দেখতে পাবে। আমি তোমার মাকে উপহারটা দিয়ে চমকে দিতে চাই। তাই তোমাকে আগে থেকে উপহারের কথা বলে কৌতূহলের গুরুত্বটা হালকা করে দিতে চাই না।'

'বিশ্বাস করো ড্যাড কথাটা আমি গোপন রাখবো,' কাতর অনুণয় করে ও বলে, 'বলো ড্যাড—'

'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো?'

'হ্যাঁ, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

'ফারের একটা কোট তোমার মাকে উপহার দিচ্ছি।'

'সত্যি বলছো ড্যাড? ওঃ কি চমৎকার হবে তাহলে!' বাচ্চা মেয়ের মতো স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে ও।

'স্টিয়ারিংটা শক্ত করে হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরো, তা না হলে তোমার মাকে

উপহার দেওয়ার জন্যে তুমি আমি কেউই তখন আর ইহজগতে থাকবো না।' চমকে উঠে ওকে সাবধান করে দিই।

ইতিমধ্যে আমরা ওর স্কুলের সামনে এসে পড়েছিলাম। জেনি আবার ব্রেক কষলো। বাচ্চা ছেলের মতো কঁকিয়ে উঠলো গাড়ীর চাকাগুলো। দরজা ও নিজেই খুলে দিয়ে আমার দিকে তাকালো। জেনি তখন অন্য মেয়ে, অন্য মন নিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো এবং আমার গালে আলতো চুমু দিলো। 'ড্যাড, সত্যি তুমি মহান!'

গাড়ী থেকে নেমে রাস্তা পার হয় জেনি, আমি ওর যাওয়ার পথে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকি। এক সময় ও আমার চোখের আড়ালে চলে যেতেই গাড়ীতে স্টার্ট দিতে যাই, হঠাৎ গাড়ীর মেঝের ওপর একটা চকচকে জিনিষ পড়ে থাকতে দেখে আমার দৃষ্টি আটকে যায় সেটার ওপর। ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে নিলাম।

সূর্যের আলোয় সেটা আরো ঝলমল করে উঠলো। পাতলা একটা সোনার সিগারেট কেস। সেটা আমি আমার হাতের মধ্যে রেখে উল্টে দেখি। এক কোণায় ছোট্ট একটা মনোগ্রাম। একটি মাত্র কথা।

এলেন!

আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোয় না।

❑ অষ্টম অধ্যায় ❑

ছোট বেঁটে-খাটো লোক ম্যাট ব্রেডি। তাকে আমি কখনো হাসতে দেখিনি। নিরস, কাট-খোট্টা প্রকৃতির লোক। বড় বড় লাল চোখ দুটো অনুজ্জ্বল। তবে সে চোখের দৃষ্টি বড় অর্ন্তভেদী, তোমার দিকে তাকালে তোমার পেটের কথা টেনে বার করতে পারে। কি সাংঘাতিক সেই দৃষ্টি। লোকটা আমার একেবারে অপছন্দ। কেন জানি না, কিন্তু যে মুহূর্তে আমি তাকে দেখি, আমার মন যেন বলে ওঠে, লোকটাকে আমি পছন্দ করিনা, সে আমার চোখের মণি নয়, আমার চোখের ছানি, যতো তাড়াতাড়ি কাটানো যায় আমার পক্ষে ততোই যেন মঙ্গল। তবু এসব সত্ত্বেও লোকটাকে সহ্য করে যেতে হয়, আর পাঁচজনের মতো আমিও করি।

হয়তো লোকটার ক্ষমতা একটা অদৃশ্য শক্তির মতো আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে, আমরা পরাভূত সেই শক্তির কাছে। মনে হয়, এই কারণেই বোধহয় কমিটির অন্য সদস্যরা তার প্রতি এমনি ব্যবহার করে থাকে। তারা সবাই বিজনেসের এক একজন বিগবস। হোমরা-চোমরা লোক। প্রত্যেকে এক একটা কোম্পানির মালিক, যার দাম কয়েক মিলিয়ন ডলার। তবু তারা সবাই তার সামনে মাথা নুইয়ে দেয়, তাদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি সেই মুহূর্তের জন্যে ধূলোয় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। তারা তাকে 'মিস্টার' বলে সম্বোধন করে, যেন সে এক সাক্ষাৎ ভগবান! আর সে তাদের আজ্ঞাবাহক ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করে।

চকিতে আমি ক্রাইসের দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখে আমার মনের অভিব্যক্তি, প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে দেখার জন্যে। অনুভূতিশূন্য মুখ তার। তার এই নতি স্বীকারের জন্যে নীরবে আমি তাকে অভিশাপ দিই। এবং ম্যাট ব্রেডির দিকে ফিরে তাকাই।

হিমার্ত কণ্ঠস্বর লোকটার। 'ইয়ং ম্যান। অসাড় কথা-বার্তায় সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। কাঠিন্য আমার চরিত্রের একটা মূল বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বাড়তি একটা কথাও আমি বলি না। আপনার বিজ্ঞাপনের নমুনা আমি দেখেছি। কিন্তু কোথাও আমার মনে হয়নি যে, এই বিজ্ঞাপন মানুষের মনে এতটুকু রেখাপাত করতে পারে, আমরা কি বলতে চাই, তারা আদৌ সেটা বুঝতে পারবে বলে আমার তো মনে হয় না।'

লোকটার দিকে আমি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকি, এবং অবাক বিস্ময়ে একটা কথাই শুধু ভাবি, এই লোকটাকেই এলেন কি করে মিষ্টিভাবে সম্বোধন করে থাকে, 'মিঃ ব্রেডি!' আমি একটু রুক্ষস্বরেই বলি, 'আমি একজন জনসংযোগ অধিকর্তা। আপনি জানেন, এর কি অর্থ? শহরে সার্কাস পার্টি এলে, আমি আমার বিজ্ঞাপনে কখনোই বলবো না, সার্কাস দেখে আসুন। দর্শকদের আমি **বলবো,** কত রকম মজার মজার জীবন্ত ঘটনা, এর নাম সার্কাস।'

'কিন্তু এ তো বাক্‌চাতুর্যের খেলা, মিষ্টি কথায় চিঁড়ে যেমন ভেজে না, হয়তো দেখা যাবে সার্কাসের দর্শকদের মন গলছে না। এ বিজ্ঞাপন চটকদার বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ম্যাট ব্রেডি একটু থেমে গলাটা এবার একটু খাদে নামিয়ে এনে বলে, 'ইয়ং ম্যান, আমি আপনার দক্ষতা এতোটুকু খাটো করে দেখাতে চাইছি না, আমি আপনার প্রচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে দু' একটা প্রশ্ন রাখতে চাইছি মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি এ-বিজ্ঞাপনের যে দুর্বল দিকটা আমার বেশি করে চোখে পড়েছে, সেটা ক্লায়েন্টের স্বার্থের চেয়ে আপনার ব্যক্তিগত ঢাক-ঢোল পেটানোর সামিল হয়ে উঠেছে, তাই নয় কি?'

মনে মনে ভাবলাম আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন, যা খুশি বলতে পারেন আমার বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে, কারণ আমার আন্তরিক প্রচেষ্টার বিনিময়ে আপনি আমাকে পারিশ্রমিক দেবেন। 'কিন্তু মিঃ ব্রেডি,' আমার হিমার্ত চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্যে একটু বুঝি বা কঠিন হয়ে উঠলো, 'খানিক আগে আপনি দাবী করলেন, আপনি একজন কঠিন প্রকৃতির লোক, আপনার মতো আমিও যদি একটু কঠিন হতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই বলতাম, আমি কি বলতে চাই সে ব্যাপারে আপনার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কারণ এই বিজ্ঞাপনের প্রচার মাধ্যমে আপনি স্বার্থপরের মতো আপনার ব্যক্তিগত প্রচার চাইছেন, আপনার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থটা এখানে গৌণ মাত্র।'

আমি বেশ ভালো করে জানি, আমার এ-ধরণের চাঁচাছোলা কথাবার্তা এখানকার কোন সদস্যেরই মনঃপুত হবে না, বিশেষ করে ক্রাইসের, তার মুখের অসন্তুষ্টির ভাবটা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দিলো আরো বেশি করে।

অথচ ম্যাট ব্রেডির কণ্ঠস্বর কেমন রহস্যময় শোনায়, 'ইয়ংম্যান, থামলে কেন বলে যাও!'

স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি তার চোখের দিকে তাকাই। হয়তো আমি জেদের বশে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তার চোখে এক গভীর স্তব্ধতা অনুভব করেছিলাম। 'মিঃ ব্রেডি,' শান্ত গলায় আমি বললাম, 'আপনি স্টীল তৈরি করেন, আর আমি আমার মতামত প্রকাশ করে থাকি। আমার ধারণা আপনি আপনার ব্যবসা বেশ ভালোই জানেন, আর আমি আপনার উৎপাদিত জিনিস যেমন, গাড়ী, ফ্রিজ যখন ক্রয় করি এই বিশ্বাস নিয়ে যে, যথাযথ ধাতব বস্তু দিয়ে সেগুলো আপনি তৈরি করেছেন।'

তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আমি তার বিজনেস পার্টনারদের দিকে ফিরে তাদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলি, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা তো আপনাদের হিসাবের খাতায় 'গুডউইলের' খাতে কেউ লক্ষ ডলার আবার কেউ বা মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে রাখেন। আপনাদের হিসাব রাখার পদ্ধতিটা আমার ঠিক বোধগম্য হয় না, ওসব আমার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, আমি হিসাব-রক্ষক নই। হয়তো আপনারা বলবেন, আমি যেসব জিনিস আপনাদের কাছে বিক্রী করি সে-ও তো ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, যার কোন ওজন নেই, যার কোন মাপ নেই, সে জিনিস আপনি তালিকাভুক্ত করতে পারেন না। কিন্তু—'

তাদের মুখ দেখে মনে হলো, আমার কথাগুলো তাদের খুব মনঃপুত হয়েছে। উৎসাহ পেয়ে আমি আবার বলতে শুরু করি, 'আমি সেই জিনিস আপনাদের কাছে বিক্রী করে থাকি যা আপনাদের কাছে 'গুডউইল' বলে পরিচিত। যদি আপনারা আমাকে অনুমতি দেন তাহলে বলি, একটু আগে উপস্থিত জনতার বক্তব্য আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। তাদের সব মন্তব্য খুঁটিয়ে বলতে না পারলেও আমার যুক্তির সমর্থনে এখানে কিছু কিছু উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না।'

'পাল হারবার আক্রমনের পর এখানে নিউইয়র্কে জনসাধারণের মধ্যে কানাঘুঁষো শোনা যায়, জাপানীরা আমাদের নাইনথ এভিনিউ ফিরিয়ে দিয়েছে এবং ভুল হোক কিংবা সঠিকই হোক, তারা আপনাকে দোষারোপ করে থাকে, আপনি নাকি তাদের কাছে স্টীল ইণ্ডাস্ট্রী বিক্রী করে দিয়েছেন। প্রবাদ আছে বদনাম যা রটে, সব না হলেও কিছু তো বটেই! এই যদি আপনার মনে ছিলো তবে কি দরকার ছিলো, এই ব্যবসার পিছনে আপনার আমার ব্যবসার অন্য আরো পার্টনারদের অতো পরিশ্রম করার?'

এক টানা কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। দম নেওয়ার জন্যে একজন পরিচারকের কাছ থেকে জল, স্রেফ সাদা জল খেয়ে নিয়ে গলা ভেজালাম। তবে আমার দৃষ্টি পড়ে রইলো এক কোণায় বসে থাকা ম্যাট ব্রেডির ওপরে। তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, সে বেশ আগ্রহ নিয়েই আমার কথাগুলো শুনছে।

'গুডউইল! হ্যাঁ ভদ্রমহোদয়গণ, যে কথা আমি বলছিলাম,' আমি আবার আমার বক্তব্য রাখতে শুরু করলাম, 'সেটাই আমার একমাত্র ব্যবসা। আপনাদের কথা, আপনাদের ব্যবসার পরিচয় জনসাধারণকে ভালো করে বোঝানোটাই আমার ব্যবসার একমাত্র গুডউইল। সম্ভবতঃ সেই গুডউইল আমি কোন প্রলোভনেই বিক্রী করবো না। আর সেই গুডউইল হলো আমার সুচিন্তিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যম। আমি জানি, আমি যদি সফল হই, জনসাধারণ তখন আমার কথা মনে করবে না, তারা তখন আপনাদের উৎপাদিত সামগ্রীর কথাই

বেশি করে স্মরণ করবে। তা হোক, আমার প্রচার যন্ত্রের সাফল্য এখানেই, তার দাম দিন চাই না দিন। ভদ্রমহোদয়গণ, জানি না আপনারা এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা উপলব্ধি করবেন কিনা, তবু আমার বলা কর্তব্য বলে মনে করি, এ আমার উপদেশ বলেও ধরে নিতে পারেন, খদ্দেররা আপনাদের কথা বেশি করে ভাবুক, এটাই সব থেকে জরুরী ব্যাপার আজকের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার ক্ষেত্রে। ব্যাস, এর বেশি কিছু বলার নেই আমার।' তারপর আমি আমার কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে ব্রীফকেসের মধ্যে পুরে ফেলি। মনে হয়, আমাকে কেন্দ্র করে আজকের এই যে সাক্ষাৎকার পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে আমার বক্তব্যে ইতি টানার সঙ্গে সঙ্গে।

ক্রাইসের দিকে ফিরে তাকাবার কোন প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমার ভাবধারা তার মনোমত কিনা, সে নিয়েও আমি মাথা ঘামাতে চাইলাম না। আধ মিলিয়নের ব্যাপার যা আমাদের হিসেবের খাতায় স্থান পাবে না সে কথাও আমি হলপ করে বলে দিতে পারি—

এলিভেটরে নামার সময় একটা কথাও বললো না ক্রাইস। আকাশে উজ্জ্বল রোদ থাকা সত্ত্বেও বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল যেন। শীতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে জামার কলারটা তুলে দিলাম।

ক্রাইস ভদ্রতা দেখিয়ে আমার জন্যে গাড়ীর ব্যবস্থা করে রেখেছিল। গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমি মত বদলে ফেলি। ঘুরে আমার ব্রীফকেসটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলি, 'ক্রাইস, তুমি অফিসে ফিরে যাও। আমি ভাবছি বাকিটা পথ হেঁটেই যাবো।'

একটু পরে ক্রাইসের গাড়ীটা ফিফথ এভিনিউ-এর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। অতঃপর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

সবার মন জয় করতে পারলেও আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, ম্যাট ব্রেডিকে বোঝানো ঈশ্বরেরও অসাধ্য। তার হিমার্ত চোখ, মুখে অবিশ্বাসের ছাপটা আমার ধারণা আরো বদ্ধমূল করে দেয়। 'ঐ বেঁটে লোকটাকে সাবধানে এড়িয়ে চলো।' বাবা একদিন আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'বেঁটে লোকদের টিঁকে থাকার জন্যে স্মার্ট হতেই হয়।' বাবা ঠিকই বলেছিলেন। ম্যার্ট ব্রেডি বেঁটে এবং স্মার্ট বলা বাহুল্য। শুরু থেকেই আমি দেখেছি তার মধ্যে কেমন সবজান্তা ভাব। হতে পারে সব কিছু তার নখদর্পনে, সব উত্তর তার মুখে মুখে। কিন্তু তার ভুল ধারণা, অন্য কেউ সেই উত্তরগুলো জানে না।

জানি না আমি কোথায় এবং তখন আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ যখন থামলাম চেয়ে দেখি, এলেনের হোটেলের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেই কোন্ সকাল থেকে পকেটে সোনার সিগারেট কেসটা নিয়ে ঘুরছি।

এলিভেটর থেকে বেরোতেই এলেনের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল ও। ওর মুখ দেখে মনে হলো, আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ও। ওর চোখে আমন্ত্রণ। আমি ওকে অনুসরণ করে ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, সিগারেট কেসটা হাতেই ছিলো। 'ইচ্ছে করেই তুমি এটা গাড়ীতে ফেলে রেখেছিলে।'

নিঃশব্দে সিগারেট কেসটা আমার হাত থেকে নেয় ও, স্বীকার কিংবা অস্বীকার কিছুই করলো না। 'ধন্যবাদ ব্র্যাড,' আমার দিকে না তাকিয়েই বললো ও।

'কেন?'

এক সময় ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো ও, ওর চোখে এক অসম্ভব নিঃসঙ্গতা অনুভব করলাম। ঠোঁট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করে কি যেন বলতে যায় ও, কিন্তু ওর চোখের পাতা ছাপিয়ে দু'কূলে জল উপচে পড়ে।

দু'হাত বাড়াতেই ও আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, যেন এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল ও। ওর চোখের জলে আমার মুখ ভেসে যায়। সযত্নে দু'হাতে আমি ওর আয়ত মুখখানি তুলে ধরি, শেষ অশ্রুবিন্দুটা মুছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি। অনেক দূর থেকে ভেসে আসার মতো শোনালো ওর কণ্ঠস্বর, 'আমি দুঃখিত ব্র্যাড, এখন আমি ঠিক আছি।'

আমার বন্ধন ছাড়িয়ে ওকে বাথরুম চলে যেতে দেখলাম, কয়েক সেকেণ্ড পরে জলের শব্দ আমার কানে ভেসে আসে। চেয়ারের ওপর কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গ্রাহকযন্ত্রটা হাতে তুলে নিলাম।

হোটেলের রুম সার্ভিস বেশ ভালো। গ্লাসে স্কচ ঢালতে যাচ্ছি সেই সময় এলেন আবার ঘরে ফিরে এলো। মুখে ওর প্রসাধনের প্রলেপ লেগেছিল তখনো, চোখে কোথাও অশ্রুর চিহ্ন দেখতে পেলাম না। গ্লাস ভর্তি স্কচ ওর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলি, 'তোমার এখন ড্রিঙ্কের প্রয়োজন বলে মনে হয়।'

'আমি দুঃখিত ব্র্যাড,' আবার ক্ষমা চাইলো এলেন, 'আমি ঠিক কাঁদতে চাইনি।'

'এখন ওসব কথা ভুলে যাও এলেন।'

'না, না আমি কান্নাকে ভীষণ ঘৃণা করি,' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে ও বলে ওঠে, 'তোমার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ভালো লাগেনি।'

চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'ভালোবাসার কাছে সব কিছুই ভালো এলেন, আর—' কথাটা শেষ করতে পারলাম না, ওর মুখের ভাবটা আমাকে কেমন যেন আনমনা করে দিলো হঠাৎ।

নিঃশব্দে স্কচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে যাই। ও আমার ঠিক বিপরীত দিকের চেয়ারে বসলো। কতক্ষণ আমরা নিঃশব্দে বসেছিলাম জানি না, তখন আমার মনে হচ্ছিল, এই পৃথিবী, আমার ব্যবসা, সংসার সব কিছু যেন অসাড়। একমাত্র এলেনই এখন আমার মনে সাড়া জাগাতে পারে।

ওর পিছন দিকের জানলায় অন্ধকারের ছায়া পড়তে শুরু করেছিল তখন। নিস্তব্ধ ঘরে আমার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। আমি নিজেই বুঝতে পারি না আমার মুখ থেকে কি করে কথাটা বেরিয়ে এলো, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি এলেন।'

গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে আমি ওর দিকে তাকালাম।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ও বলে, 'আর আমি, আমিও তোমায় ভালোবাসি।' তারপর ও ওর দীর্ঘায়ত চোখ দুটো মেলে দেয়। কেমন যেন আধ-ফোটা হাসিতে উদ্ভাসিত ওর

দু'ঠোঁটের মাঝে ঝিকিয়ে ওঠে সাদা দাঁতের সারি। এবার আমি বুঝতে পারি কেন ও মাথা নেড়ে সায় দিলো। যেন আমরা দুজনেই আমাদের মনের কথাটা আগেই জানতাম, এইমাত্র যা প্রকাশ পেলো আমাদের কথায়, আমাদের পাঁপড়ি মেলা ঠোঁটের ফাঁকে।

'জানি না এ কেমন করে সম্ভব হলো, আর কেনই বা এমন হলো?' আমার মনের সংশয়টা তখনো ঠিক দূর করতে পারছিলাম না। আমার মতো এলেনও আমাকে ভালোবাসে, কথাটা নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছিল, আমি ভুল শুনিনি তো?

'তাতে কিছু এসে যায় না,' আমার সব সংশয় এবার ও দূর করে দিয়ে বললো, 'জানো ব্র্যাড, তোমাকে দেখার মুহূর্ত থেকে আবার আমার বাঁচতে ইচ্ছে হলো। আমি বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ ছিলাম এতোদিন।'

'এখন আর তুমি একা নও,' আমি ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম।

'একা নই?' বিহ্বল ভঙ্গিতে ও প্রশ্ন চোখে তাকায়। উজ্জ্বল সোনালী চুল মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু দুষ্টু চোখে হাসছে। বিস্ময় আর কৌতুকে একসঙ্গে মিশে কেমন যেন ঝিকমিক করে ওঠে ওর হালকা নীল রঙের চোখের মণি দুটো।

আমি তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি, আমার রক্তের স্পন্দনে কোথায় যেন একটা দোলা লেগেছে। আমরা দুজনে দুজনার হয়ে ঘরের ঠিক মাঝখানটায় মিলিত হই। আমার শরীরটা তখন যেন চাপা অগ্নি-বলয়, এলেনের স্পর্শের অপেক্ষায়, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

পাখীর মতোন ওর নরম বুকটা আমার বুকের সঙ্গে লেপ্টে গেছে তখন, সারা শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বেসামাল শরীরটাকে কোন রকমে শক্ত করে ধরে রাখলাম। আগুনের হল্কার মতো ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত একটা শিহরণ যেন ধীরে ধীরে উঠে আসতে থাকে আমার বুকের ভেতর থেকে। আমার দু'হাতের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে, এলেনও তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। দু'হাত বাড়িয়ে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। ওর আয়ত চোখের ওপর আমার দৃষ্টি স্থির হলো।

ওর দু'চোখের পাতায় লজ্জারুণ জড়ানো এক অদ্ভুত বিস্ময়, আশ্চর্য এক অনিশ্চয়তার দোলায় কেঁপে ওঠে ওর হৃদয়, ওর ঠোঁট দুটো কেবল কেঁপে ওঠে, 'না ব্র্যাড, না এখন নয়, এ আমার মিনতি, একান্ত অনুরোধ ব্র্যাড।'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম এবং দু'হাত দিয়ে আমি ওকে আমার কোলে তুলে নিলাম।

আমার কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কেমন শুকনো শোনালো। ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'এ ভাব মুখের কথায় বোঝানো যায় না। এর আগে এমনটি কখনো হয়নি। এই প্রথম, এ সুযোগ তুমি আমাকে হাতছাড়া করতে বলো না লক্ষ্মীটি।'

গোলাপের ঝরা পাঁপড়ির মতো ওর পাতলা ঠোঁট দুটো অল্প একটু ফাঁক হতে দেখা যায়, ও কিছু বলার আগেই ওর কাঁধের দু'পাশে হাত রেখে ওর আধফোটা ঠোঁটের ওপর আমার ঠোঁট দুটো চেপে ধরলাম। অনেকক্ষণ পরে সামান্য একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃদুভাষে শুধোই, 'আমরা কেবল এখন দুজন দুজনার। কোন আপত্তি শুনবো না তোমার।'

ওর জিভে, ওর নরম দু'ঠোঁটের প্রান্তে টের পাই উত্তপ্ত আগুনের ছোঁওয়া, টের পাই আমার রক্তেও উত্তাপ বাড়ছে, কাঁপছে ওর উত্তপ্ত ঠোঁট দুটো আগুনের শিখার মতো। এক সময় ওর ঠোঁটের কাঁপুনি থামলেও উত্তাপ কিন্তু এতোটুকু কমেনি, বরং আরো যেন বেড়েই চলেছে।

ওর শরীরটা যেন একটা অগ্নিবলয়, উত্তাপ যেন ক্রমশঃ বাড়ছে, মিষ্টি কবোষ্ণ একটা আমেজ ছড়িয়ে পড়ছিলো ওর শিরা-উপশিরায়, প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে, ওর ছোঁওয়া লেগে হাজার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেন ঢেউ খেলে গেলো আমার সমস্ত শরীর বেয়ে। এই মুহূর্তে আমরা যেন পৃথিবী ছেড়ে ভিন্ন গ্রহের মানুষ হয়ে গেছি, এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ছুটে চলেছি জ্বলন্ত রকেটের মতো।

এবার এলেন নিজেকে সঁপে দিলো আমার কাছে, ওর সব বাধা ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে গেলো আমার উষ্ণ স্পর্শে, আমার ঠোঁটের নিচে ওর ঠোঁট আবার কেঁপে ওঠে, আমার শরীরের নিচে ও ওর শরীরটা নিজের অজান্তে বিছিয়ে দিতে থাকে গুছিয়ে আমার সুবিধের জন্যে, আবেশে চোখ দুটো বুজে আসে। আমার নম্র হাতের ছোঁয়ায় ও বার বার শিউরে ওঠে। শেষে নিজের থেকেই এলেন ওর পোষাকের বাঁধনগুলো আলগা করে দেয় যাতে ওর নগ্ন শরীরে আমার হাতের ছোঁয়াটা আরও স্পষ্ট অনুভব করতে পারে ও। এলেন বুঝতে পারে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে আমার, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। নিজের মুখ থেকে আমার মুখটা ও সরিয়ে এনে নিটোল স্তনের ওপর চেপে ধরে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম ওর পুরুষের সঙ্গে মিলনে লিপ্ত হওয়া। উত্তপ্ত শরীরের ওপর অনেকদিন পরে এই প্রথম পুরুষ সোহাগের বারি-বর্ষণ হওয়া। তাই বোধহয় আবেগটা ওর একটু বেশি বলে মনে হলো।

এলেন ওর স্তনবৃন্তের চারপাশে অনুভব করলো আমার দাঁতের নিষ্পেষণ। সমস্ত শরীর বেয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ রক্তস্রোত। আমি মুখটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই এলেন আরো শক্ত করে আমার মাথাটা চেপে ধরলো। পাতলা ঠোঁটের কোণে আধফোটা হাসির একটা ঝিলিক হেনে আমার দিকে তাকালো।

মৃদুভাষে ও ডাকে, 'ব্র্যাড।'

আমার কথা তখন জড়িয়ে আসছিল। প্রায় কান্নার মতো শোনায় আমার অস্ফুট কণ্ঠস্বর। এলেন অনুভব করতে পারলো আমার রক্তের স্পন্দন। এমন কি আমার পোষাকের ওপার থেকেও সে ঢেউ ক্রুদ্ধ গর্জনে আছড়ে পড়তে লাগলো ওর নগ্ন দেহতটের প্রতিটি কূলে উপকূলে। কেমন যেন উষ্ণ প্রতিধ্বনিত একটা যন্ত্রণায় ও বার বার কেঁপে উঠতে লাগলো, যেন এখুনি রুদ্ধ হয়ে যাবে ওর হৃদয়ের স্পন্দন। হৃদয়ের সমস্ত দুয়ার খুলে ওর সেই আমন্ত্রণের মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। আমার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ যেন এক একটা জ্বলন্ত আগুনের চুল্লি। সেই উত্তাপে আমার সমস্ত শরীরটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ও অনুভব করলো বিপুল শিহরণ। তারপর সবকিছুই ধীরে ধীরে কেমন যেন শিথিল হয়ে গেলো।

শরীরে তখন আমার দারুণ একটা অবসাদ, এবং মনেও, এ আমি কি করলাম? মারজার মুখটা সেই সময় আমার চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠতেই নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হলো। ওর কাছ থেকে প্রায় ছিটকে সরে গিয়ে বালিশের ওপরে মুখ গুঁজে শুলাম। তখনো আমি হাঁপাচ্ছিলাম।

এলেন বোধহয় আমার মনের কথাটা টের পেয়ে গিয়েছিল। ওর আয়ত চোখে পলকে এক অদ্ভুত হাসির ঝিলিক খেলে যায়। ও আমার দিকে পাশ ফিরে আমার নরম চুলে হাত বোলাতে বোলাতে কোমল স্বরে বলে, 'ব্র্যাড, সোনামণি আমার, আমার প্রেম, আমার পাপ, আমার পুণ্য...

ধীরে ধীরে মাথা তুলে ওর মুখের দিকে তাকালাম। অপরাধীর মতো তাকিয়ে বললাম, 'কেন এমন হলো এলেন?'

দুটো ঠোঁটের ফাঁকে দুর্লভ চাপা এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে এলেন আমার দিকে তাকায়। তারপর দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলে, 'যেহেতু আমার পরস্পরকে ভালোবাসি ছোট্ট সোনামণি আমার। যেহেতু আমারা পরস্পরকে সুখী করতে চাই, সেইজন্যে।' একটু থেমে ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি ফুটিয়ে ও শুধোয়, 'কেন তোমার ভালো লাগেনি সোনামণি? তুমি ঠিক এরকমই চাইছিলে, চাইছিলে না?

—হ্যাঁ, না মানে—'

'বুঝেছি,' অভিমানে ও ঠোঁট ফোলায়, 'বৌয়ের কথা ভেবে তোমার অনুশোচনা হচ্ছে, তাই না?' দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে এলেনের চোখের কোল বেয়ে।

সেই মুহূর্তে সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেলো। মনে হলো আমি বোধহয় এলেনের ওপর অবিচার করছি। মনকে বোঝাই আমার স্ত্রী আছে জেনেও এলেন নিজেকে আমার কাছে সঁপে দিয়েছে উজাড় করে মনে এতোটুকু দ্বিধা কিংবা সংকোচ না রেখে এমন কি মেয়ে হয়েও। আর আমি পুরুষ হয়ে মন থেকে সঙ্কীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে উঠতে পারছি না? ছিঃ ছিঃ নিজের ওপর ভীষণ ঘৃণা হলো। এই আমার প্রেম? কথাটা উপলব্ধি করতেই মারজার কথা আমি অন্তত সেই মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে এলেনকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম, তারপর ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট নামাতে গিয়ে অস্ফুটে বলি, 'আমি তোমায় ভালবাসি এলেন। আমি মিথ্যে তোমায় কষ্ট দিলাম। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমরা দুজন দুজনার কেবল। সত্যি তো আমাদের ভালোবাসার কাছে এ কোন অন্যায় খেলা নয়। এ খেলা চিরন্তন প্রেমের, ভালোবাসার।'

সেই ভালোবাসায় সাড়া দিতে এলেন ওর ঠোঁটের উত্তাপ আমার ঠোঁটের ওপর ছড়িয়ে দিলো চোখ বুজে। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো ম্যাট ব্রেডির কাছে আমার দাম কি করে আধ মিলিয়ন ডলারে তোলা যায়।

❑ নবম অধ্যায় ❑

জলের কলকল শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে থাকলাম। অদ্ভুত এক অন্ধকারে আমার চোখ দুটো কি যেন খুঁজে ফেরে। অভ্যাসবশতঃ আমি আমার সিগারেটের দিকে হাত বাড়াই। কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় সিগারেট পাওয়া গেলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম আমি কোথায়।

গড়াতে গড়াতে বিছানার একেবারে প্রান্ত সীমানায় এসে থামলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম। বিছানা সংলগ্ন টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কব্জি ঘুরিয়ে দেখলাম, রাত তখন ন'টা। মারজা চিন্তা করবে। গ্রাহকযন্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে অপারেটারকে একটা নম্বর দিলাম।

ডায়াল ঘোরানোর শব্দ কানে ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। মুহূর্তে এলেনকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম বাথরুম থেকে। দরজার সামনে থমকে দাঁড়ায় ও। ওর পিছনে বাথরুমের আলো এসে পড়েছিল দরজা পথে। ওর মাথায় একটা ছোট আকারের তোয়ালে জড়ানো। এবং একটা বড় আকারের টার্কিশ তোয়ালে ওর নিরাভরণ দেহের ওপর ছড়ানো।

'কি ব্যাপার, বাড়িতে ফোন করছিলে নাকি?' প্রশ্ন নয় এ যেন জবাবদিহি চাওয়া।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

ও কিছু বললো না। সেই সময় মারজার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাষে, 'ব্র্যাড?'

'হুঁ, সোনামণি, ওদিককার খবর সব ঠিক তো?'

'হ্যাঁ ব্র্যাড, তুমি কোত্থেকে কথা বলছো? আমি খুব চিন্তায় ছিলাম।'

'আমি ভালোই আছি,' এলেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ড্রিঙ্কের মাত্রাটা আজ একটু বেশি হয়ে গেছে।'

এলেন বাথরুমে ফিরে গেলো। আড়চোখে ওর বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে দেখে আশ্বস্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

'তা তুমি এখন কোথায়?' মারজা জানতে চাইলো, 'বিকেল থেকে তোমার অফিস তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'থার্ড এভিনিউ-এর একটা বার থেকে কথা বলছি,' মিথ্যে করে বলি, 'ওরা কি চায়?'

'জানি না,' মারজা প্রত্যুত্তরে বলে, 'ক্রাইস বলছিল, স্টীল ইন্সটিটিয়েটের ব্যাপারে হতে পারে। বিকেল থেকে তুমি অফিসে নেই, তা কি ব্যাপার বলো তো? আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে।'

'না, সে সব কিছু নয়,' আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'শুধু শুধু তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই।'

ওর হাসির শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। 'না ব্র্যাড, আমি সেরকম কিছু ভেবে বলিনি। তাছাড়া তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমাদের অভাব কি বলো? যখন যে ভাবে তুমি আমাকে চাইবে।' একটু থেমে গম্ভীর স্বরে মারজা বলে, 'কেন আমি কি

খুব বুড়ি হয়ে গেছি ব্রাড?'

'না, না কে বলেছে?' অনিচ্ছা সত্ত্বেও রসিকতা করলাম, 'টাইট ব্রা পড়লে আজও তুমি এইট্‌টিন, কি বলো?' আমার হাসির সঙ্গে মারজাও যোগ দিলো।

'না, ব্র্যাড, অতো সব ভেবে আমি বলিনি। আমি জানি, তোমার আমার মাঝে আজ আর ওটা বাধা হতে পারে না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' এবার মারজার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক বলে মনে হয়, 'ক্রাইস বলছিল তুমি নাকি তোমাদের পিটসবার্গের হেড অফিস যাবে। তা তুমি একবার তাকে ফোনে করে খবর নেবে? পরে আমাকে ফোন করে জানিও ব্যাপারটা কি!'

'নিশ্চয়ই জানাবো সোনামণি। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, কেমন!'

'না ভেবে পারি? আচ্ছা ব্র্যাড, তুমি আজ খুব বেশি মদ খাওনি তো?' মারজার কথায় অভিমানের সুর, 'তুমি তো জানো, বেশি ড্রিঙ্ক করলে তুমি কিরকম অসুস্থ হয়ে পড়ো!'

'না, আমি জানি না,' তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে বলি, 'ক্রাইসকে ফোন করে তোমাকে ফিরে আবার ফোন করবো।'

গ্রাহকযন্ত্রটা নামিয়ে রাখার পরেও ওর বিদায় সম্ভাষণের সুরটা আমার কানে বাজছিল। সেই সময় বাথরুমের দরজার ওপার থেকে একটা সংকেত ধ্বনি বেজে উঠলো, তারপরেই দরজা খুলে এলেন বেরিয়ে এলো।

'ও ভাবে সংকেত জানিয়ে না আসলেই পারতে,' আমি ওকে বলি, 'এখানে বাইরের কেউ ছিলো না, কেবল তুমি আর আমি।'

বড় বড় চোখ করে তাকায় এলেন, ওকে কেমন যেন চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার নির্জলা মিথ্যে কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।'

'কেন, সাহস নেই তোমার শোনার?'

ওর মুখে ছায়া পড়ে। 'ওরকম দুঃসাহস যেন আমার না হয়,' গম্ভীর স্বরে ও বলে, 'এ-কথা তো তোমাকে আমি আগেও বলেছি।'

আমি ওর দিকে এগিয়ে যাই, কিন্তু ও আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকায়। 'তোমাকে এখনো আর একটা ফোন করতে হবে না?'

'না করলেও চলবে,' এবার ছুটে গিয়ে ওর হাতটা সহজেই ধরে ফেললাম। আমি ওর মুখে চুমু খেলাম। তোয়ালের নিচে ওর শরীরটা বেশ গরম বলেই মনে হলো। ভীরু হরিণীর মতো ও এবার আমার কাছে ধরা দিলো, কোন বাধা নেই, কোন আপত্তি নেই। দু'হাত দিয়ে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে শুধোয়, 'ব্র্যাড, আমার প্রিয়তম ব্র্যাড।'

এবার আমি ওর জলসিক্ত কাঁধের ওপর চুমু খেলাম। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি এলেন।' ফিসফিসিয়ে বললাম, 'কখনো এর আগে এমন করে ভালোবাসিনি, কাউকে এ রকম অনুভূতি আমার কখনো হয়নি।'

এলেন আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, ওর চোখে মুখে একটা নিটোল পরিতৃপ্তির

ছায়া পড়ে। 'বলো ব্র্যাড, আমাকে বলো, আরো বলো। আমাকে অনুভব করতে দাও, তুমি মিথ্যে বলছো না, আমাকে তুমি তোমার খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার করছো না। বলো, আমার মতো তুমিও আমাকে ভালোবাসো। বলো প্রিয়তম!'

ক্রাইসের গলার স্বর কেমন উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে ফোন না করে পারলাম না। 'তা কোথায় তুমি ছিলে এতোক্ষণ?'

'মদ গিলছিলাম,' সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, 'কি ব্যাপার, এমন জরুরী তলব কিসের জন্যে বন্ধু?'

'সেই কোন সন্ধ্যে থেকে তোমাকে ধরার জন্যে চেষ্টা করছি,' ক্রাইস বলে, 'কাল সকালে ব্রেডি তার পিটসবার্গের অফিসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

উত্তেজনাটা বোধহয় সংক্রামক রোগের মতো। এবার আমার উত্তেজিত হওয়ার পালা। বুড়ো ভামটা আবার কি চায়? হদিশ করতে পারি না। 'ঠিক আছে আমি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত, প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করো।'

'টিকিটের ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছি,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় সে, 'এয়ারপোর্টে তোমার নামে টিকিট বুক করা আছে। ফ্লাইট ১০৪, এগারোটা পনেরোয় ছাড়ছে। তোমার লাগেজও সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি, চেকরুম থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করো।'

কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম। তখন প্রায় দশটা। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। 'ঠিক আছে ক্রাইস। আমি যাচ্ছি। শুভরাত্রি।'

বিদায় সম্ভাষণের পালা চুকিয়ে গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখি। এলেন এতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েছিল। 'শুনেছো তুমি?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় ও, 'তাহলে আর দেরী করো না, খুব বেশি সময় নেই।'

'এবং তুমিও তাড়াতাড়ি তোমার টুকিটাকি জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও। তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছো।'

এলেন উঠে দাঁড়ায় সহসা, ওর দু'চোখে অবাক বিস্ময়। 'বোকামো করো না ব্র্যাড। এ তুমি করতে পারো না।'

ইতিমধ্যে আমি আমার জিনিষপত্র গোছানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি। হাসতে হাসতে বলি, 'তুমি তো জানো, তোমাকে ছাড়া আমি এক পাও নড়তে পারি না। আমি চাই ছায়া হয়ে তুমি আমার পাশে পাশে থাকো সব সময়। তুমি আমার প্রেরণা, তুমি আমার সৌভাগ্যের প্রতীক। এই কণ্টাক্টটা সই না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার চোখের আড়াল কিছুতেই হতে পারো না।'

'কিন্তু—'

'না, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু থাকতে পারে না এলেন,' আমি ওকে বাধা দিয়ে বলি, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

এলেন ওর জিনিষপত্র গোছগাছ করার জন্যে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই ফাঁকে বাড়িতে আবার ফোন করলাম। 'শোনো মারজা, এগারোটা পনেরোর প্লেনে

আমাকে পিটসবার্গ যেতে হচ্ছে। ব্রেডি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'চমৎকার।' দূরভাষে মারজার হাসির কলকল শব্দ ভেসে আসে। 'সত্যি ব্র্যাড, তোমার গর্বে আমার বুক ভরে যাচ্ছে। আমি জানি, একদিন না একদিন তুমি ঠিক নাম করবে। তোমার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

ক্রাইসকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল সে। আমার ব্যাগের সঙ্গে একটা ছোট্ট চিরকুট সে গেঁথে রেখেছিল। সেই চিরকুটে আমার উদ্দেশ্যে লিখে রেখেছিল সে, পিটসবার্গের ব্রুকেয় আমার নামে হোটেল বুক করা আছে। রেজিস্টারে সই করে আমরা যখন আমাদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, তখন ঠিক রাত দু'টো। একটু পরেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। শুরু হবে আমাদের নতুন জীবন।

বসার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল এলেন, হোটেল বয় তখন আমাদের স্যুট পরীক্ষা করে দেখছিল। অবশেষে আমার কাছে সে এসে চাবিটা আমার হাতে তুলে দেয়। এক ডলার তার হাতে গুঁজে দিতেই সে আমাদের ঘর ছেড়ে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে দিলাম।

তারপর এলেনের দিকে ফিরে তাকালাম। জয়ের হাসি ফুটে ওঠে আমার ঠোঁটে, ওর দৃষ্টি এড়ায় না। আমার এই হাসির অর্থ না বোঝার বয়স ওর নয়। হঠাৎ ওকে কেমন একটু গম্ভীর দেখায়। তবে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে বললাম, 'আমরা যেন স্বর্গে এসে উঠেছি, বাড়ির থেকেও এই ঘর, পাশে শয়নকক্ষের ঐ শয্যা অনেক বেশি সুন্দর-আরামদায়ক, কি বলো?'

কোন উত্তর দেয় না এলেন।

'নিষ্ঠুর হয়ো না সুন্দরী,' আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলি, 'পিটসবার্গ অমন খারাপ কখনো হতে পারে না।'

এবার ও উত্তর না দিয়ে পারলো না, 'তোমার পাগলামিতে সাড়া দিয়ে আমি এখানে এসে কি ভুল যে করেছি, এখানে এসে টের পাচ্ছি। তুমি জানো এর জন্যে তোমাকে কতো জবাবদিহি করতে হবে?'

'তুমি কি করবে তাই আগে বলো?' পাল্টা প্রশ্ন করে ওর দিকে তাকাই।

'কারোর কাছে কোন কিছুর জন্যে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।' এলেন প্রত্যুত্তরে বলে, 'কিন্তু তোমাকে—'

আমি ওকে কথা শেষ করতে দিলাম না। 'আমার ভাবনা আমার জন্যেই না হয় তোলা থাক!'

'ব্র্যাড,' এলেন প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, 'তুমি জানো না ব্র্যাড, লোকে কি বলবে, তুমি ওদের স্বভাব, ওদের সঠিক চরিত্র জানো না। তুমি জানো না, এরপর ওরা কি করবে, কি করতে পারে—'

'তার জন্যে আমি কোন পরোয়া করি না,' আবার আমি ওর কথায় ওকে বাধা দিয়ে বলি, 'আমি কোন লোককে তোয়াক্কা করি না। আমার সব ভাবনা, সে শুধু তোমার

জন্যে। তোমাকে আমার একান্তে কাছে পাওয়ার জন্যে। তোমাকে একবার যখন কাছে পেয়েছি, এখন আর আমি তোমাকে হারাতে চাই না। জানো এলেন, আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, এই যে তোমাকে এতো কাছে পাওয়া, এর জন্যে আমাকে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। বলো, এর পরেও কি তোমাকে আমি দূরে সরিয়ে রাখতে পারি?'

নিঃশব্দে আমার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো এলেন, ওর আয়ত চোখ দুটো আমার মুখের মধ্যে কি যেন খুঁজে ফিরলো। 'ব্র্যাড, সত্যি তুমি কি তাই মনে করো?'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, 'আমরা এখানে, এটাই যথেষ্ট উত্তর নয় কি?'

ওর দৃষ্টি তখনো আমার মুখের ওপরে নিবদ্ধ ছিলো। জানি না কি খুঁজছিল ও। তবে মনে হয়, ও যা খুঁজছিল তা ও পেয়ে গেছে। আমার কথায় দরজার কাছে যাওয়ার আগেই ও থমকে দাঁড়ালো। আমার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে ও ঘুরে দাঁড়ালো।

'একটু অপেক্ষা করো এলেন,' আমি বললাম, 'আমরা ঠিকই করেছি।' এলেনকে আমি দু'হাত দিয়ে আমার কোলে তুলে নিলাম ঘরের চৌকাঠ পার হওয়ার আগেই।

কনসোলিডেটেড স্টীলের বিরাট এ্যাডমিনিসট্রেটিভ বিল্ডিং, সদ্য রঙ করার দরুণ সূর্যের আলোয় বাড়িটা ঝলমল করছিল। অদূরে কারখানার চিমিনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, ধোঁয়াগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে নীল আকাশে মিশে যাচ্ছিল।

একজন স্পেশাল অফিসার আমাকে বাধা দিলো, তার পরণে ইউনিফর্ম। দরজা পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে বলি, 'মিঃ রোয়ান মিঃ ব্রেডির সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'আপনার পাস আছে?'

আমি মাথা নেড়ে অস্বীকার করলাম।

'এ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

'হ্যাঁ, আছে।'

লোকটা তার টেবিলের ওপর থেকে গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিয়ে মাউথপীসে মুখ রেখে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলে, কথা বলার সময় তাকিয়ে দেখে সে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে। সময় কাটাতে একটা সিগারেট ধরালাম। এক সময় গ্রাহকযন্ত্রটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে ফিরে তাকালো, 'মিঃ রোয়ান, আসুন এদিকের এই এলিভেটারে,' নরম সুরে বলে এগিয়ে আসে সে। দেওয়ালে সুইচ টিপতেই এলিভেটরের দরজা খুলে যায়। দরজা খুলে যেতেই দ্বিতীয় স্পেশাল অফিসারকে দেখা যায়। 'মিঃ ব্রেডির অফিসে যেতে চান মিঃ রোয়ান।'

এলিভেটরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। অপারেটরের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মতোই খারাপ দেখাচ্ছে।'

'মিঃ ব্রেডি বোর্ডের চেয়ারম্যান,' মরা মাছের চোখ নিয়ে তাকালো সে।

একবার ভাবলাম বলি, আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথা বলছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও ভাবলাম, শুধু শুধু সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভেবে

বলতে গিয়েও চুপ করে রইলাম। ইতিমধ্যে এলিভেটর থেমে গিয়েছিল, দরজা খুলে যেতেই আমি নেমে বাইরে এলাম।

'এই দিকে স্যার,' স্পেশাল অফিসার আমার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো সে, আলতো টোকা মারতেই দরজা খুলে যায়। অনুজ্জ্বল করিডোরে পা দিতেই দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এলো আমার।

'মিঃ রোয়ান?' ঘরের মাঝখানে গোলাকৃতি একটা টেবিলের সামনে বসেছিল মেয়েটি, প্রশ্ন চোখে আমার দিকে তাকায় সে।

মাথা নেড়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মেয়েটি ডেস্কের সামনে এসে শুধোয়, 'মিঃ ব্রেডি খুব ব্যস্ত, এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে দেখা করতে না পারার জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। দয়া করে আপনি যদি অভ্যর্থনা-ঘরে একটু অপেক্ষা করেন।'

আমার অজান্তে নিঃশব্দে মুখ দিয়ে শিষ বেরিয়ে এলো। বেরসিক লোক ম্যাট ব্রেডি। লোহার ব্যবসা করতে করতে লোকটার মনটাও বুঝি লোহার মতো কঠিন হয়ে গেছে। এমন সুন্দরী সেক্রেটারীকে তার চেম্বারের বাইরে রেখে কি করে সে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে, ভেবে পাই না। সুগঠিত দেহ, কোথাও এতটুকু মেদের আধিক্য নেই। তবে তাকে একটু গম্ভীর বলে মনে হলো।

হাসলো না মেয়েটি একটু সময়ের জন্যেও। 'এখানে আরাম করুন। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন।'

'সিগারেট খেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই!' এই প্রথম মেয়েটির ঠোঁটে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'টেবিলের ওপর ম্যাগাজিন এবং খবরের কাগজ আছে, পড়তে পারেন।' কথাটা শেষ করা মাত্র দরজা বন্ধ করে দিলো সে আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই।

এই প্রথম আমি ঘরের চারিদিকে তাকালাম। পরিপাটি করে সাজানো দামী আসবাবপত্র। ওক-কাঠ দিয়ে দেওয়াল মোড়া। মেঝেয় দামী পুরু কার্পেট। দরজার ঠিক উল্টো দিকের দেওয়ালে সুন্দর করে ফ্রেমে বাঁধানো একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফের দিকে তাকাতেই আমার চোখ স্থির হয়ে গেলো।

ধীরে ধীরে সেই ফটোর নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। কতকগুলো মুখ অতি পরিচিত বলে মনে হলো। ম্যাট ব্রেডির জন্যে প্রতিটি ফটোর নিচে অটোগ্রাফ দেওয়া। তারা সবাই অ্যামেরিকার প্রেসিডেণ্ট। উডরো উইলসন, হার্ডিং, কুলিজ, হুভার, এফ. ডি. আর, ট্রুম্যান, আইসেন হাওয়ার।

অপারেটার আমার কৌতূকটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারলো না, অবশ্য সেজন্য অবাক হলাম না। প্রেসিডেণ্ট আসে যায়, কিন্তু ম্যাট ব্রেডি যেন গেছে তো গেছেই, ফেরার আর নাম নেই। ব্রেডির ফটোর দিকে তাকালাম। রুক্ষ মেজাজের লোক। স্মার্ট।

অবাক হয়ে ভাবি, কি করছি আমি এখানে। ম্যাট ব্রেডি নিজেকে একজন সৎ জনপ্রতিনিধি

বলে মনে করে থাকে, সেই লোকের কি আর তাকে প্রয়োজন হতে পারে! ম্যাট ব্রেডি মানুষের নাড়ী-নক্ষত্র ভালো বোঝেন, মানুষের সাইকোলজি তাঁর নক্ষদর্পণে, তার প্রভাব ঘরের মধ্যে ছড়িয়েছিল। ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখতে গিয়ে সময়ের সিঁড়ি বেয়ে প্রায় পঁচিশ মিনিট কাটিয়ে দিলাম। এক সময় একঘেয়েমি কাটাতে র‍্যাক থেকে একটা ম্যাগাজিন টেনে নিলাম।

খানিক পরে ম্যাট ব্রেডির ঘরের দরজা খুলে যেতেই মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি দু'জোড়া ভারী বুট বাইরে যাওয়ার রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে মনে হলো ম্যাট ব্রেডি তাহলে এতোক্ষণ দুজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, ওরা চলে গেলো, এবার আমার পালা। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগাজিনটা রেখে দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করলাম তাঁর মুখোমুখি হওয়ার জন্য। পর মুহূর্তে ম্যাট ব্রেডির চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, 'মিঃ ব্রেডি,' আমি বললাম, 'কি চমৎকার অফিস আপনার!'

রেডিও সিটি মিউজিক হলের লবির মতো বিরাট অফিস। বিল্ডিং-এর একেবারে এক কোণায় তাঁর অফিস। দুটি দেওয়ালে বড় বড় দুটি জানালা, জানালার ওপারে সারি সারি অফিস বিল্ডিং, নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন, বেশির ভাগ ম্যাট ব্রেডির অফিসের কনসোলোডিটেড স্টীলের বিস্তারিত বিবরণ। তাঁর ডেস্কের চারপাশে তিনটি বাকেট চেয়ার। তাঁর অফিস ঘরের ঠিক বিপরীত দিতে কনফারেন্স টেবিল, টেবিলের চারপাশে দশটা চেয়ার।

তিনি আমাকে তাঁর ডেস্কের সামনে বসতে বললেন। তারপর নিঃশব্দে বসে আমার দিকে তাকালেন তিনি। আমি তাঁর বলার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, 'আপনার বয়স কতো মিঃ ব্রাড?'

আমার চোখে অজানা কৌতূহল, 'তেতাল্লিশ।'

তাঁর পরবর্তী প্রশ্নটাও আমার মনে দারুণ এক কৌতূহল জাগালো, 'বছরে কতো আয় আপনার?'

মিথ্যে বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই কেন জানি না দ্রুত আমার উত্তরটা মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'পঁয়ত্রিশ হাজার।'

কোন কথা না বলে তিনি তাঁর ডেস্কের ওপর তাকালেন, টাইপ করা কয়েকটা কাগজের সীট ছড়িয়ে ছিলো সেখানে। মনে হলো সেই কাগজগুলোর ওপর চোখ রাখছিলেন তিনি। একটু পরেই তিনি আমার দিকে তাকালেন, 'আপনি জানেন, কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি?'

'মনে হয় জানি,' সরল মনে বললাম, 'কিন্তু এখনও আমি নিশ্চিত নই।'

'শোন ইয়ংম্যান, সততা আমার আদর্শ, সহজ কথা আমি ভালোবাসি। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার মধ্যে কোন প্যাঁচ নেই।' ম্যাট ব্রেডির কথায় অন্তরঙ্গ সুর শুনে মনে হলো আমার কথায় তিনি বেশ খুশি হয়েছেন। 'অতএব মিথ্যে সময় নষ্ট না করে, আসুন কাজের কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক।' একটু থেমে তিনি আবার বলেন, 'বছরে

ষাট হাজার ডলার আয়, কেমন মনে হয় তোমার?'

নিজের কানেই আমার হাসির শব্দটা কেমন বেসুরো শোনায়। এই ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, আমি যেন ওয়াশিংটনে ফিরে গেছি। প্রত্যুত্তরে বলি, 'ভালোই তো।'

'কালকের আলোচনায়,' ভদ্রলোকের কথায় একটা আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হলো, 'আপনি বিজনেসের একটা প্ল্যানের কথা বলছিলেন, মনে আছে?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম, কথা বলতে ভয় হচ্ছিল। আশ্চর্য, গতকাল এ ব্যাপারে তিনি খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। এই সব কথা ভেবেই চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো।

'আপনার প্ল্যানে কিছু দোষ-ত্রুটি আছে।' ব্রেডি বলেন, 'তবে প্ল্যানটা মোটামুটি ভালো।'

অনেকক্ষণ পরে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমার প্ল্যান যে আপনার পছন্দ হয়েছে, শুনে খুশি হলাম।'

'আজ আমি স্বীকার করছি, গতকালের আলোচনা শেষে আমি একটু ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম,' তাঁর কণ্ঠে সেই আত্মপ্রত্যয়ের সুরটা তখনো শোনা যায়। আমার চোখে চোখ রেখে তিনি বলেন, 'কারণ আপনার অভিযোগের জন্যে।'

'আমি তার জন্যে দুঃখিত স্যার,' আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'তার কারণ—'

হাত নেড়ে তিনি আমাকে বাধা দিলেন, 'আর বলতে হবে না। আমি স্বীকার করছি, আপনাকে আমি যথেষ্ট প্ররোচিত করেছি। তবে আপনার বক্তব্য আমার মনে দাগ কেটেছে। ইস্কাবনের টেক্কাকে জোর করে ইস্কাবনের টেক্কা বলার সাহস আপনার আছে।' তাঁর দু'ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটে ওঠে, 'অনেকদিন কাউকে আমি আপনার মতো এমন দৃঢ়স্বরে অভিমত ব্যক্ত করতে শুনিনি।'

ভদ্রলোককে যতোই দেখছি ততোই যেন অবাক হচ্ছি। জানি না লোকটার মনে কি আছে! তাই আমি চুপ করে রইলাম।

জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ঐ দিকে তাকিয়ে থাকুন মিঃ রোয়ান। ওটা হলো কনসোলিডেটেড স্টীল। তবে এটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়। আমেরিকায় এরকম আরো কুড়িটা ফাউনড্রি আছে। প্রথম পাঁচটা ফাউনড্রির মধ্যে এটা অন্যতম, এর মূলে আমি। কিন্তু লোকে আমার বিচার-বুদ্ধির আমল দেয় না। অবশ্য তার জন্যে আমি ভাবি না। আমার এখন একমাত্র ভাবনা, আমার স্বপ্ন সফল হওয়াকে নিয়ে। সেই কোন্ বারো বছর বয়স থেকে স্টীল আমার শয়নে স্বপনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি, আমিও বোধহয় লোহা হয়ে গেছি, একেবারে খাঁটি লোহা, বুঝলেন মিঃ রোয়ান?'

লোকটার সম্পর্কে আমার যে ধারণাই থাক না কেন, এই মুহূর্তে ওঁর কথাগুলো যেন আমার মনকে স্পর্শ করে গেলো। তাঁর মর্মস্পর্শী আত্মবিশ্লেষণ আমাকে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করলো, লোকটার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। নিঃশব্দে গোয়েন্দা গল্পের মতো তাঁর জীবনের পরবর্তী রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

'আপনারা ভাবেন আমি হয়তো স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের কথাই ভেবেছি, তখন

আমার মনে হয় আপনাদের অনুমানই ঠিক। হ্যাঁ সত্যি তো মিথ্যে নয়! তবে তার জন্যে আমার এতটুকু অনুযোগ নেই। নিজেকে শোধরাবারও সময় আর নেই, অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

তখনো আমি তার মনের সঠিক ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারি নি। তাঁর কথাবার্তা তখনো অস্পষ্ট, ধোঁয়াশা ছাড়া আর কিছু মনে হলো না আমার। চেয়ারে হেলান দিয়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি।

'আপনাকে আমার খুব পছন্দ মিঃ রোয়ান,' শান্ত কণ্ঠস্বর তাঁর। 'কারণ আপনিও আমাকে পছন্দ করেন। আপনি স্পষ্ট বক্তা। আমি জানি, স্পষ্ট ভাষায় আপনি আমার স্বার্থপরতার কথা বলে থাকেন। কোন রাখ-ঢাক নেই, কেমন মুখের ওপর আমার সমালোচনা করলেন। তাতে আমার চোখ খুলে গেছে। আমি জানি, আপনি আমাকে সংশোধন করার পথ দেখিয়েছেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।' একটু থেমে তিনি তাঁর কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করলেন, 'আর সেই জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি আপনাকে ভাইস-প্রেডিডেণ্ট এবং জনসেবা অধিকর্তার পদ দিতে চাই, পারিশ্রমিক বছরে ষাট হাজার। এবার বলুন, কি করে এই প্রতিষ্ঠানের আরো উন্নতি ঘটানো যায়।'

এবার আমি চেয়ারে নড়ে-চড়ে বসলাম। 'কেন, প্রচার মাধ্যমে।'

তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'সেটা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। সে ভাবনা আমার।'

আমি কোন কথা বললাম না। এ আমার বিরুদ্ধে একটা প্রচ্ছন্ন আঘাত মনে করা যেতে পারে। সারাজীবন প্রচার মাধ্যমের সর্বোচ্চ আসনে বসে থেকে আজ তিনি আমাকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দিতে চাইছেন। কি আমার অযোগ্যতা, আমার কিসের ব্যর্থতা, ওঁর মুখ থেকেই সেই কথাটা শোনার অপেক্ষায় বসে থাকলাম নীরবে।

ম্যাট ব্রেডির শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল আমার মুখের ওপরে। আমার এই নীরবতার মানে খুঁজে তাঁর মুখে ব্যাগ্রতা ফুটে উঠতে দেখা যায়। তাঁর আঙ্গুলগুলো ডেস্কের ওপর রাখা কাগজের সীটগুলোর ওপর বিলি কাটতে থাকে। চকিতে একবার সেদিকে তাকিয়ে থেকে তিনি আবার বললেন, 'মিঃ রোয়ান, এই কাগজগুলো আপনার একটা পুরো জীবনলিপি। রাতারাতি আপনার সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছি, সব লিখে রেখেছি এই কাগজগুলোর পাতায়। প্রতিটি পাতায় লিপিবদ্ধ করা আছে আপনার জীবনের এক একটা মুহূর্তের ঘটনার কথা। কেবল একটা ছোট ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই।'

প্রশ্ন চোখে আমি তাঁর দিকে তাকাই। আমার মাথা তখনো ঘুরছিল, এখন আবার কি বলতে চান তিনি?

কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'আপনার বিজনেস রেকর্ড অত্যন্ত ভালো। এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। আপনার পারিবারিক জীবনও বেশ ভালো। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত জীবনের একটা দিকের ব্যাপারে আপনার একটু সতর্ক হওয়া উচিত।'

কথাটা শোনা মাত্র আমার মনে হলো যেন একটা শীতল বাতাস আমার শিড়দাঁড়া বেয়ে বয়ে গেলো। 'সে কি মিঃ ব্রেডি?'

'গতকাল রাত্রে ব্রুকেতে একটি মহিলার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে দেখা গেছে, অথচ সেই মহিলা আপনার স্ত্রী নন মিঃ ব্রাড। এটা অসমীচীন। আপনাকে বলে রাখি, এখানে আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে সবার নজর আমাদের ওপর পড়ে আছে।'

আমার ধৈর্যের শেষ বাঁধটা এবার ভেঙ্গে গেলো। প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে ভাবতে বসলাম, এই লোকটা কতোদিন থেকে আমার ওপর নজর রাখছে? মনে হয় এটা ওর টোপ। মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে উনি আমাকে এলেনের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। 'ওরা কারা মিঃ ব্রেডি?' হিমার্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি? আমি কি করছি না করছি, এ ব্যাপারে কাদের এতো আগ্রহ হতে পারে?'

'প্রত্যেকেই, এই পিটসবার্গে লোহা-লক্করের ব্যবসার সঙ্গে যারাই জড়িত তারা সবাই একরকম নজরবন্দী মিঃ রোয়ান।'

ঐ কাগজের সীটগুলোতে কি লেখা আছে দেখতে হবে, কথাটা মনে হতেই বললাম, 'আমার অনুমান, গতকাল যে মহিলার সঙ্গে আমি ছিলাম তার নাম নিশ্চয়ই আপনার গুপ্তচর জড়িয়ে থাকবে?'

হিমার্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'মিঃ রোয়ান, আপনার শয্যাসঙ্গিনীর নাম জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠান অতি সুসংগঠিত, সেই কারণেই কথাটা আমি আপনার কাছে উল্লেখ করলাম।'

'তাই বুঝি!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনার অফারে আমি আগ্রহী নই মিঃ ব্রেডি।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন, 'ইয়ংম্যান, বোকার মতো কথা বলবেন না,' অন্তরঙ্গতার সুর শোনা যায় তাঁর কণ্ঠস্বরে, 'যে-কোন শুভ কাজেই নারী অনর্থের মূল।'

মনে মনে হাসলাম। ভদ্রলোক যদি জানতেন সেই নারী তাঁরই ভাইঝি, জানি না তিনি তাঁর মন্তব্যটা ফিরিয়ে নিতেন কিনা! 'আপনার বিজনেসের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই মিঃ ব্রেডি।' হিমার্ত গলায় কথাটা বলে আমি দরজার দিকে হেঁটে যাই, তারপর চলে আসতে গিয়ে ফিরে তাকাই, 'আমার ওপর পুলিশী নজর রেখে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন মিঃ ব্রেডি।' তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে বললাম, 'এমন কি হিটলারের ওপরে গেস্টাপো নজর রেখেও বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি।'

সূর্যের আলোয় চোখ দুটো আমার ঝলসে যাচ্ছিল, ভালো করে চোখের পাতাগুলো মেলে দিতে পারছিলাম না। রাস্তার বারে অস্কার বার চোখে পড়তেই গাড়ী থামালাম। বাইরে থেকে মনে হলো বারের ভেতরটা ঠাণ্ডা, অন্ধকার। এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে সময় কাটাতে ইচ্ছে হচ্ছিল। রেস্তোরাঁর সঙ্গে লাগোয়া ককটেল। বারে ঢুকে একটা চেয়ার দখল করে বসলাম। জায়গাটা কনস্টীলের লোকে ভর্তি। তাদের পোষাকে আঁটা ব্যাজগুলো পরিচয় করিয়ে দেয়, তারা কন স্টীলের লোক।

বারটেণ্ডার আমার সামনে এসে দাঁড়াতেই তাকে ফরমাস করি, 'বরফ মেশানো ডাবল ব্ল্যাক লেবেল পানীয়, সঙ্গে লেবুর রস।'

ম্যাট ব্রেডির ডেস্কের কাগজগুলো আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছিল। রিপোর্টটা যেই দিয়ে থাকুক না কেন, সে নিশ্চয়ই জানে এলেন এখন আমার সঙ্গিনী। সেটা ভালো লক্ষণ নয়। হয়তো ম্যাট ব্রেডি আমার কথা অগ্রাহ্য করতে পারেন, কিন্তু আমার সঙ্গে এলেনের মেলামেশাটা বরদাস্ত তিনি করতে পারবেন না কিছুতেই। অতএব এখন আমার প্রথম কাজ হবে কে এই রিপোর্টটা দিলো তার নাম জানা।

এলেনের কথা মনে পড়লো, নিশ্চয়ই ও এতোক্ষণ হোটেলে ফিরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সেদিন সকালে সেই ব্রেকফাস্টের ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো। আমি তখন ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ি। আমার বুকটা তখন ধকধক করছিল।

'সহজ হওয়ার চেষ্টা করো,' কেমন সহজ নিরুত্তাপ গলায় ও আমাকে অভয় দিয়ে বলেছিল, 'আমার কাকা রাক্ষস নন যে তোমাকে খেয়ে ফেলবেন। তিনি কেবল ব্যবসার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

জোর করে হাসার চেষ্টা করলাম। হয়তো ম্যাট ব্রেডি তাঁর ব্যবসার স্বার্থে এলেনের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করলেন, কিন্তু উনি তো জানে না, এলেনের সঙ্গে আমার কি গভীর সম্পর্ক!

পানীয়ে শেষ চুমুক দিতেই বারটেণ্ডার ছুটে এলো আমার খালি গ্লাস ভর্তি করার জন্য। ইচ্ছে হলো জানলা গলিয়ে গ্লাসটা উপুড় করে দিই। ঘড়ির দিকে তাকালাম, দুটো বাজে। এলেনের হোটেলে গিয়ে ওকে সব কথা খুলে বলার স্পৃহা এখন আর আমার নেই।

দ্বিতীয় রাউণ্ড গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখ তুলে তাকাতে গিয়ে বারের শেষ প্রান্তের আয়নায় আমার দৃষ্টি থমকে দাঁড়ালো। মনে হলো একটি সুন্দরী মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। হ্যাঁ, আমার অনুমানই ঠিক। আয়নায় মেয়েটিকে আবার হাস্যরতম অবস্থায় দেখা গেলো।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আমি ওর হাসির প্রত্যুত্তরে হাসলাম। চোখে ওর বিলোল কটাক্ষ, অঙ্গে নানান রঙ্গের ভঙ্গিমা, পায়ে পায়ে আমার টেবিলের সামনে এসে আমার গ্লাসটা তুলে নেয় ও এবং তেমনি পায়ে পায়ে নিজের টেবিলে ফিরে যায়। ম্যাট ব্রেডির সেক্রেটারি ও। এখানেও স্পাই লাগিয়েছেন ভদ্রলোক আমার পিছনে? জড়তা কাটিয়ে উঠে মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বস তোমাকে মধ্যাহ্নভোজের সময় বাইরে ছেড়ে দিলেন যে বড়?'

আমার খোঁচাটা বেমালুম হজম করে নিলো ও। 'মিঃ ব্রেডি প্রতিদিনই দেড়টার সময় অফিস থেকে চলে যান, আর ফেরেন না।' আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসে।

ওর চোখে কিসের আমন্ত্রণ? সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেবো কিনা ভাবতে ভাবতে কখন যে ওর চেয়ারের পাশে এসে বসেছিলাম খেয়াল নেই। নিজের কথা নিজের কানে কেমন অদ্ভুত শোনালো। 'ভালোই হলো তুমি এলে। একা একা ড্রিঙ্ক করতে ভালো লাগে না।'

ওর দু'ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক খেলে যায়। 'বাড়ি যাওয়ার আগে উনি তোমার হোটেলে ফোন করে একটা বার্তা রেখে গেছেন।'

'ওঁকে বলো তার কোন প্রয়োজন ছিলো না,' আমার কথায় প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়, 'আমি ওর ব্যবসায় অংশ নিতে চাই না।'

হাত তুলে পাল্টা প্রতিবাদ করে মেয়েটি বলে, 'পাগলের মতো আমার ওপর শুধু শুধু দোষারোপ করো না মিঃ রোয়ান,' মেয়েটি কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'আমি সেখানে কাজ করি পেটের দায়ে কেবল।'

মেয়েটি ঠিকই বলেছে। সত্যি আমি কি বোকা? ওর কি কি দোষ! আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিস—'

'ওয়ালেস,' প্রত্যুত্তরে ও বলে, 'সান্দ্রা ওয়ালেস।'

'মিস ওয়ালেস,' ভদ্রতার খাতিরে বললাম, 'তোমার জন্যে ড্রিঙ্কের ফরমাস দিই, কি বলো?' ওয়েটারের দিকে ইশারা করে প্রশ্ন চোখে তাকালাম ওর দিকে।

'ড্রাই মারটিনি,' মেয়েটি নিজের থেকেই ওয়েটারকে ওর পছন্দের কথা বলে আমার দিকে তাকালো। 'মিঃ ব্রেডির খুব পছন্দ আপনাকে।'

'ভালো, শুনে খুশি হলাম,' উত্তরে আমি ওকে শুধোই, 'কিন্তু আমি তো তাঁকে পছন্দ করি না।'

'উনি চান তুমি ওঁর সঙ্গে কাজ করো। তোমার সঙ্গে চুক্তি করার জন্যে আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শও করেছেন উনি।'

'তিনি কি তাঁর গুপ্তচরদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন?'

সান্দ্রা তার কোন কথার উত্তর দিলো না। ইতিমধ্যে ওয়েটার ড্রিঙ্কের গ্লাস রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি আমার গ্লাসটা টেনে নিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালাম। 'এই মুহূর্তে আমি তাঁর কাছ থেকে একটা কাজই নিয়েছি, তোমার ওপর নজর রাখার কাজ।'

হাসলো ও। 'তুমি ভীষণ জেদী।'

'জেদী! হ্যাঁ, জেদীই বটে! তবে এর জন্যে তাঁকে কোন পারিশ্রমিক দিতে হবে না।'

'ধন্যবাদ মিঃ রোয়ান,' সান্দ্রা ওর গ্লাসটা মুখের কাছে ঠেকাতে গিয়ে আরো কি যেন বলতে যায়, আমি তাকে হাতের ইশারায় থামতে বলি।

'আমার একটা নাম আছে, ব্রাড। কেউ আমাকে মিস্টার বলে সম্বোধন করলে আমি তার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিই। আমার তখন মনে হয়, বাবা যেন আমার সঙ্গে কথা বলছেন।'

'ঠিক আছে ব্র্যাড,' হাসলো ও, 'আজ হোক কিংবা কাল হোক, ওঁর কথা মতো কাজ তোমাকে করতেই হবে।'

'কেন, অফিস থেকে চলে আসার সময় তুমি শোনোনি, আমি তাঁর মুখের ওপর সাফ জবাব দিয়ে এসেছি, এ কাজ আমি নিচ্ছি না।'

ওর মুখে একটা অদ্ভুত ছায়া ঘনিয়ে আসে, দেখে মনে হয় যেন এ কথাটা অনেকবার শুনেছে আমার মুখ থেকে। উনি তোমাকে ওঁর কাজে ঠিক লাগাবেনই।' শান্ত গলায় ও বলে, 'তুমি তো ওঁকে চেনো না। ম্যাট ব্রেডি যখন যা চান ঠিক পেয়ে যান, ওঁর অপূর্ণ বলে কিছু থাকে না।'

চকিতে আমার মনে হলো ম্যাট ব্রেডির বিরুদ্ধে সান্দ্রার কোন অনুযোগ আছে বোধহয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি ওঁকে পছন্দ করো না?

খাদের নিচ থেকে কথা বলার মতো করে ও বলে, 'আমি ওকে ঘৃণা করি।'

'তাহলে এখনো তুমি ওঁর সঙ্গে কাজ করছে কেন? আরো কতো কাজ তো আছে তোমার জন্যে?'

'কেন আছি জানো?' সান্দ্রার কণ্ঠস্বর কেমন করুণ শোনায়। 'আমার যখন বছর এগারো বয়স আমার বাবা ফাউণ্ড্রিতে নিহত হন। তখনি আমি জেনে যাই, আমি ওঁর সেক্রেটারি হতে যাচ্ছি।'

আমার কেমন কৌতূহল হলো, 'কেন, কেন তোমার একথা মনে হলো?'

'আমার মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে যান। বয়সের তুলনায় আমার শরীরের গড়ন তখন অনেক বড় ছিলো। ম্যাট ব্রেডির চোখে লোলুপ দৃষ্টি আমি দেখেছিলাম। সেই অল্প বয়সেও ওঁর চোখের ভাষা পড়তে আমার কোন অসুবিধে হয়নি। আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার মনে আছে, উঃ কি ঠাণ্ডা ওঁর হাতের আঙ্গুলগুলো। আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে তিনি আমার মাকে বলেছিলেন, কোন চিন্তা করবেন না মিসেস ওলেনকিউইজ, আপনাদের সব খরচের ভার আমি নিলাম। আপনার মেয়ে আলেকজেণ্ডার বড় হলে আমার অফিসে কাজ করবে, সম্ভবত আমার সেক্রেটারি হয়ে। তারপর থেকে ছলছুতো করে উনি মাকে ডেকে পাঠাতেন। উনি জানতেন মা'র সঙ্গে আমি যাবো। সেই সুযোগে উনি দেখে নিতেন আমি কতো বড় হয়েছি আর ওঁর উপভোগের উপযুক্ত হয়ে উঠেছি কিনা।' মারটিনির গ্লাসে চুমুক দিয়ে সান্দ্রা বলে ওর গলার স্বর কেমন ভারি ভারি শোনায়। 'আমি ওঁকে ছেড়ে এলে উনি আমাকে অন্য কোন কাজ পাওয়ার সুযোগ দেবেন না।'

'তার মানে উনি কি তোমাকে ওঁর রক্ষিতা হিসেবে রেখে দিতে চান?'

'না,' মাথা ঝাঁকিয়ে সান্দ্রা বলে, 'যদিও অনেকের এরকমই ধারণা কিন্তু আমার মনে হয় সেরকম কোন মতলব ওঁর নেই।' কথা শেষ করে সান্দ্রা আমার মুখের দিকে তাকালো, ওর চোখ দেখে মনে হলো, ও আমার মনোভাব জানতে ভীষণ আগ্রহী।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে আমি বললাম, 'তোমার কি মনে হয় উনি তোমার ওপর নজর রাখছেন?'

'জানি না'। সান্দ্রা বলে, 'এক এক সময় মনে হয় উনি বোধহয় আমার ওপর নজর রাখছেন, আবার কখনো মনে হয়, আমার ধারণা ভুল। তবে এ কথা ঠিক যে, কাউকেই উনি বিশ্বাস করেন না।'

এই মুহূর্তে কেন জানি না আমার মনে হলো, এই মেয়েটিকে বিশ্বাস করা যায়। 'আচ্ছা সান্দ্রা, আমার সম্পর্কে যে রিপোর্টটা উনি পেয়েছেন, দেখেছো তুমি?'

মাথা নেড়ে ও বলে, 'আসলে রিপোর্টটা একটা সীল করা খামে এসেছিলো ইনভেষ্টিগেসন অফিস থেকে, তাই আমার দেখার কোন সুযোগ হয়নি।'

'রিপোর্টের একটা কপি পাওয়ার কোন উপায় আছে?'

'একটাই কপি এবং সেটা ওঁর ডেস্কের মধ্যে থাকে।'

'ওটা একবার দেখার ব্যবস্থা করে দিতে পারো?' আমি ওকে অনুরোধ করে বলি, 'ওটা আমার দেখা একান্ত প্রয়োজন। মনে হয় ঐ রিপোর্টে এমন কিছু লেখা আছে যার অর্থ আমাকে হয়তো ঝামেলায় পড়তে হবে।'

'তাতে কোন লাভ হবে না ব্র্যাড,' সান্দ্রা বলে, 'তেমন কিছু থাকলে ভোলার পাত্র উনি নন।'

'কিন্তু উনি আমার সম্পর্কে কি জানলেন, সেটা জানার সুযোগ তো আমি পাবো!'

কোন কথা বললো না ও। মনে হলো, আমাকে বলার জন্যে ও বোধহয় ভয় পেয়েছে। হাজার হোক ও তো আমাকে ভালোরকম চেনে না, ও শুধু জানে, আমি হয়তো ম্যাট ব্রেডির গুপ্তচর।

'উপকারের বিনিময়ে উপকার।' তাড়াতাড়ি বললাম, 'তুমি আমাকে সাহায্য করো, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি আমাকে ঐ রিপোর্টটা দেখার সুযোগ করে দিলে আমি তোমাকে ম্যাট ব্রেডির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দেবো যার হদিশ উনি কোন দিনও পেতে পারেন না।'

বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় সান্দ্রা। হঠাৎ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হলাম। ও তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ঙ্কর আহ্বান ছড়িয়ে আছে ওর সারা দেহ ঘিরে। ওর যৌবনোচ্ছল শরীরের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পড়েছে দেওয়ালের আয়নায়। পাতলা বহির্বাসের আড়ালে নিটোল ভরাট দুটি স্তনাবাস। সেই মুহূর্তে ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো, ও বোধহয় পোষাকের খোলস ছেড়ে ওর নগ্ন দেহটা আমার চোখের সামনে মেলে দিতে প্রস্তুত। আমি যে ওকে অবাক চোখে দেখছি, ওর মনের কথা আমি টের পেয়ে গেছি সে কথাটা এখন আর আর অজানা নয় ওর। একটা অদ্ভুত হাসি ওর দু'ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে যায়।

'কিন্তু আমি তো সেখানে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাই না। আমি জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই।'

আমি ওর চোখে চোখ রেখে বলি, 'তোমার ইচ্ছের সঙ্গে আমার ইচ্ছেটা মিলিয়ে দেওয়ার সে সৌভাগ্য আমার নেই।'

'কেন নেই? এ কথা কেনই বা তোমার মনে হলো?' দ্রুত স্বরে সান্দ্রা বলে, 'এ সব ব্যাপারে ভাগ্যের দোহাই দেওয়া বোকামো, ভাগ্য নিজের হাতে, তোমার সৌভাগ্য তোমাকে নিজেকে করে নিতে হবে। সৌভাগ্য তোমার হাতের মুঠোয়।' সান্দ্রা আমার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে চাপ দেয়। সান্দ্রা আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। ওর বুকের উত্তাপ আমার কাঁধ ছুঁয়ে যায়। আশ্চর্য এক উত্তেজনায় মুহূর্তে এলেনের মুখটা মনে পড়ে যেতেই আমি ওর স্পর্শ সীমা থেকে নিজেকে দূরে ঠেলে দিই। বেশ বুঝতে পারি অভিমানে আহত পাখীর মতো ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ নামিয়ে নেয় ওর কল্পনার রঙিন বেলুনটা ফেটে যাওয়ার আশঙ্কায়।

❑ দশম অধ্যায় ❑

বড় লোহার গেটটা পেরিয়ে অফিস বিল্ডিং-এর প্রবেশ পথের দিকে বাঁক নিলাম। সান্দ্রার হিমার্ত হাতটা আমার হাত স্পর্শ করলো সেই মুহূর্তে। আশ্চর্য নম্র এবং দ্রুত স্বরে ও বলে, 'এই পথে—'

বিল্ডিং-এর একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওকে আমি অনুসরণ করলাম' চোরা দরজার সামনে এসে ও থামলো। হাত-ব্যাগ থেকে চাবি বার করে দরজা খুললো সান্দ্রা। 'ম্যাট ব্রেডির গোপন প্রবেশ পথ।' সান্দ্রা শুধোয়।

দরজার ওপারে করিডোর। কয়েক পা এগিয়ে আমরা একটা এলিভেটরের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বোতাম টিপতেই এলিভেটরের দরজা খুলে গেলো। সান্দ্রা মৃদু হেসে আমাকে আহ্বান করলো, 'এসো!' একটু পরেই অনুভব করলাম, এলিভেটরটা ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। ম্যাট ব্রেডির ব্যক্তিগত এলিভেটর। ওর ঠোঁটে সেই হাসির রেশ তখনো লেগেছিল।

ওর সেই আহ্বান আমি ফিরিয়ে দিতে পারলাম না, কেন জানি না। সেই মুহূর্তে এলিভেটরে ওকে একা পেয়ে আমি কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, আমার রক্তের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় এক অদ্ভুত উত্তাপ আমি অনুভব করলাম সেই মুহূর্তে। ওকে আমি আমার কাছে টেনে নিলাম। বড় বড় চোখ করে দুহাত দিয়ে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। ও বোধহয় এতোক্ষণ এই অন্তরঙ্গ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছিল।

এই প্রথম আমি ওকে এতো কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। ঝকঝকে মসৃণ ত্বক, টোল পড়া চিবুকে সুন্দর একটা ভাঁজ, অত্যন্ত সজীব আকর্ষণীয় মুখ। নিটোল পরিপূর্ণ দুটো স্তন, সরু কোমর, তারপরেই হঠাৎ ঢল-ভেঙ্গে-নামা ভারি নিতম্ব, সবচেয়ে সুন্দর ক্রমশ ঢালু হয়ে আসা ওর দীর্ঘ সরল কমনীয় জঙ্ঘা। আমার ঠোঁটের গভীরে সান্দ্রা ওর নিজের ঠোঁট দুটো হারিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলো যেন। ঠোঁটদুটো আমার মুখের ওপর চেপে ধরে ও জিভটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। এবার আমি মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলাম সান্দ্রার আহ্বানে মুখ ফিরিয়ে আর থাকবো না। প্রদীপ্ত কামনায় ওকে আমি নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলাম বুকের মধ্যে। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম সান্দ্রার কোমল আঙ্গুলগুলো আমার মুখের ওপর খেলা করছে, আর আমার দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, একটু একটু করে আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি, হারিয়ে ফেলছি নিজেকে। হঠাৎ আমার মনে হলে, সান্দ্রা যেন আমাকে এলেনের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে চাইছে। কথাটা মনে হতেই সান্দ্রার ওপর আমার ভীষণ রাগ হলো, দ্রুত ওর ঠোঁটের ওপর থেকে আমার ঠোঁটটা সরিয়ে নিলাম। আমার অনুমানই ঠিক। সান্দ্রা আমাকে জয় করতে চায়। জয়ের নেশায় মেতে উঠেছে ও তখন। এলিভেটরের দরজা খুলে যাওয়ার পরেও দু'বাহু দিয়ে ও আমার গলা জড়িয়ে থাকে।

'এবার ছাড়ো,' আমি ওকে তাড়া দিতে সম্বিৎ ফিরে পেলো। ধীরে ধীরে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার গলার ওপর থেকে ও ওর হাত দুটো গুটিয়ে নিলো। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না। মিনতির মতো করুণ হয়ে গেছে ওর চোখের চাহনি। আমি

যতোই ওর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে থাকি না কেন, এই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, ওর সঙ্গে নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করতে গিয়ে বুকের মধ্যে একটা ক্ষীণ বেদনা আমার একান্ত দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়ে বসেছে।

ওর সেই হাসিটা এখন আর নেই, সে জায়গায় এক করুণ আকুতি ওর চোখের তারায় ভাষা পায়।

'আমি যে তোমাকে ভীষণ পছন্দ করি ব্র্যাড।'

ওকে আমি এখন চটাতে চাই না। মুখে একটা কৃত্রিম হাসি টেনে ওকে দোটানায় ফেলে দিলাম। অতি সন্তর্পণে অভিনয় করে যেতে হবে ওর সঙ্গে। আমার সম্পর্কে পাওয়া রিপোর্টটা ম্যাট ব্রেডির ডেস্ক থেকে টেনে বার করতে হবে, সেজন্যে সান্দ্রার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। এসব কথা ভেবেই এলিভেটর থেকে বেরিয়ে আসার আগে ওকে কাছে টেনে নিয়ে আমি এবার নিজের থেকে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম।

তারপর সান্দ্রার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে গিয়ে বাধা পেলাম ওর কাছ থেকে। সূর্যমুখী ফুলের মতো মুখটা ও তুলে ধরলো আমার ঝুঁকে পড়া মুখের কাছে। ও এবার নিজের থেকে আমাকে চুমু খেলো, ওর চুমু খাওয়ার ধরণটা অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা যেন। উষ্ণ আর নিবিড়, কোমল অথচ বলিষ্ঠ। মিষ্টি একটা আমেজে সমুদ্র-ঝিনুকের মতো মুদে এলো ওর দু'চোখের পাতা। মনে হলো কবোষ্ণ একটা স্রোতে ও যেন অলস ভঙ্গিমায় ভেসে চলেছে আর রক্তের কল্লোলে শোনা যাচ্ছে রিনি রিনি ধ্বনি। অন্য মেয়েদের বেলায় এতোদিন আমার যা ছিলো কৌতূহল, এ যেন সে খেলা নয়। এ যেন পরম পাওয়া, ওর একান্ত মনের আগল খুলে ওর হৃদয়ে প্রবেশ করা।

তেমনি জড়ানো অবস্থায় ফিসফিসিয়ে সান্দ্রা বলে, 'তুমিই আমার একমাত্র মনের মানুষ হওয়ার উপযুক্ত ব্র্যাড। তোমাকে প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকেই এই পরম সত্যটা আমি মনে মনে কামনা করে এসেছি, এখন অনুভবে সেই সত্যটা হৃদয় দিয়ে, তোমার সান্নিধ্যে এসে উপলব্ধি করলাম। বিশ্বাস করো ব্র্যাড, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন কখনোই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।'

আমি কোন কথা বললাম না।

'তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে ব্র্যাড?' আমার চোখের ওপর ওর দৃষ্টি তখনো স্থির নিবদ্ধ। ওর বড় বড় হয়ে ওঠা হালকা বাদামী রঙের স্বচ্ছ চোখের মণির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওর চোখ দুটো ঠিক যেন কথা কইছে, কিন্তু কি ও বলছে তা আমি বুঝতে পারলাম না। কিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করলাম 'কেন?'

আমার প্রশ্নের কোন ব্যাখ্যা না করেই ও ঘুরে দাঁড়িয়ে এলিভেটর থেকে নেমে দাঁড়ালো। আমি ওকে অনুসরণ করলাম ম্যাট ব্রেডির প্রাইভেট অফিসে। অতঃপর ম্যাট ব্রেডির ডেস্কের সামনে গিয়ে সান্দ্রা ওর হাত-ব্যাগ থেকে একটা চাবি বার করলো। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ডেস্কটা শেষ পর্যন্ত ও খুলেই ফেললো। এবং পর মুহূর্তে সেই রিপোর্টটা টেনে বার করলো। আমি কি বোকা? রিপোর্টটা তখনো ওর হাতের মুঠোয়।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে ওর দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলাম। কয়েক সেকেণ্ড

পরেই রিপোর্টটা না দেখেই আমার হাতে তুলে দিলো ও। আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা তুমি একবার পড়েও দেখলে না?'

'না,' দরজার সামনে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো সান্দ্রা। নম্র ও দ্রুত স্বরে ও বলে, 'আমি জানি, তুমি বিবাহিত। আমার মনে হয় না রিপোর্টে সত্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তবু তোমার সঙ্গে যদি কোন মেয়ের নাম জড়িয়ে কিছু লেখাও থাকে, তার নাম জানার জন্য আমার কোন আগ্রহ নেই।'

ম্যাট ব্রেডির অফিস ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে গেলো ও। অতঃপর ধীরে ধীরে রিপোর্টের পাতাগুলো ওল্টাতে থাকি। আমার সতর্ক দৃষ্টি পড়ে প্রতিটি লাইনের ওপর। না, আমার কোন চিন্তার কারণ নেই। কেবল লেখা আছে আমার সুটে আমি একটি মহিলার সঙ্গে রাত কাটিয়েছি কিছুক্ষণ। রিপোর্টে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী অনুসন্ধান কাজ চালানোর কোন প্রয়োজন নেই। কাগজগুলো ব্রেডির ডেস্কের ওপর রেখে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার ভাবনার আকাশ থেকে মেঘগুলো কেটে গেছে।

একটু পরে সান্দ্রা দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলো, 'সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, পড়লাম,' নিজেকে খুব বোকা বলে মনে হলো, এতো ভাবনার কোন কারণ ছিলো না। সান্দ্রার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বললাম, 'তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো।'

সান্দ্রা উত্তর দিলো না।

এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বললাম, 'মনে হয় এবার আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।'

'এখন তুমি যেতে পারো না,' বাধা দিলো সান্দ্রা, 'তোমাকেওরা দেখতে পাবে। কন্ট্রোল প্যানেলে এলিভেটরের সিগন্যাল দেখতে পেয়ে ওরা ছুটে আসবে।'

থমকে দাঁড়ালাম। 'তাহলে এখান থেকে পালানোর উপায়?'

ওর ঠোঁটে কৌতূহলের হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। পাঁচটা পনেরো নাগাদ অফিস ছেড়ে যাই আমি। তখন অফিস প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। তখন তোমাকে লক্ষ্য করার মতো কেউ থাকবে না।'

কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম, প্রায় চারটে বাজে। তখনো আমার দিকে তাকিয়েছিল ও, ওর ঠোঁটে সেই হাসিটা তখনো লেগেছিল। 'বসো, আমি তোমার জন্যে ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করছি।'

একটু পড়ে ও ফিরে আসে। হাতে দুটো হুইস্কির গ্লাস, বরফ উপচে পড়ছিল। আমার ঠিক বিপরীতে একটা চেয়ারে বসলো সান্দ্রা।

'তা এখন তুমি কি করবে, কিছু ভেবেছো ব্র্যাড?' সান্দ্রা প্রশ্ন করে আমার দিকে তাকায়।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে প্রত্যুত্তরে বললাম, 'নিউইয়র্কে ফিরে যাওয়া, আর সব কিছু ভুলে যাওয়া ছাড়া আর কি ভাবতে পারি বলো?'

'অতো সহজে কি ম্যাট ব্রেডি তোমাকে রেহাই দেবে?' সান্দ্রা পাল্টা প্রশ্ন করে তাকায়, 'ম্যাট তোমাকে চায়।'

আমি হাসলাম।

'হেসো না,' একান্ত আপনজনের মতো ও আমাকে ধমক্ দেয়, বেশ গম্ভীর স্বরে বলে, 'ফিরে গিয়ে দেখবে তোমার জন্যে একটা মেসেজ অপেক্ষা করছে, ম্যাট তোমাকে তার বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় ডিনার খেতে আহ্বান করেছেন।'

'কিন্তু আমি যাবো না।'

'তোমাকে যেতেই হবে,' সান্দ্রা বিজ্ঞের মতো বলে, 'হোটেলে ফিরে গিয়ে তোমার মনের সব দৃঢ়তা ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়বে। তখন তোমার মনে হবে, টাকাই সব কিছু। মোটা টাকার প্রলোভন সামলাতে পারবে না তুমি। দুনিয়াটা কার বশ জানো? টাকার বশ। টাকার কাছে আদর্শ, ইজ্জত ওসব ফাঁকা আওয়াজ বলে মনে হবে তখন তোমার।' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ও বলে, 'তখন তুমি আর সে তুমি থাকবে না। যন্ত্রচালকের মতো এক পা এক পা করে গিয়ে হাজির হবে ম্যাট ব্রেডির ডিনার টেবিলে।'

'আমার উত্তর তো তুমি পেয়েই গেছো আগে,' কথাটা বলে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম, ওর মনের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে।

আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সান্দ্রা হলে, 'পেয়েছি, কিন্তু বুঝিনি। এরকম আগেও অনেক ঘটতে দেখেছি। টাকার মোহ থেকে কেউ দূরে সরে থাকতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। তুমিও পারবে না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ম্যাট তোমার মত বদলাবার চেষ্টা করে যাবে।'

কফির টেবিলে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'এ কথা তুমি আমাকে বলছো কেন? এর মধ্যে তোমার কি স্বার্থ আছে?'

আমার গ্লাসের পাশে ও ওর গ্লাসটা রেখে বললো, 'অনেক বড় বড় নামী দামী ভদ্রলোককে আমি দেখেছি ম্যাটকে ভয় পেতে। তাদের সেই ভয়ার্ত চোখ দেখে দেখে আমি ক্লান্ত ব্র্যাড।' কথা বলতে গিয়ে ওর কণ্ঠস্বর কেমন কাঁপছিল, ওর চোখের মণিতে আমার মুখের ছায়া পড়ে।

'তাহলে?' নরম গলায় বললাম।

'আমার চোখে তুমি একজন বিরাট পুরুষ ব্র্যাড, তোমার ক্ষমতা আছে, সাহস আছে, তোমার মধ্যে ভয়ের কোন চিহ্ন আমি দেখতে পাই না। তুমি এমন কিছু ভীতু নও যে আমাকে দেখতে পাও না। তোমার চোখে আমি একটা আসবাবপত্রের মতো জড়পদার্থ মাত্র। আমি লক্ষ্য করেছি আমাকে তুমি ঠিক এভাবেই দেখে থাকো।'

'বেশ তো কি চোখে তোমাকে দেখবো বলো?'

উঠে দাঁড়িয়ে ও আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি ওর প্রতিটি চালচলন লক্ষ্য করছিলাম নির্নিমেষ নয়নে। ওকে যতো দেখছি ততোই যেন অবাক হচ্ছি। অবাক হয়ে ভাবি, কি চায় ও আমার কাছ থেকে?

এক সময় ও ওর মনের কথা ব্যক্ত করে বলে, 'এখন তুমি আমাকে যে চোখে দেখছো!'

নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে আমি বসে থাকলাম।

সেই আশ্চর্য সুন্দর হাসিটা আবার ওর দুটো ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। 'আমি জানি, তুমি আমার জন্য নও,' করুণ স্বরে ও বলে, 'আর আমি এও জানি, অন্য

আর একটি মেয়ে তোমার হৃদয় জুড়ে বসে আছে, সে কথা তুমিও বেশ ভালো করে জানো। তুমি যখন আমাকে প্রথম চুমু খেলে, এই সত্যটা আমি নির্মমভাবে উপলব্ধি করলাম। তবে তাতে কিছু এসে যায় না।'

এখানে সান্দ্রা একটু থেমে আবার অভিযোগ করতে থাকে, 'তোমার কাছে আমি ম্যাট ব্রেডির সেক্রেটারি নই, কিংবা তার অফিসের কোন আসবাবপত্রও নই, আসলে আমি মানুষ। সর্বোপরি আমি একজন নারী, আমার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, সব নারীরই যা থাকে। ঠিক এভাবেই কি তুমি আমাকে দেখে থাকো?'

আমি কোন প্রতিবাদ করলাম না। আমার মাথায় তখন কেবল একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, এই পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আমরা কেউ যন্ত্র নই। কেউ কারোর থেকে কম কিছু নয়, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে নিজেকে অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে থাকে।

হুইস্কির গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াতে গেলে ও আমার হাতে হাত রেখে বাধা দেয়। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাই, আমার চোখ দুটো ওর দুটো চোখের সঙ্গে মিলিত হলো, ওর সমুদ্র-ঝিনুকের মতো অতল ম্লান চোখ দুটো আরও দীর্ঘায়িত হয়ে উঠলো।

আমার বুকের ভেতরে কে যেন তখন অনবরত হাতুড়ি পিটে যাচ্ছিল। আমার নাড়ীর গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠলো। জানি না কেন এমন হলো। সুন্দরী যুবতীর কাছ থেকে পুরুষরা যা আশা করে থাকে, ওর মধ্যে সব কিছু বর্তমান, অভাব কেবল ভালোবাসার। আমি ওর জন্য নই।

অতি সন্তর্পণে ওর হাত থেকে আমার হাতটা সরিয়ে নিলাম। কেন জানিনা ওকে আমার হৃদয় দিতে আমার মন চাইলো না। কি বলতে হবে, সে কথাও আমার জানা ছিলো না তখন।

'অন্য আর একজন নারী তোমার মনের চারপাশে এখন বিচরণ করছে, তাই না ব্র্যাড?'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে দাঁড়ালো সান্দ্রা। ওর ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম। 'তোমার এই সততা, সহজ সরল স্বীকারোক্তির জন্য আমি তোমার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। ঠকাবার মনোভাব নিয়ে কাউকে তুমি ঠকাতে চাও না।'

একরকম টলতে টলতে পাশের ঘরে চলে গেলো সান্দ্রা। একটু পরেই টাইপরাইটারে ঝড় তোলার শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। অলস ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে আমি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ম্যাট ব্রেডির ব্যক্তিগত অফিসের জানলার ফ্রেমে তার বিরাট ফাউণ্ড্রির ছবি ধরা দিলো আমার চোখের তারায়। সত্যি গর্ব করার মত ফাউণ্ড্রি। হাজার হাজার কর্মচারীর কর্ম ব্যস্ততা দেখে আমার মনে হলো, আমার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হতো, আমিও এমনি একটা ফাউণ্ড্রির মালিক হতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়, মিঃ ব্রেডি ঠিকই বলেছিলেন, ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের মতো দুর্ভাগা লোকেদের গলায় জয়মালা দিতে চান না।

এক সময় পেটা ঘড়িতে ছুটির ঘণ্টা ধ্বনিত হতে শোনা যায়। একটু পরে সান্দ্রা

ঘরে ঢুকে শুধোয়, 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা অফিস ছেড়ে যেতে পারি, আর কোন বাধা নেই এখন।'

গোধূলিবেলার গাঢ় আরক্তিম একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। গনগনে আগুনের শিখার মতো লাল বিশাল সূর্যটা প্রায়ান্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে। যেমন সকালের রোদ্দুরের মিষ্টি আলোয় ম্যাট ব্রেডির ষাট হাজার ডলারের প্রলোভনটা আমি এক প্রচণ্ড সংগ্রাম করে জয় করেছিলাম। আশ্চর্য এক মনের দৃঢ়তা তখন আমি হঠাৎ পেয়ে যাই যেন। গর্বে আমার বুক ভরে যায়। আমার সেই গর্বের কথাটা এলেনকে বলার জন্যে দ্রুত ছুটে এলাম হোটেলে। তখন ছ'টা পনেরো।

আমার সুটের দরজা খুলেই মৃদু চিৎকার করে ডাকলাম, 'এলেন!'

কোনো সাড়া নেই। নিস্তব্ধ ঘর। আমার ডাকটা প্রতিধ্বনিত হয়ে আছড়ে পড়ে ঘরের চার দেওয়ালে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমার গর্ব, আমার সব আনন্দ নিমেষে বিলীন হয়ে গেলো আমার মন থেকে। তার বদলে হঠাৎ একটা আশঙ্কা আমার মনের অগোচরে কখন যে স্থান করে নিয়েছিল বুঝতে পারিনি। না, না এ হতে পারে না। ও কখনো আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যেতে পারে না। না, ও পারে না!

আমার আশঙ্কাটা বোধহয় সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত। টেবিলের ওপর ঐ কাগজের চিরকূটটা কিসের? দ্রুত টেবিলের ওপর থেকে ভাঁজ করা চিরকূটটা হাতে তুলে নিলাম। কাঁপা হাতে চিরকূটের ভাঁজটা খুলতে থাকি।

অপরাহ্ন সাড়ে চারটা

"প্রিয়তম,

একা একা একটি মেয়ে এর বেশি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে বলো? ঘিউটি পারলারে চললাম অবসর কাটাতে। সাড়ে ছ'টা নাগাদ আবার ফিরে আসছি।

তোমার জন্য ভালোবাসা রইলো,

এলেন।"

চিরকূটটা টেবিলের ওপর রেখে এগিয়ে গিয়ে গ্রাহকযন্ত্রটা হাতে তুলে অফিসে ফোন করলাম।

দূরাভাষে ক্রাইসের উত্তেজনাময় কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। 'কি করলে ব্র্যাড?'

'খুব একটা ভালো নয়,' উত্তরে বলি, 'ব্রেডি চায় আমার সবকিছু বিকিয়ে দিয়ে তার হাতে হাত মেলাই।'

'কতো পারিশ্রমিক?'

'বছরে ষাট হাজার।' সঙ্গে সঙ্গে আমি শিষ দিয়ে উঠলাম। 'উনি আমাকে পছন্দ করেন, বুঝলে ক্রাইস!'

'তা কবে থেকে তুমি কাজ শুরু করছো?' ক্রাইসের কথা শুনে মনে হয় সে খুব খুশি হয়েছে খবরটা শুনে।

'করছি না,' আমি তার খুশির বেলুনটা ফাটিয়ে দিলাম, 'আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।'

'তুমি পাগল,' ক্রুদ্ধ হয়ে সে বলে, 'এতো টাকার অফার কেউ হাতছাড়া করে নাকি? সত্যি ব্র্যাড, তুমি পাগল হয়ে গেছো—'

'বেশ তো, কর্নেল ক্লিনিকে একটা ঘর আমার জন্যে বন্দোবস্ত করে রাখো।' হাসতে হাসতে বললাম, 'পাগলদের ওটাই তো উপযুক্ত জায়গা এখন।'

'কিন্তু ব্র্যাড।' সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিবাদ করে উঠলো, 'তুমি তো এ ধরণেরই একটা সেট-আপ চাইছিলে। চাকরীটা তুমি নিতে পারো, তোমার এখানকার স্বার্থ তুমি অনায়াসে অবসর সময়ে দেখতে পারবে। তাছাড়া আমি তো এখানে রইলাম, চিন্তা কিসের?'

ক্রাইসের উপদেশ আমার ভালো লাগলো না। হঠাৎ যে ভাবে সে আমার বিজনেস পার্টনার হয়েছে সেটা আমার ঠিক মনপুতঃ নয়। 'ম্যাট ব্রেডিকে আমি বলে দিয়েছি, আমার চাকরীর দরকার নেই।' হিমার্ত গলায় বললাম, 'আমি এখনো তোমার বস। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য হলো, আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রীর হিসাব-নিকাশ শেষ করা।'

'ঠিক আছে ব্র্যাড। তা কবে তুমি ফিরছো?'

'আগামীকাল। আজ রাত্রে ম্যাট ব্রেডির সঙ্গে আর একবার দেখা করতে হবে।'

'তাহলে মারজাকে ফোন করে তোমার প্রোগ্রামের কথা জানিয়ে দেবো?'

'দরকার নেই, আমি নিজেই ওকে ফোন করবো। কাল দেখা হচ্ছে।'

ক্রাইসের সঙ্গে কথা শেষ করে অপারেটরকে বাড়ির ফোন নম্বর দিলাম। মারজার লাইন পাওয়ার আগে গ্লাসে হুইস্কি ঢাললাম। গলাটা ভীষণ শুকিয়ে গিয়েছিল।

'হ্যালো সোনামণি,' গ্রাহকযন্ত্রে মুখ ঠেকিয়ে বলি, 'আমি তোমার—'

ওর কণ্ঠস্বরে খুশির আমেজ ঝরে, 'ব্রাড, উঃ কতোক্ষণ যে তোমার মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনতে পাইনি। কিন্তু তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে, তুমি খুব ক্লান্ত।'

আমি কেবল দুটি কথাই বলবো, তাতেই ও বুঝে যাবে, বারবার আমি কিরকম আঘাত পাচ্ছি। 'আমি ভালোই আছি। কিন্তু ঐ ব্রেডি লোকটার ব্যবহার খুব খারাপ।'

'তুমি কি সারাক্ষণ ওঁর অফিসেই ছিলে?'

মারজার কথা শুনে খুশি হলাম। যাক তাহলে ব্যাপারটা ও এভাবেই নিয়েছে। অতএব মিথ্যে বানিয়ে আমাকে বলতে হবে না। 'ও হ্যাঁ', দ্রুত এবং খুব সন্তর্পণে উত্তর দিলাম, 'উনি আমাকে একটা চাকরী দেবেন বলেছেন। বছরে ষাট হাজার ডলার।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, প্রস্তাবটা তোমার মনপুতঃ হয়নি।' কোন রকম দ্বিধা না করেই কথাটা ও বললো।

'আমার তো তাই মনে হয়,' প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'এর অর্থ দাঁড়ায় বিজ্ঞাপন এজেন্সির জগত থেকে আমার চিরতরে বিদায় নেওয়া। তাই ঠিক করেছি, আজ রাতটা কাটাতে পারলে এখানে আর নয়। তবে,' একটু থেমে তাড়াতাড়ি আবার বলি, 'আজ রাতে ওঁর বাড়িতে নৈশভোজ সারতে যাচ্ছি।'

'তুমি যাই করো না কেন, আমার সবেতেই সম্মতি আছে।'

আমার প্রতি ওর এমন অগাধ বিশ্বাস জেনে খুশি হওয়ার চেয়ে একটা চাপা বেদনা অনুভব করলাম মনে মনে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টাতে বললাম, 'জেনি কেমন আছে মারজা?'

'চমৎকার,' মারজা বলে, 'কিন্তু ওর অভিনয়টা ভীষণ রহস্যজনক। ও আমাদের বিবাহ বার্ষিকীর ব্যাপারে একটা চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলতে গিয়েও চেপে গেলো। ও কি ভাবে বলো তো?

'বড় হচ্ছে, ওরও তো কোন ইচ্ছে হতে পারে—'

'তাই বলে বাপ-মা'র বিয়ের ব্যাপারে?'

'ছেলেমেয়ে বড় হলে তারা বাবা-মা'র বন্ধুর মতো হয়ে যায়, এই সহজ কথাটা কেন তুমি বুঝতে পারছো না মারজা? যাই হোক, কোন চিন্তা করো না সোনামণি। কাল আমরা আবার দুজনে মিলিত হচ্ছি।'

'ঠিক আছে ব্র্যাড', গলার স্বর কেমন ভারি ভারি শোনায়। 'আজ তোমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো।'

'সোনামণি, তোমাকে আজ দেখতে না পেয়ে আমিও কি কম দুঃখিত, তবে কাল দেখা হলে সুদে-আসলে সব পুষিয়ে দেবো। বাই—'

ফোনটা রেখে স্কচের গ্লাসে বরফের টুকরো মিশিয়ে কৌচে পা তুলে দিয়ে আরাম করে চুমুক দিলাম। আশ্চর্য এক অনুভূতি আমার মনের দুয়ারে তখন বারবার উঁকি দিচ্ছিলো। হঠাৎ মনে হলো আমি যেন আর আমাতে নেই। কেন, কি বৃত্তান্ত এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন নয় বলেই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে রাখলাম। মনে হয় ম্যাট ব্রেডির সেক্রেটারির কথাই ঠিক। একটি ভালো ঘর, একটি নারীর ভালোবাসা, এই নিয়েই আমার মনে প্রসারতা, লুকোচুরি খেলা, সবকিছু, সেখানে অন্য কোন নারীর স্থান হতে পারে না। বেচারী সান্ড্রা, অনেক আশা নিয়ে ও আমাকে একান্ত নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, কিংবা আমার মনে একাগ্রতা সে যাই হোক, ও আমাকে সেই একাগ্রতা থেকে এক চুলও নড়াতে পারেনি।

কার উদ্দেশ্যে আমার মনের সেই একাগ্রতা? সে কি তবে এলেনের জন্যে? এলেন। সে এক আশ্চর্য সুন্দর নাম, এখন আমার মনে রিনরিন করে বাজছে। ওর নামটা আমার মনে হতেই অজান্তে আমার ঠোঁটের কোণায় হাসি ফুটে উঠলো, ওর কথা ভাবতে বসলাম। মনে হয় একমাত্র এলেনই বোধহয় পুরুষের আদর্শ নারী। ওর মধ্যে কোন অভাব নেই, নেই কোন খুঁত। ওর মুখ, ওর দীর্ঘায়ত চোখ জোড়া, ওর অনিন্দ্যসুন্দর ছোটখাটো টানটান শরীর এবং সুন্দর ছাঁদে কথা বলার ভঙ্গিমা, সবকিছুই যেন এক আশ্চর্য মহিমায় মণ্ডিত, ওর চলার ছন্দে নৃত্যের কলতান সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মতো। এক কথায় ও অনন্যা, অতুলনীয়া। আর একবার গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমি চোখ বন্ধ করলাম। চোখ বন্ধ করলে আমি যেন ওর সেই সুন্দর মুখখানি দেখতে পাই, আমি ওকে কাছে পাই স্বপ্নের আবেশে অলস ভঙ্গিমায়।

স্বপ্নে সেই ছোট্ট মেয়েটি হয়ে এলো ও আমার কাছে, সাটন প্লেসের মেয়ে। মনে

আছে আমাদের সেই রেললাইনের ধারের ফ্ল্যাট থেকে আমি যেতাম ওদের বাড়ির কাছে। দীর্ঘ এলায়িত সোনালী চুলে সুন্দর দেখাতো ওকে। আমার দিকে কোনদিনও তাকাতো না ও। একদিন ওর লাল-নীল বলটা গড়িয়ে গড়িয়ে আমার কাছে আসতেই আমি সেটা হাতে তুলে নিয়ে ওকে ফেরত দিতে গিয়ে মৃদু হেসেছিলাম। নীরবে বলটা ও হাতে নিয়ে ফিরে যায় এমন করে, যেন আমি কেবল ওর খেলার বল তুলে দিতেই সেখানে হাজির ছিলাম।

কাঁধের ওপর মেয়েলি হাতের চাপ পড়তেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ মেলে তাকাতেই দেখি এলেন আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আবার ড্রিঙ্ক করেছো?'

মৃদু হেসে আমি ওকে আমার কাছে টেনে নিলাম। দু'হাতে ওর মুখখানি তুলে ধরে আমি ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। তারপর ওকে আমার বিছানায় টেনে নিলাম। পর-মুহূর্তে ও ওর শরীরটা আলগা করে বিছিয়ে দেয়। আমি তখন আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।

'ও হ!' কপোট বিস্ময়ে মৃদু চিৎকার করে এলেন বলে ওঠে, 'এ তুমি কি করছো ব্র্যাড?'

'তোমার আমার ব্যবধান মুছে গিয়ে সব একাকার হয়ে যাক সোনামণি। আমি দেখতে চাই তোমার প্রেম নিখাদ কিনা! আমার প্রেমে তুমি সাড়া দাও কিনা?'

এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে এলেন আমার মুখটা ওর বুকের ওপর চেপে ধরে। অনেকক্ষণ পরে এক সময় ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও আমার মুখটা তুলে ধরে বলে, 'ঠুনকো প্রেম করে বেড়াবার মতো মেয়ে আমি নই ব্র্যাড।' ওর কণ্ঠস্বর বেশ শান্ত এবং সংযত। 'আমি যখন কাউকে ভালোবাসি, তখন দীর্ঘদিনের জন্যেই ভালোবাসি, সে ভালোবাসা সমস্ত দূরত্ব পেরিয়ে আসার। কেবল জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করে তোলার প্রয়াসী একটা নিঃসঙ্গ বিধবা আমি নই। আর কারুর কিংবা শরীরিক উত্তেজনা আগুন নেভানোর জিনিষ হিসেবেও আমি নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিতে চাই না।' তারপর মৃদু হেসে ও বলে, 'বুঝেছো আমার প্রেমিক-প্রবর?'

ওর চোখের দিকে তাকালাম, 'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে আমার কথার সত্যতা খুঁজলো ও। তারপর নরম গলায় বললো, 'আমিও তাই আশা করি, আমি চাই তুমি তা বোঝ।' এবার ও নিজের থেকে আমার মুখটা নামিয়ে এনে আমার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরলো ও। সেই মুহূর্তে আমরা তখন নীরব, কারোর মুখে কথা ফোটার কোন উপায় না থাকারই কথা। চুম্বনের স্বাদ নিতে নিতে শুধু আমাদের হাতের আঙুলগুলো তখন অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায় শান্তভাবে বিশ্রাম নিতে নিতে কথা কইছিলো নিজেদের মধ্যে।

ইতিমধ্যে আমার হাতের আঙুলগুলো বোধহয় ওর থেকে একটু বেশি অশান্ত হয়ে পড়েছিল, একটু বেশি বেয়ারাপনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। সব প্রেমিক-প্রেমিকারাই বোধহয় টেলিপ্যাথিক, এ ওর মনের কথা অতি সহজেই বুঝতে পেরে যায়। এলেন আমার

মনের কথাটা টের পেয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'আলোটা নিভিয়ে দাও ব্র্যাড, আমার ভীষণ লজ্জা করছে।'

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপতেই আলো নিভে গেলো। তবে জানলা দিয়ে রাস্তার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো ওর মুখখানি।

'ব্র্যাড, আমার ব্র্যাড,' এলেনের বাহু দুটি আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

মাথা তুলে আস্তে আস্তে এবার ওর দেহ থেকে পোশাকের আবরণটা সরিয়ে দিলাম। কোন বাধা এলো না ওর কাছ থেকে এবারেও। ওর চোখ দুটি এখন খোলা, লক্ষ্য করছে আমাকে অধীর আগ্রহে, আমার পরবর্তী ভূমিকার অপেক্ষায়। ওই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলো, 'আমাকে তোমার ভালো লাগে ব্র্যাড?'

আমার তখন কথা বলে সময় নষ্ট করার মোটেই ইচ্ছে নয়। দু' চোখের পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমি ওর নিরাবরণ দেহের সৌন্দর্য দেখতে ব্যস্ত তখন। পূর্ণ বিকশিত আর অহঙ্কারী ওর দুই স্তন। বুকের খাঁচার নিচে পাতলা সরু কোমর। পেট সমতল, শুধু নিচের দিকে নেমে আসা নিতম্বের স্ফীত বাঁকের কাছে খানিকটা বর্তুলাকৃতির আভাস। উরু দুটি বলিষ্ঠ, পা দীর্ঘ আর ঋজু।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে নিজের থেকেই আবার ও বলে, 'আমি শুধু তোমার জন্যেই সুন্দর হতে চাই আবার ব্র্যাড।' ওর সুমিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আবার নৈঃশব্দকে ভরিয়ে তোলে।

'আমার সোনামণি,' ফিসফিসিয়ে বলি।

ওর বাহুবন্ধন নিবিড় হয়ে ওঠে। 'আমাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরো ব্র্যাড, নাও, আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও...' ওকে দুহাত দিয়ে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতেই আবেশে ওর চোখ দুটি বুজে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, কামনার প্লাবন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সুখের সাগরে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুললাম ওর ঠোঁট দুটি, নিবিড় আশ্লেষে কোমল ধ্বনি ফুটে উঠলো ওর কণ্ঠে। অনুভব করলাম আমার শরীরের নিচে ওর উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর আর কিছু প্রকাশের কোন অবকাশ নেই, কেবল আমার হৃৎপিণ্ডের দ্রিমি দ্রিমি তাল আর মস্তিষ্কের গর্জন ছাড়া। কিন্তু সেই মুহূর্তে মারজার মুখটা আমার হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই একটা সংকোচ, দ্বিধা এসে আমার সারা মন ছেয়ে গেলো। বাস্তবতা থেকে পালিয়ে থাকার জন্যে হুইস্কি-স্কচ খাওয়া, এই অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হওয়া, এসব যেন দারুণ ভাবে আঘাত করলো আমাকে, আমার সব অহঙ্কারের, সব কামনার বাঁধ দিলো ভেঙ্গে। গোপনে গভীরে মারজার ওপর যে অবিচার আমি করতে যাচ্ছি, তার কোন ক্ষমা নেই।

'না—আ!' চিৎকার করে বলে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেলাম, বিস্ময় আর আঘাতে আমাকে ঘিরে থাকা এলেনের বাহু দুটি হিমস্তব্ধ হয়ে গেছে। 'প্লিজ, না!' বললাম আবার।

কিন্তু ততক্ষণে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। ক্লান্তি আর অবসাদে সারা দেহ তখন ছেয়ে গেছে। খানিকক্ষণ নিস্তেজ নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলাম এলেনের বুকের ওপর। কে জানে

ও আমার বুকের হাহাকার ধ্বনি শুনতে পেলো কিনা। তারও অনেক পরে চোখ মেলে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও তখন হাসছে, খুশির আনন্দে। এই মুহূর্তে ওর স্বপ্ন আমি ভেঙ্গে দিতে চাইলাম না, ওকে আঘাত দিয়ে বলতে পারলাম না, এতোক্ষণ আমি আমার স্ত্রীর কথা ভাবছিলাম। তোমাকে উপভোগ করতে গিয়ে আমি আমার মারজার কথাই ভাবছিলাম। মারজা ভেবে আমি ওকে উপভোগ করছিলাম বললে মিথ্যে বলা হবে। সত্যিই কি তাই? নিজের বিবেককে প্রশ্ন করি। না, তা সে নয়? বরং এলেনের মধ্যে মারজা বিলীন হয়ে গিয়েছিল তখন। অস্বীকার করবো না, মারজার থেকে অনেক বেশি সুখ দিয়েছে ও আজ আমায়। এই মুহূর্তে আমার কেন জানি না মনে হলো একজন প্রেমিকা যে সুখ দিতে পারে, নিজের বিবাহিত স্ত্রী কখনোই তা দিতে পারে না। স্ত্রীর চেয়ে প্রেমিকার আন্তরিকতা অনেক, অনেক বেশি, যার কোন পরিমাপ নেই, নেই কোন তুলনা।

তাই বোধহয় মনের অজান্তে গোপনে-গভীরে অভিসারের স্বীকৃতি স্বরূপ আমার মুখ থেকে ভালোলাগা ভালোবাসার কথা বেরিয়ে এলো, 'তোমায় পেয়ে আজ আমি তৃপ্ত, ধন্য এলেন। তোমায় অজস্র ধন্যবাদ।'

আমাদের প্লেনটা তখন এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করতে যাচ্ছে, সারা এয়ারপোর্ট আলোয় আলোকিত, রানওয়ে দিনের আলোয় মতো উদ্ভাসিত। দু'একজন মানুষ দেখা যায় জানলার ওপারে। এবার আমাদের নামবার সময় হয়ে এলো।

'এখনো আমি আজকের সেই বিশ্রী ঘটনার কথা ভাবছি।' পাশে বসে থাকা এলেনের দিকে ফিরে বলি, 'ছিঃ ছিঃ—

এলেনও জানলার দিকে তাকিয়েছিল, সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ও বলে, 'আজ রাত্রে আঙ্কল ম্যাটকে ফিরিয়ে দিয়ে কোন অন্যায় তুমি করোনি,' ও আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'আমার ধারণা, ওঁকে বাদ দিয়ে তুমি নিজের চেষ্টায় আরো অনেক বড় হতে পারবে।'

আমার তখন নিজের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ওকে আমি ম্যাট ব্রেডির সঙ্গে আমার আলোচনার সব কথা বলেছি, অথচ আমার সম্পর্কে তাঁর গোপন রিপোর্ট সংগ্রহের কথাটা বলতে পারিনি। আসলে আমি চাইনি, খবরটা শুনে ও ঘাবড়ে যাক।

ইতিমধ্যে প্লেনটা এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করে একেবারে থেমে গিয়েছিল। কোমরের বেল্ট খুলে আমি ওকে সাহায্য করার জন্যে ওর দিকে ঝুঁকে পড়লাম।

'আমার বিশ্বাস, আমি তোমার সঙ্গে গেলে তোমার জন্যে কিছু একটা করতে পারতাম। কিন্তু তুমি তোমার গর্বের, দাম্ভিকতার জন্যে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখলে। আমার কাকার কাছে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করতে তোমার মনে এখনো দ্বিধা, সঙ্কোচ এবং সংশয় আছে।'

আমার ভীষণ রাগ হলো। কি করে তাকে বলি, আমার সঙ্গে ওকে দেখলে উনি ঠিক আন্দাজ করে নেবেন, ওঁর সংগ্রহ করা সেই রিপোর্টে যে মেয়েটির বর্ণনা দেওয়া আছে, সে এলেন। তাই আমি চুপ করে থাকি ওর পরবর্তী অনুযোগ শোনার জন্যে।

এলেন আর কথা বাড়ালো না। আমরা আমাদের লাগেজ নিয়ে রানওয়ে থেকে বেরিয়ে

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এলেন এবার মুখ খুললো, 'অফিসে যাওয়ার আগে আমারা টাওয়ারে স্নান সেরে গেলে কেমন হয়?'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। ভীষণ হাসি পেলো, হাসলাম। আমার হাসি দেখে এলেনও হাসলো। 'হাসছো যে?' প্রশ্ন করে তাকালাম ওর দিকে।

'বাবা! গোমড়া মুখে এখন তবু একটু হাসি ফুটলো। বাচ্চা ছেলের মতো যে ভাবে মুখ ভার করেছিলে?'

এবার আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম। আমার হাসির শব্দ মিলাতে না মিলাতেই একটা ট্যাক্সি আমাদের সামনে এসে থামলো। দরজা খুলে আমি ট্যাক্সিতে উঠলাম, এলেন আমাকে অনুসরণ করলো। 'টাওয়ারস, চলো।' ট্যাক্সিচালককে আমাদের গন্তব্যস্থল বললাম।

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করার পর সবেমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছি চালকের কণ্ঠস্বর আমার কানে ভেসে এলো।

'আশ্চর্য, কি মজার ব্যাপার ব্রাড, তুমি তোমার বাবাকে চিনতেও পারলে না?'

'ড্যাড! আপনি? আমি ঠিক চিনতে পারিনি আপনাকে।'

'কিন্তু যখন তুমি ছোট ছিলে, ঠিক চিনতে পারতে। আর আজ? বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চোখের রঙও বদলে গেছে। আমি তো এখন বুড়ো হয়ে গেছি। তোমার মন এখন—' পিছন ফিরে এলেনের দিকে তাকালো সে।

'না, না ড্যাড,' বাবার সরাসরি ইঙ্গিতটা আমাকে ভীষণ লজ্জায় ফেলে দিলো। লজ্জা কাটাতে তাড়াতাড়ি এলেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'এলেন, উনি আমার বাবা।' ওর ঠোঁটে হাসি দেখে মনে হলো আমাদের ব্যাপারটা দেখে ও বেশ কৌতুক অনুভব করছে। 'উনি আমার বাবা হলে হবে কি, ভীষণ সন্দেহবাতিক মানুষ। এর জন্যে আমি দায়ী নই, আমার জন্মের আগে থেকেই উনি এই রকম স্বভাবের ছিলেন।' তারপর বাবার দিকে ফিরে বললাম, 'ড্যাড, ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, মিসেস স্কাইলার।'

এলেনের কণ্ঠস্বর শান্ত সংযত, 'মিঃ রোয়ান আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুশি হলাম।'

'আমরা দুজনে একসঙ্গে একই প্লেনে এসেছি,' কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, 'আমি ওকে ওর হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যাবো, কথা দিয়েছি।'

'দারুণ উপকারী বন্ধু ব্র্যাড, জানেন মিঃ রোয়ান,' এলেন আবার একটা বল গোলের দিকে ছুঁড়লো, 'আমি ওকে বলেছিলাম, তুমি তোমার পথে যাও, অনায়সে আমি একা আমার হোটেলে ফিরে যেতে পারবো।'

'মেয়েদের প্রতি ওর একটু বাড়তি দুর্বলতা আছে মিসেস স্কাইলার,' বাবা মুচকি হেসে বললেন, 'বিশেষ করে সেই মেয়েটি যদি আবার সুন্দরী হয়।'

হাসলো এলেন। 'এখন বুঝছি আপনার ছেলে আপনার মতোই তোষামুদে ভাষায় কথা বলতে শিখেছে।'

'না, না তোষামোদ নয় মিসেস স্কাইলার,' বাবা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, 'ওর দুটি সুন্দর ছেলে মেয়ে আছে। বলেছে ও সে কথা?'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি,' এলেনের ঠোঁটে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠলো।

'ব্রাড একজন আদর্শ স্বামী এবং পিতা,' বাবা তাঁর কথার জের টেনে বলেন, 'ওর স্ত্রী একজন চমৎকার মহিলা। স্কুলে এক ডাকে সবাই তার কথায় সায় দেয়।'

বিরক্তিকর কথাবার্তা বাবার। বাবার মতলব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। উনি কি ভেবেছেন? বেশিদূর ওঁকে আর এগোতে দেওয়া উচিত নয়, ভাবলাম। 'ও সব কথা ছেড়ে দাও ড্যাড.' আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বলি, 'আমার বিশ্বাস, মিসেস স্কাইলার আমার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী শুনতে আগ্রহী নয়।'

ইতিমধ্যে ট্যাক্সিটা এলেনের হোটেলের সামনে এসে থেমেছিল। বাবার একঘেয়ে কথাবার্তা শোনার হাত থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা।

'একটু অপেক্ষা করো ড্যাড, মিসেস স্কাইলারকে হোটেলের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বাবার সঙ্গে করমর্দন করে এলেন হোটেলের দিকে এগিয়ে যায়। হোটেলে ঢুকে ও বলে, 'ব্র্যাড, তোমার বাবা দেখছি তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর—'

এলিভেটরে উঠতে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখ দুটো কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেলো। আমার ভীষণ কৌতূহল হলো ওর সেই অনুচ্চারিত কথাটা জানবার জন্যে।

'এলেন,' ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি হয়েছে বলতো?'

'কিছু না,' মাথা হেলিয়ে ও বলে, 'আবার অনেক কিছুও মনে করতে পারো।'

'একটু পরেই বাবার হাত থেকে আমি রেহাই পেয়ে যাচ্ছি, 'আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম,' গ্যারাজ থেকে আমি আমার পাড়ী বার করে আবার ফিরে আসছি একটু পরে।'

'বোকামো করো না!' দৃঢ়স্বরে ফিস্‌ফিসিয়ে ও বলে, 'উনি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে এয়ারপোর্টে এসেছিলেন বুঝতে পারো না?'

'কিন্তু আমার যে অনেক কথা ছিলো তোমার এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবো, কেন তুমি ভুলে যাচ্ছো সেকথা এলেন?'

'এখন আর সেসব কথার কোন মানে হয় না,' নীরস, নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর এলেনের।

চকিতে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখে বেদনার ছায়া দেখে আমার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। আমরা কেউ একটা কথাও বললাম না। নির্নিমেষে নয়নে কেবল ওর সারা মুখে বেদনার কালোছায়া ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম একটু একটু করে। এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই এলেন ভেতরে ঢুকে গেলো।

ওর হাতে ব্যাগটা তুলে দিতে গিয়ে অসহায় ভাবে বললাম, 'পরে তোমার কাছে আসবো।'

ওর চোখ দুটো তখন ছলছল করছিল, কান্নার জমাট মেঘ জমে আছে ওর দু'চোখের কোলে, যেকোন মুহূর্তে সেগুলো গলে গলে জল হয়ে ঝরে পড়তে পারে। ঝড়ের পূর্বাভাস দেখতে পেলাম ওর সারা মুখের ওপরে।

'শুভরাত্রি প্রিয়তমা,' এলিভেটরের দরজা বন্ধ হতেই আমি ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম।

তারপর লবি পেরিয়ে ট্যাক্সিতে এসে উঠলাম। আয়নায় চোখ রেখে বাবা বললেন, 'ভারি সুন্দর মেয়েটি, তাই না ব্রাড? কোথায় তোমার আলাপ হলো ওর সঙ্গে?'

সংক্ষেপে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার কথা বলতে বাবা দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

অসময়ে আমাকে ফিরতে দেখে মারজা বিস্মিত। আমার ফেরার কথা পরদিন সকালে। আমি ওকে বোঝালাম, শেষ মুহূর্তে মিটিং বাতিল, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। বাবার চোখে যে সন্দেহের ছায়া দেখেছিলাম মারজার বেলা সেটা দেখতে পেলাম না। কে জানে, চতুর মারজা সব বুঝেও না জানার ভান করলো কিনা।

রাত তখন দেড়টা, কফি শেষ করে আমার শয়নকক্ষে এলাম। এলেনকে ফোন করার জন্যে মনটা ভীষণ উতলা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এতো রাত্রে ওকে ফোনে পাওয়া অসম্ভব। অগত্যা বিছানায় আশ্রয় নিতে হলো। গভীর রাত্রে আমার কাঁধে মারজার হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

'ব্র্যাড, তোমাকে কেমন উদাস দেখাচ্ছে, কোন অঘটন?' রাতের অন্ধকারের মতোই রহস্যময় ওর কণ্ঠস্বর।

'না,' সংক্ষেপে উত্তর দিই, 'মনে হয় একটু ক্লান্ত, সারাদিনের ধকল তো কম নয়।'

'কন্ট্রাক্টটা বিরাট, তাই না?' ফিস্‌ফিসিয়ে ও বলে। তারপর বিছানায় আমার পাশে এসে শোয় ও। দু'বাহু বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরে ও আমার মাথাটা ওর বুকের মধ্যে টেনে নেয়। 'লক্ষ্মীসোনা এবার ঘুমোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

আমার সব দৃঢ়তা ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়লো মারজার উজাড় করা ভালোবাসায় এবং ও ওর শরীরের সব উত্তাপ আমার দেহে এমন করে ছড়িয়ে দিলো, আবেশে কখন যে আমার ক্লান্ত চোখ দুটি বুজে গিয়েছিল একেবারেই টের পাইনি।

সকালে অফিসে পৌঁছেই এলেনের হোটেলে ফোন করলাম গভীর আগ্রহ নিয়ে। পরমুহূর্তে আমার সব আগ্রহ নিমেষে মিলিয়ে গেলো। বিশ্বাস করতে মন চাইছিলো না, অপারেটরের কথাটা মিথ্যে হলে এই মুহূর্তে আমার চেয়ে বেশি খুশি বোধহয় কেউ আর হতো না।

উত্তেজিত হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বললেন?'

ওদিকে দূরাভাষে ভেসে আসে নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর অপারেটরের, 'আজ সকালেই মিসেস স্কাইলার হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

❑ একাদশ অধ্যায় ❑

দুপুর তিনটে। আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। প্রথমে রাগ হলো, পরে আঘাত পেলাম। এভাবে ওর পালিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। আমরা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। আমাদের ভালোবাসার মধ্যে কোন পাপ ছিলো না, হতে পারে সামাজিক স্বীকৃতি নেই, তবে তাই বলে পালাবার মতো কোন কারণ এখনো পর্যন্ত ঘটেনি। ভালোবাসা থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো কোন স্থান পৃথিবীতে নেই।

এইসব কথা ভেবেই আমি নিজেকে আমার কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম অতঃপর। কারোর সঙ্গে কোন কথা নয়, স্রেফ কাজ, আর কাজ। এমন কি মধ্যাহ্নভোজ সারার সময় পর্যন্ত পেলাম না। আমি আমার সমস্ত কর্মচারী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী মিকিকে পর্যন্ত বলে দিলাম, আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে, আমার কোন ফোন এলে লাইন যেন না দেয়।

এক সময় আমার ব্যক্তিগত ফোনটা বেজে উঠলো, আমি কান দিলাম না অনেকক্ষণ। একমাত্র মারজাই আমার এই ব্যক্তিগত লাইনে ফোন করে থাকে, ওর সঙ্গে কথা বলার সেই মেজাজটা আমার এখন আর নেই। কিন্তু ফোনটা ক্রমাগত বাজতে থাকায় শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে গ্রাহকযন্ত্রটা হাতে তুলে নিলাম। 'হ্যালো!' অস্ফুটে বললাম।

'ব্র্যাড?'

কণ্ঠস্বর শোনামাত্র আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। 'তুমি কোথায়? আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম।

'ম্যাথুজ কাকার বাড়ি থেকে কথা বলছি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার। 'আমি ভাবলাম, আমার কাছ থেকে তুমি বুঝি পালিয়ে গেলে!'

'হ্যাঁ, আমি তো পালাতেই চেয়েছিলাম।'

এক মুহূর্ত আমার মুখ থেকে কথা বেরোলো না। তারপর আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ হাহাকার করে উঠলো। 'কেন, কেন?'

'তুমি আমার জন্যে নও ব্র্যাড।' ওর কণ্ঠস্বর বড় ক্ষীণ, শুনতে অসুবিধে হচ্ছিল। 'এই সত্যটা আমি এখন জেনে গেছি, বিশেষ করে গতকাল রাতের পর অন্য কথা আমি আর ভাবতে পারি না। তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক এখন আমার মন থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত।'

'আমার বাবার বয়স হয়েছে,' সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'কি বলতে কি বলেছেন, এই সহজ কথাটা কেন তুমি বুঝতে পারছো না এলেন? আমি—'

'আমি খুব ভালো ভাবেই বুঝে গেছি,' আমাকে বাধা দিয়ে ও বলে, 'জানি না কেন যে তোমার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক পাতাতে গেলাম! আমি স্পষ্ট বুঝেছি, তোমার জীবনে আমার কোন স্থান হতে পারে না।'

'এলেন!' কথা বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

'হয়তো আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম বলে,' আমার কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনি ভাবে কথার জের টেনে ও বলে, 'কিংবা ডেভিডকে হারিয়েছি বলেই বোধহয় সঙ্গ পাওয়ার জন্যে তোমার দিকে ঝুঁকেছিলাম।'

'তা ঠিক নয় সোনামণি,' মরিয়া হয়ে আমি বলি, 'সে কথা তুমিও জানো।'

'জানি না আসলে কোন্‌টা সত্যি,' ক্লান্ত উদাস কণ্ঠস্বর ওর, 'তবে তার জন্যে আমি মাথা ঘামাই না। আমি শুধু জানি, তুমি আমার নও। পরে বেশি আঘাত যাতে না পেতে হয় তাই আগে ভাগে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাই।'

'কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালোবাসি এলেন,' আমি প্রতিবাদ করে বলে উঠি, 'জানো আজ সকালে হোটেলে তোমার খোঁজ না পেয়ে আমার বুকটা হাহাকার করে ওঠে। তাহলে বুঝতেই পারছো কতো না তোমাকে আমি ভালোবাসি। এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার আপনজন বলতে কেউ নেই। আমার মনে হয়, তুমি আর আমি অভিন্ন, কোন বাধাই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমরা দুজনে—'

'এখন আর এসব চিন্তা করা ভালো নয়,' এলেন আমাকে বাধা দিয়ে বলে, 'আমাদের মনের ইচ্ছে কখনো পূরণ হতে পারে না। এ অসম্ভব, এ অবাস্তব।'

'এলেন,' দূরাভাষে আমার গভীর অনুরাগের সুর ভাসে, 'আমাকে ছেড়ে তুমি যেতে পারো না এলেন!'

'আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না,' শান্ত স্বরে ও বলে, 'মনে করবো আমরা কেউ কারোর পরিচিত নই।'

'সেকথা তুমি হয়তো ভাবতে পারো,' রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তা পারি না।'

'যাইহোক,' এলেনের কথাগুলো আমার বুকে ছুরির মতো বিঁধলো যেন, 'তোমাবে আমি ফোন করেছিলাম একটা খবর দিতে, ম্যাট কাকা ব্যবসার প্রয়োজনে নিউ ইয়র্কে আছেন। তিনি বলছিলেন, সময় পেলে তিনি তোমার অফিসে যাবেন। গুডবাই ব্র্যাড।'

তারপরেই দূরভাষে এক নিঃসীম নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে। ধীরে ধীরে গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখালাম। চেয়ারে বসে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। আমার ভেতরটা তখন এক অদ্ভুত হিমস্তব্ধ। আর কোন স্বপ্ন নয়, আর কোন আনন্দ নয়, আর কোন উচ্ছ্বাসও নয়।

ইন্টারকমে আওয়াজ হওয়ার স্যুইচ টিপতেই মিকির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'মিঃ ব্রেডি এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

'না, না আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবো না,' উত্তেজিত গলায় বলি, 'ক্রাইসের কাছে ওঁকে পাঠিয়ে দাও।'

'কি—কিন্তু মিঃ রোয়ান—' কথা বলতে গিয়ে মিকি তোতলায়।

'বললাম না ক্রাইসের কাছে ওঁকে পাঠিয়ে দাও!' চিৎকার করে বলে উঠেই স্যুইচটা অফ করে দিলাম।

বিক্ষিপ্ত মনটাকে শান্ত সংযত করতে ক্যাবিনেট থেকে স্কচের বোতল বার করতে যাবো, মিকি ঘরে এসে ঢুকলো। 'আপনি বসুন ব্র্যাড, আমি আপনার ড্রিঙ্ক তৈরী করে দিচ্ছি।'

একটু পরে মিকি আমার হাতে স্কচের গ্লাস তুলে দেয়। ওর হাতেও স্কচের গ্লাস। ওর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার ওপর।

'ব্র্যাড, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'বলো কি জানতে চাও?'

'আপনার কি হয়েছে বলুন তো? অন্যদের মতো আপনিও কি—'

'বলো, থামলে কেন?'

ম্যাকার্থি আপনাকে কম্যুনিস্ট বলে চিহ্নিত করে থাকে।'

আমি হাসলাম। 'এ অন্যায়,' আমি বললাম, 'ব্রেডি কিন্তু আমাকে একজন খাঁটি ও সৎ লোক বলে চিহ্নিত করেছেন।'

নৈশ ভোজের জন্যে বাড়ি ফিরে এলাম ক্লান্ত পায়ে। এক পলকে মারজা আমাকে দেখে নিয়ে বলে, 'খাওয়ার আগে বরং তোমার জন্যে একটা ককটেলের ব্যবস্থা করি কি বলো?'

চেয়ারে শরীরটা ডুবিয়ে দিয়ে মারজার দিকে তাকাই। আমার দিকে ও এমন করে তাকিয়েছিল যেন অনেকদিন ওর কাছ থেকে আমি বুঝি দূরে সরে ছিলাম। ওর চোখে উদ্বেগের ছায়া।

'তোমার কি হয়েছে ব্র্যাড?'

আমি ওর দিকে তাকালাম, 'খুব খারাপ খবর আছে। প্রথমতঃ ম্যাট ব্রেডির প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় উনি আমাকে আমার ব্যবসা থেকে বার করে দেওয়ার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। দ্বিতীয়তঃ আজ আমার ব্যবসায় অন্যতম অংশীদার পিট গরডি তার নিয়োজিত মূলধনের সমস্ত টাকাটাই তুলে নেয়, ফলে আর্থিক দিক থেকে আমি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছি। এর পরে কার মন ভালো থাকতে পারে বলো?'

'ও এই কথা!' একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মারজা।

'কেন এটা কি কম খারাপ নাকি?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'এর থেকে আর কি খারাপ হতে পারে?' আমি ওর কথার মানে বুঝতে পারি না।

'হতে পারে। হ্যাঁ, এর থেকেও খারাপ হতে পারে অন্তত আমার কাছে,' হেঁয়ালি করে মারজা বলে, 'আমি তোমাকে হারাতে পারি,' গম্ভীর হয়ে এবার ও বলে, 'আমার ভ্রে মনে হয়েছিল, আমি বুঝি তোমাকে হারিয়েই বসেছি, যে ভাবে এতদিন আনমনা ছিলে আমার তো ভয় ছিলো, আমি বোধহয় তোমাকে হারাতে বসেছি। কিন্তু এখন বুঝছি সত্যি সত্যি ব্যবসার ব্যাপারেই তোমার অমন পরিবর্তন। তাই আমাকে এড়িয়ে যাওয়া। তুমি খুব ঘাবড়ে গেছো, তাই না?'

কোন কথা না বলে মাথা নাড়লাম। মনে হয় আমার কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

'সোনামণি, তুমি খুব ক্লান্ত,' নরম গলায় বললো ও আমার চিবুকে ওর ঠোঁট বোলাতে বোলাতে, 'তা এখন তুমি কি করবে, কিছু ভেবেছো?'

'জানি না,' উত্তরে আমি বললাম, 'আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখতে হবে কি ঘটে। সব কিছু নির্ভর করছে কতো মূলধন আমার রইলো আর তারপর ব্যবসা কোন দিকে মোড় নেয় তার ওপর নির্ভর করছে, এজেন্সি রাখা চলবে কি চলবে না!'

'তা ক্রাইস কি বলে?' মারজা জানতে চাইলো।

আমি জানি ক্রাইসের কথা ও খুব ভাবে। আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'জানি না ও এখন কি ভাবছে। আজ ওর সঙ্গে দেখাই হয়নি।'

'কি আশ্চর্য! ও জানে না অফিসে কি ঘটছে না ঘটছে? এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।' মারজার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া কাঁপে থির থির করে।

'বিশ্বাস কি ছাই আমিও করি?' ক্লান্তস্বরে বলি, 'ক্রাইসের কথাই ধরো না, আমার জন্যে সে কি না করেছে এক সময়। আর আজ ও আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছে।'

'আমার বিশ্বাস হয় না, ক্রাইস এ রকম কাজ কখনো করতে পারে।' মারজা সরাসরি অস্বীকার করে বসে আমার বক্তব্য।

'কে জানে, তোমার কথাই হয়তো ঠিক। তবে এ-কথা ঠিক যে, আমি কখনো লোক চিনতে ভুল করি না।'

এই সময় বাইরে কারোর পায়ের শব্দ শুনে প্রশ্ন করি, 'কে, এসো'

'বোধ হয় জেনি, ওর আজ ডেট ছিলো। ঐ বোধহয় ও ফিরে এলো।'

'তুমি তোমার কফি শেষ করো,' মারজা উঠতে যাচ্ছিল, ওকে বাধা দিয়ে বলি, 'আমি দেখছি কে এলো!'

দরজা খুলতেই দেখি পল রেমি দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে অবাক চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পল, তুমি এখানে কি করতে এলে?'

'তোমার সঙ্গে কথা ছিলো।' ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে সে বলে, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ব্র্যাড? তুকি কি নিজেকে ধ্বংস করতে চাইছো?'

পলের টুপি এবং কোটটা হাতে নিয়ে আমি ওয়ারড্রোবে রাখতে গিয়ে তাকে-বলি, 'এইমাত্র আমরা কফি শেষ করলাম। এসো বাইরে এসো!'

ডাইনিংরুম পর্যন্ত পল আমাকে অনুসরণ করলো। তারপর মারজাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে সে বলে, 'ম্যাট ব্রেডির সঙ্গে তোমার বাক্-যুদ্ধের কথা শুনলাম, কথাটা কি সত্যি?'

'না, আমার সঙ্গে তাঁর কোন বাক্-বিতণ্ডা কিংবা ঝগড়া ঠিক হয়নি,' শান্তভাবে আমি বললাম, 'আমি তাঁর দেওয়া চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি মাত্র। ব্যাস এই পর্যন্ত।'

'না সেটাই সেটা শেষ নয়,' বেশ একটু ক্রুদ্ধ হয়েই সে বলে, 'আমি শুনেছি, তুমি নাকি তোমার অফিস থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছো।'

'তুমি তো আমাকে ভালোভাবেই জানো পল,' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলি, 'আসলে আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে চাই না। এর পরেও তিনি আমার অফিসে আসেন। আমি তখন কাজের মধ্যে খুবই ব্যস্ত ছিলাম তাই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।'

'কাজে ব্যস্ত ছিলে, নাকি ইচ্ছে করে দ্যাখা করেনি?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো পল, 'আমাদের দেশের পাঁচজন ব্যবসায়ীর মধ্যে উনি একজন অন্যতম, তাঁকে চটালে তার ফল কি দাঁড়াতে পারে জানো? হয়তো কালই তোমার ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারেন উনি। তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি বলে কিছু নেই ব্র্যাড?'

'আমি ওঁকে ঠিকই বুঝেছি পল, বরং তোমার একটু দেরী হয়ে গেছে। যা ক্ষতি করার আজই তিনি শুরু করে দিয়েছেন। আজ প্রায় পঁয়ষট্টি ভাগ বেচা-কেনা আমার বন্ধ। সে যাই হোক, খবরটা তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'এসব খবর বেশিক্ষণ চাপা থাকে না। এরকম মুখোরোচক খবর তোমার-আমার শত্রু-মিত্রের সবার মুখে মুখে ঘুরে থাকে।' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে এবার জিজ্ঞেস করে, 'আসল ব্যাপার কি বলো তো?'

'ব্রেডি চায়, আমি আমার ইণ্ডাস্ট্রি কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে ওর হয়ে কাজ করি। আমি তাঁকে সাফ জানিয়ে দিই, আমার স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে কারোর হয়ে কাজ করার মানসিকতা আমার নেই। তাছাড়া—' এলেনের প্রসঙ্গটা আমি ইচ্ছে করে চেপে গেলাম, চেপে গেলাম আমার সম্পর্কে ম্যাট ব্রেডির রিপোর্ট সংগ্রহের কথা।

হঠাৎ পল কি ভেবে বলে ওঠে, 'পেয়েছি, একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি। এলেন স্কাইলার।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি সম্বিত ফিরে পেলাম, 'ওর প্রসঙ্গটা এখানে আসে কি করে?'

'ম্যাট ব্রেডির প্রিয় ভাইঝি এলেন,' পল বলে, 'এলেনকে আমি বলবো, ও যেন ম্যাট ব্রেডিকে বলে ওর ভালোর জন্যে তুমি কতো চেষ্টাই না করছো।'

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে আপত্তি জানাই, 'কোন প্রয়োজন নেই, আমি একাই আমার সংগ্রামের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবো।'

'বোকামো করো না,' পল আমাকে বাধা দিয়ে বলে, 'বৃদ্ধ ম্যাট ব্রেডিকে বাগে আনার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে এলেন।'

'ও কি করতে পারে না পারে সেটা দেখার কথা আমার নয়,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি বলি, 'ব্যাপারটা আমার আর ম্যাট ব্রেডির। এর মধ্যে এলেনের নাক গলানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আর আমি এও চাই না এলেনের প্রতি ম্যাট ব্রেডির দুর্বলতার সুযোগ নিই।'

'কিন্তু ব্র্যাড,' এই প্রথম মারজা কথা বললো, 'এলেনের জন্যে তুমি অনেক কিছু করছো। তাছাড়া তুমি তো প্রায়ই বলে থাক, একটা হাত অপর হাতের পরিপূরক। সেই হিসেবে এলেন তো তোমার ডানহাত, তাই নয় কি?

'এখন নয়,' আমি বলি, 'এর মধ্যে ওকে আর আমি জড়াতে চাই না।'

'কিন্তু কেন ব্র্যাড?' মারজা শান্ত স্বরে আমাকে বোঝায়, 'হাসিমুখে ও তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। তুমিই তো বলেছো, তুমি ওকে পছন্দ করো, আর ও-ও তোমাকে পছন্দ করে।'

'সেকথা ঠিক ব্র্যাড,' পল প্রসঙ্গের জের টেনে বলে, 'এডিথ বলছিল, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এলেন যেভাবে উতলা হয়েছে, সেরকম মনোভাব এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি।'

আমি ওদের দুজনের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। স্তব্ধ, হতবাক আমি। কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। কথা আমার ঠোঁটে আটকে গেলো। একটা বন্য চিন্তা আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকলো। মনে পড়লো, দূরভাষে ওর শেষ ভাষণের কাথাটা। নাকি সেটা আমার কথা? ঠিক বুঝতে পারি না।

'মনে করো, যেন আমাদের কোনদিনই দেখা হয়নি,' এলেন বলেছিল, 'আমরা একে

অপরের অপরিচিত। কি বোকা আমরা? না, না, এ হতে পারে না।' চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে গেলাম।

মেঘমুক্ত রাতের আকাশ। বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা। বসেছিলাম সিঁড়ির একটা ধাপে, শীতের কাঁপন গায়ে লাগে। জানলা পথে ডাইনিংরুমের দিকে চোখ পড়ে। সেখানে পল এবং মারজা দুজনে নৈশভোজ সমাধা করতে ব্যস্ত তখনো। খাওয়ার চেয়ে কথাই বেশি চলছিল তাদের।

এক এক করে বাড়ির থেকে এক প্রান্ত অন্য প্রান্তে তাকালাম, আমার স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি জরীপ করার চেষ্টা করলাম। বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, প্রায় সবটাই বিক্রী করে আমি আমার ব্যবসায় খাটিয়েছি, যে ব্যবসা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে গুটিয়ে ফেলতে হবে।

বাড়ির সামনে গাড়ী থামার আওয়াজ হলো। সিঁড়িতে জেনির কণ্ঠস্বর কলকলিয়ে ওঠে। একটু পরে আমার সামনে এসে ও শুধোয়, 'এখানে চুপচাপ বসে কি করছো ড্যাড?' তারপর মাথা নামিয়ে নিচু গলায় বলে, 'মাকে তাঁর উপহারের কথা আমি বলিনি।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। এখন আমার মনের যা অবস্থা, তাতে ওসব কথা ভাবা যায় না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জেনি জিজ্ঞেস করে, 'কি ব্যাপার ড্যাড, তুমি অমন মুখ গোমড়া করে বসে আছো? মাম্মির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

'না সোনামণি,' উত্তরে আমি বলি, 'ব্যবসার সমস্যার জন্যে মনটা একটু খারাপ।'

'ও! আমি ভেবেছিলাম অন্য কিছু। এ ক'দিন তুমি যেরকম হাবভাব দেখাচ্ছিলে, আর মাম্মির মুখে বিষাদের ছায়া দেখে আমার ধারণা অন্যরকম হয়েছিল।'

হাসবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। নিজেকে খুব বোকা বলে মনে হলো। 'ওসব ধারণা তোমার একেবারে বাজে জেনি।'

জেনির চোখ স্থির হলো আমার চোখের ওপরে, ওর একটা হাত আমার হাতের ওপর এসে পড়লো। ওর মুখের ভাব দেখে মনে হলো, ও যেন সবজান্তাদের দলে। 'কাগজে মিসেস স্কাইলারের ছবি আমি দেখেচি ড্যাড,' জেনি বলে, 'সত্যি অপূর্ব সুন্দরী উনি। ঠাকুরদা মনে করেন তোমার সঙ্গে ওঁর ভালোবাসা আছে।'

বাবার ওপর খুব রাগ হলো, জেনি আমার মেয়ে, ওর কাছে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এ ধরণের মন্তব্য করা উচিত হয়নি। ক্রুদ্ধ হয়ে বলি, 'তুমি তো ওঁকে ভালোই চেনো, উনি মনে করেন সব মেয়েরাই বুঝি আমার জন্যে পাগল।'

জেনির চোখে কৌতুক ঝিলিক দেয়। 'হ্যাঁ, তা সম্ভব ড্যাড,' ও বলে, 'তুমি এখনো বুড়িয়ে যাওনি, একথাটা বোধহয় তোমার জানা নেই।'

আমি হাসলাম ওর দিকে তাকিয়ে, 'কিন্তু একদিন তুমিই না বলছিলে, আমি জবু-থবু বুড়ো হয়ে গেছি, আমার সেই আগের রোমাণ্টিক চেহারাটা আর নেই, মনে আছে?'

'কিন্তু ওর প্রেমে পড়ার যোগ্যতা তোমার এখনো আছে। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে কে কখন ধরা পড়ে কে জানে। একটা ছবিতে দেখেছিলাম, ক্লার্ক গেবল—'

'সে তো ছায়াছবির ঘটনা,' আমি ওকে বাধা দিয়ে বলি, 'আর আমি ক্লার্ক গেবলও নই।'

'তার থেকেও তুমি দেখতে সুপুরুষ।' সঙ্গে সঙ্গে জেনি বলে।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসার চেষ্টা করলাম, ওর কথায় আমি আমার দেহের মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তাপ অনুভব করলাম। জেনির মুখটা বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল, 'এ তো তোমার তোষামুদের কথা হয়ে গেলো জেনি।'

হঠাৎ জেনি ছেলেমানুষের মতো নেচে উঠলো, ফিসফিসিয়ে বললো, 'যদি তিনি সত্যি তোমাকে ভালোবেসে থাকেন, এবং তিনি যদি জেনে থাকেন, সারা জীবন ধরে অপেক্ষা করলেও তিনি তোমাকে পাবেন না, সেটা কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হয়ে উঠতো তাঁর কাছে, তাই না ড্যাড?'

গত কয়েকদিন মাথার যন্ত্রণার কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন আবার সেটা ফিরে অনুভব করতেই বললাম, 'চলো, ভেতরে চলো, পলকাকা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

পলকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে এলাম। সারাটা পথ কথা বললো না পল। ঠিক প্লেনে ওঠার সময় ও মুখ খুললো, 'এলেনের ব্যাপারে আমাকে অন্তত কিছু বলবে তো?' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে নিজের থেকে সে আবার বলে, 'তুমি তোমার গর্ব নিয়েই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করতে পারলে না।'

আমার চাহনির মধ্যে কি ছিলো কে জানে, গলার সুর আগের চেয়ে অনেক নরম করে পল বলে, 'আশা করি, শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, হবে বৈকি,' দৃঢ়তার সঙ্গে আমি বললাম, 'হতেই হবে!'

তারপর প্লেনের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে সে বলে, 'শুভেচ্ছা রইলো।'

'ধন্যবাদ,' কি ভেবে তাকে পিছু ডাকলাম, 'পল! এটা তো প্রথম রাউণ্ডের খেলা। সবে শুরু। আরো সাহস সঞ্চয় করো।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেশহীন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে পল বলে, 'তুমি সাংঘাতিক জেদী!' বলে সে হাত বাড়িয়ে দেয় করমর্দনের জন্যে।

অফিসে ঢুকতেই মিকি খবর দিলো ক্রাইস নাকি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। দ্রুতপায়ে আমার অফিসঘরে এসে দেখি ও আমার চেয়ারে বসে আছে। হাতে কাগজ পেন্সিল নিয়ে ডেস্কের ওপর কি যেন লিখছিল সে।

কয়েক মিনিট দুজনে নীরব থাকার পর ক্রাইসের মধ্যে একটা চঞ্চলতা অনুভব করলাম আমি। তবু আমি নিজের থেকে কথা বলবো না বলে যেন শপথ নিয়ে তার সামনে বসেছিলাম।

গলা পরিস্কার করে সে ডাকলো, 'ব্র্যাড—'

ক্রাইসের দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ হাসি পেলো। এক সময় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, 'ক্রাইস, আগে তুমি আমাকে কেন বললে না, এ ব্যাপারে তোমার আগ্রহ আছে?'

'তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না ব্র্যাড এ আমার কোন আগ্রহ নয়, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছি মাত্র।'

'সাহায্য!' উত্তেজিত হয়ে আমি বলি, 'গতকাল সারাদিন কোথায় তুমি ছিলে?'

'ম্যাট ব্রেডিকে খুশি করার চেষ্টা করছিলাম।' ক্রাইস বলে, 'আমি ওঁর সঙ্গে একটা চুক্তি করেছি।'

'কিসের চুক্তি?' আমি জিজ্ঞেস করি, 'প্রায় সব খদ্দের তো আমাদের ছেড়ে চলে গেলো, বাকীরা আজ হয়তো চলে যাবে। আচ্ছা বলতে পারো ম্যাট ব্রেডিকে কে আমাদের খদ্দেরের নাম ঠিকানা দিলো? তুমি নিশ্চয়ই। এর পরেও তুমি বলতে পারো, তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও?'

'কি করবো, উনি রেফারেন্স চাইছিলেন, তাই—'

'তা ম্যাট ব্রেডি বুঝি তোমাকে দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চান? আর সেটাই কি তোমার বর্ণিত চুক্তির একটা অঙ্গ?'

ক্রাইস কোন উত্তর দেয় না। এক মিনিট আমি তার দিকে তাকিয়ে থেকে নিরীক্ষণ করি।

'কিন্তু ব্র্যাড,' ক্রাইস কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'আমি—'

আমি তাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলি, 'আমি তোমাকে কিংবা কাউকেই বিশ্বাস করি না।' বলে ইন্টারকমের সুইচ টিপলাম। মিকির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাষে। 'আমি চাই আমার সংস্থায় সব কর্মচারীরা তোমার ঘরে এসে জমায়েত হোক। ক্রাইসকে ঘেরাও করতে হবে।'

'ও নিশ্চয়ই ব্র্যাড।'

সমবেত আমার অফিসের কর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন যেন মায়া হলো, ওদের আমি হারাতে পারি না! বেচারা! ওদের কেউ কেউ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যতদিন না আমার ব্যবসায় স্থিতাবস্থা ফিরে আসে সেই দুঃসময়টা ওরা কম বেতনে কাজ চালিয়ে যেতে চায়। আশ্চর্য, তবু ওরা আমাকে ছেড়ে যেতে নারাজ।

গ্রাহকযন্ত্রগুলোর দিকে তাকালাম, অসাড়-স্তব্ধ, কোন সাড়া শব্দ নেই। অথচ অন্যদিন এসময় ঘন ঘন টেলিফোন আসার জন্যে কতোই না বিরক্তি প্রকাশ করেছি। কতোদিন মিকিকে বলেছি, এর পর ফোন এলে বলে দেবে, আমি অফিসে নেই। আর আজ? একটা ফোনের জন্যে চাতকের মতো মুখ উঁচু করে বসে আছি।

একেই বলে দিন বদল।

ইন্টারকমে আওয়াজ হতেই বোতাম টিপলাম। মিকির কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে, 'মিসেস স্কাইলার অপেক্ষা করছেন। তিনি জানতে চান, একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া দেখায় সময়

কি আপনার হবে?'

কয়েক মুহূর্ত আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোলো না। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলি, 'ওকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

এলেন ফিরে আসছে। একটা বন্য উত্তেজনায় আমার শরীরের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। একটু পরেই আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো ও। ওর দীর্ঘায়ত চোখ দুটি আমার চোখের ওপর স্থির নিবদ্ধ ছিলো, তবে ওর ঠোঁটে হাসি ছিলো না একটুও। একসময় ধীরে ধীরে আমার ডেস্কের সামনে এসে বসলো ও। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না।

এক সময় এলেনই নিজের থেকে বললো, 'ব্র্যাড, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার শরীর ভালো নেই।'

এবারও আমি কথা বললাম না। কেবল নীরবে ওর মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি। তখনো আমার বিস্ময়ের ঘোরটা ঠিক কাটেনি।

'কি ব্যাপার, আমাকে তুমি একবার 'হ্যালো' বলে সম্বোধন করতেও ভুলে গেলে?'

'এলেন!' নিজের সেই অদ্ভুত গাঢ় কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। ওর একটা হাত স্পর্শ করার জন্যে হাত বাড়ালাম। ওর আঙ্গুল কেবল একটু স্পর্শ করা মাত্র ইচ্ছে হলো ওর কাছ থেকে আরো কিছু পাই যেন। আমি ওকে কাছে টেনে নিতে গেলাম।

'না ব্র্যাড,' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত সংযত স্বরে এলেন বলে, 'সব শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে আর শুরু করতে চাই না।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি এলেন, আমার ভালোবাসার শেষ নেই।'

'আমি ভুল করেছি ব্র্যাড,' নিচু গলায় ও বলে, 'তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ, সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে আমাকে দিও না। আমাকে তুমি লোভ দেখিও না। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই, কেবল বন্ধু।'

'কেন তুমি আমাকে ভালোবাসো না?' আমি জানতে চাইলাম।

ওর চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠলাম, অব্যক্ত বেদনা ঝড়ে পড়ছিল ওর চোখ থেকে।

'আমাকে যেতে দাও ব্র্যাড,' কাতর অনুণয় জানায় এলেন।

ব্যর্থ মন নিয়ে আমি আমার চেয়ারে ফিরে এলাম। কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাই। এক মুখ ধোঁওয়া উদগীরণ করে জিজ্ঞেস করি, 'তাহলে কেন তুমি ফিরে এলে? আমাকে কষ্ট দিতে?'

এলেনকে দেখে মনে হলো, ও ওর মনের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছে। 'আমারই দোষ,' দৃঢ়তা ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে, 'তোমার সঙ্গে আমি জড়িয়ে না পড়লে, আমার কাকার সঙ্গে তোমার অমন বিরোধ কিছুতেই ঘটতো না।'

'এ ব্যাপারে তোমার কোন সম্পর্ক নেই,' আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'এমন কি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাও তিনি জানেন না।'

'তোমার সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্টটা পেয়েছেন, আমি জানি সে কথা।' এলেন বলে,

'আর সেই কারণেই সেদিন রাত্রে তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করোনি। তুমি জানতে আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই, তিনি তাহলে ব্যাপারটা আরো পরিস্কার জেনে যাবেন, তুমি আমাকে আড়াল করতে চাইছো।'

'তা রিপোর্টের কথা তুমি জানলে কি করে? সান্দ্রা বলেছে?'

'না ম্যাট কাকা বলেছেন,' প্রত্যুত্তরে ও বলে, 'তুমি ওঁর সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছো তার জন্যে উনি ভীষণ ক্রুদ্ধ। ওঁর ধারণা ওঁর সঙ্গে কাজ করলে তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।'

'আমার ভবিষ্যৎ এখানেও তো উজ্জ্বল,' আমি মন্তব্য করলাম, 'সেকথা তোমার কাকা বেশ ভালোই জানেন। তবে একথা স্বীকার করবো, তোমার কাকা পরোপোকারী, যতোক্ষণ না তুমি তাঁর বিরোধিতা করো।'

'তোমার হয়ে আমি কথা বলতে পারি।' এলেন বলে।

'না, ধন্যবাদ, বলতে হবে না,' আমি বলি, 'আমার আর কোন আগ্রহ নেই। এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে উনি আমার অনেক ক্লায়েন্ট ভাঙ্গিয়ে নিয়েছেন।'

'আমি দুঃখিত ব্র্যাড,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলেন। 'আমার কিছু টাকা আছে। সেই টাকা তোমার কোন সাহায্যে লাগলে আমি সত্যি খুব খুশী হবো।'

দীর্ঘ-সময় আমি ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ি, 'জানি না এলেন, এই মুহূর্তে কারোর সাহায্য আমার কাজে লাগতে পারে। কারণ আমার কোন খদ্দেরই এখন আমার কাছে আসতে ভরসা পাচ্ছে না তোমার কাকার ভয়ে।'

'আচ্ছা ব্র্যাড, স্টীল কমিটির অন্য আর কে কে সদস্য বলতে পারো?' এলেন বলে, 'তাদের কয়েকজনকে আমি চিনি। তারা এখনো তোমার প্ল্যান সম্পর্কে খুবই আগ্রহী।'

আমি হাসলাম, 'তোমার কাকা কি তাদের মুঠোয় পুরতে বাকী রেখেছেন? কেবলি পরিশ্রম ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হবে বলে তো মনে হয় না।'

'চেষ্টা না করলে জানবোই বা কি করে?' এলেন বলে, 'আমি ওদের প্রায় সকলকেই চিনি, তারা কেউই ম্যাট-কাকাকে পছন্দ করে না।'

'তাহলে অন্তত কেউ একজন তো তাঁকে পছন্দ করেন। কে, কে সে?

'রিচার্ড মারটিন, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট স্টীলের মালিক। তুমি কি তাকে এখুনি ফোন করতে চাও?'

'হ্যাঁ,' বলে মাথা নাড়লাম। ইন্টারকম মারফত মিকিকে বললাম রিচার্ড মারটিনের ফোনটা দিতে।

আমি মনে মনে হাসলাম, এলেন আমার জন্যে অনেক কিছু করছে। এরই নাম প্রেম। হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'তুমি যে উপকার আমার করলে, তুমি যদি সেই মেয়ে না হতে, যে মেয়েকে আমি ভালোবাসি, তাহলে তোমাকে আমি আমার বিজনেসের একজন অংশীদার করে নিতাম।'

'কেন ব্র্যাড, তুমি কি আমাকে তোমার একজন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারো না?'

'হয়তো পারি,' ধীরে ধীরে আমি বললাম, 'প্রেম যখন ফুরিয়ে যায় তখন।'

ফোনটা বেজে ওঠে। গ্রাহকযন্ত্রটা তুলতেই মিকি বলে, মিঃ মারটিন মধ্যাহ্নভোজে

গেছেন। ফিরে এলেই আমি আবার ফোন করবো।'

'ঠিক আছে, তাই হবে', এলেনের দিকে ফিরে বলি, 'মিঃ মারটিন মধ্যাহ্নভোজ সারতে গেছেন। পরে আবার তাকে ফোন করতে বলেছি।' 'ঠিক আছে।' ওর কণ্ঠস্বর কেমন ভারাক্রান্ত বলে মনে হলো।

'এলেন?' নিচু গলায় আমি তাড়াতাড়ি ডাকলাম।

'কি?' কেমন ভাবলেশহীন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

'কি বলো?

'আমাদের ভালোবাসা এখনো ফুরোয়নি এলেন।' আমার দিকে তাকালো ও। আমি জানি, বেশিদিন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে না ও, বেশিদিন সত্যকে গোপন করে থাকতে পারবে না।

এলেনের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, ওর দুঃখটা সেইমাত্র চোখের কোল থেকে বিদায় নিয়েছে। সে এক অবিস্মরণীয় অনাস্বাদিত মুহূর্ত।

❑ দ্বাদশ অধ্যায় ❑

কলোনিতে মধ্যাহ্নভোজ সারতে গেলাম আমরা। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার খুব খাতির করে আমাদের পছন্দ মতো এক কোণার একটা টেবিলের ব্যবস্থা করে দিলো। এলেনের দিকে তাকিয়ে আমি হাসছিলাম।

'হাসছো যে?' এলেন জিজ্ঞেস করলো।

'ভাবছি তোমার সান্নিধ্য যেকোন মুহূর্তে আমার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে। ভালো এবং খারাপ দুই-ই—'

এলেন হাসে, ওর হাসিটা কেমন যেন ম্লান বিষণ্ণ দেখায়। মনে হয় ওর মনে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম আঘাতের সুর ধ্বনিত হলো আমার শেষ কথায়। ওর সান্নিধ্য আমার জীবনে শুভ সূচনা করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অশুভর বার্তা আসে কি করে এর মধ্যে। কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু কি ভেবে যে আমি অমন অপ্রীতিকর কথাটা বলে ফেললাম, জানি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে এক মেয়েলী কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আমরা দুজনেই চমকে পিছন ফিরে তাকাই।

'এলেন স্কাইলার? এখানে তুমি কি করছো?'

মধ্যবয়স্কা এক সুন্দরী মহিলা আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসছিল তখন। আমি ওকে চিনি, একজন সোসাইটি গার্ল। রয়টারও বলা যেতে পারে। আমার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। ঝড়ের মতো এসে ঝড়ের বেগেই চলে গেলো ভদ্রমহিলা।

এলেনের দিকে ফিরে তাকালাম, 'জানো এর অর্থ কি দাঁড়াতে পারে? তোমার কাকা এরপর দারুণ রেগে যাবেন। কারণ এরপর তোমার আমার সম্পর্কের কথা তাঁর কাছে

অজানা আর থাকবে না। ভদ্রমহিলাকে একরকম রয়টার বলা যেতে পারে।'

দীর্ঘায়ত চোখ তুলে হাসলো এলেন, 'আমি ওসব তুচ্ছ ব্যাপারে পরোয়া করি না।' ওর একটা হাত আমার হাতের ওপর এসে পড়লো; 'আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকবো।'

তারপর অফিসে ফিরে গিয়ে মারটিনের ফোনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। এই ফাঁকে এলেন ওর কাকার ব্যবসার গোড়ার দিকের কাহিনী শোনাচ্ছিল। তারই মাঝে আমার ব্যক্তিগত ফোনটা বেজে উঠলো। মারজার ফোন।

'ওদিককার কি খবর প্রিয়তম?' মারজা জিজ্ঞেস করে।

'ভালোই,' এলেনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলি, 'আজই সকালে মিসেস স্কাইলার এসেছেন। উনি আমাকে ওঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি।'

'তাই বুঝি?' মারজা জিজ্ঞেস করে, 'ক্রাইসের খবর কি?'

সংক্ষেপে আমি বললাম সেদিন সকালে কি ঘটেছিল। আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র মারজা বলে ওঠে, 'আমি ভাবতেই পারছি না ক্রাইস এমন বেইমানি করবে।'

'ভুলে যাও ওকে,' আমি বললাম, 'মনে করো ও ছিলো আমাদের জীবনে একটা ধূমকেতু।'

'তুমি কি এখন একা ওখানে?' হঠাৎ মারজা ওর গলার স্বর বদল করে জিজ্ঞেস করলো।

'না।'

'তাহলে তোমার সঙ্গে মিসেস স্কাইলার আছে?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে মারজা বলে, 'আমরা ওর সাহায্যের জন্যে কতো যে কৃতজ্ঞ, কথাটা ওকে বলতে ভুলো না যেন।' মারজার কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গের সুর লুকিয়ে ছিল যেন।

মারজা তখন ফোনটা ছেড়ে দিয়েছিল। আমি দ্রুত এলেনের দিকে তাকালাম। এলেন আমাকে লক্ষ্য করছিল। মারজার শেষ উক্তিটা ও শোনেনি তো? আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। মারজা ফোন ছেড়ে দিয়েছে জেনেও এলেনকে শুনিয়ে অভিনয়ের সুরে বলি, 'গুড বাই,' তারপর এলেনের দিকে ফিরে বললাম, 'মারজা তোমাকে আমাদের সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ জানাতে বলেছে।'

'তোমার স্ত্রী তো আমাকে পছন্দ করে না।'

'সে কি করে হতে পারে?' জোর করে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললাম, 'ও তো তোমাকে চেনেও না।'

এলেন নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকালো, 'আমি ওকে দোষ দিচ্ছি না। আমি যদি তোমার স্ত্রী হতাম, তাহলে আমিও একই দোষে অভিযুক্তা হতাম।'

একটু পরেই মারটিনের ফোন এলো। কিন্তু মারটিন আমার পরিকল্পনায় তেমন আগ্রহ দেখালো না। এলেনকে মারটিনের অনাগ্রহের কথা বলতেই ও বলে ওঠে, 'আমি ওঁর

সঙ্গে কথা বলতে চাই, ফোনটা আমাকে দাও। ও আমার কথা শোনে।'

ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় ওকে বললাম, 'ছেড়ে দাও, অন্য পথ আমাকে খুঁজে বার করতে হবে।'

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে দিনটা তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল, ছ'টা বেজে দশ তখন, হঠাৎ এলেনকে একটু উত্তেজিত হতে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হলো, জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ অমন চিৎকার করে উঠলে যে?'

'স্টীলের গুণাগুণ নির্দ্ধারণের ব্যাপারে আমার স্বামী অভিজ্ঞ ছিলেন। অমন উন্নতমানের স্টীল ও ছাড়া অন্য কেউ উৎপাদন করার কথা জানতো না।'

'ডেভিড কি তোমার কাকাকে এ ব্যাপারে কথা বলেছিল?'

এলেনের মুখের ওপর অন্ধকারের একটা ছায়া নেমে আসে, 'আমার তা মনে হয় না,' এলেন বলে, 'ও অসুস্থ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা।' একটু থেমে এলেন বলে, 'এ ব্যাপারে তোমার খুব আগ্রহ বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ এলেন, তোমার স্বামী তার সেই নব আবিষ্কারের কথা কিছু বলেনি তোমাকে?'

'হ্যাঁ বলেছে বৈকি,' বলে এলেন সংক্ষেপে যা বললো আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এতো বিদূষী মেয়ে এলেন। স্টীলের কম্পোজিসনগুলো পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখেছে ও। আশ্চর্য! আমি ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, 'তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য সোনামণি, আমি ভাগ্যবান, আমার জীবনে তোমাকে এতো কাছে পেয়ে। এখন বুঝছি, তোমাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও চলবে না। সোনামণি, তোমারও কি তাই মনে হয়?'

আমার তখন হাঁটতে হাঁটতে ম্যাডিসন এভিনিউ-এ এসে পৌঁছেছিলাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম, সাড়ে আটটা। আমি ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, 'আবার একটু হাঁটবে?' একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কই আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিলে না?'

'এখন আর আমরা আগের মতো নেই,' এলেনের চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে ওঠে, চোখের কোণায় শিশিরের ফোঁটার মতো জল চিকচিক করে।

'এলেন?' আমি ওকে আমার কাছে আকর্ষণ করতে চাইলাম, 'তুমি কি আমাকে ভয় করো? আমার তরফ থেকে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না, সে প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিতে পারি। তাছাড়া তুমি তো নিজেই সেটা উপলব্ধি করতে পারো। এই যে আজ সারাটা দিন আমরা দুজনে এক সঙ্গে কাটালাম, কোন ক্ষতি আমি তোমার করেছি বলে তোমার মনে হয়?'

আমার চোখে চোখ রেখে ক্লান্ত ম্লান ভঙ্গিতে এলেন মাথা নাড়লো, 'ও প্রশ্ন তো এখন আর কিছুতেই উঠতে পারে না। সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে ব্র্যাড, আমরা আর কিছুতেই আগের দিনগুলোয় ফিরে যেতে পারি না।'

'তুমি আমার বাবার কথায় অযথা গুরুত্ব দিচ্ছো এলেন।'

'এখন আর কোন ঝগড়ায় যেতে চাই না ব্র্যাড। প্লীজ, ওসব কথা আর তুলো না। তাছাড়া আমি এখন ভীষণ ক্লান্ত।'

প্রতিচ্ছবিহীন ওর দীর্ঘায়ত চোখে চোখ রাখতেই আমার বুকটা কেমন কেঁপে উঠলো।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। খানিকটা হেঁটে গিয়ে গ্যারাজ থেকে গাড়ী বার করে এলেনের হোটেলের দিকে এগিয়ে চললাম।

রাত তখন দশটা, ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরলাম। মারজা নিশ্চয়ই খুব রেগে আছে। নিচু হয়ে আমি ওর চিবুকে চুমু খেতে গেলে মুখ সরিয়ে নিলো ও।

'ছিঃ!' আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সৈনিককে বুঝি এভাবে সম্বর্ধনা জানাতে হয়?'

'যুদ্ধ?' ব্যাঙ্গ করে মারজা বলে, 'নাকি সন্ধি? তা শেষ পর্যন্ত কি চুক্তি হলো এলেনের সঙ্গে জানতে পারি?'

'মারজা!' আমি মৃদু চিৎকার করে উঠি, 'গতকাল তুমি না বলছিলে, এলেনের সাহায্য চাইবার জন্যে, আর আজ তুমি এসব কি বলছো? আসলে তুমি কি চাও বলো তো?'

'আমি কিছুই চাই না,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর মারজার, 'কেবল, তোমার এই অভিনয় আমার আর ভালো লাগে না।'

'সত্যি বিচিত্র নারী তোমরা, তার চেয়েও বিচিত্র বোধহয় তোমাদের মন। কি করলে যে তোমাদের মন পাওয়া যায়, সে বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না।'

মারজা কোন জবাব দিলো না। নিজের ঘরে ঢুকে সেই যে দরজা বন্ধ করে দিলো, আর খুললো না পরদিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত। সারাটা রাত আমাকে গেস্টরুমে শুয়ে থাকতে হলো। একা, নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

নিস্তব্ধ গেস্টরুম। মনে হয় একটা আলপিন পড়লেও বোধহয় শব্দ শোনা যাবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ব্রেকফাস্টের টেবিলে এসে বসতে আরো অবাক হয়ে গেলাম। অন্যদিনের মতো টেবিলের ওপর লেবুর জুস দেখতে পেলাম না। সামনে মারজার চেয়ারও শূন্য। সকালের প্রভাতী সংবাদপত্রটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে তার ওপর চোখ রাখতে গিয়েই 'সামাজিক সমাচারের' পাতায় আমার দৃষ্টি আটকে যায়।

'ওয়াশিংটনের বিখ্যাত স্টীল ম্যাগনেট ম্যাথিউ ব্রেডির ভাইঝি মিসেস হরটেন্স (এলেন) স্কাইলার অবশেষে গত বছর তাঁর জীবনের সেই বিয়োগান্ত ঘটনার পর লোকচক্ষুর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, গত বছর পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে ওঁর স্বামী এবং যমজ দুই পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটে। 'দ্য কলোনি' রেস্তোরাঁয় ওঁকে এক সুপুরুষ ভদ্রলোকের সঙ্গে গতকাল মধ্যাহ্নভোজ সারতে দেখা যায়। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সেই ভদ্রলোকের নাম ব্র্যাড রোয়ান, উনি একজন প্রখ্যাত সমাজ-সেবক— কাউন্সিলর। খবরে প্রকাশ, মিসেস স্কাইলার নাকি অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যাচ্ছেন, মিঃ রোয়ান ওঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদের ধারণা, স্বামী-পুত্রহারা মিসেস স্কাইলারের বিষণ্ন মুখে যদি কেউ হাসি ফুটিয়ে থাকে, সে ঐ মিঃ রোয়ান। মনে হয় ওঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হতে যাচ্ছেন...'

খবরের শেষাংশ পড়তে গিয়ে বিরক্তিতে ভরে উঠলো আমার মন। তাড়াতাড়ি পাতা

ওল্টাতে গিয়ে অর্থনীতির পাতায় দৃষ্টি আমার স্থির হয়ে গেলো আর এক বিস্ময়কর খবর দেখে।

'খ্রিস্টোপার প্রোক্টর কনসোলিডেটেড স্টীল করপোরেশনের প্রধান মিঃ ম্যাথিউ ব্রেডির বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন...'

কাগজটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেললাম।

অফিসে সকালটাও কেমন জোলো বলে মনে হলো। কোন ব্যস্ততা নেই, নেই ক্লায়েণ্টদের তেমন আনাগোনা। নিঃঝুম, স্তব্ধ অফিস। চারটের বেশি টেলিফোন পেলাম না। তখন প্রায় নৈশভোজের সময় হয়ে এসেছিল, এলেনের ফোন এলো।

ওর গলার স্বর দ্রুত এবং অশান্ত, 'তোমার গলার স্বরটা কেমন যেন,' ব্যাকুল হয়ে এলেন জিজ্ঞেস করে, 'কাল রাতে তোমার ঘুম হয়নি?'

'হ্যাঁ, ঘুম হয়েছিল বৈকি,' আমার জন্যে ও চিন্তা করুক, আমি তা চাই না। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি? তোমার ঘুম হয়েছিল তো?'

'আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।' এলেন বলে, 'আজকের কাগজে আমাদের সম্বন্ধে কি খবর বেরিয়েছে দেখেছো?'

'হুঁ।'

'তোমার স্ত্রী দেখেছেন?

'বোধহয় দেখে থাকবে,' শব্দ করে হাসলাম, 'সকাল থেকে আজ ওর মুখ দেখতে পাইনি।'

'ম্যাট কাকা দেখেছেন,' এলেন নিজের থেকেই আবার বলে, 'আমাকে ডেকে উনি খুব রাগ দেখিয়েছেন। তোমার সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছেন। আমার সঙ্গে তোমার মেলামেশাটা নাকি নিছক একটা নেশা ছাড়া আর কিছু নয়। নেশা ফুরোলেই—'

'তাই নাকি?' আমি ওকে বাধা দিয়ে বলি, 'তা তুমি কি জবাব দিলে?'

'আমি ওঁকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি, যাকে আমার পছন্দ আমি তার সঙ্গে দেখা করবো, মেলামেশা করবো,' সঙ্গে সঙ্গে এলেন বলে, 'আমি কি বলতে পারি তুমি কিছু ভেবেছিলে?'

আমি ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলি, 'তোমার কাকাকে আরো রাগিয়ে তুলবো। আমি তোমার কাকাকে পাগল করে তুলতে চাই। এতো খবরের কাগজের খবর। বাস্তবে আমরা পরস্পরের আরো কাছে আসবো।'

'না ব্র্যাড, দয়া করে ও কাজটি আর করো না,' এলেনের কণ্ঠে করুণ আকুতি, 'আমি তো তোমায় একবার বলেছি, সেই সম্পর্কটা আমাদের চুকে গেছে কবেই, দাম্পত্য জীবন যাপন করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাছাড়া উনি আমাকে খুব ভালোবাসেন, ওঁকে আমি চটাতে চাই না।'

'ঠিক আছে, তুমি তোমার কাকার মন যুগিয়ে থাকো, তাহলে আমাকে তোমার কি প্রয়োজন বলো?'

'শোনো ব্র্যাড, আমাকে তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো—'

'আমি একটা কথাই শুধু জানি, তুমি আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করতে চাও,'

আমি ওকে বাধা দিয়ে বলি, 'ঠিক আছে, তবুও আমার কাছে তুমি আজও সোনামণি। আমি তোমাকে দোষ দিতে চাই না।'

পর মুহূর্তেই ওর কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাষে। 'ঠিক আছে ব্র্যাড, বলো তুমি আমাকে কি করতে বলো?'

আনন্দে আমার বুক ভরে যায় সঙ্গে সঙ্গে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠি, 'আজ তোমাকে তোমার সব থেকে দামী পোষাক পরে আসতে হবে। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের ককটেল পার্টি দিচ্ছো তুমি, সেই পার্টিতে তুমি ঘোষণা করবে, তোমার সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যের কথা।'

'এতো সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জন করা—'

'আজকাল সবাই তো সস্তায় কিস্তিমাত করে থাকে,' আমি ওকে বোঝাই, 'তুমিই বা বাদ যাও কেন! তাহলে ঐ কথা রইলো, ককটেলের সব ব্যবস্থা করে আমি তোমাকে একটু পরে ফোন করবো।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে পরক্ষণেই ইন্টারকমের বোতাম টিপে মিকিকে খবরটা দিলাম, 'শোনো মিকি, আজ সন্ধ্যায় মিসেস স্কাইলার সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ককটেল পার্টি দিচ্ছে। আমাদের ফটোগ্রাফারদের প্রস্তুত থাকতে বলো।'

'ও কে বস, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যথা সময়ে ফটোগ্রাফাররা মিসেস স্কাইলারের পার্টিতে গিয়ে হাজির হবে।'

এলেনের স্বামী ডেভিডের উকিল রবার্ট এস. লেভির সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। নিউ ইয়র্কের ওয়াপিঙ্কার ফলস্, ঠিকানাটা যোগাড় করে দিয়েছে পল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো ঐ নামে কোন উকিল সেখানে থাকে না। তবে বব লেভি নামে এক প্রাক্তন বৈমানিকের হদিশ পাওয়া গেলো। ভদ্রলোক গত বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান আক্রমণের সময় অংশ নিয়েছিল বোমাবর্ষণে। মনে হয় এই লোকটা রবার্ট লেভিকে চিনলেও চিনতে পারে। পদবী এক, হয়তো তার কোন আত্মীয়ও হতে পারে রবার্ট লেভি।

বাড়ির গেটের সামনে প্ল্যাকার্ড ঝুলছিল, 'মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস বব লেভি, প্রোপ্রাইটার।'

'বলুন স্যার, আপনার জন্যে কি করতে পারি?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। ভাবলেশহীন মুখ। 'কুকুরছানার খোঁজ করছেন?'

আমি মাথা নাড়লাম। 'না, আমি রবার্ট এস. লেভির খোঁজ করছিলাম। তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনের এ্যাটর্নি। এখানে একমাত্র আপনিই এই পদবীর লোক থাকেন। আপনি কি সেই লোক?'

ভদ্রলোক তাঁর সামনে উপবিষ্ট স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন। ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি বরং ভেতরে যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে,' ভদ্রলোক অসহায় ভাবে তাঁর স্ত্রীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অনেকক্ষণ পরে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ভদ্রলোক আবার মুখ খুললেন, 'তা আপনার প্রয়োজনটা কি জানতে পারি?'

'আমি ওঁর কাছ থেকে কিছু খবর এবং পরামর্শ চাইতে এসেছিলাম।'

আমার দিক তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে আমার গাড়ীর দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই আমার দিকে আবার ফিরে বলেন, 'কিন্তু আমি তো অনেক বছর আগে আইন-ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি। আমার আশঙ্কা, খুব বেশি সাহায্য আমি আপনাকে করতে পারবো না বোধহয়।'

'এটা কোন আইন ঘটিত ব্যাপার নয়,' আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলি, 'এটা একটা ইতিহাস বলতে পারেন।'

ভদ্রলোক কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন।

'এ-ইতিহাস সেই কেসের, যে কেসে সরকার তরফের হয়ে আপনি একদিন আইনের যুদ্ধ চালিয়েছিলেন।' সংক্ষেপে আমি বললাম, 'কনসোলিডেটেড স্টীল। বিশ্বাস ভঙ্গের কেস। খবর নিয়ে জেনেছি সেই কেসের তদন্তের ভার পড়েছিল আপনার ওপর।'

ভদ্রলোকের চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ে, 'এ ব্যাপারে আপনার এতো আগ্রহ কিসের?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি উকিল?'

আমি আবার মাথা নেড়ে বললাম, 'আমি একজন সমাজসেবক কাউন্সিলার,' পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিলাম।

কার্ডটার ওপর সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে ভদ্রলোক সেটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, এ কেসে আপনার এতো আগ্রহ কিসের মিঃ রোয়ান?'

'কেন আগ্রহ শুনবেন? একটা স্টীল ব্যবসায়ীর প্রস্তাব আমি প্রত্যাখান করতে তিনি আমার ব্যবসা তুলে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। উনি চান, আমি আমার ব্যবসা ছেড়ে বছরে ষাট হাজার ডলার মাইনের চাকরী করি ওঁর প্রতিষ্ঠানে। আমার অপরাধ, ওঁর প্রস্তাবে রাজী হইনি। তাই আমি ঠিক করেছি, ওঁর এই বেয়াদপির বদলা নেবো। আমি ওঁকে ডাবল ক্রস করে ওঁর ব্যবসার সুনাম ক্ষুণ্ণ করবো। শুনেছি সেই জাল স্টীল সংক্রান্ত মামলার সঙ্গে তিনিও জড়িত ছিলেন।' একটু থেমে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'যাঁর কথা বলছি, তাঁর নাম আপনি শুনতে চান?'

ভদ্রলোক হাসলেন, সবজান্তার মতো হাসি। 'আপনাকে বলতে হবে না। তাঁর নাম আমার জানা হয়ে গেছে। ম্যাট ব্রেডি, এই তো?' একটু থেমে মিঃ লেভি বলেন, 'বাড়ির ভেতরে চলুন। আমার স্ত্রী চমৎকার কফি তৈরি করতে পারে। কফি খেতে খেতে আলোচনা করা যাবেখন।'

বব লেভির স্ত্রী সত্যিই খুব ভালো কফি তৈরী করতে জানে। বব এতটুকু অতিরঞ্জিত করে বলেনি। ওর স্ত্রী ইউরেশিয়ান, অর্থাৎ অর্ধেক জার্মান, অর্ধেক জাপানিজ। কর্মক্ষেত্র জাপানে আলাপ হয় ওঁদের। ওঁরা আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন। ম্যাট ব্রেডির সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলতেও ভুললাম না। আমার বলা শেষ হতেই ওঁরা দুজনে পরস্পরের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালেন।

মিঃ লেভি ভাবলেশহীন চোখে তাকালেন আমার দিকে, 'মিঃ রোয়ান, আপনি কি

করে ভাবলেন, আমি আপনার সাহায্যে আসতে পারি?'

'শুনেছি কনসোলিডেটেড স্টীলের সেই দুর্নীতির কেসের ব্যাপারে আপনি অনেক কিছুই জানেন। স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে আপনি যদি আমাকে সেই মামলার সারমর্ম কিছু বলেন—' একটু থেমে আমি আবার বললাম, 'আমি এও শুনেছি, ম্যাট ব্রেডি ছাড়া একমাত্র আপনিই জীবিত আছেন, সেই কেসের নাড়ী-নক্ষত্র সবকিছু আপনার নখদর্পণে।'

আবার সেই অদ্ভুত চাহনি লক্ষ্য করা গেলো মিঃ এবং মিসেস লেভির মধ্যে। বিশেষ করে মিঃ লেভির মুখে আগের সেই জেদী ভাবটা আবার ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'আমার মনে হয় না, আমি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি।'

শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি ফিরে আসার জন্যে। বড় রাস্তায় পড়ার আগে গাড়ীর আয়নায় চোখ পড়তেই দেখি লেভির স্ত্রী একটা স্টেশন ওয়াগান চালিয়ে আসছেন আমার পিছনে। আমি আমার গাড়ীর গতি কমিয়ে দিলাম। একটু পরেই স্টেশন ওয়াগানটা আমার গাড়ীর সামনে এসে ব্রেক কসলো। আমাদের দুজনের গাড়ীই থেমে গেলো মুখোমুখি।

'মিঃ রোয়ান!' মিসেস লেভির কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত রহস্যের ছোঁওয়া অনুভূত হলো, আয়ত চোখে কিছু অজানা কথা প্রকাশ করার ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হলো। 'আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা ছিলো।'

গাড়ীর দরজা খুলে আমি মুখ বাড়ালাম, 'বেশ তো কি বলতে চান বলুন মিসেস লেভি!'

মিসেস লেভি তাঁর গাড়ী থেকে নেমে আমার গাড়ীতে উঠে বসলেন এবং কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালেন। 'আমার স্বামী আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করতে চান। কিন্তু ওঁর সন্দেহ হয়, আপনি বোধহয় ব্রেডির লোক। অনেক কথাই তো তিনি প্রকাশ করে দিতে চান। কিন্তু সাহস পাচ্ছেন না—'

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ম্যাট ব্রেডির ভয়ে? উনি কি এখনো আপনার স্বামীর কোন ক্ষতি করতে পারেন বলে মনে হয়?'

'না, আমার স্বামী নিজের কথা ভাবছেন না' মিসেস লেভি বলেন, 'আসলে আমার জন্যেই তিনি বেশি চিন্তিত। এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

ভাবতে আশ্চর্য লাগে মিসেস লেভির কি এমন ক্ষতি করতে পারে ম্যাট ব্রেডি?

আমাকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে মিসেস লেভি নিজের থেকেই আবার বলেন, 'জানেন মিঃ ব্র্যাড, ববকে প্রথম যখন দেখি, কি হাসিখুশিতে না ভরা ছিলো ও। উজ্জ্বল চোখ, সদা হাস্যময় মুখ। দারুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন সব সময়। কিন্তু ম্যাট ব্রেডির সংস্পর্শে আশা মাত্র ওর সেই হাসিটা যেন নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। হাসি ভুলে গেলো ও তারপব থেকে, ভুলে গেলো ওর সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা।'

'কিন্তু এতে ওঁর ভয় পাওয়ার কি আছে? আপনার স্বামী আমাকে স্পষ্ট বলতে পারতেন।'

'না বলতে পারতেন না,' মিসেস লেভি বলেন, 'আমার জন্যে বলতে পারেন না।

আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, জাপান থেকে ম্যাট ব্রেডি আমাকে এখানে নিয়ে আসেন চোরা-পথে সাংহাই ভিসার সাহায্যে। এই সূত্রে ম্যাট ব্রেডি তারপর থেকে আমার স্বামীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলে, স্টীল কেলেঙ্কারী মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার স্বামী যদি মুখ খোলে অন্য কারোর কাছে, তাহলে তিনিও আমার এখানে চোরা-পথে আসার ব্যাপারে সরকারের কাছে গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেবেন। সেই থেকে বব মুখ খুলতে চায় না। আমার মতে ওঁর এখন জাপানে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু ও তা চায় না। ও এখানেই থেকে যেতে চায়। অথচ ওর কোন আয় বলতে এখন কিছু নেই। আপনি যদি ওকে একটা চাকরী দেন, আমার মনে হয়, ও আপনাকে সাহায্য করতে পারে। পারেন না ববকে একটা চাকরী দিতে?

'চাকরী!' এক মুহূর্ত ভাববার সময় নিয়ে বলি, 'আপনার স্বামীকে আমার অফিসে দেখা করতে বলবেন আমার সঙ্গে।'

'আঃ আপনি আমাকে বাঁচালেন মিঃ রোয়ান।' মিসেস লেভির মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'অনেক দিন পরে আমি আবার আমার স্বামীর মুখে হাসি দেখতে পাবো। আঃ ভাবতেও অরাম আনন্দ লাগছে। এর জন্যে অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ রোয়ান।' বলে নেমে যান মিসেস লেভি আমার গাড়ী থেকে।

ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকালাম, চারটে। পাঁচটার মধ্যে পৌঁছতে হবে মিসেস স্কাইলারের ককটেল পার্টিতে। আমাকে সেখানে হাজির থাকতেই হবে।

❑ ত্রয়োদশ অধ্যায় ❑

কারোর সম্পর্কে ভালো কথা বলো কেউ তোমার কথা শুনবে না। কিন্তু তাকে গালাগালি দিয়ে কথা বলো, কিংবা তার চরিত্রহনন করে কুৎসা রটাও, দেখবে তোমার কথা শোনার জন্যে আশাতিরিক্ত ভীড় জমে গেছে। গত তিনদিনে শহরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের প্রতিটি সংবাদপত্রে আমার এবং এলেনের ছবিসহ আমাদের চরিত্রের ওপর মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে প্রকাশিত সংবাদ এখন প্রতিটি মানুষের মুখোরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। সর্বত্র এখন লোকের ফিস্‌ফিসানি, কানাকানি। আমারা এখন শহরের বিরাট রোমান্স, টাটকা নরম-গরম খবর। আমরা কখন কোন্ সিনেমাহলে গেছি, কোন্ বড় রেস্তোরাঁয় নৈশভোজ সারতে গেছি, কিংবা কোন্ বড় দোকানে কেনা-কাটা করতে ঢুকেছি, সেসব সংবাদ এখন নিন্দুক সাংবাদিকদের হাতের মুঠোয়।

তবু এসব সত্ত্বেও আমি এবং এলেন প্রতিদিন অপেক্ষা করে বসে থাকি, ম্যাট ব্রেডির প্রতিক্রিয়া শোনার জন্যে। কিন্তু কোন খবর নেই এ ব্যাপারে। তবে বুধবার সকালে এলেনের ফোন পেয়ে একটু নড়েচড়ে বসতে হলো।

'নোরা কাকীমা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' এলেনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে অপর প্রান্ত থেকে।

'উনি কে?' অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি।

'ম্যাথুস কাকার স্ত্রী।'

'সেকি, তোমার কাকা যে বিবাহিত, সেকথা তো আমার জানা ছিলো না! ওঁর কথা তো কখনো শুনিওনি।'

'না শোনারই কথা।' এলেন বলে, 'প্রায় চল্লিশ বছর হলো, এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পঙ্গু অবস্থায় পড়ে আছেন। ওঁদের বিয়ের ঠিক এক বছর পরেই ঐ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। বেচারী!'

'তা উনি কি বলতে চান তোমাকে?'

'ম্যাট কাকা নাকি খুব রাগারাগি করেছেন আমাদের এই মেলামেশার ব্যাপারে। মনে হয় কাকীমা আমাকে কিছু বোঝাতে চান, আমাকে সতর্ক করে দিতে চান।'

'ভালো।' আমি ওকে বলি, 'যেও না। ম্যাট কাকাকে জ্বলতে দাও।'

'ব্র্যাড, তুমি কি মনে করো, তুমি ঠিক পথে চলছো?' এলেন অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে।

'জানি না। আমি কেবল একটা কথাই জানি, তুমি যখন আমার সঙ্গে আছো, তখন সবকিছুই আমার কাছে তুচ্ছ। ব্যবসা, টাকা পয়সা, ম্যাট ব্রেডি তোমার কাছে কিছুই নয়!'

'তুমি ঠিক বলছো ব্র্যাড, আমার কাছে ওসব কিছুই নয়?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন রাখে ও দূরাভাষে, 'তোমার স্ত্রী?'

চোখ বন্ধ করে আমি একটু ইতস্ততঃ করি মারজার প্রসঙ্গ ওঠাতে। ও বোধহয় আমার মনের কথাটা টের পেয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি নিজের থেকেই ও আবার বলে ওঠে, 'উত্তর তোমাকে দিতে হবে না ব্র্যাড, আমি জানি, আমি মোটেও ভালো মেয়ে নই। তাই নয় কি?'

তারপরেই ফোনটা ছেড়ে দেয় এলেন। আশ্চর্য, আমার উত্তরটা ও শুনলো না, ওকি তাহলে আমার উত্তরটা জেনে গিয়েছিল। আমার চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করলো ইণ্টারকম।

'মিঃ রবার্ট লেভি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান,' মিকির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

মিঃ লেভির কথা আমি একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। লেভির কথা উঠতেই তার স্ত্রীর মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মিকিকে বললাম, 'ওঁকে আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দাও!'

একটু পরেই দরজা ঠেলে মিঃ লেভিকে ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। করুণ মুখ করে তিনি বলেন, 'সোমবারই আমার আসার কথা ছিলো। কিন্তু আমার সব স্যুটগুলো আমার দেহের তুলনায় ইদানীং এতো বড় হয়ে গিয়েছিল, বড় বেমানান বলে মনে হচ্ছিল। দর্জিকে দিয়ে একসেট স্যুট ছোট করিয়ে তবে আপনার এখানে আসতে পারলাম।'

'বিনিয়োগ কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না মিঃ লেভি!' আমি ওঁকে আশ্বাস দিলাম।

'সেই সুযোগ আমি নিতে পারি,' মিঃ লেভি বলেন, 'অবশ্য আপনার প্রস্তাবটা যদি এখনো কার্যকরি অবস্থায় থাকে, তবে—'

'আপনাকে সব সময় স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আমি।' আমি তাঁকে বলি, 'আপনাকে

আমি কিছু সময় দিচ্ছি, আমার এই অফিস এবং কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে। মধ্যাহ্নভোজের পর আমাদের স্টাফ মিটিং আছে, আপনাকে সেই দলের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। তারপর দেখবেন, এখান থেকে আমরা কোথায় যাই।'

মিঃ লেভি তাঁর ডেস্কের পিছনে উঠে দাঁড়ালেন। 'ধন্যবাদ ব্র্যাড। এ ব্যবসার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, তবে আমার বিশ্বাস, আমি আপনার উপকারে লাগতে পারি।'

'আপনি আমার এখানে এসেই যথেষ্ট উপকার করেছেন,' আমি বললাম, 'ডুবন্ত জাহাজে ঝাঁপ দেওয়ার মতো সাহস ক'জনের থাকে বলুন!'

সেদিন অপরাহ্নে কনসোলিডেটেড স্টিল সম্বন্ধে যতটুকু আমি জানলাম, গত কয়েক সপ্তাহে তার সিকি ভাগও আমি জানতে পারিনি। বব লেভি সুন্দর এবং সহজ ভাবে আমাকে বোঝালেন এ ব্যাপারে। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ম্যাট ব্রেডির কেশাগ্র স্পর্শ করার মতো তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমি তখনো পর্যন্ত দেখতে পেলাম না মিঃ লেভির কথার মধ্যে। তখন প্রায় সন্ধ্যা সাতটা, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। বব লেভিকে বললাম, 'ভীষণ মাথা ধরেছে, আজ আর কোন কথা নয়, কাল সকালে নতুন করে আলোচনা শুরু করবো, কেমন?'

আমার দিকে তাকিয়ে বব হাসলো। খুশির হাসি, ওর সেই হাসিটা মনে পড়িয়ে দেয়, এখানে এসে ওর বয়স যেন অনেক কমে গেছে। পরিবেশ মানুষকে বোধহয় এভাবেই বদলে দেয়। 'ঠিক আছে ব্র্যাড,' উঠে দাঁড়ায় বব চলে যাওয়ার জন্যে।

সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠতেই গ্রাহকযন্ত্রটা যন্ত্রটা হাতে তুলে নিলাম, 'মিঃ রোয়ান?' দূরভাষে মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'হ্যাঁ, আমি রোয়ান কথা বলছি?'

'আমি সান্দ্রা ওয়ালেস কথা বলছি,' সান্দ্রা বলে, 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই ব্র্যাড!'

এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে ভাবলাম, এখন রোমান্সের সময় নয়। ভীষণ ক্লান্ত আমি। তাছাড়া ও যদি জানে, ম্যাট ব্রেডির বিরুদ্ধে আমি চরম খেলায় মেতে উঠতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে রোমান্স করতে তেমন উৎসাহ বোধ ও করবে না। তাই আমি আগে থেকেই ওকে এড়ানোর জন্যে বললাম, 'আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত স্যাণ্ডি। তোমার ওখানে যাওয়ার সময় একেবারেই করতে পারছি না।'

'খুব বেশি দূর তোমাকে আসতে হবে না,' ওপার থেকে সান্দ্রা বলে, 'তোমার অফিস বিল্ডিং-এর নিচে একতলায় ড্রাগস্টোর থেকে কথা বলছি। প্রয়োজনটা অত্যন্ত জরুরী ব্র্যাড।'

ওর কথার মধ্যে রোমান্সের নামগন্ধ নেই। তাহলে? কি ভেবে সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'বেশ তো, তাহলে এখুনি আমার চেম্বারে চলে এসো। রাইট!'

পরমুহূর্তে দূরভাষে সান্দ্রার হাসি ভেসে আসে। আমি চমকে উঠলাম। নারী ছলনাময়ী, আমার ভুল বুঝতে পেরে দূরভাষে কথা বলতে যাই, ততক্ষণে ফোনটা ছেড়ে দিয়েছিল ও। ববের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখি, কৌতূহলী চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন

তিনি।

'তাহলে ঐ কথা রইলো, কাল সকালে—'

বব থমকে দাঁড়ালেন চলে যেতে গিয়ে। তাঁর চোখে সেই অজানা কৌতূহলটা তখনো থিক্‌থিক্ করছিল।

'আপনি কি কিছু বলতে চান মিঃ বব?'

'যদি কিছু মনে না করেন তো বলি,' একটু ইতস্ততঃ করে বব বলেন, 'খবরের কাগজে আপনার এবং মিসেস স্কাইলারের নাম জড়িয়ে যেসব মুখোরোচক গরম গরম খবর বেরুচ্ছে, সেই ব্যাপারে দু'-চারটে কথা আপনাকে বলতে চাই মিঃ রোয়ান!'

'আমাদের ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে আপনি যতোটা খারাপ ভাবছেন, ঠিক ততটা নয়,' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ববকে সতর্ক করে দিয়ে বলি, 'এ ব্যাপারে আপনার অহেতুক কৌতূহল না দেখালেও চলবে। তাছাড়া জেনে রাখুন, এলেন আমার পুরনো বান্ধবী। ও আমার পক্ষেই আছে।'

'আমি দুঃখিত। ঠিক আছে, কাল সকালে আবার আপনার সঙ্গে দেখা করবো।' কথা শেষ করে দরজার দিকে এগিয়ে যান বব লেভি। কিন্তু দরজায় হাত দেওয়ার আগেই সেটা খুলে যায়, দরজার ওপারে তখন সান্দ্রা দাঁড়িয়েছিল।

'ওঃ আমি দুঃখিত!' সান্দ্রা মৃদু চিৎকার করে ওঠে, 'আমি বোধহয় না জেনে আপনাদের আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করে ফেললাম।

'তোমার কোন কিন্তু হওয়ার কারণ নেই সান্দ্রা,' সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠি, 'ভেতরে এসো!'

'ভালোই হলো স্যাণ্ডি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে,' ওর একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলি, 'তারপর কি খবর বলো?'

হাসলো সান্দ্রা। 'কিন্তু ফোনে তোমার গলার আওয়াজটা বড় একটা সুখের বলে মনে হলো না।'

'খুব ক্লান্ত আমি,' ওকে একটা চেয়ারে বসতে বলে বললাম, 'তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আশায় আমি এসেছি ব্র্যাড!'

অবাক হলাম। 'শেষ পর্যন্ত ওঁর কাজটা তুমি ছেড়ে এলে?'

'আগামীকাল থেকে আর যাচ্ছি না,' সান্দ্রা বলে, 'যদিও উনি জানেন না আমি ওঁর চাকরীতে ইস্তফা দিচ্ছি।'

'তা সেই চাকরীটা ছেড়ে দেওয়ার এমন কি কারণ ঘটলো, বললে না তো?'

'সে তোমার, শুধু তোমার জন্যে,' আবেগে গলা কাঁপে সান্দ্রার, 'আমি জানি, আমাকে দেওয়ার মতো কিছু নেই তোমার, তুমি অন্য কারোর। কিন্তু দিনের পর দিন নিজের মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি, আমার জীবনে অনেকটা জায়গা অধিকার করে আছো তুমি।'

'তুমি এখন পূর্ণযৌবনা, বয়স কম তোমার?' আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'একদিন কোন যুবকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে, তখন তোমার আবার মনে হবে সে-ই তোমার জীবনে

প্রকৃত পুরুষ। আর তার বিরাট ব্যক্তিত্বের আড়ালে ছায়ার মতো আমি মিলিয়ে যাবো তোমার জীবন থেকে।'

সান্দ্রা জোর করে ঠোঁটে হাসির ঝিলিক টেনে বলে, 'কিন্তু তুমিই তো আমার অনেক কিছু ব্র্যাড!'

আমি ওর চোখে চোখ রাখলাম। ওর নিজের ঠোঁটটা অসম্ভব কাঁপছিল। থাকতে না পেরে আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর সেই কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে চুমু খেলাম।

'আঃ ব্র্যাড! তুমি কি সুন্দর?' আমার মুখটা সান্দ্রা ওর বুকের ওপর চেপে ধরে আবেশে। আমাদের দেহের উত্তাপে কামনা-বাসনা সব একাকার হয়ে গেলো।

'আমি দুঃখিত স্যাণ্ডি।'

ওর ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হলো, মনে হয় ও যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে একজোড়া পায়ের শব্দ শুনে সন্ত্রস্ত হলো ও।

পর-মুহূর্তে দরজার সামনে হঠাৎ আবির্ভূত হলো এলেন, আকস্মিক ভাবে আমাদের দুজনকে চমকে দিয়ে।

'ব্র্যাড, তুমি বড় পরিশ্রম করছো, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এলাম—'

আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে এলেনের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো—'ওঃ তোমরা!'

ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে আমার কাঁধের ওপর থেকে হাতটা ধীরে ধীরে সরিয়ে নেয় সান্দ্রা।

এলেনের মুখ থেকে হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে। ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ও বলে, 'হয়তো আমি ভুলও করতে পারি। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে, মেয়েদের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা খেলতে তোমার নাকি খুব ভালো লাগে। তখন তোমার কথাটা বিশ্বাস হয়নি, তবে এখন আর কোন কিছুই অবিশ্বাস্য নয়। তুমি আজ আমার চোখ খুলে দিয়েছো ব্র্যাড। আমি চললাম। বিদায়—'

'এলেন?' চমকে ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখি এলেন দ্রুত পায়ে ছুটে যাচ্ছে। করিডোর পর্যন্ত আমিও ছুটে গেলাম। এলিভেটর নড়ে উঠতেই আবার আমি ডাকলাম, 'এলেন? শোনো আমাকে ভুল বুঝো না। শোনো আমি—'

এলিভেটর নিচে নেমে চলে নিঃশব্দে। অতঃপর ক্লান্ত পায়ে আমিও ফিরে গেলাম আমার অফিসে। সান্দ্রা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি ওকে খুব ভালোবাসো তাই না ব্র্যাড?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'শুভরাত্রি ব্র্যাড!' বিদায় নিয়ে চলে যায় সান্দ্রা। আমি তখন আকাশ পাতাল ভাবছিলাম, সত্যি কি আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম তখন সান্দ্রার কাছে?

নিস্তব্ধ অফিস। আমি শুধু বসে একা। হঠাৎ বব লেভির গলার আওয়াজ শুনে চমকে ফিরে তাকাই তার দিকে।

'সেকি আপনি এখনো বাড়ি যাননি?'

'হ্যাঁ, এই যাচ্ছি।' বলেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ম্যাট ব্রেডির মেয়ের সঙ্গে কি কাজ থাকতে পারে আপনার?'

চকিতে ওঁর দিকে ফিরে তাকালাম।

'মিসেস স্কাইলার ম্যাট ব্রেডির ভাইঝি,' বব লেভি বললো।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। 'তাহলে আপনি কার কথা বলছিলেন, কাকে আপনি ম্যাট ব্রেডির মেয়ে বলে সম্বোধন করছিলেন মিঃ লেভি?'

'সান্দ্রা ওয়ালেস,' প্রত্যুত্তর বললেন তিনি।

তারপর বব লেভি সংক্ষেপে সান্দ্রার জন্ম রহস্যের বিবরণ দিতে গিয়ে যা বললেন তা ঠিক এইরকম ঃ

বিয়ের বছরেই ম্যাট ব্রেডির স্ত্রী মোটর দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যান। ম্যাট ব্রেডির তখন ভরা যৌবন। দেহে প্রচণ্ড ক্ষুধা, কিন্তু মন চায় না দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে, তাহলে প্রথম স্ত্রীর ওপর দারুণ অবিচার করা হয়। অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থা তাঁর বাড়ির মধ্যেই ছিলো তখন। গ্রহণ করতে পারছিলেন না কেবল বিবেকের দংশনে। অবশেষে একদিন সেই বিবেকটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ম্যাট তাঁর দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন। সান্দ্রার মা মারযা ছিলো তাঁর বাড়ির প্রধান পরিচারিকা। ম্যাটের অসুস্থা স্ত্রীর পরিচর্যা করাই লক্ষ্য ছিলো তার। সান্দ্রার মতোই সুন্দরী সে। ধীরে ধীরে তার রূপ এবং যৌবনের ওপর আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন ম্যাট ব্রেডি। তারপর হঠাৎ একদিন মারযা ম্যাট ব্রেডির বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। প্রায় তিন মাস পরে জো ওলেনকুইজ নামে ম্যাটের এক অফিস কর্মচারী দেখা করে ম্যাটের ব্যক্তিগত অফিস চেম্বারে। বব লেভি তখন চীফ একাউন্টেন্ট। ম্যাট তাঁকে ডেকে জো ওলেনকুইজের নামে পাঁচ হাজার ডলারের একটা চেক লিখে দিতে বলেন। সেই চেকটা নিয়ে জো চলে যায় সিটি হলে এবং মারযার সঙ্গে মিলিত হয়। সেই দিনই অপরাহ্নে মারযাকে বিয়ে করে জো।

কুড়িদিন পরে সান্দ্রার জন্ম হয়। পরদিনই ম্যাট ব্রেডি তাঁর কোম্পানির পাঁচশো শেয়ার জো অর্থাৎ জোসেফ এবং মারটা ওলেনকুইজের নামে লিখে দেন, পরবর্তীকালে সেই শেয়ারগুলো সান্দ্রার নামে ট্রান্সফার করা হয়।

এই পর্যন্ত বলে থামলেন বব লেভি।

'এ সবের প্রমাণ সংগ্রহ করতে আপনার কত সময় লাগতে পারে মিঃ লেভি?'

'কয়েক ঘণ্টার মামলা। স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ম্যাট ব্রেডির কোম্পানির শেয়ার সান্দ্রার নামে ট্রান্সফারের তথ্যটা আজই সংগ্রহ করে নিচ্ছি, বাকী তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে আমাকে একবার পিটসবার্গে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, তাই করুন। কুইক মিঃ লেভি,' একটু থেমে আমি বললাম, 'পেনসিলভেনিয়ায় ব্ল্যাকমেল করার জন্যে কি ধরনের শাস্তি হতে পারে, অবশ্য যদি ধরা পড়তে হয়, সেটাও জেনে আসবেন। রাইট!'

আচ্ছা এলেন কি জানে সান্দ্রার জন্ম বৃত্তান্ত? ওর কাকার অবৈধ জীবন যাপনের কথা। মনে হয় না। কারণ জানলে এতোদিনে এলেন নিশ্চয়ই আমাকে খবরটা দিতো। কথাটা মনে হতেই এলেনের হোটেলে গেলাম। ও ওর স্যুটে ছিলো না, ডেস্ক ক্লার্ক আমাকে চিনতো। তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে এলেনের স্যুটে ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করলাম। তখনো ও ফেরেনি। শেষে বিরক্ত হয়ে ব্যর্থ মন নিয়ে ফিরে এলাম।

❑ চতুর্দশ অধ্যায় ❑

পিটসবার্গ এয়ারপোর্ট থেকে অফিসে ফোন করলাম মিকিকে, 'লেডি কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ,' প্রত্যুত্তরে ও বলে, 'উনি আপনার সঙ্গে পিটসবার্গ এয়ারপোর্টে দেখা করবেন।'

'আর কোন খবর আছে?'

'তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নয়, এক মিনিট,' একটু পরে মিকির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাষে, 'ও হ্যাঁ, ভালো কথা, মিসেস স্কাইলার ওয়াশিংটন থেকে ফোন করেছিলেন আপনাকে। উনি আপনাকে ফোন করতে বলেছেন।'

ঘড়ির দিকে তাকালাম, প্লেন ছাড়তে দেরী ছিলো। বললাম, ঠিক আছে পিটসবার্গ থেকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবো।' বলেই গ্রাহকযন্ত্রটা নামিয়ে রাখলাম।

এখন আমার মনটা হাল্কা অনেকটা। এলেন ফোনে আমাকে চেয়েছিল। খুশির আমেজে উচ্ছ্বসিত হয়ে হঠাৎ শিষ দিয়ে ফেললাম প্লেন ধরার জন্যে এগিয়ে যেতে গিয়ে।

ম্যাট ব্রেডি প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন না। ম্যাটের সেক্রেটারি সান্দ্রা আমাকে অনুরোধ করলো, ম্যাটের সঙ্গে দেখা না করার জন্যে। আমার জায়গায় ক্রাইসকে নিয়োগ করেছেন ম্যাট ব্রেডি। অতএব আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তাঁর কাছে। কিন্তু আমি তো জানি, আমার প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি, বরং নতুন করে দেখা দিয়েছে। সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে সোজা ব্রেডির ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ি।

'আমি তো বলে দিয়েছি, তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না?' ম্যাট খিঁচিয়ে ওঠেন।

'কিন্তু আমি যে দেখা করতে চাই মিঃ ব্রেডি!' আমার পিছন পিছন ববও এসে ঘরে ঢোকে। 'আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরী দরকার আছে।'

'তোমার আবার নতুন করে কি বলার থাকতে পারে?'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন স্যার। নতুন করেই বটে,' আমার ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি তিনি দেখতে পেলেন কিনা জানি না, তবে তাঁকে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে অধীর আগ্রহে আমার পরবর্তী কথা শোনার জন্যে বসে থাকতে দেখা গেলো। 'নতুন করে আমায় বোধ হয় আর ফিরে আসতে হতো না, যদি না এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যেতো। আপনি জানেন আপনার মেয়ে আমাকে ঘৃণা করে?'

'কে, কে আমার মেয়ে?'

'সান্দ্রা!'

'মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে! তাহলে এই কাগজগুলোও মিথ্যে?' বলে আমি অতঃপর বব লেভির সংগ্রহ করা সান্দ্রার জন্ম বৃত্তান্তের নথিপত্র মিঃ ব্রেডির ডেস্কের সামনে ছুড়ে দিলাম। 'এর পরেও কি আপনি বলবেন আমি মিথ্যে, আপনার চরিত্রের ওপর কলঙ্ক রটাতে এসেছি? কাল সান্দ্রা আমার অফিসে এসেছিল চাকরীর খোঁজে। ও আপনার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চায়।'

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালেন। এই কয়েক মুহূর্তে তাঁর মুখের রঙ বদলে গেছে, আগের চেয়ে তিনি যেন এখন অনেক বেশি বৃদ্ধ। কোটরাগত চোখ, গলার স্বরে হতাশা; বিষণ্ণতা, 'আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা সান্দ্রা জানে?'

আমি মাথা নেড়ে বলি, 'না।'

'কেন, তুমি ওকে বলোনি?'

'অতোটা হীন মন আমার এখনো হয়নি মিঃ ব্রেডি। তাছাড়া আপনি ওর বাবা, আর আমি তো ওর বন্ধু। বন্ধু হয়ে বন্ধুর সর্বনাশ করি কি করে বলুন?'

এই প্রথম মিঃ ব্রেডি ফিরে তাকালেন ক্রাইসের দিকে, 'ক্রাইস, তুমি এখন যেতে পারো—দরকার হলে পরে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।'

ক্রাইস আমার দিকে তাকালো, তার দু'চোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল। তার অমন অবস্থা দেখে আমার খুব হাসি পেলো। বেচারা!

'মিঃ রোয়ান, বসো,' এই প্রথম তিনি আমাকে বসতে বললেন তিনি।

'ব্র্যাড?' অনেকক্ষণ পরে মিঃ ব্রেডি আমাকে ডাকলেন, 'আজ আমি যদি তোমাকে ফিরিয়ে দিতাম তুমি কি করতে তারপর? নিশ্চয়ই আমার মেয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার বিরুদ্ধে যেতে? কি যেতে না?

'হ্যাঁ, সেই রকমই ভেবে এসেছিলাম।' আমি স্বীকার করলাম।

'আর এখনো যদি আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিই?'

একটু সময় নিলাম ভাববার জন্যে। তারপর বললাম, 'আমার বাবা বলেছিলেন, ক্ষমার থেকে বড় কিছু নেই সংসারে। তাই এক্ষেত্রে বাবার উপদেশটা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চাই।'

'ব্র্যাড, আমি তোমার এই কথা শুনে সত্যি খুব মুগ্ধ। আমি তোমাকে আগে ঠিক চিনতে পারিনি। এখন জানলাম, তুমি কি মহান, আশ্চর্য তোমার অভিব্যক্তি, তোমার মনের প্রসারতা!' এগিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর সেক্রেটারীর ঘরে যাওয়ার দরজা খুলে বললেন, 'এসো সান্দ্রা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

সান্দ্রা ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'মিঃ রোয়ান আমাদের কোম্পানীর প্রচার ব্যবস্থার দায়িত্ব নিচ্ছেন। আমার ইচ্ছে, তুমি এখন থেকে নিউ ইয়র্কে গিয়ে আমাদের স্বার্থে ওঁর সঙ্গে সহযোগিতা করো।'

'না, আমি কোথাও যেতে চাই না, অন্তত কিছুদিনের জন্যে আমি আপনার কাছে

থাকতে চাই মিঃ ব্রেডি।' সান্দ্রা শান্ত সংযত স্বরে বলে ম্যাটের দিকে তাকায় ওর আয়ত চোখ দুটি তুলে।

'তুমি, তুমি আমাদের কাছে থাকবে সান্দ্রা?' বৃদ্ধ পিতার মুখে খুশির আমেজটা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

ফিরে আসছি ঠিক তখনি মিঃ ম্যাট ব্রেডি আমাকে কাছে ডেকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের পরিবারের সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত—'

আমি জানি এরপর তিনি কার নাম উল্লেখ করতে চান। 'হ্যাঁ, মিসেস স্কাইলার আমার বান্ধবী, খুব ভালো মেয়ে ও। শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তিত। আমি ওকে সাহায্য করতে চাই।'

'শুধু কি তাই?' মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'তোমাদের যেকোন কাজে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো। তোমরা এগিয়ে যাও।'

ন'টার কিছু পরে আমার প্লেনটা ওয়াশিংটনে এসে পৌছালো, এবং প্রায় দশটার সময় এলেনের এ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে আমি বেল টিপলাম।

একটু পরেই এলেনের পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে শুনলাম দরজার ওপারে। আমার পা দুটো হঠাৎ কেঁপে উঠলো। দরজা খুলে যায়। দরজা খুলতেই এক ঝলক জ্যোৎস্নার আলো যেন এসে পড়লো আমার চোখের ওপর। ভালো করে চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে দেখি পূর্ণিমার সুন্দর নিটোল গোল চাঁদ আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত। 'এলেন!' ফিস্‌ফিসিয়ে আমি বললাম।

আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ও মুখে হাত চাপা দিয়ে অস্ফুটে বলে ওঠে, 'ব্র্যাড।' আমার দিকে স্খলিত পদে এগিয়ে এসে এলেন বলে, 'কেন তুমি এলে ব্র্যাড? আমরা দুজনই জানি, আমাদের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে আবার—'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, ওভাবে আমাকে ভুল বুঝে তুমি চলে আসতে পারো না।'

'আর তুমিও আমাকে আর পাঁচটা মেয়ের মতো সস্তা মেয়ে ভাবতে পারো না!' ক্রুদ্ধ স্বরে এলেন বলে ওঠে, 'আমি তোমার সান্দ্রা নই।'

'এলেন!' আমি চিৎকার করে বললাম, 'তুমি যা ওকে ভাবছো ও ঠিক তা নয়। ওকে চাকরীর ব্যাপারে আমি সাহায্য করবো বলেছিলাম বলেই ও আমার কাছে এসেছিল দেখা করতে। আর কোন উদ্দেশ্য ওর ছিলো না, বিশ্বাস করো—'

কোন কথা বললো না ও, কেবল ও ওর গভীর কালো দুটো চোখ তুলে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যে, দেখে মনে হলো ও বলতে চায়, বিশ্বাস করেছে আমাকে।

অতঃপর আমি এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত স্পর্শ করতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে ও আমাকে ফিরিয়ে দেয়।

'যাও,' তিক্তস্বরে ও অস্ফুটে বলে, 'আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। প্লিজ—'

'আমি তা পারি না এলেন, তুমি আমার সব কিছু। আমি তোমাকে একলা ছেড়ে যেতে পারি না। কেবল তুমি যদি আমাকে বলো, তুমি আমাকে ভালোবাসো না, তবেই আমি ফিরে যেতে পারি।'

মুখ নিচু করে ও বলে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি না।'

'কিন্তু কয়েকদিন আগে তুমি বলেছিলে, আমাকে তুমি ভালোবাসো। বলো, তখন তুমি মিথ্যে বলছো? কিংবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলো তোমার সেদিনের সে কথা মিথ্যে—'

ধীরে ধীরে আমার মুখের দিকে তাকালো ও। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। 'আমি—আমি—' কথা শেষ করতে পারলো না ও।

আমি হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ও আমার বাহুপাশে ধরা দিলো। আমার বুকে মুখ রেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে ও, ওর দেহের কাঁপন আমি টের পাই আমার বুকের মধ্যে। কান্না জড়ানো স্বরে ও বলে, 'সেদিনের সেই মুহূর্তে...তোমার অফিসে ফিরে গিয়ে চমকে উঠি আমার জায়গায় সান্দ্রা—অথচ আমি তোমার স্ত্রীর মতো—হঠাৎ নিজেকে তখন ভীষণ ছোট মনে করলাম।'

আমি ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। ওর রেশমী নরম চুলে ঠোঁট ছোঁয়াই। আমি বেশ বুঝতে পারি আমার বেদনার অশ্রু চিবুক বেয়ে ওর চুল ভেজাচ্ছিল তখন। 'প্লিজ এলেন,' আমি ওকে অনুরোধ করলাম, 'কেঁদো না লক্ষ্মীটি!'

ও আমার ঠোঁটে বারবার চুমু খেতে খেতে বলতে থাকে, 'ব্র্যাড, ব্র্যাড, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার কাছ থেকে আমাকে আর পালিয়ে যেতে দিও না। আমাকে ছেড়ে তুমি যেও না ব্র্যাড!'

'হ্যাঁ, প্রিয়তমা, তোমাকে আমি আর কোনদিনও ছেড়ে যাবো না।' একটা আশ্চর্য সুন্দর আনন্দঘন মুহূর্ত দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখার জন্যে আমি চুম্বনের প্রত্যুত্তরে চোখ বন্ধ করে ওর ঠোঁটের ওপর আমার ঠোঁট দুটো চেপে ধরলাম আলতো করে।

❑ পঞ্চদশ অধ্যায় ❑

সপ্তাহ শেষের ছুটি যেন আমাদের হনিমুনের অবসরের মতো কাটছিল, যেন সবেমাত্র আমাদের বিয়ে হয়েছে। সময়ের কোন হিসেব-নিকেশ নেই, নেই কোন ভাবনা। খিদে পেলে খাই, ঘুমবার ইচ্ছে হলে তবে ঘুমোই। বাকী সময় দুজনে মুখর, কখনো কথায় কখনো বা হাসি-ঠাট্টায়। তারই মাঝে এলেন একদিন প্রশ্ন তুললো, 'ব্র্যাড, আমাদের জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছো? এ ভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে কতোদিন পালিয়ে থাকবো আমরা, সে কথা কি ভেবে দেখেছো? একদিন না একদিন তোমাকে তো বাড়ি ফিরে যেতে হবেই। তারপর?'

আমি ওর ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিয়ে বলি, 'কেন, যেভাবে চলছে, বাকী জীবন ঠিক

সেই ভাবেই চলবে।' আমি ওর নরম চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলি, 'তারপর তুমি যে কথাটা ভাবছো অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছো না, সেটাই আমি করবো, অর্থাৎ তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই এলেন!'

কাঁপা কাঁপা স্বরে ও বলে, 'তুমি ঠিক বলছো, আমাকে বিয়ে করবে ব্র্যাড?'

'হ্যাঁ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, 'হ্যাঁ তোমাকে ছাড়া আমি আমার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাই না, তোমার মধ্যেই আমি যে জীবনের পূর্ণতার আভাষ দেখতে পেয়েছি।'

'আমিও তাই অনুভব করি ব্র্যাড। এখন কেন জানি না আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আপনজন বলতে কেউ আর নেই। তাই আমি তোমার মধ্যেই বিলীন হয়ে যেতে চাই। তুমি, তুমি আমাকে গ্রহণ করো ব্র্যাড, আমার জীবনে পরিপূর্ণতা এনে দাও।' দীর্ঘায়ত চোখের দৃষ্টি আমার চোখের ওপর মেলে দিয়ে ও বলে, 'একমাত্র তুমিই পারো আমার বাকী জীবন সফল করে তুলতে।' একটু থেমে এলেন আবার বলে, 'কিন্তু তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, এদের কি করবে তুমি?'

'কাল ফিরে গিয়ে মারজাকে সব খুলে বলবো। অবশ্য ও আমাদের ব্যাপারটা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছে। তাই মনে হয় ডিভোর্সের ব্যাপারে ও খুব বেশি আপত্তি করবে না। আর ছেলে-মেয়ের কথা বলছো? ওরা এখন বড় হয়ে গেছে। ওরা বুঝে গেছে, আমাদের মতো অবস্থায় পড়লে এছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই।'

'পরে ওদের ছেড়ে আসার জন্যে তোমার কোন অনুশোচনা হবে না তো? তখন তুমি আমাকে দোষ দেবে না তো?'

'না, তাছাড়া আমার মনে হয় না, সেরকম কিছু ঘটতে পারে।'

'তা না হয় হলো,' এলেন এবার বলে, 'মারজার সঙ্গে তোমার বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তোমাকে অনেক টাকা খেসারত দিতে হবে। পরে অর্থাভাবে তোমার তখন মনে হবে না তো, আমার জন্যে তোমার সংসার ছাড়তে হলো, প্রচুর অর্থ খোয়াতে হলো?'

'না, সে রকম অবস্থায় আমাকে পড়তে হবে না, কেন জানো? 'আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি,' জানো এলেন, টাকার ওপর আমার কোন দিনই তেমন লোভ ছিলো না। তাই মনে করবো তোমাকে পেয়ে আমি না হয় আমার সেই আগের অবস্থায় ফিরে গেছি। তাছাড়া তুমি তো আমার জীবনে সব চেয়ে বড় অ্যাসেট, তাই না সোনামণি?' ওর ঠোঁটের ওপর আমার ঠোঁটটা নামিয়ে এনে চুমু খেলাম। 'বলো, এলেন, তুমি আমাকে সুখী করে তুলবে কিনা?'

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে সুখ দেবো, তোমাকে স্পর্শ করে শপথ নিলাম,' এলেন আমার ঠোঁটের ওপর ওর উষ্ণ ঠোঁট দুটো চেপে ধরলো।

তারপর অনেক, অনেকক্ষণ পরে ফিস্‌ফিসিয়ে ও বলে, 'কিন্তু তোমাকেও একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ব্র্যাড, তোমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে গিয়ে মারজার ওপর কোনরকম রূঢ় ব্যবহার তুমি করবে না। আর এরকম অবস্থায় পড়ে পরে আমাকে যেন সেই কথাটা তোমাকে বলতে না হয়।'

'বেশ, কথা দিলাম তোমাকে, তাই হবে। আর,' একটু থেমে বললাম, 'তোমার আমার

জীবনে বিচ্ছেদের প্রশ্ন কোনদিন উঠবে না। মৃত্যুর পরেও আমাদের কবর রচিত হবে পাশাপাশি।'

এক সময় ফোনটা বেজে উঠতেই এলেনকে ফোনটা ধরতে বললাম। 'হ্যাল্লো, ও হ্যাঁ, উনি আছেন। আপনি ফোনটা একটু ধরুন।' আমার দিকে ফিরে এলেন বলে, 'তোমার বাবা তোমাকে ডাকছেন ব্র্যাড।'

গ্রাহকযন্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে মাউথপীসে মুখ রাখলাম, 'হ্যালো ড্যাড—'

'শোনো ব্র্যাড, তোমার ছেলের খুব অসুখ, পোলিও। মারজা হাসপাতালের পথে রওনা হচ্ছে এখুনি, দূরভাষে বাবার কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠি, 'তা তুমি কখন আসছো?'

'এখুনি, প্রথম প্লেনেই যাচ্ছি। আপনি কিছু ভাববেন না।' কাঁপা কাঁপা হাতে গ্রাহকযন্ত্রটা রেখে দিলাম। আশ্চর্য! একটু আগে কত সহজেই না বললাম, ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে আসতে আমার এতটুকু কষ্ট হবে না। এখন তুমি আমার সমস্ত মন জুড়ে বিচরণ করছো, সেখানে অন্য কারোর স্থান নেই। সেই সত্য কথাটা ছেলের অসুখের কথা শুনে মুহূর্তে যেন মিথ্যে হয়ে গেলো। মনটা আমার ছটফট করে উঠলো হাসপাতালে ছুটে যাওয়ার জন্য। সেই মুহূর্তে এলেনের কথা বুঝি ভুলেই গেলাম। হ্যাঁ, একেই বলে রক্তের টান! এলেন বোধহয় আমার মনের কথাটা টের পেয়ে গিয়েছিল। কাছে এসে কেমন করুণ চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। ওর চোখ বলছিল, ওর সব জানা হয়ে গেছে। ও বুঝে গেছে, এই মুহূর্তে আমার কাছে ওর কোন অস্তিত্ব নেই। আমার সারা মন জুড়ে ছেয়ে গেছে অসুস্থ ছেলের চিন্তায়, পুত্রের অসুখের চিন্তায় ব্যাকুল মারজার চিন্তায়। তবু ওকে সেই দুঃসংবাদটা দিতে হলো।

'জানো এলেন, আমার ছেলের খুব অসুখ। ডাক্তার সন্দেহ করছে পোলিও। এখুনি আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে। আমার দুর্ভাগ্য তোমাকে একা ফেলে চলে যেতে হচ্ছে বলে।'

'দুর্ভাগ্য তোমার কেন হতে যাবে ব্র্যাড, দুর্ভাগ্য আমার।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলেন বলে, 'যাকেই আমি ভালোবেসেছি, তাকেই হারাতে হয়েছে। মনে হয় ভালোবাসা, এবং ভালোবাসা পাওয়াটা বোধহয় আমার জীবনে মস্ত বড় অভিশাপ। যাক্ তার জন্যে আমি দুঃখ করবো না। এখন আমার একমাত্র ভাবনা, তোমার ছেলে কি করে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'এলেন—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'এখন আর কোন কথা নয় ব্র্যাড, তোমার প্লেনের সময় হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমাকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

ঈশ্বরের অসীম করুণা যে, দু'দিনের মধ্যেই আমার ছেলে বিপজ্জনক মুহূর্তটা কাটিয়ে উঠে সুস্থ হতে চলেছে। ডাক্তার হাসিমুখে বলেছে, 'মিঃ রোয়ান, আপনার ছেলের বিপদ কেটে গেছে। আপনি এখন নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন।'

বাড়ি ফিরে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মারজা। ওর কান্না যেন থামানো যায় না। ওকে যতো বোঝাই, আমি তোমারই আছি, তবু ওর

কান্না থামে না।

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ও বলে, 'আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, আমাদের ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছো। বলো, বলো ব্র্যাড, আমাদের ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না। আমাকে কথা দাও।'

মারজার অশ্রুসিক্ত চোখে চুমু খাই—অশ্রু হয়ে ঝরে পড়া ওর সব দুঃখ আমি নিঃশেষে পান করে নিলাম। কথা বলার অবসর তখন আমার ছিলো না।

সেইদিনই মারজাকে উপহার দেওয়ার জিনিষটা ডেলিভারি দিয়ে গেলো টেলারিং শপ থেকে। ফারের কোট, মারজার জন্যে অর্ডার দিয়েছিলাম। মনে পড়লো সেই অর্ডার দেওয়ার দিনেই এলেনের সঙ্গে প্রথম আমার দেখা হয়। আগামীকাল আমাদের বিবাহ বার্ষিকীর দিন।

তখনো আমি জানতাম না, বারো ঘণ্টা আগে মারা গেছে এলেন।

❑ শুরুর রেশ থেকে যায় শেষে ❑

আমার মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল, চোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল। কতক্ষণ যে অন্যমনস্ক ভাবে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম খেয়াল নেই। ইণ্টারকমে আওয়াজ হতেই সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

'হ্যাঁ মিকি, কি খবর বলো?'

'সান্দ্রা ওয়ালেস আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

ঘড়িতে তখন ছ'টা বাজে। একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, 'ঠিক আছে ওকে পাঠিয়ে দাও।'

'হ্যালো ব্র্যাড,' একটু পরেই সান্দ্রা ঘরে ঢোকে, ওর নীল চোখের জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরময়। অমন করে কি দেখছে ও!

'এসো স্যাণ্ডি,' শান্ত স্বরে আমি বললাম, 'বলো!'

'ঠিক আছে।' সান্দ্রা বলে, 'তোমার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠেছে শুনে আমি খুব আনন্দিত।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কি মনে করে এই শহরে এলে?'

'তোমার একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'কার, মিঃ ব্রেডির?'

'না,' সান্দ্রা মাথা দুলিয়ে বলে, 'মিসেস স্কাইলারের।'

'মিসেস স্কাইলারের?' বোকার মতো আমি প্রশ্ন করি, 'কিন্তু ওতো—'

'আমি জানি,' শান্ত কণ্ঠস্বর সান্দ্রার, 'আজ সকালেই দুঃসংবাদটা আমি শুনলুম। মিঃ ব্রেডি খুব মুষড়ে পড়েছেন।'

'তা চিঠিটা তুমি কি করে পেলে? ওর কাছে আগে গিয়েছিলে নাকি?'

'না, ডাকে পেয়েছি' বলে চিঠিটটা আমার হাতে তুলে দেয় সান্দ্রা। 'আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, তুমি ততক্ষণে চিঠিটা পড়ো—'

'না যেও না, এখানে বসে থাকতে পারো।'

অতি দ্রুত চিঠিটা পড়ে গেলাম।

"প্রিয়তম ব্র্যাড,

তোমাকে প্লেনে তুলে দেওয়ার পর থেকে সব সময় আমি তোমার মঙ্গলের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি। আমার একান্ত কামনা, তোমার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠুক। আর সেটাই এখন সব থেকে জরুরী।

আমি তোমার ছেলের কথাই কেবল চিন্তা করছিলাম। সত্যি তার কথা ভাবতে গিয়ে আমার মনে হলো, আমরা দুজনে কতোই না বোকা! নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাদের ক্ষণিকের কামনার কথা ভেবে সবকিছু ত্যাগ করতে যাচ্ছিলাম। কি স্বার্থপর আমরা!

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা কখনোই পরস্পর পরস্পরের হতে পারবো না। আমার জীবন তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জীবনের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে আমি তোমার জীবনের কিছু অংশ ভিক্ষা করছিলাম। ছিঃ এ আমি কি করতে যাচ্ছিলাম। তোমাকে তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কাছ থেকে স্বার্থপরের মতো ছিনিয়ে নিচ্ছিলাম?

মনে পড়ে তোমাকে আমি একদিন বলেছিলাম, ডেভিডের কথা তুমি আমাকে মনে পড়িয়ে দাও সময় সময়, ডেভিডের সব গুণগুলো তোমার মধ্যে আছে। ওর মতো তুমিও তো তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের খুব ভালোবাসো। তখন আমি ঠিক এভাবে তোমাকে বোঝাতে চাইনি নিজের কথা ভেবে। তুমি যে তোমার স্ত্রী এবং ছেলেদের এতো ভালোবাসো জানতাম না।

নির্জনে আমি যখন একা, এক'দিন আমি ছেলে-মেয়েদের কবরের পাশে গিয়ে বসতাম। তোমাকে নতুন করে উপলব্ধি করার পর কেন জানি না আমার মনে হলো, তোমার পাশে আমার কবরের স্থান হতে পারে না, আমার উপযুক্ত জায়গা হলো ডেভিডের পাশে। স্বামীর জীবন থেকে কেউ কি কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে?

তবে তাই বলে এই নয় যে, আমি তোমাকে কম ভালোবাসি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ডেভিড এবং আমার ছেলেমেয়েদের আমি আরো বেশি করে ভালোবাসি।

অতএব তুমি যেন মনে করো না, আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু তোমার পাশে আমার স্থান হতে পারে না। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝো না। ঐ ডেভিড আমাকে ডাকছে। বিদায়। আমার একান্ত অনুরোধ আমার অতৃপ্ত আত্মার জন্য তোমার ঈশ্বরের কাছে একটিবার অন্তত প্রার্থনা জানিও। বিদায়, বন্ধু বিদায়।

ভালোবাসা রইলো

—এলেন"

আমার সব দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়লো দু'গাল বেয়ে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। সান্দ্রা আমার পিঠে হাত রাখলো সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। মনে হয় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শুরুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আবার নতুন করে।

অনুবাদ ☐ শ্রী পার্থ
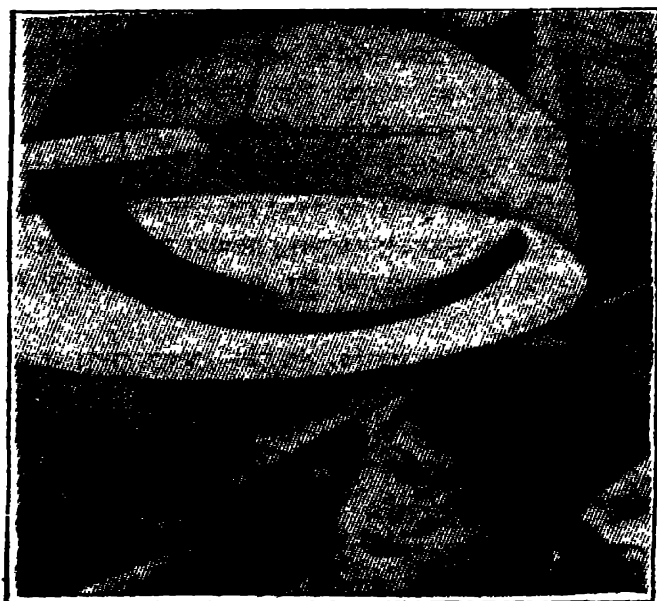
৭৯ পার্ক এভিনিউ

❑ সরকার বনাম প্রতিবাদী মেরিয়ান ফ্লাড ❑

সামনে আদালত। গাড়ী রাখার জায়গায় সবে গাড়ীটা দাঁড় করিয়েছি, পরিচারক ছুটে এসে দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। তাকে কোনদিন এর আগে আমার গাড়ীর দরজা খুলতে দেখিনি। হাতে ব্রীফকেস, গাড়ী থেকে নেমে ধীরে ধীরে হাঁটছি, ও শুধালো—ভারি চমৎকার দিন আজ, তাই না মিঃ কেইস?

বলে কি ছোকরা, ডিসেম্বরের ধূসর দিনটা সে চমৎকার বলছে! ওর ভুল ভাঙ্গালাম না। বানিয়ে বলতে হলো, হ্যাঁ জেরি, ঠিকই বলেছ। ওর ঠোঁটে এক অদ্ভুত চাপা হাসি। ওর সেই হাসিটা মনে করিয়ে দেয়, ও সব জেনে গেছে, তাই এতো আপ্যায়ণ। অথচ এখনো কুড়ি মিনিটও হয়নি ইডেন হসপিটালের একটা ঘর ছেড়ে এসেছি। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, সেই অবস্থায় তিনি ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, এ কেসটা তোমাকে নিতেই হবে মাইকেল।

তা হয় না মিঃ উইলসন। আমি অসহায়। আপনি বরং অন্য আর কাউকে এই মামলার ভার দিন।

ওরা সবাই ধান্দাবাজ। পলিটিকস্ করে। একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করা যায়, তোমার উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

আবার আপনি ভুল করছেন মিঃ উইলসন। এই মামলার ভার আমি নিতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা করবেন। এরপর আমার তখন চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য আর কোনো পথ খোলা ছিলো না। কারণ আমি বেশ ভালো করেই জানি, যেদিন থেকে টম ডিউরি জেলা-প্রতিনিধির ভার গ্রহণ করেছেন, সেদিন থেকে আইন বিভাগ বলতে গেলে এক রকম সম্পূর্ণ ভাবে রাজনীতিমুক্ত হয়েছে। আর আজ যা রয়েছে সে কেবল জন ডেউইট জ্যাকসনের উচ্চাকাঙ্খা।

বৃদ্ধ জ্যাকসন পলক-পতনহীন চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, আমি খেয়াল করিনি। তাই যখন তাঁর চোখে আমার চোখ পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তখন বলে উঠলেন, মাইক, সেই-সেই দিনটার কথা তোমার মনে আছে, সেই যে যেদিন তুমি প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে? তখন তুমি নেহাতই যুবক ছিলে, সবে তখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছো। তোমার সেই ছাত্রাবস্থার লাজুক লাজুক, ভয় ভয় ভাবটা কাটেনি তখনো। আইন পরীক্ষা পাশ করার পর সেই প্রথম তোমার ছাত্রজীবন শেষ করে চাকরি জীবনে প্রবেশ করতে যাওয়া। তাই আমার কাছে প্রথম চাকরি চাইতে এসে তোমার সেকি লজ্জা! সংকোচে তোমার চোখ-মুখ কেমন লাল হয়ে উঠেছিল। আমি তোমার সেই লজ্জা ভাবটা কাটানর জন্যে তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তা বেছে বেছে আমার কাছেই বা চাকরির

জন্যে এলে কেন? তার জবাবে তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে মাইক?

সে কথা কি ভোলা যায়? আমার স্পষ্ট মনে ছিলো, কিন্তু মনে মনে তখনি ঠিক করে ফেললাম, চুপ করে থাকবো, এবং তাই করলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে নিজের থেকে তিনিই তখন আবার বললেন, তোমার মনে পড়ছে না? ঠিক আছে, আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। বৃদ্ধ বালিশে মাথা রেখে যুতসই করে শুলেন। তারপর তিনি তাঁর কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করলেন,— তুমি সেদিন আমাকে বলেছিলে, আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা এক সৈনিক মিস্টার জ্যাকসন, আর আমার জীবিকার জন্যে আপনার কাছে আসা ছাড়া অন্য কোনো জায়গা আমার ছিলো না। এখানে একটু থেমে উনি আবার বলে উঠলেন, সেদিন আমি তোমাকে আমার অফিসে চাকরি দিয়েছিলাম কেন জানো মাইক, তোমার সততা আর তোমার কথায় বিশ্বাসের আভাষ দেখতে পেয়েছিলাম বলে। এক কথায় আমি তোমাকে চাকরি দিয়েছিলাম। সেদিন যদি আমি তোমাকে চাকরি না দিতাম, তোমার উপকার না করতাম, তাহলে আজ তুমি এতো বড় আইনবিদ হতে না, আর আমিও তোমাকে কাছে ডেকে এনে এভাবে তোমাকে খোসামোদ করতাম না। আর সেই তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছো, আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছো?

না মিঃ জ্যাকসন, আমি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করছি না। ওঁর একান্ত সান্নিধ্যে গিয়ে আমি ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহস আমার নেই, আমি কেবল এই মামলাটাই নিতে অস্বীকার করছি এই কারণে যে, এই মামলাটা হাতে নেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না, এমন কি আপনার পক্ষেও না। মামলার শুরুতেই এ-কথাটা আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, খেয়াল আছে আপনার?

হ্যাঁ, আছে বৈকি। কিন্তু মাইক, তখন তোমার কথা তেমন করে ভাববার প্রয়োজন মনে করিনি, আর এখনো যে ভাবছি তা নয়। তুমি আমাকে এড়িয়ে গেছো বলেই যে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ হবে তা নয়, তোমার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে আজো। ভাবাবেগে উদ্বেলিত ওঁর অস্ফুট কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। যদি আর কয়েকটা হাতে সময় পেতাম....., যাকগে, যদির কথা নদীতে থাক, যা হয়নি তা নিয়ে মাথা না ঘামানেই ভালো, কি বলো?

আমার খুব হাসি পেলো তখন, কিন্তু সেই হাসিটা আমাকে দমন করতে হলো, বৃদ্ধের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে। তবে আমি তো জানি, বালিশে মাথা রেখে এই মুহূর্তে বৃদ্ধ জ্যাকসন কি ভাবছেন। জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং চাঞ্চল্যকর একটা মামলা ঠিক ফয়সালা হওয়ার মুখে চিকিৎসকরা ওঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। এদিকে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি, তারপরেই রাজ্যপালের নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে ঘরে ঘরে নরক গুলজার হবে। কাফে, রেস্তোরাঁয়, কফির পেয়ালায় তর্কের ঝড় উঠবে। যদি তার আগে মামলাটার রায় বেরিয়ে যেতো, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো। সত্যি, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সব কিছুই কেমন ঠিক ঠিক চলছিল, সময় নির্বাচনের ব্যাপারে কোথাও যে ওঁর একটু ভুল হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

মাইক! ক্লান্ত কণ্ঠস্বর ওঁর, এবং এমন ব্যথিত চোখে উনি আমার দিকে তাকালেন, যা বর্ণনা করা যায় না।

ওঁর আহ্বানে কি ভাবেই বা আমি সাড়া দেবো, যখন এ-কথাটা ভাবছি, তখনি উনি আবার নিজের থেকেই বললেন, তোমাকে আর পাঁচজনের মতো কখনো মনে করিনি মাইক। তুমি ঠিক আমার নিজের সন্তানের মতোন। তোমার ওপর আমার অনেক আশা মাইক, একমাত্র তুমিই যে আমার ভরসা, সারা অফিসের মধ্যে একমাত্র গর্ব তুমি, তুমিই যে আমার একমাত্র ভবিষ্যৎ! তোমাকে আমি আবার বলছি মাইক, আমাকে তুমি যেন আশাহত করো না.....

আর আমিও আপনাকে আবার অনুরোধ করছি মিঃ জ্যাকসন, আপনি অন্য কোনো সহকারীর হাতে মামলার ব্রীফটা তুলে দিয়ে পরখ করতে পারতেন, তারাও আমার থেকে কম কিসের?

না, তা পারি না! ধবধবে সাদা চাদরটা উনি ওঁর বুক পর্যন্ত টেনে নিলেন। উনি নীরব হলেন কিছুক্ষণের জন্যে, এবং তারপরেই ওঁর মুখটা আগের চেয়ে অরো বেশি কঠিন হয়ে উঠতে দেখা গেলো, ওঁর কণ্ঠস্বর ততোধিক কঠিন শোনালো আমার কানে। আমি চাই না, ওই সুবিধাবাদী ধান্দাবাজরা আমার সুনামের সুযোগ নিয়ে তাদের আখের ভালো করুক। আমি তা কখনোই চাইবো না। তাই আমি আবার তোমাকে বলছি মাইক, আমি চাই, তুমি আবার আদালতে ফিরে যাও, স্বাধীন ভাবে প্র্যাক্টিস করো, তোমার ওপরে কারোর একটা কথা বলারও সাহস নেই। তুমি তোমার খুশি মতো কাজ করে যেতে পারো, কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না, এমন কি আমাকও নয়। চাই কি সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, এমন একটা যুক্তি দেখিয়ে আদালত থেকে মামলাটা তুলেও নিতে পারো, সবার সামনে তুমি আমাকে অপমানও করতে পারো, আমার তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি বরং মুখ বুঁজে সব সহ্য করে যাবো, তবু ওই সব সুবিধাবাদীদের মধ্যে থেকে কাউকে এই গুরু দায়িত্বভার তুলে দিতে বাধ্য করো না আমাকে।

আমার অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। উনি যে বরফ গলিয়ে জল করে দিতে পারেন, সে কথা আবার অজানা নয়। তবে উনি যা বললেন এতক্ষণ, তার একটা অক্ষরও আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। আমি বেশ ভালো করেই জানি, নিজের স্বার্থে এমন কোনো কাজ নেই যা উনি করতে পারেন না। এমন কি প্রয়োজনে উনি নিচেও নামতে পারেন, পা পর্যন্ত ধরতে পারেন তাঁর অনুজদের। তবু উনি আমার নমস্য। আমার চোখের জল আর সংবরণ করতে পারলাম না, ওঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল কানায় কানায়।

উনি বোধহয় আমার মনের কথা টের পেয়েছিলেন। তাই উৎসুক চোখে আমার মুখের দিকে তাকালেন,—তাহলে তুমি রাজি তো মাইকেল?

হ্যাঁ, মিস্টার উইল্‌সন।

মুহূর্তে তার চোখ দুটো ঝলমলিয়ে উঠল। মাথার বালিশের তলা থেকে টাইপ করা কাগজের একটা বাণ্ডিল বার করে আমার হাতে তুলে দিলেন।—জুরিদের ওপর কড়া

নজর রেখ। বিশেষ করে তিন নম্বর...

কাগজগুলো মন দিয়ে পড়ে দেখো, বললেন উনি।

চিন্তা করবেন না মিস্টার জ্যাকসন, আমি ওঁকে আশস্ত করার জন্যে বললাম, সব কাগজই আমার খুব ভালো করে পড়া আছে। তবু বলছেন যখন, আর একবার না হয় পরেই দেখবো'খন।

পায়ে পায়ে দেওয়াল পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ওঁর মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিলাম। এক ঝলক বাতাস বাচ্চা ছেলে-মেয়ের মতো ঘরের ভেতরে যেন দাপাদাপি শুরু করে দিলো। পরক্ষণেই আবার ওঁর বিছানার পাশে ফিরে এলাম।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন উনি, ওঁর কি বলার থাকতে পারে আমার অজানা নয়, তাই আমি ওঁকে একরকম বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, ওঁদের নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা হয়ে গেছে, সে জন্যে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। শুধু তাই নয়, এর আগে মামলা চলাকালীন সময়ে প্রতিটি সাক্ষ্য-প্রমাণও আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখেছি, কোনো কিছুই আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। চলে যাওয়ার জন্যে আমি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দরজার কপাটে হাত রেখে বৃদ্ধের উদ্দেশে বলে উঠলাম, আপনি যে আমাকে স্বাধীন ভাবে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন, পরে নিশ্চয়ই সেকথা অস্বীকার করবেন না মিস্টার জ্যাকসন!

না, না মাইক, এ তুমি কি বলছো? আমি কি তা পারি? আমার ওপর অনায়াসে তুমি বিশ্বাস রাখতে পারো। তুমি তো জানো, আমার কথার খেলাপ কখনো হয় না!

না, সেরকম কিছু ভেবে আমি বলিনি, শুধুমাত্র আপনার কথাটাই আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলাম আর কি। তারপর কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম এই ভেবে যে, ওর এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

আদালতের দোরগোড়ায় পা রাখা মাত্র সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হলো আমাকে, দেখতে পেলাম ওদের চোখে অজস্র প্রশ্ন। এই মুহূর্তে ওদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো মানসিকতা আমার নেই। তাই প্রশ্ন তোলার আগেই ওদের পাশ কাটিয়ে কোনো রকমে পথ করে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। মনে মনে আমি তখন অঙ্ক কষে নিই, দু'য়ে দু'য়ে চার। অর্থাৎ বৃদ্ধর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরেই উনি নিশ্চয়ই সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধির কাছে ওঁর সিদ্ধান্তের কথাটা জানিয়ে দিয়েছেন দূরভাষে।

সাংবাদিক মানেই নাছোড়বান্দা, ছিনে-জোঁকের মতো লেগে থাকাই তাদের ধর্ম। আর সেই ধর্ম পালন করতেই তাদের মধ্যে থেকে একজন আমার উদ্দেশে তাদের প্রথম প্রশ্নবাণটি নিক্ষেপ করে বসল,—শুনলাম, আপনি নাকি জেলা-প্রতিনিধির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন মিস্টার কেইস্, তা কথাটা কি আমরা সত্যি বলে ধরে নিতে পারি?

তার কথায় প্রথমেই ধাক্কা খেলাম। আমার নামের 'স্' শব্দটা সে এমন বিকৃত করে উচ্চারণ করলো, রাগে আমার সারা গা জ্বলে উঠল, তার প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো আগ্রহই জাগল না। অবজ্ঞা করে তাদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে আমি তখন নিঃশব্দে টানা

বারান্দা বরাবর এগিয়ে চললাম ধীর গতিতে।

কিন্তু ওরাও ছাড়বার পাত্র নয়। আমার সঙ্গে চলতে চলতে অজস্র প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত করতে করতে এগিয়ে চলল ওরা।

আমরা আবার এও জানতে পেরেছি.....

এবাব আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। রুখে দাঁড়ালাম। আপনারা কেন আমাকে মিছিমিছি বিরক্ত করছেন বলুন তো? আমি আমার ভাবভঙ্গিমায় তাদের বুঝিয়ে দিতে চাইলাম, আমি কিছুই জানি না, ওদের কোনো প্রশ্নের উত্তরই আমার জানা নেই। তাই ওদের আরো বললাম.—আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, দীর্ঘদিন আমি ছুটিতে ছিলাম, আর ছুটি কাটানোর পর এই প্রথম আমি আদালতে পা রাখছি।

বেশ একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, গত পরশু জেলা-প্রতিনিধি একটা তারবার্তা পাঠিয়ে আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, এটা কি সত্যি?

সঙ্গে সঙ্গে আর এক সাংবাদিক প্রশ্ন করে বসল, আমাদের কাছে খবর আছে, আপনি ছুটিতে ছিলেন, তাই আপনার ফিরে না আসা পর্যন্ত এই কেসের পরবর্তী শুনানী মুলতুবি রাখা হয়, এ কি সত্যি?

আমি আগেই ঠিক করে ফেলেছিলাম ওদের কোনো প্রশ্নের উত্তরই দেবো না। তাই ওদের প্রশ্নের কোনো পাত্তা না দিয়ে দরজার পাল্লা ঠেলে লিফটের দিকে আসতেই আমার চোখে-মুখে ঘন ঘন ফ্ল্যাসবাল্বের কয়েক ঝলক আলো এসে পড়লো। নানান রঙের আলোর ছটায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবু ওদের এড়ানোর জন্যে সেই অবস্থাতেই লিফটের প্রবেশ পথের সামনে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালাম ওদের দিকে মুখ করে।

দেখুন, ছুটির পর আজ আদালতে এসেছি, এখন আমার হাতে অনেক কাজ। এখন আমাকে একটু রেহাই দিন, দুপুরে বিশ্রামের সময় আমি আমার সাধ্য মতো আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবো, আর আমার নিজস্ব বক্তব্যও রাখবো। এখন দয়া করে আপনারা আমার পিছু নেওয়া ছেড়ে দিয়ে আদালতের কার্য শুরু করার আগে আমার কাজ গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ আমাকে একা থাকতে দিন। প্লিজ............

আমার বক্তব্য শেষ করার পর আর কালবিলম্ব না করে লিফটের ভেতরে প্রবেশ কবা মাত্র লিফটম্যান ওদের মুখের ওপর দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিলো। অচিরেই আট তলায় লিফটটা উঠে এসে থামলো। হলঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে চোরা-কুঠুরির মতো আমার ছোট্ট অফিসঘর। হনহন করে হেঁটে আমার সেই অফিস ঘরে এসে ঢুকলাম।

আমি তোমার সাফল্য কামনা করি মাইকেল। আমাকে দেখেই জোল র‍্যাডার হাত বাড়িয়ে দিল। আমার অপেক্ষায় ছিল সে সেখানে। ধন্যবাদ জোল। আশা করি তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। বৃদ্ধ উইলসন যাদের সম্পর্কে আমাকে সতর্ক হতে বলেছিলেন, জোল তাদের মধ্যে অন্যতম। উচ্চাভিলাষী। বয়সে আমার থেকে দু-এক বছরের বড়ই হবে হয়তো।

তোমাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে আমার মুখে অদ্ভুত রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে।—তাছাড়া তুমি

তো এই মামলার শুরু থেকেই বুড়োর সঙ্গে কাজ করছিলে। বেশ বুঝতে পারলাম, জোল তার দায়িত্বটা এড়িয়ে যেতে চাইছে।

তোমার জন্যে অ্যালেক টেবিলের ওপর ঐ কাগজগুলো রেখে গেছে। পরিস্কার ঝকঝকে টাইপ করা একগোছা কাগজ। টেবিলের ওপর সকালের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছিল। সেই মুক্তো-ঝরা রোদে কালো কালো অক্ষরগুলো আরো বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অ্যালেক কাটার বৃদ্ধ জ্যাকসনের অন্যতম একজন সহকারী ঠিক সময় মতো জোলকে জিজ্ঞেস করলাম, কই অ্যালেককে দেখছি না তো?

ও বোধহয় কাছে-পিঠে কোথাও গেছে, এখুনি এসে পড়বে। তুমি ততক্ষণ ওই সব নথিপত্রগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারো।

হ্যাঁ, তা তো দেখবোই, নরম গলায় বললাম।

আমি তাহলে এখন আমার অফিসঘরে চললাম, জোল বলল, দরকার পড়লে ডাকতে যেন দ্বিধা করো না, কেমন।

ধন্যবাদ জোল।

জোল দরজা ঠেলে চলে যায়। দরজাটা আবার পুরোপুরি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। তখন আমি জোলের কথাই শুধু ভাবছিলাম। এ অফিসে ও আমার থেকে পাঁচ বছরের সিনিয়ার, তবু আজ এভাবে আমাকে একটু বাড়তি খাতির করতে দেখে হাসি আর চাপতে পারলাম না। ঘরে তখন আমি একা। আমার হাসি কেবল আমাকেই শুনতে হলো। ওর হাসির কারণটা আমি বুঝি, এই কেসের ভার বৃদ্ধ জ্যাকসন আমাকে দেওয়ায় রাতারাতি জোল ওর ভোল পাল্টে আমাকে এ ভাবে খাতির করতে শুরু করেছে। এর অর্থ হলো, মানুষ মাইকেলকে খাতির করছে না ও, সব খাতির আমার এই নতুন পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে। কি অদ্ভুত মানুষের মনোবিশ্লেষন ঃ বিচিত্র মানুষ, তার চেয়েও বিচিত্র বোধহয় তাদের মন।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরালাম। উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা জানালার ধারে নিয়ে গিয়ে বসলাম, যাতে আলোর অভাবে নথিপত্রগুলো পড়তে অসুবিধে না হয়, কোনো উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট আমার দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। জানালা পথে সকালের সোনারোদ এসে পড়েছিল টাইপকরা কাগজগুলোর ওপরে, তাতে কালো কালো অক্ষরগুলো যেন আরো বেশি উজ্জ্বল, আরো বেশি ঝলমলে হয়ে উঠল।

❑ নিউ ইয়র্কের জনসাধারণ বনাম প্রতিবাদী মেরিয়ান ফ্লাড ❑

আমার বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা নিঃশব্দে মুচড়ে উঠছে। এ যন্ত্রণার শুরু আজ নয়, সেই কোন্ উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের এক গ্রীষ্মে। এ যন্ত্রণা আমার একার, একাই আমাকে বহন করতে হবে বৈকি। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রথম দিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

মাত্র ষোল বছরে আমাকে চাকরিতে ঢুকতে হয়। মা'র অনুরোধ ছিল শত কাজের মধ্যেও আমি যেন প্রতি রবিবার গির্জায় যেতে না ভুলি। সেদিন সেই রবিবারেও তার কোন ব্যতিক্রম হলো না। ক্লান্তিতে সবে চোখের পাতা দুটো একটু ঢুলে এসেছে, হঠাৎ কাঁধের কাছে কার যেন কনুইয়ের গোঁত্তা লাগল। ব্যাপারটা বোঝামাত্র আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাড়িয়ে পথ করে দিলাম এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা এবং তরুণীকে। ভদ্রমহিলার চোখে বিরক্তির ছায়া কাঁপে। কিন্তু তার সঙ্গিনী মেয়েটি আমার দৃষ্টিকে দারুণ ভাবে আটকে রেখেছিল যেন। আমাদের পাশের পাড়াতেই থাকে ও।

নিটোল মিষ্টি মুখের চারপাশ ঘিরে উজ্জ্বল একরাশ সোনালী চুল। সামান্য একটু ফাঁক হয়ে থাকা পাতলা দু'ঠোটের রক্তাক্ত পাপড়ির মাঝে মুক্তোর মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত। সুন্দর টিকোল নাক। ওর হাল্কা বাদামী রঙের উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দু'টো বড় অদ্ভুত, যেন কথা বলছে। আমার মনে হলো, নীল চোখের ভাষা পড়া তত সহজ নয় বোধহয়। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর ছোঁয়া লেগে হাজার বিদ্যুৎ তরঙ্গ যেন ঢেউ খেলে গেল আমার সারা শরীর দিয়ে।

মাফ করবেন, ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে চলে গেল ও।

সেই শুরু। আমার পরিবর্তন, নাকি অধঃপতন কে জানে। প্রার্থনায় মন দেবার চেষ্টা করলাম, কাজ হলো। তবু ঘুরে ফিরে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে ওর ওপর তখন। হাল্কা পোশাকে ঢাকা ওর দুরন্ত শরীরের স্পন্দন যেন আমার বুকের ধমনিতে অনুভূত হচ্ছিল বার বার। কিছুক্ষণ পরে ওর দেহের মৃদু স্পর্শে অনুভব করলাম মেয়েটি আমার দিকে বেশ খানিকটা সরে এসেছে। চোখ বুজে যতটা সম্ভব প্রার্থনায় মন বসাতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না, অদৃশ্য কোন শয়তান যেন ভর করে আছে আমার কাঁধে। এক সময় প্রার্থনা শেষ হতে চোখ মেলে তাকালাম ভয়ে ভয়ে। ও কিন্তু আমার দিকে তাকাল না, বরং আমার দৃষ্টি এড়াবার জন্যে মুখ নিচু করে তাকিয়ে ছিলো। আমি বোকা বনে গেলাম। একটু সরে দাঁড়িয়ে ও ওর মাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চকিতে ঠিক আমার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো।

আমার সারা শরীর আবার রোমাঞ্চিত হলো। ওর চোখে চোখ পড়তেই ও তখন আবার হাসতে শুরু করে দিয়েছিল। এমন দুর্বোধ্য হাসি আমি এর আগে কখনো দেখিনি। গোলাপের পাঁপড়ির মতো পাতলা দুটি ঠোঁট অল্প একটু ফাঁক করে অস্ফুটে ও বলে, -

—এসো আমরা ডুয়েট নাচি।

এখন এক এক সময় ভাবি, ওকে যদি সত্যিই আর কোনদিন খুঁজে না পেতাম, তাহলে আমার জীবন অন্য খাতে বইতে পারত অবশ্যই। স্মৃতির পাতাগুলোর ওপর পাথর চাপা দিয়ে আবার নড়ে চড়ে বসলাম। কাগজগুলোর এক বর্ণও তখনো আমার পড়া হয়নি। অথচ মাত্র মিনিট চল্লিশ পরে বিচারকের সামনে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আমি কেমন গড়গড় করে পড়ে গেলাম। সব যেন আমার কণ্ঠস্থ।

জনতার ঔৎসুক্য আর চাপা ফিস্‌ফিসানি শুনে আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রায় দশটার সময় আদালতে গিয়ে প্রবেশ করলাম। আড়-চোখে প্রতিবাদী পক্ষের

টেবিলের দিকে তাকাতেই দেখি, টেবিল ফাঁকা।

হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন যেন চকিতে ঢেউ খেলে গেল। পেছন ফিরে না তাকিয়েও আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না, ওরা এসে গেছে। পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে মেয়েটির দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর, ও আমাকে আদালতে দেখে স্তব্ধ, বিস্মিত। পলকের জন্যে হলেও আমার পড়তে অসুবিধে হলো না ওর সেই অতলস্পর্শী চোখের ভাষা। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ও এগিয়ে গেল নিজের আসনের দিকে। ওর হাঁটার সেই সতেজ ছন্দিত ভঙ্গি আজও একটুও বদলায়নি, এত যুগ পরেও! আশ্চর্য।

সত্যি, তাকিয়ে থাকার মতো রূপ বটে। জোল আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলল। কোন কথা না বলে আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম।

সামনের দিকে তাকাতেই দেখি হেনরি ভিটো আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে একটু ঝুকে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, —মিস্টার জ্যাকসন এখন কেমন আছেন মাইকেল?

আগের চেয়ে একটু ভালো।

ভাগ্যবান উনি, শেষ পর্যন্ত উনি প্রকৃত যোগ্য প্রতিনিধিকেই নির্বাচিণ করেছেন। কথাটা ভিটো যেন পেছনের সারিতে বসে থাকা সাংবাদিকদের শুনিয়েই বলল।

কিন্তু সত্যিকারের ভাগ্যলক্ষ্মী তো আপনারই সহায় মিস্টার ভিটো।

তোমার ওপর ওর ব্যক্তিত্বের প্রভাব কিছুতেই ফেলতে দিও না মাইকেল। জোল আমাকে সর্তক করে দিলো।

নিশ্চয়ই! আমার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠতে দেখল জোল।

পোশাকের খসখসানি এবং চাপা গুঞ্জন শুনে চকিতে উঠে দাঁড়ালাম। সেই মুহূর্তে মহামান্য বিচারপতি আদালতে এসে প্রবেশ করলেন। ছোট-বেঁটে-খাটো মানুষ এই পিটার অ্যামেলি। টাক মাথা। শিশুর মতো অনিন্দ্য সুন্দর নিষ্পাপ মুখ। আসন গ্রহণ করে টেবিলের ওপর হাতুড়ি পিটে আওয়াজ করলেন উনি। সব চুপ। একটু পরেই এই ফৌজদারী মামলার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছে।

আইন-যুদ্ধ শুরু হবার বাজনা বেজে উঠেছে, এখন ফেরার সব পথ বন্ধ। অতএব অতীতের সব দুঃস্বপ্ন মন থেকে মুছে ফেলতে হলো।

সেই স্মৃতি আমাকে যন্ত্রণায় আর কাবু করে তুলতে পারবে না। এখন আমার কেবল একটাই ভাবনা, আমার ভূমিকায় আমি যথাযথ অভিনয় করে যেতে পারব তো?

একটু পরে আমার সব ভাবনার অবসান করেছিলেন মহামান্য বিচারপতি আমাকে যুদ্ধে বাদী সরকার পক্ষের প্রধান সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ন হতে বলে। ধীরে ধীরে জুরিদের আসনের দিকে এগিয়ে চললাম। পাশ দিয়ে যাবার সময় ও আমার দিকে তাকাল না, তবু আমি বেশ বুঝতে পারি, পাগল-করা রূপ নিয়ে চোরা চোখে খুটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ্য করছে ও আমার প্রতিটি পদক্ষেপ।

'জুরি ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ,'—এখানে একটু থেমে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে আবার আমি বলতে শুরু করলাম,—নিউ ইয়র্ক শহরের নির্বাচিত

জনপ্রতিনিধিদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব জনসাধারণ দিয়েছে। যে নোংরামি এবং আইনভঙ্গের কাহিনী বলার সুযোগ আমাকে দেবার জন্যে মহামান্য আদালতকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বপ্রথমে।

মেরিয়ান ফ্লাড 'পার্ক এভিনিউ মডেল সংস্থা' নামে সম্ভ্রান্ত এক মডেল প্রতিষ্ঠানের আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে অল্পবয়েসি মেয়েদের সংগ্রহ করাতেন এবং তাদের দিয়ে নানা রকম অবৈধ ব্যবসা, মানে বেশ্যাবৃত্তি করাতে বাধ্য করতেন। মেরিয়ান ফ্লাডের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ, তিনি নাকি পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নানা ভাবে ঘুষ দিয়ে তাঁর সেই পাতা ব্যবসার পথ পরিস্কার রাখতেন। মেরিয়ান ফ্লাড তাঁর সেই হীন ব্যবসায়ে জড়িত মক্কেলদের বিরুদ্ধে স্ক্যান্ডালে ছড়ানোর ভয় দেখিয়ে অর্থাৎ ব্ল্যাকমেল করে বহু অর্থ রোজগার করতেন। এগুলোর কোনটাই সাধারণ অভিযোগ নয়। নিরীহ অসহায় মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, আইনের শাসন যাঁদের হাতে তাঁদের ঘুষ দিয়ে তিনি তাঁদের মুখ বন্ধ করে অবাধে তাঁর পাতা ব্যবসা ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এ-ভাবে চিরদিন চলতে পারে না, চলা উচিত নয়, তাছাড়া নিউইয়র্কের জনসাধারণ তা মুখ বুঁজে নির্বিবাদে সহ্য করবে না।

এই পর্যন্ত বলে এই প্রথম আমি বিবাদীর মুখের দিকে তাকালাম। ও তখন হাতে একটা পেন্সিল নিয়ে মাথা নিচু করে নীরবে বসেছিল। ভিটোর দু ঠোঁটে লেগে রয়েছে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা।

মেরিয়ান ফ্লাড —স্বৈরিনী, কলঙ্কিনী, বহু বিতর্কিত একটি নাম। মেরিয়ান ফ্লাড, উনি স্বশরীরে মাননীয় বিচারপতি এবং জুরীদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন। ওঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো আমরা সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ তুলে ধরেছি। সব শোনার পর আমি মহামান্য জুরি মহোদয়গণকে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন জনসাধারণের প্রতি তাঁদের দায়-দায়িত্বের কথা মনে রেখে এমন কঠোর শাস্তির কথা ভাবেন যাতে এ-ধরণের অপরাধ করতে আর কেউ সাহর্স না পায়।

অতঃপর মেরিয়ান ফ্লাডের অবাধ পাপ ব্যবসার সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ বিস্তাড়িত বিবরণ দিয়ে বললাম, এই সব দেখে-শুনে পুলিশ এবং জেলা প্রতিনিধি দফতর অনুমান করে নেয়, এই সংস্থার আড়ালে একদল কুচক্রী ঢালাও পাপ-ব্যবসা গোপনে চালিয়ে যাচ্ছে। তারপর সেই যৌথ অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা এই রকম ঃ

দ্রুত হাতে পাতা উল্টিয়ে আমি পড়তে থাকি। শিল্প, আলোকচিত্র এবং আধুনিক সাজসজ্জার প্রয়োজনে মডেল হিসেবে কাজ করার জন্যে পার্ক এভিনিউ মডেল সংস্থাকে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। সংস্থার পরিচালনকর্ত্রী হলেন কুমারী মেরিয়ান ফ্লাড।

পরের পাতাটা মেরিয়ান ফ্লাড সম্পর্কে পুলিশের রিপোর্ট। ছেলেবেলায় সৎবাবাকে মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে খুন করতে যাওয়া। বেশ্যাবৃত্তি এবং লোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। তারপর ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে লস এঞ্জেলস এবং ক্যালিফোর্নিয়ার কুখ্যাত জুয়াড়ি ও জালিয়াত ম্যাক আর্থারের হত্যা মামলায় সাক্ষী হিসেবে উনি বিশেষ

ভূমিকা গ্রহণ করেন। অতএব শুরু থেকে এ কাহিনীর প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন, এইসব জঘন্য অপরাধের মূলে কেবলমাত্র একজনই হাতের কাগজগুলো উচিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বিবাদী আসনের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি বলে উঠলাম, আর তিনি হলেন, ঐ মেরিয়ান ফ্লাড, স্বৈরিণী, কলঙ্কিনী—

দারুণ বলেছ! পাশ থেকে জোল মন্তব্য করল।

আচ্ছাসে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে। ভদ্রমহিলার দু' গালে। অ্যালেকও উল্লসিত হয়ে আমাকে বাহবা দিলো। এবং সেই সঙ্গে দর্শকদের মৃদু গুঞ্জন।

আমি কারোর কথাতেই কান না দিয়ে সোজা কাফে-ডি-ভুঁইন রেস্তোরাঁয় চলে এলাম। বিচারপতি আদালতের কাজ দুটো পর্যন্ত মুলতুবি রেখেছেন। কোণের দিকে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসলাম। জোল এবং অ্যালেক বসল ঠিক আমার মুখোমুখি।

আবার একটা মৃদু গুঞ্জন হতে জোল বলল, ওঁরাও টিফিন করতে এলেন।

পরিচারিকা অতি সন্তর্পণে গেলাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। আমি ছোঁ মেরে গেলাসটা তুলে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল ছোট্ট একটা চিরকুট। নিচে স্বাক্ষর না দেখেই আমি লেখককে চিনতে পারলাম। আশ্চর্য, ওর সেই ছেলেমানুষি আজও গেল না।

'তোমার সাফল্য কামনা করি, তুমি যেন নামী এবং দামী কৌসুলী হও।— মারজা।

আশ্চর্য। ভয় কাকে বলে ও জানে না। ও বেশ ভাল করেই জানে, এ কেসে আমার সাফল্য মানেই পরের দশটা বছর ওঁকে জেলে পচে মরতে হবে। সত্যি, কি দুঃসাহস? এতটুকু ভয় ডর নেই যেন। মনে আছে একবার বেপরোয়াভাবে রাস্তা পার হবার সময় ওকে বাধা দিতে ও রেগে গিয়ে বলেছিল, তোমাকে নিয়ে আমার সবচেয়ে এটাই বড় ভাবনা মাইকেল, সাধারণ কোন তুচ্ছ ঝুঁকি নিতেও তুমি কেন যে এত ভয় পাও!

কিন্তু এতে যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত, তুমি যদি মারা যেতে। ওকে আমি বোঝাতে যাই।

বেশ তো আমি মরবো, ওর বাদামী চোখে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল, তাতে তোমার কি?

ঠিক এমনি ছিল মারজার চিন্তাধারা। ভাবনার এই বৈপরীত্য নিয়েই আমরা দুজনে বড় হয়েছি। ভালবাসা এবং নিষ্ঠুরতা দুটোই সমানভাবে কাজ করত ওর মনের মধ্যে।

আর একটা দিনের কথা মনে পড়ল। মারজার সঙ্গে বেড়াতে যাবার কথা ছিল সেদিন। কিন্তু সে এলো না। শেষে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কোন রকমে অশ্রু চেপে নিজের ঘরে যাবার সময় মার হাতে ধরা পড়ে গেলাম।

ও মেয়ে তোর জন্যে নয় মাইকেল। শান্ত নরম গলায় মা বলেছিলেন। ওর মধ্যে ভালবাসা বলতে কিছু নেই। ভালবাসা যে কি জিনিষ তা ও জানে না, জানার চেষ্টা করে না কখনো।

সেদিন বুঝিনি। এতদিন পর আজ বুঝতে পেরেছি, সেদিন সহজ করে মা যে কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলেন, আসলে সেটাই মারজার জীবন-কাহিনী।

মেরিয়ান ফ্লাড প্রেমহীন এক জীবন-কাহিনীর প্রতিমূর্তি।

❑ মারজা ❑

স্টেশনারি দোকানের পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো মারজা। ফাঁকা দোকানঘর। ও অধৈর্য জানান দেবার জন্যে পাথরের মেঝের ওপর পয়সা ঠুকলো। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হলো। পেছনের ঘর থেকে দোকানি র‍্যানিসের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, যাচ্ছি।

আরে মারজা তুমি! কাউন্টারের সামনে এক গাল হেসে সে জিজ্ঞেস করল,—এই ভর দুপুরে, কি ব্যাপার?

সিগারেট চাই। পাঁচটা টোয়েন্টি গ্রাণ্ডস্।

র‍্যানিস একটু ইতস্ততঃ করে। মারজা হেসে ফেলে। ভাবনা নেই, আজ আমি নগদ পয়সা দিয়েই কিনবো।

র‍্যানিস পাল্টা হেসে জিজ্ঞেস করে, তা এতদিন কোথায় ছিলে মারজা?

তোমার কাছ থেকে পালিয়েছিলুম। মিষ্টি করে হাসে ও। আমি তো জানি তোমার কাছে আমার কত ধার হয়ে গেছে।

কাউন্টারের ওপরে রাখা ওর হাতে আলতো করে চাপ দিয়ে বুড়ো র‍্যানিস বলে, ছিঃ-ছিঃ আমি কি কখনো তোমাকে তাগাদা দিয়েছি? তুমি কি জানো না মারজা, তোমাকে দেখলে আমি কত খুশি হই?

র‍্যানিসের মুখের দিকে তাকায় ও, কিন্তু হাতটা সরায় না।—যে-কোন মেয়ে দেখলেই তুমি খুশি হও র‍্যানিস।

তোমার কাছে কেউ লাগে না। বিশ্বাস করো মারজা, তুমি ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে আমি এক পয়সা ধার দিই না। আর তোমার কাছে যে তিন ডলার পঁচিশ সেন্ট পাই, তার জন্যে তো আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই।

ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে নেয় ও। কিন্তু ফ্রান্সি ফিগান আমাকে বলেছে, তুমি প্রায়ই ধারে জিনিষ দাও।

আরে ও ছুঁড়ির কথা ছাড়ো। বুড়ো খিঁচিয়ে ওঠে,—যেমন ধার দিই, তেমনি আবার দুবেলা তাগাদা করতেও ছাড়ি না। কিন্তু তোমাকে কি আমি কখনো তাগাদা দিয়েছি? বলো দিয়েছি?

মারজা নিঃশব্দে মাথা নাড়ে, ঝাঁকুনিতে সারা কাঁধে সোনালী চুল ছড়িয়ে পড়ে এলোমেলো ভাবে। ঘরের চারিদিকে তাকাতে গিয়ে ও বলে,—দোকানটার কিছু উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, র‍্যানিস আহ্লাদে ফেটে পড়ল। পেছনের ঘরটা নতুন রঙ করিয়েছি। ভারি চমৎকার হাল্কা সবুজ রঙ।

তাই বুঝি। ভ্রূদুটো বাঁকা ধনুকের মতো করে তাকাল ও। একটু সরে এসে কাঁচের ঢাকনা-দেওয়া চকোলেটের বাক্সর ওপর ঝুঁকে পড়ে। ওর যৌবনোচ্ছল শরীরের একটা নিটোল ছায়া পড়েছে কাঁচের গায়ে। পাতলা ব্লাউজের আড়ালে নিটোল ভরাট দু'টি স্তন। বুড়ো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। অস্ফুটে বলে, কি, চকোলেট চাও?

দুষ্টুমি ভরা চোখে মারজা তাকায়। আমার হাত কিন্তু শূন্য।

পয়সার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। বুড়ো তাড়াতাড়ি কাঁচের ঢাকনাটা খুলে বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ওর পছন্দ মতো চকোলেট খুঁজতে শুরু করে। মারজা স্থির দৃষ্টি র‍্যানিসের ওপর। ও জানে কাঁচের খোলা ঢাকনায় ওর শরীরের যে প্রতিচ্ছবি পড়েছে, ঐ বুড়োটা তন্ময় হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে আছে। এ পাড়ার সব মেয়েরাই জানে, বুড়োর এক কানা কড়িও মুরোদ নেই, অথচ ষোল আনা ইচ্ছে আছে মেয়েদের শরীর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার। তাই সবাই ওকে নিয়ে মজা করে। বুড়োর মাথায় হাত বুলিয়ে যতটা আদায় করে নেওয়া যায় আর কি! মারজার কিন্তু বেশিক্ষণ এই সস্তার খেলা ভালো লাগল না। ওখান থেকে সরে দাঁড়াল ও।

নিরুপায় র‍্যানিস চকোলেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো। মারজা হাত বাড়াতেই বুড়ো খপ করে অন্য হাত দিয়ে ওর নরম হাতটা ধরে ফেলল। এবার কিন্তু হাতটা ছাড়িয়ে নেবার কোনরকম চেষ্টা করলনা ও।

এ তল্লাটে তোমার মত সুন্দরী মেয়ে আর একটাও নেই মারজা। সত্যি বলছি, ছোট্ট মেয়েদের মতোন তোমার হাতটাও কেমন সুন্দর।

তাই নাকি! মারজার ঠোঁটে আবার দুষ্টুমির হাসি।—কিন্তু এখন আমি আর ছোট্ট নই র‍্যানিস, ষোল বছর প্রায় ছুঁতে চললাম।

সে কি! দেখতে দেখতে তুমি এতো বড় হয়ে গেলে? বুড়ো অবাক হয়ে তাকায়।— তাহলে তো স্কুলের ছেলেরা তোমাকে এখন পাওয়ার জন্যে পাগল। ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে কোন নির্জন জায়গাতে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, করে না?

জানি না তো। ন্যাকা সাজার ভান করে মারজা। কি বলতে চাইছো একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হয় র‍্যানিস, বুঝিয়ে দেবে?

নিশ্চয়ই। র‍্যানিস ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে, এসো, তোমাকে আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মারজা দেখে উত্তেজনায় বুড়োর মুখ থমথম করছে, কথা বলতে পারছে না। মারজা মুচকি হাসে, হ্যাঁ কি যেন বোঝাবে বলছিলে র‍্যানিস?

র‍্যানিস আলতো করে ব্লাউজের ওপর আঙুল ঠেকায় ওর নরম নিটোল বুক স্পর্শ করার জন্যে। ভয়ে ভয়ে তাকায়, ও রেগে গেল না তো—এখানটায় হাত দেবার জন্যে।

না, ও রাগ করল না, এমন কি তার হাতটা পর্যন্ত সরাল না। বরং ওর দুষ্টু-দুষ্টু চোখে ঝিলিক খেলে যায়। ও, হ্যাঁ মিঃ র‍্যানিস তারা আমার জন্যে পাগল, পারলে আমার দেহটা দুমড়ে-মুচড়ে দেয় এমনি ভাব যেন তাদের সব সময়। কখনো আমি তাদের ডাকে সাড়া দিই না। সেটা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। সামান্য একটু সরে গিয়ে হাত বাড়ায় ও,—আমার চকোলেটটা এবার দাও মিঃ র‍্যানিস।

কিছু না ভেবে সে চকোলেটটা দিয়ে বললো— পেছনের ঘরটা কেমন রঙ করেছি দেখবে?

কথা বলল না ও। নীরবে চকোলেটের ওপর থেকে রাংতা খুলতে ব্যস্ত তখনও।

ঐ ঘরটায় তুমি যদি আসো দেখবে তোমার ভালো লাগবেই। আর সেই সঙ্গে তোমার কাছে আমার পাওনা তিন ডলারের কথাও আমি ভুলে যাবো।

চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে চকোলেটটা মুখে পুরে দিলো ও। এবং তার কথার উত্তর না দিয়ে ফিরে যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

মারজা, যেও না। কাতর অনুণয়ের সুর ছিল তার সেই আহ্বানে,—তোমাকে আমি আরো কিছু টাকা দেবো। এমন কি তুমি যা চাইবে দেবো। এসো। অন্তত একবারের জন্যে।

মূহূর্তের জন্যে ও থমকে দাঁড়াল। না, মিঃ র‍্যানিস। নম্র এবং ওর স্বভাব-সুলভ দ্রুত স্বরে ও বলল,—তোমার জন্যে আমি এখনো ঠিক নিজেকে তৈরী করতে উঠতে পারিনি।

তারপর হঠাৎই ও তার মুখের ওপর দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় নামল। আর ওদিকে বুড়ো র‍্যানিস তখন পরাজিত সৈনিকের মতোন আক্ষেপ এবং হতাশায় ভেঙে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ছিল।

দোকানের বাইরে আসতেই গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যের আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। পথ প্রায়ে মরুভূমির মতোন নির্জন, মাঝে-মধ্যে আতি উৎসাহী বাচ্ছা ছেলেদের খেলা দেখা গেলো। পয়সা থাকলে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত সিনেমা হলে ঢোকা যেত। ভাবল মারজা। মারজা, পরিচিত মেয়েলী কণ্ঠস্বর শুনে পেছন ফিরে তাকাল ও। ওর বান্ধবী ফ্রান্সি ফিগান ডাকছিল। নিটোল বুক, ভরাট নিতম্ব, ঘন নীল দুটি চোখ।

ফ্রান্সি, তুই?

কতটুকু পথই বা হেঁটেছে ফ্রান্সি! বেচারি। সামান্য একটু পথ হেঁটে আসতেই হাঁফিয়ে উঠেছে ও। দেহটা ওর বেশ ভারি। নিটোল গোলাকৃতি বুক, ভরাট নিতম্ব, চমৎকার পায়ের গড়ন। মারজার থেকে মাত্র বছর খানেকের বড় ও। মাথা-ভর্তি কালো কুচকুচে চুল কাঁধ ছুঁই ছুঁই। ঘন-নীল দুটি চোখ। সব মিলিয়ে মাত্র সতেরো বছর বয়সেই রীতিমতন মহিলার মতো দেখতে হয়ে গেছে ও এখন।

তা তুই এখন কোথায় চলেছিস?

কোথায় আবার বাড়িতে! বাইরে যা গরম, বলল মারজা, পথ চলা যায় না।

তুই বড্ড বেরসিক মেয়ে, হতাশ স্বরে বললো ফ্র্যান্সি।

কেন, বেরসিক হলাম আমি কি করে? দৃঢ় প্রতিবাদ করে উঠল মারজা।

ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখবো। কিন্তু মোমের মতো শরীর তোর, রাস্তার গরমে গলে যাওয়ার ভয় বাড়ি ফিরে যেতে চাস, সেটা কি বেরসিকের লক্ষণ নয়?

ঠিক আছে, আমি না হয় বেরসিক, কিন্তু সিনেমা যে দেখবি, পয়সা আছে তোর কাছে?

না। তোর কাছে নেই?

না, আমার কাছে নেই। বাড়ির পথ ধরে মারজা।

মারজা যাস না, শোন প্লিজ। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলো ফ্র্যান্সি।

চকিত একবার ওর মুখটা দেখে নিয়ে ফ্রাঙ্গি ফিগান বললো, দারুণ একটা মতলব এঁটেছি আমি।

ওর কথায় কোন রকম আগ্রহ দেখালো না মারজা। নীরবে পায়ে পায়ে আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গেলো দুজনে।

ওই বুড়ো র‍্যানিসের ওখানে একবার গেলে কেমন হয়? ওর মাথায় হাত বুলিয়ে কিংবা আমাদের শরীরের একটু ছোঁয়া লাগিয়ে দেখাই যাক না ওর কাছ থেকে কয়েক ডলার আদায় করা যায় কি না।

ঘন ঘন মাথা নাড়লো মারজা। না, তাতে চিঁড়ে ভিজবে না। এই যে, ওর এখান থেকেই তো আসছি।

সত্যি? অবাক ফ্রাঙ্গি বিশ্বাস করতে চাইলো না মারজার কথা। কথা বলতে গিয়ে তার গলার স্বর বুজে আসে।

হ্যাঁ সত্যি রে, বিশ্বাস কর, চোখ দিয়ে বুড়ো ভামটা আমাকে রাক্ষসের মতো গিলতে দিয়েও চকোলেট ছাড়া আর কিছু আদায় করতে পারিনি।

সে কি? তারপর!

তারপর? তারপর আর কিছু নেই। সব ফক্কা। অবশ্য মিথ্যে বলবো না, ওর কথা শুনলে ও আমাকে যা দিতো, সিনেমার টিকিট কেনা ছাড়াও রেস্তোরাঁর খরচটাও উঠে আসতো।

কি রকম? থামলি কেন বল, তারপর? অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে ফ্রাঙ্গি মারজার কথা শোনবার জন্যে।

বুড়োটা আমাকে পেছনের ঘরটায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ওর কথা মতো সেখানে গেলে আমার একটা লাভ হতো, ওর কাছে আমার তিন ডলার দেনা মুকুব করে দিতো। তাতে অবশ্য সিনেমায় যাওয়া যেত না।

একটু সময় নীরবে থেকে মারজার কথাগুলো মনে মনে যাচাই করে দেখার চেষ্টা করলো। তারপর কি ভেবে বললো ও, বেশতো একটা চকোলেট দে।

নেই। মাথা নেড়ে হাসলো মারজা। সে তো কখন শেষ হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক। যা গরম!

কোন কথা বলল না মারজা। আবার নীরব হলো ও। তারপর দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চললো। এক সময় বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে ফ্র্যাঙ্গিই প্রথমে সেই নীরবতা ভঙ্গ করলো, তোর বাড়িতে এখন কে, কে আছে রে?

সবারই তো থাকার কথা, বললো মারজা। পাঁচটার আগে বেরোয় না মা।

ওর মা মফস্বলের একটা অফিস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করে, বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত কাজের সময়।

আর তোর সৎবাবা?

হ্যাঁ, সে তো আছেই। সৎ বাবার কথা উঠতেই মুখটা ঘৃণায় কালো হয়ে উঠল, এমনিতেই রোদে পুড়ে মুখটা কালো ছিলো। তার ওপর ঘৃণায় ওর মুখটা আরো বেশি যেন কালো

দেখালো। মদের বোতল ছেড়ে এক পাও বাইরে কোথায় নড়ে না সে।

কেন কাজকর্ম কিছু করে না উনি?

আর এক দফা ঘৃণায় মুখ কালো হয়ে গেলো মারজার। বালাই যাট, কাজ করতে যাবে কেন? কাজ না করেই যদি বাড়িতে বসে বসে মদের যোগান পাওয়া যায়, বোকার মতো মিছিমিছি কেনই বা পরিশ্রম করতে যাবে বল?

একটু দুর্বোধ্য চাহনি ফুটে উঠতে দেখা গেলো ফ্র্যান্সির চোখে। মারজা, তাহলে তোকে একটা খবর দিই, একদিন নিচের হলঘরে উনি আমাকে পাকড়াও করেছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো মারজা। ওর চোখে অনেক প্রশ্ন, কি বললি?

তোর খোঁজ নিচ্ছিলেন উনি।

কি জিজ্ঞেস করলো?

এই ধর তুই কোথায় যাস। তোর ছেলে-বন্ধু কারা, তোর নির্দিষ্ট কোন মনের মানুষ আছে কিনা, এই সব আর কি!

তাই বুঝি! একটু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় মারজা। তারপর ধীরে ধীরে আবার মুখ খুলল ও, এ সব প্রশ্ন আমাকেও করে সে। তার উত্তরে তুই কি বললি শুনি?

কি বলবো বল, বলার মতো তেমন কিছু আছে নাকি?

মনে মনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মারজা। জানিস ফ্র্যান্সি, সে আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। বেশ বুঝতে পারি আমাকে ঘৃণা করে। সব-সময়ে আমার দোষ-ত্রুটি ধরার চেষ্টা করে। বোধহয় আমি তার সৎ মেয়ে বলেই এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার করে আমার সঙ্গে। নিজের মেয়ে হলে তা করতো না। একটা গভীর বেদনায় মারজার কণ্ঠস্বর কেমন ভারি হয়ে উঠল। তুই বিশ্বাস কর ফ্র্যান্সি—

জানি রে, আমি সব জানি। তিনতলা থেকে আমি ওর হম্বিতম্বি, কিংবা চিৎকার সব শুনতে পাই।

ফ্র্যান্সিদের ঘরটা মারজাদের ঠিক ওপর তলায়।

এ সব বড় লজ্জার কথা রে। দুঃখ করে মারজা বলল, বাড়িতে আমার এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করে না, ভালো লাগে না। এক এক সময় কি যে হয় জানিস, কাউকে না বলে কোথায় পালিয়ে যাই।

ও কথা কখনো মনেও আনিস না, ওর হাত চেপে ধরে অনুণয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠল ফ্র্যান্সি, যদি কখনো সেরকম ইচ্ছে হয়, তাহলে অন্তত একবার বলিস, দেখবো অন্য কোথাও একটা থাকার ভালো ব্যবস্থা করতে পারি কিনা তোর জন্যে।

ওরা তখন ওদের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছিল। পাশাপাশি সব বাড়িগুলো প্রায় একই রকম দেখতে। রঙ-চটা দেওয়াল, বিবর্ণ নোংরা দরজা-জানলাগুলো যেন বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে পথ চলতি মানুষের সহানুভূতি আদায় করার জন্যে।

সিড়ির প্রথম ধাপে পা দিতে গিয়ে ওরা দুজনে চকিত ঘুরে দাঁড়াল, হঠাৎ রাস্তার ওপর থেকে তীক্ষ্ণ শিস্ দেওয়ার শব্দ কানে ভেসে আসতে।

তিনটে ছেলে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কি যেন বলাবলি করছিল। মারজা তাদের

চেনার চেষ্টা করল। তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সি, তোমার সঙ্গিনী ঐ সোনালী-চুল বান্ধবীটি কে?

তুমি নিজের চোখে দেখেই যাও না। ফ্র্যান্সি খিল্‌খিল্ করে হেসে বলল।

ফ্রান্সির সঙ্গে যে ছেলেটি কথা বলল মারজা তাকে চেনে। কিন্তু অপর দুজনকে কিছুতেই চিনতে পারলো না ও। আগন্তুক দুজনেই বেশ লম্বা। তাদের মধ্যে একজনের ফিকে বাদামী প্রায় সোনালী চুল বলা যায়, সবচেয়ে আশ্চর্য তার গভীর দু'টি নীল চোখ, মুখে সারল্যের ছাপ। অপর ছেলেটি ঠিক তার বিপরীত। সুঠাম, সুপুরুষ চেহারা। চোখে লাগার মতো চেহারা। খানিক পরেই সরল ছেলেটা চলে গেলো। অন্য দুজন ধীরে ধীরে রাস্তা পার হলো।

হ্যালো জিমি। তারা কাছে আসতেই ফ্র্যান্সি জিজ্ঞেস করল,—কি খবর?

রোগা লম্বা চেহারা জিমির। ভাসা-ভাসা চোখ। কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

তোমাদের মতোই। জিমি চকিতে তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল,— বড্ড গরম। ভাবছি রস আর আমি সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যাবো। যাবে আমাদের সঙ্গে তোমরা?

ফ্র্যান্সি উৎসুক চোখে মারজার দিকে তাকাল। ওর বাদামী চোখে গভীর আগ্রহ। ওরা দু'জনে এক সঙ্গে মাথা নাড়ল।

রসের গাড়ী আছে। জিমি বলে, আমরা ওর গাড়ীতে চেপেই কনি দ্বীপে যাচ্ছি।

মারজা এই প্রথম কথা বলল,—এমন কথা বলে মিথ্যে সময় নষ্ট করে কি লাভ?

রস এগিয়ে এসে মারজার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। বলিষ্ঠ এবং নির্ভরশীল এমন একটি মুঠোর মধ্যে মারজা ওর হাতটা সঁপে দিয়ে খুব খুশি হলো। তার প্রাণ-খোলা হাসির সঙ্গে ভরাট কণ্ঠস্বর,—তোমার মতোন একটি মেয়েকে আমি খুঁজছিলাম, আমার মনের কথা তোমার আগেই জানা হয়ে গেছল দেখছি।

পাশাপশি হাঁটতে গিয়ে ছেলেটির দিকে মারজা আড়চোখে তাকাল, তোমার মনের কথা আমি আগেই জেনে বসে আছি কিনা বলতে পারি না। তবে বুঝতেই পারছো কি গরম। তাই সাঁতার কাটার নাম শোনা মাত্র সায় দিলাম। ব্যস, এই পর্যন্ত বলতে পারি।

জিমি আর ফ্র্যান্সি পিছিয়ে পড়েছিল। ছেলেটি তার গাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বলে—আমার নাম রস ড্রেগো, তোমার?

মারজা।

শুধুই মারজা, আর কিছু নেই?

মারজা আনা ফ্লাড। আমরা পোলিশ, ইংরেজ নয় ফ্লাডজিংকি থেকে ফ্লাড শব্দটা এসেছে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হলো। ছাদ-খোলা বুইক রোডস্টারের দরজা খুলে হাসতে হাসতে বলল, শ্রীমতী, এই তোমার রথ।

মারজা গাড়ীর দিকে তাকিয়ে চকিতে চোখ ফিরিয়ে নিল, না এ গাড়ীতে আমি যাবো না। কে বলতে পারে, এটি তুমি চুরি করে আননি? চুরি করা গাড়ী চড়ে স্ফূর্তি করতে গিয়ে কোন ঝামেলায় আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না।

গাড়ীটা আমার শ্রীমতী, রস হেসে ফেলল, চোরাই গাড়ী নয়।

তবু ও রসের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। তুমি এমন কি কাজ করো যে এতো দামী গাড়ী নিয়ে চলাফেরা করো? তোমার ঐ বন্ধুটি বোধহয় সেই কারণেই তোমরা সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলো।

তুমি কি মাইকেল কেইসের কথা বলছ? আরে ওকে তো সংসার চালাতে হয় রোজগার করে। সারাদিন পরিশ্রম করে ও ওর বাবাকে সাহায্য করে। ও খুব ভাল ছেলে। বিশ্বাস করো, ওটা আমারই গাড়ী।

ততক্ষণে জিমি ও ফ্র্যাঙ্কি এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। জিমি তাকে সমর্থন করে বলল, উঠে পড়, এ গাড়ী ওরই। ওর বাবা ওকে দিয়েছে।

তবু মারজা বিশ্বাস করতে পারে না।—বেশ তো প্রমাণ দাও। দু পা পিছিয়ে এসে ও বলে।

রস রাগে ফুঁসে ওঠে।—ঠিক আছে, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না। হঠাৎ তার মাথায় রক্ত চড়ে যায় যেন। রাগের মাথায় সে বলে ফেলে,—আমার সামান্য ইসারায় তোমার মতোন হাজারটা মেয়ে আমার বিছানায় এসে শুতে পারে। বলে সে পকেট থেকে তার ওয়ালেটটা বার করে ওর চোখের সামনে তুলে ধরল।—গাড়ীটা আমার কিনা তোমায় দেখাচ্ছি।

হঠাৎ মারজা তার হাত থেকে ওয়ালেটটা ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেলে। ভেতরটা দেখতে গিয়ে চমকে ওঠে। এক সঙ্গে এতগুলো টাকা ও কখনো দেখেনি এর আগে। ওয়ালেটটার অন্যপাশে ছিল চালকের লাইসেন্স। চালক এবং মালিক দু'জায়গাতেই রস ড্রেগোর নাম লেখাছিল। ঠিকানা ঃ ৯৮৭ পার্ক এভিনিউ, নিউইয়র্ক, বয়স আঠারো। আর কোন কথা না বলে ওয়ালেটটা রসের হাতে ফিরিয়ে দেয় ও।

আগে বললেই তো পারতে, ওয়ালেটটা তাকে ফেরত দিতে গিয়ে মারজা বলল, কেন আমাকে পরীক্ষা করতে গেলে?

আমি অত্যন্ত দুঃখিত। রস ওর দিকে গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, আমায় তুমি ক্ষমা কর মারজা।

মারজা অবাক চোখে রসের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি অদ্ভুত ছেলে সে! এমন সহজ সুন্দর কথা বলে সে, মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। অথচ ওর মধ্যে একটা বুনো পাগলামি লুকিয়ে আছে। খুব ভালো লাগে মারজার ওর এমন অদ্ভুত ভাবটা দেখে। খুশি হয়ে ও তাড়া দিলো,—চলো ভীষণ গরম, জলে নামতে আমি আর একটুও দেরি সহ্য করতে পারছি না।

কনি দ্বীপ। জায়গাটার নাম 'সি গেট'। রস একটা বাড়ির গেটের সামনে গাড়ীটা দাঁড় করাল।

কি চমৎকার বাড়ি! কি অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা বাড়িটার চারপাশে। এটা তোমাদের? উচ্ছ্বসিত মারজা জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, এটা আমাদের গ্রীষ্মাবাস।

ইতিমধ্যে গেটম্যান জো গেট খুলে রসের দিকে অবাক চোখে তাকায়, মিঃ ড্রেগো, আপনি?

হ্যাঁ, সমুদ্রে একটু সাঁতার কাটতে এলাম। তারপর সে গেট পেরিয়ে গাড়ীর গতি আবার বাড়িয়ে দিলো।

রাস্তার দু'পাশে সবুজ ঘাসের ঢল নেমেছে, দেয়ালের চারপাশে ছায়াঘন দীর্ঘ গাছের সারি। মারজা খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে,—এ যেন একটা পার্কের মধ্যে বাস করা। কোটিপতি না হলে কেউ এখানে থাকতে পারে? তোমার বাবার অনেক টাকা তাই না?

রস গাড়ী বারান্দার নিচে গাড়ীটা থামিয়ে মারজার দিকে হিম চোখে তাকাল, আমার বাবার টাকা নিয়ে তোমার মাথা ব্যাথ্যা কিসের? ভুলে যেওনা আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

তার হঠাৎ এই রেগে যাওয়ার কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না ও।—হ্যাঁ, সে কথা আমার মনে আছে, অগত্যা স্বীকার করতে বাধ্য হলো মারজা।

বিরাট দোতলা বাড়ি। সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো ঘরগুলো। ব্যালকনি থেকে দেখা যায় দীর্ঘ তটরেখা এবং ঢেউ-ভাঙা সমুদ্রে, ফেনিল জলরাশি। রস যাই বলুক না কেন, ওর বাবা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ধনী লোক।

রস একটা ঘরের সামনে এসে বলল,—এটা আমার বোনের ঘর। মনে হয় এখানে তোমার প্রয়োজনীয় স্নানের পোশাক পেয়ে যেতে পারো। দশ মিনিট সময় দিলাম তৈরী হয়ে নাও। তারপর জিমিকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল সে।

ফ্র্যাঙ্কি আলমারি খুলে রসের বোনের দামী পোষাক দেখে বিস্মিত। মারজা ততক্ষণে তার পরণের ব্লাউজ আর স্কার্টটা খুলে ফেলেছিল, এবং অর্ন্তবাসের ফিতে আলগা করতে ব্যস্ত তখন সে।

না রস, প্লিজ এমন কোরো না! খিল খিল করে হাসতে হাসতে জল থেকে উঠেই পাগলের মতো বালির ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করলো মারজা। তাকে অনুসরণ করছিল রস পেছন থেকে। অমন কোরো না বালিতে আমার মাথা ভর্তি হয়ে যাবে।

তাতে কি হয়েছে জলে আবার ধুয়ে ফেললেই তো মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দু'হাত বাড়িয়ে মারজাকে ধরতে যায়, কিন্তু সাবধানে তাকে এড়িয়ে যায় ও চটকরে একপাশে সরে গিয়ে। টাল সামলাতে পারে না রস, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় বালির ওপর। এবং সেই অবস্থাতে চকিত দুপাশে গড়িয়ে মারজার কাছে পৌছে যায় সে। ছুটন্ত মারজার পায়ের গোড়ালিটা হাত দিয়ে টেনে ধরতেই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তার পাশে আছড়ে পড়লো মারজা।

পাশাপাশি শুয়ে ওরা তখন নিঃশব্দে হাসতে থাকে, হ্যাঁ করে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে দু'জনেই। এক সময় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতেই সরাসরি সূর্যের দিকে মুখ করে চিৎ হয় শোয় মারজা। দুচোখের পাতা এক করে মুঠো মুঠো নরম উত্তাপ উপভোগ করতে থাকে ও। মারজার তখন মনে হচ্ছিল, স্বর্গসুখ কাকে বলে ওর জানা নেই। তবে এই মুহূর্তে ওর মনে হয়েছে, যেখানে ও শুয়েছিল সেটাই ওর স্বর্গ, সেটাই ওর সুখের সাম্রাজ্য। এখানে

থেকে সুখ, আবার এখানকার স্বপ্ন দেখেও সুখ আছে।

সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা মারজা অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে দেখলো কনুইয়ের ওপর ভর রেখে ওর দিকে তাকাতে গিয়ে বুঝি পলক ফেলতে ভুলে গেছে রস। ওর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই রস শান্ত সংযত এবং মিষ্টি সুরে বলে. উঠল, আহা কি ভালো যে লাগছে তোমাকে!

মারজা ওর চোখের তারায় এক অদ্ভুত খুশির ঝিলিক তুলে অস্ফুট পাল্টা প্রশ্ন করল, খুব খুব ভাল লাগছে তোমায়?

হুঁ।

কিন্তু জিমি আর ফ্র্যান্সি তো দেখছি দারুণ জমে গেছে, জল থেকে উঠে আসার নামটি নেই ওদের।

কি আর দোষ বলো ওদের? মিষ্টি করে হাসলো মারজা। দুজনে এক সঙ্গে মিলিত হলে লোভ সামলানো দায়।

চকিত মারজার দিকে একবার তাকিয়ে উঠে বসলো রস। তার চোখে এখন হাজারো প্রশ্ন। বেশ তাই যদি হয়, তুমিই বা কেন সাত তাড়াতাড়ি উঠে এলে।

এসব লোভ আমার বরাবরই একটু কম। মারজার নরম হাসিটা কেমন অদ্ভুত লাগলো। তাছাড়া কি রস, ভালো কিছুর বেশি লোভ করাটা ঠিক নয়, কারণ সব ভালো আমার আবার ধাতে সয় না।

কিন্তু আমার লোভটা যে অনেক বেশি মারজা। রস তার মুখটা মারজার মুখের খুব কাছাকাছি নামিয়ে এনে নিচু গলায় বলল, তোমাকে ভোগ করার জন্যে আমি যে আর একটুও অপেক্ষা করতে পারছি না প্রিয়তমা।

মারজা এবার সরাসরি তার চোখের দিকে তাকায়। রসের চোখদুটো অসম্ভব লাল দেখাচ্ছিল, তার চোখের পাতাদুটো যেন গাঢ় ঘুমের ঘোরে ভারি হয়ে উঠেছিল। তার জীবনে মারজাই প্রথম এমন গভীর ভাবে তার চোখে চোখ রাখলো, রসের মনে হলো, তার মনের দুয়ার খুলে গেছে ওর কাছে। ও তার মুখের গহন-গভীরের সব কিছুই এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো ওদের দুজনের মধ্যে।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করলো মারজাই এক সময়। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি বলছো?

হ্যাঁ, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

কিন্তু রস, আমি তোমার উপযুক্ত নই।

কেন নও, হতেই হবে। দুহাত বাড়িয়ে মারজার দু কাঁধে রস আলতো করে রেখে সে এবার ওর অর্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপের পাঁপড়ির মতো রক্তাভ ঠোঁট জোড়ার ওপর তার মুখটা ধীরে ধীরে নামিয়ে আনে। পরক্ষণে মারজার জিভে, ওর নরম ঠোঁটের ওপর যেন উত্তপ্ত আগুন তখন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে।

মারজার কাছ থেকে কোন বাধা না পেয়ে রস এবার ফুলের মালার মতো হাত দুটো ওর গলার নিচে জড়িয়ে রেখে মারজার মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরলো তপ্ত বালির মধ্যে। আবেশ জাগানো একটা অদ্ভুত উষ্ণতায় তার চোখের পাতাদুটো একটু একটু করে বুঁজে

আসে। এর আগে এমন গভীর ভাবে কোন মেয়ে তাকে চুমু খেতে দেয়নি।

মারজা তখনো তার চোখের ওপর থেকে ওর চোখদুটি সরিয়ে নেয়নি, ওর চোখের আবেশ জড়ানো চাহনি তখনো স্থির অকম্পন। সেই চোখের দেখার একটা মিষ্টি মধুর আমেজ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছিল রক্তের প্রতিটি শিরা উপশিরায়, প্রতিটি প্রায় স্নায়ুতন্ত্রীতে। রসের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়বিষ্ট মারজা ভাবছিল। আশ্চর্য সব ছেলেরাই কি একই রকম হয়ে থাকে, তারা যখনই ওকে চুমু খায়, সবাই তখন কেমন বোকা হয়ে যায়। নারীর স্পর্শে এটা তাদের দুর্বলতা কিনা ঠিক বুঝতে পারে না ও। অথচ ওদের বেলায় তো এরকম দেখায় না। মারজা দেখে, রসের চোখের পাতাদুটো ধীরে ধীরে কেমন আবেশে বুজে আসে। সব ছেলেদেরই এমনটি হয়ে থাকে, এই একটা ব্যাপারে রসের অন্য ছেলেদের থেকে ব্যাতিক্রম নয় বলে মনে হলো ওর।

এরপর মেয়েদের কাছ থেকে বাড়তি প্রশ্রয় পেয়ে সব ছেলেরা যা করে থাকে তাই করলো রসও। তার অনুসন্ধানী হাত দুটো তখন ওর সর্বাঙ্গে ঘোরাফেরা করতে থাকে। তার উষ্ণ নরম হাতের স্পর্শে থেকে থেকে শিউরে উঠতে থাকে মারজা। এরই মধ্যে বুঝে গেছে মারজা, অন্য সব পুরুষদের মতো বর্বর নয় রস। তাই তাকে আরো বেশি প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে ও এবার একটু বেপরোয়া হয়ে উঠে ধীরে ধীরে নিজের সাঁতার পোশাকের বাঁধনগুলো আলগা করে দিতে থাকে যাতে করে ওর নগ্ন শরীরে তার হাতের স্পর্শসুখটা আরো স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারে!

রস এবার আগের চেয়ে আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অনুভবে মারজা বুঝতে পারে, রস আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে উঠছে। ওর দেহের মধ্যে তার ছটফটানি লক্ষ্য করে মারজা এবার নিজেকে তার কাছে সম্পূর্ন সঁপে দেওয়ার জন্যে তৎপর হয়ে উঠল। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিজের মুখ থেকে রসের মুখটা সরিয়ে এনে মারজা ওর পুরুষ্টু স্তনজোড়ার ওপরে চেপে ধরে।

নিমেষে মারজা অনুভব করলো ওর স্তনবৃন্তের চারপাশে তার দাঁতের নিস্পেষণ। ওর তখন সারা শরীরের শিরা উপশিরা থেকে চলকে ওঠে উষ্ণ রক্তস্রোত। হাঁপিয়ে উঠেছিল রস। মারজার দেহ মনের শক্তির কাছে সে তখন প্রায় পরাস্ত। বুঝিবা একটু দম নেওয়ার জন্যে রস তার মুখটা ওর স্তনবৃন্তের ওপর থেকে সরিয়ে নেওয়ায় চেষ্টা করতেই ও তখন আরো শক্ত করে তার মাথাটা নিজের বুকের ওপরে চেপে ধরলো। রসের অমন অসহায় ভাব দেখে মারজা ওর পাতলা ঠোঁটের কোনে অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলের মতো হাসির ঝিলিক হেনে তার দিকে তাকালো। পুরুষদের দিয়ে নারী তার ইচ্ছে মতো যা করিয়ে নিতে চায় সেই চিরন্তন ইচ্ছেটা সেই মুহূর্তে মারজার মনে জেগে উঠলো তীব্র ভাবে। এসব ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা অনেক, অনেক বেশি আগ্রাসী, মারজাও ব্যতিক্রম নয়।

রস। ওর মৃদু কন্ঠস্বর অনেক দূর থেকে ভেসে আসার মতো শোনালো। উঁই। অনেকটা কান্নার মতো শোনালো রসের অস্ফুট কন্ঠস্বর। অনুভবে মারজা তার রক্তের স্পন্দন বুঝতে পারলো। টের পেলো তার দেহ তখন উত্তাল। রসের জলসিক্ত সাঁতার পোশাকের নিচ

থেকেই সেই উত্তাল ঢেউ ক্রুদ্ধ গর্জনে আছড়ে পড়তে লাগলো ওর নগ্ন দেহতটের অনুভূতিপ্রবণ প্রতিটি কূলে উপকূলে। কেমন যেন দেহ নিংড়ানো আবেশ জড়ানো একটা যন্ত্রণায় বার বার কেঁপে উঠতে থাকলো মারজা। ওর দেহ-মনও তখন উত্তাল, সারা দেহে ওর তখন ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। ওর মনে হয় যেন ওর হৃদয়ের সব স্পন্দন বুঝি স্তব্ধ হয়ে যাবে এখুনি। সব লজ্জা-সরম ভুলে গিয়ে মারজা তখন দুহাত দিয়ে রসের নগ্ন শরীরটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। আর তারপরেই চরম মুহূর্তে অনুভব করলো একটা বিপুল শিহরণ, ক্ষণিকের জন্যে। তারপরেই সব কেমন শান্ত হয়ে গেলো।

মারজার দেহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দু'হাত দূরে ভিজে বালির ওপরে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো রস। হাঁপাচ্ছিল সে তখনো।

মারজারও সারা দেহ একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির আবেশে ছেয়ে গেছে। রস ওর দেহ-মন ভরিয়ে দিয়েছে কানায় কানায়। ওর শেষ সুখ-তৃপ্তির জানান দিতে রসের পাশে শুয়ে পড়ে তার নরম চুলে হাত বোলাতে বোলাতে নরম গলায় ডাকলো ও, রস, প্রিয়তম আমার—

কেমন যেন একটা জড়তায় পেয়েছিল রসকে তখন। কোন রকমে সেই জড়তার আড়মোড়া ভেঙে ধীরে ধীরে মাথা তুলে মারজার মুখের ওপরে দৃষ্টি ফেললো। তখনো তার দুচোখের পাতায় লজ্জার আবরণে জড়ানো এক অদ্ভুত বিস্ময়। কথা বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে উঠল, এ তুমি কি করলে মারজা?

মাত্র ষোল বছর বয়সেই কেমন পরিণত মেয়েদের মতো মারজা ওর দু'ঠোঁটের ফাঁকে চাপা এক-টুকরো হাসি ফুটিয়ে রসের মুখের দিকে তাকায়। ওর আয়ত চোখের গভীর এক অনুরাগের ছোঁয়া রসকে আরো বেশি বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো।

তারপর ওর সেই মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রস, ঠিকই করেছি রস। আমি তোমাকে আমার মনের অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছি আমার বড় আদরের সোনামনি, আমার হৃদয় উজার করা সব ভালোবাসা দিয়ে আমি যে তোমাকে সুখী করতে চাই রস।

না, এরকম সুখ, এরকম সুখের পথ আমি চাই না। মারজার প্রতিটি কথায় বার বার শিউরে ওঠে রস। কাঁপা কাঁপা ঠোঁট দুটোকে রস তাড়াতাড়ি সর্বশক্তি দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করলো। সে তার চোখের জল অনেক চেষ্টা করেও সামলাতে পারলো না। বয়সে মারজার চেয়ে বড় সে, তবু ওর কাছে নিজেকে একটা ছোট্ট শিশু বলেই মনে হয়। মারজার কাছে তার অনাথ ভাবটা কাটানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টার ত্রুটি করলো না। সে তার পৌরুষ প্রদর্শনে ব্রতী হলো এবার। যা তুমি করেছো করেছো, কিন্তু ভবিষ্যতে কখ্খনো এমনটি আর করো না।

কেন প্রিয়, আমাকে তোমার ভালো লাগেনি? আমি কি তোমাকে একটুও সুখ দিতে পারিনি?

না।

ঠিক আছে, আর কখনো এমন করবো না।

এমন রূঢ় একটা কথা বলতে গিয়ে বুক ফেটে যাচ্ছিল রসের, তবু সে নাচার। এ

ছাড়া তার করার আর কিছু ছিলো না। দেহ-মন তার ক্লান্তিতে ভরে উঠলেও তার দৃষ্টি চিন্তা স্থির অকম্পন। দেখলো সে, তার চোখের সামনে বিষন্ন, বিধ্বস্ত মারজ্জা ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। বেলাশেষে নরম সোনালী রোদ তার সোনালী চুলের সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করতে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো মারজ্জা, কষ্ট হচ্ছিল,তবু হাসলো ও। ওর চোখের তারা চিকচিক করে উঠল। তোমাকে আমি বলেছিলাম না, এই দেখো, বালিতে কেমন আমার মাথা ভর্তি হয়ে গেছে? এখন ধুতে হবে, এ অবস্থায় বাড়ি ফিরলে বাড়ির লোক কি বলবে। চলো আমার সঙ্গে, তুমি আমার মাথা ধুইয়ে দেবে না?

রসের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো মারজ্জা।

ওর আহ্বানে সেই মুহূর্তে সাড়া দেবার মতো মানসিকতা ছিলো না রসের। ঠিক ওকে ফিরিয়ে দেওয়া নয়, তবে ওর সঙ্গে গেলো না রস। বলল তুমি এগিয়ে যাও, একটু পরেই আমি যাচ্ছি।

তেমনি বালিরেখায় কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে থেকে মারজ্জাকে বালির ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যেতে দেখলো রস। তবে বড় একটা ঢেউয়ের ওপর ও ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মারজ্জাকে অনুসরণ করে ছুটতে শুরু করলো।

বেলা পড়ে আসছে। বিকেলের সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমের দিকে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, আস্তে আস্তে অন্ধকার ছেয়ে যাবে যতদুরে চোখ যায় ততদূরে। আর সেই অন্ধকারের রূপকারকে ঠেকানোর জন্যে বিশাল সূর্যটা গনগনে আগুনের শিখার মতো এখন প্রাণপনে চেষ্টা করছে। তবে সূর্যের তেজ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দোসর গুমোট ভাবটাও কেটে গিয়ে এখন ঝিরঝিরে হিমেল মিষ্টি একটা বাতাস বইতে শুরু করেছে।

বালির ওপর একটা চাদর বিছিয়ে শুয়েছিল ওরা। উঠে বসে সময়ের হিসেব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল মারজ্জা। এখন সময় কতো বলো তো?

আকাশের পানে চাতক পাখির মতো তৃষ্ণার্ত চোখদুটি মেলে রস বলল, প্রায় সোয়া ছটা হবে।

কি করে বুঝলে?

কেন, আকাশকে নিরীক্ষণ করে। বেশ কিছুদিন আমি ব্রতচারীতে ছিলুম কিনা, তাই—

ওহো তাই নাকি? রসের কাঁধে ভর রেখে মারজ্জা বলে, একজন ব্রতচারীর সঙ্গে এই যে আমার আলাপ হলো তাতে আমি খুবই খুশি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রসকে নড়েচড়ে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি তার কাঁধের ওপর থেকে মারজ্জা ওর হাতটা সরিয়ে নিলো। এই, তুমি রাগ করলে? লক্ষীটি বিশ্বাস করো, সত্যি আমার খেয়াল ছিলো না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো না হয় বিশ্বাসই করে নিলাম, গম্ভীর গলায় বলল রস।

বেশ বুঝতে পারছি, আমার ওপরে বিরক্ত হয়েছো তুমি। অনুযোগ করলো মারজ্জা।

তোমাকে ছুঁই এ তুমি চাও না।

না, কথাটা তা নয়। তবে কি জানো মারজা, এ ব্যাপারে আমি এখনও অনভিজ্ঞ, তোমার মতো রপ্ত করে উঠতে পারিনি, হয়তো তাই।

মুখে একটা মোলায়েম হাসি ফুটিয়ে মারজা জিজ্ঞেস করলো, তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি, আমাকে তোমার মনে ধরেছে, তাই না রস?

হ্যাঁ। আড্ডার টেবিলে বসে তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই তোমাকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে মারজা।

ঠিক বলছো? বিশ্বাস করতে পারছে না মারজা।

হ্যাঁ ঠিকই বলছি, যাকে ভালোবাসা যায় তাকে কখনো প্রতারণা করা যায় না। সত্যি ফ্র্যাঙ্কির সঙ্গে তোমাকে হেঁটে যেতে দেখে আমি তোমার মুখের ওপর থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারিনি। তুমি তোমার এই সুন্দর মুখখানা দেখিয়ে আমার খেলাটাই মাটি করে দিয়েছিলে, না হলে মাইক কি ওই দানটা জিততে পারতো?

মাইক! মারজার চোখে অজানা একটা কৌতূহলের ছায়া কাঁপে। মাইক মানে তোমাদের সেই বন্ধুটি, যার চুলগুলো কটা, যে আমাদের সঙ্গে আসতে অনীহা প্রকাশ করেছিল?

হ্যাঁ। শুধু না আসতে চাওয়া নয়, এমনকি তোমার উপস্থিতির কথা তাকে জানাবার পরেও একবারের জন্যে টেবিল থেকে চোখ তুলে তোমার দিকে তাকায়নি পর্যন্ত।

মারজা এবার নিজের কথায় ফিরে এলো। বেশ, তোমাকে বলতেই হবে, ঠিক বাচ্চা মেয়ের মতো নাছোরবান্দা ও, আমার সম্পর্কে তোমরা কি বলাবলি করছিলে?

আয়ত চোখে মারজার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় তার মুখ থেকে অকপটে একটা স্বীকারোক্তি বেরিয়ে আসে, তোমাকে দেখে থাকতে না পেরে ওকে আমি বলেছিলাম, এই রকম একটা পুতুল পেলে যতো দামই হোক না কেন আমি ঠিক কিনে ফেলতাম।

কপট রাগ দেখাতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মারজা হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো, রসের পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, তাই নাকি? কিন্তু ভেবোনা আমি একজন সস্তা মেয়ে।

রাগ করো না, তখন আমার মনের অবস্থা এরকমই হয়ে উঠেছিল। রস তার মনের গোপন কথাটা প্রকাশ না করে থাকতে পারলো না। জিমি আমার সঙ্গে ছিলো, তাই আমার মতো বেড়ালের ভাগ্যে সিঁকে ছিঁড়ে গেলো, তোমাকে এভাবে কাছে পেলাম। তোমার একান্ত সান্নিধ্যে আসতে পারলাম। তা না হলে হয়তো তুমি আমার কাছে অধরাই থেকে যেতে চিরদিন, দেখা হতো না কোনদিন তোমার সঙ্গে আমার।

হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। অদ্ভুত আবেশে মারজার গলার স্বর, কেমন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কাঁপা, কাঁপা গলায় বলে ওঠে, তোমার ওই বন্ধুটি কিন্তু তোমার ঠিক উল্টো, তোমাকে দিয়ে যা করালাম ওকে দিয়ে এ কাজ কখনো করানো যেত না, আনাড়ি সে একটা।

মাইক সম্পর্কে তোমার কোন ধারনাই নেই বলে এ-কথা তুমি বলতে পারলে মারজা, তুমি জানো না ও যে কত ভালো ছেলে। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল রস। জানো মেয়েদের

ব্যাপারে কোন দুর্বলতাই নেই ওর। ভালো ছেলে বলে ও শুধু নিজেকে পড়াশুনোর মধ্যে ধরে রাখতে চায়, আর বাইরের জগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ওর ওই অক্ষমতার জন্যে যদি তুমি ওকে আনাড়ি বলে ধরে নাও মস্ত বড় ভুল করবে। আর আমি তোমাকে এও বলে রাখছি ভবিষ্যতে ও একজন নামকরা আইনজ্ঞ হবে। সেরকম কিছু না হোক, হয়তো আদালতে তোমার কেস লড়ার জন্যে বিশেষ ভাবে ওকে তোমার প্রয়োজন হতে পারে। আর তখন তুমি বুঝতে পারবে কত বড় উপকারী ও তোমার কাছে।

আমি দুঃখিত রস, না জেনে ওর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে ফেলার জন্যে। বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত মারজা মনে মনে মাইকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলো। এর পর মাইকের সম্পর্কে ওর কৌতূহল কেমন দুর্বার হয়ে উঠল। আচ্ছা রস, ও কি তোমার সমবয়সী?

না, আমি ওর থেকে বছরখানেকের বড়োই হবো হয়তো। তবে স্কুলে ও আমার সহপাঠী। একই ক্লাসে পড়ি দুজনে।

হঠাৎ মাইকের সম্পর্কে ওর কৌতূহলটা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। বড় উকিল হবে, তাই বলেই এখন থেকেই এতো অহঙ্কার ওর যে, মারজার দিকে ফিরে তাকানোর প্রায়োজন বোধ করে না? ও-ও কি কম কিসের মাইকের চেয়ে। মারজার প্রচ্ছন্ন অহমিকায় এ যেন বজ্রাঘাতের সামিল। নিজেকে ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে মনে করতো, তাই ওর আজন্ম ধারণা, সব ছেলেরাই ওকে কামনা করতে বাধ্য। কিন্তু মাইকের ওপর পাল্টা আঘাত হানার জন্যে বলে উঠল মারজা, যত গুণই ওর থাক না কেন, ও কিন্তু দেখতে মোটেই সুন্দর নয় তোমার মতো।

তোমার এই বিশ্লেষণের জন্যে ধন্যবাদ। অনেক দুঃখে, অনেক কষ্টে বিষন্ন গলায় বলল রস। একমাত্র মেয়ে তুমি যে কিনা তোমার অপছন্দের কথা শোনালে, অথচ কতো মেয়েই না ওকে তাদের মনের মানুষ হিসেবে কামনা করে থাকে।

হ্যাঁ, তাতেই তো ওর এতো অহঙ্কার। আর তাইতো অহঙ্কারী ছেলেদের আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। যাক্, ওসব কথা এখন থাকগে। অবজ্ঞায় মারজা ঠোঁট ওল্টায়। এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠল, কই ফ্র্যাঙ্কি জিমিদের দেখছি না তো!

ওরা তো অনেক আগেই ফিরে গেছে, ফ্র্যাঙ্কির শীত করছিল, তাই।

আমারও বেশ শীত লাগছে, বলল মারজা, চলো আর নয়, ফেরা যাক এবার।

অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকার দরুন শরীরটা মারজার বেশ অবশ হয়ে গিয়েছিল, তাই উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত দুদিকে ঝাঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো ও। ওর শরীরের সেই অদ্ভুত ভঙ্গিমাটা তারিয়ে তারিয়ে দেখতে গিয়ে ওর বয়সটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলো রস। কতই বা বয়স হবে ওর? পনেরো-ষোল, তবে সতেরোর বেশী অবশ্যই নয়। তবে এই অল্প বয়সে, কৈশোরত্তীর্ণ কোন মেয়েকে এমন পরিণত বয়স্কা মহিলাদের মতো ভাব ভঙ্গী করতে কখনও আর চোখে পড়েনি ওর। ওর ঝকঝকে মসৃণ ত্বক কোন দামী প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। চিবুকে টোল পড়াতে সুন্দর একটা ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ওর মুখটা খুবই সজীব, আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আড়মোড়া ভাঙতে

গিয়ে মাথার ওপরে হাত তোলার দরুন ওর পশম নরম জলসিক্ত চুলগুলো তার চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। স্তন দুটো নিটোল পরিপূর্ণ, সরু কোমরের ঠিক নিচেই হঠাৎ ওর শরীরের সব ঢল-ভেঙে-নামা ভারি নিতম্ব। এ সব কিছু সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে ওর সেরা সৌন্দর্যের প্রকাশ ওর কমনীয় জঙ্ঘায়।

রূপের পুজারিনী মারজা অত্যন্ত রূপ-সচেতক, সব সময় ফিটফাট থাকতে চায়। পুরুষরা মুগ্ধ নয়নে ওকে দেখুক, এটাই ওর রূপচর্চার পেছনে ওর একটা গোপন অভিসন্ধি। রসকেও সেই সব পুরুষের দলে টানার জন্যে তার মনের প্রতিক্রিয়াটি বোঝার জন্যে ও ওর ঠোঁটে মেয়েদের সেই চিরন্তন দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটিয়ে তাকায় তার মুখ পানে।

খুকুমনি তোমার বয়স কতো? ইচ্ছে ছিলো না, তবু জিজ্ঞেস করলো রস।

তোমার কি অনুমান? পাল্টা প্রশ্ন করলো মারজা।

সতেরো হবে।

অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছো তুমি। রস ওকে বয়সে বড় ভেবেছে জেনে মনে মনে খুশি হলো মারজা।

খুশি রসও। সেই খুশির বাঁধ ভেঙে পড়লো তার আবেগের তাড়নায়, হঠাৎ সে তার পাদুটো দিয়ে মারজার পা দুটো জড়িয়ে ধরে টান দেয়। মারজা তার মনের কথা টের পেয়ে হাসিতে উপছে পড়ে তার বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনটিই চাইছিল রস যেন মনে মনে, তার ইচ্ছেটা পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাবার জন্যে দু'হাত দিয়ে ওকে তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল, ওগো সুন্দরী, আর একটা চুম্বনে তোমার ওই গোলাপের পাঁপড়ির মতো তোমার ওই লাল ঠোঁটদুটো আমি রাঙিয়ে তুলতে চাই, তার জন্যে নিজেকে তৈরি রাখো।

কোন লজ্জা নয়, কোন দ্বিধা নয়, মুখের রঙ পাল্টানো নয়, আগের মতোই ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসির রেখা টেনে যেন সহজ সরল ভাবে বলল, আমি তো সব সময়ে নিজেকে তোমার কাছে সব কিছু উজাড় করে দেবার জন্যে তৈরি হয়েই আছি রস।

তাই বুঝি। বেশ তো প্রমাণ দাও দেখি এখন। তোমার ঠোঁটের গহনে গভীরে রস তার নিজের ঠোঁট জোড়া ডুব সাঁতার দেওয়ার মতো চেপে ধরতে গিয়ে দারুণ বিস্মিত। বিস্ময়ে ঘনিভূত তার হৃদয়। হঠাৎ ধেয়ে আসা দমকা-ঝড়টা থেমে যেতেই অনুভবে সে বুঝলো, মিথ্যে বলেনি ও, দেহ মন উভয় দিক থেকেই সত্যি সত্যিই তৈরি ও। পাল্টা সাড়া দিতে গিয়ে মারজা ওর ঠোঁটদুটো তার মুখের ওপরে শক্ত করে চেপে ধরে তার জিভটার সন্ধানে মুখের গহ্বরে যেন তলিয়ে যেতে থাকে একটু একটু করে। রসও এবার প্রস্তুত, সে তখন ঠিক করে ফেলেছে মারজার কাছে সে আর হার স্বীকার করবে না। উদগ্র একটা কামনায় মারজাকে সে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একেবারে মিশিয়ে ফেলতে চাইলো। তার পুরুষদীপ্ত কঠিন বুকের মধ্যে মারজার পাখির মতোন নরম বুক নিষ্পেষিত হতে থাকলেও কোন যন্ত্রণার প্রকাশ ছিলো না ওর মধ্যে, বরং একটা সুখের আবেশে ওর মুখের ওপরে নিটোল একটা তৃপ্তির প্রলেপ পড়তে দেখা গেলো। আর তারপরেই অনুভবে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলো রস, ওর নরম আঙুলগুলো দিয়ে বিলি কাটছে ওর

সারা মুখের ওপরে। এর ফলে ওর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে একটা প্রচন্ড উত্তাপ, যার আগুনে বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ওর প্রতিটি শিরা-উপশিরা। সে এখন বেশ বুঝতে পারছে, ওর মধ্যে নিজেকে এখন হারিয়ে ফেলা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই তার সামনে।

কিন্তু একেবারে হারিয়ে যাওয়ার আগে রস তার দেহ-মনের সঙ্গে প্রচন্ড সংগ্রাম করতে করতে শেষ বারের মতো একবার জ্বলে ওঠার চেষ্টা করে বলে উঠল, আর নয় অনেক তো হলো, এবার চলো যাওয়া যাক।

চলো, মুচকি হাসলো মারজা তার চোখে চোখ রেখে। তার সেই দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার থিক থিক করছিল, ভাবখানা এই যে, এতো তাড়াতাড়ি, তুমি রণে ভঙ্গ দিলে! ও জানে, ওর এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যেতনা রসের কাছ থেকে, যেমন পাওয়া যায় না তার মতো অন্য সব ছেলেদের কাছ থেকেও। তাই সে উত্তরের আশা না করেই উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রইলো রসের জন্যে।

রস তার জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল অতঃপর। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মারজার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলো সে। তার একটা হাতের ওপর রস আলতো হাতের স্পর্শ রাখতেই চমকে উঠল সে। মারজার ঠোঁটে আবেগের সেই দুষ্টুমির হাসির ঝিলিক দেখা গেলো। কি ব্যাপার খোকামনি!

আরক্তিম মুখে ওর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই রসের বাড়ি পৌঁছে গেলো। নিঃশব্দে দরজা খুলে আহ্বান জানালো রস। সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার সুবিধের জন্যে সেটা ছিল বাড়ির পেছন দিকের একটি দরজা। ঘরের ভেতরে প্রবেশ করামাত্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় মারজা। ঠোঁটের ওপরে ও আঙ্গুল রেখে রসকে ইশারা করলো কথা না বলার জন্যে। তারপর নিজেই কৌতূহল চাপতে না পেরে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল ও, ওখানে তাকিয়ে দেখো। অদূরে একটা সোফার দিকে আঙুল দেখালো। দৃষ্টি ফেলে সামনের দিকে তাকাতে গিয়ে রস দেখলো ফ্র্যান্সি আর জিমি এক গভীর সুখ-নিদ্রায় ঘুমোচ্ছে সোফার ওপরে। সারা দেহে ওদের কোথাও এক চিলতে সুতোও নেই, আব্রুর বালাই বলতে কিছু নেই। অবাক হওয়ার ভাবটা কোনরকমে কাটিয়ে উঠতেই নিঃশব্দে হেসে উঠল। ফ্র্যান্সির দেহটা যথেষ্ট ভরাট এবং ভারি। ওর এই শরীরের কাছে জিমির রোগাটে চেহারাটা বড় অদ্ভুত লাগছিল। অবাক হয়ে মনে মনে রস তখন ভাবছিল, কি করে ফ্র্যান্সির অমন ভারি দেহের সঙ্গে জিমি তার লিকলিকে দেহ নিয়ে সামাল দিলো। নাকি চরম সুখ প্রাপ্তির আগেই রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল তাকে, কে জানে!

মারজার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল রস, এদের এখন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললে কেমন হয়?

না না, থাক। ঘুমোবার আগে না জানি কত না দৈহিক পরিশ্রম করতে হয়েছে ওদের। তাই আরও একটু না হয় ঘুমোতে দাও ওদের।

বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে হলঘরটা পেছনে ফেলে ওরা চলে এলো উপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে। তারপর তেমনি নিঃশব্দে সিঁড়ির ধাপ ভেঙে ওরা মারজার পোশাক

ছেড়ে আসা ঘরে এসে ঢুকলো।

তুমি এখানে অপেক্ষা করো, মারজা বললো রসকে, 'গায়ে বালি কিরকির করছে, আমি একটু স্নান সেরে নিতে চাই। চেয়ারের ওপর থেকে মারজা ওর পরিত্যাক্ত পোশাকগুলো তুলে নিয়ে বাথরুমের গিয়ে ঢুকলো। শ্যোন দৃষ্টিতে ওর গমন পথের দিকে তাকিয়েছিল। মারজার দৃষ্টি এড়ালো না। এই মুহূর্তে রস কি চায় ও জানে। তার সেই কামাতুর দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে ও সেই পাতলা ঠোটের মৃদু হাসির একটা ঝিলিক খেলিয়ে কপট বাধা দিয়ে অস্ফুটে বললো, দুষ্টু কোথাকার। সব সময়ে অতো খিদে ভালো নয়। ভালো খাবার একটু রসিয়ে খেতে হয়, না হলে খাবারের স্বাদই পাওয়া যায় না। বলেই বাথরুমের ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয় ও।

ওর সেই ইঙ্গিতটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না রসের। এদিকে বাথরুম থেকে ও ঘরের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনলো মারজা কান খাড়া করে। মনে মনে হাসলো ও, বেচারা! কিন্তু কি করবে ও? খিদে কি ওরও পায়নি? ওর স্নানের স্বচ্ছ পোশাকের দিকে যে ভাবে লুব্ধ চোখে তাকিয়েছিল রস, ওর মনে হলো আর একবার ধরা দেয় তার কাছে তার দেহের সম্ভার সাজিয়ে। ওর দেহটাও তখন তপ্ত আগুনের মতো জ্বলছিল। কিন্তু এখন ও নিরুপায়। যতো শিগগরি বাড়ি ফেরা যায় ততই ভালো, দেরি হলে ওর সৎ বাবা নানা কুৎসিত ইঙ্গিত করতে ছাড়বে না। তাই তাড়াতাড়ি ফোয়ারাটা খুলে দিয়ে কৃত্তিম ঝরনার নিচে গিয়ে দাড়াবার আগে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে এলো, তারপর বাথরুমে ফিরে এসে সাঁতারের পোশাকগুলো এক এক করে খুলে ফেললো। সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে ঠান্ডা জলের ধারা নামতে থাকলো এবার। দারুণ ভালো লাগলো ঠান্ডা জলটা। একটু পরেই ওর খানিক আগের তপ্ত দেহটা শীতল হতে শুরু করলো ধীরে ধীরে। বাড়িতে এমন ঝরনা-ধারার বালাই নেই। যৌথ বাথরুম ওদের ঘর থেকে খানিকটা দূরে। ভাড়াটে বাড়ির পুরুষগুলোর কামাতুর দৃষ্টির সামনে এ ভাবে সাঁতারের পোশাক পরে বাথরুমে স্নান করতে যাওয়া কল্পনাই করা যায় না। তার ওপর নিজের ঘরে ওর সৎ বাবার লোলুপ দৃষ্টি তো আছেই। কিন্তু ওর একটা চাওয়ার বিনিময়ে এখানে এতটা পেয়ে যাওয়ার খুশিতে ও এখন এমনি খুশীতে ডগমগ যে, ওর বেসুরো গলাতেও কেমন গান ভেসে এলো। গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে মিনিট দশেক ধরে স্নান সেরে এক সময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো মারজা।

বাথরুম সংলগ্ন ঘরের মেঝেতে পা রাখা মাত্র সামনে ভূত দেখার মতে চমকে উঠল মারজা। সম্পূর্ণ নিরাবরন দেহ ওর তখন, হাতে ওর সেই পোশাকগুলো। ভেবেছিল এঘরে এসে পোশাকগুলো গায়ে চাপাবে যুৎসই করে। কিন্তু...স্বাভাবিক হওয়ার পর দেখলো ও, ঘরের অন্য আর একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রস, তার নগ্ন শরীরটা যেন সে তার চোখ দিয়ে গিলছে, তার হাতে একটা বড় তোয়ালে। ওর দিকে সেটা এগিয়ে দিতে গিয়ে বললো, তোমার একটা তোয়ালে দরকার, কথাটা মনে হতেই তাই চলে এলাম।'

আমি তো এঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি ঢুকলে কি করে

এ ঘরে রস? ওর সেই একটু আগের চমকানো ভাবটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি তখনো মারজা।

পাশেই আমার ঘর, যে দরজার চৌকাঠের উপরে রস দাঁড়িয়েছিল, সেই দরজার ওপারের ঘরটা দেখিয়ে বলল সে, আমার ওই ঘরের ভেতর দিয়ে। যাইহোক, তোয়ালেটা নিয়ে জল মুছে ফেলো। তোমাদের মতো সুন্দর, মেয়েদের তো আবার ঠাণ্ডায় বড় ভয়। সর্দি লেগে যেতে পারে।

ধন্যবাদ। দ্রুত হাতে রসের হাত থেকে তোয়ালেটা নিয়ে মারজা ওর নগ্ন দেহে জড়িয়ে নেয়।

তুমি আমার ওপর রাগ করলে না তো? ওর কাছে এগিয়ে এলো রস।

না। তবে এভাবে চুরি করে দেখাটা আমি অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করি।

রস এবার আর এক ধাপ এগিয়ে এলো। সারদার নাগাল পেয়ে ওকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর ঠোঁটে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করতেই বাধা পেল মারজার কাছ থেকে। আমি ঠাট্টা করছিলাম, কিছু মনে করো না।

মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বললো মারজা, ঠাট্টার একটা সীমা আছে, সেই সীমারেখাটা ছাড়িয়ে যাওয়া আমি মোটেও পছন্দ করি না। যাইহোক, এখন এখান থেকে কেটে পড়ো, আমি পোশাক পড়বো।

তবু রস ওকে ছাড়লো না। বরং আরো বেশী শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ওকে। মোটা তোয়ালের আবরনের নিচ থেকে মারজার নগ্ন দেহের উত্তাপে তার রক্তের স্পন্দন তখন উত্তাল, অশান্ত তার স্নায়ুর গতি, রক্ত-চাপের রোগীর মতো তার মেজাজ তখন ভয়ঙ্কর তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আর ওর এক তলায় বসবার ঘরে সোফার ওপরে ফ্র্যাঙ্কি এবং জিমির নগ্ন যুগল-মূর্তির দৃশ্যটা নতুন করে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতেই তার উত্তেজনা আরো বেড়ে গেলো। নিবিড় আলিঙ্গনে মারজাকে আবদ্ধ করে আবেগ জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে বলে উঠল রস, না মারজা, এভাবে তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারো না। রস তার কানে রক্তের দ্রুত স্পন্দনের শব্দ আরো স্পষ্ট করে শুনতে পেলো।

ওদিকে রসের মুখের ওপরে মারজার চোখের দৃষ্টি তখন স্থির, অকম্পন, ওর চোখের চাহনি বড় অনুজ্জ্বল, বরফ-ঠাণ্ডা চোখ যে ওর মতো কোনো সুন্দরী মেয়ের হতে পারে, ভাবতেও পারে না সে।

উত্তেজনায় রসের রক্ত এবার টগবগ করে ফুটতে শুরু করলো। আর সেই উত্তেজনা হঠাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে রূপান্তরিত হলো, তার দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠলো, নিজেকে সে আর সামলাতে পারলো না তখন। উন্মাদের মতো জোর করে মারজার ঠোঁটে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করতেই ও তখন ওর সর্বশক্তি দিয়ে প্রচন্ড জোরে তাকে ধাক্কা দিতেই ছিটকে পড়লো সে অদূরে। রস তখন বুঝে গেছে অতো বড় ঘরে ওকে ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে তখন মারজাকে কোনো রকমে বাগে এনে দু'হাত দিয়ে ঠেসে ধরলো ওর শরীরটা। এর ফলে নড়বার একটু জায়গাও পেলো না মারজা।

তেমনি হিমেল চোখে রসের দিকে তাকিয়ে থাকে মারজা, ওর দুচোখের পাতায় ভয়ের

একটুও চিহ্ন ছিলো না।

বস তখন অশ্রাব্য ভাষায় বলে উঠলো, ন্যাকামো করো না মারজা। মনে করো না, আমি তোমাকে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করতে নিয়ে এসেছি এখানে? আমি তোমাকে ভোগ করতে চাই। সেই ভাবে তুমি নিজেকে তৈরী করবে, নাকি আমাকে বল প্রয়োগ করতে হবে তোমার উপরে?

তার মতো অমন স্থূল কথাবার্তায় অভ্যস্ত ছিলো না মারজা। তাই তার কোনো প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। ওর সেই তীক্ষ্ণ চোখের কোল বেয়ে মুঠো মুঠো আগুন ঝরে পড়ছিল তখন, সেই আগুনে রসেব নোংরা মনটাকে পুড়িয়ে দগ্ধ করে ফেলতে চাইছিল ও, রসের ঘুম পাড়ানো বিবেককে জাগিয়ে তুলতে চাইছিল ও।

তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই রসের। সে তখন আরো বেপরোয়া হয়ে তোয়ালেটা মারজার শরীরের ওপর থেকে টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করতে উদ্যত হলো, কিন্তু ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত। তোয়ালেটা মারজা ওর দু'হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছে। রস তখন আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। বলপ্রয়োগে ব্রতী হলো। প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ জোরে চড় কষিয়ে দিলো মারজার ফর্সা গালে। মুখে তার খিস্তির বুলি ফুটলোঃ তোয়ালেটা তোর শরীরের উপর থেকে সরাতে দে আমাকে। নষ্ট মেয়ে, আমি তোর সব খবর রাখি। ভেবেছিস আমি বুঝি তোর খবর রাখি না? তোর নোংরা জীবন-যাপনের সব খবর আমি পেয়েছি ফ্র্যাঙ্গির কাছ থেকে।

মারজা তখন দেওয়ালের সঙ্গে যেন আঠার মতো লেগে গেছে, নড়তে-চড়তে পারছে না একটুও। তারিয়ে তারিয়ে ওর সেই অসহায় মুখের ছবি দেখতে থাকে রস, আর মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠে সে। রোদে পোড়া মারজার লাল টকটকে গালে তার হাতের পাঁচ আঙুলের দাগ স্পষ্ট চোখে পড়লো রসের। মারজা তখন ভাবছিল, এই জানোয়ারটার সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠবে না ও, মিষ্টি কথায় ভোলাতে হবে তাকে, তার করুণা-প্রার্থী হতে হবে ওকে। নিচের দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে মিনতি জানালো ও, লক্ষ্মীটি, এমন করতে নেই সোনামনি।

এবার পথে এসো সুন্দরী, রসের ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। এসব মেয়ে যে শক্তের ভক্ত, তা সে বেশ ভাল করেই জানতো। তবে সেই আত্মবিশ্বাসকে মূলধন করে সে এবার উচিতমতো তার পৌরুষ দেখানোর জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। এখন আর তার কোনো ব্যস্ততা নেই, সে তখন বুঝে গেছে, ও তার কাছে এসে গেছে। এখন ওকে দিয়ে সে তার কাম চরিতার্থ করতে পারবে অনায়াসে।

কিন্তু রসের মতো দুর্বলচিত্তের ছেলে মারজার মতো নিরীহ পবিত্র মেয়ের ক্ষমতার ওজন কতো জানবে কি করে? মেয়েরা আজ আর অবলা নয়, তারাও প্রতিবাদ করতে জানে, প্রয়োজনে পুরুষের মারের জবাব দিতেও পারে। কিন্তু রস সেটা বোঝে না, সে মনে করে মেয়েরা যেন এখনো সেই মান্ধাতা আমলের মধ্যেই পরে আছে, এখনো তারা পুরুষের অধীনে, তাদের কথায় উঠবে, বসবে, তাদের খুশিতে হাসবে, এবং তাদের দুঃখে কাঁদবে। রস তলপেটের নীচে আঘাত পাবার আগে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি, ধীরে ধীরে

মারজ্জা ওদিকে তার ওপরে দৈহিক আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অবিশ্বাস্য! হ্যাঁ, বিশ্বাস না হওয়ারই তো কথা! আর সেই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ে রস। জ্ঞান হারাবার আগে অনুযোগ করে মারজ্জাকে বলে সে, আমাকে তুমি এমন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে পারলে? তোমার মনে কি একটুও মায়া-দয়া নেই?

এবার মারজ্জার ভ্রূক্ষেপ না করার পালা। বরং উল্টে রক্ত-লাল চোখে রসের দিকে তাকিয়ে গায়ে পোশাক চাপাতে চাপাতে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো এবং তারপরেই রাগে ঘৃণায় ফুঁসে উঠলো, আমাকে তুমি বাজারের মেয়ে ভাবলে ভুল করবে রস। আর যদি তুমি আমাকে এভাবেই পেতে চাও, তাহলে কেন তুমি ফ্র্যান্সির দিকে তোমার কামজ হাতের থাবা বাড়ালে না?

ব্যথাটা একটু কমলেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও বসে পড়লো রস ফিরে আবার যন্ত্রণাটা যদি বেড়ে যায়! ক্লান্ত, বিষণ্ণ গলায় বললো সে, কিন্তু আমার যে তোমাকেই প্রয়োজন ছিলো মারজ্জা।

তোমার প্রয়োজনই তো শেষ কথা নয়, আমারও তো ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কথা আছে? জানি না তুমি আমাকে ঠিক কি ধরণের মেয়ে ভেবেছো।

জবাব দেবার মতো উত্তর জানা ছিলো না রসের। তাই চুপচাপ মেঝের ওপরে পড়ে থেকে যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহটা টানটান করে ছড়িয়ে দেয় অতঃপর। ব্যথাটা আবার যেন চাগিয়ে উঠেছে। তার মুখের সামনে মারজ্জা দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলে সে তখন তার ব্যথার জায়গায় হাত বোলাতে থাকে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসা মারজ্জার নগ্ন শরীরের ছবিটা তার চোখের সামনে একবার ফুটে উঠেই পরমুহূর্তে তার সেই ব্যথার যন্ত্রণায় সেই সুমধুর দৃশ্যটা তার দৃষ্টির আড়ালে নিমেষে চলে গেলো। তার দেহটা তখন একটু একটু করে অবশ হয়ে আসছিল, সে তখন বেশ বুঝতে পারছিল, জ্ঞান হারাতে বসেছে সে। তবে জ্ঞান থাকতে থাকতে মৃদু আর্তনাদ করে বলে উঠলো রস, তুমি ঠিক কি ধরণের মেয়ে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি মারজ্জা, হয়তো বুঝতেও পারবো না কখনো।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে, ক্লান্ত চোখ দুটো মেলে রস তার দৃষ্টি ফেল শূন্যে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। বাইরেও রাত্রির অন্ধকার ক্রমশ ঘন হচ্ছে। পাশ ফিরে সে তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহটা কোনো রকমে একটু নড়াতে গিয়ে অনুভবে বুঝলো সে, একটা উষ্ণ নরম বিছানায় কে যেন শুইয়ে দিয়েছে তাকে। কিন্তু কেই বা তাকে সেখানে শুইয়ে দিয়ে গেলো? ইতিমধ্যে ব্যথাটা তার আবার চাগিয়ে উঠলো, আর তখনই তার মনে পড়ে গেলো অপরাহ্নের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার কথাটা। সে তখন তার ব্যথার কথা ভুলে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবতে আরম্ভ করলো। তার সেই ভাবনায় বাধা পড়লো।

এখন কেমন লাগছে রস? মারজ্জার কণ্ঠস্বর।

ধীরে ধীরে ওর সেই কণ্ঠস্বর অনুধাবন করে সেদিকে ঘাড় ফেরাতেই দেখলো মারজ্জা ঘরের এক কোণে বসে আছে, ওর হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। ক্লান্ত হাতের ওপরে

কোনো রকমে ভর দিয়ে উঠে বসলো রস। তারপর মারজার প্রশ্নের উত্তরে বললো সে, আগের থেকে ভালো।

একটু পরে সেই গাঢ় অন্ধকারে শুনতে পেলো রস মারজার নরম পায়ের ছন্দ পতনের শব্দ, ওর পোশাকের খসখস আওয়াজ। একটা ছায়ামূর্তি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার বিছানায় বসতেই খাটটা কেঁপে উঠলো। মারজা ওর হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা রসের মুখের কাছে বাড়িয়ে তার ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে বললো, দু'একবার টান দিলেই দেখবে তোমার দেহের ক্লান্তি কেমন কেটে গেছে। একটা লম্বা টান দেয় রস, কড়া তামাকের ধোঁয়াটা সত্যি সত্যি তার দেহ-মনে কেমন অদ্ভুত আমেজ যেন এনে দেয়। মারজা ঠিকই বলেছে। ওর কথা মেনে আর একবার সুখটান দেয় মারজার সিগারেটে। একটু চাঙ্গা হয়ে উঠতেই সে জানতে চাইল, এখন সময় কতো?

প্রায় নটা, মারজা ওর কব্জিঘড়ির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে বলে উঠলো। রেডিয়াম লাগানো ঘড়ি, তাই অন্ধকারে সময়টা ঠাওর করতে কোনো অসুবিধে হলো না ওর।

তৃতীয়বার সিগারেটে টান দিতেই রসের সব জড়তা যেন কেটে গেলো। টান দেওয়ার সময় জ্বলে ওঠা সিগারেটের ক্ষীণ আলোয় মারজার মুখটা দেখার চেষ্টা করে রস জিজ্ঞেস করলো, ওরা কি এখনো নিচে সেই ভাবে জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে?

না। বাড়ি ফেরার জন্যে ফ্র্যাঙ্কি খুব তাড়া দিচ্ছিল, তাই জিমি ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেছে।

আমার খবর নেয়নি ওরা?

হ্যাঁ নিয়েছিল বৈকি!

তা তুমি কি বললে?

তুমি অসুস্থ।

এ কিরকম বন্ধুত্ব? অবাক হয়ে রস তখন ভাবছিল, সে অসুস্থ জেনেও ওরা চলে গেলো? তবে, রস আবার এও ভাবলো, জিমির কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা যায় না, সুখের পাখী ও, মাইক হলে কখনো এমন ব্যবহার করতো না। সেই মুহূর্তে মারজার মুখটা দেখার জন্যে তার মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠলো, সে তার হৃদয়ের ছটফটানি অনুভব করলো প্রচণ্ডভাবে। কিন্তু ঘরের অন্ধকার সেই ইচ্ছেটার পথে একটা ভয়ঙ্কর বাধা হয়ে উঠলো। বিছানার সামনে টেবিলের ওপরে রাখা ছোট্ট বেডল্যাম্পটা সে হাত বাড়িয়ে জ্বালতেই ঘরটা একটু আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই আলোয় মারজার মুখের ওপরে সে তার দৃষ্টি ফেলে নরম গলায় বললো রস, তা তুমিও ওদের সঙ্গে চলে গেলে না কেন মারজা?

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আয়ত চোখের দৃষ্টি ফেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে মারজা।

কথা বলছো না কেন? তাকে তাড়া দেয় রস।

তুমি আমাকে এনেছো এখানে, তাই তোমার সঙ্গেই আমি ফিরে যেতে চাই। ওর সেই ভিজে নরম কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো যেন অনেক, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

তুমি কি মনে করো, সন্ধ্যায় যে ঘটনার অবতারণা তুমি করেছো, তার পরেও আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাবো?

তেমনি নিঃশব্দে চোখ তুলে তার দিকে তাকালো মারজা। ওর সেই স্বচ্ছ চোখের মণির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলো রস। মুখে কিছু না বললেও ওর চোখ দুটো মনে হলো কথা বলছে, কিন্তু কি যে বলছে সেটা ঠিক বোধগম্য হলো না তার।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো রসের, তাড়া দেয় সে, কি হলো, কথা বলছো না কেন?

শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা নীরবে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো সারদা। চেয়ারের ওপর থেকে নিজের হাতব্যাগটা তুলে নেয়। তারপর সোজা দরজার দিকে এগিয়ে যায় পেছন ফিরে একবারের জন্যও না তাকিয়ে।

রস এতক্ষণ একদৃষ্টে মারজার গমনপথের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু দরজার হাতলে হাতটা ও রাখার আগেই বলে উঠলো সে, যেও না মারজা, শোনো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায় মারজা।

চলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, তুমি তো এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছো, তাই আমার এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত। মারজার কণ্ঠস্বরে নেই কোনো উত্তেজনা, নেই কোনো উত্তাপ।

কর্তব্যের খাতিরে রস জিজ্ঞেস করলো, তুমি যে একা চলে যাচ্ছো, তা তোমার কাছে গাড়িভাড়া আছে তো?

ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। মারজার কথার মধ্যে স্পষ্ট একটা আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ লক্ষ্য করলো রস।

তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে ওর হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নেয়। তারপর সে একটা কঠিন প্রশ্ন করলো মারজাকে, টাকা তুমি কোথায় পেলে? কারণ ফ্র্যাঙ্কি বলেছিল তোমাদের কাছে একটা কাণাকড়িও নেই।

তার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করলো না মারজা। এমন কি ওর মুখের একটা রেখাও বদলালো না। কেবল ওর ম্লান চোখের দৃষ্টি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়ত হয়ে উঠতে দেখা গেলো।

ওদিকে রস তখন ওর ব্যাগের জীপারটা একটানে খুলে ফেলে ভেতরের জিনিষগুলো হাতড়াতে গিয়ে দেখলো একটা ছোট্ট চিরুনি, সস্তা দামের লিপস্টিক, ভাঙা দুটো সিগারেটের টুকরো এবং দেশলাইয়ের কয়েকটা কাঠি ছাড়া বাড়তি আর কিছু ছিলো না।

তোমার মানিব্যাগটা আমি তোমার মাথার বালিশের নিচে রেখে দিয়েছি। শান্ত সংযত গলায় কথাগুলো বললো মারজা।

বালিশের নিচ থেকে মানিব্যাগটা টেনে নিয়ে দ্রুত হাতে সেটা খুলে দেখল টাকা-পয়সা যেমন সে রেখেছিল সব ঠিক-ঠাকই আছে, একটা পয়সাও খোয়া যায়নি। মারজার ওপরে মিথ্যে সন্দেহের জন্যে মনে মনে খুব অনুতপ্ত হলো সে।

মারজা এবার তাড়া দেয়। কই আমার ব্যাগটা ফিরিয়ে দাও। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। পথে আরো কতো দেরী হবে কে জানে।

মুহূর্তের জন্যে মারজার দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে এক সময় সে তার মানিব্যাগ থেকে একটা দশ ডলার বার করে মারজার ব্যাগে পুরে দিয়ে বললো, ট্যাক্সিতে যেও।

দ্রুত পায়ে মারজা ওর ব্যাগ থেকে নোটটা বার করে রসের বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরুত্তাপ গলায় বললো, এর জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু এখন আর ওটার প্রয়োজন নেই আমার। তারপর রসকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বাইরে থেকে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এলো মারজা।

বিহুল দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়েছিল রস। সাঁতারের পোশাক ছাড়ার পর তার পরনে যে একটা সূতোও অবশিষ্ট ছিল না, কথাটা মনে হতেই দ্রুত হাতে বিছানার চাদরটা সে তার নগ্ন দেহের উপরে টেনে নিয়ে মারজার পেছন পেছন ছুটতে শুরু করলো। এবং ওর উদ্দেশে সবিশয় অনুরোধের সুরে মৃদু চিৎকার করে বলতে থাকে, মারজা শোনো, একবারটি আমার কথা শোনো। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছিল রস, আর একটু হলে সিঁড়ি থেকে পড়ে যেতো সে, কিন্তু ঠিক সময়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনো রকমে টাল সামলে নেয়।

মারজা তখন সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে এসেছিল। সিঁড়ির রেলিংয়ের ওপরে রসের ভারি দেহটা পড়ে যাবার শব্দ শুনে চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় মারজা। তারপর রসের দিকে তাকাতেই বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিল করে হেসে উঠলো ও। ওর সেই হাসির শব্দটা হলঘরের চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরলো।

ওর সেই বিদ্রুপের হাসি দেখে সিঁড়ির ওপর থেকেই খিঁচিয়ে উঠলো রস, এতে হাসবার কি আছে শুনি?

বেশ তো, একবার নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলেই আমার হাসির কারণটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে রস। মারজা বললো, তোমাকে ঠিক ভূতের মতোন দেখাচ্ছে।

পেছনের দেওয়ালে একটা প্রমাণ সাইজের আয়নার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো রস। মারজা ঠিকই বলেছে, তার উসকোখুসকো চুল, নীরস মুখ, ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়া চেহারাটা সাদা চাদরে ঢাকা পড়ে সত্যি সত্যি ভূতের মতো দেখতে হয়ে গেছে। মনে মনে সে তখন ভাবছে, আয়না কখনো মিথ্যে বলে না। আয়নায় নিজের ভূতের মতো চেহারাটা দেখে সে এবার নিজেই হেসে উঠলো। তারপর মারজার উদ্দেশে বলে উঠলো সে, একটু দাঁড়াও মারজা আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেবো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ মারজা মুখ খুললো, এখানেই আমাকে নামিয়ে দাও রস। তা না হলে আমার সন্দেহবাতিক সৎবাবা দেখে ফেলবেন, কারণ সবসময় জানালার ধারে উনি বসে থাকেন, বিশেষ করে আমার বাড়ি ফিরতে দেরী হলে।

রসও প্রথমে গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে মারজার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। মারজা আপত্তি করে না, তার হাতে ধরা দেয়। গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা সময় নীরবে দাঁড়িয়ে রসের মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখ পাকিয়ে থাকে। তারপর এক সময় রসের হাতের বন্ধন শিথিল করে আবেগ জড়ানো স্বরে বলে উঠলো, তোমার কাছ থেকে আজ আমি সুন্দর

একটা দিন উপহার পেলাম, তার জন্যে তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ রস।

রস চমকে উঠে ওর আয়ত চোখের দিকে তাকায়, বুঝতে চায় মন থেকে বললো কিনা ও। না, ওর চোখে বিদ্রূপের কোনো চিহ্নই নেই। আশ্বস্ত হয়ে ওর হাতটা আবার নিজের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ করে গাঢ় স্বরে বললো রস, তোমার সঙ্গে আমার কি আর কখনো দেখা হবে না মারজা?

যদি তুমি মন থেকে কখনো চাও আমাকে, দেখা পাবে বৈকি!

হ্যাঁ, মন থেকেই আমি চাই তোমাকে, বিশ্বাস করো মারজা, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ করে আমার কাছে পেতে চাই।

রসের চোখে-মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ছায়া পড়তে দেখে মারজার কেমন যেন মায়া হয়, কৈফিয়তের সুরে বললো, আমি তোমাকে আঘাত করতে চাইনি রস, কিছু মনে করো না।

তাতে কি হয়েছে, আমি কিছু মনে করিনি। উত্তরে বললো রস। তাছাড়া আমি তো মনে করি, ওটা আমার পাওনা ছিলো তোমাকে ঠিক মতো বুঝতে না পারার জন্যে। বুঝতে পারলে ওরকম ঘটতেই পারতো না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মারজা বললো, এবার আমাকে যেতে দাও রস, এরপরেও যদি দেখা হয় ওই বুড়োটা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। রাগে তখন আমার বাপান্ত করে ছাড়বে।

তাহলে তোমার ফোন নাম্বারটা দাও, দরকার হলে যাতে তোমার সাথে কথা বলতে পারি।

হেসে উঠলো মারজা। কিন্তু আমাদের ফোন তো নেই।

তবে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবোই বা কি করে? রসের ধারণা ছিলো সবার মতো মারজাদেরও ফোন আছে। তাই ওর বাড়িতে ফোন নেই শুনে অবাক হলো না, বরং হতাশই হলো।

যাইহোক, তার সেই হতাশ ভাবটা কাটানোর জন্যে মারজা বললো, প্রায়ই দুপুর তিনটের সময় বৃদ্ধ র‍্যানিসের স্টেশনারি দোকানে গিয়ে আমরা আড্ডা দিয়ে থাকি।

সে তো ভালোই, কালই আমি তোমায় ফোন করবো ওখানে।

বেশ, তাই করো। একটু ইতস্তত করে মারজা বললো, তাহলে আজ আমাদের কথাবার্তার ইতি টানছি এখানেই। বিদায় বন্ধু বিদায়। শুভরাত্রি।

প্রত্যুত্তরে ঠোঁটের কোণায় একটা মিষ্টি হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দিলো সে, হ্যাঁ, শুভরাত্রি মারজা।

তারপর সেখানে আর দাঁড়ালো না মারজা। শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে নাচের ছন্দে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকলো ও। ওর সেই সুন্দর ছন্দময় হাঁটার ভঙ্গিমাটা দারুন ভালো লেগে গেল রসের। তাই সে তার ভালো লাগা সেই আমেজটা উপভোগ করার জন্যে অপেক্ষা করে রইলো যতোক্ষণ না মারজা ওর বাড়িতে প্রবেশ করে। এক সময় গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে মারজাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তাদের সেই পুরনো

আড্ডাখানায় তখনো আলো জ্বলতে দেখে রোজকার অভ্যাস মতো গাড়ি থামিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলো।

বাইরে থেকেই জিমির গলার আওয়াজ তার কানে ভেসে আসে। ভেতরে ঢুকে তাকে বিলিয়ার্ডের ষ্টিক হাতে তাদের বন্ধুদের সঙ্গে নিচু গলায় রসিয়ে গল্প করতে শুনলো সে। তাদের মধ্যে একটি ছেলে কৌতূহল প্রকাশ করলো, তারপর?...রস তো তখন একেবারে নগ্ন হয়ে বিছানায় পড়েছিলো। মুশকিলে পড়লাম, ও ছাড়া গাড়ি চালাবে কে? এদিকে ফ্র্যান্সি তো বাড়ি ফেরার জন্যে খুবই ব্যস্ত, কি করা যায় ভাবছি তখন...আরে, রস তুমি? রসকে দেখা মাত্র জিমি তখন অন্য জগতের মানুষ হয়ে যায়, তার কণ্ঠস্বর একেবারে অন্য রকম তখন, সেই সঙ্গে তার চোখ-মুখের অভিব্যক্তিও কিরকম আলাদা ধরনের যেন। আমতা আমতা করে বললো সে, এখন কেমন লাগছে রস তোমার? ভালো। যাই বলো, তোমাদের ওই ব্যাপারটা ছাড়া আজকের দিনটা বেশ ভালোই কাটলো, কি বলো?

ওদিকে জিমির দিকে রক্তচোখে তাকাতে গিয়ে দম নিচ্ছিলো এতক্ষণ, এবার সে গর্জে উঠলো, বাস্টার্ড। লজ্জা করে না তোমার এভাবে আমাকে ফেলে আসতে?

কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো রস, আমি তখন একেবারে নিরুপায়। ফ্র্যান্সি তখন কিছুতেই থাকতে চাইছিল না সেখানে, সত্যি ওর খুব দেরী হয়ে গিয়েছিল তখন। কৈফিয়ত দিতে থাকে জিম। সেই জন্যে কাউকে না কাউকে তো ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হতো। তাছাড়া মারজা তোমার দেখাশোনার ভার নিয়ে বলেছিল আমাকে, তোমরা যাও, আমি একাই রসকে সুস্থ করে তুলতে পারবো।

রসের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যে, সে তখন জিমির কোনো কথাই যেন শুনছিল না, ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছিল সে রাগে, উত্তেজনায়। মেঝের ওপরে জোরে জোরে পা ঠুকে ঠুকে জিমির দিকে এগিয়ে যায় সে। তার বন্ধুরা তখন জিমির কাছ থেকে সরে যায়, একটা ঝড় উঠতে যাচ্ছে, সেই সংকেতধ্বনি যেন পেয়ে গেছে তারা। তাই অহেতুক সংঘর্ষ এড়াতে তাদের এই পিছু হটে যাওয়া। রস কিন্তু শান্ত স্বরেই জিজ্ঞেস করলো, যদি সত্যি সত্যি আমার আঘাতটা গুরুতর হয়ে উঠতো, যদি সত্যি সত্যি তোমদের সাহায্যের প্রয়োজন হতো? ও একটা মেয়ে, কি করে ভাবলে আমরা পুরুষরা যা পারি মারজাও আমাদের মতো সব দিক সামলাতে পারতো?

একটা কুৎসিত হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায় জিমির ঠোঁটে। ও একটা ঝানু মাল, তুমি ওকে চেনো না? এ ধরণের মেয়ে সব পারে—

জিমি তার কথা শেষ করতে পারে না, তার আগেই রসের একটা প্রচণ্ড ঘুষি তার মুখের ওপরে আছড়ে এসে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়লো সে ঘরের এক কোণে। জিমিও চুপ করে থাকলো না। কোনোরকমে সামলে নিয়ে সে তার হাতের বিলিয়ার্ডের স্টিক দিয়ে সজোরে আঘাত হানার চেষ্টা করলো রসের মুখের ওপরে। প্রস্তুত হয়েই ছিল রস, সে জানতো পাল্টা আঘাত আসবে জিমির কাছ থেকে। তাই সাবধানে তার আঘাতটা এড়িয়ে গিয়ে এবার সে বেপরোয়া ভাবে ঘুষি চালালো জিমির ওপরে। জিমির অবস্থা তখন অত্যন্ত সঙ্গীন। সে তার চোখের সামনে সরষে ফুল দেখতে থাকে। ঘরের আলোগুলো

বিবর্ণ দেখালো তার চোখে। তার নাক বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে, আর মুখে তীব্র আর্তনাদ। রসেরও তখন নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, তার কপাল দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম পড়ছিল। হঠাৎ রস অনুভবে বুঝলো তার হাতে কার যেন স্পর্শ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে যাচ্ছিল। মাইক তাকে টানতে টানতে ঘরের এক প্রান্তে নিয়ে এসে তাকে ধমকায়, এ তুমি কি করছো রস, তুমি কি শেষে পাগল হয়ে গেলে নাকি? ওকে মেরে ফেলতে চাও!

এবার হুঁশ হলো রসের। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বললো, আমার ভুল হয়ে গেছে মাইক, আমাকে ক্ষমা করে দাও।

ঠিক আছে, ক্ষমা করে দিলাম, মাইক তার হাতের বাঁধন শিথিল করে দিয়ে বললো, এখন চলো এখান থেকে।

বাইরে এসে রস অনুরোধ করলো, শরীরটা আমার খুবই ক্লান্ত লাগছে, আমাকে তুমি বাড়িতে পৌঁছে দেবে মাইক?

নিশ্চয়ই! গাড়ির দরজা খুলে চালকের আসনে গিয়ে বসলো মাইক, এবং রস তার পাশের আসনে বসলো। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে মাইক বললো, ভাগ্যিস আমি ছিলাম, না থাকলে নির্ঘাত রক্তপাত ঘটে যেতো।

হাসলো রস। তা তুমি দেখছি চিরদিন আমার পথের বাধা হয়ে রইলে মাইক। রসের তখন অতীতের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো। মনে আছে, ফুটবল খেলার মাঠে তারা পরস্পরের বিপরীত পক্ষের হয়ে খেলতো। রস খেলতো সেন্টার ফরোয়ার্ডে, আর মাইক স্টপার পজিশনে। বল নিয়ে এগোলেই সে তাকে আটকাতো।

কেনই বা থাকবো না বলো? যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝায় মাইক। তুমি একজনকে খতম করে ফেলবে, আর সেটা আমি আমার চোখের সামনে ঘটতে দেখবো?

দোষ কি আমার একার? প্রতিবাদ করে উঠলো রস। শুধু শুধু জিমিই বা কেন মেয়েটার সম্পর্কে বদনাম করতে গেলো?

ধাবমান রাস্তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রসের দিকে প্রশ্ন-চোখে তাকাল মাইক। তা বিকেলে কাকে নিয়ে তুমি বেড়াতে বেরুলে, সেই সোনালী চুলের মেয়েটির কথা বলছো তুমি?

হ্যাঁ, তোমার অনুমান যথার্থ।

এবার মেয়েদের ব্যাপারে একটু সংযত হওয়ার চেষ্টা করো রস, তা না হলে একদিন না একদিন তুমি ঠিক একটা বড় রকমের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে দেখো!

কি বলতে চাও তুমি? ফুঁসে উঠলো রস।

আমার কথাটা তুমি ঠিকই বুঝেছো, অথচ না বোঝার ভান করছো। তোমাকে বোঝা ভার রস। কেন যে তুমি মেয়েদের সঙ্গে একটা না একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেও আমি পাই না।

বিস্ময় ভরা চোখে মাইকের দিকে তাকিয়ে থাকে রস। এখন সে ভাবছে, ঠিকই বলেছে মাইক, বরং মারজাকে সে-ই বুঝতে পারেনি, কেউই বুঝতে পারেনি ওকে, ও বড় রহস্যময়ী, ওকে বোঝা ভার—মাইক কি নিজেই ওকে ঠিক মতো বুঝতে পেরেছে? কিন্তু তার মতো

সে নয়, অত্যন্ত সাবধানী। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছিল মাইক, রস লক্ষ করেছে, কোনো ব্যাপারেই অহেতুক ঝুঁকি সে যেমন নেয় না, তেমনি ভুলও করে না সে কোনো কাজে। আবার এই মাইকই সব ব্যাপারেই সবার অন্তরায় হয়ে ওঠে, রস এ কথাও ভাবলো, কারোর অন্যায় বরদাস্ত করতে পারে না সে, বাধা সে দেবেই! কোনো কাজেই ঝুঁকি নেয় না সে, তাই বলে এই নয়, ভীরু প্রকৃতির ছেলে সে।

তবে এর পরেও একটা কিন্তু থেকে যায়, তাকে ঠিক মতো বুঝতে পারেনি মাইক, ভাবলো রস। তাই মারজাকেও বোঝার কথা নয় তার। আর না পারারই তো কথা! একবার চোখের দেখাও দেখেনি মারজাকে সে এখনো পর্যন্ত।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে শিশুর কান্নার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো মারজার কানে। ওপরে উঠে এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই তার সেই কান্নাটা এবার একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয় মারজা। তারপরেই পেছন থেকে একজোড়া পায়ের শব্দ কানে ভেসে আসতেই ঘুরে দাঁড়ালো ও। ওর সৎবাবা পিটারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো কথা না বললেও তার ঘুমে ঢুলু-ঢুলু চোখদুটোর চাহনি অত্যন্ত কদর্য বলে মনে হলো মারজার, কেমন বিশ্রীভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিল, নাকি সে তার লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে ওর যৌবনপুষ্ট দেহটা লেহন করছিল, ঠিক বুঝতে পারলো না মারজা সেই মুহূর্তে।

পাশে শয়নকক্ষের দিকে তাকিয়ে মারজা জানতে চাইলো, বাচ্চাটা কাঁদছে কেন?

ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে মারজার সৎবাবা ওর হাত চেপে ধরল, বলত রাত দশটা পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

সাঁতার কাটছিলাম।

মাকে বলে গেলেই তো পারতে। তুমি তো জানো তোমার মা'র শরীর ভালো নয়।

তা বাড়িতে বসে থেকে মাতলামো না করে কাজকর্ম কিছু জোগার করলেই তো পারো, তাহলে মাকে আর রাত্তিরে কাজে যেতে হয় না। মারজা মুখ ঝামটা দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে।

তোমার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব না থাকলে আমাকে এই অবস্থায় পড়তে হতো না।

বাবার বন্ধুত্বের খাতিরে নাকি আমার মা'র লোভে তুমি এ-বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলে!

খান্‌কি আর কাকে বলে? ওর সৎবাবা পিটার পোলিশ ভাষায় খিস্তি করল।

অথচ প্রথমদিন যখন ওর বাবার মৃত্যুর পর ওর সৎবাবা ওদের বাড়িতে কেকের প্যাকেট হাতে নিয়ে এলো, সেদিন তার ব্যবহারে কত আন্তরিকতা, কত নম্রতাই না ছিল? আর মারজাও তাকে একান্ত আপনজনের মতোন খাতির করতে কসুর করেনি। মনে আছে সেদিন ওর মা'র হাতে-তৈরী করা ওর পোশাকটা পরে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সৎবাবার সামনে। সে তখন ওর পিটারকাকা।

চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে এই নতুন পোশাকে। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি তুমি বড়

হয়ে গেলে কি করে?

মারজা ওর সুন্দর টানা-টানা বাদামী চোখ তুলে সোজাসুজি তাকিয়েছিল তার দিকে। বারে, আমার বয়স হয়নি বুঝি? জানো পিটারকাকু, আমার এখন তেরো চলছে। তবে তাই বলে অমন চমৎকার কেক আনার জন্যে তোমাকে চুমু দেবো না; এত বড় আমি এখনও হয়ে যাইনি, কই নিচু হও, তা না হলে তোমার মুখের নাগাল পাবো কি করে? মারজা হাসতে হাসতে বলেছিল।

পিটার নিচু হয়ে দু'হাত দিয়ে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছিল ওর গলাটা, তারপর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল মারজা। অপরিণত কিশোরীর মতোন নয়, ঠিক এক যুবতী মেয়ের মতন, যেন চুমু দেবার জন্যেই জন্মেছে ও। তাড়াতাড়িতে ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে গিয়ে মারজার পাখীর মতোন নরম বুকে তার হাতের ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল, হাতটা যেন আগুনে পুড়ে ঝলসে গেল, এতো উত্তাপ ওর বুকে। হাতে সেই ছোঁয়ার স্মৃতি আজও তার রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। দুর্ঘটনায় মারজার বাবার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সে পিটারকে বলেছিল, বছর না ঘুরতেই দেখবে পাড়ার ছেলেরা ওর পেছনে লাইন দিয়েছে। হেনরীর কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো। এক এক সময় পিটারেরও কি মনে হয় না, সেই সদ্য উঠতি যুবকদের দলে সে ভীড়ে যায়? যাইহোক, আপাততঃ পিটার তার মনের ইচ্ছেটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো আঙ্গুলে সেই ছোঁয়ার স্মৃতি মন্থন করে। তবে ইচ্ছে রইল একবার ওকে কায়দা করতে পারলে—

তোমার কেকটা সত্যিই খুব ভালো পিটারকাকু।

তাই নাকি! শুনে খুব খুশি হলাম।

মারজার মা কেটি পিটারের জন্যে কফি তৈরী করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে,— পিটারকাকুর কেক তো তোমার খুব ভালো লাগল বললে। এখন বলো ওকে বাবা হিসেবে পেতে তোমার কেমন লাগবে মারজা?

ওর অবাক হওয়া ভাবটা পিটারের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ তুমি কি বলছ মা-মণি? অব্যক্ত যন্ত্রণায় ওর বুকটা তখন ফেটে যাচ্ছিল।

মানে তোমার পিটারকাকুকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।

না মা-মণি, এ হতে পারে না। মারজা তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে,—আমি ওকে বাবা হিসেবে কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না। এ-ভাবে আমার স্মৃতিটা তুমি মুছে দিও না।

মারজা তুমি ছেলেমানুষ, কেটি ওকে ধমক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে,—তুমি এখন ছোট তাই বুঝতে পারছ না। বড় হলে বুঝবে, পুরুষমানুষ ছাড়া মেয়েদের বেঁচে থাকা কত কঠিন, কত কষ্টের। তাই বলছি ওকে তুমি তোমার বাবার মতো করে স্বীকার করে নাও।

না, মামণি সে আমি কিছুতেই পারব না। আমার বাবার অভাব কেউ পূরণ করতে পারবে না।

কিন্তু উনি খুব ভালো লোক। উনি আমাদের দুজনের ভার নিতে চান।

অসম্ভব! ঐ বেটে কালো লোকটা সার্কাসের ক্লাউনের মতো সে কিছুতেই আমার বাবা

হতে পারে না।

মারজা! কেটি করুণ সুরে বলে, তোমার নতুন বাবার সঙ্গে এখন একটু ভদ্র ব্যবহার করলে আমি খুশী হব। তারপর পিটারের দিকে ফিরে বলে—কিছু মনে করো না। মেজাজটা আজ ভাল নেই পরে ঠিক হয়ে যাবে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় কেটি। তারপর আস্তে করে দরজায় ধাক্কা দিতেই কপাটটা খুলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ভোরের প্রথম এক ঝলক মিষ্টি আলোয় ঘরটা ভরে গেলো। ঘরে প্রবেশের মুখেই মেয়ের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। মারজার ঘুমানোর ভঙ্গিটা বড় অদ্ভুত লাগে তার। এই কারণে যে, যখন ও জেগে থাকে তখন ওর রূপ অন্য রকম, অন্য মেয়ে ও তখন, যেন ঠিক পাকা গিন্নীর মতোন, অথচ ঘুমন্ত অবস্থায় ও যেন একেবারে শিশু হয়ে যায়। আপন ভোলা শিশু, যে শুধু তার মায়ের কথাই চিন্তা করে আর কারোর নয়। তখন ও একেবারে শান্ত, নির্লিপ্ত, তার নিবিড় প্রেম, একান্ত ভালোবাসার ফসল, তার চির-আদরের সেই ছোট্ট সোনামণিটা, তার প্রথম স্বামীর রেখে যাওয়া এক অনিন্দ্যসুখের স্মৃতি, শুধু স্মৃতি, বুক ভরে যায় কথা ভাবতে ভালো লাগে, যাকে স্বপ্ন দেখে সুখ, আবার সামনে দেখেও সুখ।

চকিতে একবার মেয়ের মুখের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কেটি এবার তার সদ্যজাত বাচ্চার কাছে গিয়ে কাথাটা নাড়াচাড়া করে দেখে, না একটুও ভেজেনি, তেমনি শুকনো রয়েছে, অবাক হয় কেটি। স্নেহ মমতায় ভরা মায়ের হাতের স্পর্শে বাচ্চাটা খুশিতে হাত-পা ছোঁড়ে। বাচ্চাটা তাহলে আরামেই আছে, নিশ্চিত হয়ে কেটি এবার মারজার মুখের দিকে তাকাতেই দেখলো বড় বড় চোখের মুগ্ধতা মুক্তোর মতো ছড়িয়ে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষে তার দিকে।

সুপ্রভাত মামণি, কেমন আছো তুমি?

শরীর আমার যথেষ্ট ভালো আছে, কিন্তু মন একটুও ভালো নেই সোনামণি, একবার তাকিয়ে কেটি বলে, আর আমার মনের অসুখের কারণ একমাত্র তুমি, হ্যাঁ তুমিই মারজা! কিন্তু কোনো জবাব দিলো না সে। গতকাল মারজা বাড়ি ফেরার আগেই কেটিকে তার রাতের কাজে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে না আসার দুর্ভাবনা নিয়ে। তবে আজ বাড়ি ফেরা মাত্র পিটার তাকে জানিয়ে দিয়েছিল মারজা বাড়ি ফিরেছে রাত এগারোটার পরে।

ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙলো মারজা অলস ভঙ্গিমায়, সেটা করতে গিয়ে চাদরটা ওর বুক থেকে খসে পড়লো কোমর অবধি। ওর ধবধবে সাদা নিটোল সুগোল স্তন তখন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, রোদে পুড়ে একটু বুঝিবা তামাটে আভা দেখা দিয়েছিল ওর স্তনের ওপরে।

মারজার উন্মুক্ত বুকের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে ধমকে উঠলো কেটি, আগে বুক ঢাকো বলছি। এর আগেও তোমাকে অনেকবার বলেছি, শোবার আগে রাতের পোশাক পরবে। এভাবে খুব খারাপ লাগে তোমাকে দেখতে, তুমি নিজে অনুভব করো না?

কিন্তু মামণি, বড্ড যে গরম লাগে, পোশাক গায়ে চাপাতে গিয়ে মারজা আধো আধো গলায় বললো, তাছাড়া মামণি, এখানে তুমি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ তো আর নেই।

না থাকুক, মেয়েদের এভাবে শোয়া ঠিক নয়, সব সময় তাদের শরীরের অনুভূতিপ্রবণ জায়গাগুলো পুরুষদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা উচিত, বুঝলে?

বিছানা থেকে নেমে পায়জামার দড়িটা বেঁধে নিয়ে কেটির কাছে এগিয়ে এসে তার গালে চুমু দিয়ে আদুরে গলায় মারজা বললো, লক্ষ্মীটি মামণি, আমার কথা শোনো, তুমি আমার উপর রাগ করলে আমার খুব খারাপ লাগে। রাগ করোনি তো?

গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত হেসে ফেললো কেটি। থাক্, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না, তোমার কথায় আমি ভুলছি না, বুঝলে? মেয়ের স্পর্শ এড়িয়ে গিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বললো কেটি, তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাবো, তাই না? কিন্তু আমি তোমার সব চালাকি ধরে ফেলেছি। তুমি ভেবেছো, আমি বুঝি কিছু বুঝি না?

মার মনের খবর টের পেয়ে গিয়ে মারজা এবার আগেভাগে সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করলো, বিশ্বাস করো মামণি, সত্যিই কাল আমি সাঁতার কাটতে গিয়েছিলাম। মারজা ওর বুকের উপর থেকে পোশাকটা একটু সরিয়ে বললো, এই দেখো, রোদে আমার বুকে কিরকম পোড়া দাগ হয়ে গেছে।

দেখেছি, বুক ঢাকো, বিশ্রী লাগছে দেখতে। মারজার বুকটা পোশাকে ঢেকে দিয়ে কেটি বললো, যাইহোক, যাবার আগে খবর দিয়ে যেতে দোষ কি ছিলো?

হঠাৎ আমরা স্কুল থেকে চলে যেতে হলো বলে তোমাদের খবর দেবার সুযোগ পাইনি। কনিদ্বীপে সি গেটের কাছে ফ্র্যান্সির এক বন্ধুর বিরাট একটা বাড়ি আছে জানো মামণি!

সি গেটের কাছে? বিস্ময়াবিষ্ট কেটি বলে উঠলো, শুনেছি ওখানে যতো সব বিত্তবানদের বাস, ফ্র্যান্সির বন্ধুরাও নিশ্চয়ই খুব ধনী হবে?

হ্যাঁ মামণি, ধনী বৈকি! সাবধানে কথা বলে মারজা, মাকে বুঝতেই দেয় না, ফ্র্যান্সির বন্ধু ছেলে না মেয়ে! তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, জানো মামণি, ওরা থাকে পার্ক এভিনিউতে।

এই সময় বাচ্চাটা কেঁদে উঠতেই তাড়াতাড়ি ওকে বুকে তুলে নিলো কেটি। তা হলেও অত রাত করে তোমার বাড়ি ফেরা উচিত হয়নি।

আমি তো সন্ধ্যা থেকেই তাড়া দিচ্ছিলাম বাড়ি ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু কি করবো বলো, ও যে রাতের ডিনার সেরে যেতে বললো।

ঠিক আছে, আর কখনো অমন দেরী করে বাড়ি ফিরো না। তোমার বাবাও তোমার জন্যে খুব চিন্তা করছিল।

কেন? মারজার ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। মদ ফুরিয়ে গেছলো বলে?

মারজা? ধমক দিয়ে উঠলো কেটি। বাবা তোমার গুরুজন, ওঁর সম্পর্কে এভাবে তোমার কথা বলা উচিত নয়।

আলনার দিকে এগিয়ে যায় মারজা। একটা স্নানের পোশাক টেনে নিয়ে গায়ে জড়াতে

জড়াতে রুক্ষস্বরে মারজা বলে উঠলো, তাকে আমি আমার বাবা বলে স্বীকার করি না।

কেটি এবার সত্যি সত্যি খুব রেগে যায়। তার কথার ঝাঁঝ প্রকাশ পায়। কেন বারবার এক কথা বলো তুমি? ও তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে, আর ও চায় তুমিও ওকে ভালোবাসো। কেন তুমি ওর দুঃখটা বোঝবার চেষ্টা করো না বলো তো?

মা'র কথায় কোনো জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করলো না মারজা। যেন ও মা'র কথা শুনতেই পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে ব্রাসে টুথপেস্ট লাগিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চোখের আড়াল হওয়ার আগে দরজার ওপার থেকে বলে উঠলো, বাচ্চার জন্যে আমি দুধ তৈরী করে নিয়ে আসছি। একটু পরে মুখ ধুয়ে দুধের বোতল হাতে ফিরে এলো মারজা।

বাচ্চাকে তুমি দুধ খাওয়াও, আমি তোমার ব্রেকফাস্ট তৈরি করে নিয়ে আসি, কেটি বললো, তা না হলে তোমার আবার স্কুলের দেরী হয়ে যাবে। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কেটি।

দুধ খাইয়ে তোয়ালে দিয়ে বাচ্চাটার মুখ মুছিয়ে মারজা ধমক দিয়ে ভাইকে বলে, চুপ করে থাকবে, একদম কাঁদবে না লক্ষ্মীসোনা। আমি ততক্ষণে আমার স্কুলের পোশাকটা পরে নিই, কেমন।

মারজা খাট থেকে নেমে দাঁড়াতেই বাচ্চাটা বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আলনা থেকে স্কুলের পোশাক টেনে নিয়ে মারজা ওর পরণের পোশাকটা খুলে ফেললো দ্রুত হাতে। তেমনি দ্রুত হাতে প্যান্টটা পরে নিয়ে ব্রাটা টেনে নিতে যায়। হঠাৎ আয়নার ওপর দৃষ্টি ফেলতেই চমকে উঠলো মারজা। আয়নার ঠিক উল্টোদিকে রান্নাঘরের দরজাটা খোলা, সেখানে একটা টেবিলের উপর ওর সৎবাবাকে বসে থাকতে দেখলো। তার চোখে লোলুপ দৃষ্টি। মারজার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই ওর সৎবাবা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়।

তার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে মারজা তেমনি দুহাতের মধ্যে দিয়ে ব্রাটা দ্রুত গলিয়ে হুকটা লাগিয়ে নেয়। তারপর সোজা রান্নাঘরে যাওয়ার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ কটমট করে সৎবাবার দিকে তাকিয়ে থাকে মারজা। কিছুক্ষণ পরে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পোশাক বদলাতে শুরু করে দেয় মারজা।

এক সময় খাবারের পাত্র হাতে ঘরে প্রবেশ করলো কেটি। চকিতে একবার খাবারের পাত্রটা দেখে নিয়ে সারদা বিরক্তি প্রকাশ করলো, আবার উটের খাবার তৈরী করেছো?

খেয়ে নাও। স্বাস্থ্যের পক্ষে ওটা খুবই ভালো।

আমার খেতে ভালো লাগছে না। নিরাসক্তের মতো বললো মারজা।

তা কেন লাগবে? কখন যে সৎবাবা নিঃশব্দে রান্নাঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি মারজা। ভালো খাবার না হলে তো মেয়ের আবার মুখেই উঠবে না।

তাকে একটু খোঁচা দেবার লোভটা সামলাতে পারলো না মারজা। রুক্ষস্বরে বললো, ও, হ্যাঁ সত্যি তো, ভালো খাবার একটু খেলেই পেট ভরে যায়।

তা অবশ্য ঠিক। পিটারের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ঝরে পড়ে। জানো কেটি, আমরা গরীব,

গরীব খানা খেতে মেয়ে আমাদের খুবই লজ্জা পাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলো মারজা। আমাদের এমন দুরাবস্থা হতো না যদি না তুমি বেকার হয়ে বাড়িতে বসে মদের বোতল ধ্বংস করতে।

শুনলে কেটি, আড্ডাবাজ মেয়ের কথা? স্ত্রীর দিকে অসহায় দৃষ্টি রেখে পিটার বলে উঠলো, দিনরাত শুধু ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মেরে মেরে ও কিরকম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে শিখেছে দেখেছো? বাবা-মার ওপরে শ্রদ্ধা-ভক্তি বিন্দুমাত্র নেই ওর।

উত্তরটা যেন মারজার মুখেই লেগেছিল। বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধা আমার থাকবেই বা না কেন? কিন্তু তোমার মতো নিষ্কর্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি একটুও নেই।

মারজা, তুমি চুপ করবে? চিৎকার করে উঠলো কেটি।

ওকে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে মানা করো, তাহলেই আমি ঠিক চুপ করে যাবো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাবার মুখে তুলে নেয় মারজা।

তোমার বাবা মিথ্যে অভিযোগ করে না তোমার বিরুদ্ধে, আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে কেটি। ওর সঙ্গে একটু ভালো ভাবে কথা বলবে তো? ও কিন্তু তোমার কথা সব সময়েই ভাবে।

থামো তো তুমি। ওর হয়ে তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না। তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলো মারজা। এক নম্বরের স্বার্থপর ও। নিজের ছাড়া অন্য আর কারোর কথা ভাবতে জানে না ও। যদি ওর মধ্যে এতটুকু দয়ামায়া থাকে, তাহলে নিজে ঠায় বাড়িতে বসে থেকে তোমাকে কাজের জন্যে রাতভোর বাইরে পাঠিয়ে নিজে মদের বোতল আঁকড়ে ধরে বসে থাকতো না। আমাদের সংসারে ও ঠিক ক্যানসারের মতো, যতো তাড়াতাড়ি অপারেশন করে বাদ দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।

কেটি এবার আর স্থির থাকতে পারলো না, আগে থেকেই তার হাতটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, মারজার মুখ বন্ধ করার জন্যে একটা তাগিদ অনুভব করছিল ভেতরে ভেতরে সে। তাই সে এবার মারজার সামনে ছুটে গিয়ে ওর ফর্সা গালে একটা চড় কষিয়ে দিলো। মুহূর্তে মারজার দুধ-সাদা গালে কেটির পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যেতে দেখা গেলো।

হঠাৎ মার অমন অস্বাভাবিক ভাব দেখে কিছু সময় ধরে স্তব্ধ বিস্ময়ে কেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিঃশব্দে। তারপর এক সময় মুখ খুললো ও, তুমি আমাকে চড় মারলে?

কেটি নিজেও বোবা বনে গেছে তখন। ভেতরে ভেতরে সে-ও খুব কষ্ট পাচ্ছিল। কান্নার মতো কি যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠছিল তার গলার মধ্যে তখন। এই প্রথম মেয়ের গায়ে হাত তুললো সে। তবু তা সত্ত্বেও আগের মতোই কঠিন সুরে বললো সে, হ্যাঁ মারবোই তো। কি ভাবে বাবা-মার প্রতি ভদ্র ব্যবহার করতে হয়, সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই আমাকে এমন কঠিন হতে হয়েছে।

ওদিকে তখন মারজার চোখ দেখে মনে হলো, এখনি বুঝি ওর দুচোখের কোল বেয়ে অশ্রুর বাদল নামবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, চোখে ওর এক ফোঁটা জলও নেই, দুঃখে বেদনায় ওর চোখের সব জল নিঃশেষ, শুধু মরুভূমির হাহাকার সেখানে। আর সে জায়গায় ওর দু'চোখের দৃষ্টি তখন অগ্নিবর্ষনের মতো ঝরে পড়লো, ও তখন ওর মাকে বুঝিয়ে দিলো,

এখন আর ছোট্ট মেয়েটি নেই, ও এখন নিজের ভালো মন্দ বুঝতে শিখেছে, তাই তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ও।

মেয়ের মনের খবর টের পেয়ে গেছে কেটি তখন। তার মনট ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে তখন। মারজা! ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, আমি দুঃখিত সোনামণি, তোমাকে আঘাত করে দুঃখ আমিও কি কম পেয়েছি?

আমিও ভীষণ দুঃখিত মামনি। প্রত্যুত্তরে এমন করুণ সুরে কথাটা বললো মারজা যে ওর কথা শুনে মনে হলো, ওই-ই যেন ওর মাকে প্রথমে আঘাত করেছে। তারপর সেখানে এক মুহূর্তও আর দাঁড়াতে পারলো না, ছুটে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে।

অসহায় দৃষ্টি ফেলে পিটারের দিকে তাকায় কেটি। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে যাওয়া মারজার পায়ের শব্দ ভেসে আসে। কেটির চোখের কোল বেয়ে জল উপচে পড়ে। আর্তনাদ করে ওঠে সে, আমি বোধহয় ভুল করলাম পিটার। মেয়েটাকে ওভাবে মারা উচিত হয়নি।

কেন উচিত হয়নি। তুমি আজ যা করলে অনেক আগেই সেটা করা উচিত ছিলো তোমার।

তাহলে তোমার মতে আমি ঠিকই করেছি পিটার? বিশ্বাস করতে পারছে না কেটি।

পিটারের চাপা উল্লাসটা প্রকাশ হয়ে পড়লো। হ্যাঁ, অবশ্যই।

ওদিকে বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে যেতেই কেঁদে ওঠে, কেটি তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশুপুত্রকে দোলাতে দোলাতে কেটি তখন ভাবছে, হয়তো পিটারের কথাই ঠিক, মারাটা অন্যায় হয়নি। কিন্তু তার মন যে কিছুতেই মানতে চায় না, বুকের মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রনা খচ খচ করে উঠতে থাকে তার।

র‍্যানিসের স্টেশনারি দোকানে প্রবেশ করার পর থেকেই কেমন ছটফট্ করতে থাকে মারজা। ঘন ঘন পায়চারি করার সময় হঠাৎ তার ফোনটা বেজে উঠতেই মারজা ব্যস্ত হয়ে ফোনের দিকে ছুটে যেতে গিয়ে বলে উঠলো, ছেড়ে দাও, ওটা আমারই ফোন র‍্যানিস। এই বলে দ্রুত হাতে টেলিফোনটা তুলে নেয় মারজা।

দূরভাষে রসের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, কে, মারজা কথা বলছো নাকি?

হুঁ। অস্ফুটে বলে মারজা।

আমি রস বলছি।

তোমার গলার স্বর চিনতে পেরেই বুঝেছি—

তা তুমি কি করছিলে?

তোমার ফোন আসার অপেক্ষায় ছিলাম। যা গরম, কী আর করবো বলো?

বেশ তো, চলো না-নদীর ধার একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক?

ঠিক আছে, তাই না হয় চলো।

তাহলে ওখানেই থাকো, যাওয়ার পথে আমি তোমাকে তুলে নেবো কেমন?

না রস, ঘামে আমার পোশাক ভিজে একেবারে জ্যাবজেবে হয় গেছে। বরং বাড়ি গিয়ে এটা পাল্টিয়ে অন্য কোথাও অপেক্ষা করবো না হয় তোমার জন্যে।

সেই ভালো, আমার গ্যারাজে তুমি চলে এসো, তিরাশি নম্বর পার্ক এভিনিউ, মনে থাকবে তো?

হ্যাঁ, খুব মনে থাকবে।

বেশী দেরী করো না কিন্তু।

না, আধ ঘন্টার মধ্যেই তোমার গ্যারাজে ঠিক পৌছে যাবো দেখো।

তাহলে ওই কথা রইলো, এখন ছাড়ছি।

ঠিক আছে।

এরপর সেই ছোট ঘর থেকে মারজা বেরিয়ে আসতেই র‍্যানিস ওর পথ আগলে দাঁড়ায়। তার চোখে এক অজানা সন্দেহ থিক্‌থিক্ করতে থাকে। কে ও?

বন্ধু। মারজা ওর চোখে-মুখে অবজ্ঞার ছায়া ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দুহাত বাড়িয়ে ওর পথ আগলে দাঁড়াও র‍্যানিস। তোমর জন্যে একটা নতুন ধরণের চকোলেট এনেছি, পরখ করে দেখবে না?

না, এখন ওসব থাক। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি দেখিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায় মারজা।

বুড়ো র‍্যানিস ওর একট হাত শক্ত করে চেপে ধরে নরম সুরে বললো, বিশ্বাস করো, চকোলেটের দাম নেবো না।

হাসি চাপতে পারে না মারজা। দাম চাইলেও দেওয়ার ক্ষমতা এখন আমার নেই। র‍্যানিসের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মারজা বলে, তাছাড়া বাড়ি ফিরতে দেরী হলে বাড়িতে বকাবকি করবে আমার মা ও বাবা।

পেছন থেকে বুড়ো র‍্যানিস ওর শরীরটা স্থির চোখে জরীপ করতে থাকে। তাতেই বুড়ো সন্তুষ্ট হয়ে হঠাৎ খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে উঠলো, আবার যদি কখনো কিছুর প্রয়োজন হয় তোমার, এই বুড়োর কাছে চলে এসো, সে তোমার সব চাহিদা পূরণ করে দেবে, মনে থাকে যেন?

মনে থাকবে র‍্যানিস, পেছন ফিরে হাত নেড়ে বললো মারজা, তোমার কাছে আবার আমি ফিরে আসবো। বুড়ো ভাম কোথাকার। মনে মনে খিস্তি করলো মারজা তাকে। পরক্ষণেই আমার কেমন মায়া হলো ওর এই কথা ভেবে, কতো অল্পেই না সন্তুষ্ট সে। শুধু তার চোখ দিয়ে ওর শরীরটার জরীপ করতে দিলেই খুশি সে, তার বিনিময়ে মারজা তার কাছ থেকে যা চাইবে তাই দিতে প্রস্তুত সে। অথচ একটা যুবকের কাছে এতো কম ঢলাঢলি করে কিছুই পাওয়া যায় না, ভাবলো মারজা।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই মার মুখোমুখি পড়ে গেলো মারজা। আজ তাহলে সকাল সকালই বাড়ি ফিরলে দেখছি। লক্ষী সোনামনি আমার।

হ্যাঁ মামনি, দেখলে তো আজ তোমার কথা রেখেছি কেমন, সোজা স্কুল থেকে বাড়ি

ফিরে এসেছি।

স্কুলে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

না, অসুবিধে হতে যাবে কেন? এক পলকে মারজা ওর মাকে দেখে নিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মা?

না মানে, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি। আসলে কেটি সেদিন সকালের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে কতো যে অনুতপ্ত, সে কথাটাই বলার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু মুখে সে কথা বলতে পারলো না সে। কেটি বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়েই নিচে নেমেছিল। তাই সে এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়।

কোথায় যাচ্ছো মা? ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো মারজা।

এই দোকানে। মিথ্যে করেই বলতে হলো কেটিকে। আসলে নিজেকে দেখানোর জন্যেই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে কেটি, কিন্তু সে কথা মেয়েকে বলা যায় না। তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টিয়ে কেটি জিজ্ঞেস করলো, বিকেলে বাড়ি থাকছো তো?

না মামনি, ভাবছি বিকেলে এক বন্ধুর বাড়িতে যাবো। দুজনে মিলে স্কুলের পড়া নিয়ে আলোচনা করবো। ঘামে পোশাকটা কেমন ভিজে গেছে, পাল্টাতে এসেছি।

তাই বুঝি? কেটি বলে, ঠিক আছে। তবে হ্যা, দেখো, আওয়াজ করো না, ছোট ভায়ের ঘুম ভেঙে যাবে।

ঠিক আছে, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।

বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ওপরে উঠে এসে কান পাততে গিয়ে কোনো শব্দই কানে এলো না ওর। শূন্য রান্নাঘর। হলঘরও তাই, সেটা পেরিয়ে ছোট ঘরটায় ঢুকে দেখলো ও, জানালার সামনে চেয়ারের ওপরে ওর সৎবাবা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। মাথাটা ঝুলছে, খবরের কাগজটা বিছানো রয়েছে তার হাঁটুর ওপরে।

মারজা তখন তেমনি নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলো, বাচ্চাটা অঘোরে, ঘুমচ্ছে দোলনায়। নিশ্চিন্তে ও তখন আলমারি থেকে পরিস্কার পোশাক বার করে সেগুলো বিছানার ওপর রেখে দিয়ে ও এবার ওর ঘামে ভেজা জামাকাপড় খুলতে শুরু করলো। প্রথমে ব্লাউজ, পরে ঘাঘরাটা দেহচ্যুত করে ফেলে এবার। তারপর নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে ফিরে এলো বাথরুমে।

গা ধোবে সে এবার। খুব আস্তে করে কল খুললো। জলের কলকল শব্দ এড়াতে, কারণ কলের শব্দে ওর সৎবাবার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তারপর দ্রুত হাতে ও ওর বুকের ওপর থেকে ব্রায়ের হুক খুলে, বক্ষমুক্ত করে সেটা ব্রাকেটের উপরে ঝুলিয়ে রাখে। এবার বুকে পিঠে জল-সাবান বুলিয়ে নেয় ও। চোখ বুঁজে মুখেও সাবান মাখলো, তারপর জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলে তোয়ালে দিয়ে ভিজে গা মুছে পরিস্কার ব্রাটা নেবার জন্যে দেওয়ালের ব্রাকেটটার দিকে হাত বাড়ালো পেছনের দিকে না তাকিয়েই। কিন্তু সেটা ও হাতের নাগালে পেলো না। কি মনে করে ও এবার পেছন ফিরে মেঝের দিকে তাকায় যদি সেটা নিচে পড়ে গিয়ে থাকে। তখনি সৎবাবার গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো মারজা।

এই যে এখানে, নিচে পড়ে গিয়েছিল ওটা, কুড়িয়ে রেখেছি তোমার জন্যে।

মারজা স্তম্ভিত। সৎবাবার কথাগুলো ওর মনে একটুও বিশ্বাস জাগাতে পারে না। বরং একরাশ বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে ওর নগ্ন বক্ষ এক হাতের আড়ালে ঢেকে অপর হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দেয় ব্রাটা নেওয়ার জন্যে। ওর কথায় বিদ্রুপ ধ্বনিত হয়। এটা পড়ে যাওয়ার সময় বুঝি মেঝেতে শব্দ হয়েছিল, আর তাতেই কি তোমার ঘুম ভেঙে যায়?

মারজার বিদ্রুপ গায়ে এতটুকু না মেখে কেমন বেহায়ার মতো হাসতে হাসতে বললো পিটার, সত্যি কি সুন্দর তোমার শরীর, ছেলেবেলায় তোমার মা ঠিক তোমার মতোই এমনি দেখতে সুন্দর ছিলো।

তা তুমি কি করে জানলে? ব্রার হুক আটকাতে গিয়ে প্রতিবাদ করে উঠলো মারজা। তখন তো মার সঙ্গে তোমার দেখাই হয়নি।

ব্রার আড়ালে মারজা ওর নগ্ন বুক ঢেকে পিটারের পাশ কাটিয়ে বাথরুম থেকে বেরোতে গেলে হাত বাড়িয়ে সে তার কাঁধ ছুঁয়ে ফেলে। তারপর দুহাত দিয়ে ওর দুধসাদা কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে অনুযোগ করে বললো, সব সময় তুমি আমাকে এভাবে এড়িয়ে যাও কেন বলো তো?

ধীরে ধীরে মারজা ওর সৎবাবার চোখে চোখ রেখে বলে তোমাকে আমি কখনোই এড়িয়ে যাইনি পিটারকাকা। আসলে কি জানো পুরুষ হয়ে নিষ্কর্মার মতো ঠায় বাড়িতে বসে থেকে স্ত্রীর টাকায় মদ গেলাটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না।

শোন, যদি আমি একটা কাজ জুটিয়ে নিই, মিনতির মতো করে পিটার বলে, তখন তুমি আমাকে এড়িয়ে যাবে না তো? তখন তোমাকে কাছে পাবো তো!

আগে একটা কাজ জোগাড় করো তো, মনে মনে খিস্তি করলো মারজা, ড্যামনা কোথাকার! তারপর আবার বললো, তখন ভেবে দেখা যাবে।

তখন তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করবে, তাই তো? বলেই ওকে বুকে টেনে নিয়ে চুমুক খেতে যায় পিটার। আচমকা মুখটা সরিয়ে নিতেই পিটারের কামার্ত ঠোঁটজোড়া পিছলে মারজার গালের ওপরে আঁছড়ে পড়ে। ঘৃণায় মারজা গাল মুছে নিয়ে তার কামজ হাতটা জোরে মোচড় দিতেই শিথিল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে তার হাতের বন্ধনমুক্ত হয়ে একরকম ছুটে পালিয়ে যায় ওর ঘরে।

ভেতর থেকে মারজার বন্ধ ঘরের দরজার দিকে লোলুপ দৃষ্টি তাকাতে গিয়ে পিটারের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, ঝড় ওঠার সংকেত শুনতে পায় সে। বেজন্মার বাচ্চা কোথাকার! নিজের মনেই মারজার উদ্দেশে খিস্তি করে তার ঝাল মেটায়, দেবো তোর শরীটা এমন চটকে, সেদিন তোর সব সতীপনা ঘুচিয়ে ছাড়বো। তারপর মদের বোতলের খোঁজে বরফের বাক্সের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

সামনে হাডসন নদী। সবুজ ঘাসের ওপর মারজা হাঁটু মুড়ে বসেছিল। হাওয়ায় ওর সোনালী চুলগুলো বাচ্চা মেয়ের মতোন লুটোপুটি খাচ্ছিল। হঠাৎ ও বলে উঠল, জানো রস, এই গ্রীষ্মের ছুটিতে যদি একটা চাকরী পেতাম সংসারের উপকার হতো। তুমি তো

জানো আমার সৎবাবা মাতাল। মা অসুস্থ শরীর নিয়ে রাত্তিরে কাজ করতে যান। এক্ষেত্রে আমার চাকরী পাওয়াটা একান্তই জরুরী।

তা তুমি কি ধরণের চাকরী চাও বলো? রস কৌতুহলী চোখে তাকায় ওর দিকে।

যে কোনো, কেরানীর চাকরী হলেও চলবে।

কিন্তু ওতে আর কতই বা পাবে? সপ্তাহে বড় জোর আট ডলার?

একেবারে না পাওয়ার চেয়ে সেটা ভাল নয় কি?

আচ্ছা তুমি নাচ জান? মানে ভালো নাচ?

হ্যাঁ, ভালো নাচই জানি মারজার চোখে কৌতুহল, কেন বল তো?

চলো, রস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখি তোমার জন্যে কি করতে পারি।

হলঘরের দেওয়াল জুড়ে মেয়েদের ছবি, হাসছে। হাসিতে ও কিসের আমন্ত্রণ? ছবিগুলোর নিচে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ঃ

"আমার সঙ্গে নাচবে এসো ; মাত্র দশ সেন্ট।"

এক ডলারের দুটো টিকিট কেটে রস নাচঘরে গিয়ে ঢুকলো মারজার কোমরে হাত রেখে। মৃদু স্বপ্নিল আলোয় তারা হেঁটে এলো একেবারে শেষ প্রান্তে। বাজনা বাজছিল সেখানে। রসকে দেখা মাত্র কয়েকজন তরুণী যন্ত্রচালিতের মতোন উচ্ছ্বসিত হয়ে তার কাছে ছুটে এলো। কিন্তু মারজাকে তার পাশে দেখা মাত্র তাদের মুখের হাসি নিমেষে মিলিয়ে গেলো, সেই সঙ্গে তারাও।

ডানদিকে মদ খাবার জায়গা। রস বিয়ারের অর্ডার দিয়ে মারজার দিকে তাকাল, কি, প্রস্তুত তো?

অদ্ভুত একটা হাসি ঝলসে উঠল ওর ঠোঁটে। সব সময়েই আমি প্রস্তুত।

তাহলে এসো, নাচা যাক।

বাজনার তালে তালে নিখুঁত পায়ের ছন্দে নাচছিল মারজা। রস স্তব্ধ, বিস্মিত, ওর এমন ছন্দময় নাচের ভঙ্গী দেখে। এখানকার মেয়ে হলে ওকে সে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতো, কিন্তু একথাও ঠিক যে, ওর মতো ওই সুরমূর্ছনাকে এমন করে তারা একাত্ম করে নিতে পারতো না।

ফিরে এসে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে মারজা ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা টেনে জিজ্ঞেস করে, নাচ আমার কেমন হলো, ভালো তো?

তুমি এতো ভালো নাচ কোত্থেকে শিখলে?

কোথাও না, মারজা মুখ টিপে হাসে, নিজে নিজেই শিখেছি।

এখানে মেয়েরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ডলার রোজগার করে, রস ওকে বলল।

শুধু কি নাচের জন্যে? আর কিছু করতে হয় না? মারজা অদ্ভুত চোখে তাকায়।

একটু ইতস্ততঃ করে রস বলে, হ্যাঁ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাই।

তাহলে তো ওরা অনেক কামায়? ওর চোখদুটো কেমন লোভাতুর হয়ে ওঠে।

হঠাৎ নিজের ওপর রস কেমন বিরক্ত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলো,

এবার ফেরা যাক।

মারজা নীরবে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর কাঁধের ওপর থেকে কে যেন বাজখাই গলায় চিৎকার করে ওঠে, —আরে রস যে, তোমাকে কতদিন যেন দেখিনি। তা কোথায় ছিলে এত দিন?

মারজা পেছন ফিরে তাকাতেই অবাক হলো ধূসর কালো চুল লম্বাটে একজন লোককে ঠিক ওর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

রস জবাব দিতে গেলে লোকটা তাকে বাঁধা দিয়ে বলে, — থাক আর বলতে হবে না। মারজার দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে সে আবার বললো, —বুঝেছি, এখানকার মেয়েদের কেন তোমার মনে ধরছে না এখন আর।

মারজা মুখ টিপে হেসে রসের দিকে তাকায়। হাসি হাসি মুখ ওর, তবে চোখ দুটো কেমন ঠাণ্ডা।

হ্যালো জোকার, এসো তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, একটু ইতস্ততঃ করে রস বলে, —জোকার মারটিন, মারজার দিকে ফিরল সে এবার, আর ও হলো মারজা ফ্লাড।

জানেন, রস আমাদের পুরনো খদ্দের। এতদিন কেন যে ডুব দিয়েছিল, এখন বুঝতে পারছি আপনাকে দেখে তার কারণটা। ওর পছন্দের সত্যিই তারিফ করতে হয়।

মারজার মুখ লাল হলো লজ্জায়।

জানো মারজা, রস বলে জোকার হলো এই নাচঘরের মালিক। সব সময় ওরা টাকার চিন্তা।

জোকারের দিকে তাকিয়ে ও মৃদু হাসে। কেই বা চিন্তা করে না বলুন?

জোকার দাঁত বার করে হাসে। তারিফ করার ছলে ওর কাঁধে হাত রাখে ইচ্ছে করে। যা বলেছেন, আপনার বন্ধুর মতো আমরা কি ধনী হতে পারবো কোনদিন?

মারজা এই প্রথম তার চোখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল, সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে চাপা ধূর্তমি।

আচ্ছা আপনি তো এখন চাকরি খুঁজছেন, তাই না?

মারজা জবাব দেবার আগেই রস ওর হয়ে বলে, —না ওকি চাকরী করবে? ও-তো এখনো স্কুলে পড়ছে।

তাই বুঝি। জোকারকে বুঝিবা একটু আহত বলে মনে হলো। অবশ্য সামলে নিয়ে পরক্ষণেই আবার সে বলে, ভালো কথা, আমার অফিস-ঘরের পেছনে ছাত্রদের জন্যে নিয়মিত একটা জুয়ার ব্যবস্থা করেছি। তোমার ভালো লাগবে, আসবে?

হয়তো আসতে পারি কোন এক সন্ধ্যায়। আজ চলি।

সঙ্গে ওঁকেও এনো। মারজার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল সে, উনি এলে খেলা জমবে ভালো। চাই কি তোমার ভাগ্যও ফিরে যেতে পারে।

আচ্ছা চেষ্টা করবো। শুভ রাত্রি। রস তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এলো।

গাড়ী চালাতে গিয়ে রস তাকায় ওর দিকে। ও তখন উইণ্ডস্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। রস জানে, ও এখন কি ভাবতে পারে। তাই ওর সেই চিন্তার ছেদ টানার জন্যে

রস নিচু গলায় বলল, চলো, আমার বাড়িতে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

তোমার বাড়ির লোকেরা কেউ কিছু ভাববে না! মারজ্জার চোখে এক রাশ প্রশ্ন এবং বিস্ময়, রস কি বলতে চাইছে।

রস মাথা নাড়ে। সপ্তাহ শেষের ছুটিতে সবাই বাইরে গেছে।

ঠিক আছে, তাহলে চলো। বললো মারজ্জা।

রস তার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাতে বাধা পেলো, মারজ্জা তার হাত চেপে ধরলো। এতক্ষণ তোমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলাম, অথচ তুমি আমাকে একবারও চুমু দিলে না। সেই থেকে অতো কি ভাবছ বল তো? আমি কি কোন দোষ করেছি রস!

রস মাথা নাড়ল। ওকে সে সব কথা বলা যায় না। নাচঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে মস্ত ভুল করেছে সে, তার জন্যে নিজের ওপর ভীষর রাগ হলো। ওরকম একটা জঘন্য জায়গায় গিয়ে পড়লে ওরা এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ্যা বানিয়ে ছাড়বে। না, তা সে হতে দেবে না। টাকার ওর যতোই দরকার থাকুক না কেন, এদিককার কথাটা তার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

মারজ্জা ধৈর্য রাখতে পারল না। দু'হাত দিয়ে রসের গলা জড়িয়ে ধরে আলতো করে তার চিবুকে ঠোঁট বোলাতে বোলাতে বলল, আমার ওপর তুমি রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

দরজার কপাটে হেলান দিয়ে রস ওকে বুকে টেনে নেয়। মারজ্জা স্বেচ্ছায় সমর্পিতার ভূমিকায় ওর দেহের সমস্ত ভার শিথিল করে দেয় রসের বুকের ওপর। রস ওকে চুমু খায়।

আমাকে তোমার ভাল লাগে মারজ্জা? রস ওর ঠোঁটের ওপর থেকে মুখ সরিয়ে শুধায়।

তুমিই আমার জীবনের সব চেয়ে মিষ্টি ছেলে রস, মারজা উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে, তাই তোমাকেই তো আমার সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে।

রস সহসা রেগে ওঠে, মারজ্জা তার কথার মধ্যে অন্য ছেলেদের প্রসঙ্গ টেনে আনতে। —না, সে কথা আমি বলতে চাইনি। রস ওকে জোরে কাছে টেনে এবং আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। আমি-আমি তোমাকে একান্তভাবে কাছে পেতে চাই।

সে কথা তুমি বেশ ভালো করেই জানো। তুমিও কি ঠিক একই ভাবে আমাকে কাছে পেতে চাও মারজ্জা?

সেই নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মারজ্জা। তারপর রসের চোখে চোখ রেখে ও শান্ত ভাবে বলে, —হ্যাঁ, তোমার মতো ভালোবাসলেও এর চেয়ে বেশী দূর আর আমি এগোতে পারি না। আমি মেয়ে, তোমার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়া গভীর ভাবে মিশিয়ে দিলে যদি আমাকে শেষে অসুবিধেয় পড়তে হয়? না, সেটা মেয়েদের পক্ষে ভালো নয় রস।

কিন্তু—

মারজ্জা তাকে বাধা দেয়। না রস, তা হয় না। তার গালে ও আলতো করে ঠোঁট বুলিয়ে দেয়। লক্ষ্মীটি, ফিস্‌ফিস্ স্বরে ও বলে, —তোমাকে সুখ দেবার জন্যে তুমি যা চাইবে আমি

তাই দেবো রস, কিন্তু ওটা ছাড়া, ও আমি এখন কিছুতেই খরচ করতে পারবো না।

বেশ, ও ছাড়া যা কিছু চাইবো দেবে তো?

হ্যাঁ, বললাম তো। মিষ্টি হেসে ও বলল, বলো কি চাও?

রস ওকে কাছে টেনে আনলো সোফার ওপর। মারজার তপ্ত দেহের ওপর তার উষ্ণ শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠতে খুব বেশী সময় লাগল না। রস ওর দেহের সঙ্গে তার দেহটা সম্পূর্ণ করে মিশিয়ে দিতে চাইলো। সে আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। কিন্তু চরম মুহূর্তের আগে মারজা খুব সাবধানে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে করুণ সুরে মিনতি করে বলে, —লক্ষ্মীটি, আমাকে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে দাও।

রাত তখন সাড়ে দশটা। ছিয়াশিতম সড়কের থিয়েটার ভাঙবে এগারোটায়। তার আগেই সান্ধ্য পত্রিকাগুলো গুছিয়ে রাখতে হবে থিয়েটার ফেরত খদ্দেরদের হাতে তুলে দেবার জন্যে। আজ সারা সন্ধ্যে সে এই বাড়িতেই লিফট চালকের বদলি হিসেবে কাজ করেছে। তাই শরীরটা খুব ক্লান্ত ছিল। মনে হয় রাতটা তাড়াতাড়ি কেটে যাবে।

আরে মাইকেল যে!

মাইকেল তার কাগজের বাণ্ডিলের ওপর থেকে চোখ তুলে রসের দিকে তাকাল কৌতূহলী চোখে, সে কি, তুমি ওদের সঙ্গে বেড়াতে যাওনি।

না, আজ কেবল একজনের সঙ্গে এপয়েণ্টমেণ্ট ছিলো। এই সোনালী চুলের মেয়েটির সঙ্গে। রস তার গাড়ীর দিকে তাকাল।

আমি ভেবেছিলাম, মাইকেল গাড়ীর দিকে তাকাল মেয়েটিকে দেখার জন্যে, কিন্তু অন্ধকারে ওর মুখ স্পষ্ট দেখা গেলো না, ও মেয়েটিও তোমার খেলার আর এক সঙ্গিনী।

রস রেগে ওঠে। ওভাবে তোমার কথা বলা উচিত নয়। তুমি তো মেয়েটির সম্বন্ধে কিছুই জানো না এখনো।

মাইকেলের কেমন সন্দেহ হয়। রস কোনদিন এর আগে কোন মেয়ের সম্বন্ধে এমন আন্তরিক ভাবে কথা বলেনি। তাহলে নিশ্চয়ই সে ওর প্রেমে দারুণ মজে গেছে। মনে মনে হাসল সে। রসের প্রেমরসনায় তৃপ্তি!

তাই নাকি?

নিজের চোখেই ওকে দেখবে চলো না। রস তাকে আহ্বান জানাল, আলাপ করতেই বুঝতে পারবে।

মাইকেল তার অদম্য কৌতূহল কোন রকমে দমন করে মেয়েটিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বেশ একটু জোরেই বলল, —তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। আমি অবিশ্বাস করছি না। মাইকেল তার কাজের কথায় ফিরে এলো, তোমার কাগজ চাই না রস?

রস মাথা নাড়ল। মাইকেল তার হাতে 'টাইমস'-এর একটা সংখ্যা তুলে দিলো। রস তার হাতে দামটা গুঁজে দিলো।

গাড়ীর ভেতর থেকে মাইকেলের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে মারজা তাকে নিরীক্ষণ করছিল।

সুন্দর কর্মঠ স্বাস্থ্য, চোখে-মুখে দৃঢ়তার ছাপ। প্রকৃত পুরুষের যে যে গুণ থাকে মাইকেলের মধ্যে সবই আছে, মারজার তাই মনে হলো। কিন্তু ওর প্রতি তার এই অবজ্ঞার ভাবটা ভালো লাগে না মারজার। রস কাছে এলেও অভিমানহত স্বরে বলে, তোমার বন্ধু নিজেকে খুব বড় বলে মনে করে, তাই না?

ও কথা বলছ কেন? আজ হয়তো সে খুব ক্লান্ত, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলো না। রস ওকে কৈফিয়ত দেয়, তাছাড়া সে তোমাকে এখনো পর্যন্ত ভালো করে দেখেইনি।

আমি এখান থেকে ওর সব কথাবার্তা স্পষ্ট শুনেছি। মারজা আহত স্বরে বলে, —ঠিক আছে, হয়তো সুযোগ পেলে আমিও ওকে একদিন এক হাত নেবো।

রস চকিতে ওর মুখের দিকে তাকায়। ওর চোখে কিসের একটা যন্ত্রণার ছাপ যেন লক্ষণীয়। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল, মাইকেলের কথাগুলো এখনো ওর মনে রেশ ফেলে রেখেছে।

অন্যদিনের মতো বেদির সামনে এগিয়ে যেতে গেলো কেটি, তার হাত টেনে ধরে মারজা বলে উঠলো, না মামনি এখানে যেও না, তুমি জায়গা পাবে না। বরং এপাশ দিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

মারজাকে অমান্য করার ক্ষমতা ছিলো না কেটির, তাই ওকেই অনুসরণ করল সে অতঃপর। তার মাথায় তখন অন্য এক গভীর চিন্তা, ফাদার জানোউইচের কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল কেটির। যেদিন উনি তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, দেখো কেটি, তোমাকে একটা প্রয়োজনীয় কথা বলে রাখি, তোমার এ-অবস্থার কথা আর চেপে রাখাটা ঠিক হবে না। এবারে মারজাকে জানানো উচিত, তাতে তোমারি ভালো হবে, দেখো। তারপর থেকেই কেটির মনে দুশ্চিন্তা, কি ভাবে কথাটা তুলবে সে তার মেয়ের কাছে।

কথাগুলো অন্যমনস্ক ভাবে ভাবতে গিয়ে ধাক্কা লেগে যায় তার একটি ছেলের সঙ্গে। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ছেলেটির পাশ কাটিয়ে মারজার নির্দেশিত বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো সে। তারপর দু'হাত যেন তাকে ভুল না বোঝে, তার অবস্থার কথা ঠিক মতো উপলব্ধি করতে পারে, সব যেন ঠিক মতো চলে এবং পিটার যেন একটা চাকরি পায়। নিজের ছাড়া আর সবার জন্যেই তার যতো সব দুশ্চিন্তা, আর তাদের জন্যেই তার এই প্রার্থনা।

গির্জার অনুষ্ঠান শেষে মেয়ের দিকে তাকাতে গিয়ে আজ অনেক দিন পরে কেটিকে বেশ খুশি খুশি দেখালো তার এই খুশির কারণ বোঝা গেলো পরে। ওদিকে মারজার সারা মুখে একটা গভীর প্রশান্তির ছাপ স্পষ্ট, মুখে হাসির রেশ ছড়িয়ে রয়েছে, এর থেকে সুখ আর কিইবা হতে পারে, এবং এতেই এমন খুশি খুশি ভাব দেখা যায়। তাছাড়া, অনেক দিন পরে এই যে সে মারজাকে গির্জায় প্রার্থনা সভায় নিয়ে আসতে পেরেছে, সেটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। মনে মনে ভাবলো কেটি।

মার জন্যে মারজার কম দুশ্চিন্তা নয় এখন। সবাই তখন বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পাশে ভিড়ের চাপে মার কষ্ট হয়, সেই ভাবনা নিরসন করার জন্যে এক পাশে সরে গিয়ে কেটির সুবিধার জন্যে বাড়তি একটু জায়গা করে দেয় মারজা। ছেলেটিকে

অতিক্রম করে আসার সময় তার মলিন মুখটা দেখে মারজার মনে হলো, আজ সত্যি সত্যি বেশ গরম পড়েছে।

গির্জা থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চাপা হাসিতে ফেটে পড়লো মারজা। ছেলেটি কি বোকা, ও তখন ভাবছিল, নিজের কষ্ট স্বীকার করেও পথ ছেড়ে দিলো ওদের। মারজার মুখে এ রকম হাসি কতদিন সে দেখেনি, খেয়াল করার চেষ্টা করলো কেটি, কিন্তু ব্যর্থ হলো। কিন্তু তাতে তার একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই, মেয়ের কথা তখন সারা মন জুড়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তার সারা মন ভরে গিয়েছিল সুখের আবেশে কানায় কানায়। হাসলে ওকে সত্যি কি অপূর্বই না দেখায়, ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ঠিক মেরি মাতার পবিত্র মুখের মতো দেখায় তখন। এই মুহূর্তে, মনে মনে ঠিক করে ফেললো কেটি, তার আবার বাচ্চা হওয়ার কথাটা বলবে মারজাকে। তার আশঙ্কা, যদি মারজা সেই খবরটা ভালো মনে নিতে না পারে, যদি কথাটা শোনার পর ওর মন খারাপ হয়ে যায়, যদি ওর মুখের অমন সুন্দর হাসিটা মিলিয়ে যায়? না, মনটাকে শক্ত করে নিজের মনেই বলে উঠলো কেটি, ওর ওই খুশি খুশি ভাবটাকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না সে এখনি।

লিফটের বাইরে থেকে মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল মাইকেল। চেনা-চেনা গলার স্বর।

মাইকেল তুমি এখানে?

মাইকেল তাড়াতাড়ি তার হাতের অঙ্কের বইটা বন্ধ করে ওর দিকে তাকাল। সোনালী চুল মেয়েটার চোখে দুষ্টুমি-ভরা হাসি। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার রক্তে মৃদু ঝড় উঠেছে। তবু সে সংযত হয়ে লিফটের দরজা বন্ধ করে দেয় মেয়েটি ভেতরে ঢুকতেই।

তুমি আমার নাম জানলে কি করে?

মেয়েটি চুপ করে থাকে। লিফটটা চালু করে দিয়ে মাইকেল শুধায়, ক'তলায়?

বারো।

এবার সে বুঝতে পারল। তার মানে তুমি রসের বান্ধবী?

বেরসিক মানুষের চোখে কে কার বান্ধবী বোঝা যায় নাকি? মেয়েটি টিপ্পনি কাটে, —তাছাড়া দূর থেকে দেখে সব কিছু বোঝা যায় নাকি? ভালো করে জানতে হলে কাছে আসতে হয়।

মাইকেল লজ্জা পায়। কাল রাতের কথাগুলো তাহলে ও শুনতে পেয়েছে। চোখ নামিয়ে নিয়ে সে বলে, সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু তুমি তো তখন কিছু বলতে পারতে?

মারজা খিলখিল্ করে হেসে ওঠে। তুমি আমায় ক্ষমা করো, এই কথাটা তুমি শুনতে চেয়েছিলে, এই তো?

মাইকেল ওর কথার ধরণ দেখে দারুণ চটে গেলো। দাঁতে দাঁতে চেপে সে ভাবল, তোমাদের মতোন মেয়েদের কেমন করে জব্দ করতে হয় আমি জানি। —রস ঠিকই বলেছে, মাইকেল রেগে গিয়ে শেষে বলেই ফেলল, —এ সবের জন্যেই তোমার জন্ম।

ধন্যবাদ মাইকেল, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মারজা বলে, —ভালই হলো, আমি তোমার মুখ থেকেই এ সব কথা শুনতে চাইছিলাম। বলো, আর কি তোমার অভিযোগ আছে?

মাইকেল নিশ্চিত জেনে গেছে এখন, ও মেয়ে হাল্কা সস্তা ধরণের না হয়ে যেতে পারে না। অতএব মজা লোটার জন্যে ওকে কাছে টানতেই ও স্বেচ্ছায় ধরা দিলো তার কাছে। নীচু হয়ে ওকে চুমু খেতে গিয়ে সে দেখলো, ওর চোখ দুটো জ্বলছে বিদ্যুতের মতোন। সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিলো। লিফ্‌টটা ততক্ষণে বারোতলায় এসে থেমেছিল।

মারজা লিফট থেকে নেমে রসের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, রস তাকে দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান করল। মাইকেল সেই দৃশ্যটা সহ্য করতে পারল না। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে লিফট নিচে নামিয়ে নিয়ে চলল। হঠাৎ এই প্রথম কোন এক মেয়ের জন্যে তার ভীষণ হিংসে হলো। অঙ্কের বইয়ের পাতা খুলে পড়তে গিয়ে বার বার মারজার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকলো। রাগে-দুঃখে বইটা বন্ধ করে রাখল সে। হঠাৎ তারপর বারো তলায় যাওয়ার লাল সংকেত পাওয়া মাত্র লিফটটা সে আবার চালু করে দিলো।

মারজা রসের ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা হঠাৎ ভালো লাগছে এখন মাইকেলের। তেমনি মিষ্টি হেসে ও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রহস্যময় চোখের চাহনি। লিফটের ভেতরে ও ঢুকতেই মাইকেল বলে, তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্যে সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত মারজা!

মারজা তির্যক চোখে তাকাল।

বিশ্বাস করো মারজা, রসের সঙ্গে কোনদিনও আমি পাল্লা দিতে পারবো না বলেই তখন মনটা আমার কেমন খিচিয়ে উঠেছিল। ও বড়লোক, টাকার জোরে তোমাকে খুব সহজেই পেয়ে যাবে। আর আমাকে তোমায় পেতে হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে।

তুমি যা ভাবছ আমি ঠিক তা নই মাইকেল। মারজা সহজ সরল হাসি হেসে জবাব দেয়, আমিও এমন কিছু সুন্দরী নই যে আমাকে পেতে তোমায় খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যাইহোক, আর কোন ঝগড়া নয় আমাদের মধ্যে, শোধবোধ কেমন? মারজা এবার মিষ্টি করে হাসল তার চোখে চোখ রেখে। ও এখন ভাবছে, মাইকেল যেন ওর আর পাঁচটা ছেলে বন্ধুদের থেকে আলাদা। তার কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা ওকে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। তার প্রতি একটা অদ্ভুত দুর্বলতা অনুভব করল ও এই প্রথম।

ওদিকে মাইকেল তখন ওকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। মারজা তার মুখের কাছে ওর উষ্ণ ঠোঁট তুলে ধরল স্বেচ্ছায়। মাইকেল ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। তার চুমুটাও যেন ভিন্ন স্বাদের, আবেশে চোখ বুজে যায়। তার চুম্বন দীর্ঘস্থায়ী হলে আরো ভালো লাগে মনে হয়। ওর আরো মনে হলো অন্য সব ছেলেদের মতোন ওকে নিয়ে কেবল খেলা করতে ওর মন সায় দেয় না। তাকে নিয়ে আরো গভীর ভাবে চিন্তা করতে ওর মন চায় যেন। নিজেকে অসম্ভব দুর্বল বলে মনে হচ্ছে ওর। এই মুহূর্তে মাইকেলকে ওর মনের কথাটা বলা যায় না। মারজা তাই তাড়াতাড়ি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিচে নিয়ে চলো মাইকেল।

মাইকেল ওকে বিদায় জানাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমাদের আর দেখা হবে না মারজা?

কেন হবে না? মারজা তাকে পাল্টা প্রশ্ন করে তার চোখে চোখ রাখল। গভীর অন্তর্ভেদী সেই দৃষ্টি। তুমি চাইলেই দেখা হবে। বলেই সে লিফট থেকে নেমে দাঁড়াল।

মারজা জোকার মার্টিনের জুয়ার আড্ডায় যাচ্ছে শুনে মাইকেল রাজী হয়ে গেলো রসের সঙ্গে যাবে বলে। এমনিতে যাবার ইচ্ছে ছিল না তার সেখানে। যেভাবে সে হাতের কারসাজি করে লোক ঠকায় তাতে পুলিশের ঝামেলা আছে। এর আগেও সে এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার জেল খেটেছে। কিন্তু মারজা তার সাথী হচ্ছে শুনে মাইকেল ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার লোভটা সামলাতে পারল না। সেই সপ্তাহ খানেক আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর ভরসা করে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেনি সে।

মারজা গাড়ীর মধ্যে অপেক্ষা করছিল। রসের সঙ্গে মাইকেলকে দেখেও অবাক হলো।

তোমাদের দুজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে অনেকদিন থেকে আমি অপেক্ষা করছিলাম। বস বললো, মারজা এ আমার বন্ধু মাইকেল আর এই আমার বান্ধবী মারজা।

মারজার মুখে এক উজ্জ্বল হাসির ঢেউ খেলে গেলো। মাইকেলের দিকে হাত বাড়িয়ে সহজ গলায় বললো, তোমরা কথা আমি অনেক শুনেছি।

মাইকেলের জড়তা কাটিয়ে উঠতে একটু দেরী হলো। ওর হাতটা কোন রকমে নিজের মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে সে বললো, আমিও! তার সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেলো যেন। সঙ্গে সঙ্গে সে ওর হাতটা ছেড়ে দিলো।

মাইকেল আমাদের সঙ্গে আসছে, জানো মারজা? রস ওকে খবরটা দিলো।

পা দুটো যেন আর চলতে চায় না, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে অদ্ভুত এক ক্লান্তিতে মারজার শরীরটা নুইয়ে পড়ছিল। তখন ও নিজেকে বারবার প্রশ্ন করতে থাকে, কেন এমন হলো ওর? ওর কাছে ছেলেদের মধ্যে তো কোনো তফাত থাকার কথা নয়, সবাই সমান ওর কাছে। সবাই ওর খেলার সাথী, বন্ধুর মতো মিশেছে তাদের সঙ্গে। সবার কাছ থেকেই নিজেকে একদিন যেমন ও তাদের সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, ওর মনের ওপর প্রভাব ফেলতে দেয়নি কাউকে, কিংবা আলাদা করে বিশেষ কোনো ছেলের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেনি ও। এই যে ওর মানসিকতা, নিজেকে সবার উর্দ্ধে রাখার প্রবণতা, এর মধ্যে একটা অদ্ভুত মজা অনুভব করতো মারজা। কিন্তু মাইক যেন স্বতন্ত্রই, সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ছেলে সে। তার স্পর্শ কেন হঠাৎ ওকে বদলে দিয়েছে, ওর আগের মনের সব দৃঢ়তা ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। কেন এমন হলো, জানে না মারজা। ও শুধু জেনেছে, এখন মাইকই ওর গর্ব, ওর একমাত্র কামনা-বাসনা, সব কিছু ওর।

হলঘরে ঢোকা মাত্র কার যেন বমি করার শব্দ ভেসে এলো মারজার কানে। চিন্তিত হয়ে ও তখন ভাবে, কে জানে কার আবার অসুখ করলো। অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য করতে পারে না ও। রান্নাঘরে ঢোকার মুখেই সংবাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

তুমি এসে গেছো, ভালোই হয়েছে। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল নিয়ে এসো, তোমার

মার অসুখ।

মারজা দ্রুত ছুটে যায় রান্নাঘরে, তেমনি দ্রুত হাতে এক গ্লাস জল হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ও দেখে, রান্নাঘরের উল্টোদিকের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে হাঁপাচ্ছে মা, সৎবাবা শক্ত হাতে তার কাঁধ ধরে রয়েছে।

জলের গ্লাসটা মারজার হাত থেকে নিয়ে কেটির মুখের সামনে তুলে ধরলো পিটার। খানিকটা জল মুখে নিয়ে কুলকুচো করে ফেলে দেয় কেটি, তারপর গ্লাসের বাকি জলটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে দেয়।

একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কেটি তার মেয়ের দিকে তাকাতেই মারজা জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি হয়েছে মামনি?

ভাববার কিছু নয়, ক্লান্ত গলায় কেটি বলো, গা একটু গুলিয়ে উঠেছিল, এই যা—

কিন্তু মামনি, তবু মারজার মুখের ওপর থেকে ভাবনার ছায়াটা, যায় না। ও তখন ভাবছিল, এর আগে কখনো ও ওর মাকে অসুস্থ হতে দেখেনি। কেবল গতবার ছোট ভাইটা হবার আগে ......নতুন করে আবার আশঙ্কায় পেয়ে বসে মারজাকে, তাহলে কি মামনি আবার.......কথাটা মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে কেটির দিকে কৌতূহলী চোখ তুলে তাকায়। নিজের মনেই বলে উঠলো ও, না, ওর আশঙ্কা যেন সত্যি না হয়। ডাক্তারের সতর্কবাণী মনে করে মারজা এবার ভয়ে ভয়ে বলো উঠলো, তুমি কি বলছো মামনি, তুমি ঠিক আছো তো। তুমি আবার ....

মারজা কি জানতে চায় বুঝে নিয়ে ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো পিটার, কেন, গর্ভবতী হওয়াটা কি খুবই খারাপ?

স্তব্ধ, হতবাক হয়ে যায় মারজা। মার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর তখন মনে হচ্ছিল, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ও। তাই অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলো মারজা, না মামনি, তুমি বলো এ ভুল, এ মিথ্যে। মাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও এবার প্রতিবাদ করে উঠলো, ডাক্তার না তোমাকে বারবার নিষেধ করে দিয়েছিল, ফিরে আর গর্ভবতী না হওয়ার জন্যে। ডাক্তার আবার এও বলেছিল, তাতে তোমার জীবন সংশয় দেখা দিতে পারে।

একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায় কেটির ঠোঁটে। ডাক্তাররা তো অনেক কথাই বলে থাকে, তাই বলে তাদের সব কথা কি শোনা যায়, না কি মানা সম্ভব?

কেটির মা হওয়ার ব্যাপারে তার সমর্থনের আভাষ পেয়ে পিটার এবার মুখর হয়ে ওঠে, গর্বের সঙ্গে সে বলে উঠলো, দেখো এবারেও ওর ছেলে হবে, ছেলে হলে কি করতে হবে আমি তার সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

তোমার দূরদর্শিতার জ্ঞান কতদূর সে তো আমার বেশ ভালোই জানা আছে, মারজার কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়। মামনির পেট বাধিয়ে তুমি তো খালাস। তোমার মতো বেকুব স্বামী এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারে বলো? কিন্তু বোকচন্দ্র, গর্ভাবস্থায় মামনি কাজে না গেলে, মাস শেষে মাইনে না আনতে পারলে তাকে গেলাবে কে, আর তোমার মদের খরচই বা কে জোগাবে, সে চিন্তাটা কি আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রেখেছো? না রেখে থাকলে এখন নতুন করে আর কাউকে আনার যেন চেষ্টা

করো না, বুঝলে হাঁদারাম!

মারজা, চুপ করবে তুমি? চিৎকার করে উঠলো কেটি। মারজা ওর মার কথা রাখতে এবার নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তারপরেই সিঁড়িতে ওর দ্রুত পা ফেলার শব্দ ভেসে আসে।

অসহায় চোখে স্বামীর দিকে তাকায় কেটি। তাকে খুবই দুর্বল দেখাচ্ছিল। ফাদার জাগে উইচের উপদেশের কথা মনে পড়ে গেলো তার, একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর তাঁর কথা মতো যার গর্ভবতী হওয়ার খবরটা মারজাকে আগেই দেওয়া উচিত ছিলো। কেটি এখন ভাবছে, তাহলে ও তাকে এমন ভুল বুঝতো না।

নাচঘরে ঢুকে রস খোঁজ নিল কখন জুয়োর আড্ডাটা শুরু হবে। মারজা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। রস চলে যেতেই মাইকেল বলল, এ এক রকম ভালোই হল কি বল?

তখন দ্রুতলয়ে অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে ফক্সট্রটের ছন্দে। কিছুক্ষণ নীরবে নাচার পর মারজা তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস্‌ফিস করে বললো, ভেবেছিলাম তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।

ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া, তুমি তো রসের বান্ধবী।

সেকথা আমি কি বলেছি একবারও?

কিন্তু রস বলেছে, আর তুমি তার প্রতিবাদ করোনি। তাই ভাবলাম, তুমি বোধহয় ব্যাপারটা তার কাছে গোপন রাখতে চাও।

ও কি বললো তাতে আমার কি? মারজা প্রত্যুত্তরে বলে, আমি আমার নিজস্ব ধারণা নিয়ে আছি, তাতেই যথেষ্ট।

ইতিমধ্যে বাজনা থেমে গিয়েছিল। ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ওদের টেবিলের কাছে ফিরে এলো আবার।

রস হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। চলো, খেলা শুরু হচ্ছে এবার। কুইক।

মারজার দু'চোখে গভীর বিস্ময়। কি ব্যাপার, আমরা তো এখানে শুধু নাচতেই এসেছি। খেলার কথা কি বলছ বুঝতে পারছি না।

রস সরাসরি মারজার দিকে তাকায়। জোকার সেদিন যে খেলার কথা বলছিল, সেই খেলাতেই যোগ দিতে এসেছি আমরা। তুমি খুব পয়মন্ত বলেই তোমাকে আমি সঙ্গে এনেছি।

কিন্তু মাইকেলকে আনলে কেন? আমার ওপর নজর রাখার জন্য?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। রস হাসতে হাসতে বলে, তুমি কি ভাবো ঐ সব লোভী কুকুরগুলোর সমানে তোমাকে আমি একা ফেলে রাখবো? মাইকেল আমার বন্ধু, ওকে বিশ্বাস করা যায়। তাই সঙ্গে এনেছি ওকে।

কিন্তু আমার নিজের ওপরই যে আস্থা নেই রস। মাইকেল প্রতিবাদ করে উঠল। তাছাড়া তুমি তো নিজেই বলেছ, ও একটা ভয়ঙ্কর মেয়ে।

মারজার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল। ঠিক আছে, আমাকে নিয়ে তোমাদের দুই বন্ধুতে ঝগড়া বাঁধিয়ে বসতে হবে না। চলো, আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

মাইকেল এবং রস দুজনে একসঙ্গে খুশিতে হেসে উঠল।

রসের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল। কিসের এক উত্তেজনায় তার মুখটা কেমন থমথম করছিল। পাশার ঘুঁটিগুলো মারজার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে সে বলে, আমার ভাগ্য ফেরানোর জন্যে এগুলোর ওপর জোরে ফুঁ দিয়ে দাও, প্লিজ।

টেবিলের ওপর স্তূপাকার করা টাকাগুলো দেখে মারজার কেমন মায়া হলো। বেচারা রস, ইতিমধ্যেই যে চল্লিশ ডলার হেরে বসে আছে। এখন ওর স্পর্শে ভাগ্য ফেরাতে চাইছে। মারজা তার কথা রাখতে অনেকখানি নিচে ঝুঁকে পড়ে তার হাতের পাশার ঘুঁটিগুলোর ওপর জোরে জোরে ফুঁ দিলো। ফুঁ দিতে গিয়ে ও স্পষ্ট দেখতে পেলো ঘুঁটিগুলোর ওপর রসের আঙুলগুলো ঘোরাফেরা করছে। ও বড় বড় চোখ করে তাকাল রসের দিকে। সে বুঝতে পারলো, মারজা তার কারসাজি ধরে ফেলেছে। যাই হোক, পরবর্তী খেলায় মেতে উঠলো সে। সেই সুযোগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মারজা।

মাইকেলের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেলো। সত্যি সত্যি ফুঁ দিয়ে তুমি ওর ভাগ্য ফিরিয়ে দিলে মারজা?

মারজা কেমন উদাস চোখে তাকাল মাইকেলের দিকে। ওর মনে হলো, রসের চালাকিটা তাহলে মাইকেল ধরতে পারেনি। তাই সে তার দিকে তাকিয়ে বলে, চলো, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে চলো। মাইকেল ওকে অনুসরণ করলো।

বেরুবার মুখে জোকার মার্টিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো মারজার। বন্ধুকে ফেলে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন যে!

শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে, তাই—

জোকারের দু'চোখে চাপা ধূর্তমি খেলে বেরাচ্ছিল তখন। মিস ফ্রাড, আপনাকে আগেও বলেছি, আবার এখনো বলছি, আপনার জন্যে এখানকার দরজা সব সময় খোলা রইল, আপনার যখনই প্রয়োজন মনে হবে চলে আসবেন।

ধন্যবাদ, আপনার কথাটা মনে থাকবে। কে জানে হয়তো আপনার কাজটা আমার সত্যিই হয়তো প্রয়োজন হতে পারে কোন একদিন।

বাড়ির কাছে এসে মারজা ঘুরে দাঁড়াল, তোমরা দুজনেই জানতে কেন আমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বলো জানতে কিনা?

কেন, তুমি জানতে না? মাইকেল পাল্টা প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, জানতাম বৈকি! মারজার চোখে আগুন ঝরে পড়ছিল। কিন্তু তখন জানতাম না পাশার ঘুঁটি নিয়ে রস এমন কারসাজি করবে।

কারসাজি? মাইকেল অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

হ্যাঁ, প্রত্যুত্তরে ও বলে, যখন ফুঁ দিচ্ছিলাম তখনই ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতোন পরিষ্কার হয়ে গেলো। রস জানতো, আমি নিচু হয়ে ফুঁ দিতে গেলে আমার বুকের অনেকখানি উন্মুক্ত হবে। তাই তখন সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়বে আমার বুকের উন্মুক্ত জায়গায়। আর সেই সুযোগে সে তার হাতের কারসাজির কাজটা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে পারবে। কিন্তু ওভাবে আমি নিজেকে সবার সামনে খেলো করতে চাইনি।

তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, মাইকেল বলে, আমি এসবের কিছু জানি না।

তবু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকে মারজা। মাইকেল ভাবে এই কারণেই বোধহয় অতি তাড়াতাড়ি ও চলে এসেছিল জোকারের জুয়ার আড্ডাখানা থেকে।

ঠিক আছে মাইকেল, আজ চলি। শুভরাত্রি।

শুভরাত্রি মারজা। বাড়ির ভেতরে না যাওয়া পর্যন্ত মাইকেল পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

মারজার বাড়ি থেকে ফেরার মুখে রসের সঙ্গে তার দেখা হতেই সে তার হাতে কুড়ি ডলার গুঁজে দিয়ে বলে, এটা তোমার পাওনা। জানো মাইকেল, আজ আমি একশো কুড়ি ডলার জিতেছি।

বেশ তো, এই কুড়ি ডলারও রেখে দাও তোমার কাছে, মাইকেল টাকাটা তাকে ফেরত দিতে গিয়ে বলে, ধন্যবাদ রস, আমি কোন ভাগের প্রত্যাশা করি না। জোচ্চুরির পয়সায় আমার কোন লোভ নেই।

এসব কথা মারজা বলেছে বুঝি?

মারজা কি বললো জানি না, তবে এ আমার মনের কথা। মাইকেল ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, যদি ধরা পড়তে তোমার সঙ্গে আমারও জেল হয়ে যেতো নির্ঘাত।

তা যখন হয়নি, ও নিয়ে মিথ্যা মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই। রস একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করলো, তা ওকে কোথায় রেখে এলে?

বললুম তো ওর বাড়িতে।

তাই বলে এতো সময় লাগে? রস খিস্তি করল, নাকি অন্ধকারে কোথাও মজা লুটছিলে? বেশ্যা মাগীটা আবার এভাবেই স্ফূর্তি করতে ভালোবাসে।

মাইকেল রাগে ফুঁসে উঠল, খবরদার, ওর সম্পর্কে আর একটাও বাজে কথা বলবে না।

বুনো-উত্তেজনায় রস উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তাহলে আমার অনুমানই ঠিক। ও এবার তোমাকে পাকড়াও করেছে? কিন্তু ওর আবার এক পুরুষে মন ভরে না। দেখো, ভুল করে তুমি যেন না ওর ফাঁদে—

তার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বিদ্যুৎ বেগে একটা ঘুষি এসে পড়ল রসের মুখের ওপর। আশাকরি এবার নিশ্চয়ই তুমি তোমার মুখে তালা লাগাবে!

ঠিক আছে মাইকেল, রস ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে শাসায়, একদিন না একদিন আমারও সময় আসবে। তখন আজকের ঘটনার সুদে-আসলে আদায় করে নেবো, মনে থাকে যেন।

হ্যাঁ, অবশ্যই আমার মনে থাকবে। কথাটা শেষ করেই সে তার বাড়ির পথে পা বাড়াল।

•

শেষ পর্যন্ত জোকার মার্টিনের নাচঘরের চাকরীটা নিতে বাধ্য হলো মারজা। ওর মার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। কেটির আবার বাচ্চা হবে। তাই তাকে রাতের চাকরীটা ছেড়ে

দিতে হয়েছে।

সাধারণ নাচের পোষাকেও ওকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল। অন্য আর পাঁচটা মেয়েদের থেকে ও যেন সম্পূর্ণ আলাদা। কিছু কিছু মেয়ে থাকে যাদের মাতাল করা রূপ দেখলেই পুরুষদের রক্তে ঝড় ওঠে, মারজা ঠিক সেই জাতের মেয়ে।

রস ওর পথ আগলে দাঁড়ায়। হ্যালো মারজা, কি খবর?

মারজা তার দিকে তাকায়। হ্যালো রস, তোমার কাছে টিকিট আছে তো?

রস সদ্য কেনা একগাদা টিকিট দেখায় ওকে।

তাহলে চলো, নাচ শুরু করা যাক।

রস ওর হাত ধরে ওকে আকর্ষণ করতে চাইল। মারজা সাবধানে দূরত্ব বজায় রেখে নাচতে থাকল।

তুমি কি আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখতে চাও না মারজা?

মারজা তার দিকে তাকালো। ও দেখলো, বন্য পশুর মতো আহত অথচ স্বার্থপর একটা অভিমানে তার সারা মুখ থমথম করছে। মারজা তার জন্যে কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। কঠিন সুরেই বলল, আমি চাই না আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তার খেয়াল খুশি মতো আমাকে ব্যবহার করুক।

আমার ধারণা ছিল, তুমি আমাকে পছন্দ করো মারজা।

আগে করতুম, কিন্তু সেদিন তোমার কাছ থেকে যেভাবে আঘাত পেয়েছি রস, তাতে আমার মনে হয়েছে আমার ধারণাটা পাল্টাতে হবে। কারণ তোমার আমার জগতের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আমি অনুভব করছি।

কিন্তু মারজা ও সবই একটা হাসির ব্যাপার মাত্র, ও নিয়ে, তোমার বেশী চিন্তা না করাই ভালো। কথা বলার সঙ্গে রস ওকে কাছে টানার চেষ্টা করে। পাতলা পোশাক ভেদ করে ওর শরীরের নিবিড় উষ্ণতা, ঘ্রাণ বার বার তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল কোন কিছুই এখনো শেষ হয়ে যায়নি। অন্ধকারে এক কোণায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রস ওকে চুমু খাবার চেষ্টা করল।

না রস, মারজা ওর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, এখানকার চাকরীটা আমি টিকিয়ে রাখতে চাই।

কিন্তু মারজা পরশুদিনই আমি কিছু দিনের জন্যে বাইরে চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে নির্জনে কোথাও দেখা করতে চাই।

অসম্ভব! মারজা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। আমার এখন অনেক কাজ। আমি দারুণ ব্যস্ত।

না, এগুলো তোমার অজুহাত। রস আবার ওকে চুমু খেতে যায় অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়ে। মারজা এবারও মুখ ঘুরিয়ে নিলো। রস দেখতে পায় না মারজা তার পেছন থেকে কাকে যেন হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। মুহূর্তে একটা কঠিন লোমশ হাত তার জামার কলার ধরে টান দিলো।

রস পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলো, দৈত্যের মতোন একটা লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে

বিশ্রী ভাবে হাসছে। শোন ছোকরা ভালো ব্যবহার না করলে এরপর গলাধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বার করে দেবো।

রাগে অপমানে রসের মুখের রঙ যায় বদলে। চকিতে সে মারজা দিকে তাকাল। মারজা উদাস, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ঠিক আছে মারজা, তুমি কি এইভাবেই শেষ করতে চাও, তাহলে আমি চললাম। অতঃপর রস ওকে ছেড়ে চলে গেল।

মারজা যখন ওর টেবিলে ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতে যাবে ঠিক তখনি জোকার মার্টিন ওর পথ আগলে দাঁড়াল। কি ব্যাপার মারজা, তোমার বন্ধুটি হঠাৎ অমন রেগে-মেগে চলে গেলো কেন?

বন্ধু? অবাক চোখে জোকারের মুখের দিকে তাকায় মারজা। ও আমার বন্ধু কখনোই ছিলো না।

এ তুমি কি বলছো? না জানার ভান করলো জোকার। একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করে চোখে ধূর্ত শৃগাল-চাহনি হেনে বললো, তবে আমি যে তোমাদেব কোনো খবরই রাখি না, এ কথা ঘুনাক্ষরেও যেন কখনো ভেবো না, বুঝলে হে সুন্দরী!

বোবা দৃষ্টি দিয়ে তাকালো মারজা।

হ্যাঁ সেদিন, জোকার তার কথার জের টেনে বললো, তোমাকে অমন ব্যস্ত হয়ে চলে যেতে দেখেই আমি ধরে নিয়েছিলাম ওই ধুরন্ধর বড়লোকের ছেলেটা তোমাকে দিয়ে খারাপ কিছু একটা করিয়ে নিতে চায়।

সেকি! অবাক চোখে জোকারের দিকে তাকায় মারজা। আপনি জানতেন?

অবশ্যই।

জানতেনই যদি, তাহলে ওতে বাধা দিলেন না কেন? কৈফিয়ৎ চাইলো মারজা।

আবার সেই ধূর্তুমি ভরা চোখে হাসলো জোকার। পাগল হয়েছে? ওকে বাধা দিলে তো আমার রোজগার বন্ধ হয়ে যেতো। এটাই তো আমার ব্যবসা। নিজের হাতে ভাগ্যলক্ষ্মী কি কেউ ঠেলে ফেলে দেয়?

ঘরে এসে নীচের পোশাকটা আলমারিতে সযত্নে তুলে রেখে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল মারজা, মুখে হাল্কা প্রসাধনের প্রলেপ বুলিয়ে বেরিয়ে এলো। তখন বারোটা বাজতে মিনিট কয়েক বাকি ছিলো। সপ্তাহে ঘন্টা ছয়েক কাজ করে মন্দ আয় হয় না। কিন্তু শুক্রবার আর শনিবারের সন্ধ্যাগুলো ওর কাছে সব থেকে বেশী ক্লান্তিকর বলে মনে হয় যেন। ওই দুটো দিন ওকে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয়। সেই কোন্ বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত টানা বারো ঘন্টা নাচ করতে হয় ওকে। দীর্ঘ সময় ধরে পরিশ্রম করার পর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে হয় মাঝরাতে।

অতো রাতেও রাস্তাটা যথেষ্ট কোলাহল মুখর, ব্যস্ত পথাচরীদের বাড়ি ফেরার তাড়া। সেই ভিড় ছাপিয়ে মারজার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে অদূরে একটা গাড়ির দিকে, সেই গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাইকেল।

মাইকেল ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। অতো রাত পর্যন্ত আমার জন্যে তুমি দাঁড়িয়ে

থাক কেন মাইকেল? তোমার কষ্ট হয় না? ধীর গলায় শুধালো মারজা।

না, বরং এতে আমি একটা আলাদা আনন্দ পাই। আমার খুব ভালো লাগে মারজা।

একটা কফির দোকানে এসে বসল ওরা। মারজা আজ তাকে খাওয়াচ্ছে।

কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে মারজা হাসতে হাসতে বলে, —জানো, রস আজ আমার কাছে এসেছিল। পরশুদিন ও ইউরোপে বেড়াতে যাচ্ছে। একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও আবার বলে, —ওদের কত টাকা, তাই না?

তুমি ওকে এখনো পছন্দ করো, তাই না মারজা?

ঠিক করে এখনো বলতে পারি না। মারজা শান্ত স্বরে বলে, তবে আমি যে সব ছেলেদের চিনি তাদের থেকে ও আলাদা। ও ঠিক ওর মতো। নিজের মতো করে ও ভাবে, নিজের মতো করে ও চাইতে জানে।

আর তাই বুঝি তুমি ওকে পছন্দ করো? মাইকেল রুক্ষ এবং ঝাঁঝালো স্বরে বলে।

মারজা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, কে জানে হয়তো তাই, এই নরক-জীবনে বাস করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি, তাই বোধহয় বিলাস-বহুল জীবনই আমাকে বেশী করে আকর্ষণ করে থাকে।

প্রায় এগারোটা বাজে, মারজা এখনো ফিরলো না, কেটি তার হাতের সেলাইটা সরিয়ে রেখে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেই সময় পিটার মদে চুব হয়ে ফিরল বাড়িতে। বিশ্রী ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল, মেয়ের ফেরার পথে তাকিয়ে আছো বুঝি?

হ্যাঁ তাতে অন্যায় কিছু হয়েছে নাকি?

ও মেয়ের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। পিটার সেই একই ভঙ্গিতে খিস্তি করল, দ্যাখো ফেরার পথে অন্ধকারে কোথাও দু পয়সা কামিয়ে আসছে।

মাতাল হয়েছ, যাও এবার শুয়ে পড়োগে। কেটি ঠাণ্ডা মাথায় বলল।

সেই সময় মারজাকে মাইকেলের সঙ্গে ফিরতে দেখে কেটির বুকটা আনন্দে ভরে উঠল। ওদের দুজনকে চমৎকার মানিয়েছে এক সঙ্গে। কেটি মনে মনে ভাবলো।

ওদিকে পিটার তেমনি বিশ্রী ভাবে তাকিয়েছিল ওদের দিকে। এবং রাগে গজরাচ্ছিল। কেটি ভয় পায়, পিটার আজ না একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে বলে, —চলো শোবে চলো।

না, তার আগে আমি দেখতে চাই ওরা এতক্ষণ কি করছিল?

আহা, কেন বিরক্ত করবে ওকে? বেচারি এতক্ষণ খেটেখুটে এলো, ওকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে দাও পিটার। কেটি করুণ মিনতি জানায় তাকে।

বেশ্যা মেয়ের জন্যে তোমার আবার এতো দরদ কিসের শুনি। পিটার ফুঁসে উঠল।

হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল কেটি, এবং পিটারের বাঁ গালে চড় বসিয়ে দিলো রাগে উত্তেজনায়। চুপ। ফের যদি ওর সম্পর্কে অমন জঘন্য মন্তব্য করো তাহলে তোমাকে জ্যান্ত রাখবো না, খুন করে ফেলবো আমি।

পিটারের মুখ লাল হয়ে ওঠে। চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। ঠিক আছে, দেখা যাবে কে

কাকে খুন করে। পিটার তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকে তড়তড় করে। কেটিও তার পেছনে পেছনে ছুটে আসে, পিটার যেও না, থামো বলছি! মেয়েব গায়ে হাত দিলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো।

আমিও বলে রাখছি, আমার বাড়িতে ওর অমন বেশ্যাবৃত্তি চলবে না।

কেটি তার হাত চেপে ধরে শেষ পর্যন্ত। মাতাল, বুনো ভাম, ওকে একা থাকতে দাও। ও আমার মেয়ে, যা খুশি করবে, তাতে তোমার কি?

দেখাচ্ছি মজা। পিটার তাকে ধাক্কা দিয়ে হাত ছাড়াতে যায়, কেটি টাল সামলাতে পারে না, সিঁড়ির ওপর আছড়ে পড়ে যায়। ভারী দেহটা তার নিচে গড়াতে থাকে। চোখে অন্ধকার দেখে কেটি। একটা আর্ত চিৎকার তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে মা-র-জা— মারজাকে বিদায় দিয়ে মাইকেল ফিরে যাচ্ছিল। কেটির চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তারপর মারজার সঙ্গে সে-ও ছুটে এলো ঘটনাস্থলে। একটা বুক ফাটা কান্নায় আছড়ে পড়ে মারজা মা'র বুকের ওপর। সব হারানোর বেদনায় তার বুকটা তখন ফেটে যাচ্ছিল। তার মাইকেলের জীবনে সেই একবারই মারজার কান্না শুনতে পেয়েছিল সে।

'সোনালী আভা'য় কাজে যোগ দেওয়া ওর পক্ষে এক সপ্তাহের আগে সম্ভব হলো না। একদিনে ও অনেক রোগা হয়ে গিয়েছিল, চোখে কালি পড়ে গিয়েছিল। সেণ্ট আগস্টাইনে মা'কে কবর দেওয়ার কাজটা অতি সাধারণ ভাবেই সম্পন্ন হলো।

এসো। মার্টিন সাদরে ডাকল।

মারজা দরজা ঠেলে তার অফিস ঘরে ঢুকলো। আমাকে আপনি ডেকেছিলেন?

হ্যা বসো। জোকার মার্টিন তার হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে মুখ তুলে তাকাল ওব দিকে, তোমার মায়ের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর জন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।

ধন্যবাদ। মারজা তাড়াতাড়ি মুখ নিচু করলো। মায়ের কথা শুনলে ওর বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা কেমন দলা পাকিয়ে উঠে, সহ্য করতে পারে না।

একটু নীরব থেকে সে আবার বলে, সমাজকল্যান সংস্থার একজন প্রতিনিধি এসেছিল আমার কাছে তোমার খোঁজ-খবর নিতে।

মারজা ভয়ে আঁতকে উঠল।

না, না ভয় পাবার কিছু নেই, জোকার ওকে আশ্বাস দিয়ে বলে, আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার এখানে হিসাব দেখা-শোনার কাজ করে থাকো। কিন্তু তুমি আমার কাছে বয়স লুকোতে গেলে কেন মারজা?

জোকার ওর দুর্বল প্রসঙ্গটা তুলতে চাইছে। মারজার ভয় এখানেই।

বয়স না লুকোলে আপনি কি আমাকে চাকরী দিতেন।

তা অবশ্য দিতাম না। জোকার বলে, আমি অবশ্য একথাটা আদৌ ভাবিনি। কারণ এমনিতেই তোমাকে বেশ বড়সড় দেখায়, দেখায় না?

হ্যাঁ, মারজা হেসে ফেলে, এখন আমি সত্যি সত্যিই বড় হয়ে গেছি, তাই না মিস্টার মার্টিন?

অস্বীকার করব না। তোমার মায়ের মৃত্যুটাই বোধহয় তোমার বয়স বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

তাহলে এখানকার চাকরীটা আমার থাকবে তো? মারজা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

অবশ্যই। তবে চোখ কান খুলে রেখো। বেগতিক দেখলেই এখানে থেকে সটকে পড়ো। কারণ তুমি ধবা পড়লেই আমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।

আপনার উপদেশ আমরা সব সময় মনে থাকবে, মারজা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, আমি আপনার নির্দেশ মতো চলবো, কথা দিচ্ছি। মারজা অতঃপর উঠে দাঁড়াল। ওর চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ, আপনার এ-ঋণ আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিস্টার মার্টিন।

মারজার গমন পথের দিকে তাকিয়ে মার্টিন ভাবতে থাকে, বিশ্বাস করা যায় না এর বয়স এখনো ষোলোর কম। শুধু কি তাই, এই অল্প বয়সেই তন্বী, যুবতী মেয়ের সব জৌলুস যেন ওর সারা দেহে থরে থরে সাজানো।

মারজা পোশাক বদলাচ্ছিল অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ কি খেয়াল হতে ও পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখল, পিটার বিশ্রী ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। কি চাও তুমি?

না, মানে বলছিলাম, ঐ ছেলেটির কি যেন নাম, মাইকেল না কি যেন। ও তোমাকে খুব পছন্দ করে, তাই না?

আমারও তাই মনে হয়।

ওপরে ওঠার আগে তোমরা কিন্তু বড্ড বেশী সময় নষ্ট করো। তার কথার মধ্যে কেমন নোংরা একটা ইঙ্গিত ছিলো।

তাতে তোমার কি? মারজা চকিতে ঘুরে দাঁড়ায়।

না, বলছিলাম কি, পিটার ওর একটা হাত হঠাৎ নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে বলল— সত্যি তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে মারজা। কামাতুর চোখ দুটো তুলে সে করুণ মিনতি জানায়, ঐ ছেলেটার মতো আমার প্রতি একটু তুমি সদয় হলে তো পারো? তাহলে আমরা সবাই বেশ সুখে থাকতে পারতাম।

রাগে ঘৃণায় মারজা ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। ওর দু'চোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল। পিটার! এই প্রথম ও তার নাম ধরে ডাকল। নোংরামি করো না। তোমার যদি এতোই মেয়েমানুষের প্রয়োজন হয়ে থাকে, যাও অন্য কোথাও গিয়ে নিজে বাজারের কোনো মেয়ে খুঁজে নাও। কথাটা বলেই তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর ওর বিছানায় আছড়ে পরে ডুকরে কেঁদে উঠল মায়ের জন্যে। ওর দুচোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। মনে পড়ল মা ওকে ভালো মেয়ে হয়ে থাকতে বলেছিলো। আমি ভালো হয়ে থাকবো তোমাকে কথা দিয়েছিলাম মা, মারজা অস্ফুটে আর্তনাদ করে ওঠে, আমি ভালো হয়েই থাকবো দেখো মা! কান্না চাপতে বালিশ মুখ গুজলো ও।

শোনো মারজা, শান্ত নম্র গলায় জোকার মার্টিন বললো, সমাজকল্যান সংস্থার সঙ্গে কথা বলে তোমার সব ব্যবস্থা আমি পাকা করে ফেলেছি। আমার প্রস্তাবে ওরা রাজিও হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় তুমি কাজ করবে, সেই সঙ্গে এখানকার কাজও চালিয়ে যেতে পারবে।

আপনাকে ধন্যবাদ দেবার মতো ভাষা আমার জানা নেই। আপনি আমার ভালো-মন্দের কথা এতো চিন্তা কবেন, কেন বলুন তো?

জোকারের ঠোটে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। বোধহয় তোমাকে আমি পছন্দ করে ফেলেছি। মারজার প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে ওর দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে দেখে নেয়। কিন্তু ওর কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়েও নিজের থেকেই সে আবার বলতে থাকে, তোমার কাজে খুবই নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রতি রাত্রেই তুমি হাজিরা দিয়ে থাকো, আজ পর্যন্ত একদিনও অনুপস্থিত থাকোনি। এ ব্যাপারে তোমাকে নিয়ে অন্য সব মেয়েদের মতো কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি আজ পর্যন্ত। হয়তো এই কারণেই তোমাকেই আমার বেশী পছন্দ।

আপনাব কাছে আমি খুবই ঋণী, জানি না কখনো শোধ দিতে পারবো কিনা! গদগদ স্বরে বললো মাবজা।

উত্তরে জোকার কিছু বলার আগেই দূরভাষের আওয়াজে বাধা পেলো। ত্রস্ত হাতে গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিলো জোকার। হ্যাঁ, জোকার মার্টিন কথা বলছি। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে?

কিছুক্ষণ কথা বলার পর আড়চোখে মারজার দিকে তাকায় জোকার। মারজার মধ্যে একটা অস্বস্তিবোধ দেখা যায়, ও তখন ভাবছিল সেখান থেকে চলে যাবে কিনা। আর ওর দ্বিধাবোধ লক্ষ্য করে হাতের ইশারায় ওকে থাকতে বলে মাউথপীসে মুখ রেখে অনুরোধ করে, দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। তারপর মারজার দিকে ফিরে বললো সে, একটু আগে তুমি বলছিলে না মারজা, আমার ঋণ তুমি শোধ করতে পারবে কিনা জানো না। কিন্তু আমি বলি কি জানো, এখনি তুমি আমার ঋণ শোধ করতে পারো।

কি ভাবে? প্রশ্ন চোখে জোকারের দিকে তাকালো মারজা।

যাঁর সঙ্গে আমি এখন দূরাভাষে কথা বলছি তিনি একজন নামী-দামী লোক। উনি একটা পার্টি দিচ্ছেন আজ, আর সেই পার্টিতে ওর একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন। যদি তুমি ওঁর সঙ্গিনী হতে চাও তাহলে আজ বাড়তি পাঁচ ডলার উপার্জন করতে পারো। কি রাজি আছো?

আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ মার্টিন, একটু ইতস্তত করে মারজা বলে, আমার যে বাইরে কোথাও যাওয়ার একেবারেই অভ্যাস নেই। তাই মনে হয়, আমি হয়তো খুবই অসহায় বোধ করবো।

মারজা কি বলতে চাইছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না জোকারের। ওর মনে সাহস জোগানোর জন্যে বলল সে, আরে ভয় কিসের, কোনো দ্বিধা না করে ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও। ভদ্রলোক সত্যিই খুব ভদ্র এবং মার্জিত। ওঁর পার্টিতে বাজে লোকের স্থান নেই। তোমার সেখানে কোনো অসুবিধে হবে না বলেই আবার বিশ্বাস। ওখানে তোমার কাজের

মধ্যে একটু-আধটু নাচ করতে হবে, হাসি-ঠাট্টা করতে হবে, ব্যাস এই আর কি। তিনটে-সাড়ে তিনটের মধ্যে ছুটি হয়ে যাবে।

তবু ইতস্তত করে মারজ্জা। সব জেনে-শুনে বলছেন তো?

নিশ্চয়ই! জোর দিয়ে বললো জোকার!

কিন্তু অমন নামী-দামী লোকের পার্টিতে যাওয়ার মতো পোশাক তো আমার নেই। থাকগে, আমি যাবোনা।

কেন, পোশাক তুমি আমার এখান থেকে নিতে পারো, কাল ফেরত আনলেই চলবে।' অনুণয়ের ভঙ্গিতে জোকার বলে, তুমি ওঁর কথা রাখলে আমার বিশেষ উপকার হয় মারজ্জা।

মারজ্জা বেশ বুঝতে পারে জোকারের অনুরোধ কোনো ভাবেই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। তার এই অনুরোধের সঙ্গে ওর ঋণ পরিশোধ করার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। অসময়ে ও যখন অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছিল, যখন ওদের সংসারে প্রচন্ড ভাবে টাকার অভাব চলছিল, তখন তিনি যদি তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিতেন, তাহলে সেই দুর্দিন কিছুতেই কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিলো না ওর। তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুটে বললো মারজ্জা, ঠিক আছে, ওঁকে বলে দিন আমি রাজি।

জোকারের ধূর্ত চোখে একটা হাসির ঝিলিক খেলে যায়। এই তো সমঝদার মেয়ের মতো কথা বলেছো। পোশাক বদল করে তৈরী হয়ে এসো। মনে মনে জয়ের মেজাজে উল্লসিত হয়ে ওঠে জোকার, কিন্তু মুখে সেটা সে প্রকাশ করলো না, অন্তত মারজ্জার সামনে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মারজ্জা ক্লান্ত পায়ে। ওর চলার ছন্দে একটা জড়তা দেখতে পেয়ে মনে মনে হাসল জোকার। তার সেই ধূর্ত হাসিটা দেখার সুযোগ হলো না মারজ্জারও তখন দরজা টেনে ঘরের বাইরে পা দিয়েছিল। দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলো জোকার। যখন সে বুঝলো, তার কণ্ঠস্বর দরজার ওপারে পৌঁছবে না, তখনি সে আবার গ্রাহ যন্ত্রের মাউথপীসে মুখ রেখে সরব হলো, একটা সুখবর তোমাকে দিচ্ছি জ্যাক, একেবারে নতুন আনকোরা এক কিশোরীকে পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। আমি যতদূর জানি, এখনো পর্যন্ত মেয়েটি কোনো পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, যাকে বলে একেবারে অক্ষত। তুমিই হবে ওর জীবনে প্রথম পুরুষ, যে কিনা......তার ইঙ্গিতটা না বোঝার কথা নয় জ্যাকের। সে কি বললো দূরভাষে কে জানে, তবে তাকে সাবধান করে দিয়ে জোকার তার কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো, তাই দেখো বন্ধু, মেয়েটির যেন কোনো অসুবিধে না হয়, কিংবা কোনো কারণেই যেন ভয় না পায়। দূরাভাষের অপর প্রান্ত থেকে জ্যাকের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জোকারকে অপেক্ষা করতে হয়। তার কথা শেষ হতেই জোকার হাসতে হাসতে বললো, বেশ তো যাকে পাঠাচ্ছি, নিজের চোখে দেখলে আমি হলফ করে বলতে পারি, তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, দেখো! তবে তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি জ্যাক, কোনো কারণেই যেন হঠকারিতার পরিচয় দিয়ে বসো না। মেয়েটি এখনো নাবালিকা। একটু বেসামাল হয়েছ কি শুধু তুমি নও সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বিপদে পড়তে হবে। ভালো খাবার যেমন একটু রয়ে সয়ে খেতে হয়, তেমনি আবার সুন্দরী মেয়েকে......আমি কি বলতে চাইছি তুমি নিশ্চয়ই

বুঝতে পেরেছো, পারো নি? হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ওই কথা রইলো। গ্রাহকযন্ত্র নামিয়ে রেখে মারজ্জার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে জোকার।

প্রাসাদোপম একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সিটা থামতেই দারোয়ান ছুটে এসে দরজা খুলে দেয় মারজার সুবিধার জন্যে। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে মারজা, আচ্ছা, এটাই তো মিস্টার অস্টারের বাড়ি, তাই না?

হ্যাঁ, সতেরো তলায় ওঁর অ্যাপার্টমেন্ট, সোজা চলে যান। সবজান্তার ভাব তার কথায়।

লিফটচালকের কথা বলার ধরণ দারোয়ানেরই মতো। সতেরোতলায় উঠে এসে লিফটের দরজা খুলে দিয়ে সে বলে উঠলো, বাঁদিকেই মিস্টার অস্টারের অ্যাপার্টমেন্ট।

কলিংবেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়। ইউনিফর্ম পরিহিত একটি ছোকরা প্রবেশ পথের বাইরে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাকে চান?

মিস্টার অস্টারকে। ওঁকে গিয়ে বলো, আমি মারজা ফ্লাড, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ঠিক আছে, ভেতরে এসে বসুন, আমি মিস্টার অস্টারকে এখুনি আপনার আগমনের খবরটা দিচ্ছি। ছোকরাকে দারুণ স্মার্ট লাগলো, কথাবার্তায় তুখোর যেন সে।

বসবার ঘরে মারজাকে বসিয়ে ছোকরা-পরিচারক তার মনিবকে খবর দিতে চলে যায়। একটু পরেই দামী সান্ধ্যপোশাক পরা ছোটখাটো মাপের একজন ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন সেখানে। মারজার দিকে সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, আমার নাম জ্যাক অস্টার। শুভ-সন্ধ্যা।

প্রত্যুত্তরে মারজাও তাকে শুভ-সন্ধ্যা জানিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বললো, আর আমি মারজা ফ্ল্যাড।

মারজাকে দেখা মাত্র ভদ্রলোকের চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম হলো। বিস্ময়ের ভাবটা কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে তিনি বললেন, এই প্রথম জোকারকে সত্যি কথা বলতে দেখলাম। সত্যি রীতিমতো সুন্দরী তুমি!

মারজার মুখ থেকে হাসিটা নিমেষে মিলিয়ে যায়। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো ও, ধন্যবাদ মিস্টার অস্টার।

না, না ওসব মিস্টার ফিস্টার নয়, তুমি আমাকে জ্যাক বলেই সম্বোধন করো। চলো, এখন ভেতরে যাওয়া যাক। মারজার হাত ধরে ওকে ভেতরের ঘরে নিয়ে এলেন তিনি। বিরাট সাজানো-গোছানো ঘর যেন এই প্রথম দেখ মারজা।

ওয়াইন ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে জ্যাক জিজ্ঞেস করলেন, মানহাট্টান না মার্টিনি, কি খাবে বলো?

ও দুটোর কোনটাই নয়, স্রেফ কোক।

জ্যাকের ভুরু কুঁচকে উঠলো, তবে পরক্ষণেই হেসে ফেললেন তিনি। তারপর সেই ছোকরা পরিচারককে ডেকে বললেন, মিস ফ্লাডের জন্যে বরফ-মেশানো কোক নিয়ে এসো।

ঠিক আছে স্যার, এখুনি নিয়ে আসছি।

মিস্টার মার্টিন আমাকে আসতে বলেছিলেন, একটু ইতস্তত করে মারজা বললো, আমি কি আগেই এসে পড়েছি?

হাসলেন জ্যাক। নিজের হুইস্কির গ্লাসে দু'টুকরো বরফ দিয়ে চুমুক দিলেন গ্লাসে। তারপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে মারজাকে দেখতে গিয়ে বললেন তিনি, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আগে এলে পার্টির শোভাবর্ধন হয়। তাই আগে এসে ঠিকই করেছো তুমি।

এই সময় কলিংবেলটা বেজে উঠতেই দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তিনি বললেন, ওই বোধহয় কোনো অতিথি এলেন। এখনি তাঁকে আমি নিয়ে আসছি, তুমি একটু অপেক্ষা করো।

ছোকরা কোক দিয়ে যায় মারজাকে। ঘরের চারদিকে দৃষ্টি ফেলে দেখে নেয় মারজা। প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা হলঘর, শেষ প্রান্তে একটা জানালা, আর জানালার ওপারে লতাপাতায় ঘেরা ঝুলবারান্দাটা চোখে পড়ল ওর।

অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে হলঘরে ফিরে এলেন জ্যাক। তাদের মধ্যে একজন চিত্রাভিনেত্রীকে দেখে বিস্মিত হলো মারজা। সিনেমার পর্দায় তাকে ও দেখেছে অনেকবার। আর আজ তাকে সামনা-সামনি দেখতে পেয়ে চক্ষু সার্থক হলো ওর। তাদের মধ্যে একজন নামকরা সাংবাদিককেও দেখতে পেলো ও, সংবাদপত্রে তার বহু লেখাই পড়েছে ও।

অতিথিদের পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার আগেই আবার সেই কলিংবেলটা বেজে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন জ্যাক সাড়া দেওয়ার জন্যে। অতো সব নামী-দামী অতিথিদের একসঙ্গে দেখে মারজা তো হতবাক। তাদের সবাইকে না চিনলেও তারা যে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি বুঝতে অসুবিধে হয়না মারজার, কারণ তাদের হামেশাই কাগজে ছাপার অক্ষরে দেখা যায়।

সমাজের উঁচুস্তরের সম্মানিত ব্যক্তিদের পার্টিতে এই প্রথম অংশগ্রহণ করা মারজার, তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় জানা ছিলো না ওর, তাই চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলো ও। যাইহোক, তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে মারজার মনে হয়েছে, সত্যিই জ্যাক অস্টার একজন বিত্তবান পুরুষ এবং দুহাতে টাকা বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করেন না।

সেই সঙ্গে এই ছোট-খাটো চেহারার মানুষটি রীতিমতো মিশুকেও বটে, একটুও ক্লান্তি নেই, সর্বক্ষণ মুখে হাসি ফুটিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন, এবং তারই মাঝে মারজার কাছে এসে খবর নিচ্ছেন ওর কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা।

হলঘরের একেবারে একপ্রান্তে বসে থেকে নিজেকে অন্যদের থেকে গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও সাংবাদিকদের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি মারজা। একবার এক সাংবাদিক ওর কাছে এসে ওকে জিজ্ঞেস করে, তোমার পেশা কি? কি উত্তর দেবে, প্রথমে বুঝতেই পারেনি মারজা। তারপর উত্তর একটা দিতে হয় এই ভেবে একটা দায়সারা গোছের জবাবে ও বলে, এই নাচ করি আর কি।

তাই বুঝি। এদিকে জ্যাক যে কখন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি মারজা। তাঁকে দেখে সেই সাংবাদিক ভদ্রলোক তো রীতিমতো হতচকিত, অস্বস্তির ভাবটা

কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে সে তখন জানতে চেয়েছিল, তা কোথায় তুমি নাচ করো বলো আমাকে, আমাদের কাগজে তোমার নাচের কথা লিখবো।

কিন্তু এখনো তো আমি সেরকম নাম কিছু করতে পারিনি, ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে মারজা বললো, যখন নাম করবো, তখন আমি নিজের থেকেই আপনাদের কাছে চলে যাবো।

সাংবাদিক ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা, কারণ সে বেশ ভালো করেই জানে, এরকম পার্টিতে জ্যাক সাধারণত কি ধরণের মেয়েদের আমন্ত্রণ করে থাকে, আর এ ধরণের মেয়েরাই বা কি চরিত্রের হয়। তাই সরল নিরীহ এবং নিষ্পাপ মারজার মতো মেয়ের সঙ্গে একটু মজা করার লোভটা সংবরন করতে পারলো না সে। একরকম জোর করেই বললো সে, কেমন তুমি নাচো একটু দেখাও তো!

তার সেই নাছোড়বান্দা ভাব দেখে উপস্থিত অতিথিরা কৌতূহলী চোখে মারজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারাও রগড় দেখতে চায়, মারজাকে নাস্তানাবুদ হতে দেখতে চায়। মারজা কিন্তু এতটুকু বিচলিত হয় না, তেমনি ঠোঁটে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে বললো, আমি নাচ ভালোবাসি, নাচাটাই আমার পেশা, কিন্তু আজ আমার নাচতে একটু অসুবিধা আছে।

কিসের বাধা শুনি? হঠাৎ সাংবাদিকের চোখদুটো কেমন বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। নাচে বাধা হয় কারোর, এরকম কথা তো আগে কখনো শুনিনি কারোর মুখে!

সোফার উপর বাচ্চা মেয়ের মতো পা দোলাতে দোলাতে মারজা বলে, আপনি নাচের কিছুই জানেন না, আপনি কি জানেন, মাঝে মাঝে আমাদের পায়ের শিরায় টান ধরতে পারে?

ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠেছিল। ছেলেমানুষী কথা সব। পেছন থেকে ওর কাঁধের ওপরে আলতো হাতের স্পর্শ রেখে জ্যাক অস্টার বলেছিলেন, লক্ষ্মী সোনা মেয়ে আমার, একবার নেচেই দেখো না, তুমি কেমন নাচো? এরপর ও আর না করতে পারেনি।

রাত আড়াইটের পর থেকে অতিথিরা একে একে বিদায় নিতে শুরু করলো। তিনটের পর অতিথিরা সবাই চলে যাওয়ার পর মারজাকে একা পেয়ে ওর পাশে এসে বসলেন জ্যাক। বাঁচা গেলো, এ সপ্তাহের মতো নিস্তার পাওয়া গেলো।

সেকি? অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে মারজা বললো, আপনার যখন ভালোই লাগে না তখন এসব পার্টির আয়োজন করতে যান কেন?

এটাই তো এখানকার রীতি, ম্লান হেসে জ্যাক বললেন, সপ্তাহে একবার আমার এই পার্টিতে ওরা যোগ দিতে না পারলে যে মুষড়ে পরবে ওরা।

তার মানে প্রতি সপ্তাহে এই রকম পার্টি হয় আপনার এখানে?

হ্যাঁ, হয় বৈকি! আমার এখানে ছাড়া অন্য আর কোথাও হওয়ার জায়গা কোথায় বলো? জ্যাকের কণ্ঠে দম্ভ প্রকাশ পায়। সপ্তাহে একদিন, মঙ্গলবার আমার ঘরে ওদের এই সান্ধ্যবৈঠক না বসলে নিউইয়র্ক শহরের কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকবে না।

মারজা বুঝতে পারে না, কেউ এলো কি এলো না, তাতে কি এসে যায়। ওর মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা তখন। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে এক সময় বাড়ি ফেরার

কথা মনে পড়ে যেতেই বলে উঠলো, রাত তো অনেক হলো, এবার যে আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে মিস্টাব অস্টার।

তুমি কি একান্তই চলে যাবে? করুণ স্বরে তিনি বললেন। আমার এখানে অনেক ঘর আছে, মনে কবলে অনায়াসে তুমি থাকতে পারো সেখানে।

তা সম্ভব নয় মিস্টার অস্টার, বাড়ি না ফিরলে আমাব বাবা চিন্তা করবেন।

তাহলে তো তোমাকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হয়। জ্যাক তাঁর পকেটে হাত বাখেন। সত্যি তো কথাটা আমাব অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিলো। পকেট থেকে একটা ডলারের নোট বার করে মারজার হাতে গুঁজে দেন।

সেটা হাতে নিয়ে মিস্টি হাসি হেসে মারজা বলে, সন্ধ্যেটা আজ বেশ ভালোই কাটলো, অনেক দিন মনে থাকবে।

আমারো খুব ভালো লাগলো আজ তোমার সঙ্গ। মারজাব হাতে মৃদু চাপ দিয়ে জ্যাক বললেন। অনেক দিন মনে থাকবে বলছো কেন, আসছে সপ্তাহে তুমি আসবে না আমার এখানে?

তা তো বলতে পারছি না। একটু ইতস্তত করে মারজা বলে, এ ব্যাপারে মিস্টার মার্টিনের অনুমতির প্রয়োজন, তবে ওঁর সঙ্গে কথা বলবো।

ও ভার আমার, তাকে বাধা দিয়ে জ্যাক বললো, আমি বরং জোকারের সঙ্গে কথা বলে নেবো।

মারজাকে বিদায় জানানর জন্যে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন তিনি।

চলি মিস্টার অস্টার। শুভরাত্রি।

শুভরাত্রি মারজা। লিফটের দিকে এগিয়ে যায় মারজা। লিফটের দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত জ্যাক তাঁর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। লিফট নিচে নামতেই মারজা ওর হাতের মুঠোটা ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। জ্যাকের দেওয়া ডলারের নোটটা তখন ও ভালো করে দেখেওনি। কিন্তু এখন সেটা দেখতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ও। বিশ ডলারের নোট! ওর এক সপ্তাহের রোজগার। কে জানে উনি ভুল করে এতোগুলো টাকা দেননি তো, ভাবলো মারজা।

ওকে লিফট থেকে বেরোতে দেখে দারোয়ান ছুটে আসে। ট্যাক্সি লাগবে মেমসাহেব?

ব্যাগের মধ্যে সদ্য উপার্জিত বিশ ডলারের নোটটার কথা মনে পড়তেই তাও তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, হ্যাঁ, লাগবে বৈকি! ডাকো একটা ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই মারজা ওদের ঘরের দিকে দ্রুত পা বাড়ালো। আর ঠিক তখনি অন্ধকারের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তি ওর পথ আগলে দাঁড়ালো। মারজা!

আরে মাইক যে! তা তুমি এখানে কি করছো?

এই তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল তোমার খোঁজ নিই। তা তুমি ভালো আছো তো?

একটা সিগারেট ধরিয়ে আবেশ করে টান দিলো মারজা। তারপর মাইকের চোখে

স্থির দৃষ্টি রেখে বললো মারজা, ভালো আছি, খুব ভালো, কেন তুমি দেখে বুঝতে পারছো না আমি কেমন আছি?

হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, মাইক বলে। জানো মারজা, আজ তোমাকে দেখার এতো ইচ্ছে হচ্ছিল, রাত সাড়ে-বারোটা পর্যন্ত 'সোনালী আভা'র সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখতে না পেয়ে তখন ওখানে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি, তুমি নাকি অনেক আগেই আজ চলে গেছো সেখান থেকে। তাই আমার তখন আরো দুশ্চিন্তা হলো, তবে কি হঠাৎ তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ করলো না তো? এখানে তোমাদের বাড়িতে এসে তোমার বাবার কাছ থেকে আবার শুনলাম, তুমি এখনো বাড়ি ফেরোনি। কি ব্যাপার, এতো দেরী হলো যে?

মাইকের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে মারজা বলে, কেন তুমি মিছিমিছি অপেক্ষা করতে গেলে মাইক? আসলে আজ আমি একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম।

কোথায়, কার পার্টিতে?

জ্যাক অস্টারের বাড়িতে।

তোমার পরিচিত তিনি? কৌতূহল দমন করতে পারে না মাইক।

না। উত্তরে মারজা বলে, জোকার মার্টিনের অনুরোধে যেতে হয়েছিল সেখানে।

অনুযোগ করে মাইক বললো, এসব আমার একেবারেই পছন্দ নয় মারজা।

কেন, কাঁরণ জানতে পারি?

আমার ইচ্ছে নয় জোকার মার্টিন বললেই যে তোমাকে যেতে হবে তার কি মানে আছে। তাছাড়া তোমাকে এ সব জায়গায় পাঠানর অধিকার কি আছে তার?

মারজা এবার রাগতস্বরে বলে উঠলো, আমার ব্যাপারে অহেতুক তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

আমার প্রয়োজন হয়তো নেই, আহত বাঘের মতো ক্ষিপ্র হয়ে উঠে বললো মাইক, তবু বলবো তোমার যাওয়া উচিত হয়নি। তোমার ভালোর জন্যেই বলা। কে বলতে পারে, তোমাকে কোনো বিপদে পড়তে হতো না?

এই রাতদুপুরে তোমার উপদেশ শুনতে ভালো লাগছে না। তুমি এখন বাড়ি যেতে পারো মাইক। নিস্পৃহ গলায় বলে আর দাঁড়ায় না মারজা। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো ও।

একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাইক তার বাড়ির পথে পা বাড়াতে গিয়ে মনে মনে ভাবলো, এই প্রথম, সত্যি ওকে আজও সে বুঝতে পারেনি।

রোজকার অভ্যাসমতো বিয়ারের বোতল হাতে টেবিলের সামনে বসে মারজার ফেরার অপেক্ষায় বসেছিল পিটার। ওকে দেখেই ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো, কোথায় গিয়েছিলে?

কেন, কাজে গিয়েছিলাম।

কিন্তু তোমার এক ছেলে-বন্ধু এসে যে বলে গেলো আজ সন্ধ্যের আগেই তুমি তোমার কাজের জায়গা থেকে বেরিয়ে পরেছো, এতক্ষণ কি করছিলে তাহলে? এই বলে জোকারের

দেওয়া নতুন চকচকে পোশাকের দিকে তাকিয়ে থাকে শ্যেন দৃষ্টিতে।

কাজে গিয়েছিলাম, শুনলে না? পিটারের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যায় মারজা, কিন্তু তার আগেই তার কাঁধের ওপর পিটারের লোমশ হাতের থাবা এসে পড়ে।

বিকৃত মুখ করে সে বলে, বুক বার করা এই আধা-ন্যাংটো পোশাকে?

কেন, এটাই তো আমার নাচের পোশাক। অন্যদিন কাজের জায়গায় খুলে রেখে আসি। কিন্তু আজ পোশাকটা বদলাতে ভুলে গেছি।

এবার পিটার আরো বেশী হিংস্র হয়ে ওঠে। মারজার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে একটানে জীপারটা খুলে ফেলে হাত ঢোকায় সেটার মধ্যে, কিছু খুচরো মুদ্রার সঙ্গে একটা কুড়ি ডলারের নোট উঠে আসে তার হাতের মধ্যে। একসঙ্গে এতোগুলো টাকা কোথ্থেকে পেলে শুনি?

টিপস পেয়েছি।

ধমকে উঠে পিটার। শুধু নাচ দেখে কেউ অতো টাকা টিপস দেয় না।

কি উত্তর দেবে মারজা? সৎবাবার কুৎসিত ইঙ্গিতের উত্তরে কিছু বলার মতো প্রবৃত্তি ছিলো না মারজার, তাই চুপ করে থাকে।

পিটার তখন নিজে থেকেই আবার খিঁচিয়ে উঠলো, কিরে দেহ বেচে এসে চুপ করে আছিস কেন?

তারপরেও মারজাকে চুপ করে থাকতে দেখে আচমকা ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দেয় পিটার। মাথা ঘুরে যায় মারজার, দেওয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ে। ওর সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিটার ওর আলতো করে আটকানো পোশাকের ফিতে খুলে ফেলে। বুক থেকে সেটা খসে পড়ার আগেই তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলো মারজা দুহাত দিয়ে।

সেদিন তোর মাকে বলেছিলাম, তুই ভ্রষ্টা, কিন্তু তোর মা তখন বিশ্বাস করেনি। ভাগ্য ভালো ওর, জীবিত অবস্থায় আমার অভিযোগ যে কতো সত্য সেটা জেনে যেতে হলো না ওকে।

মা নেই তোমার তো এখন পৌষ মাস, তাই না? মারজার দুচোখ দিয়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছিল।

হ্যাঁ, তা তো বটেই! দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে মজা..... ট্রাউজারের বেল্টটা খুলতে খুলতেই ওর দিকে ছুটে আসে পিটার। চটপট মাথা নিচু করে সরে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে মাংস কাটার ছুরিটা দ্রুত হাতে বার করে নেয় মারজা। ঘরের আলোয় চকচক করে ওঠে ছুরির ফলা। ছুরির তীক্ষ্ণ ধারালো মুখটা পিটারের বুকের দিকে তাক করে ঠোঁট কামড়ায় মারজা। কই এগিয়ে এসো? কাপুরুষের মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

তীক্ষ্ণ ছুরির ফলাটার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ধীরে ধীরে মারজার মুখের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তাকালো পিটার। ঘৃণায় ফুঁসছিল ও। ওদিকে ওর জ্বলন্ত চোখ দুটি দেখে ভয়ে পিছু হটতে থাকে পিটার। মারজা, এ তুমি কি করছো? নামাও, হাত থেকে ছুরিটা নামাও বলছি।

দাঁতে দাঁত চেপে ক্রুদ্ধ স্বরে মারজ্জা বলে, কেন, খুব তো বীরত্ব দেখাচ্ছিলে একটু আগে। কই কোমর থেকে বেল্টটা খোলো আগে, তারপর এসো দেখি আমাকে স্পর্শ করার হিম্মত তোমার কতো!

পিটার তখন বুঝে গেছে, এ মেয়ে সাংঘাতিক, আর রেগে গেলে ওর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হ্যাঁ, এখন ওকে ভালো ভালো মিস্টি কথায় ভোলাতে হবে। অত্যন্ত সতর্কভাবে একটু পিছিয়ে গিয়ে সে বলে, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, ওসব কথা ভুলে যাও মারজ্জা!

তা না হয় ভুললাম, কিন্তু আমার টাকাটা?

সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি ডলারের নোটটা দূর থেকে যথেষ্ট ব্যবধান রেখেই টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় পিটার। টাকাটা ব্যাগে পুরে রাখে। মারজ্জার চোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়তে থাকে তখনো। তেমনি ফুঁসে সে বলে, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে যদি তুমি আমাকে আবার স্পর্শ করার চেষ্টা করো, তোমাকে খতম করতে একটুও দ্বিধা করবো না, বুঝলে পিটার?

পিটার কোনো প্রতিবাদ করে না। কারণ ও বেশ ভালো করেই জানে, মারজ্জার কথা আর কাজের মধ্যে কোনো তফাত থাকে না। তাই কথা আর না বাড়িয়ে ওর শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই ধীরে ধীরে বিয়ারের সন্ধানে বরফের বাক্সটার দিকে এগিয়ে গেলো।

ওদিকে মারজ্জা তখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ বন্ধ করে ভাবছিল, মা মারা যাওয়ার পর এক মাসও কাটেনি, অথচ মনে হচ্ছে যেন কত যুগই না পেরিয়ে এসেছে ও। এক সময় চোখের পাতা মেলতে গিয়ে প্রথমেই হাতে ধরে রাখা ছুরিটার ওপর নজর পড়লো ওর। কিছু সময় স্থির চোখে ছুরিটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর সেটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পোশাক বদল করে বিছানায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত ছুরিটার কথা মনেই ছিলো না ওর। ছুরিটা হাতে নিয়ে তোষকের নিচে চালান করে দেয় মারজ্জা, কে জানে যদি আবার দরকার হয় কখনো। জানোয়াররা কখনো তাদের শিকারের পিছু নেওয়া থেকে বিরত হয় না, এই ভেবে তারপর থেকে প্রতিদিন শোবার আগে তোষকের তলায় হাত রেখে দেখে নিতে ভোলে না মারজ্জা, ঠিক জায়গায় ছুরিটা আছে কিনা।

জোকার মার্টিনের কাছে কৃতজ্ঞ মারজ্জা। এই দুর্দিনে সে ওকে চাক্‌রী দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ইদানীং মারজ্জার জন্য পার্টিতে যোগ দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়। বড়লোকদের খেয়াল। তবে কয়েকটা পার্টিতে যোগ দিয়ে তার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। স্কুলের অন্য সবজান্তা ছেলেদের থেকে তারা অনেকবেশী শান্ত? নিরাপদ। এব্যাপারে ওর বেশ মোটা টাকার প্রাপ্তিযোগ হচ্ছিল। তাই এসব কাজের পরে মাইকেলের সঙ্গে ইদানিং ওর দেখা-সাক্ষাৎ এক রকম হচ্ছিলই না বলা যেতে পারে। একদিন নাচ-ঘরের ড্রেসিংরুমে ওর ফোন এলো। খানিক আগে দৈত্যাকার সেই লোকটা ওকে খবর দিলো, ওর ফোন এসেছে। ক'দিন থেকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ও মনের দিক থেকে ভীষণ তাগিদ অনুভব করছিল।

কে, মাইকেল?

হ্যাঁ, কেমন আছ মারজা? বহু আকাঙ্খিত কণ্ঠস্বর।

ভালো, তুমি কেমন আছ?

তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল, আজ একবার আসবে?

অনেকদিন পরে মাইকেল ওকে আহ্বান করছে। ওর শরীরের ভেতর দিয়ে একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল যেন। এ যেন ঠিক ভালো লাগা মানুষের ভালোবাসার পরশ। মারজা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—আমি এক পায়ে খাড়া, তা কোথায় দেখা হবে বলো?

সেই গাড়ী দাঁড়ানোর কোণটায়, যেখানে প্রথম তোমার আমার দেখা হয়েছিল, মনে আছে?

নিশ্চয়ই! আমি আসবো এখানকার কাজ শেষ হলেই।

তাহলে ঐ কথা রইল।

ওরা একটা রেস্তোরায় এসে বসল।

কি ব্যাপার তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না। মারজা কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে বলল।

আমার এখন কিছুই খেতে ভালো লাগে না। মাইকেলের কণ্ঠস্বর কেমন ভারি ভারি শোনাল যেন। জানো, মারজা তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে। রস তোমাকে বলতে বলেছে, আসছে মাসে সে ফিরে আসছে।

মারজা চকিতে তার চোখের ওপর স্থির চোখ রেখে বলল, তবে কি তুমি এ-কথা শোনাবার জন্যেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে? কে কবে ফিরবে, তাতে আমার কি?

মাইকেল চুপ করে রইল।

মাইকেল! মারজা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকল, কাছে, আমার একটু কাছে আসবে তুমি?

মাইকেল একটা থামের আড়ালে অনুসরণ করল ওকে। জায়গাটা আবছা অন্ধকারে ছেয়েছিল। সেই আলো-আঁধারির মধ্যে মারজা তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে তার মুখটা নামিয়ে আনে নিজের মুখের কাছে। তারপব ও তাকে চুমু খেলো। মুহূর্তে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রথমে। পরমুহূর্তে নিজের বুকের মধ্যে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে যতক্ষণ না তার কাঁপা কাঁপা শরীরটা একটু শান্ত হয়।

সেই রকম জড়ানো অবস্থায় মারজা বলল, এখন তোমার কি রকম লাগছে মাইকেল?

কিন্তু আগে তো তুমি এসব কথা কিছুই বলোনি, মারজা মাইকেলের গলায় এখনো কিসের সংশয় যেন জড়ানো। এর আগে তুমি আমাকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছ। কথা দিয়ে কথা রাখোনি।

তুমি তো জানো মাইকেল, অর্থের জন্যে আমাকে কত জায়গায়ই না যেতে হয়।

তাই বলে টাকার জন্যে তুমি—

চুপ করো, দয়া করে তুমি চুপ করো। টাকার অভাবে মাকে কত কষ্টই না পেতে দেখেছি। সেই অবস্থায় আমাকে যাতে না পড়তে হয় তাই আগে থেকে টাকা রোগজার করে রাখছি। এতে আমার কোনো অন্যায় নেই।

কিন্তু তুমি আমাকে কখনো—

না, আর কোন কথা নয়' মারজা তাকে কপট ধমক দিয়ে বলে, সেই থেকে তুমি বড্ড বেশী কথা বলে যাচ্ছ। অথচ একবারও তুমি আমাকে চুমু খেলে না এখনো পর্যন্ত।'

হাসল সে, একটা নিটোল তৃপ্তির হাসি। নিচু হয়ে মারজার উষ্ণ ঠোটের সঙ্গে নিজের ঠোট দুটো নিবিড় করে মিশিয়ে দিলো সে। চুম্বন অতি দীর্ঘায়িত হলো। তারপর এক সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে সে বলল, এ এক রকম ভালই হলো মারজা। এতোদিন আমি অন্ধকারে ছিলাম, আজ তুমি আমাদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা খুব স্পষ্ট করে দিলে। বাইরে বেরিয়ে এসে সে আবার নিচু গলায় বলল,—জানো মারজা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

জানি। স্বপ্নালু চোখ তুলে তার চোখে চোখ রাখে মারজা,—সেই প্রথম দিন লিফটে দেখা হওয়ার দিনই আমিও তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি মাইকেল। ওর চোখ দু'টো সহসা বড় বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর থেকে তুমি আমাকে দারুণ ভাবে পাগল করে দিয়েছ। তোমার মতোন কেউ আমার মনটাকে এভাবে নাড়া দিতে পারেনি।

ভালই তো, মাইকেল ওকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, এরপর আর আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতে না। কেমন জব্দ তো?

আবছা অন্ধকার ঘন হয়েছিল জানালার সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে এক এক করে সব লক্ষ্য করছিল পিটার, রাগে উত্তেজনায় মনে মনে ফুঁসছিল সে। না, ঢেমনিটা বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছে। যেভাবেই হোক আজ ওকে একটু টাইট দিতে হবে। বেজন্মাগুলো তোমায় নিয়ে মজা লুটবে, আর শালা আমার বেলায় কেবল ছেনালীপনা? খিস্তি করে নিজের মনে বলল সে, দাঁড়া, আজ তোকে আমার খেল্ দেখাচ্ছি! মারজার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করতে আরো কয়েক ঢোক তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করে নিলো সে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, আর তখনি আচমকা একটা অদ্ভুত মতলব বিদ্যুতগতিতে খেলে গেলো তার মাথায়। উত্তেজনায় পায়চারি করতে থাকে ঘরের মধ্যে পিটাব।

ওদিকে একসময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠতেই চট্‌জলদি নিজের ঘরে চলে এলো পিটার। আরো কয়েক পেগ মদ গলাধঃকরণ করে নিলো সে। ঘরটা অন্ধকারে ডুবে ছিলো, সেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে রইলো।

এক জোড়া পায়ের শব্দ তার ঘরের সামনে এসে থামলো।

পিটার? মারজার নিচু গলার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে। তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে পিটার?

তার পরিকল্পনা মতো চুপ করে রইলো পিটার, ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না. পরক্ষণেই সে দেখলো, মারজার ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে, তার ঘরের খোলা দরজা পথ দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে সামনের হলঘরে। মনেহয় ও ধরে নিয়েছে, পিটার ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই ও দরজাটা খুলে রেখেছে। এরকমটিই চাইছিল সে মনে মনে, এবং তার মতলবটা মিলিয়ে নিচ্ছিল। মারজার ঘর থেকে মিষ্টি একটা গানের সুর ভেসে এলো। দারুণ স্বস্তিতে আছে ও, মাগীটা নিশ্চয়ই আজ খুব মজে আছে, দেহ-মনের সুখে

ভরপুর।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে পিটার ওর পরবর্তী গতিবিধি আন্দাজ করার জন্যে। একটু পরেই ঘর সংলগ্ন বাথরুম থেকে ছরছর করে জল পড়ার শব্দ ভেসে এলো। পিটার বুঝলো, মাগী ওর পুরুষসঙ্গের যতো সব কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ করছে এখন। দৃশ্যটা মনে পড়তেই আর এক প্রস্থ উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে বোতলের অবশিষ্ট মদটুকু গলায় ঢেলে নিয়ে হাতের উল্টো দিক দিয়ে সে মুখ মুছে নিলো। তারপর বোতলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চোরের মতো অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে মারজার ঘরে ঢুকে নিজেকে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রাখে। সেখান থেকেই ওর ঘরের চারদিকে চোখ বোলাতে গিয়ে বিছানার ওপর তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হলো। মারজার পরিত্যক্ত সব পোশাক, এমনকি ওর অন্তর্বাসটাও পড়ে থাকতে দেখলো সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে পিটারের রক্তে কদর্য দহনের একটা উত্তাপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তার দেহের সমস্ত রক্তস্রোত যেন অকস্মাৎ চলকে চলকে উঠতে থাকে। একটু পরে বাথরুমে আবার জল পড়াব শব্দ শুনতে পেলো সে। কল্পনায় ওর নগ্ন-দেহটা কি রকম হতে পারে অনুমান করতে গিয়ে তার ইচ্ছে হলো সেই মুহূর্তে বাথরুমে ঢুকে ওর দেহ অপবিত্র করে দেয়। কিন্তু তা সে করবে না এই মুহূর্তে, আর একটু অপেক্ষা করবে সে।

একসময় বাথরুমে জল পড়ার শব্দ বন্ধ হলো। পরক্ষণেই বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ হতেই পিটার সতর্ক হয়ে ওঠে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো মারজা প্রমাণ সাইজের একটা উজ্জ্বল মসৃণ তোয়ালে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে। আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে পিটার বুঝতে পারে ওই তোয়ালের নিচে আর কোন আবরণের বালাই নেই। এই সুযোগ! নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করতে উদ্যত হলো সে। মারজা এবার দেহ থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে ওর নগ্ন দেহের জল মুছতে শুরু করলো। ওদিকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা পিটারের চোখে ওর সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তার দেহের রক্ত তখন টগবগ করে ফুটে ওঠে। এবারেও সে অপেক্ষা করে থাকলো, ফল এখনো ঠিক পাকেনি এই ভেবে। সে জানে ফল পাকলেই বৃন্তচ্যুত হয়ে টুপ করে খসে পড়বে তার পায়ের নিচে, আর তখনি সে.......সেই মনোরম দৃশ্যটা কল্পনা করে তেমনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলো।

আলনার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে মারজা ওর নাইটড্রেসটা টেনে নেয়। তার মানে ওর অমন সুন্দর সতেজ, সবে মাত্র জলে ধোয়া নগ্ন শরীরটা নাইট-ড্রেসের আড়ালে চাপা পড়ে যাবে। না, আর অপেক্ষা করা বোধহয় ঠিক হবে না, মনে মনে ভাবলো পিটার, তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ওর ওপর। মাতাল করা একটা চাপা উত্তেজনায় পিটারের সমস্ত রক্তস্রোত যেন একই সঙ্গে চলকে উঠল। দরজার দিকে একপা এগিয়ে আসতেই পিটারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে উঠল মারজার। আর তখনি ভয়ে এবং বিস্ময়ে আঁতকে উঠলো ও।

দুহাত বাড়িয়ে পিটার নিচু গলায় ডেকে উঠল মারজার নাম ধরে। এসো, আমার কাছে এসো।

ভীত সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো ত্রস্ত পায়ে দোলনাটার দিকে পিছিয়ে যায় মারজা। দু'চোখে

রাজ্যের ভয় তখন, ও রাগে ঘৃণায় পাথর সমান হয়ে গেছে। মনটাও তেমনি পাথরের মতো শক্ত করে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে বলে উঠল ও, যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

বুনো জানোয়ারের মতো ক্ষেপে উঠেছিল পিটার তখন। মারজার কোনো বাধা-নিষেধের কথাই তার কানে ঢুকছিল না। এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে থাকে সে মারজার দিকে। কামোত্তেজনায় দরদর করে তার কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকে, সুস্বাদু কিছু খাবার খাওয়ার মতো সে তার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। গাঢ়স্বরে সে বলে উঠল, লক্ষ্মীটি মারজা আমার, আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না, একটু দয়া করো আমার ওপর...

দু'হাতে মারজা ওর নগ্ন বুক ঢেকে ঘৃণায় চিৎকার করে আবার বলে উঠল, তোর ওপর দয়া করবো? শয়তান, মাতাল কোথাকার! এখনো আমার ঘরে রয়েছিস? যা, বেরিয়ে যা, তা না হলে...

তবে রে, ভ্রষ্টা মেয়ে! তোর দেমাক আমি এখনি ঘোচাচ্ছি,—

ভয় পেয়ে পিছু হটে যায় মারজা। তবে তার আগেই ওর একটা হাত খপ করে ধরে ফেলে পিটার। ওকে তার বুকের কাছে টেনে এনে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করে।

মারজাও তেমনি ক্ষিপ্রগতিতে মুখটা সরিয়ে নেয়, এবং হিংস্র বাঘিনীর মতো নখ বসিয়ে তার সারা মুখ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। সেই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে ওঠে ও, বেজন্মা, ছেড়ে দে আমাকে, নইলে—

পিটার তেমনি এক হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখে ওকে, অপর হাত দিয়ে সে তার মুখে হাত বোলাতেই তরল পদার্থের মতো কি যেন তার হাতে লাগে। তাড়াতাড়ি সে তার হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরতেই দেখে রক্ত লেগে গেছে সেখানে।

মারজার কেনো ভ্রুক্ষেপ নেই তাতে। বরং আগুন ঝরে পড়ছিল দুচোখ দিয়ে ওর। ফুঁসে উঠে বলল ও, কি এখনো যাস্‌নি, যাবি না?

ওদিকে হাতে রক্ত দেখে পিটার তখন পাগলের মতো ক্ষেপে উঠেছে, হিংস্র জানোয়ারের মতো ফুঁসছে। সে তখন নিষ্ঠুরের মতো একটা কাণ্ড করে বসলো, প্রচন্ড জোরে মারজার হাতটা চেপে মুচড়ে দেয়, তারপর ততোধিক জোরে ওর কানের পাশে আঘাত করে বসলো। আর একটু হলে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতো, কিন্তু ঠিক সময়ে নিজেকে সামলে নিলো ও। সঙ্গে সঙ্গে ওর সব রাগ জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়তে চাইলো। ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ালো ও বিছানার দিকে। তোষকের নিচ থেকে ছুরিটা বার করতে যায়। কিন্তু ছুরিটার নাগাল পাওয়ার আগেই ওর পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ালো পিটার, ওর চুলের মুঠি ধরে এক হেঁচকায় টান দিয়ে কাছে টেনে নেয়। পিটারের কাছ থেকে চরম আঘাত পাওয়ার আগে মুহূর্তের জন্যে মারজা দেখলো তার হাতটা দ্রুত নেমে আসছে তার দিকে, তার হাতটা দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। তার উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পেরে তার আঘাতটা এড়াতে চাইলো ও, কিন্তু পারলো না। বিদ্যুত গতিতে লোহার হাতুড়ির মতো তার হাতের ঘুঁষিটা সোজা এসে আঘাত হানলো ওর মাথার তালুতে। ভূকম্পনের মতো কাঁপুনি তখন ওর সারা শরীরে সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ে। একটা তীব্র আর্তনাদের সঙ্গে

সঙ্গে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ওর কাঁপা কাঁপা দেহটা মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

ওর চোখের সামনে এক রাশ অন্ধকার তখন, সেই আচ্ছন্নভাবের মধ্যেই মারজা নিজেকে অক্ষত রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে চলেছে ও তখন। কিন্তু তারই মাঝে অনুভব করতে পারলো ও, পিটার ওকে কোলপাঁজা করে তুলে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, এবং একটা ভারি জিনিষ যেন তার সারা শরীরে ভর করে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে, থেঁতলে পিষে ফেলছে ওর মাংসল বুক জোড়া, ওর নগ্ন দেহটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সে। কিন্তু কিছুই করার ছিল না ওর। বেদনার অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুচোখের কোল বেয়ে। তবু শত কষ্টের মধ্যেও দোলনায় বাচ্চা ছেলেটার কান্না শুনতে শুনতে এক সময় চেতনাহীন হয়ে পড়লো ও। সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান হারাবার আগেই একটা অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেলো মারজা, যেখানে যন্ত্রণা বলতে কিছু নেই, দুঃখ-কষ্ট বলতে কিছু নেই, যেন সে এক অন্তবিহীন সুখ ও অসুখের মাঝামাঝি একটা সমুদ্র, ঢেউ শুধু ঢেউ, যেখানে হারিয়ে যেতে কোনো বাধা নেই। তারপরের কথা আর মনে নেই ওর। রাশি রাশি ঘুম যেন ওর চোখের ওপর আঠার মতো আটকে দিয়েছিল কেউই তখন।

অজ্ঞান অবস্থায় কতক্ষণ যে পড়েছিল খেয়াল নেই মারজার। জ্ঞান ফিরে এলে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো ও। সারা শরীরে তখন অসহ্য যন্ত্রণা, যেন শত সহস্র সূঁচ বিঁধে আছে ওর পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত। অতি সাবধানে একটু একটু করে মাথা তুললো ও। আলোয় আলোকিত ঘর। ও তখন সম্পূর্ণ নগ্না, দেহের কোথাও এক চিলতে সুতো বলতে অবশিষ্ট ছিলো না। ও যেন একটা ভয়ঙ্কর ঘোর কিংবা গভীর ঘুমে বুঝি বা ঘুমিয়েছিল। জ্ঞান হারানোর আগের ঘটনা মনে করার চেষ্টা করলো ও। প্রথমে কিছুই মনে পড়ছিল না ওর। অনেক চেষ্টা করার পর একটু একটু করে ওর সমস্ত স্মৃতি ফিরে এলো। আর তখনি অবরুদ্ধ কান্নায় ওর বিদীর্ণ ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো।

এবার ভালো করে চোখ মেলে তাকালো মারজা। প্রথমেই ওর চোখ পড়লো বিছানার ওপর। বিছানার এক পাশে পিটারের পোশাকগুলো পড়ে থাকতে দেখে ওর গাটা কেমন ঘিনঘিন করে উঠল। এক লাফে খাট থেকে নেমে দ্রুত বাথরুমে ছুটে গেলো। পিটারের পোশাকের কথা মনে হতেই বমি উঠে এলো, বেসিনে বমি করতে গিয়ে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ওর পেটের ভেতরটা মোচর দিয়ে উঠল, পেটটা গুলিয়ে উঠল। সেই ভাবটা কেটে যেতেই সারা শরীর ওর শিরশির করে উঠল, জ্বর আসার আগের মুহূর্তে যেমনটি হয় ঠিক সেইরকম।

দ্রুত গরম জলের নল খুলে স্নান করতে নেমে পড়লো মারজা। ময়দা ঠাসার মতো জোরে জোরে সাবান ঘষলো সারা শরীরে, লজ্জাস্থানে বেশি করে। সাবান দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ পরিস্কার করলেও কিন্তু ভেতরে মনের কালিমাকে কিছুতেই পরিস্কার করতে পারলো না ও। ভেতরে একবার দাগ লাগলে সে কি মোছা যায়? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলো।

তবে গরম জলের স্পর্শে মনের শুচিতা না গেলেও দৈহিক যন্ত্রণার হাত থেকে অনেকটা

রেহাই পেলো ও। এখন ওকে বেশ হাল্কা বলে মনে হলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে এলো, আলনা থেকে একটা শুকনো তোয়ালে টেনে নিয়ে ও এবার ওর জলসিক্ত গা মোছার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলো। তারপর অত্যন্ত অলস ভাবে, যেন কোনো তাড়া নেই, এমনি একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে পোশাক পড়তে শুরু করলো।

অবিন্যাস্ত চুল, একটু শায়েস্তা করার জন্যে প্রমাণ সাইজের একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। চুলে একবার চিরুনি বোলাতে গিয়ে অনেক কথাই মনে পড়তে থাকে ওর এক এক করে। ওর ভাবনাগুলো তখনকার মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখে ঠোঁটে একটা হাল্কা রঙের পরশ বুলিয়ে একটু রাঙিয়ে নিলো। ম্লান বিষণ্ণতায় আপ্লুত সারা মুখের মধ্যে কোথাও একটুকু উজ্জ্বলতার বালাই ছিলো না ওর, তবু তারই মাঝে ওর স্বচ্ছ বাদামী চোখ দুটো বুঝি ব্যতিক্রম, তীব্র ঘৃণায় জ্বলছিল তখনো।

ওদিকে দোলনা থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসতেই আলতো পায়ের পাতা ফেলে সেদিকে এগিয়ে যায় ও। প্রস্রাবে কাঁথাটা ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছে, সেটা পাল্টে ফিডিং বোতলে জল ভরে ছোট ভায়ের মুখের মধ্যে নিপলটা পুরে দেয় মারজা, তার অগোছালো বিছানাটা টেনেটুনে গোছগাছ করে দেয়। তারপব ওর বিছানার সামনে ফিরে এসে রক্তে মাখা বালিশের ঢাকনাটা খুলে নতুন একটা ঢাকনা পরালো। আর ভিজে কম্বলটা ঘৃণায় টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো খাটের নিচে।

তখনো একটা আসল কাজ ওর বাকি ছিলো। তোশকের নিচ থেকে ছুরিটা হাতে নিয়ে সেটার ধার পরীক্ষা করে দেখলো আলতো ভাবে একটা আঙুল বুলিয়ে। চলবে, সন্তুষ্ট হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মারজা অতঃপর।

সন্তর্পণে পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি মারতে গিয়ে দেখলো, বিছানায় কালো মোষের মতো দেহ সর্বস্ব পিটার অঘোরে ঘুমচ্ছে। তাকে এখনি জাগাতে হবে, মনের দিক থেক একটা প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করলো মারজা। ঘরের হাই-পাওয়ারের আলোটা জ্বালিয়ে দিলো ও, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘুম ভাঙ্গলো না তার। সারা গা কম্বলে ঢেকে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে সে। গভীর নিশ্বাসে তার বুকের ওঠানামা দেখতে দেখতে ঘৃণায় ওর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। হাতের ছুরিটার ওপর একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে ভুললো না।

বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার কপালের কাছে ছুরিটা উঁচিয়ে নিরুত্তাপ গলায় মারজা তার নাম ধরে ডাকলো, 'পিটার, উঠে পড়ো।'

সে তখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিলো, একটা উৎকট আওয়াজ তার সেই নাক ডাকার মধ্যে, ঠোঁট দুটো সামান্য একটু নড়ে উঠলো কিন্তু মারজা তার ডাকে কোনো সাড়া পেলো না। তখনও ঠিক করলো, হয়তো পিটারের ওপর একটু শারীরিক অত্যাচার চালালে তবে তার ঘুম ভাঙ্গতে পারে। কথাটা মনে হতেই ও তখন তার চুলের মুঠি ধরে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে দাঁত ঘষে রাগ প্রকাশ করলো মারজা। চটপট উঠে পড়ো পিটার তা না হলে...

মারজা ওর কথা শেষ করার আগেই পিটার তার চোখের পাতা মেলে তাকালো ওর

পানে। মুহূর্তের জন্যে সেই একই ভাবে সে তার বিছানায় শুয়ে রইলো চুপচাপ। তারপর হঠাৎ, মারজার হাতে ধরে রাখা ছুরিটা তার নজরে পড়লো। আর সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে ভয়ে আতঙ্কে তার চোখের মণি দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম, তার কণ্ঠনালীতে শক্ত জাতীয় কি একটা যেন আটকে গেছে তখন। কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার। কোনো রকমে জোর করে অস্ফুটে চিৎকার করে বলে উঠল সে। মারজা, শোনো মারজা, আমার কথা শোনবার চেষ্টা করো।

তার কোনো কথাই শুনতে চাইছিল না মারজা তখন। ও তখন তার মুখের ওপর ছুরিটা নামিয়ে আনতে থাকে ধীরে ধীরে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই, কিন্তু ও ওর সংকল্পে অবিচল।

ওদিকে আসন্ন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে শঙ্কিত পিটার কাতর মিনতি জানিয়ে বলল, মারজা, থামো মারজা। তুমি কি বুঝতে পারছো না, এ তুমি কি করছো?

আমি ঠিকই বুঝতে পারছি কি আমি করতে যাচ্ছি, মারজা তার সংকল্পে তেমনি অবিচল থেকে বলল, আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করতে এসেছি। আমার প্রতিজ্ঞার কথা তোমার মনে পড়ে?

তুমি, তুমি কি শেষে পাগল হয়ে গেলে! আঁতকে ওঠার মতো করে বলল পিটার।

মারজার ঠোঁটে ক্রূর হাসি। না পিটার, তোমার মতো একেবারে বদ্ধ পাগল আমি হইনি এখনো। তবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখলে, তোমার পাগলামো আরো বাড়তে দিলে আমি বোধহয় সত্যি সত্যি একদিন পাগল হয়ে যাবো। না আমি পাগল হতে চাই না, আমি সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে চাই। তাই তার জন্যে যদি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হতে হয় সেও ভালো, কারণ তোমার মৃত্যুর পর আমি নিশ্চয়ই আগের মতো আবার আমার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবো। যেমন আবার নিজের বাবার সময়ে পেতাম। তারপর ও আর এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারলো না। আগে থেকেই পিটারের সঙ্গে কথা চালাচালি করার সময় তার ছুরি ধরে রাখা হাতটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। থরথর করে কাঁপছিল, কিন্তু কি অদ্ভুত, ছুরিটা পিটারের মুখের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত নির্মমভাবে চালিয়ে দেওয়ার সময় একটুও হাত কাঁপল না ওর।

কাঠ-ফাটা রোদে হাঁ হয়ে যাওয়া ধানখেতের মতো পিটারের মুখের ক্ষতস্থানগুলো থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকলো। পিটারের বুকের ওপর হাঁটু মুড়ে বসেছিল মারজা। ও ওর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মাত্র এক লাফে তার বিছানা থেকে নেমে পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো।

একটু সময়ের জন্যে সিঁড়ির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে তাকাতেই মারজা দেখলো, পিটার তখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে তার ক্ষতস্থান থেকে সিঁড়ির ধাপে ধাপে। সেই রক্ত দেখে হঠাৎ ওর মার কথা মনে পড়ে গেলো,—হ্যাঁ এই তো সেদিন ওই জায়গাটায় ওর মা মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সেদিনও রক্তের ধারা নেমেছিল সিঁড়ির ধাপ বেয়ে।

ছুরিটা রান্নাঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে এলো

মারজা। ভেতর থেকে দরজা ভেজিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এবার শান্ত হয়ে বসলো মারজা। এখন ওর অতীতের অনেক কথাই মনে পড়ছে, মনে পড়ে এই চেয়ারটাতেই মামণি প্রতিদিন ওর ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকতো।

এখন ওর সারা দেহ-মন ক্লান্তি আর অবসাদে ভরে উঠেছিল, অসম্ভব ক্লান্তিতে ওর চোখের পাতাদুটো মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিলো। এই সময় হঠাৎ দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠল মারজা, ওর চোখের পাতাদুটো খুলে গেলো। বুঝি বা দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো ওর চোখের কোল বেয়ে। চোখের পাতাদুটো মুছে ধীর শান্ত গলায় বলল ও, দরজা খোলাই আছে, ভেতরে আসতে পারেন।

পুলিশ ওর ঘরে প্রবেশ করে ঠিক এইভাবেই ওকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিল।

সব শোনার পর সমাজকল্যাণ সংস্থার মহিলাটি বলল, মারজা, তুমি কিন্তু আসল কথাটাই বললে না, নিশ্চয়ই তোমার জীবনে এমন ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটেছিল যার জন্যে তুমি এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলে তুমি, বলো, আমার এই অনুমান ঠিক কিনা?

মহিলাটির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে মারজা শুধুই মাথা নাড়ল. তার প্রশ্নের উত্তর দিলো না।

তবু একটুও হতাশ না হয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আমার মনে হয়, তুমি নিশ্চয়ই কোন সংশোধক কিংবা উদ্ধার আশ্রমে যেতে চাইবে না।

অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকায় মারজা। নিরুত্তাপ গলায় বলল ও, পুলিশ যখন আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না, তখন আমাকে কোথায় রাখা হবে কি হবে না, সে নিয়ে মিছিমিছি আমি মাথা ঘামাতে চাই না।

শোনো মারজা, হয়তো ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না, কিংবা বোঝবার চেষ্টাই করছো না। ঠিক আছে, আমি তোমাকে আরো বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি শোনো, সরকারী আবাসিক সংস্থা আর সংশোধক আশ্রমের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

সে যাইহোক না কেন, আমি মনে করি দুটোই সমান।

ভদ্রমহিলা সত্যি সত্যি এবার হতাশ হলেন। সেই হতাশার সুর তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে দেখা গেলো। তবে কি তুমি এখন আর তোমার ভাইটাকেও কাছে পেতে চাও না?

এবার বুঝি মারজার মনটা একটু নরম হলো। ওর চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল। ক্ষোভের সঙ্গে বলল, আমার চাওয়া না চাওয়াতে কি এসে যায় ওদের? আমি চাইলেই তো ওরা আমার ভাইকে আমার সঙ্গে থাকতে দেবে না! যদি দেয়, আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, আমি নিজে রোজগার করে ওকে খাওয়াবো, মানুষ করবো।

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন। না, আমার তা মনে হয় না। তাছাড়া তুমি এখনও অনেক ছোট, এই অল্প বয়সে কিই বা তুমি রোজগার করতে পারবে যে তোমার ভাইকে খাওয়াবে?

তাহলে ওরা আমাকে কোথায় পাঠাবে, এ সব ভেবে কি লাভ বলুন?

ওর এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই ভদ্রমহিলার, তাই নীরব থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ

বলে মনে করলেন তিনি।

মারজা তখন বুঝে গেছে, এরপর আলোচনার কিছু থাকতে পারে না। তাই ও উঠে দাঁড়ালো। তাহলে এবার কি আমি যেতে পারি?

হ্যাঁ, চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

আদালত প্রায় ফাঁকাই ছিল বলা যায়। মাত্র কয়েকজন দর্শক এদিক-ওদিক নিজেদের আরাম মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল।

কাঠগড়ার ওপর উঠতে যাওয়ার আগে অলস ভঙ্গিতে আদালতকক্ষের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল মারজা। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মুখ দেখে কিছুই বোঝবার উপায় ছিলো না। কেমন যেন নির্লিপ্ত, নির্বিকার, চিত্ত ওর ভয়-শূন্য। যদি কোনো অমঙ্গল নেমে আসে ওর জীবনে, আসুক তার জন্যে ভয় ও পাবে না, বরং সেই সত্যটাকে মেনে নিতে একটুও দ্বিধাবোধ করবে না।

আপন মনে পা ফেলছিল ও। এক সময় পাশ থেকে ও ওর হাতে কার যেন আলতো হাতের পরশ অনুভব করলো, সেই সঙ্গে ওর কানের কাছে তার ফিসফিসিয়ে ডাক শুনতে পেলো, মারজা!

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো মারজা। ওর চোখে গভীর বিস্ময়।

মাইকের ঠোঁটে তখন একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এর আগে তোমার সঙ্গে আমি অনেকবার দেখা করার চেষ্টা করেছি মারজা, কিন্তু পুলিশের লোকগুলো আমাকে কিছুতেই তোমার ধারে কাছে যেতে দেয়নি।

মাইকেলের কোনো কথাই এখন আর আকর্ষণ করে না ওকে। তাকে এড়িয়ে যেতে চায় এখন ও। আর ওর এখনকার সেই মনোভাবটা তাকে বোঝানোর জন্যেই বোধহয় তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে চোখ-মুখে নীরবতার কঠিন একটা মুখোশ এঁটে তেমনি ধীর গতিতে আবার চলতে শুরু করলো মারজা। ওরা তাকে বাধা দেয়নি, আসলে মারজাই ওদের বলে দিয়েছিল, কারোর সঙ্গে দেখা করতে চায় না ও। কিন্তু এসব কথা তাকে এখন আর বলে কোনে লাভ নেই, ভাবলো ও।

মাইকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটু এগিয়ে যেতেই সমাজকল্যান সংস্থার সেই ভদ্রমহিলাটি পিছন থেকে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটিকে দারুণ সুন্দর দেখতে তো, রীতিমতো সুপুরুষ। কে ও? তোমার বন্ধু!

আমি ওকে চিনি না। স্রেফ অস্বীকার করলো মারজা। এই প্রথম ওকে এখানে দেখলাম। এর আগে ওকে কখনো দেখেছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না।

তাই বুঝি। ভদ্রমহিলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ও ঠিক বলল কিনা, সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখার চেষ্টা করলেন। তবে তিনি তাঁর বিশ্লেষণের কথা প্রকাশ করলেন না, চেপে গেলেন। মারজাকে আসামীর কাঠগড়ায় পৌঁছে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে এলেন তিনি অতঃপর।

ওদিকে বিচারক তখন তাঁর আসনে নড়েচড়ে বসলেন। যেমন বিশ্রী দেখতে, তেমনি রুক্ষ তাঁর হাবভাব। চোখ দুটো তাঁর ঘোলাটে, রাত্রি জাগরণের ছাপ স্পষ্ট তাঁর চোখে-মুখে। ঘোলাটে চোখে মারজার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, শোনো খুকুমনি, তোমাকে এখানে বলে রাখি, কথাটা খুব কঠিন হলেও তোমাকে না শুনিয়ে পারছি না। কেন তোমাকে আমার এজলাসে হাজির করা হয়েছে জানো? হ্যাঁ, যে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো ঃ তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, একটা ধারালো ছুরি দিয়ে তুমি তোমার সৎবাবাকে আঘাত করেছো।

প্রতিবাদ করলো না মারজা, চুপ করে রইলো।

বিচারক তখন নকিবকে জিজ্ঞেস করলেন, মিস্টার রিচিক কি উপস্থিত আছেন এখানে?

সঙ্গে সঙ্গে হাঁক পড়লো নকিব, মিস্টার রিচিক হা-জি-র।

ডাক পেয়ে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো পিটার। সাদা ব্যান্ডেজে ঢাকা তার সারা মুখ। গলার আওয়াজ না শুনলে তাকে চিনতেই পারতো না মারজা।

'মিস্টার রিচিক,' পিটারের উদ্দেশে বললেন বিচারক, 'সেদিনকার প্রকৃত ঘটনা যদি আপনি আমাকে সংক্ষেপে বলেন...'

একবার আড়চোখে মারজাকে দেখে নিয়ে গলাটা পরিস্কার করে নিলো পিটার। তারপর বিচারকের দিকে ফিরে তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলতে শুরু করলো, হুজুর, কি বলবো, মেয়েটার স্বভাব চরিত্র মোটেও ভালো নয়, যাকে বলে একেবারে নষ্ট মেয়ে আর কি! কারোর কথাই শুনতো না। কাজ করতো একটা নাচঘরে, রাতে কোনদিনই বাড়ি ফিরতো না ও। আর যদি বা কখনো ফিরতো সে অনেক রাতে। ঘটনার দিন রাতে ও যখন বাড়ি ফিরলো, আমি ওকে স্পষ্ট জানিয়ে দিই, এভাবে রোজ রাত করে বাড়ি ফেরাটা মোটেই শোভনীয় নয়, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। ও আমার কথার কোন জবাব দেয়নি। মুখ গোমড়া করে ওর ঘরে চলে যায়। আমিও তখন শুতে চলে যাই। তার খানিক পরে আমি যখন অঘোরে ঘুমচ্ছিলাম তখন ও আমার ঘরে ঢুকে—দেখুন হুজুর আমার কি অবস্থা করেছে!

ওদিকে মারজা তখন মনে মনে ফুঁসছিল, রাগে ঘৃণায় ওর দেহটা থরথর করে কাঁপছিল। মার মুখ মনে পড়ে গেলো ওর। মার স্মৃতি যদি ওর প্রতিবাদের প্রতিবন্ধক হয়ে না উঠতো, তাহলে ও সোচ্চার হয়ে উঠে সবাইকে জানিয়ে দিতো সেদিনকার প্রকৃত ঘটনা কি। কিন্তু মা'র আত্মার শান্তিকে কোন মতেই বিঘ্নিত হতে দেবে না।

যাইহোক, ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ালো না, অতি সহজেই মিটে গেলো। ঘোলাটে চোখে মারজার দিকে তাকালেন বিচারক। 'তোমার বয়স কম, সেটা বিবেচনা করে আমরা তোমাকে রোজ গেইয়ারের সংশোধক আশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আঠারো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকতে হবে তোমাকে। আমাদের বিশ্বাস, এই সময়ের মধ্যে সেখানে থাকতে থাকতে তুমি নিজেকে সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

ভাবলেশহীন চোখে বিচারকের দিকে তাকিয়ে থাকে মারজা। যেন বিচারকের কোন কথাই কানে ঢুকছিল না ওর। হঠাৎ সমাজকল্যান সংস্থার ভদ্রমহিলার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলো ও। এবার যে তোমাকে যেতে হবে মারজা, এসো আমার সঙ্গে।

কোন কথা না বলে ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করলো মারজা।

ওদিকে ওর চলার পথে দাঁড়িয়েছিল মাইক। কাছে আসতেই ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলো। ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে পুলিশের গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করে চললো মাইক। মারজা তার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক ফিরেও তাকালো না। অবাক বিস্ময়ে ওর চলার পথে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

ব্রাঙ্কের একেবারে শেষ প্রান্তে রোজ গেইয়ারের আশ্রমটা। চারদিকে খোলা মেলা, একটা গ্রাম্য পবিবেশ বিরাজ করছিল সেখানে। এক সময় আশ্রমেরই একটি মেয়ে ওকে ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গেলো। লম্বা টানা একটা বারান্দা পেরিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের দরজা ঠেলে মারজাকে বলল সে, ভেতরে যাও, ডাক্তারবাবু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

এসে গেছো, বাইরে কেন ভেতরে এসো। নরম গলায় ওকে আহ্বান জানালো ডাক্তার। সৌম্য চেহারার একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার চেম্বার সংলগ্ন ছোট ঘরটা দেখিয়ে মারজাকে বলল, ওই ঘরে গিয়ে তোমার পোশাকটা খুলে ফেলো।

মারজা পোশাকমুক্ত হলে ডাক্তার নিপুণ হাতে ওকে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে পোশাক গায়ে চাপিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এলো মারজা। ওর হাতে প্রেসক্রিপসানটা তুলে দিয়ে ডাক্তার বললেন, এখানে ওষুধ লেখা আছে, গর্ভাবস্থায় এই ওষুধটা তোমাকে নিয়মিত খেয়ে যেতে হবে।

গর্ভাবস্থায়? চমকে ওঠে মারজা। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার মুখের দিকে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকালো ও। মারজার কথায় অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়, এ আপনি কি বলছেন ডাক্তারবাবু?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি মামনি। আন্তরিকভাবেই বললেন তিনি, এটাই নির্মম সত্য।

প্রেসক্রিপসানটা ওঁর হাত থেকে নিয়ে পাগলের মতো হা-হা করে হেসে উঠলো মারজা।

বিস্ময় ভরা চোখ দুটি ওর দিকে মেলে ধরে তেমনি মিস্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কি ব্যাপার, এতো হাসির কি আছে এতে?

মারজা নীরবে ওর দীর্ঘায়ত চোখদুটো তুলে তাকালো, পদ্মফুলের পাতায় জল টলটল করার মতো চোখদুটি থেকে অশ্রুর বাদল নামতে দেখা গেলো। কি জবাব দেবে ও ডাক্তারবাবুকে। না, না, নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল ও, ও ওর লজ্জার কথা কাউকে বলবে না, এ কথা কাউকে বলা যায় না! না, কাউকে না। একেবারে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। আবার অবিশ্বাসে দ্বিগুণ যন্ত্রণা! না, এ হতে পারে না!

❑ সরকার বনাম মারজা ফ্লাড ❑

রীতিমতো সুন্দরী প্রথম রাজসাক্ষী। এই মেয়েটির শপথবাক্য পাঠ করানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। দীর্ঘাঙ্গী, রোগাটে, ছিপছিপে চেহারা, মাথাটা

একরাশ কুচকুচে কালো চুলে ভর্তি। এমন কি তার চোখ দু'টোও কালো পিচের মতোন। আর কেমন যেন একটা উদ্ধত বেপরোয়া ভঙ্গি তার।

বিচারকের নির্দেশ পাওয়া মাত্র ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম, এগিয়ে গেলাম সেই প্রথম রাজসাক্ষীর দিকে, আমার অপেক্ষার ইতি ঘটলো তখনি। দূর থেকে মেয়েটিকে আগেই একবার দেখে নিয়েছিলাম, এবার একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আরও ভালো করে নিরীক্ষণ করে নিলাম। তারপর অতি সাবধানে জেরা করতে শুরু করলাম।

আপনার নাম?

রেই মারনে। আশ্চর্য অমন একটা অনিন্দ্যসুন্দর মুখের মেয়ের কণ্ঠস্বর এতো?

আমার পরবর্তী প্রশ্ন ঃ আপনার বয়স কতো মিস মারনে?

তেইশ।

আপনার জন্মস্থান?

ওহিওর চিলিকোথে।

তা নিউইয়র্কে কবে এলেন? জিজ্ঞেস করলাম

বছর দুয়েক তো হবেই।

মেয়েটির সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে তার সেই মিনমিনে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে গেছি। এবার তার চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করলাম, চিলিকোথে এলেন কেন? মানে কি করতেন সেখানে?

কেন থাকতুম। থাকার জন্যেই ওখানে আমার যাওয়া।

তার কথা শুনে আদালতকক্ষে একটা চাপা হাসির আওয়াজ উঠল। সেই হাসির রেশটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত স্বভাবতই আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। আমি কিন্তু ওখানে আপনার জীবিকা নির্বাহের খবরটাই জানতে চেয়েছি মিস মারনে।

দুঃখিত, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, লজ্জিত হয়ে এবার মেয়েটি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা দিলো, ওখানে শিক্ষকতা করতাম।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। বিশ্বাস হয় না, সে যে সত্যি সত্যি শিক্ষকতা করতো, ভাবাই যায় না। তবু আরো নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে জানতে চাইলাম, কোন্ ক্লাসে পড়াতেন?

একেবারে নিচের ক্লাসে। তার মুখে যেন একটা রেডিমেড উত্তর লেগেছিল। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আমাদের খুব ভালো লাগে।

তার কথা বলার ধরণ দেখে শেষ পর্যন্ত আমিও না হেসে থাকতে পারলাম না। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললাম, ভুল বুঝবেন না মিস মারনে, আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। তারপর হাসি থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এবার বলবেন, হঠাৎ নিউইয়র্কে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

অভিনেত্রী হওয়ার বাসনা নিয়ে। অধ্যাপক বার্গ ছিলেন ওই স্কুলের উঁচু ক্লাসের নাটকের শিক্ষক। তিনি নিজেও একজন নাট্যকার ছিলেন। আমার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর লেখা একটা নাটক,—"লার্ক ইন দ্য ভ্যালিতে" নায়িকার ভূমিকায় আমাকে দিয়ে অভিনয়

করিয়েছিলেন। সেই নাটকে আমার দুর্দান্ত অভিনয় দেখে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ওরকম একটা ছোট্ট শহরে পড়ে না থেকে নিউইয়র্কে চলে যেতে। তাঁর মতে আমি নাকি ইচ্ছে করলে মেরি এস্টোর মতো একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী হতে পারি। তাই থেকে যাই নিউ ইয়র্কে। কিন্তু নিউ ইয়র্কে তেমন কোনো সুবিধেই আমি করতে পারলাম না। কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। এমন কি অধ্যাপক বার্গের সুপারিশ করা চিঠিটাও কোনো কাজে লাগলো না।

তাহলে তখনি তো আপনার চিলিকোথে ফিরে যাওয়া উচিত ছিলো, তা করলেন না কেন?

তখন আমার আর ফেরার পথ ছিলো না। মৃদু হেসে মারনে তার বুকের কোণে লুকিয়ে রাখা অনেকদিনের পুঞ্জিভূত ব্যথাটা আড়াল করার চেষ্টা করলো। সেখানে ফিরে গেলে সবাই ধরে নিতো, আমি ব্যর্থ, আমি শেষ হয়ে গেছি।

তাই বুঝি! একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর রোজগারের জন্যে কোন্ পথ ধরলেন?

কিছুদিন ব্রডওয়ের একটা রেস্তোরাঁয় কাজ করি। সেখানে নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের যাতায়াত ছিলো, ভেবেছিলাম তাদের খুশি করতে পারলে আমার চিরদিনের স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু সেখানেও তেমন সুবিধে করতে পারলাম না। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার আমার উদ্দেশের কথা টের পেয়ে আমাকে তাড়িয়ে দেন সেখান থেকে। তারপর থেকে আবার চাকরীর চেষ্টা করতে থাকি। আমার বাড়ির একটি মেয়ে আমাকে পরামর্শ দেয় তখন, আমার যা চেহারা তাতে আমি মডেলিং-এর কাজ যোগাড় করে নিতে পারি অনায়াসে। তাছাড়া শুনেছিলাম, অনেক মেয়ে মডেলিং করতে করতে অভিনেত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সেই মেয়েটিই আমাকে পার্ক এভিনিউ মডেল সংস্থার ঠিকানা দেয়। তার নির্দেশ মতো সেখানে যাই কাজের খোঁজে।

সেখানে আপনি কার সঙ্গে দেখা করেন?

মিস ফ্লাডের সঙ্গে।

ওই যে ওখানে যিনি বসে রয়েছেন, ওঁর সঙ্গে কি?

হুঁ। মাথা নাড়লো মারনে।

তারপর? কাজ পেলেন সেখানে?

হ্যাঁ, উনি আমাকে চোদ্দতম সড়কে পশমের পোশাক তৈরীর একটা দোকানে পাঠালেন। সেই প্রথম আমার মডেলের কাজে নামা। সেখানে আমি সবার খুব পছন্দসই হয়ে গেলাম। সপ্তাহে তিনদিন কাজ করতে হতো আমাকে সেখানে।

আর কোথাও মডেলের কাজ করেননি?

না, সেখানেই আমার প্রথম ও শেষ কাজ।

গোড়ার দিকে মডেলিং-এর কাজে তো তেমন রোজগার হয় না। শুনেছি, নাটক লেখার পেছনে আপনার অনেক খরচ হয়ে যেতো। তাতেই কি আপনি আপনার প্রয়োজনীয় টাকাটা উপার্জন করতেন মিস মারনে?

তখন আমি প্রচুর ডেট পেতে শুরু করি।

তা ডেট বলতে কি বোঝাতে চাইছেন মিস মারনে? আমার কথায় কোনোরকম কৌতূহল ছিলো না, নেহাতই এটা ছিলো আমার মামুলি প্রশ্ন।

পুরুষের সঙ্গে আমাদের মেলামেশাটাকেই আমরা ডেট বলে চিহ্নিত করতাম।

আমরা মানে?

মানে যে সব মেয়েরা সেখানে কাজ করতাম।

বেশ, এই ডেটের ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলতেন। মানে কি করে পুরুষদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হতো, আর কোথাই বা তাদের সঙ্গে মিলিত হতেন, আর কি ভাবেই বা প্রথম এই ডেটের কথা আপনাদের মনে আসে, এই আর কি।

আমার তখন টাকার বড়ই অভাব। তাই একদিন মিস ফ্লাডের কাছে অতিরিক্ত উপায়ের পথের সন্ধান করে দিতে বলায় উনি আমাকে ওঁর ঘরে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে উনি আমাকে বলেন ওঁর কিছু পরিচিত মক্কেল তাদের অবসর বিনোদনের জন্যে সঙ্গিনী চায়। তারা খুবই ভদ্র এবং মেয়েদের ভালো পাবিশ্রমিকই দিয়ে থাকে। আমি চাইলে সেই রকম মক্কেলের সন্ধান করে দিতে পারেন তিনি।

আপনি জবাবে কি বললেন তখন?

আমি রাজি।

আদালতে আবার হাসির রোল পড়ে গেলো, তাদের দোষ দেওয়া যায় না, আমারও হাসি পাচ্ছিল মেয়েটির কথা শুনে, কোনো রকমে সেই হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলাম, তা কি করলেন তারপর?

সেই রাতেই মিস ফ্লাড আমার জন্যে একটা ডেটের ব্যবস্থা করে দিলেন। দারুণ ভালো আর আমুদে ছিলেন সেই ভদ্রলোক যাঁর কাছে মিস ফ্লাড আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আর ওঁর মনটাও ছিলো খুবই উদার। চলে আসবার সময় আমার হাতে একটা দশ ডলারের নোট গুঁজে দিয়ে গদগদ হয়ে উনি বলেন, আমি যেন মিস ফ্লাডকে বলি আমার সঙ্গ পেয়ে উনি খুবই খুশি হয়েছেন।

আমি তখন মেয়েটির চোখে স্থির দৃষ্টি ফেলে জানতে চাই, সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে আপনি কি শুধু মদ খেয়েছিলেন, নাকি আরও কিছু...

আমার সেই অদ্ভুত প্রশ্নটা শুনে সেই প্রথম ওর চোখ-মুখের রঙ বদলে গিয়ে একটু আরক্তিম হয়ে যেতে দেখলাম।

হ্যাঁ, মদ পান করা ছাড়াও আমরা দুবার মিলিত হয়েছিলাম।

মিলিত হয়েছিলেন বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন যদি একটু পরিস্কার করে বলেন মিস মারনে?

মিলিত মানে সহবাস।

সহবাস মানে আপনি আপনাদের দৈহিক মিলনের কথা বলছেন, এই তো?

হ্যাঁ ঠিক তাই।

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সেদিন আপনাদের দুটি দেহ মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, সেই মিলনে আমরা দুজনেই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

আবার একটা চাপা হাসির রোল পড়ে গেলো আদালতকক্ষে। তাদের হাসি থামলে আমি তখন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, তারপর?

তারপর ঘরে ফিরে এসে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ি। ক্লান্তিতে দেহটা তখন ভীষণ অবশ লাগলেও ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত সুখ অনুভূত হচ্ছিল। আর সেই সুখটাই বোধহয় আমাকে ঘুমের দেশে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

এবার সম্মিলিত হাসির শব্দটা যেন আদালতকক্ষে হঠাৎ বোমা ফাটার মতো মনে হলো। মারনে যে ভাবে ওর সুখানুভূতির বর্ণনা দিলো তাতে আমাকেও মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপতে হলো কোনোরকমে। বিচারপতি অসন্তুষ্ট হয়ে হাতুড়ি পিটলেন ঘন ঘন। তারপর হাসির শব্দটা মিলিয়ে যেতেই আমি আবার মুখর হলাম। আচ্ছা মিস মারনে, ঠিক কবে থেকে আপনি পার্ক এভিনিউ মডেল সংস্থায় পাকাপাকি ভাবে এই ডেট নেওয়ার কাজে যোগ দিলেন?

পরের দিনই। আমার জন্যে অমন সুন্দর একটা ডেটের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে প্রথমেই মিস ফ্লাডকে ধন্যবাদ জানালাম। উনি তখন জানতে চাইলেন, ভবিষ্যতে এ ধরণের ডেট নিতে আর ইচ্ছে আছে কিনা। আমি তখন ওঁকে বলি, কালকের মতো ভদ্রলোক পেলে আমি একপায়ে খাড়া। তারপরেই উনি জানতে চাইলেন গতকাল রাতে আমরা ক'বার মিলিত হয়েছি। আমি ওঁকে সংখ্যাটা বলতেই উনি তখন ওঁর ডেস্কের ড্রয়ার টেনে একটা পঞ্চাশ ডলারের নোট বার করে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি সেটা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বললাম, না থাক ভদ্রলোক তো আমাকে সকালেই দশ ডলার দিয়েছেন, আবার কেন? জবাবে উনি বলেন ওটা ছিলো তোমার টিপস, আর এটা তোমার সত্যিকারের পারিশ্রমিক, বুঝলে?

আচ্ছা মিস মারনে, এর পরেও কি আপনি বুঝতে পারেননি, এইভাবে মিস ফ্লাড আপনাকে পতিতাবৃত্তির কাজে ঠেলে দিচ্ছিলেন?

না, কেনই বা তা মনে হবে? সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে মারনে। ভদ্রলোককে আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। আমি রাজি না হলে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে উনি কখনোই আমাকে ওঁর শয্যাসঙ্গিনী করতে পারতেন না। আর আমিও সেটা বরদাস্ত করতাম না।

আবার হাসির শব্দ উঠলো, হাসি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো আমাকে।

আচ্ছা মিস মারনে, মিস ফ্লাডের সংস্পর্শে আসার আগে আপনি কি কখনো টাকা রোজগারের জন্য এভাবে কাউকে দেহদান করেছেন?

না, কখ্খনো না। ঘন ঘন মাথা নেড়ে মেয়েটি অস্বীকার করে ওঠে।

আর মিস ফ্লাড ডেটের ব্যবস্থা করে দেওয়া ছাড়া আপনি নিজের থেকে অন্য কোথাও কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন কখনো?

না, আমাকে কি বেশ্যা বলে মনে হয়? টাকা রোজগারের জন্যে অমন একটা জঘন্য পেশা আমি বেছে নিতে পারি না। জোরালো প্রতিবাদ করে উঠলো মেয়েটি।

বেশ, ধন্যবাদ মিস মারনে, আমার আর কিছু জানার নেই।

সাক্ষীব কাঠগোড়া থেকে সরে এসে আমি হেনরি ভিটোর টেবিলের সামনে একটু সময়ের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে মারজা। ওর আয়ত চোখের স্বচ্ছ তারাদুটো যেন গর্বে ঝলমল করছে। আর সেই গর্ব যে আমারি জন্যে, ভাবতে গিয়ে বিস্ময়বোধ করি। আমার মনের ভাবটা ওকে বুঝতে দেওয়ার আগেই ওর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। তারপর ভিটোর দিকে ফিরে বললাম, ইচ্ছে করলে আপনি এখন সাক্ষীকে জেরা করতে পারেন।

নিজের সামনে ফিরে এসে দেখি ভিটো তখন ধীরে ধীরে ওঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উনি যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এবং যে ভঙ্গিমায় উনি সাক্ষীর কাঠগোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন, তাতেই স্পষ্ট বোঝা গেলো, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে ভরপুর উনি এখন।

কোনো রকম ভূমিকা না করেই মেয়েটির নাম ধরে হাঁক দিলেন উনি, মিস মারনে!

হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন? সম্ভবত ওঁর জোরালো হাঁক শুনেই একটু চমকে উঠে থাকবে মারনে।

একটু আগে আমার সম্মানীয় বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, "লার্ক ইন দ্য ভ্যালি" নাটকটা অধ্যাপক বার্গের লেখা, তাই কি?

হুঁ।

আপনি আবার এও বলেছেন, অধ্যাপকের মতে আপনার মতো প্রতিভাসম্পন্না মেয়ের ছোট্ট শহর চিলিকোথে পড়ে না থেকে আপনার প্রতিভা বিকাশের জন্যে নিউ ইয়র্কে চলে যাওয়া উচিত, আর ওঁর ইচ্ছে মতোই আপনি নিউইয়র্কে চলে আসেন, এই তো?

হুঁ।

তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি, অধ্যাপক বার্গে আপনার নাট্য-প্রতিভার কথা মনে রেখেই আপনাকে ওই রকম একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাই না?

চুপ করে থাকে মেয়েটি। ভিটো তাড়া দিয়ে ওঠেন, চুপ করে থাকবেন না, বলুন কথাটা ঠিক কিনা?

অস্পষ্ট গলায় কোনোরকমে মারনে জবাব দেয়, হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হয়।

আচ্ছা এবার বলুন তো সেই নাটকটা কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনিত হয়েছিল?

দেখুন ঠিক কোনো রঙ্গমঞ্চে নয়, অসহায় দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকালো মারনে। ভাবখানা এই যে, এই কেসের সঙ্গে এইসব তথ্য জানার কি প্রয়োজন আছে। আমিও ঠিক বুঝতে পারি না, এই সব অবান্তর প্রশ্নের মধ্যে থেকে কি খুঁজতে চাইছেন ভিটো। আমতা আমতা করে মারনে তখন বলে, নাটকটা অভিনীত হয়েছিল ক্লাবের হলে ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলনে।

বেশ, সেই নাটকে একমাত্র নারী চরিত্রে আপনিই তো অভিনয় করেছিলেন, এই তো?

হুঁ।

আপনার ভূমিকা কি ছিলো বলুন তো?

এক চাষীর মেয়ে।

নাটকের কাহিনীটা আপনার মনে আছে?

সেই চাষীর মেয়ে আর তিনজন চাষার কাহিনী নিয়ে নাটক। একই খামারে কাজ করতো তারা। একদিন হলো কি সেই খামারে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন চাষা মতলব আঁটতে শুরু করলো রাত গভীর হলে তারা সেই চাষী মেয়েটিকে ধর্ষন করবে। নাটকের প্রায় সব দৃশ্যেই আমার একটা কথাও বলতে হয়নি। সেটা এক রকম মুকাভিনয়ের নাটক। জানেন, অধ্যাপক বার্গ ছিলেন স্তানিস্লাভস্কি নাট্য-ধারার একজন সত্যিকারের অনুগামী।

স্তানিস্লাভস্কি? চোখ বুজে একটু সময় কি যেন ভাবলেন ভিটো। তারপর মনে পড়ে গেছে, এমনি ভাব দেখিয়ে তিনি আবার বলে উঠলেন, ওহো সেই রাশিয়ান ভদ্রলোক, যিনি কথা নয় শুধু হাতমুখ নেড়ে আঙ্গিক ফুটিয়ে তোলার কাজে বিশ্বাস করতেন, তাই না? তার মানে আমি ধরে নিতে পারি যে, সারা নাটকে অভিনয় কেবল অঙ্গভঙ্গি দিয়েই ফুটিয়ে তোলার কাজ ছিলো?

হ্যাঁ ঠিক তাই! জোর দিয়ে বললো মারনে।

এবার ভিটোকে সম্পূর্ণ অন্য এক মূর্তিতে প্রকাশ পেতে দেখা গেলো। তাঁর কথায় বিদ্রূপ ধ্বনি শোনা গেলো। তাহলে সেই নাটকের অভিনয় চলার সময় কি অশ্লীলতার অভিযোগে হঠাৎ স্টেজের ভেতরে পুলিশের আবির্ভাব ঘটে এবং আপনাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়? আর এই একই কারণে আপনাদের দুজনের স্কুলের চাকরী চলে যায়, এ কথা সত্যি তো?

মারনের মুখ থেকে সব কথা তখন উধাও, ও তখন ভেতরে ভেতরে ভীষণ কাঁপছিল। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ধমক দিয়ে উঠলেন ভিটো, চুপ করে থাকবেন না মিস মারনে, আমি যা জিজ্ঞেস করলাম উত্তর দিন। মনে হলো, নিমেষে মারনের মুখের সমস্ত রক্ত যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নেওয়া হয়েছে। ওর ফ্যাকাশে মুখটা ভিটোর দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে অস্ফুটে কোনোরকমে বললো, হ্যাঁ, সত্যি।

ঠিক আছে, এখন আপনি যেতে পারেন। তারপর জুরিদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন চোখে তাকালেন এমন ভাবে যে, কথা না বললেও তাদের বুঝতে অসুবিধে হলো না তিনি কি বলতে চাইছেন,—হ্যাঁ, এতো সব জানার পরেও কি করে মেয়েটিকে বিশ্বাস করা যায়?

উনি ওঁর জায়গায় ফিরে গেলেন অতঃপর।

আমার পাশেই বসেছিল জোল এবং অ্যালেক, এবার তারা নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় আলোচনা শুরু করতেই আমার সারা শরীর রাগে জ্বলে উঠলো। একটু পরেই আমার দ্বিতীয় সাক্ষীর ডাক পড়বে, তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। এরই মাঝে ওদের আলোচনার সারাংশ আমার কানে এলো, যাই বলো তুমি, ভিটো কিন্তু মেয়েটার পেট থেকে সব গোপন কথা টেনে বার করে ছেড়েছে—

তুমিও কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছো, মিস ফ্লাড সম্পর্কে মাইকের বক্তব্য এখনো বাতিল হয়ে যায়নি। বরং লক্ষ্য করেছো, ওর কথাগুলো খাঁটি সত্যি জেনেই বুদ্ধিমানের মতো ভিটো ওর বক্তব্যের কোনো চ্যালেঞ্জ করেনি?

আরে ওটাই তো বড় স্ট্র্যাটেজি।

চোখ বুজে ওদের তর্ক শুনছিলাম। এক সময় চোখ মেলে তাকাতেই দেখলাম সাক্ষীর কাঠগোড়া থেকে শপথবাক্য পাঠ করার পর দু নম্বর রাজসাক্ষী মেয়েটি আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রয়েছে। আদালতের নির্দেশ পেয়ে আমি এবার ধীরে ধীরে মেয়েটিকে জেরা করার জন্যে এগিয়ে গেলাম তার দিকে।

হাসপাতালের সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকতে যাবো, কর্তব্যরত নার্স ছুটে এসে আমার পথ আগলে থেকে বলে উঠলো, যাবেন না, উনি এখন ঘুমচ্ছেন।

ফিরে আসতে গিয়ে ওঁর কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে দাঁড়ালাম, উনি তখন বলছিলেন, কে বললে, আমি ঘুমচ্ছি, জেগে আছি। হাত নেড়ে উনি আমাকে ওঁর কাছে ডাকলেন, এসো মাইক। আমি ওর বিছানার পাশে গিয়ে একটা টুলে বসতেই ক্লান্ত গলায় উনি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, এবার তোমার কথা বলো মাইক। ওঁর চোখে-মুখে একটা অদম্য কৌতূহল, তা আজকের সওয়াল কি রকম হলো?

ভালোই। আজ আমরা চারজন সাক্ষীকে জেরা করেছি। ভিটো ওঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় নিজেকে জাহির করতেই ব্যস্ত ছিলেন, কাজের কাজ কিছু করতে পারেননি। আমার বিশ্বাস, কেসটা মোটামুটি আমাদের অনুকূলেই যাবে।

জানি, ম্লান হেসে বৃদ্ধ বললেন, তোমার বলার আগেই আমার সব শোনা হয়ে গেছে।

ভুল বলেননি উনি। ওঁর বিছানার পাশে একটা টুলের ওপর রাখা টেলিফোনের দিকে চোখ পড়তেই বুঝলাম, খবরটা পেয়েছেন উনি ওই পথেই।

কিন্তু মাইক, ভিটো কি চায় এখনো পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর হাবভাব দেখে তো আমার মনে হচ্ছে, সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে মেয়েটিকে ও।

সেই মুহূর্তে আমার মুখে কোনো জবাব এলো না। মনে মনে নিজেকে আমি গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত তখন। কারণ এ কথা ঠিক যে, ইচ্ছে করলে আজই আমি ভিটোর চেয়ে আরো বেশী জোরালো জেরার স্বাক্ষর রাখতে পারতাম। মনে হয়েছে আমাদের এই মামলার সব কিছু ব্যাপারেই মিস্টার ভিটো কেমন যেন উপেক্ষার ভঙ্গিতে দেখছিলেন, এবং সব ব্যাপারেই আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। আর তাই কি আমার জবাবগুলোর একটা দ্বিধার ভাব ফুটে উঠেছিল?

আমার এতো সব কৈফিয়ত বৃদ্ধ শুনলেন বলে তো মনে হলো না। উল্টে ওঁর মধ্যে একটা সতর্ক ভাব লক্ষ্য করলাম, ওঁর পরবর্তী প্রশ্নের মধ্যে বেশ একটা সংযত-ভাব দেখতে পেলাম। ফ্লাডকে কেমন দেখলে?

সুন্দর, খুব সুন্দর।

ওর প্রতি তোমার সেই আগের মনোভাব রয়েছে তো?

ওঁর শেষ প্রশ্নের উত্তরটা আমি কিন্তু দিতে পারলাম না।

উনি তখন নিজের থেকেই বললেন, মাইক, সব না হলেও কিছু অন্তত বলো।

কি বলবো বলুন, আমার যে কিছুই জানা নেই। তবে এটুকু বুঝতে পারি, ওর দিকে তাকালেই বুকের ভেতরটা আমার হাহাকার করে ওঠে, সব হারানোর বেদনায় মুচড়ে ওঠে,

স্থির থাকতে পারি না তখন আর। তখন মনে হয় ও যেন এক অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ শক্তি নিয়ে আমাকে খেলাচ্ছে, আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে, যে পরীক্ষায় আমার হারজিতের ওপর নির্ভর করছে ওকে ফিরে আবার চাওয়া-না-পাওয়ার।

হ্যাঁ, আমি তা জানি মাইক। ওর সঙ্গে কথা বলে আমিও দেখেছি, আশ্চর্য একটা শক্তি আর সাহসে ভরপুর ও, আজও ওর মনের জোর অটুট রয়েছে। তাই আমার কি মনে হয় জানো মাইক, যদি ওকে ঠিক পথে চালানো যেতো, মানে ও যদি একটু সামলে চলে নিজের থেকে, ভবিষ্যতে ও যে জীবনে বিরাট একটা কিছু করতে পারতো তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

হয়তো সেই সুযোগ আসেনি ওর কাছে।

বৃদ্ধর ঠোঁটে আবার সেই চতুর হাসিটা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। সুযোগ ও অনেক পেয়েছে। তোমার আমার কিংবা অন্য কারোর বলা-না-বলা কিংবা ভাবা-না-ভাবাতে ওর কোনো ভ্রূক্ষেপ হয় না। কারণ ও বেশ ভালো করেই জানে যে, ওর পাওয়া বহু সুযোগই হেলায় নষ্ট করেছে, তুমি বোঝো না মাইক?

ওঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমি তখন চুপ করে অনেক, অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনার কথা ভাবছিলাম। মনে পড়ে রোজ গেইয়ারের উদ্ধারশ্রম থেকে ওর ছাড়া পাবার দিন আমি ওকে আনতে যাই। ও কিন্তু আমার সঙ্গে আসেনি, কেমন নির্বিকার ভাবে আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে একাই চলে গিয়েছিল। আমাকে এড়িয়ে ওভাবে ওর চলে যাওয়ার ধরণ দেখেই বুঝেছিলাম, কিছু একটা হয়েছে ওর। সম্পূর্ণ বদলে গেছে ও। ওর গভীর চোখের দৃষ্টি, ওর বাড়বাড়ন্ত শরীরের দিকে না তাকানো পর্যন্ত ওর সেই পরিবর্তনের মানে আমি বুঝতে পারিনি। ভালো করে ওর দিকে তাকাতে গিয়েই সেই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম, ওর বয়স বেড়েছে, কৈশোর পেরিয়ে পরিপূর্ণ যৌবনের পথে পা রেখেছে ও, আমার সব ধারণা ওলট-পালট করে দিয়ে ও এখন পূর্ণ যুবতী হয়ে উঠেছে। এখন ওর মনে অনেক দ্বিধা, অনেক সংকোচ, অনেক ভয়, অনেক হিসেব করে পুরুষদের সঙ্গে যে এই বয়সে মেলামেশা করতে হয় এই বোধটা তখন ওর মনে জেগে গেছে আগের মতো উচ্ছল, বেপরোয়া স্বভাবের মেয়ে আর ও নেই এখন। তাই বোধহয় সঙ্গত কারণেই আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে চলে গিয়েছিল ও সেদিন।

ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই আমি গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু একাই আমাকে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে কোনো রকমে ক্লান্ত অবসন্ন পা দুটো টেনে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসেছিলাম। বাবা মা তখন ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। ওঁদের দিকে সরাসরি তাকাতে পারিনি, তবে অনুভবে বেশ টের পাচ্ছিলাম, আমার মুখের ওপরে ওঁদের দৃষ্টি পড়েছিল, সেই দৃষ্টিতে অনেক প্রশ্ন জড়িয়েছিল। আমি ওঁদের সব প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দিলাম কান্নাভেজা গলায়, ও এলো না, আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে একা চলে গেলো।

বাবা স্থানুর মতো বসে রইলেন, আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা হয়তো খুঁজে পাননি তখন। কিন্তু মা আবার তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার হাত তাঁর মুঠোর

মধ্যে নিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়তো এটাই ছিলো, ভালোই হলো।

না মা, ও কথা বলো না! আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়, আর্তনাদ করে ওঠার মতো করে বললাম, ওর চলে যাওয়াটা কখনোই ভালো হতে পারে না মা, অন্তত আমার কাছে তো বটেই। শেষ দিকে আমার কান্নাটা বুঝি গলায় আটকে গেলো। কোনো রকমে জোর করে মুখ খুললাম। তুমি তো জানো না মা, আমি জানি, আমাকে এখন ওর খুবই প্রয়োজন, আমি ছাড়া নিজের মতো করে অন্য কেউ ওর ভালো মন্দের কথা ভাববে না, ভাবতে পারে না। এসব কথা ও নিজেও জানে। কিন্তু তা সত্বেও মনে হয়, ওর জীবনে এমন একটা কিছু ঘটেছে যা ও মুখ ফুটে আমাকে বলতে পারেনি, নিজেকে ও ভাবে আমার কাছ থেকে গুটিয়ে নিয়ে দূরে সরে গেলো। কিন্তু আমার কাছে ওর আমার পথে বাধাটাই বা কি তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। আর সেটা না জানা পর্যন্ত মন যে আমার শান্ত হতে পারবে না মা। এর কি জ্বালা কি করে বোঝাই তোমাকে বলো!

হয়তো আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা উপলব্ধি করেই বাবা এবার উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বলে উঠলেন, একটু ধৈর্য ধরে তুমি বোসো মাইক, দেখি ওকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা! বলেই আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন উনি।

আর তারপরেই বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো অশ্রু আমার দু'চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়তে থাকলো। কাঁদতে কাঁদতেই বললাম, মা তুমি আমাকে বলে দাও, এখন আমি কি করবো, কি আমার করা উচিত?

কেমন সহজে নিরুত্তাপ গলায় মা বললেন, ওকে তোমার এখন ভুলে যাওয়াই উচিত মাইক, আমি আগেও বলেছি আবার এখনো বলছি, ও মেয়ে তোমার জন্যে জন্মায়নি।

তুমি যত সহজে কথাটা বলতে পারলে বাস্তবে তা সম্ভব নয় মা। আমি আর তোমার আগের সেই খোকাটি আর নেই, এখন বয়স আমার একুশ বছর হতে চললো, আর এই বয়সটা উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই মা, আমি ওকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি, পাপ বলো, পূণ্য বলো, ও যে এখন আমার সব কিছুই মা!

তোমার যতোই বয়স হোক না কেন বাছা, তুমি এখনো আগের মতোই ছেলেমানুষ আছো, ভালোবাসা কাকে বলে তুমি কিছুই জানো না...কথাটা শেষ করতে পারলেন না উনি, কান্নায় ভেঙে পড়লেন শিশুর মতো।

তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ওঁর হাত দুটো শক্ত করে ধরে কাতর স্বরে বলে উঠলাম, তুমিও কাঁদছো মা, কান্না থামাও, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না মা।

কান্নাভেজা চোখদুটি তুলে আমার দিকে এমন অদ্ভুত ভাবে তাকালেন মা, মনে হলো যেন এক পসলা বৃষ্টির পরে গনগনে রোদ্দুর ঝরে পড়ছে ওঁর দুচোখ দিয়ে, সেই রোদ্দুরের তাপ আগুনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। মার সেই আগুন-ঝরা দৃষ্টি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। তুমি, তুমি আমাকে কান্না থামাতে বলছো? তারপরেই চিৎকার করে উঠলেন মা, ওঁর মনের জমানো সব রাগ অভিমান, অভিযোগ ঝরে পড়তে থাকলো

ওঁর প্রতিটি কথার মধ্যে। আ-আমি ওই মেয়েকে ঘৃণা করি। এর জন্যে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি বলছি, যে মেয়ে আমার ছেলের জীবনকে এভাবে নষ্ট করে দেয়, তাকে আমি নরকের কীটের চেয়েও বেশী ঘৃণা করি।

কিন্তু মা, ওর দিকটাও তো একবার ভেবে দেখা উচিত তোমার। হয়তো এছাড়া ওর করার মতো কিছু ছিলোনা।

চুপ করো! ওই জঘন্য মেয়েটার হয়ে তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না। আমি যা বলছি ঠিকই বলেছি। হিংস্র বাঘিনীর মতো আবার ফুঁসে উঠলেন উনি। ইচ্ছে করলে কি না করতে পারতো ও। মনে রেখো, নিজের ইচ্ছেতেই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে ও আজ।

মার সেই উপলব্ধি অনেক, অনেকদিন আগের ঘটনা, আর আজ মিস্টার জ্যাকসনের মুখে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে পেলাম যেন। অবাক হয়ে ভাবি, তবু কেন এঁদের যুক্তি আমি বুঝতে পারছি না। নিজের মনকে প্রবোধ দিই, অনেক আগেই আমি যে ধরে নিয়েছি এঁরা কেউই আমার মনের কথাটা বোঝবার চেষ্টা করে দেখেননি কখনো, তাই আজও পারবেন না। ওর সম্পর্কে আমার যা ধারণা ছিলো, সেটা থাকলে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মা যতোই বলুন না কেন, ওকে আমি ভুলতে পারবো না কোনোদিনও!

আগামীকাল কার কার সাক্ষী নিচ্ছো মাইক? মিস্টার জ্যাকসনের প্রশ্ন শুনে সম্বিত ফিরে পেলাম।

জড়তা কাটিয়ে উঠে নামের তালিকাটা বলে গেলাম ধীরে ধীরে।

মনে মনে উনি হিসেব করে বললেন, তাহলে মামলাটা শেষ করতে তোমার এখনো সপ্তাহ দুয়েক সময় লাগবে, কি বলো?

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

তাহলে সেই সময় আমি এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবো। প্রয়োজনে তোমাকে সাহায্যও করতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠলাম। কারণ ওঁকে আমি বেশ ভালোভাবেই চিনি। আমার মা আর ওঁর চিন্তাধারা একই রকমের। তাই প্রতিবাদ করে উঠলাম। না, আপনার কোনো রকম সাহায্য আমি নিতে পারি না মিঃ জ্যাকসন। আপনি তো জানেন, এ ব্যাপারে শুরুতেই আমাদের একটা চুক্তি হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ হাসি আর চাপতে পারলেন না। হ্যাঁ তাই তো, চুক্তির কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

তারপরেই বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। ওকে কেন্দ্র করে আমাদের মা ও ছেলের মধ্যে মান-অভিমানের পালা শেষ হতেই আমি বিছানায় আশ্রয় নিই। চোখ বুঁজতেই আপনা থেকেই কেমন মারজার মুখটা একটু একটু করে ভেসে উঠতে থাকে আমার চোখের সামনে। ওর স্বচ্ছ বাদামী চোখের সেই অদ্ভুত চাহনিটা আমি যে কিছুতেই আমার চোখের আড়াল

করতে পারছি না।

বুঝতে পারি না একটা ভয়ঙ্কর প্রত্যাশা নিয়ে আজ সারাক্ষণ আমার দিকে কেনই বা তাকিয়ে বসেছিল। আমার জন্যে এখনো ওর কিসের প্রত্যাশা, কিসের এতো গর্ব? ও কি বোঝে না, আমি ওকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি তলে তলে? নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হয় এখন আমার। নিজের মনেই বলি, ওকি জানে আমি ওকে ভালোবাসি আজও, আজও ওকে কামনা করি। যতোই আইনি ব্যবস্থায় ওর শাস্তি আমি কামনা করে থাকি না কেন, এ কথা সত্যি যে, আমি ওকে ভুলতে পারবো না কখনো, ভালোবেসে যাবো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ও আমার স্বপ্নচারিণী। এ ক'বছর যখন ওকে দেখিনি, তখন আমার জীবনটা কেমন যেন মরুভূমির মতো মনে হচ্ছিল। ও ওর ভালোবাসার বারি-বরষণে শীতল করেছিল আমার তৃষিত জীবন। কখন ওর আর আমার মিলন বেলায় পাখীরা আমার কানে কানে বলে যেতো আমি ওকে যেন বলি গাও তুমি একটি গানের কলি। সে গান যেন হয় আমার চির-সুখের, বলতে যেন পারি ঠিকানা পেয়েছি আমি তোমার মনের। আর সেই মনের খেয়ায় ভেসে যেতে ইচ্ছে হয় দূর থেকে দূরে যেখানে থাকবে না তোমাকে হারানোর কোনো ভয়! কিন্তু আমার এই সব ভাবনা, আমার মনের গোপন কথাগুলো ওর জানার কথা নয়। আমি তো এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে দূরে অন্য কোথাও সরে যেতে পারতাম। তাছাড়া আমার বদলে এই মামলায় অন্য কেউ প্রতিনিধিত্বও করতে পারতো।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার আমার মনে হলো, আমার মনের কথা অজানা থাকার কথা নয় ওর। এর একটাই কারণ হলো, আমাদের দুজনের মধ্যে এমন একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমরা ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জানার কথা নয়। তাই এরপর যতোই আমি আমার মন থেকে ওর ভাবনাটা মুছে ফেলার চেষ্টা করতে যাই ততোই যেন আরো বেশী করে ও আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। অথচ ওর মনের অনেক খবরই অজানা থেকে গেছে আমার আজও। ওর জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে, যা আমার গোচরে আসেনি কখনো।

রোজ গেইয়ারের আশ্রম থেকে ছাড়া পাওয়া এবং পুলিশের খাতায় ওর প্রথম নাম ওঠার মাঝে এই চার মাস সময়ের ব্যবধানের কোনো খবরই আমি রাখিনি। আমার ধারণা, নিশ্চয়ই এই সময়ে নিজেকে নিয়ে যথেচ্ছভাবে ছেলেখেলা করেছে, ওর যৌবনকে নিয়ে বিশ্রীভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। কোথায় কার কাছে গেছে, সে সব খবর আমি কিছুই রাখিনি। তবে আমি এখন নিঃসংকোচে বলতে পারি, তখন আমাকে ওর খুবই প্রয়োজন ছিলো। তখন আমি ওর পাশে থাকলে আজ আর এমন দুরাবস্থায় পড়তে হতো না ওকে।

কিন্তু ওর জন্যে আমি কিছুই করতে পারিনি, অকপটে আজ স্বীকার করছি, আমি ব্যর্থ, সম্পূর্ণ ব্যর্থ আমি আজ।

❑ মারজা থেকে মেরি ❑

ওর উজ্জ্বল সোনালী চুলের বাহার রোদ্দুরে যেন চিকচিক করছে। শীতের হিমেল হাওয়ায় ওর পীনোন্নত বুক, সরু কোমর, হেঁটে চলার তালে তালে ছন্দময় নিতম্ব এবং সুডৌল পা'দুটোয় যেন একটা মিষ্টি পরশ লেগেছে। পরণে কালো কোট, রোগাটে চেহারার মেয়েটিকে হেলে দুলে এগিয়ে আসতে দেখে বৃদ্ধ দারোয়ান টুল থেকে উঠে দাঁড়ায় ওকে স্বাগত জানানর জন্যে। মেয়েটি ওর পরিচিত। একগাল হেসে কেমন আপনজনের মতো বললো সে, তুমি কি বাড়ি ফিরে চললে মারজা?

বাড়ি? চোখে খুশির হিল্লোল তুলে মারজা পাল্টা প্রশ্ন করে তাকায়, বাড়ি আমার কোথায় যে যাবো? এখানে আমার আগের বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখানে আমাকে সব কিছুই পাল্টাতে হয়েছে, দেখোনা এমন কি আমার নামটা পর্যন্ত। আগে ছিলাম মারজা, আর এখন আমি মেরি, বুঝলে?

সব জান্তার ভঙ্গিমায় বৃদ্ধ দারোয়ান হাসলো, বুঝলাম, কিন্তু আমার কাছে সেই আগের মারজাই রয়েছো তুমি। তুমি তোমার নাম থেকে শুরু করে সব কিছু পাল্টে ফেলতে পারো, কিন্তু তোমার শিরা-উপশিরায় যে পোলিশ রক্তের ধারা বয়ে চলেছে, পারবে তা পাল্টাতে? কখ্খনো নয়!

বন্ধু, তুমি তো জানো না, আমার এখন এখানে টিকে থাকাটাই একটা বড় সমস্যা। আর টিকে থাকতে হলে আজ আমাকে অনেক কিছুই যে পাল্টাতে হবে।

হ্যাঁ, তা তো বটেই। বৃদ্ধ তার ফোকলা দাঁতে হাসি ফুটিয়ে বলে, কিন্তু তার জন্যে নিজেকে পাল্টে নয়, টিকে থাকার উপায় তো অনেক আছে। যাইহোক, সে তো পরের ভাবনা। তা এখন তুমি যাবে কোথায় শুনি?

এখনি তা তো বলতে পারি না, উদাস স্বরে মারজা বলে, তবে প্রথমে আমি কোনো হোটেলে গিয়ে উঠতে চাই। ঘন্টা দুই মনের সুখে স্নান সেরে, এই নোংরা পোশাকটা দূর করবো। তারপর কোথাও পেট ভরে খেয়ে পরদিন দুপুর পর্যন্ত একটানা ঘুমবো।

তারপর?

তারপর আর কি, কাজের ধান্দায় বেরোবো।

সে তো খুব ভালো কথা মারজা, জ্ঞান-বৃদ্ধের মতো সে ওকে পরামর্শ দেয়, এই চেষ্টাটা আগে করলে কতো ভালোই না হতো, তাই তো?

ঠিক আছে, এর পর থেকে তোমার এই উপদেশটা মনে রাখার চেষ্টা করবো। চটপট বৃদ্ধ দারোয়ানের তোবড়ানো গালে একটা চুমু খেয়ে হাসতে হাসতে বললো, এবার তাহলে চলি বন্ধু, বিদায়।

বিদায় মারজা, বিদায়। কথাটা বলতে গিয়ে বৃদ্ধের গলার স্বরটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, তার চোখ মুখে বিষাদের ছায়া পড়তে দেখা গেলো। ওদিকে মারজা ঠিক তার উল্টো, ময়ূরের মতো পেখম মেলা আনন্দে ওর সারা বুকে কাঁপন উঠলো। এখন ও মুক্ত, সম্পূর্ণ মুক্ত। একবারের জন্যেও ও ওর পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে

তাকাবে না। এখন শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলা, সে পথে যতো কাঁটা থাকুক কিংবা বাঁধা আসুক না কেন, এগিয়ে তাকে যেতেই হবে, পথ চলাতেই তার আনন্দ নতুন পথে চলার মাধুর্যে ও ওর অতীতের যতো গ্লানি, ক্লান্তি সব ধুয়ে-মুছে ফেলতে চায়। তাই ও ওর হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে পথ চলার নতুন এক ছন্দময় গতি বাড়িয়ে তুলে এগিয়ে চলতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে বাধাপ্রাপ্ত হলো মারজা। পেছন থেকে কে যেন ওর ব্যাগটা টেনে ধরেছিলো। তারপরেই একটা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর ওর কানে ভেসে এলো, এ তুমি কি করছো, না দেখে অন্ধের মতো কেউ এভাবে পথ চলে? হঠাৎ যদি একটা গাড়ি এসে পড়তো তোমার সামনে?

কে ওর পথের বাধা হলো পেছন ফিরে দেখতে হলো না, বক্তার গলার স্বরটা চিনতে অসুবিধে হলো না মেরির। অস্বীকার করবে না ও, চলে আসার সময় মনে মনে তাকে আশা করছিল। তাই ধীরে-সুস্থে মুখ্ তুলে তাকালো ও, ততক্ষণে ওর সেই পরিচিত মানুষটি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওর চোখের ভাষা কিন্তু পড়তে পারলো না মাইক। একটা ক্ষীণ হাসির রেখা সে তার ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলে বললো, তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছি মারজা।

তার কথার কোনো উত্তর দেয় না ও।

মাইক আবার নিজের থেকেই বললো, কোন্ সকাল থেকে আমি যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো ও, না, তা হয় না।

কেন হয় না মারজা, আমি যে—

সাবধানে মাইকের হাত থেকে ও ওর ব্যাগটা ছাড়িয়ে নিয়ে স্পষ্ট গলায় বললো, মিথ্যে তুমি একটা নষ্ট মেয়ের পেছনে ঘুরছো মাইক। তুমি ফিরে যাও।

কেন?

এই দেড় বছরে তোমার জানা মারজার অনেক কিছুই পাল্টে গেছে, এমন কি তার নামটা পর্যন্ত।

তোমার এই পাল্টানোর ব্যাপারে, আমার কোনো মাথা ব্যাথা নেই, আর আমার কাছে তুমি এখনো মারজা নামেই পরিচিত। তুমি আমার একটা চিঠিরও জবাব দাওনি জানি, তবু তা সত্বেও আমি তোমাকে কেন নিয়ে যেতে এসেছি জানো?

জানি না, আর শুনতেও চাই না।

না, তোমাকে শুনতেই হবে মারজা। ওর আঘাতে তার বুকটা থেকে থেকে কেঁপে উঠলেও সে তার মনটাকে শক্ত করে বললো, মারজা আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি বলে। আর তুমিও তো বলেছিলে তুমি আমাকে ভালোবাসো।

তখন আমার বয়স অল্প ছিলো। সেই কম বয়সে ভালোমন্দ কিছুই বুঝতাম না।

অল্প বয়স ছিলো তোমার? মাইক রাগে ফুঁসে উঠলো। আর এখন তোমার বয়স কতই বেড়েছে শুনি? মাত্র দেড় বছরে এতো বদলে গেছো তুমি?

হ্যাঁ মাইক, ঠিক তাই। অবাক চোখে মাইকের দিকে তাকিয়ে মেরি বলে, এই দেড়

বছর আমার কাছে দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের সামিল। অবাক হচ্ছো, কিন্তু সত্যিই এই দেড় বছরে আমি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছি।

সে তো আমিও বড় হয়েছি, বাচ্ছা ছেলের মতো অভিমানে ঠোঁট ফোলায় মাইক। কিন্তু তাই বলে তোমার ব্যাপারে আমার ভাবনা কি একটুও পাল্টেছে বলে তুমি মনে কর তবে? না, একটুও নয়। বরং বেড়েছে, আর আমায় এই ভাবনার শেষ নেই কখনো মারজা। কেন আমি পাল্টাইনি জানো না তুমি?

না, আমি জানি না, অথবা এখন আমার জানার ইচ্ছেটাও নেই, মরে গেছে কবেই।

আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বলো তো মারজা? আদ্র গলায় বললো মাইক?

বিষন্ন গলায় জবাব দেয় মারজা। যা হবার হয়ে গেছে। আমার সব শেষ হয়ে গেছে মাইক, আমি আগের জীবনে কোন মতেই আর ফিরে যেতে পারি না।

ওর হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে মাইক ভিজে গলায় বলে উঠলো, কেন পারো না মারজা! সে এমন কি ঘনটন যা আমাদের আগের দিনগুলো ফিরে যাওয়ার পথে অন্তরায় হতে পারে?

চুপ করে রইলো মেরি। ওর দীর্ঘায়ত চোখে চোখ রাখতেই আঁতকে উঠলো মাইক। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, বলো মারজা, বলো কি সেই ঘটনা?

শুনবে সেই ঘটনার কথা? জানি না সেই কথা শুনলে তুমি সহ্য করতে পারবে কিনা, তবু তোমার জানতে যখন এতোই ইচ্ছে তাহলে শোন, এখানে থাকার সময়ে আমি মা হয়েছিলাম, ধীরে ধীরে নিস্পৃহ গলায় বললো ও, তবে আমার ছেলে না মেয়ে হয়েছিল তা বলতে পারবো না। কারণ তার জন্ম দেবার আগেই আমি তার অনত্র থাকার একটা ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। এখন বুঝলে তো এর থেকে ভয়ঙ্কর ঘটনা আর কি হতে পারে আমার জীবনে?

মাইকের হাতের মুঠোটা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে পরে, অবশেষ ওর হাত থেকে খসে পড়ে তার হাতটা। তার বুকের রক্ত চলকে ওঠে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে কপালে। বুঝিবা একটু কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করে, ছেলেই হোক, কিংবা মেয়েই হোক, সেটা কার ছিল, কে তার বাপ, রস?

মারজার শান্ত চোখদুটো আগের চেয়ে বেশী দীর্ঘায়ত হলো। না, সে কেন আমার বাচ্চার বাপ হতে যাবে, সে তখন এখানেই ছিলো না।

তার মানে অন্য কোন পুরুষ? একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরে উঠলো মাইক।

মারজা তখন নিশ্চল পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। কথাহারা এক অসহায় নারীর প্রতিচ্ছবিহীন দীর্ঘায়ত চোখে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মাইকের দিকে ও।

তার বেদনা-বিদুর নীল চোখদুটি দিয়ে তখন ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। দুঃখ করে সে বলে, কিন্তু একি করে সম্ভব, তুমি, তুমি যে শুধু আমাকেই ভালোবাসো মারজা, পারো তা অস্বীকার করতে?

কিন্তু মাইক, তোমাকে ভালোবাসা ছাড়াও আমার তো আরও অনেক কিছু থাকতে পারে, কেন তুমি বুঝছো না।

মিথ্যে, কথা, আমি বিশ্বাস করি না। তার সব বেদনা অশ্রু হয়ে ঝড়ে পড়লো। কেন তুমি আমার কাছে এ সব লুকোতে গেলে? তোমার শুধু একটা কথায়, কিংবা তোমার চোখের ইশারায় আমি তোমার জন্যে সব কিছুই করতে পারতাম। আর একবার বলে দেখো, এখনো আমি তোমার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারি। আমাকে একটু সুযোগ দাও!

এখন আর তা হয় না মাইক। হাত নেড়ে একটি চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে মেরি বললো, আমি দুঃখিত, চলি এবার। ট্যাক্সিতে উঠে দরজা বন্ধ করে দেয় ও। ট্যাক্সিটা বেশ খানিকক্ষণ চলে আসার পর পেছন দিকে তাকাতে মেরি দেখে মাইক তখনো তাকিয়ে রয়েছে, চোখ ভর্তি জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে। মেরিও কান্না আর চাপতে পারলো না। অশ্রু নয়নে নিজের মনে বলে, মাইক, কোনদিন তুমি জানতে পারবে না, আমার বুকের মধ্যে কি দুঃসহ যন্ত্রণার আগুণ ধিকি-ধিকি জ্বলে চলেছে, সে আগুণ নেভার নয়, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে। এ ভাবেই বুকের জ্বালা নিয়ে তোমাকে ভালোবেসে যাবো চিরদিন।

কোথায় যাবেন ম্যাডাম?

চালকের ডাক শুনে মুখ ফেরায় মারজা। তারপর ধীরে ধীরে বললো ও ব্রডওয়ের হোটেল অ্যাস্টোরে।

অভিজাত হোটেল অ্যাস্টোরে থাকতে হলে দিনে সাড়ে তিন ডলার, মেরির পক্ষে একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে। এখানে থাকতে গেলে ওর অবশিষ্ট একশো ডলার কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তা হোক, অভিজাত হোটেলে থাকার স্বপ্ন ও দেখে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। সেই সুযোগটা হাতের কাছে পেয়ে তাই হাতছাড়া করতে চাইলো না ও। তাই দেরি না করে হোটেলের রেজিস্ট্রারে দ্রুত লিখে দেয় ও, মেরি ফ্লাড, ইয়ার্ক ভিল, নিউ ইয়র্ক, ২০শে নভেম্বর, ১৯৩৭। ওর ঘর নির্দিষ্ট হলো বারোশো চার।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে নরম গদি আঁটা বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরি। নিবিড় সুখে চোখ বুঁজে আসে ওর। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে ও, যেন পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে স্বপ্নের দেশে। এক সময়ে সেই ভালোলাগা আমেজ নিয়ে মোজেক করা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। সুন্দর বাথরুম, আয়েস করে স্নান করতে গিয়ে ও ভাবলো, এরই নাম জীবন।

ঘরে ফিরে এসে মেরি ওর হাত ব্যাগটা বিছানার ওপর উপুড় করে দেয়। আর একবার ডলারের নোটগুলো গুনলো ও, একশো আঠারো ডলার। এ টাকাটা ওখানকার লন্ড্রিতে কাজ করে রোজগার করেছে ও। দীর্ঘদিনের স্মৃতির ঝাঁপিটা তখনকার মতো বন্ধ করে বর্তমানে ফিরে আসার চেষ্টা করে মেরি। তারপর টাকাটা ব্যাগে পুরে বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে।

ব্রডওয়ের উঁচুতলায় দাঁড়িয়ে ঘুরে-ফিরে চারদিকে দৃষ্টি ফেলে দেখতে থাকে ও। রাস্তায় এখন অস্বাভাবিক ভিড়, মধ্যহ্নভোজের সময় এখন। ব্যস্ত পায়ে সবাই নেমে পড়েছে রাস্তায়।

এখন কেউ কারোর দিকে তাকিয়ে দেখার অবসর নেই। সেই ভিড়ের মধ্যে নিজেকেও সামিল করে তুললো মেরি। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে ফেলে মেরি এখন ভাবছে, সকালে বৃদ্ধ দারোয়ানকে ভুল বলে অন্যায় করেছে, কারণ ওর এখন মনে হচ্ছে ও যেন নিজের বাড়িতেই ফিরে এসেছে।

হোটেলে ফিরে এসে বাথরুমে ঢুকে আবার স্নান করার লোভটা সামলাতে পারলো না মেরি। এখানকার সাবানটার মধ্যে একটা আলাদা সুবাস আছে, কেমন নরম আর স্নিগ্ধ, সাবানের স্পর্শে নিমেষে শরীরটা কেমন তরতাজা হয়ে যায়।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে চোখের পাতা যেন আপনা থেকেই বুঁজে আসছিল আবেশে। তাড়াতাড়ি তাক থেকে একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে বালিশের ওপর বিছিয়ে দেয় ভাঁজ করে। এ ভাবে শুয়ে থাকলে বালিশ ভিজবে না, অথচ একটু আগের স্নানের স্নিগ্ধ আমেজটা অনুভব করা যায় অনেকক্ষণ ধরে। আর এতো সুখ যেন এর আগে কখনো উপভোগ করেনি ও। এখানে ওকে বিরক্ত করবার কেউ নেই। কারোর বলারও কিছু নেই। এখানকার সব কিছুই অন্যরকম, ভিন্ন স্বাদের। একেবারে অন্য রকমের এক উষ্ণ আমেজে ওর চোখের পাতাদুটো আঠার মতো লেগে যায়। ও তখন ওর ফেলে আসা দিনগুলোর স্বপ্ন দেখে এক এক করে।

বিশেষ করে বাচ্চাটা জন্মবার সময়ের টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা স্বপ্ন হলেও সেগুলো তো সত্যিই, ভুলবে কি করে ও?

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে যায় ওর তলপেটে প্রচন্ড ব্যাথা শুরু হওয়ায়। নার্স এসে হাসপাতালে নিয়ে যায় ওকে। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানিয়ে দিলেন, ওকে লেবাররুমে নিয়ে গিয়ে তৈরী করে দিতে, বেশী দেরী নেই। ডাক্তারের নির্দেশে নার্স প্রসবের সব সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে থাকে। তীব্র যন্ত্রণায় ওর তখন জ্ঞান হারানোর মত অবস্থা, এরই মাঝে কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মনে নেই ওর। আর জ্ঞান যখন ফিরে আসে তখন সব যন্ত্রণায় অবসান ঘটে গেছে। শেষ পর্যন্ত, দীর্ঘ দশ মাসের লজ্জাকর গ্লানি আর অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মেরির মনে হয়েছিল যেন একটা মস্ত বড় বোঝা নেমে গেছে ওর মাথার ওপর থেকে। জ্ঞান ফিরে পাবার পর এক সময় কার যেন পায়ের শব্দে মেরি ওর জগদ্দল পাথরের মতো ভারি চোখের পাতাদুটো মেলে তাকাতেই দেখে আশ্রমের পরিচারিকা মিসেস ফস্টার ওর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মাথা-ভর্তি সাদা চুল, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, আর হাতে একটা কাগজ।

কেমন আছো মেরি, ভালো তো? নরম গলায় শুধালেন তিনি।

হ্যাঁ। ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ও।

তুমি কিন্তু তোমার বাচ্চাটার সম্পর্কে বললেনা কিছু। কারণ ওর বাবার পরিচয়টা পেলে—?

মিসেস ফস্টার তাঁর কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না মেরির হিমায়তে চোখের দিকে তাকিয়ে। ওর এই নিস্পৃহ চোখের দৃষ্টির সামনে হঠাৎ কেমন বাক্যহারা হয়ে পড়েন উনি। তখন মেরির মুখে ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। কিই বা বলতে পারে

ও। ওর বলার যা কিছু ছিলো সব যে ফুরিয়ে গেছে। তাই ওকে এখন নীরব থাকতে হলো।

ওর বাবার কাছ থেকে ওর ভরণ-পোষণের খরচ আদায় করতাম। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে এবার উনি ওঁর ইচ্ছেটা প্রকাশই করে ফেললেন।

কিন্তু আমি তো কখনো ওসব কিছু ভাবিনি মিসেস ফস্টার, আর আদৌ ভাববার দরকার মনে করি না। একটা যন্ত্রণা বুকে চেপে রাখতে গিয়ে ওর গলার স্বরটা কেমন ভারি হয়ে উঠলো।

তাহলে তুমি এখন তোমার ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করবে? মিসেস ফস্টার অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন, কাউকে দত্তক দেওয়াটাই কি তুমি স্থির করে ফেলেছো?

সঙ্গে সঙ্গে একটু দ্বিধা না করে নীরবে মাথা নেড়ে ওঁর কথায় সায় দেয় মেরি।

কিন্তু এর ফলাফল তোমার নিশ্চয়ই অজানা নয় মেরি। ভালো কথায় উনি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। এর অর্থ দাঁড়াবে বাচ্চাটার ওপর থেকে তোমার সমস্ত অধিকার তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তুমি তোমার বাচ্চাটার ওপর থেকে অধিকার ছেড়ে দেওয়ার পর সে কোথায় কার কাছে থাকবে কোন খবরই তুমি পাবে না তখন। তুমি যে বাচ্চাটার জন্ম দিয়েছিলে। তুমি যে তার মা ছিলে কোনদিন, এ সব কথা তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে যেতে হবে।

তবু ওঁর কোন কথারই জবাব কিংবা প্রতিবাদ না দেওয়াতে উনি এবার একটু রূঢ়স্বরেই বলেন, সন্তানের জন্ম তুমি দিতে পারো, কিন্তু সে যে কি জিনিষ সেটা উপলব্ধি করার মানসিকতা নেই তোমার মতো মেয়ের।

মেরি তখন ভয়ঙ্কর ক্লান্ত, তাই একটু বিরক্ত হয়েই ও বলে, সেরকম মানসিকতা থাকলে আপনি কি ওকে আমার কাছে রাখতে দেবেন আপনার আশ্রমে?

আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করতে না পারলেও অন্য আরো অনেক জায়গা আছে। এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে তো যেতে পারো।

আমি যে এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই ওকে আমার কাছে রাখার অধিকার পাবো, তার প্রতিশ্রুতি আপনি কি দিতে পারেন?

না, তা অবশ্য এখনি দিতে পারি না, একটু দ্বিধাগ্রস্থ গলায় উনি বললেন, সবার আগে তোমাকে দেখতে হবে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করে তুমি ওর সব ভার নিতে পারবে কিনা।

আমার সেই সময়কার বিচার কে করবে জানতে পারি?

আদালত।

তার মানে আদালতের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ওকে আমি কাছে পাচ্ছি না, ওকে অনাথ আশ্রমে থাকতে হবে, এই তো?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আর কেউ যদি ওকে পোষ্য নেয় তার কাছেই আশ্রয় পাবে চিরদিনের মতো।

হ্যাঁ, সেটাই তো নিয়ম।

খুবই ভালো কথা, আপনি তাহলে সেই ব্যবস্থাই করুন। দেখুন কেউ যেন ওকে দত্তক নেয়, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

তোমার বাচ্চাটা কি সুন্দরই না হয়েছে, মিসেস ফস্টার ওকে মনে করিয়ে দেন কি ভেবে যেন, এরপরেও কি তুমি —

আবার সেই নিস্পৃহ চোখের দৃষ্টি ওর। এ সব কথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই মিসেস ফস্টার। ওর রোগাটে মুখের ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠে একটা অব্যক্ত বেদনায়, দীর্ঘায়ত চোখের কোণে জল চিক্ চিক্ করে উঠছিল। আমার আর বলার কিছুই নেই, এখন আপনি যে ভাবে পারেন ওকে আমার চোখের আড়াল করে দেবার ব্যবস্থা করুন।

মেরি, লক্ষ্মী মা আমার কথা শোনো, এভাবে নিজের বাচ্চাটাকে হেলায় ছেড়ে দিও না। এই বলে উনি ওর কপালের ওপর ওঁর একটা হাত রেখেছিলেন, যে হাতের স্পর্শ ঠিক ওব মার মতো স্নেহভরা বলে মনে হয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল উনি কথা না বললেও ওঁর আঙুলগুলো যেন ফিসফিসিয়ে সান্তনার বানী শোনাচ্ছিল ওকে। তারপর এক সময় ও নিজেই ভারাক্রান্ত গলায় বলে উঠলো, বাচ্ছাটা এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আলো দেখবার জন্যে বেরিয়ে আসার সময় ওর ছটফটানিতে যে তীব্র যন্ত্রণা আমি পেয়েছি, ওর বাবা আমাকে তার চেয়ে আরও বেশি যন্ত্রণা দিয়েছে আমাকে, যা অতি নির্মম, অসহনীয় বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। সে যন্ত্রণা ভোলা যায় না, ভুলতে পারবো না আমি কোনদিনও!

মেরির শেষ স্বীকারোক্তি শোনার পর মিসেস ফস্টারের মনে হয়েছিল, সব যেন জলের মতো পরিস্কার হয়ে গেছে। উনি তখন বেশ ভালো করেই বুঝে গেছেন, কেন যে মেয়েটি তার বুকের মধ্যে এতোদিন নিঃশব্দে ওর যন্ত্রণা বয়ে বেরিয়েছে। সেই যন্ত্রণায়, বেদনায় কাতর হয়ে ওঠা ওঁর দুচোখের কোণায় মেঘের মতো জল ঝড়ে পড়ে দুগাল বেয়ে। মেরিও কাঁদছিল তখন। তাই ওকে সান্তনা দিতে ধীরে ধীরে উনি বললেন, ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে মতোই ব্যবস্থা করবো।

গোয়েন্দা দ প্তরের মিস্টাইগান ভদ্রলোকের ব্যবহার ওঁর চেহারার মতোই সুন্দর। সুন্দর সুঠাম দেহ। ওঁর চেম্বারে ঢুকতেই উনি নিজে থেকে দাঁড়িয়ে ওকে ওর ডেস্কের উল্টোদিকের একটি চেয়ারে বসতে বললেন। স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন উনি। এক নজরে ওকে দেখেই মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ওর সম্পর্কে, এ ধরণের মেয়ের জন্ম বিপদ ঘটানোর জন্যেই। কিন্তু মেয়েরা সাধারণত যে কারণে বিপদ ঘটিয়ে থাকে, সেই উগ্রতা কিংবা অশোভনতার চিহ্ন ওঁর মধ্যে নেই। বরং আকর্ষন করার মতো ওর উজ্জল একরাশ সোনালী চুল যা ওর একেবারে নিজস্ব, ওর সুন্দর মুখ, ওর আয়ত চোখের চাহনি, ওর কথা বলার অদ্ভুত ভঙ্গিমা, এবং ওর সারা দেহের অবয়ব ওযে একজন নারী সেকথাটা যেন বার বার মনে করিয়ে দেয়, একান্ত ভাবেই পুরুষের জন্যে সাজানো নৈবেদ্য হিসেবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

কার্ডটার ওপর চকিত একবার চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে ভেতর ভেতর ভীষণ বিস্মিত

হলেন উনি। মেরি ফ্লাড, এ নামে উনি পরিচিত হতে চান না ওর সঙ্গে। তাই ওর নাম না ধরে উনি আর একবার আড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এখানকার ঠিকানা কি মিস ফ্লাড?

হোটেল অ্যাস্টোর, ব্রডওয়ে।

তা ওখানকার খরচ তো অনেক।

তা হোক, এরকম জীবন তো আমি চেয়েছিলাম।

কাজের জোগাড় কিছু হলো?

না। মাথা নাড়লো মেরি। সবে দু'দিন হলো বেরিয়েছি, চাকরির সন্ধান করার মতো সময় করে উঠতে পারিনি এখনো পর্যন্ত।

আজকের দিনে কাজ পাওয়াটা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়, তাই মনে হয়, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চাকরির খোঁজে আপনার বেরিয়ে পড়া উচিত, তা নয় কি?

যখন খুশি চেষ্টা করলেই পেয়ে যাব আশাকরি।

তা পাবেন হয়তো, তবে বেশী দেরি করলে যদি আপনার সঞ্চিত টাকা ফুরিয়ে যায়?

না, ঈশ্বরের কৃপায় সে রকম অবস্থায় যেন আমায় পড়তে না হয়। মেরির কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা ঔদাসিন্যের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ভাবতে লাগলেন, তা ঠিক, এ ধরণের মেয়েদের টাকার কখনো অভাব হয় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, একবার যদি ও শুধু হাঁ করে, টাকা দেওয়ার জন্যে হয়তো অনেকেই এগিয়ে আসবে, কিন্তু আসল বিপদ ঠিক তখনি ঘনিয়ে আসতে বাধ্য হবে ওর জীবনে। মেরির ভাবভঙ্গি দেখে ওঁর আবার এও মনে হলো, ও-ই যেন পুলিশের বড়কর্তা, আর ওর ডাকে উনি এসেছেন হাজিরা দিতে এখানে। মেরির অহঙ্কারি মনোভাবটা একেবারে পছন্দ হলো না ওর। তাই বিরক্ত হয়েই ওর নীরবতা ভঙ্গ করতে মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলেন উনি, মিস ফ্লাড, আমাদের নিয়ম কানুণগুলি নিশ্চয়ই আপনার কাছে পরিস্কার করা হয়েছে?

তেমনি চুপ করে থেকে শুধু মাথা নাড়লো ও।

ঠিক আছে, আর একবার আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়াটা বোধহয় ভালো। হ্যাঁ, প্রতিমাসে একবার করে আমাদের এখানে হাজিরা দিয়ে যেতে হবে আপনাকে। এ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ আছে এমন কোন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না। অন্য কোন ঠিকানায় চলে গেলে, এই ধরুন অন্য কোথায় চাকরি পেলে, নতুন ঠিকানাটা আমাদের জানাতে ভুলবেন না। পুলিশের বিনা অনুমতিতে অন্য কোন রাজ্যে যাবেন না। আপনার কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র রাখবেন না। ওর ঠোঁটে একটা অশুভ ধরনের হাসি ফুটে উঠতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক, কি ব্যাপার আমার কথায় হাসছেন যে আপনি?

ঠোঁটের ভাঁজে ভাঁজে তেমনি চোরা হাসিটি জিইয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো ও চেয়ার ছেড়ে, কাঁধ থেকে ওর কোটটা চেয়ারের ওপর পড়ে গেল। মনে হলো সেটা ইচ্ছাকৃতই তবে অসাবধানবশত নয়। আর তখুনি মনে হলো ওর গায়ে ওই কোটটা ছাড়া এক চিলতে

সুতোও ছিলো না। তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই ওর। তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠলো ও, এ সব কথা আমায় নতুন করে শোনানোর কি প্রয়োজন আছে?

ওর এমন ঔদ্ধত্ব দেখে রাগে ওঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু কিছুই যে করার নেই সে কথা উনি বেশ ভালো করেই জানেন। তাই ওঁর এখন মনে হচ্ছে, যে মেয়ে এমন রূপ আর উগ্র স্বভাব নিয়ে জন্মেছে, তাকে কোন আইনের বলে ঠেকানো যাবে না। তাই উনি নিস্পৃহ গলায় বললেন, আপনি শুনুন আর নাই শুনুন, আপনার ভালোর জন্যে বলা মিস ফ্লাড।

এ কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ লেফটেনান্ট। এই বলে ও আবার চেয়ারে বসে পড়ে কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলো।

উনি আবার আগের মতো ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, আপনার কি ধরনের চাকরির প্রয়োজন নিস ফ্লাড? বলুন, সেই মতো আপনার কাজের একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কেন, আপনার মতে আমার কি ধরনের কাজ পাওয়া উচিত জানা আছে নাকি? মেরির কথায় তাচ্ছিল্যের সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়।

হ্যাঁ, এই ধরুন কোনো বাড়ির পরিচারিকা কিংবা দোকানের কর্মীর চাকরী?

এ চাকরীতে যা মাইনে পাবো তাতে আমার পোষাবে না। আমার এখানকার থাকার ঠিকানা তো শুনলেন, এ টাকায় সেখানে থাকা যাবে না।

রাগে ফুঁসে উঠলেন উনি। সবাই তো আর হোটেল অ্যাস্টেরে থাকার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মায় নি?

এখানে থাকার মধ্যেই তো আমি জীবন খুঁজে পেয়েছি লেফটেনান্ট। ওর চোখের কোণে সেই অবজ্ঞার হাসিটা আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। জীবনের অনেকটা সময় তো চরম দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে এলাম। এবার একটু সুখের মুখ দেখতে দোষ কি লেফটেনান্ট?

কিন্তু চাইলেই কি সবাই সব সময় তা পায়? বিদ্রুপের সুরে উনি বললেন। তাছাড়া অত টাকা কে বা দেবে বলুন?

মেরি জবাব দেয় না।

নিশ্চয়ই আপনার দেহ বেচে নয়? কোনরকম মুখে আগল না দিয়ে নিজে থেকেই উনি কটাক্ষ করলেন।

মেরির আয়তচোখের তারাদুটো বড় হলো। কেন, মেয়েদের দেহ বুঝি অনেক বেশি টাকায় কেনা-বেচা হয়?

এতো সব যখন জানার ইচ্ছে, দেখছি সত্যি আপনি কোন বিপদে পড়তেই উন্মুখ। ভয় দেখিয়ে উনি আরও বললেন, মনে রাখবেন মিস ফ্লাড, এখন আপনি আগের মতো আর ছোটটি নন। এরপর কোন বিপদ ঘটলে আর কোন উদ্ধার আশ্রমে নয়, সোজা কয়েদখানায় আপনাকে পাঠানো ছাড়া অন্য কোন পথ আমাদের সামনে খোলা থাকবে না। তখন বুঝতে পারবেন কতো ধানে কত চাল।

এ সব কথা বলছেন কেন? প্রতিবাদ করে উঠলো মেরি। আমি কি এখনি সেরকম

কোন অন্যায় কাজ করেছি!

না, হয়তো এখন করেন নি, তবে সেরকম কাজ করবেন না, যার ফলে আপনাকে কষ্ট পেতে হয়। তারপর কি ভেবে উনি বললেন, ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন। আর আমার নির্দেশগুলো মনে রাখবেন।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে তাকালো মেরি, ওর চোখে আগের ধূর্তমি-ভরা চাহনি। আর আপনাকেও মনে করিয়ে দিচ্ছি লেফটেনান্ট, যদি কোন সন্ধ্যাবেলায় আপনার কোন কিছু ভাল না লাগে, এমন কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গ ভালো না লাগলে, নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ বলে মনে হলে সোজা আমার কাছে চলে আসবেন, আমি আপনাকে সঙ্গ দিয়ে আপনার একাকিত্ব ঘুঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো, কেমন?

অনেক কিছুই বলার ছিল ভদ্রলোকের মেরির কথার জবাবে। কিন্তু তখন রাগে উত্তেজনায় ওর মুখ চোখ এমন লাল হয়ে উঠেছিল যে, একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারলেন না। শুধু নীরবে ওর গমনপথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। যাবার আগে বলে গেলো ও তেমনি রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে, আর ঠিকানাতো জানেন, লেফটানান্ট, তবু লিখে রাখুন, হোটেল অ্যাস্টোর, বারোশো চার নম্বর ঘর। নিচে রিসেপশানিস্টকে জিজ্ঞেস করলে সে আপনাকে আমার ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দেবে।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে একসময় গ্রাহকযন্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে উনি বলে উঠলেন, জোকার মার্টিনের লাইনটা একটু দিন। খানিক পরেই সাড়া পেয়ে উনি বললেন, মিস্টার মার্টিন? দেখুন চুয়ান্নতম জাতীয় সড়কের থানা থেকে আমি লেফটানান্ট ইগান বলছি। হ্যাঁ, যে মেয়েটির খোঁজ আপনি করেছেন, এই মাত্র সে আমার চেম্বার থেকে চলে গেলো। তবে নিজে ওর নাম বলেছে, মেরি ফ্লাড, আপনার পরিচিত মারজা ফ্লাড তার নাম নয়। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিস্টার মার্টিন এ সে মেয়েই বটে, নাম ভিন্ন হলেও সেই একই মেয়ে, সেই উজ্জ্বল সোনালী চুল, সেই সুন্দর মুখ, রূপ উপছে পড়া রূপের হাট বসেছে যেন ওর দেহের প্রতিটি অঙ্গে। তবে একটা কথা বলে রাখি আপনাকে, পৃথিবীতে একমাত্র ভগবান ছাড়া অন্য আর কাউকে ভয় করে না ও। একটু সাবধানে ওর সঙ্গে আবার মেলামেশা করবেন। যেন বিপদে না জড়িয়ে পড়তে হয় আপনাকে। আপনি আমার পরিচিত বলেই এই ভাবে সাবধান করিয়ে দেওয়া। আপনার জন্যে কিছু করতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। আচ্ছা এবার রাখছি ফোনটা, ধন্যবাদ মিস্টার মার্টিন।

ওদিকে মিস্টার মার্টিন জোকার গ্রাহকযন্ত্রটা নামিয়ে রেখে একটা চুরুট ধরিয়ে একটা সুখ টান দেয়। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তেই সেটা রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে যেন ভাবতে থাকে আজ সে পরিতৃপ্ত। একটা বিরাট রমরমা ব্যবসার মালিক সে। ব্যবসাটা যতই পার্ক এভিনিউর দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ততোই তার মনে পড়ছে তার সুযোগ্য সহকারী রস ড্রেগোর কথা। এই পার্ক এভিনিউ অঞ্চলের বাসিন্দা সে। ছেলেবেলা থেকেই তাকে দেখে আসছে, দারুণ বেপরোয়া এবং ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখতে যে কোন বয়সের মেয়ে তার প্রেমে না পড়ে থাকতে পারবে না। আর সেও এক পাকা

জুয়াড়ি, বাজি ধরতে ওস্তাদ। তার এই উগ্র স্বভাবের জন্যে আজ সে তার বাড়ি থেকে বিতাড়িত। এই সুযোগের পুরোপুরি সদব্যবহার করেছে জোকার তাকে তার কাছে টেনে নিয়ে। আজ দু মাস হলো সে তার কাজে যোগ দিয়েছে। তার পেছনে এ-পর্যন্ত যতো খরচ সে করেছে, রস তার কাজের বিনিময় দ্বিগুন টাকা পাইয়ে দিয়েছে তাকে। এটি হলো তার প্লাস পয়েন্ট।

তবে একটা ব্যাপার সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে তাকে, ভাবলো জোকার মার্টিন। ছেলেটা যেমন বেপরোয়া, তেমনি উচ্চভিলাসী, তার আকাঙ্ক্ষা যেন আকাশ-ছোঁয়া। সে যাইহোক, চুরুটে আবার এটা সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবে সে, বৎস তোমার আকাঙ্ক্ষা যতোই আকাশ-ছোঁয়া হোক না কেন, তোমার রাশ কি করে ধরে রাখতে হয় সে আমার বেশ ভালোই জানা আছে। তারপর সে ভাবে, এই সময় ছেলেটাকে তার খুবই প্রয়োজন। এখনো সে আসছে না কেন? তার সেই ভাবনাটা শেষ হতে না হতেই দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলো রস। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জোকার বলে উঠলো, টাকা এনেছো?

দশ হাজার ডলারের বান্ডিলটা তার ডেস্কের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রস বলে উঠলো, এ আমার শেষ সম্বল।

ডেস্কের ড্রয়ার খুলে জোকার টাকাটা রেখে দিয়ে একটা স্টক সার্টিফিকেট বার করে রসের দিকে এগিয়ে দিলো। চকিতে একবার কাগজটার উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটা তার ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে অবজ্ঞা ভরে বলে উঠলো, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসো না জোকার। এ শেয়ার আমার দরকার নেই। এতে কোনো ফায়দা হবে না। এ কোম্পানির নামও কখনো শুনিনি। তা কোথায় এর অস্তিত্ব শুনতে পারি?

লাস ভোগাসে।

সেটা আবার কোথায় শুনি।

কেন, নেভাদায়। দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই জায়গাটা আমেরিকার সব চেয়ে বড় একটা উপার্জনের জায়গা হয়ে উঠবে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, নৈশক্লাব, জুয়ার আড্ডা, হোয়াট নট? আর সেখানে সবকিছুই আইনসিদ্ধ, পুলিশ কিংবা আদালতের খবরদারি নেই সেখানে।

আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না, তুমি আমার টাকা ফেরত দাও। আর পারো তো আমার জন্যে মিয়ামি কিংবা রেনোর কোন শেয়ারের ব্যবস্থা করে দাও।

বোকার মতো কাজ করো না রস। এই শেয়ার রেখে দাও, দেখবে সবুরে ঠিক মেওয়া ফলবে।

তখন আমি বুড়ো হয়ে যাবো। নিরুত্তাপ গলায় বললো রস।

কিন্তু আমি যে তোমার ভবিষ্যত এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি রস, হাসতে হাসতে বললো জোকার। দেখবে তখন তুমি হবে এদেশের সবচেয়ে ধনী, তিরিশ বছরের বুড়ো খোকা। তারপর একটু থেকে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার মতো গলা নামিয়ে বলে উঠলো সে, জানো রস, এ কোম্পানির দশটা শেয়ার আমিও কিনেছি।

তার মানে এই কোম্পানির শেয়ারে তুমি একলক্ষ ডলার লাগিয়েছ?

হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? দেখবে একদিন এই এক লক্ষ, দশ লাখ ডলার আমাকে এনে দেবে। এ আমার বিরাট পরিকল্পনা। আর তোমার ওপরেও আমার একটা বিরাট প্রত্যাশা আছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে আব একটা চুরুট ধরায় জোকার। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে আবার বলতে থাকে। আমরা যে পরিকল্পনাটা করতে যাচ্ছি তাতে কোনো রকম ঝামেলা নেই, তাছাড়া তোমাকে তো আগেই বলেছি, এখানে সব কিছুই আইনসিদ্ধ। কেনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, এ কাজের সব দায়িত্বই তোমাকে নিতে হবে। এতে প্রচুব টাকার হাতছানি রয়েছে। তুমি রাজি হয়ে যাও রস।

শেয়ারের কাগজটা ধীরে ধীরে হাতে তুলে নিয়ে রস এবার ভালো করে চোখ বোলায় সেটার ওপর।

হঠাৎ তার সেই পরিবর্তন দেখে জোকার হাসে। কি, এবার মনে হচ্ছে, এর মধ্যে টাকার গন্ধ তুমি পাচ্ছো?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো, উত্তরে রস বলে, তিনটে জিনিষের গন্ধ পেলে আমি নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারি না। এক গাল হেসে কাগজটা পকেটে চালান করে দিযে সে আবার বলে, যেনম নতুন টাকা, নতুন গাড়ি আর নতুন মেয়েমানুষের গন্ধ।

ওহো, মেয়েমানুষের কথা বলে তুমি একটা ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো, আর কথাটা তোমারই সম্পর্কে। একটু আগে তোমার এক পুরনো বান্ধবীর খবর পেলাম।

বললাম না আমার আগ্রহ নতুন মেয়েমানুষে, পুরনো কোনো বান্ধবী আজ আর আমাকে কোনো ভাবেই আকর্ষণ করে না। তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো রস।

কে বলতে পারে, এ এমন এক পুরনো বান্ধবী, যার নাম শুনলে হয়তো দ্বিগুন উৎসাহে ওর কথা তুমি নিজের থেকেই শুনতে চাইবে। জোকারের চোখে ধূর্ত চাহনি। জানো রস, আমি তোমার সেই সোনালী চুলের বান্ধবী পোলিশ মেয়েটির কথা বলছিলাম।

কে, মারজা? নামটা সে এমন ভাবে উচ্চারণ করলো যেন এর সঙ্গে তার অনেক দিনের অনেক ব্যথা জড়িয়ে আছে।

হ্যাঁ, রস, ও মেয়ে মারজাই! সাবধানে ওকে লক্ষ্য করে জোকার। কিন্তু রস, আমি যে মেয়েটিকে নিজের মতো করে পেতে চাই। তবে তোমার মনোভাব জেনে নিতে চাই, এই কারণে একথা বলছি যে, ওর প্রতি তোমার এখনো কোনো দুর্বলতা নেই তো?

রস বেশ বুঝতে পারে, আজ সে খপ্পরে পড়ে গেছে সম্পূর্ণ ভাবে। তার বিরোধিতা করার কোনো উপায় আর নেই। একজন বয়স্ক বৃদ্ধ জ্ঞানদাতার মতো প্রশ্রয় দেওয়ার মতো তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। তার চোখে এখন অনেক প্রত্যাশা, অনেক আশা, মারজাকে নিজের মতো করে পাওয়ার বাসনা। তার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে বললো রস, না জোকার, তুমি জেনে খুশি হবে, ওর প্রতি আজ আর আমার কোনো আকর্ষণ নেই। তুমি এখন ওকে নিজের মতো করে নিতে পারো।

অনেকক্ষণ থেকে একটা টেলিফোনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসেছিল মেরি। এখানে ও এসেছে চারদিন, অথচ এই অল্প সময়ে ওর টাকা প্রায় শেষ। এভেলিন

বলেছি আজ শুক্রবার ফোন করবে। ওর সঙ্গে আলাপ লন্ড্রিতে কাজ করার সময়। রোগাটে চেহারা, কাঁধের নিচে ঝুলে পড়া একরাশ কালো চুল। মেয়েটা ইস্ত্রি চালাতে চালাতে হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, ছাড়া পেয়ে কি করবে ঠিক করেছো কিছু?

মেরিও কাজের ফাঁকে মুখ তুলে বলেছিল, না এখনো কিছু ভেবে দেখিনি। তবে কাজ একটা নিশ্চয়ই কোথাও পেয়ে যাবো।

আগে থেকে পরিকল্পনা না করে রাখলে তোমার জমানো টাকা দুদিনেই ফুরিয়ে যাবে। ধরো, তখনো যদি চাকরী না পাও তবে খাবে কি করে?

তখন দেখা যাবে। মেরি তখন ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, তা তোমার পরিকল্পনা কি জানতে পারি?

সে এক বিরাট পরিকল্পনা। এভেলিন ওর সেই পরিকল্পনার কথা সবে বলতে শুরু করেছে, সেই সময় আশ্রমের পরিচালিকাকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই চুপ করে গিয়েছিল ও। তারপর উনি চলে যাওয়ার পর এভেলিন বলেছিল, রাতে আমার ঘরে এসো, তখন সব খুলে বলবো।

রাত দশটার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে এভেলিনের ঘরে গিয়ে হাজির হয় মেরি। ওর বিছানার একপাশে বসে মেরি শুধোয়, এবার বলো তোমার সেই পরিকল্পনার কথা।

কোনো ভূমিকা না করেই এভেলিন নিচু গলায় বলতে শুরু করে। এখান থেকে মুক্তি পেয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করতে চাই আমি। আমার বন্ধু তো রোজগারের সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখবে বলেছে। নানান ধরণের শো দেখানই আমাদের সেই পরিকল্পিত কাজ, বুঝলে। জো'র ইচ্ছে এখান থেকে আমার একজন মনের মতো জুটি জোগাড় করে নিয়ে যেতে, আর তাই তোমাকে বললাম। তোমার আমার জুটি জমবে ভালো। তোমার সোনালী চুল, আর আমার কালো চুল, আমাদের দুজনের অভিনয় জমবে দারুণ।

মেরির কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তা সে কি ধরণের অভিনয়, যদি একটু খুলে বলো, কারণ আমি তো কোনোদিন অভিনয় করিনি।

তেমন কিছু নয়। এক রাতেই শিখিয়ে দেবো তোমাকে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মেরি বলেছিল, বুঝেছি।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে এভেলিন তখন সাফাই গেয়েছিল। সোজা পথে কতোই বা রোজগার হবে, বড় জোর সপ্তাহে দশ ডলার? তার চেয়ে দিনে বিশ-তিরিশ ডলার কম কথা নাকি?

কিন্তু ওসব চিন্তা তো আমি কখনো করিনি। সঙ্গে সঙ্গে মেরি আবার এও ভেবেছিল, দুনিয়াটা টাকার বশ, টাকা না থাকলে কোনো ভালো ছেলে ওকে গ্রহণ করা দূরে থাক ফিরেও তাকাবে না।

সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার আগের দিন এভেলিন ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, আমার প্রস্তাবটা মনে থাকবে তো? শুক্রবার সকালে ফোন না করা পর্যন্ত অন্য কিছু ভাববে না

তুমি, অন্য কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবে না।

তখনো ওর গোছগাছ করতে বাকী ছিলো। হঠাৎ দূরাভাষে আওয়াজ হতেই সন্ত্রস্ত হলো মেরি, ওই বোধহয় ও ফোন করেছে' তাড়াতাড়ি গ্রাহকযন্ত্রটা তুলে নিয়ে ও বলে, কে এভেলিন?

না, আমি ওর বন্ধু জো কথা বলছি। অপর প্রান্ত থেকে পুরুষালি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, নিচে গাড়িতে অপেক্ষা করছে এভেলিন। তা আপনি তৈরী তো?

হ্যাঁ, একরকম তৈরীই বলা যায়।

তাহলে এখুনি গিয়ে আমরা আপনাকে নিয়ে আসছি, কেমন?

একটু পরেই জো এলো, ততক্ষণে আমার গোছগাছও শেষ। দরজার সামনে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনিই তো জো, তাই না?

জো তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, দেখছি এভেলিন একটুও বাড়িয়ে বলেনি, সত্যিই কি অপরূপ সুন্দরীই না আপনি!

গাড়ির দিকে ওকে এগিয়ে আসতে দেখে খুশিতে উপচে পড়ে এভেলিন বললো, তোমার আসতে দেরী দেখে আমি তো ভাবলাম তুমি বোধহয় আমার আসার আগেই এখান থেকে চলে গেছো।

আমিও তোমার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওর পাশে বসে বললো মেরি।

সেকি! এভেলিনের চোখে গভীর বিস্ময়। দেখো না, জিনিষপত্তর গোছগাছ করতে গিয়ে আমাদেরও একটু দেরী হয়ে গেলো।

ওদিকে চালকের আসনে বসে জো জিজ্ঞেস করে, এবার গাড়িতে স্টার্ট দিতে পারি?

হুঁ। সংক্ষেপে বলে হাসলো, এবার আমাদের যাত্রা হোক শুরু।

ভয়ে ভয়ে মেরি জিজ্ঞেস করলো, আমরা কোথায় চলেছি বললে না তো?

কোথায় আবার সেই বিখ্যাত এবং আপনার মনের মতো জায়গা, ফ্লেরিডায়। এভেলিনের হয়ে জো জবাব দেয়। উত্তর উপকূলে একটা খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছি, সেখানে গিয়েই আমরা উঠবো। আমার ধারণা, এই মরসুমে সেখানে ভিড়ে ঠাসা মানুষ্যের সমাগম হবে।

ব্রডওয়ের হোটেল অ্যাস্টোরে ঢুকে রিসেপসনিস্টকে বললো জোকার মার্টিন, বারোশো চার নম্বর ঘরে মিস মেরি ফ্লাডের সঙ্গে দেখা করতে চাই, যদি ওর ঘরটা একটু দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলে উঠলো, দুঃখিত মিস্টার, খানিক আগে উনি হোটেলের সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে চলে গেছেন।

চমকে ওঠে জোকার। সন্দেহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো সে, ওর সঙ্গে কেউ কি ছিলো?

হ্যাঁ ছিলো বৈকি, একজন ভদ্রলোক।

কেমন দেখতে ছিলো সে বলতে পারেন?

স্বাস্থ্যবান, লাল মুখ, আপনার মতোই লম্বা।

আচ্ছা ধন্যবাদ, আসি তাহলে।

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে জোকার। তার মুখ দেখে এখন মনে হয়, একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছে সে। হ্যাঁ, সে তখন ভাবছিল, মেরির সঙ্গী ভদ্রলোকের চেহারার যে বিবরণ রিসেপশনিস্ট তাকে দিলো, সে আর যেই হোক না কেন রস নয়। কারণ বস লালমুখো নয়, আর তার মতো এমন লম্বাও নয়। তবে তার বোকামির উপযুক্ত শাস্তিই সে পেয়ে গেলো। খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে তাকে এখন। তার আগেই বোঝা উচিত ছিলো, এমন চরিত্রের মেয়ের অন্য যে কোনো পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠতে বেশী সময় লাগার কথা নয়। যাইহোক, যা ঘটে গেলো হয়তো ভালোর জন্যেই। এখন চারদিকে নানান ঝামেলা। তাই একটু অপেক্ষা করে থাকাই ভালো বোধহয়। সঙ্গে সঙ্গে জোকার আবার এও ভাবলো, ফিরে ওকে আসতেই হবে তার কাছে। একদিন না একদিন সবাইকেই তার কাছে ফিরে আসতে হয়, এটাই নিয়ম।

সমুদ্র সৈকতে নিজের বাড়ি থেকে গর্ডন পেইণ্টার আজ তিনদিন হলো রোজ ওকে জল থেকে উঠে আসতে দেখছে। যেন সাক্ষাৎ কোনো জলদেবী। বেদিং কস্টিউমে কোন মেয়েকে যে এতো সুন্দর দেখায় নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না তার।

মেয়েটি কিন্তু সত্যিই খুব রূপসী মিস্টার গর্ডন! টম তার মনিবের মেজাজ অনুযায়ী রুচির কথা ভালো জানত।

তুমি ওকে চেনো নাকি?

না, কখনো দেখিনি এর আগে।

তোমার কি মনে হয় দুপুরে ও আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে?

না জিজ্ঞেস করে বলি কি করে বলুন?

তা ঠিক। গর্ডন নিজে গিয়ে দেখা করল ওর সঙ্গে।

গর্ডন পেইণ্টার তার পরিচয় দিয়ে বলল, আমি আপনাকে প্রায় রোজই সাঁতার কাটতে দেখি। অথচ এই নির্জন সমুদ্র-সৈকতে কেউ বড় একটা সাঁতার কাটতে আসে না।

নির্জনতা আমার ভীষণ ভালো লাগে। তাই তো এখানে চলে আসি।

বেশ তো আমাব বাড়ি কাছেই, বলে সে আঙুল দিয়ে দেখাল সামনের দিকে, আরো নির্জন। আসুন না আমার বাড়িতে।

ধন্যবাদ মিঃ পেইন্টার, আজ নয়, অন্য আর একদিন আপনার আমন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করবো।

তাহলে কাল দুপুরে আমার বাড়িতে লাঞ্চ সারবেন। মনে থাকে যেন।

হয়তো। মেরি হাসল। কালকের কথা কালই বলবেন মিঃ পেইন্টার।

চলে যাবার পর গর্ডন ভাবে, কি অদ্ভুত মেয়েটি। নাকি সবটাই ওর কেবলমাত্র অভিনয়? যাই হোক, আগামীকাল ওর প্রকৃত রূপটা কি তা জানা যাবে।

পরের দিন সকালে সমুদ্রে স্নান করতে এলে মেরি স্তব্ধ, হতবাক। বালিতে গাঁথা একটা ছাতার নিচে টেবিল পাতা। থরে থরে খাবার সাজানো। অদূরে গর্ডন হাসছিল।

তোমার অজুহাতের ভয়ে আগে থেকে সব তৈরী করে রেখেছি।

আমার জন্যে মিথ্যে এভাবে কষ্ট করার কোন দরকার ছিল না।

না রহস্যময়ী, এতে আর একটুও কষ্ট হয়নি।

রহস্যময়ী? বাঃ বেশ নাম দিলেন তো আমার।

এতে আপনাকে বেশ রহস্যময়ী বলে মনে হয়।

মেরি আস্তে করে মিষ্টি হাসল। আমি কিন্তু নিজেকে মোটেই রহস্যময়ী বলে মনে করি না।

মিয়ামিতে নাম বলতে চায় না, এমন মেয়ে সত্যিই রহস্যময়ী।

না, আমি রহস্যময়ী নই। আমার একটা নাম আছে। মেরি হাসতে হাসতে বলে,—মেরি ফ্লাড।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি ধন্য মিস ফ্লাড। গর্ডন হঠাৎ একটা কাজ করে বসল। মেরিকে দ্রুত কাছে টেনে নিয়ে ওর গালে চুমু খেলো, সত্যি আমি খুব খুশি তোমার সঙ্গ পেয়ে।

চলে আসার সময় গর্ডন জিজ্ঞেস করল, আজ সন্ধ্যেয় তোমার কি কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কোথাও?

হ্যাঁ।

তাহলে কাল সন্ধ্যেবেলায়?

না গর্ডন, কোন সন্ধ্যেবেলাতেই আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে পারছি না। প্রতি সন্ধ্যেয় আমি আর আমার এক বান্ধবী ক্লাবে ক্লাবে অভিনয় করে বেড়াই।

কোথায় অভিনয় করো আমাকে বলতে পারো, আমি তাহলে দেখতে যাবো।

আগে থেকে ঠিক থাকে না, বলব কি করে? মেরি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলে বাঁচে যেন। আজকের সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ গর্ডন। হাতটা বাড়িয়ে দিলে ও।

ধন্যবাদ মেরি। করমর্দনের বদলে সে ওর হাতে চুমু খেলো। তাহলে কাল আবার দেখা হচ্ছে!

সত্যি তুমি খুব মিষ্টি। মেরি তেমনি মিষ্টি হেসে বলল, তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চলি!

মেরিকে আজ বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওর সেই খুশির আমেজটা নিমেষে উধাও হয়ে গেলো এভেলিনের বন্ধু জো'র কাছ থেকে একটা দুঃসংবাদ শুনে।

শোনো, জো বলে, পুলিশ আমাদের পেছনে লেগেছে। কিছুদিনের জন্যে এখানকার কারবার গুটিয়ে নিউ অর্লিয়েন্সে চলে যেতে হবে আমাদের। তার জন্যে কিছু টাকা দরকার। তুমি যদি কিছু টাকা আমাকে ধার দাও—

কেন, তোমার টাকা কি হলো?

সেতো ও ঘোড়ার পেছনে খরচ করে ফেলেছে। জো'র হয়ে এভেলিন বলে,—আমি জানি তোমার কাছে থাকলে তুমি আমাদের কখনো নিরাশ করবে না।

মেরির মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, আমার কাছে মাত্র বাইশ ডলার আছে। এটা দিয়ে ওর যদি হয় তাহলে নিতে পারে।

মাত্র বাইশ ডলার! এভেলিনের ঠোঁটে অবিশ্বাসের হাসি। আর টাকা তোমার কি হলো?

বাঃ আমার বুঝি কোনো খরচ নেই।

কি আমি তোমাকে বলেছিলাম না, জো খিস্তি করল, ও মাগী আমাদের একটা পয়সাও দেবে না! তবে ও মাগীর কাছ থেকে কি করে টাকা আদায় করতে হয় দেখাচ্ছি। অতঃপর জো ওর দিকে তেড়ে আসে। ওকে শাষায়।

মেরিও তৎপর ছিল। হিপ পকেট থেকে স্প্রিং দেওয়া ধারালো ছুরিটা সঙ্গে সঙ্গে বার করল। জোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছোট্ট বোতামে চাপ দিতেই ধারালো ছুরিটা ছিটকে বেরিয়ে এলো।

এভেলিনের মুখটা ফ্যাকাশে সাদা দেখায়। ও মেয়ে সব পারে। সাংঘাতিক মেয়ে। ছুরি দিয়ে ও ওর সৎবাবাকে খুন করতে গিয়েছিল।

চমৎকার তোমার বন্ধু ভাগ্য! জো বিদ্রূপ করে বলে, অকৃতজ্ঞ।

পরের দিন মেরির ঘুম ভাঙল এক আশ্চর্য বিস্ময়ের মধ্যে দিয়ে। এভেলিনের ঘর ফাঁকা। ওরা ওর বাইশ ডলার চুরি করে পালিয়েছে রাতের অন্ধকারে। জানালার সামনে এসে দেখল, গাড়িটাও নেই। আলমারি খুলে দেখল, একটা পোশাকও সেখানে নেই, এভেলিন সব নিয়ে পালিয়েছে। বিষণ্ণ মনে গ্যাস-চুল্লি জ্বালিয়ে কফি তৈরী করতে ব্যস্ত হলো মেরী অতঃপর।

কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে দরজায় নক্ করার শব্দ হলো। দরজা খুলতেই ও দেখল, বাড়িওয়ালা ম্যাক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।—বলুন, কি চান?

ছোট-খাটো বেঁটে ধরণের লোক। চোখে ধূর্তমির হাসি।—তোমার বন্ধুরা তো চলে গেছে।

মেরি পথ আগলে দাঁড়াল।—জানি। তারপর?

ওরা তোমার কাছ থেকে বাকী বাড়ি ভাড়ার টাকা আদায় করতে বলে গেছে।

কত টাকা?

তিন সপ্তাহের নব্বই ডলার।

মেরি একবার তাকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল,—কিন্তু অতো টাকা তো আমার কাছে নেই। ব্যাঙ্ক থেকে না তোলা পর্যন্ত আপনাকে দিতে পারছি না।

না, ম্যাক মাথা নাড়ল। ব্যাঙ্কের নাম করে তুমি কেটে পড়বে। ওসব হচ্ছে না। আমি নগদ চাই। আর এখনই!

এখন আমার হাতে একটা পয়সাও নেই।

হ্যাঁ আছে, আছে। ম্যাক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ইচ্ছে করলেই তুমি দিতে পারো।

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর। ঠোঁটে এক রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে ও বলল—ঠিক আছে, আমি দেবো। তবে নিজেকে প্রস্তুত করতে একটু সময় দিতে হবে। আমাকে এখন স্নানে যেতে হবে।

ম্যাক অপেক্ষা করতে পারছিল না। মেরির কাছে এসে হাত বাড়িয়ে ওর রাতের পোশাকের ওপর থেকেই ওর নিটোল স্তনের ওপর।

একটু সময়ের জন্যে মেরি তাকে প্রশ্রয় দিলো। কিন্তু ম্যাক ওকে তার কাছে আকর্ষণ করতে গেলে মেরি তেমনি রহস্যময় হেসে বাধা দিলো, না, এখন নয়। আপনার চাহিদা মতো নিজেকে তৈরী করতে একটু সময় লাগবে বললাম তো।

ম্যাক ওর দিকে তাকালো, তারপর খুশি হয়ে বলল, ঠিক আছে, তোমাকে এক ঘণ্টা সময় দিলাম। তৈরী হয়ে নাও এর মধ্যে।

বাড়িওয়ালা আসলে টাকা চায় না, সে ওর দেহ চায়। ক্লান্তিতে ওর চোখ বুজে এলো। সব পুরুষই এক, সবাই ওর পেছনে ঘোরে। মেরি ভাবলো, কেবল মাইকেলই এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তার কাছে গেলে ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠতো। একটা অদ্ভুত আমেজ, একটা অদ্ভুত অনুভূতি ছিলো ওর স্পর্শসুখে। তাকে ও ভালোবাসে বলেই কি এই ব্যতিক্রমটা এত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল আজ এতদিন পরেও! মেরির বুকের ভেতরটা কেমন হাহাকার করে উঠল তার জন্যে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ওর চিন্তায় বাধা পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, দরজা খোলা আছে, ভেতরে আসুন!

ম্যাক ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলো। চাপা উত্তেজনায় তার মুখটা থম্‌থম্‌ করছিল।—কি, তৈরী তো?

হ্যাঁ, আমি সব সময়ই প্রস্তুত। মেরি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে তার চোখে চোখ রাখল।

অতঃপর ম্যাক ওকে রুক্ষ হাতে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলো। ঠোঁটে তার দাঁতের কামড় অনুভব করল। নিষ্ঠুর পীড়নের সঙ্গে সঙ্গে তার রুক্ষ হাতটাও ওর সারা দেহ পরিক্রমা করে চলেছে তখন। তারপর সে বোতাম খুলতে গিয়ে ওর একমাত্র অবশিষ্ট পোশাকটা ছিঁড়তে দেখে চমকে উঠল ও। চকিতে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, এতো তাড়া কিসের? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। আপনি ওঘরে যান, আমি আসছি।

এখন সব কিছু মেরির কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো। যদিও ওর বুঝতে দেরী হলো, তবে একটা ব্যাপার এখন ওর কাছে খুবই স্পষ্ট। ওর মনে হলো, এর জন্যেই ও জন্মেছে। সব পুরুষই ওকে নগ্ন দেহে দেখতে চায়। তারা ওর দেহ চায়, মন চায় না। মেরি সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অনেকদিন পরে গর্ডনের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেলো এক হোটেলের লিফটে। ম্যাক ওকে টাকা রোজগারের নতুন এক পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। বড় বড় হোটেলে টুরিস্টদের মনোরঞ্জন করা। এ এক নতুন খেলা, খেলা শেষে মোটা টাকার প্রলোভন। মেরির প্রথমে বিবেকে বেঁধেছিল। তারপর নিজেই ভাবল, যদি বেশ্যাবৃত্তির জন্যেই ওর জন্ম হয়ে থাকে তাহলে ও সেরা বেশ্যাই হবে। তাই ম্যাকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় ও। এই রকম হোটেলের

একটা ঘর থেকে ফেরার পথে গর্ডনের সঙ্গে হঠাৎ ওর দেখা হয়ে গেলো। সে ওকে তার বাড়িতে নিয়ে এসে পেট ভরে খাওয়াল।

খাওয়ার পর সমুদ্রের ধারে ব্যালকনিতে এসে বসল। নির্মেঘ আকাশ! ঠাণ্ডা বাতাসটা চমৎকার লাগছিল। মেরি বুক ভরে শ্বাস নিয়ে বলে, এই চমৎকার পরিবেশে চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করে আমার।

গর্ডন মুচকি হাসে; জায়গাটা তোমার ভালো লাগছে!

ভালো লাগছে? গর্ডন হো হো করে হেসে উঠল। তার সেই হাসির শব্দে সারা বাড়িটা কেঁপে উঠল, সমুদ্র-সৈকতে আছড়ে পড়ল জলের ঢেউয়ের মতোন।

মেরি বড় বড় চোখ করে তাকায়।—তা এতে এতো হাসার কি আছে?

বাঃ হাসবো না? গর্ডন হাসি থামিয়ে বলে, পৃথিবীর সব জায়গাতেই সৎ মেয়ে পাওয়া যায় বলে আমার বিশ্বাস, কিন্তু এই মিয়ামিতে একটা সৎ মেয়ে খুঁজলেও তুমি পাবে না। এই মিয়ামিতে কোন মেয়ে সৎ থাকতে পারে না। তবে তোমাকে আমি অসতী হতে দেবো না কখনো। দেখো!

মেরি দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, তুমি খুব ভালো গর্ডন। তোমার এই শোভনতা আমার খুব ভালো লাগে।

গর্ডন ওকে নিবিড় করে বুকে টেনে নেয়। তুমিই প্রথম নারী, আমাকে ঠিক মতোন চিনতে পারলে, তোমার মতো চোখ নিয়ে কোন মেয়ে আমাকে এর আগে দেখেনি। আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না, মেরি। আমি যে তোমার মধ্য দিয়ে আমার মনের মতোন সঙ্গিনীকে খুঁজে পেয়েছি।

কিন্তু গর্ডন, তুমি নিজেই জান না, তুমি কি বলছ?

আমি সব জেনে-শুনেই বলছি মেরি, গর্ডন ওর ঠোঁটের ওপর নিজের উষ্ণ ঠোঁট চেপে ধরে। তার উষ্ণ চুম্বন আর পাঁচটা পুরুষদের থেকে যেন আলাদা। মেরির সারা দেহের মধ্যে একটা উত্তাপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। এক অদ্ভুত আবেশে ওর ঘন ঘন আঁখি পল্লব বুঁজে আসে। দুই স্তনে অনুভব করে তার হাতের উষ্ণ স্পর্শ! কাঁধদুটো একটু শিথিল করে মেরি ওর অন্তর্বাসের ফিতেদুটো নামিয়ে দেয়! আর ঠিক সেই মুহূর্তে গর্ডনের শিৎকার ওর কানে ভেসে এলো।

সত্যিই তুমি সুন্দরী রূপসী, গর্ডন ওর ঠোঁট থেকে মুখ তুলে বলে, তুমি অনন্যা। তারপর ওর একটা স্তনের ওপর মুখ ডুবিয়ে দেয়।

ওদিকে মেরির হাতদুটো তার সর্বাঙ্গ পরিক্রমা করে শেষে কোমর ছাড়িয়ে আরো নিচের দিকে নামতে থাকে। মেয়েলি হাতের স্পর্শে গর্ডন থরথর করে কেঁপে ওঠে আবেশে-আবেগে। তার সারা দেহ শক্ত হয়ে ওঠে। টান-টান করে পা দু'টো কৌচের ওপর ছড়িয়ে দেয় সে। আমি তোমার জন্যে অনেক, অনেকদিন অপেক্ষা করেছি, ফিস্‌ফিস্ করে সে বলে ওঠে।

চুপ করো! মেরি ক্রুদ্ধ ধমকে উঠল তাকে, তুমি বড্ড বেশী কথা বলো গর্ডন।

সেদিনের সেই ঘটনার দু-দিন পরে গর্ডন ওকে বিয়ের প্রস্তাব জানায়।

ম্যাক হাতের প্রভাতী সংবাদপত্রটা দেখিয়ে বলল, দেখেছ, কাগজওয়ালারা লিখেছে, তুমি নাকি মৌমাছির মত ব্যস্ত এখন।

আমি! বিস্ময়ে মেরির ভ্রূ দুটো বেঁকে ধনুক হয়ে যায়।

ম্যাক সবজান্তার মতো মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, ওরা লিখেছে গর্ডন পেইন্টারের সঙ্গে তোমার নাকি বিয়ে হচ্ছে।

ও! তাই বলো। তা বিয়ে তো সবাই করছে। আমাকে নিয়ে ওদের অত মাথা ব্যথা কিসের?

ওদের কথা আমি জানি না। গর্ডন বলেছিল সেদিন তাঁর নিজের কথা। তোমার প্রতি তাঁর মনোভাবকে ওরা কিছুতেই টলাতে পারবে না। আমি তোমাকে বিয়ে করছি।

মেরি! বাড়িওয়ালা ম্যাকের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলো ও। তুমি কি সত্যিই গর্ডনকে বিয়ে করছ?

কাগজের ওপর থেকে ধীরে ধীরে চোখ তুলে ও বলে, হ্যাঁ।

তার মানে সে তোমাকে পাবার জন্যে দারুণ ক্ষেপে উঠেছে। ম্যাক বিষণ্ণ গলায় বলে, আর তার অর্থ হলো, আমার একজন ভালো ভাড়াটেকে হারাতে হচ্ছে। যাই হোক, আমি চাই না মেরি বন্ধু হিসেবে তুমি আমাকে ভুলে যাও।

মেরি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে অনেকক্ষণ কথা না বলে। কিছুদিন থেকে ও লক্ষ্য করছিল তার পরিবর্তন। এখন সে আগের চেয়ে অনেক বেশি শান্ত নম্র হয়ে গেছে। মনে হয় সে ওকে ভালোও বেসে ফেলেছে।

হঠাৎ মেরি একটু দুর্বল হয়ে পড়ল। তোমার কথা আমি কোন দিনও ভুলতে পারবো না ম্যাক। শেষ পর্যন্ত মেরিও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলল। আবেগে ওর গলার স্বর অসম্ভব কেঁপে উঠলো।

টম এসে খবর দিলো, মিস্টার গর্ডন, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। মিস ফ্লাডের সম্বন্ধে উনি কিছু বলতে চান।

ঠিক আছে, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

আমার নাম জো, লোকটা আমতা আমতা করে বলে, মিস মেরি ফ্লাডকে আপনি কতটুকু জানেন? জানেন ও কি রকম জঘন্য চরিত্রের মেয়ে?

গর্ডন সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে, যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে!

দেখুন মিঃ পেইন্টার, আমার সব কথা ভালো করে না শুনে শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করবেন না। জো দ্রুত পকেট থেকে কতকগুলো ফটো বার করে বলে, এগুলো নিজের চোখে দেখলে আশাকরি আপনি আমার ওপর আর রাগ করতে পারবেন না।

গর্ডন অবাক বিস্ময়ে ছবিগুলো উল্টে-পাল্টে দেখে। প্রায় সবকটা ছবিই দুটো মেয়ের সম্পূর্ণ নগ্ন। গর্ডনের সারা শরীর রাগে উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। মেয়ে দুটোর মধ্যে একজন মেরি ফ্লাড। জোর দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, এ ছবিগুলো আপনি

কোত্থেকে পেলেন?

জো তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলে, ঐ মেয়েটির আসল নাম হলো মারজা ফ্রাড। মাত্র বছর খানেক আগে নিউইয়র্কের একটা সংশোধন আশ্রম থেকে ছাড়া পেয়েছে।

কিন্তু এগুলো যে মিথ্যে নয় তার কি প্রমাণ আছে?

প্রমাণ? দেখাচ্ছি আপনাকে। জো নীচে নেমে গিয়ে এলভিনকে ডেকে নিয়ে এলো।

এলভিনের মুখ থেকে সব শোনার পর গর্ডন সম্পূর্ণ বদলে গেলো। ওদের সে খাতির করে বসাল। তারপর হুইস্কির বোতল খুলে ওদের আমন্ত্রণ জানাল, আসুন একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

এই ভর-সন্ধ্যেবেলায় আবার তুমি হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছ গর্ডন। মেরি তার ঘরে ঢুকেই বলল, তুমি না আমাকে কথা দিয়েছিলে—

গর্ডন ভয়ে ভয়ে হাসে। মাত্র একটা দিনের জন্যে। তাও তোমার পুরনো বন্ধুদের সম্মান দেখানোর জন্যে।

আমার পুরনো বন্ধু? মানে—

গর্ডন আঙ্গুল দেখায় কোণের একটা কৌচের দিকে। কৌচের ওপর এভেলিন বিশ্রীভাবে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। তার পরনে কেবল ব্রা এবং প্যান্টি। বাকি পোশাকগুলো মেঝের ওপর পড়েছিল।

জো ওর কাছে ছুটে আসে। এসো মেরি, কতদিন তুমি তোমার পুরনো বন্ধু জোকে চুমু খাওনি, মনে আছে?

চুপ করো? মেরি ধমকে ওঠে, তোমরা এখানে কি করতে এসেছ?

আমরা আমাদের এক পুরনো বন্ধুর বিয়েতে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। সেই সঙ্গে তোমার বন্ধুকে তোমার সুন্দর অভিনয়ের কথাও বলেছি। এভেলিনের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল জোর।

চকিতে গর্ডনের দিকে ফিরে তাকালো মেরি। ওরা তোমাকে বলেছে কিছু? গর্ডন মাথা নাড়ল।

আমাকে বলার সুযোগ না দিয়েই তুমি ওদের কথা শুনলে, বিশ্বাস করলে? অনেক প্রশ্ন, অনেক প্রত্যাশা জড়িয়ে ছিলো ওর কথায়।

এই ফটোগুলোই যথেষ্ট—গর্ডন কঠিন সুরে বলে,—এর পরেও তোমার কাছ থেকে কিছু শোনার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

মেরি জো'র দিকে ফিরে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের স্বরে বলে, জো তুমি ঠিক আগের মতোই আছো, একটুও বদলাও নি ঃ টাকার গন্ধ পেলেই ছুটে আসো।

আমার ওপর রাগ করো না লক্ষীটি। চলো, আবার আমরা অভিনয় দেখানো শুরু করি। জো এগিয়ে এসে ওর হাত ধরার চেষ্টা করে।

হঠাৎ তাকে কিছু বুঝতে দেওয়ার আগেই মেরি তার গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দেয়।

তবে রে কুত্তি, জো রাগে গর্জে ওঠে, আমি তোকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি এখুনি। পর মুহূর্তে সে দু'পা পিছিয়ে গেল মেরির হাতে ওর ধারালো ছুরিটা ঝলসে উঠতে দেখে।

মেরি! গর্ডনও চিৎকার করে উঠে। ওকে বাধা দেওয়ার জন্যে ছুটে যায় ওর দিকে।

থামো! মেরি ফুঁসে উঠল, গর্ডনের দিকে তাকিয়ে, তুমিও ওদের থেকে কোন অংশে কম নয়। আমি কতদিন তোমাকে আমার অতীতের কথা বলতে গেছি, তোমার সময় হয়নি শোনবার। অথচ ওদের কথা তুমি খুব মন দিয়ে শুনলে এবং বিশ্বাস করলে। ওদের জন্যে আমাকে কত মূল্য দিতে হয়েছে তা নিশ্চয় ওরা তোমাকে বলেনি। ওদের বাড়ি ভাড়া মেটাতে গিয়ে বাড়িওয়ালার কাছে আমার দেহদান করতে হয়েছে সে খবরটা নিশ্চয়ই দেয়নি ওরা। দিনে চল্লিশ ডলার রোজগারে আমার বেশ চলে যাচ্ছিল। সে সুখ থেকে বঞ্চিত করে তুমি, তুমিই আমাকে বিয়ের প্রলোভন দেখালে।

না মেরি না, গর্ডন আর্তনাদ করে উঠল।

হ্যাঁ, গর্ডন, ঠিক তাই। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছিলুম। আমি ভেবেছিলুম পৃথিবীতে কত লোকের জীবনে কত কিছু তো ঘটে থাকে, আমার জীবনেও হয়তো তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু ভুল, আমার সবই ভুল, না মিথ্যে গর্ডন তারপর মেরি আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালো না। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকাল মেরি। হাল্কা একটু মেঘে ঢেকে গেছে অর্ধেক চাঁদ। দূরে সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। সিগারেটের পোড়া অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও ভাবে, ফ্লোরিডায় খুব হয়েছে, আর নয়। এবার নিউইয়র্কে ফিরে যাবে। এখানের তারাগুলো বড্ড বেশি উজ্জ্বল যেন।

বিচারপতি প্রতিবাদী পক্ষের আবেদন খারিজ করে দিয়ে মামলা মুলতুবি রেখেছেন। তার মানে আমার আবেদনই গ্রাহ্য হয়েছে শেষ পর্যন্ত। বৃদ্ধ জ্যাকসন আমার সওয়ালের তারিফ করে গেছেন নিজে অফিসে এসে। তারপর মামলাটার সমস্ত কাগজপত্র খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে রাত এগারোটা বেজে গেলো।

বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। ব্রডওয়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। জায়গাটা অন্ধকার এবং বড় নির্জন। সামনের মোড়টা পেরুতে যাবো একটা গাড়ী এসে আমার সামনে জোরে ব্রেক কসল।

মাইকেল! অতি পরিচিত এক মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

একি মারজা, তুমি? অবাক চোখে তাকালাম।

ভেতরে এসো, মারজা তাকে আহ্বান জানাল, আমি তোমাকে পৌঁছে দেবো।

এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্ততঃ করে অবশেষে ওর গাড়ীতে উঠে বসলাম। মারজা আমার দিকে তাকাল, এতো রাত পর্যন্ত কাজ করো কেন মাইকেল? তবে আজ তুমি আদালতে সত্যিই খুব ভালো বলেছ। এমন ভাবে ও বলল যেন এ মামলার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। আশ্চর্য!

ধন্যবাদ মারজা।

অনেক, অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি মাইকেল।

এ কথা তুমি তো আগেও অনেকবার বলেছ, বলনি?

লক্ষীটি ঝগড়া করো না আমার সঙ্গে। কি করুণ কণ্ঠস্বর মারজার।

তুমি কি ভাবো মামলা শুরু হওয়ার আগে থেকে আমরা কেবল ঝগড়াই করে আসছি।

না মাইকেল না, ওর চোখ দুটো চিক্‌চিক্‌ করে উঠল, মামলার কথা এখানে তুলছ কেন? ব্যক্তিগতভাবে এর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

ওর অতলস্পর্শী সেই দুচোখের আর্তি আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম যেন। আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। না, একটুও বদলায় নি ঠিক আগের মতোই আছে। একটু ঝুঁকে পড়ে আমি ওকে চুমু খেলাম। আমার সারা শরীর জুড়ে একটা তাপ প্রবাহ বয়ে গেলো যেন। চকিতে আমি কামনায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম। এ এক ধরণের পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়, কথাটা মনে হতেই মুখটা সরিয়ে নিলাম।

মাইকেল! আমার হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে ও বলে,—আমরা দুজনে কাছে এলেই কেন এমন হয় বলতো?

জানি না, তবে এক এক সময় কথাটা ভাবলে আমারো কেমন অবাক লাগে।

ও আমার চোখে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। এই প্রথম অনেকদিন পরে,—ধন্যবাদ মাইকেল, আমার ভয় ছিল, তুমি বোধহয় বদলে গেছো।

আমি কোনো জবাব দিলাম না। প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললাম, শুনেছি তোমার নাকি একটা মেয়ে আছে।

ওর ঠোঁটে বিষণ্ণ এক হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ মাইকেল।

তোমার মেয়ে, নিশ্চয়ই সে তোমার মতোই সুন্দরী।

অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে ও বলল, হ্যাঁ।

আচ্ছা মারজা, তুমি এমন পাগলামি কেন করছ বল তো?

হাসল ও। আমি যে পাগলামি করতে ভালবাসি।

কিন্তু আমি বাসি না। প্রতিবাদ করলাম। তোমার আমার মধ্যে কেন এই ব্যবধানটা থেকে যায় বলতো?

ও কোন উত্তর দিলো না।

ঠিক আছে, রেগে গিয়ে বললাম, আমাকে তুমি ব্রডওয়ে ক্যানালের কাছে নামিয়ে দিও। মারজা মাথা নাড়ল।

ব্রডওয়ে ক্যানেলের কাছে ও আমাকে নামিয়ে দিলো।

আমাদের দুজনের ব্যবধানটা কি কমানো যায় না মাইকেল? মারজা গাঢ়স্বরে বলল।

এখন আর তা সম্ভব নয়। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

কিন্তু, দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

কিন্তু কি মারজা?

সহসা ও মুখ বাড়িয়ে আমার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি মাইকেল। আমি তোমাকে সব সময়ই ভালোবাসতাম। জীবনে যাই কিছু ঘটুক না কেন, তোমাকে

ভালোবাসার থেকে মহৎ কিছু হতে পারে না।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর গাড়ীটা দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গেলো। আমার দৃষ্টির বাইরে যেতেই আমি হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

ওর ঠোঁটের মৃদু স্পর্শ, ওর দেহের মিষ্টি ঘ্রাণ যেন এখনো আমার নাকে লেগে আছে। আমি ওকে আজও বুঝতে পারলাম না। ওকে আমি যত বেশি জানি বলে জাহির করতে যাই, মনে হয় কিছুই বুঝি জানা হলো না।

যুদ্ধ থেকে ফেরার পর সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনগুলো খুব সুন্দর ভাবে কেটেছিল। ওকে আমি সম্পূর্ণ নিজের মতো করে পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপরেই ও রসের সঙ্গে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। ট্যাক্সিতে উঠে ভাবতে থাকি। এর পব বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে, অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেছে। রসও মারা গেছে। সবকিছু বদলে গেছে, কেবল বদলায়নি ওর সম্পর্কে আমার মনোভাব।

❑ মেরিয়ান ❑

রিসিভারটা তুলতেই এটর্নি হেনরি ভিটোর কানে রিসেপশনিস্টের মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, মেরিয়ান ফ্লাড নামে এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান মিস্টার ভিটো।

নামটা তার পরিচিত নয়, ভিটো ভাবলেন।—তা উনি কি চান?

উনি আপনার সঙ্গে দেখা করে নিজেই আপনাকে সব বলবেন।

ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও।

রিসেপশনিস্ট ওর সঙ্গে ভিটোর পরিচয় করিয়ে দিলো। ভিটো তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ওর প্রসারিত হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিতে গিয়ে শক্ খেলেন, যেন তাঁর দেহের মধ্য একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেলো হঠাৎ। উষ্ণ স্পর্শে তাঁর দেহে রোমাঞ্চিত তখন।

আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যে নিজেকে ধন্য মনে করছি। শান্ত নম্র গলায় ও বলল।

এ আপনি কি বলছেন মিস ফ্লাড? ভিটো চেয়ারে ফিরে বসতে গিয়ে বলে, অনুগ্রহ করে বসুন! তারপর মৃদু হেসে সে জিজ্ঞেস করে, বলুন মিস ফ্লাড, আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?

আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি। শুনেছি কোন কেসে আপনি হারেননি। আমার কেসটা হলো, আজ সকালে আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু আমাকে ফোন করে জানাল, আমার নামে নাকি একটা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার করা হয়েছে। বিকেলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। আশ্চর্য ওর কণ্ঠস্বর, ভয় বা আর্তির কোন চিহ্ন নেই।

ভিটো বিস্মিত।—কিন্তু কিসের অপরাধে ওরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আসবে?

বেশ্যাবৃত্তি করার পর চুরির অভিযোগে।

কি বললেন? মুহূর্তের জন্যে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। মক্কেল হিসেবে কাউকে চিনতে

ভুল হয় না। আগে বুঝলে এরকম নোংরা কেস নিয়ে সে কোন আলোচনায় বসতো না। যাইহোক কি ভেবে ভিটো বললেন, সব ব্যাপারটা আপনি আমাকে খুলে বলুন মিস ফ্লাড!

মারজা কাল রাত্রিরের সব ঘটনা খুলে বলল।

ঠিক আছে, সব শুনে ভিটো বললেন, কেসটা আমি হাতে নিচ্ছি। কিন্তু আমার এখানে আসাব কথা কে আপনাকে বলেছে?

চুয়ান্নতম স্ট্রীট পুলিশ ষ্টেশনের ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট ইগান। প্রায় পাঁচ বছর ধরে আমি ওকে চিনি। উনি বেশ ভালো করেই জানেন, এ কাজ আমি করতে পারি না। বিশ্বাস করুন মিঃ ভিটো, আমি বেশ্যা হতে পারি তবে চোর নই।

তা কি আমি অবিশ্বাস করেছি? ভিটো ভাবেন। তাছাড়া ইগানকে তিনিও চেনেন দীর্ঘদিন ধরে। উনি জানেন ইগান কখনো কোন বাজে লোককে তার কাছে পাঠাবে না।

কেসে জেতার পর আদালত থেকে বেরিয়ে এলো মারজা। ভিটো ওকে ট্যাক্সিতে চড়িয়ে দিতে এগিয়ে এলো রাস্তায়। নিজের হাতে তিনি ট্যাক্সির দরজা খুলে দিলেন।

ট্যাক্সিতে উঠে মারজা হেসে উঠে বলল, সত্যিই উকিল হিসেবে আপনিই শ্রেষ্ঠ।

ধন্যবাদ। ভিটো ওকে মনে করিয়ে দিলো, আমাদের সেই নৈশভোজের কথা তোমার মনে আছে তো। ঠিক সাড়ে সাতটার সময় আমি তোমাকে তোমার হোটেল থেকে তুলে নিচ্ছি, কেমন? তাবপর ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ করে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

অফিসে ফেরা মাত্র রিসেপশনিস্ট জানাল, মিস্টার রস ড্রেগো আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চান।

ঠিক আছে দাও লাইনটা।

কে রস? কি ব্যাপার বল! মাউথপীসে মুখ রেখে ভিটো বললেন।

আসছে সপ্তাহে ওরা আমাকে পশ্চিমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। একটা জরুরী ব্যাপারে আজ রাতেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

অসম্ভব। হবে না। আজ রাতটা আমার কেবল এক সুন্দরী মহিলার জন্যে।

কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আপনি এর আগে কখনো মাথা ঘামিয়েছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। রস হাসলো। কি ব্যাপার মিঃ ভিটো।

আমার বিশ্বাস পৃথিবীতে ওর মতো সুন্দরী মহিলা দ্বিতীয় কেউ আছে কিনা সন্দেহ। মনে হয় মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতেই ও জন্মেছে।

ঠিক আছে শেলটন ক্লাবে ওকে নিয়ে আসুন, দেখে চোখ সার্থক করব। আর আমিও সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে যাবো। দেখা যাক কে বেশী সুন্দরী। রস হাসল।

তাহলে ঐ কথাই রইল, হ্যাঁ, অনেকদিন আগে জোকার ঠিকই বলেছিল, ছেলেটা সত্যিই খুবই বুদ্ধিমান।

স্কচের গ্লাস হাতে ভিটো মারজার বুককেসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাল আমলের ভালয়-মন্দয় মেশানো সব গল্প-উপন্যাস। এ সব বই তোমার পড়া?

হ্যাঁ। সময় তো কাটাতে হবে!

কথা বলতে বলতেই মারজা প্রসাধন সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভিটোর সামনেই ও কাঁধ থেকে হাউসকোটটা খসিয়ে দিলো। ওর পরনে এখন কেবল ব্রেসিয়ার এবং প্যান্টি! আপনার সামনে পোশাক বদলানোর জন্যে ক্ষমা চাইছি। কিছু মনে করলেন না তো?

না কিছু মনে করিনি। তবে মেয়েদের ব্যাপারে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই।

সত্যি আপনি খুব ভালো বৃদ্ধ। আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে। মেরি ভিটোর চোখে চোখ রেখে বলে, এই পৃথিবীতে মাত্র কয়েকজন পুরুষকেই আমার ভালো লাগে, আপনি তাদের মধ্যে একজন। বাকিগুলো সব পশু।

ধন্যবাদ। ভিটো বললেন, আশাকরি আমরা একদিন পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠতে পারবো।

নিশ্চয়ই! হঠাৎ কি ভেবে মারজা পাউডারের পাফটা ভিটোর হাতে তুলে দেয়। আমার পিঠে একটু পাউডার মাখিয়ে দেবেন?

আমরা দুজনে বন্ধু হতে গেলে তুমি নিজে তোমার পিঠে পাউডার মাখিয়ে নাও। ভুলে যেও না আমিও মানুষ। এবং পুরুষ।

ট্যাক্সিতে উঠে ভিটো পেছনের আসনে গা এলিয়ে দিলেন। মারজা ওঁর একটা হাত নিজের মুঠোয় জড়িয়ে ধরল। মারজার গায়ের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে।

আচ্ছা মারজা, জীবনে তুমি কি চাও বলো তো?

অন্ধকারে ওর চোখ দুটো দেখা গেল না ভালো করে। শান্ত অথচ ধীর স্বরে বলল, প্রেম, সুখের নীড়, স্বামী, সংসার এবং নিরাপত্তা। অন্য আর পাঁচটা মেয়েদের থেকে আমি আলাদা নই।

কিন্তু—ভিটোর কথায় ইতস্ততঃ ভাব।

মেরি ওঁর কথার জের টেনে বলল, আমি বেশ্যা, এই কথাটাই আপনি বলতে চাইছেন তো? তাতে কি? বেশ্যারাও তো আর পাঁচটা মেয়েদের মতোন স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে চাইবে। তারাও হাসতে জানে, কাঁদতে জানে, স্বপ্ন দেখতে জানে। কেন, জানে না?

তাহলে কেন তুমি অন্য জীবন বেছে নিলে না মারজা?

চেষ্টা করিনি, একথা আপনি ভাবলেন কি করে? ম্লান হেসে ও বলে, জানেন, ছেলেবেলা থেকে আমি আপ্রাণ সংগ্রাম করেছি এর বিরুদ্ধে। কিন্তু ছেলেরা আমার চারদিকে ঘিরে ছিল মৌমাছির মতো মধুর লোভে। আমি নাকি পুরুষদের দেহদান করার জন্যেই জন্মেছি, একজন আমাকে বলেছিল। তখন আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, সে ঠিকই বলেছিল।

ভিটো ওর হাতে মৃদু চাপ দিলেন। হঠাৎ ওঁর মনে হলো, এই মেয়েটিকে উনি খুব পছন্দ করেন। সত্যি মেয়েটির সাহস এবং সততা দুই-ই আছে।—আমার বিশ্বাস, তোমার স্বপ্ন একদিন না একদিন ঠিক সার্থক হবেই!

মারজার সঙ্গে রসের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে ভিটো চমকে উঠলেন। রসের মুখটা হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠল ওকে দেখে। তাহলে?

মারজা, তুমি?

মারজাও কম আশ্চর্য হয়নি। প্রত্যুত্তরে ও বলে, অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, তাই না রস?

হ্যাঁ, প্রায় সাত বছর পরে মারজা। রস উঠে দাঁড়িয়ে ভিটোর দিকে তাকিয়ে বলে,—বসুন হ্যাঙ্ক।

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের আলাপ। রস হাসতে হাসতে বলে—ফোনে তখন আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আপনার সঙ্গে আমিও একমত, পৃথিবীতে সব থেকে সুন্দরী মেয়ে বলতে ওকেই বোঝায়।

ভিটো ওদের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

রসের মেয়ে বন্ধু স্বভাবতই দারুণ বিরক্ত হলো তার ওপর। নৈশভোজের প্রায় সারাটা সময় রস কেবল মারজাকে নিয়ে কাটাল। সে যেন মেয়েটিকে চেনেই না, এমনি ভাব দেখাল।

ভিটো সব লক্ষ্য করছিলেন শুরু থেকে। মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন, অনেকদিন পরা ওরা মিলিত হয়েছে, ওদের গল্প করতে দিন। আমরা ততক্ষণে বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি চলুন! মেয়েটি উঠে দাঁড়াতেই ভিটো তার একটা হাত নিজের মুঠোয় জড়িয়ে নিলেন।

স্কচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রস বলে, তারপর তোমার কি খবর বলো মেরি!

ভালো। তোমার খবর ভালো? কি করছ এখন?

জোকার মার্টিনকে তুমি তো চিনতে। বাবা আমাকে তাড়িয়ে দেবাব পর ও-ই আমাকে প্রথমে কাজ দেয়। তবে এখন আমি স্বাধীন ভাবে কাজ করছি। প্রচুর টাকা রোজগারের সম্ভাবনা।

তুমি কি সেই রকমই আছ রস। কেবলি টাকার ধান্দা।

টাকাই তো জীবনের সব কিছু মারজা।

না, আমি তা বিশ্বাস করি না। মারজা ম্লান হেসে বলল,—পারো টাকা দিয়ে তোমার অতীতকে ফিরিয়ে আনতে?

কেন পারবো না? আমাকে যে পারতেই হবে।

তার মানে? মারজা চমকে তাকাল তার দিকে।

সত্যিই রস ঠিক আগের মতোই আছে। কিছুতেই সে ওর সঙ্গ ছাড়ল না। ওর ঘরে এসে উঠল সে। রস ওর ঘরে ঢুকে বলল, তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আসল কথাটাই তো এখনো আলোচনা হয়নি।

তোমার আবার কি কথা থাকতে পারে? তুমি আমি আমরা কেউ আজ আর সেই সুদূর অতীতে ফিরে যেতে পারি না। মেরী ম্লান বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে,—এই সাত বছরে আমার জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে যা তুমি কল্পনাও করতে পারো না রস।

আমি তোমার অতীত নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে চাই না। রস আবেগে বলে, তোমার প্রতি আমার তীব্র কামনা আজও রয়ে গেছে।

এসব মন ভোলানো কথা তুমি তো অন্য মেয়েদেরও বলো, বলো না? মারজার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি।

কিন্তু ওদের থেকে তুমি একেবারেই আলাদা। চিরকালই আমার চোখে তুমি একেবারে অন্য ছিলে। আমার চোখে আজও তুমি অনন্যা রয়ে গেছো।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ, এখন আমি বড় হয়েছি। ছেলেবেলার মতো তুমি আর আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমি, আমি তোমাকে আবার ফিরে পেতে চাই।

তার কথাগুলো শুনতে খুব বিরক্ত লাগছিল মারজার। বুঝিবা একটু ক্লান্তও ও।—অনেক রাত হয়েছে, আজ তুমি বাড়ি যাও রস।

না, বাকি রাতটুকু তোমায় আমি কিনে নিলুম মারজা। রস ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে বিছানার দিকে আকর্ষণ করল।

বিছানায় পাশাপাশি দুজনে শুয়েছিল অনেকক্ষণ। রসের সিগারেটের আরক্তিম আভায় ওর সুন্দর মুখের খানিকটা অংশ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওর সান্নিধ্য, ওর নিবিড় স্পর্শ তাকে দারুণ ভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিল। মারজা! গাঢ় স্বরে সে ডাকল।—আমার সান্নিধ্যে এলে তোমার কোন অনুভূতি হয় না?

নিশ্চয়ই সোনামণি! মারজা ফিসফিসিয়ে বলে, তুমিও তো পুরুষ।

না মারজা, আমি ঠিক ওভাবে বোঝাতে চাইনি। কথাটা বলতে গিয়ে তার বুকটা কেঁপে উঠলো এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়। সঙ্গে সঙ্গে সে বাচ্চা ছেলের মতোন ডুকরে কেঁদে উঠলো।

মারজা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না তার কান্না দেখে। সহসা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্তনের ওপর চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে,—এখানে সোনামণি, এখানে।

পরের দিন একটু দেরীতেই ঘুম ভাঙল রসের। মারজা তখন রান্নাঘরে ব্রেকফাস্ট তৈরী করতে ব্যস্ত ছিল।

মারজা! ওর কাছে গিয়ে সে ডাকল। মারজার একটা হাত সে নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে, কাল রাতে শেলটন ক্লাবে যে কথা আমি বলতে পারিনি আজ সেটা না বলে আমি থাকতে পারছি না মারজা।

মারজা নয়, বলো মেরি। তোমার জেনে রাখা ভালো মারজা মরে গছে অনেক আগেই।

যে নামেই তুমি ডাকতে বলো না কোনে, আমার কাছে আজও তুমি মারজা, আমার প্রিয়তমা মারজা। আমি বড় হয়েছি, তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। এখন থেকে তোমার ভাবনা আমার ভাবনা এক করে ফেলতে চাই। আমি আবার অতীতে ফিরে যেতে চাই মারজা। আমি তোমাকে—

কি বললে? মারজা আঁতকে ওঠার মতো করে বলে, তার মানে বিয়ে?

হ্যাঁ মারজা, তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

তা আর হয় না। মারজা নির্লিপ্ত ভাবে বলে, একার জীবন, এই ভালো। আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে অন্য আর কাউকে জড়াতে চাই না। ডিমের অমলেট তৈরী করতে গিয়ে ও বলে, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি করো, খেয়ে নাও, অমলেট ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রস সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠল, মাইকেল বলল, তুমি কিন্তু তাকে ফেরাতে পারতে না। তার মধ্যে তুমি কি দেখেছ কে জানে! যাইহোক সে আর ফিরবে না তোমার কাছে। কয়েক

দিনের মধ্যেই সে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে।

সেকি! মাইকেল যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে? মারজা উঠে জিজ্ঞেস করে, ওকে এখন কোথায় পাঠানো হবে জানো?

না, জানি না। রস খিঁচিয়ে ওঠে, এরপর তুমি হয়তো বলবে, তার খোঁজ এনে দিতে। তা আর হচ্ছে না। তবে তার সঙ্গে দেখা হলো বলবো, সৈনিকদের জন্যে তোমার কাজের বিশেষ কদর আছে।

ভিটোর টেবিলের সামনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল জোকার মার্টিন।

কি ব্যাপার জোকার? ভিটো অবাক চোখে তাকালেন, তোমাকে অমন চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন বলো তো?

আমাকে ছেড়ে পশ্চিমে হাওয়া খেতে চলে যাচ্ছে রস, শুনেছেন?

হ্যাঁ শুনেছি। ভিটোর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। আর এও শুনেছি, মারজা নামে একটি মেয়েও তার সঙ্গে যাচ্ছে।

মারজা? জোকার হতবাক। কে সে? রস তাকে বিয়ে করতে চায় নাকি?

ভিটো মাথা নাড়লেন। না, অন্তত মেয়েটির সেরকম কোন ইচ্ছে নেই। মেয়েটি এক বিশেষ ধরনের বেশ্যা। ও আমাকে বলেছে বেশ আছি। বেশ্যা হয়েই থাকতে চায় ও, কারোর বধূ হয়ে নয়। ওর মতে বধূ হওয়ার জ্বালা নাকি অনেক। তাছাড়া ওর ভাগ্যে নকি বড় হওয়া নেই।

তা তো থাকবেই না। জোকার খিস্তি করে, খানকি মাগীরা কখনো স্বামী, ঘর, সংসার চায় নাকি? ওরা কেবল একটা জিনিষই চেনে, সেটা হলো টাকা। মারজা। বেশ্যার উপযুক্ত নামই বটে।

মারজা, মারজা ফ্লাড।

ভিটো এবার ওর নামের সঙ্গে পদবীটাও জুড়ে দিলেন।

মাজরা ফ্লাড। হঠাৎ জোকারের মুখটা লাল হয়ে ওঠে। এবার উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলে, আচ্ছা। সোনালি চুল, বাদামী চোখের সেই মেয়েটি?

হ্যাঁ ভিটোর চোখে কৌতূহল। তুমি ওকে চেনো নাকি?

চিনি বৈকি! নামটা শুনেই আমি আন্দাজ করেছিলাম। দাঁড়াও! বিয়ে! মজা দেখাচ্ছি তোমাদের। জোকার স্বগোক্তি করে, এক ঢিলে দুটো পাখী কি করে মারতে হয় আমার জানা আছে। আচ্ছা আজ চলি। চলে আসতে গিয়ে সে বলে, ধন্যবাদ মিঃ ভিটো, এমন দরকারি খবরটা দেওয়ার জন্য।

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় মারজার। ঘুম জড়ানো চোখেই রিসিভারটা তুলে নেয় ও। হ্যালো?

মারজা? ওপার থেকে একটা সতর্ক কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরাভাষে, আমি ফ্রাঙ্ক মিলারসেন কথা বলছি।

কি ব্যাপার ফ্রাঙ্ক, আবার কোন ঝামেলা বাঁধল নাকি?

না না, ওসব কোন ব্যাপাব নয়, মারজা।

তাহলে?

কয়েকমাস আগে তুমি আমাকে খোঁজ নিতে বলেছিলে এক প্রাক্তন পুলিশ যে এখন সৈন্যবাহিনীতে কাজ করছে, মনে আছে? মাইকেল কেইস, তোমার বান্ধবীর ভাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। রসও সেদিন বলছিল মাইকেল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, তবে জায়গার নাম বলেনি। মারজা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, সে এখন কোথায়, কোথায় সে?

সেন্ট অ্যালবানস্ ভেটারনস হাসপাতালে। উত্তর আফ্রিকায় আহত হবার পর তাকে ওখানে ভর্তি করা হয়। তবে আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়। ফ্রাঙ্ক বলে, তোমার বান্ধবীকে বলো, চিন্তার কিছু নেই।

ধন্যবাদ ফ্রাঙ্ক। বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও।

মারজা বিছানায় শুয়ে ভাবে, মাইকেল হাসপাতালে একা একা কি করছে কে জানে। ফ্রাঙ্ক বলেছে, আমার বান্ধবীকে মাইকেলের খবরটা দিতে। ফ্রাঙ্ক জানে না, ওটা বানানো। কিন্তু মাইকেলের যদি অন্য কোন বান্ধবী কেউ থেকে থাকে! কে জানে, মাইকেল এখনো ওকে মনে রেখেছে কিনা!

সে যাই হোক, হাসপাতাল থেকে মাইকেল ছাড়া পেলেও তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে। ও নিজে যাবে হাসপাতালে তাকে আনতে।

রাতের নৈশভোজ সেরে বাড়ি ফিরতে ওদের অনেক রাত হয়ে গেলো। ট্যাক্সিতে মাইকেল কি যেন একটা কথা বলছিল, তাই নিয়ে তখনো হাসাহাসি করছিল। তবে মাইকেলের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত চেহারা দেখে ভয় পেলো মারজা।

নাচের আসরে তোমাকে পেয়ে আমি এমনি আনন্দে মেতে উঠেছিলাম, মারজা কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বলে, তুমি যে হাসপাতাল থেকে ফিরেছ, কথাটা আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।

কেন, আমি তো বেশ ভালই আছি মারজা।

না, তুমি ভাল নেই। তোমার মুখ বলছে, তোমার কষ্ট হচ্ছে। মারজা তাকে এক রকম জোর করে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো, আর কোন কথা নয়, এখন তোমার ঘুমোবার সময়। ঘুমোও।

মারজা, মাইকেল কপট প্রতিবাদ জানায়, তুমি কি এখনো আমাকে বাচ্চা ছেলে ভাবো নাকি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তার চোখে চোখ রেখে ও হাসে। সপ্তাহ শেষে ছুটির এই দুটো দিন কেবল তুমি আমার খোকা, আমার সোনামণি হয়ে থাকবে বুঝলে? তারপর হাসিটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ও বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

ফিরে এসে ও দেখল, মাইকেল শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে কি! তুমি এখনো ঘুমোওনি?

আমি অনায়াসে কৌচে শুতে পারতাম। মাইকেল অনুযোগ করল, তোমার বিছানা আমাকে ছেড়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না।

মারজা বেশ বুঝতে পারে ওর চোখের তারা উদ্দীপ্ত একটা কামনায় ঝিকিয়ে উঠছে। ছুটে এসে মাইকেলের গলাটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো ও।

মাইকেল তুমি এতো বোকা, কিছুই কি বোঝো না? তারপর ও মাইকেলের মুখটা নামিয়ে এনে চুমোয় ভরিয়ে দিলো। ঠোঁটে ওর দাঁতের নিষ্পেষণ বড় মধুর মনে হলো তার।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো বুকের মধ্যে যতক্ষণ না ও হাঁপিয়ে ওঠে। নিবিড় স্পর্শে ওর চোখ বুঁজে আসে আবেশে। এমন সুমধুর অনুভূতি এর আগে কখনো ওর হয়নি। এই প্রথম, হয়তো বা শেষ। সঙ্গে সঙ্গে ও চমকে উঠল। না না, শেষ নয়। চিবদিন, সে ওর চিরদিনের। চিরদিন সে যেন এমন নিবিড় করে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখে। এই ওর একমাত্র কামনা, একমাত্র বাসনা।

মাইকেল! অস্ফুটে ও বলে ওঠে, আমি, আমি তোমাকে ভালবাসি মাইকেল!

মাইকেলের মুখের ওপর ভোরের আলো এসে পড়েছিল। তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মারজা ভাবে, সপ্তাহান্তের দুটো দিন কি তাড়াতাড়িই না গতকালে পরিণত হয়ে গেল। চোখ বুজে দুটো দিনের স্মৃতিমন্থন করতে থাকলো ও।

সৈনবাহিনীতে ফিরে যাবার আগেই তোমায় বিয়ে করতে পারি।

চোখ খুলে অবাক চোখে তাকায় ও, সেকি তুমি জেগে ছিলে? আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ঘুমচ্ছো।

আমার প্রশ্নেব উত্তর কিন্তু এখনো পেলাম না।

সে তো তুমি ভালো করেই জানো মাইকেল।

তাহলে বাধাটা কিসের? লেফটেনাণ্টদের মাইনে তো ভালোই। মাইকেল ওকে বোঝায়, তাছাড়া যুদ্ধ শেষ হলে আমি আইন পড়বো। ওকালতিতে অনেক পয়সা রোজগার করা যাবে।

না, মাইকেল না, টাকার কথা আমি আদৌ ভাবছি না। মারজা আর্তস্বরে অনুরোধ করে, চুপ করো মাইকেল দয়া করে। এ ব্যাপারে আমাকে আর প্রশ্ন করো না, দোহাই তোমার।

কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি মারজা। আমি তোমাকে চিরদিনের জন্যে আমার কাছে পেতে চাই। কিন্তু তুমি কাল থেকে আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো না কেন মারজা? তবে কি বিয়ের পর তোমার চাকরি চলে যাবার ভয়ে?

না মাইকেল, তাও নয়।

মাইকেল ওকে কাছে টেনে এনে চুমু খায়। তোমার জীবনে যদি অন্য কিছু থেকে থাকে তো আমাকে বলতে পারো। আমি কোন কিছুতেই ভয় পাই না। কোন বাধাই আমাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমি, আমি তোমাকে পাগলের মতোন ভালবাসি মারজা।

একথা আমাকে অন্য একজনও বলেছিল একদিন।

তুমি কি তোমার মন থেকে বলছ এসব কথা?

মাথা নাড়ল মাইকেল।

একথা আর একজন আমাকে বলেছিল। কিন্তু বাস্তবে সেটা সে স্বীকার করেনি।

বেশ তো আমাকে বিয়ে করে নিজের চোখেই পরীক্ষা করে দেখ না কেন।

হঠাৎ কলিংবেলটা বেজে উঠল। এতো সকালে কে আসতে পারে? মাইকেল কৌতূহলী চোখে তাকায়।

বোধহয় দুধওয়ালা। দরজা খোলার দরকার নেই। কিছুক্ষণ বেল টেপার পর আর টিপবে না।

কিন্তু ঘণ্টাটা অনবরত বেজে চলে। মারজা বিরক্ত হয়ে শেষে দরজা খুলে দিলো। রসকে দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো মারজা।

আমি জানতাম তুমি ঘরেই আছ। রস ভেতরে ঢুকতে যায়।

মারজা তাকে বাধা দেয়। হঠাৎ না জানিয়ে ঘরে ঢুকতে পারো না। তোমাকে বলছি না, আমাকে না জানিয়ে আসবে না।

কি করে জানাবো? ফোন তো তুমি ধরতেই চাও না। যাকগে আমার কাজের কথাটা শেষ করে নিই। শোন বেবি, আজই আমি সমুদ্রোপকূলে পাড়ি দিচ্ছি। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

রস তুমি ছেলেমানুষ, তাই আমার কথাটা বুঝতে পারছো না, বিরক্ত হয়ে ও বলল, —তোমাকে কতবার আমি বলেছি, তোমার সঙ্গে আমি কোথাও যেতে পারি না।

মারজার হাত চেপে ধরে রস গর্জে ওঠে। তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকেল শোবার ঘরের দরজা খুলে থমকে দাঁড়ায়। রসকে সে প্রথমে চিনতে পারে না। মারজা, আমি কি তোমার কোন সাহায্যে আসতে পারি?

আরে মাইকেল যে! রসের ঠোঁটে ক্রুর হাসি। ও! এবার বুঝছি, কেন ও আমার ফোন ধরছিল না। তা ও নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে বেশ ভালো দরই দিয়েছে। একজন সৈনিকের কাছে একশো ডলার এমন কিছু বেশি নয়। তার ওপর এমন যত্ন করে ব্রেকফাস্ট করে খাওয়ানো—

রস অবাক চোখে তাকায় মারজার দিকে। ওর মুখটা ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছে।

কেন, ও তোমাকে কিছু বলেনি? তারপর সে মারজার দিকে ফিরে বলে, এটা তুমি ঠিক করোনি। তোমার আগে বলা উচিৎ ছিলো। ওর কাছে বাড়তি টাকা নাও তো থাকতে পারে। পকেট থেকে একগাদা টাকা বার করে মাইকেলকে সে বলে, —এই নাও, নিউ ইয়র্কের সবেচেয়ে দামী বেশ্যাকে নিয়ে উপভোগ করার জন্যে এই টাকাগুলো যথেষ্ট বলেই আমার মনে হয়। সৈন্যদের জন্যে কিছু একটা করার ইচ্ছে আমার সব সময়ই ছিলো।

মাইকেল আবার বিহ্বল চোখে তাকায় ওর দিকে। মারজা বলে, এসব সত্যি নয়। তার গলায় করুণ আকুতি। তুমি না বলেছিলে, আমাকে তুমি ভালবাস?

তখনো নীরব মারজা।

রসের কণ্ঠে বিদ্রুপের সুর। —আর ও তোমাকে জড়িয়ে ধরে বলেনি, তোমার মতোন সুপুরষ চেহারা আর কারোর নেই। আর যখন তুমি ওকে চুমু খাও তখন ও বলে না, ওর দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে? তারপর যখন তুমি ওর দেহের সঙ্গে তোমার দেহ—

রসের কথা শেষ হওয়ার আগেই মাইকেল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিংস্র জন্তুর মতো রাগে উত্তেজনায় ফুঁসছিল সে। কিন্তু একটু বোধহয় দেরী হয়ে গিয়েছিল। রস ঠিক সময়ে সরে যেতেই মাইকেল অনুভব করল তার পিঠের ওপর একটা কঠিন আঘাতের। তারপর মুখের ওপর। মেঝের ওপর পড়ে যেতেই রস তার বুকের ওপব দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল। তার হাতের চাবুকটা আছড়ে পড়তে থাকলো মাইকেলের দেহের ওপর।

থামো রস থামো। মারজা আর্তনাদ করে ওঠে, তুমি কি ওকে মেরে ফেলবে?

হ্যাঁ, তাই আমি চাইছি। রস ক্ষ্যাপা জন্তুর মতো চিৎকার করে উঠল, এই মুহূর্তটার জন্যে আমি অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করছিলাম। তোমার সঙ্গে ওর প্রথম আলাপের দিন আমাকে অপমান করার প্রতিশোধ নিতে পেরে আমি আজ দারুণ খুশি। হাতের ইশারায় মারজা তাকে কি যেন বলে। রস হাতের চাবুকটা উঁচু করে বলে, কি বলতে চাও বলো।

আমি তোমার সঙ্গে যাবো। তুমি যদি ওকে ছেড়ে দাও।

ঠিক আছে, আমি থামছি। তুমি তৈরী হয়ে নাও, আমি ততক্ষণে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছি।

মারজা প্রথমে নড়ল। ওর দৃষ্টি পড়েছিল আহত মাইকেলের দিকে। ওর বুকটা তখন ফেটে যাচ্ছিল মাইকেলের জন্যে।

ক্যালিফোর্নিয়ার উজ্জ্বল সোনা রোদ যেন পাহাড়ের মসৃণ গা বেয়ে পিছলে পড়েছিল। সেই সময় এক দীর্ঘদেহী লোক দবজার সামনে এসে কলিংবেল টিপল। মারজা দরজা খুলে তার দিকে তাকাতেই চিনতে পারলো। আরে আপনি? কতদিন বাদে দেখা, তাই না মিঃ মার্টিন?

জোকার মার্টিন মাথা নাড়ল। হ্যাঁ তা প্রায় চার বছর পরে দেখা আমাদের।

সেই সময় নিগ্রো আয়ার হাত ধরে একটা বাচ্চা মেয়ে জোকারের সামনে এসে দাঁড়াল। জোকার অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটির দিকে। ও ওর মায়ের মতোই রূপ পেয়েছে। মারজার মুখের আদল পেয়েছে মেয়েটি। বড় হলে মায়ের মতো ও অনেক পুরুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। মার্টিন মনে মনে ভাবল। তারপর মারজার দিকে ফিরে সে বলল, তোমার মেয়ে তো এখন রীতিমতো মহিলা, কি বলো!

মারজা হাসল। ওর বয়স এখন ছয়। মারজা একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, কি খাবেন বলুন? স্কচ না বিয়ার।

তোমার যা পছন্দ।

মারজা বৃদ্ধ টমকে ইশারায় ডাকল।

জোকার অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল টমের দিকে। লোকটাকে কোথায় দেখেছি বল তো? চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

কোটিপতি গর্ডন পেইন্টারের বাড়িতে। ভদ্রলোক বিমান দুর্ঘটনায় আহত হলে আমি ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি। ও আমার প্রকৃত বন্ধু, জানেন মিঃ মার্টিন!

তাহলে, শান্ত নম্রভাবে সে বলে, পেইন্টরটারকে তুমি চিনতে?

হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে টম হুইস্কির গ্লাস রেখে যায় টেবিলের ওপর। জোকার তার গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে বলে, তোমার কাছে একটা বিশেষ খবরের জন্য এসেছিলাম। আচ্ছা, ইদানীং তুমি কি রসের মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ?

কি বলতে চান আপনি? মারজা বিরক্ত হয়।

টাকার লোভটা ওর বড় বেশী বেড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

আমি কি করতে পারি। মারজা প্রসঙ্গটা এড়াতে চায়, আপনি তো ওকে চেনেন, কি রকম খেয়ালী পুরুষ।

সেই জন্যে তো তোমার কাছে এসেছি। আচ্ছা মারজা তুমি ওকে ভালবাস?

এটা একটা বাজে প্রশ্ন হয়ে গেলো না?

না মারজা, এভাবে আমার প্রশ্নটা এড়াবার চেষ্টা করো না, আমি যা জানতে চাইছি ঠিক মতো উত্তর দাও।

মারজার মুখটা হঠাৎ অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। —না, আমি কোনদিন ভালবাসতে পারিনি।

তাহলে তো ভালই হলো। বলতে আর দ্বিধা নেই, রসের এই টাকার মোহ তাকে একদিন ঠিক খতম করবে দেখো।

ঠিক আছে আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো।

না, তার আর দরকার নেই। ওরা তার সম্বন্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে।

ওরা নিয়েছে, নাকি নিজের মতামতটা আপনি অন্যদের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন!

তাই বা কি করে হয়। মার্টিন বলে, আমার সেরকম কোন মতলব থাকলে অন্তত তোমার কাছে এভাবে চোরের মতন ছুটে আসতাম না।

খানিক আগে জোকার মার্টিন রসকে শাষিয়ে গেছে, সানদুর হোটেলের সর্ত ছেড়ে না দিলে তাকে তার লোভের মাশুল গুণতে হবে। সেই সঙ্গে সে মারজাকে বলে গেছে, তোমার অবস্থায় পড়লে এই নরককুন্ড ছেড়ে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে কোথাও বেরিয়ে আসতাম। জোকারের আসল মতলবটা কি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যাইহোক, জোকার চলে যাওয়ার পরই রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল। ওপর থেকে সাড়া পেতেই সে বলল, —পেটি, এইমাত্র জোকার চলে গেলো। তুমি এখুনি দুটি ছেলেকে আমার বাড়ির ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠিয়ে দাও। এখুনি আসার কোন আশঙ্কা অবশ্য নেই। তবে আগে থেকে একটু সতর্ক হওয়ার দরকার। বলে সে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

এবার মারজার কথা ভাবল সে। কে জানে এসবের কতটুকু আঁচ করতে পেরেছে। ও এসব ব্যাপারে ওকে কোনদিনই জড়াতে চায়নি রস। তার মনে পড়ল এখানে চলে

আসার দু'মাস পরের একটা দিনের ঘটনার কথা যেদিন সে প্রথম জানতে পারল মারজা গর্ভবতী।

তুমি ইচ্ছে করলে তোমার বাচ্চাটাকে নষ্ট করতে পারো। আমার একজন ভালো ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় আছে।

উঁহু। মেরি মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল, এই বাচ্চাটাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

গর্বে হাসি ফুটে ওঠে রসের সারা মুখে। তাহলে তো আমার বিয়েও করতে পারি এবং—

না, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না।

কিন্তু, রস বিহুল চোখে তাকায়, তুমি যে বললে বাচ্চাটাকে চাও!

হ্যাঁ, চাই বৈকি। মারজা ওর মা'র কাছে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে।

তাহলে আমাকে বিয়ে করবে না কেন? বাবা হওয়ার সৌভাগ্য থেকে কেন আমি বঞ্চিত হবো? তাছাড়া সেটাই তো শোভনীয় হবে আমাদের জীবনে।

তা ঠিক। মারজা ওর ব্যাগে পোশাক ভরতে গিয়ে বলল, বাচ্ছাটা তোমার নয়।

তাহলে কার? রসের মুখে রক্ত চলকে ওঠে। মাইকেলের?

তোমার যখন নয়, কার সেটা তোমার জেনে কি লাভ? মারজা শ্রাগ করল, তাছাড়া আমার কাছে অন্য আরো কতো পুরুষতো তখন যাতায়াত করতো ওখানে।

রস হঠাৎ ওর মুখের ওপর সজোরে চড় কষিয় দিলো। বেশ্যা কোথাকার! মারজা মেঝের উপর আছড়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলো। রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা ওর ঠোঁট বেয়ে নামল। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না।

রস তাতে আরো রেগে গেলো। ঠিক আছে তোমার কোথাও যাওয়া হবে না, যতক্ষণ না আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিই।

বাচ্ছাটা কিন্তু মাইকেলের।

তাতে আমার কিছু যায় আসে না। রস উদাস ভারে বলে, তুমিই আমার, এই যথেষ্ট।

জোকার মার্টিন চলে যাওয়ার পর প্রায় মাস খানেক কেটে গেছে। রস এখন সুনিশ্চিত, তার দিক থেকে এখন নতুন করে কোন ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাছাড়া জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি এখন তার ওপর। তাই খুশিতে শিস্ দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকলো সে।

তোমার দেহরক্ষীরা সব গেলো কোথায় রস? মারজা তাকে জিজ্ঞেস করলো।

রস হাসে! আমি তাদের বিদায় দিয়েছি। আমার ধারণা, জোকারের তরফ থেকে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

তবু তুমি কাজটা ভালো করোনি রস। মারজার বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে অজানা আশঙ্কায়।

ভয় কি, কালই তো আমরা অ্যারোহেডে তোমার মেয়ের কাছে চলে যাচ্ছি। রস ওকে কাছে টেনে ওর একটা হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে শান্ত ভাবে মিনতি জানায়, মারজা,

কাল আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তারপরেই হবে আমাদের সত্যিকারের হনিমুন।

মারজা তার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে এই প্রথম কেন জানি না তার জন্যে ব্যথা অনুভব করলো। নরম গলায় ও বললো, সত্যিই কি তুমি মন থেকে তাই চাও রস?

হ্যাঁ মারজা, এখন আমাব মনে হচ্ছে তোমাকে আমার একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রথম ও অনুভব করল, সে আজ অনেক বড় হয়ে গেছে এবং তার চোখের মধ্যে ও দেখতে পায় নগ্ন নিঃসঙ্গতা। ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, ঠিক আছে রস, ফিসফিসিয়ে ও বলে, কালই আমরা বিয়ে করবো।

রস আবেগে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু খায়। এখন থেকে আমি তোমাকে আর কষ্ট দেবো না। বিশ্বাস করো মারজা, তোমাকে সুখ দেওয়াই আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য।

তোমাকে অতো করে বলতে হবে না রস, আমি এই মুহূর্তেও অনেক সুখী।

রস ওকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে সব সময় ভালোবাসতাম, এ কথা আগে বুঝিনি। জানো মারজা, এতদিন আমি তোমাকে অবহেলা করেছি।

তোমাকে এতো করে বলতে হবে না রস! মারজা মিষ্টি হেসে বলে, আমি তো তোমাকে আগেই সম্মতি দিয়েছি।

পাশের ঘরে তখন টেলিফোনটা বেজে চলেছিল। রস কিংবা মারজা কেউই মাথা ঘামালো না এ নিয়ে। একসময় টেলিফোনের আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেলো। একটু পরেই টম দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

মিসেস ড্রেগো, আপনার ফোন।

মারজা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো মারজা। রস হাসে।

মারজা তার কপালে চুমু খেয়ে বলে, আচ্ছা সোনামণি, আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।

মারজা ত্রস্ত হাতে রিসিভারটা তুলে নেয়। হ্যালো!

কোন সাড়া শব্দ নেই ও প্রান্ত থেকে।

হ্যালো, কে কথা বলছেন? মারজা আবার মাউথপীসে মুখ রাখলো।

মারজা? এবার ও প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

হু। কে আপনি?

মারজা? আবার সেই কণ্ঠস্বরের পুনরাবৃত্তি শোনা যায়। ভাবখানা এই যে, মারজা কোন উত্তর দেয়নি।

মারজার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ওর বুকটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। এবারে ও তার কণ্ঠস্বর চিনতে পারে। আর ও এও বুঝতে পারে, কেন ওকে এ সময় ফোন করা হয়েছে।

রস! হঠাৎ মারজ্জা আর্তনাদ করে ওঠে। ওর নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানে যেন বোমা বর্ষণ করে, রস!

সেই মুহূর্তে বসার ঘরে কাঁচের আর্সি ভাঙ্গার শব্দ হলো। মারজ্জার হাতের রিসিভারটা খসে পড়ল। দ্রুত ছুটে গেলো ও বসার ঘরে। রস তখনো কৌচের ওপর বসেছিল। ফ্যাকাশে মুখ। দুহাত দিয়ে বুকটা সে চেপে ধরে অস্ফুটে বলে ওঠে, মারজ্জা, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। রসের দশটা আঙুল রক্তে ভেসে যাচ্ছিল।

টমও শব্দ শুনে ছুটে এসেছিল। তাকে দেখে মারজ্জা তাড়াতাড়ি বলে, টম এখুনি ডাক্তারকে খবর দাও। টম বেরিয়ে যায়। মারজ্জা গিয়ে রসের মুখটা ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরে। লক্ষীসোনা আমার ওরকম করো না। তোমার কিছু হয় নি। এইতো আমি এসে গেছি কোন ভয় নেই।

আমি এতোদিন তোমার ওপর অবিচার করেছি মারজ্জা, রস আক্ষেপ করে বলে, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি নিজেকে ভালো করার অনেক চেষ্টা করেছি।

আমি জানি রস। তোমাকে বলতে হবে না। মারজ্জার দুগাল বেয়ে অশ্রুর বাদল নামে। ঝুঁকে পড়ে রসের কপালে চুমু খায় ও।

মারজ্জা। ওর বুকের মধ্যে থেকেই সে বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমিও কি আমার মতো—

হ্যাঁ রস, আমিও তোমাকে ভালোবাসি। তা নাহলে আমি তো কবেই চলে যেতাম।

তুমি যাওনি আমি তাতে খুব খুশি। রস ফিসফিসিয়ে বলে, তুমি চলে গেলে আমি খুব ভয় পেতাম।

আমি তোমার পাশে চিরদিন থাকব রস। মারজ্জা তাকে বুকের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরলো।

রসের চোখ বুঁজে এলো। একটু পরেই তার মাথাটা এলিয়ে পড়লো। তার ঠোঁটের কোল বেয়ে রক্তের ধারা নামল। শিউরে উঠল মারজ্জা আর তখুনি ওর নজরে পড়ল, ওর সাদা ব্লাউজটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ভয়ে আঁতকে উঠল ও। তবে, ওকে কি সে—

মিস মারজ্জা। টমের ডাকে ফিরে তাকাল মারজ্জা। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ধন্যবাদ টম ওকে এখানে নিয়ে এসো।

অফিসে মাইকেলের জন্যে একটা জরুরী খবর অপেক্ষা করছিল ঃ ফ্লোরেন্স রেসি। রুজভেল্ট হসপিটালে ভর্তি হয়েছে দশই মে, সকাল সাড়ে সাতটায়। গর্ভপাতের জন্যে শরীরের ভেতরে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে। অবস্থা খুবই খারাপ। সন্দেহ হয় গর্ভপাত অবৈধ।

মাইকেল সোজা চলে এলো তার বন্ধু গোয়েন্দা ক্যাপ্টেন এফ মিলারসেনের অফিস ঘরে। এক্ষেত্রে তার সাহায্য একান্ত দরকার। তাছাড়া পুলিশকে না জানিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

হ্যালো মাইকেল? কি খবর, অনেক দিন পর।

কুশল সংবাদ বিনিময়ের পর মাইকেল কোন ভূমিকা না করে ফ্লোরেন্স রেসির কেসের কথা বলল তাকে।

গোয়েন্দা মিলারসেন সব শুনে দ্রুত উঠে দাঁড়াল. চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। মাইকেল অবাক হলো, ফ্রাঙ্ক ছোটখাটো কেসের ব্যাপারে মাথা গলাতে চায় না। অথচ আজ নিজের থেকে তার সঙ্গে যেতে চাইছে ঘটনাস্থলে। তাহলে সেও কি এ ব্যাপারে সন্দেহের গন্ধ পেয়েছে?

মাইকেল তার পরিচয় দিয়ে নার্সকে জিজ্ঞেস করল, মিস রেসিব সঙ্গে এখন কি কথা বলা যায়?

খুব দুর্বল। নার্স প্রত্যুত্তরে বলে, সাবধানে কথা বলবেন।

আচ্ছা। মিলারসেনকে অনুসরণ কবে রেসির বেডের সামনে এসে দাঁড়াল মাইকেল। রেসি ঘুমচ্ছে বলে মনে হয়, চোখ বন্ধ। সাদা আর নীলে মেশানো ফ্যাকাশে মুখটা তাব বড় করুণ, ক্লান্ত এবং শীর্ণ দেখাচ্ছিল।

মিস রেসি? মিলারসেন আস্তে করে ডাকল।

কোন সাড়া নেই। এবার মাইকেল তাব বিছানা ঘেঁষে ডাকল, মিস রেসি, আপনি আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন?

মেয়েটি এবার সামান্য একটু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

আমি মাইকেল কেইস, আর উনি হলেন ক্যাপ্টেন মিলারসেন। আমরা ডিস্ট্রিক্ট এটার্নি অফিস থেকে আসছি। আপনার কোন আত্মীয়কে খবর দিতে হবে?

না। ফিসফিসিয়ে উত্তব দেয় সে।

আপনার পেশা কি মিস রেসি?

মডেলিং।

নিউইয়র্কে অধিকাংশ মেয়েদের পেশা হয় মডেল নয়তো অভিনেত্রী হওয়া। মাইকেল কথাটা ভেবে তার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি নিজে স্বাধীনভাবে কাজ করেন নাকি কোন এজেন্সির হয়ে।

এজেন্সির হয়ে। 'টরেন্টো এভিনিউ মডেল সংস্থা' এই প্রথম মেয়েটির ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। মিস মারজ্জাকে যদি একবার খবর দেন, উনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। উনি জানেন, কি করতে হবে। উনি—ফ্লোরেন্সের কথা জড়িয়ে আসে, চোখ বুঁজে যায়।

তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে ছুটে আসে নার্স। তার পালস্ দেখে। মিস রেসি এখন ঘুমচ্ছে, নার্স চিন্তিত হয়ে বলে, পরে আপনাদের আর যা প্রশ্ন করার করবেন। এখন ওকে ঘুমতে দিন।

নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এসে মাইকেল জিজ্ঞেস করে, তোমার কি মনে হয় ফ্রাঙ্ক?

কি আর মনে হবে? আর পাঁচটা মেয়ের মতোন এ মেয়েটিও—

কিন্তু ও যে মৃত্যুপথযাত্রী। এই বেলা কিছু একটা করতে না পারলে অন্য মেয়েদের ভাগ্যেও এরকম দুর্ভাগ্য নেমে আসবে যে।

কিন্তু মেয়েটি কিছু না বলতে পারলে আমরা আর কতদূর এগোতে পারি বল?

সেই এজেন্সি অফিসে ফোন করে দেখলে হয় যদি তারা কোন খবর দিতে পারে মেয়েটির সম্বন্ধে। মাইকেল হাসপাতালের অফিস ঘরের দিকে পা বাড়াতে যায়, মিলাবসেন তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়, আমি ফোন করছি। তুমি বরং এখানেই থাক, ইতিমধ্যে মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে গেলে তুমি তার কাছ থেকে আরো খবরা-খবর সংগ্রহ করতে পারো।

কথাটা মন্দ বলনি। মাইকেল মাথা নেড়ে তাকাল। মিলারসেন দ্রুত এগিয়ে গেল অফিস ঘরের দিকে। মাইকেল এবার একটা জায়গা খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জোকার মার্টিন কতক্ষণ অপেক্ষা করছিল বসার ঘরে মারজা জানে না। অলস ভঙ্গীতে এসে দাঁড়াল ও জোকারের সামনে। হাসল সে। সুপ্রভাত মারজা।

সুপ্রভাত, জোকার। আশাকরি খুব বেশী সময় আপনাকে বসিয়ে রাখিনি।

তার ঠোঁটে সূক্ষ হাসি ফুটে ওঠে। দিনের পর দিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি মারজা, আর এই সামান্য কয়েক মিনিটে কি আর এমন কষ্ট হতে পারে বল?'

মারজার পরণে কালো পোষাক। কালো পোষাকে সুন্দর মানিয়েছিল। জোকার ওর দিকে তাকিয়ে পলক ফেলতে ভুলে যায়। চাহনির মানে বুঝতে দেরী হয় না মারজার। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা বিষিয়ে উঠল বসের খুন হওযার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে যেতে।

টেলিফোন করার জন্যে ধন্যবাদ।

টেলিফোন? কবে?

না জানার ভান করবেন না। মারজা তীক্ষ্মস্বরে বলে, আমি আপনার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট চিনতে পেরেছিলাম। ফোনে ডেকে রসের কাছ থেকে আপনি আমাকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন যাতে করে আপনার লোক তাকে খুন করতে পারে, তাই না?

জানি না। জোকার কোচের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বলে, এখন তুমি কি করতে বল?

জানি না। তবে যে কোন একটা চাকরী জুটে যাবে আমার।

অবাক চোখে তাকায় জোকার, তুমি চাকরী করবে? কেন, আমার তো মনে হয় রস তোমার জন্যে প্রচুর ধন সম্পত্তি রেখে গেছে। ঠিক বলিনি?

হতে পারে, কিন্তু আমার জন্যে সে এক কাণা-কড়িটি রেখে যায়নি।

কেন, তুমিতো তার বিধবা স্ত্রী। দেখছি শোকের চিহ্ন হিসেবে কালো পোষাকাও পড়েছ।

আমি তার বিধবা হতে পারি, কিন্তু কোন সময়েই আমি তার স্ত্রী ছিলাম না, হতে চাইনি কখনো। মারজার ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি—আমি তার মৃত্যুর চিহ্ন হিসেবে কালো পোষাক পরিনি। আমাকে এই কালো রঙের পোষাকে ভাল মানায় বলেই আমি পরেছি।

তা যা বলেছ। জোকারের ঠোঁটে সেই ধূর্ত হাসিটা আবার ফুটে উঠতে দেখা যায়।

আপনি তো কোনদিন বিনা মতলবে আসেন না। তা আপনার আজকের প্রয়োজনটা কি বলুন তো?

ছেলেরা তোমার জন্যে খুব চিন্তিত। তারা তোমার জন্যে একটা ভাল কাজও যোগাড় করে রেখেছে।

কাজ? কিসের কাজ? মারজার কেমন সন্দেহ হয়।

একটা মডেল এজেন্সি? মারজা সন্দেহের চোখে তাকায়, একাজের আমি কি আর জানি বলুন?

জোকারের ঠোঁটে সেই ধূর্তমির হাসিটা লেগেই থাকে তখনো পর্যন্ত। তার জন্যে ভেবো না, ও সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি যদি না যাই!

তার ব্যবস্থাও আমার জানা আছে বৈকি? বলে সে পকেট থেকে একটা ফটো বার করে মারজার চোখের সামনে মেলে ধরে। এই ফটোর বাচ্ছা মেয়েটিকে চিনতে পার?

সোনালী চুলের ছোট বাচ্চা একটি মেয়ে ধাত্রীর সঙ্গে খেলা করছে। মারজার কণ্ঠস্বরে ভয় উদ্বেগ এবং এক অদ্ভুত উত্তেজনা, মিচেলি না? ও আপনার কাছে গেল কি করে?

ভাবনার কিছু নেই, জোকার মাথা নাড়ে, ও ভালই আছে। গত সপ্তাহে এ্যারোহেডে তোলা, ফটোটা তোমার ভাল লাগবে, তাই সঙ্গে আনলাম।

ঠিক আছে, আমি যাবো। কিন্তু মিচেলির যেন কোন ক্ষতি না হয়?

তার মানে কি বলতে চাও তুমি?

এবার আপনি দেখছি না জানার ভান করছেন। আপনি ঠিকই বুঝেছেন, আমি কি বলতে চাইছি!

ঠিক আছে, আমি কথা দিলাম, মিচেলির কোন ক্ষতি হবে না।

তাহলে আমাদের চুক্তি পাকা?

মারজা মাথা নাড়ে নিঃশব্দে। একটা চাপা বেদনা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের কোল বেয়ে। জোকারের দৃষ্টি এড়িয়ে চোখ মুছে ফেলে মারজা অতি সন্তর্পণে।

আর একটা কথা, মারজা, কতকটা হুকুমের মতো করে বলে, এখন থেকে আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন না, আমাকে ম্যাডাম বলেই সম্বোধন করবেন।

'পার্ক এভিনিউ মডেল সংস্থার' নাম লেখা দরজার সামনে সতেজ ছন্দিল ভঙ্গিমায় হেঁটে গেল মারজা। সুন্দর ছিম-ছাম সাজানো ঘর। দেওয়ালে সুন্দরী যুবতীদের বিভিন্ন পোজে তোলা প্রায় নগ্ন ছবি টাঙ্গানো সারিবদ্ধ ভাবে, খদ্দেরদের আগাম মনোরঞ্জনের এ এক পরিকল্পনা বটে।

মারজা তার চেয়ারে বসেই বেল টেপে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হুমড়ি খাওয়ার মতো করে ঘরে ঢোকে এক মাঝবয়সি ভদ্রমহিলা। —মিস মারজা, আপনি এসে গেছেন, ভালই হয়েছে। পুলিশ বিভাগ থেকে এখানে লোক ফোন করেছিল।

কি বললেন? মারজা চমকে মুখ তুলে তাকায়। পুলিশ? কি জন্যে?

ফ্লোরেন্স রেসি গর্ভপাতের পর হাসপাতালে এখন নাকি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। পুলিশ জানতে চায়, সেকি আমাদের এখানে কাজ করতেন?

তা আপনি কি বললেন?

একেবারে সোজা বলে দিলাম, ও নামে কোন মেয়ে আমাদের এখানে কাজ করে না। মিসেস মোরিস বিজ্ঞের মতোন বলে, —আমি তো জানি, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা তাই—

মারজাকে কেমন চিন্তিত বলে মনে হলো। যাইহোক, কাজটা কিন্তু আপনি ভাল করেননি। মিথ্যে বলাটা আপনার ঠিক হয়নি। বেচারী রেসি, সত্যি হয়তো কোন বিপদে পড়েছে, আমাদের সাহায্য তার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু আপনি জানেন না মিস মারজা, এসব মেয়েদের বিপদে সাহায্য করতে গেলে কি পরিমাণ ঝুঁকি আমাদের নিতে হয়।

ঠিক আছে মিসেস মোরিস, মারজা প্রসঙ্গ পাল্টায়, আরো কারোর ফোন ছিল?

হ্যাঁ, দুটো ফোন ছিল, মিঃ গেলার্ড তিনটে মেয়েকে চায় আজ সন্ধ্যায় পুরো সময়ের জন্যে। দ্বিতীয় লোকটা ছিল চোদ্দতম সড়কের পশমের পোষাকে বিক্রেতার, সে একটা ভালো মডেল চায়। আমি রেই মারলেকে পাঠিয়ে দিয়েছি তার কাছে। আপনি এখন মিঃ গেলার্ডের ফরমাস রাখার ব্যবস্থা করুন।

ঠিক আছে, আমি দেখছি কি করতে পারি। আপনি এখন যেতে পারেন।

মিসেস মোরিস চলে যাওয়ার পরেই ফোনটা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল। মারজা রিসিভারটা তুলে।

কে মারজা? আমি ফ্রাঙ্ক।

কোন খারাপ খবর আছে নাকি?

তোমাদের ওখানকার একটি মেয়ে ফ্লোরেন্স রেসি রুসভেল্ট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গর্ভপাতের কেস। সে তোমাদের সংস্থায় কাজ করে বলে জানিয়েছে। অথচ তোমার অফিসের এক গর্দভ মহিলা বলে কি, ও নামে কোন মেয়ে নাকি তোমাদের সংস্থায় কাজ করে না। পরস্পর বিরোধী কাহিনীর অর্থই হলো অহেতুক সন্দেহ জাগিয়ে তোলা। হয়েছেও তাই। এখানকার অনেক লোক এখন কেসটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ, ব্যাপারটা এখন কোন্ দিকে গড়াতে পারে?

তা এখন আমি কি করতে পারি বল?

জানি না। কি করতে হবে আমি নিজেই ভেবে উঠতে পারছি না।

আচ্ছা ফ্লোরেন্স এখন কেমন আছে ফ্রাঙ্ক?

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে সে ক্রমশঃ।

বেচারী! আমি গর্ভপাত করতে বারণ করেছিলাম। ও আমার কথা শুনল না।

ওর কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। অনেক দেরী হয়ে গেছে। ফ্রাঙ্ক ধমক দিয়ে ওঠে, —এখন তুমি নিজের কথা ভাব তো।

ঠিক আছে ফ্রাঙ্ক, আমি এখনি ভিটোর সঙ্গে পরামর্শ করব। সে জানে, কি করতে হবে, কি করলে ভাল হয়।

হ্যাঁ, আমি জানি, এ কেসের ব্যাপারে ভিটো উপযুক্ত ব্যক্তি। ফ্রাঙ্ক বলে, কিন্তু কথা কি জান, জেলা প্রতিনিধি দপ্তরের একজন চতুর তরুণ এই কেসটার ব্যাপারে দারুণ ভাবে নাক গলাতে চাইছে, কেন জানি না।

কে বল তো? অন্যমনস্ক ভাবেই জিজ্ঞেস করল মারজা।

কেইস। মাইকেল কেইস। মারজার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে নামটা পুনরাবৃত্তি করতে

গিয়ে।

হ্যাঁ, ছেলেটি কিছুদিন আগে যুদ্ধে যায়। তোমার মনে পড়ে, এই ছেলেটির খোঁজ করেছিলে তুমি একদিন?

আ—আমি? না, না আমার মনে পড়ছে না। মারজা আমতা আমতা করে বলে রিসিভারটা দ্রুত নামিয়ে রাখল। সত্যিই তো, এ যেন অনেক, অনেক যুগ আগের কথা। মাইকেল কেইস ওর কাছে যেন এক প্রবাদ পুরুষ, এখন কথাটা খুব মন দিয়ে ভাবল মারজা দরজার দিকে তাকাতে গিয়ে।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নার্স এসে খবর দিলো। আপনি এখন যেতে পারেন মিঃ কেইস, এই মাত্র মেয়েটি মারা গেলো। এ যেন আর এক সূর্য অস্ত যাওয়া। মাইকেল চমকে উঠল। —আপনি ঠিক বলছেন, মেয়েটি মারা গেছে?

মৃত্যুর খবর কখনো মিথ্যে হয় না মিঃ কেইস!

ঠিক আছে, মাইকেল চলে আসতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল, মৃতদেহ ধরে রাখার ব্যবস্থা করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আবার যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করছি।

হাসপাতাল থেকে বেরুবার মুখে ক্যাপ্টেন মিলারসেনের সঙ্গে মাইকেলের দেখা হয়ে গেলো।

আর কোন খবর পেলে মাইকেল? মিলারসেন জিজ্ঞেস করল।

মাইকেল মাথা নাড়ল, মেয়েটি কোনদিনও আব কথা বলতে পারবে না। তা তুমি কোন খবর পেলে?

মিলারসেনের মুখের অভিব্যক্তি কেমন দুর্বোধ্য বলে মনে হলো। সকালে সেই মডেল সংস্থার হিসাব রক্ষককে ফোন করেছিলাম, মিলারসেন বলে, ভদ্রমহিলা বললেন, ও নামে কোন মেয়ে তাঁদের সংস্থায় কাজ করে না? পথে আমি রেসির হোটেলে খোঁজ নিই। পেনসিলভেনিয়ার এক গ্রাম থেকে মেয়েটি নিউইয়র্কে আসে কাজের জন্যে। শেষ ছ'মাসে সে নাকি প্রচুর খোঁজ নিয়েছে?

হ্যাঁ, লোক পাঠিয়েছি, খুব শীগগীর বাড়ি থেকে কেউ না কেউ এসে পড়বে।

ঘণ্টাখানেক আগে তোমার একটা ফোন এসেছিল, জোল র‍্যাডার তার ডেস্ক থেকে মুখ তুলে তাকাল।

কার ফোন?

পার্ক এভিনিউ মডেল সংস্থা থেকে এক ভদ্রমহিলা ফোন করছিলেন। তুমি যে মেয়েটির খোঁজ করছিলে সে নাকি তাঁদের সংস্থায় মডেল হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছিল। ভদ্রমহিলা জানতে চেয়েছেন, মেয়েটির ব্যাপারে আর কোন খবর তুমি জানতে চাও কি না?

না, কোন প্রয়োজন হবে না। মেয়েটি মারা গেছে। মাইকেল রিপোর্ট লিখতে বসল অতঃপর।

জোল হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। তার হাতে প্রভাতী সংবাদপত্র। গত সপ্তাহে যে মেয়েটির কথা বলছিলে, তার বাড়ির কোন খোঁজ পেলে?

না। তা হঠাৎ তার খবর নিচ্ছ কেন বল তো?

জোল কাগজটা মাইকেলের হাতে তুলে দিয়ে বলে, পড়ে দেখ, বুঝতে পারবে কেন জিজ্ঞেস করছি।

গ্রেপ্তার এবং খালাসের সংবাদ। খবরে প্রকাশ, জন গেলার্ডের এক পার্টিতে ভাইস স্কোয়াড আচমকা হানা দিয়ে কয়েকজন যুবতী মেয়েকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে একজন প্রথমে বলেছিল, টরেন্টো এভিনিউ মডেল সংস্থায় কাজ করে সে, পরে অবশ্য অস্বীকার করে। এটর্নি হেনরি ভিটো সব মেয়েদের বেলে খালাস করার ব্যবস্থা করে আজ সকালে। জন গেলার্ডের বেলের ব্যবস্থাও ভিটো করেছে। ভদ্রলোক ব্যবসায়ী, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, ঐ সব মেয়েগুলোর দেহভোগের ব্যবস্থা করেছিল সে তার পার্টিতে, কাজটা বেআইনী। অবশ্যই।

পড়া শেষে মাইকেল চোখ তুলে তাকাতেই জোল জিজ্ঞেস করল, তোমার সেই মেয়েটিও এই পার্ক এভিনিউ মডেল সংস্থার নাম করেছিল না?

মাইকেল নীরবে মাথা নাড়ল।

তোমার কি মনে হয়? জোল আবার জিজ্ঞেই করল।

ভেবে অবাক হচ্ছি, দুটো ঘটনার সঙ্গে এমন অদ্ভুত মিল হলো কি করে? মাইকেল উঠে দাঁড়ায়, মিলারসেনের কাছে চললাম। মনেহয় ও কিছু হদিশ দিতে পারে!

ফ্রাঙ্ক মিলারসেনের দিকে রিপোর্টটা ফেলে দিয়ে মাইকেল বলে, পড়ে দেখ! এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু জান?

কাগজের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বলে, তেমন কিছু নয়। ভাইস-স্কোয়াডের নিয়মিত ট্রলের মধ্যে পড়ে এটা। খবর পেয়েছি, তাদের হানা দেওয়ার সময় মেয়েরা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ছিল।

সে খবর আমি জানতে চাই না। মাইকেল বাধা দিয়ে বলে, আমার কথা হচ্ছে, একটি মেয়ে পার্ক এভিনিউ মডেল সংস্থার নাম উল্লেখ করে পরে তা অস্বীকার করল কেন? তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, ফ্লোরেন্স রেসিও এই সংস্থার উল্লেখ করেছিল।

তাতে কি হয়েছে? সব মেয়েরাই তো ঐ সংস্থার নাম করে থাকে। ওটা কোন একটা ব্যাপারই নয়।

হতে পারে। মাইকেল স্বীকার করল, কিন্তু একবার স্বীকার করে পরে কেনই বা অস্বীকার করতে গেল মেয়েটি সেটাই রহস্যজনক ঠেকছে আমার কাছে। তাছাড়া ভিটোর মতোন নামী এ্যাটর্নি এরকম সাধারণ মেয়েদের কেস তো কখনো হাতে নেয় না। তাহলে?

রিপোর্ট দেখে তো মনে হচ্ছে জন গেলার্ডই তাকে নিয়োগ করে। এবং সেই হয়তো দয়া করে মেয়েদের জামিনের ব্যবস্থা করে থাকবে।

জানি না, মাইকেল মাথা নাড়ে, ব্যাপারটা আমার ঠিক ভাল ঠেকছে না।

আরে ও সব ভুলে যাও মাইকেল। মিলারসেন হাসতে হাসতে বলল, পরে এরকম ছোট-খাটো অনেক ঘটনার মুখোমুখি হবে, তখন দেখবে সে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে ভাল লাগবে না।

কিন্তু মিস রেসির সেই করুণ মুখখানি যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না ফ্রাঙ্ক। মাইকেল বিষণ্ণ গলায় বলে, —আজ চলি।

এসো, ফ্রাঙ্ক উঠে দাঁড়াল, কাল সকাল পর্যন্ত আমি এখানে আছি, তোমার দরকার হলে যোগাযোগ করো কেমন?

ধন্যবাদ ফ্রাঙ্ক, মাইকেল ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে তার মনে পড়ল, রিপোর্টটা সে ফেলে এসেছে। আবার সে ফিরে চলল। দ্রুত মিলারসেনের অফিস ঘরে ঢুকেই মাইকেল দেখল, কার সঙ্গে সে যেন ফোনে কথা বলছে।

এক মিনিট মারজা, ফ্রাঙ্ক দ্রুত মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে ফিরে তাকাল মাইকেলের দিকে।

মাইকেল লক্ষ্য করল, হঠাৎ তাকে দেখে ফ্রাঙ্কের মুখটা কেমন সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, মনে হয় সামনে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সে। অথচ এরকম হওয়ার কথা নয়।

তোমাকে আবার বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত ফ্রাঙ্ক। মাইকেল ক্ষমা চাওয়ার মতো করে বলে, তুমি যে ফোন করছ আমি জানতাম না। ডেস্কের ওপর থেকে কাগজটা নিয়ে সে আবার বলে, এটার জন্যে আবার আমাকে ফিরে আসতে হলো।

বেশ তো, তাতে কি হয়েছে, ফ্রাঙ্ক মৃদু হেসে জবাব দেয়, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম আর কি। ধন্যবাদ।

মাইকেল আর দাঁড়াল না। চল এলো সেখান থেকে।

অফিসে ফিরে এসে মাইকেল প্রথমেই জোলকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা জোল, ফ্রাঙ্ক মিলারসেনের স্ত্রীর নাম কি বল তো?

এলিজাবেথ, ডাক নাম বেটি।

কিন্তু ফ্রাঙ্ক তাকে মিথ্যে বলল কেন? সে তাহলে কার সঙ্গে কথা বলছিল? মাইকেল নিজের মনে কথাগুলো বলে জোলের দিকে তাকাল, অ্যালেককে একবার ফোন করে বল, পার্ক এভিনিউ মডেল সংস্থায় গোপনে হানা দিতে চাই আমরা। পুলিশের কোন সাহায্য আমরা নেবো না, এমন কি তাদের জানাবও না কিছু। ফোনে যোগাযোগ হতেই মাইকেল বলল অ্যালেককে, আর কাল সকালেই সেখানে আমরা যেতে চাই বুঝলে?

ঠিক আছে, তাই হবে। অ্যালেকের কাছ থেকে জবাব পেতেই মাইকেল ফোনটা নামিয়ে রাখল। তারপর সে একটা সিগারেট ধরাতে যাবে, ফোনটা আবার বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলে, কেইস বলছি।

মাইকেল? আমি ফ্রাঙ্ক মিলারসেন বলছি। ভেবে দেখলাম, তুমি চাইলে আমি তোমার সঙ্গে টরেণ্টো মডেল সংস্থায় সার্চ করতে যেতে পারি।

ও সব কথা ভুলে যাও ফ্রাঙ্ক। মাইকেল প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি ঠিকই বলেছিলে ফ্রাঙ্ক, ছোট-খাটো ব্যাপারে মাথা না ঘামানই ঠিক। তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত।

ঠিক আছে মাইকেল, মিলারসেনের কণ্ঠে দ্বিধার সুর ভেসে আসে, তুমি যখন এত নিশ্চিন্ত আমার বলার কিছু নেই। তবে পরে দরকার হলে আমাকে জানিও। আমি তোমায়

সাহায্য করতে সব সময় প্রস্তুত।

বেশ তো, মনে থাকবে ফ্রাঙ্ক। মাইকেল ফোনটা নামিয়ে রাখল।

জেলা প্রতিনিধি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল মাইকেলের দিকে। অনেকক্ষণ পরে ডেস্কের ওপর কাগজটা রেখে তিনি বললেন, তাহলে তুমি সত্যিই পদত্যাগ করতে চাও?

হ্যাঁ, স্যার। মাইকেল মাথা নাড়ে।

কেন?

তুমি কি তোমার কাজে সুখী নও? নাকি এ-কেসের সঙ্গে তাবড় তাবড় লোক জড়িত বলে তুমি ভয় পাচ্ছ?

না স্যার, তা নয়।

তাহলে? শেষ মুহূর্তে এসে তুমি রণে ভঙ্গ দিতে চাইছ কেন? জান, তোমাকে নিয়ে আমার কত গর্ব ছিল? এ কেসের সাফল্যের ওপর তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে? এ অবস্থায় তুমি পদত্যাগ করলে সবাই তোমাকে কাপুরুষ বলবে, তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে? সারা দুনিয়ার লোক তোমাকে ছিঃ ছিঃ করবে। আমাকে বিদ্রুপ করবে।

কিন্তু আমি নিরুপায় স্যার।

বেশ, এবার সত্যি কথাটা বলবে, কেন তুমি এ কেসের দায়িত্ব ছেড়ে যেতে চাইছ? আমার কাছে লুকিও না মাইকেল, তোমার ওপর আমার অগাধ আস্থা ছিল। বল, কেন ছাড়তে চাইছ?

মাইকেল এবার তার চোখে চোখ রেখে বলেই ফেলল, মেয়েটি আমার বান্ধবী।

মেয়েটি? স্তব্ধ হতভম্ভ জেলা প্রতিনিধি, কোন্ মেয়েটি?

মারজা, এ কেসের অন্যতম আসামী।

কিন্তু, কি ভাবে তুমি পরিচয় পেলে, তা তো বলবে?

অ্যালেককে দিয়ে টরেন্টো মডেল সংস্থায় তল্লাসী চালাই আমি। তার রিপোর্ট থেকেই এই তথ্যটা আমি জানতে পারি। আগে জানলে এ কেসের ভার আমি নিতাম না। জেনে-শুনে আমি ওর বিরোধিতা করতে পারবো না স্যার।

মাইকেল, তুমি কি এখনো ওকে ভালোবাসো।

করুণ চোখে তাকাল মাইকেল। একবার শুধু তাকালো, কোন কথা বলল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে উত্তেজিত অবস্থায় দরজা ঠেলে জোল ঘরে প্রবেশ করল। তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছ মাইকেল। মারজা, মিলারসেন, এদের সবার বিরুদ্ধেই আমরা অভিযোগ পেয়েছি। দেখো, এ কেসটা একটা বিরাট আলোড়ন তুলবে সারা শহরে। এখানে একটু থেমে সে এবার জেলা প্রতিনিধিদের দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার, ওদের গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা পেয়েছি আমরা। প্রথমে আমরা মিলারসেনকেই ধরতে যাচ্ছি।

জেলা-প্রতিনিধি উঠে দাঁড়ালেন, চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। তারপর মাইকেলের দিকে ফিরে তিনি বলেন, মাইকেল, তুমিও এসো আমাদের সঙ্গে।

দরজার ওপরে বেশ কয়েকজোড়া সম্মিলিত পায়ের শব্দ শুনে মিলারসেন তার কর্তব্য

স্থির করে ফেলল। আসুন, ভেতরে চলে আসুন!

জেলা প্রতিনিধি তার দলবল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এক পাশে মাইকেল, অপর দিকে জোল। ফ্রাঙ্কের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তার মনে হচ্ছিল, কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে। সেই অবস্থায় সে মুখে হাসি ফুটিয়ে জেলা-প্রতিনিধির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা, আসুন স্যার।

জেলা-প্রতিনিধি কিন্তু এক চুলও নড়লেন না। অগত্যা মিলারসেন মুখ থেকে টোব্যাকো পাইপটা নামিয়ে ফেলল!

ফ্রাঙ্ক, জেলা প্রতিনিধি চাপা গলায় বললেন, তোমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসেছি আমরা।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি স্যার? বলল বটে সে, তবে মাইকেলের মুখের দিকে তাকাতে সে সব বুঝে গেল বোধহয়।

সে কথা কি তোমাকে বলে দিতে হবে ফ্রাঙ্ক?

না স্যার।

তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে চলো। জোল এবার বলল।

আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে জোল, করুণ চোখে তাকালো সে।

জোল এবার তাকাল মাইকেলের দিকে, তার সম্মতির জন্যে। মাইকেল মাথা নাড়ল। ঠিক আছে ফ্রাঙ্ক, জোল অতঃপর বলে,—আমরা বাইরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

মাইকেল? ফ্রাঙ্কের ডাকে থমকে দাঁড়াল।

আমার বোঝা উচিত ছিল, জেলা প্রতিনিধির অফিসে যোগ দেবার আগে তুমি ছিলে একজন দক্ষ সৈনিক।

মাইকেলের চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে ওঠে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত ফ্রাঙ্ক।

না মাইকেল, তোমার কি দোষ? এটা তো তোমার কর্তব্য। ফ্রাঙ্ক শান্ত ভাবে জবাব দেয়।

মাইকেল মাথা নেড়ে জোলকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলো। ফ্রাঙ্ক অপেক্ষা করল তারা তার দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর ডেস্কের ড্রয়ার খুলে নীল-ধূসর রিভালবারটা বার করল। বেটি আর বাচ্ছাগুলোর জন্যে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়। না, এখন কোন সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় দেবে না সে। মুহূর্তে তার মুখের মধ্যে রিভালবারের ঠান্ডা নলটা উষ্ণ হয়ে উঠল।

ক্লান্ত, বিষণ্ন মন নিয়ে বাড়ি ফিরল মাইকেল। মা'র দৃষ্টি এড়াল না।

কি হলো মাইকেল? আবার কি হলো তোর? মা'র কথায় উদ্বেগের ছায়া পড়ে—সেই মেয়েটি আবার ফিরে এসেছে বুঝি? তুই না বললেও আমি তোর মুখের হাব-ভাব দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, মেয়েটির সঙ্গে তোর আজ দেখা হয়েছিল, বল, ঠিক বলেছি কিনা।

না মা।

তাহলে?

পুলিশ আজ ওকে গ্রেপ্তার করতে গেছে। ওর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ আমারই সংগ্রহ করা। মামলায় হার হলে ওর দীর্ঘ দিনের জন্যে জেল হয়ে যাবে!

দুঃখ করার কি আছে খোকা। এটা তোমার কর্তব্য। তাছাড়া এসব ছোট-খাটো ঝামেলা নিয়ে কেন তুমি মাথা ঘামাচ্ছো!

না মা, ও কথা বলো না! মাইকেল উত্তেজিত হয়ে বলে,—মিলারসেনও ঐ কথা বলেছিল। এখন সে মৃত।

আমি তো তোমাকে কতদিন বলেছি, ও মেয়ে তোমার জন্যে নয়। তখন বিশ্বাস করনি। আজ নিশ্চযই বুঝতে পারছ, আমি ভুল বলিনি।

চুপ করো মা! মাইকেল বাধা দেয়, যখন তুমি জানবে তোমার জীবনের সব চেয়ে প্রিয়জন নেই, তখন তোমার মনের অবস্থা কি হতে পারে ভেবে দেখেছ?

মারজা প্রস্তুত বাইরে যাওয়ার জন্যে। টম গাড়ী ডেকে এনে মারজার সামনে দাঁড়াল। মিস মারজা, যাওয়ার সময় হলো এবার।

হ্যাঁ, আমি তৈরী টম। মারজা ওর প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র, টাকা-কড়ি এবং মিচেলির ফটোটা হাত-ব্যাগে ভরতে গিয়ে ভাবল, কাল সকালে জোকার এসে দেখবে, সে নেই। এই প্রথম ও মিচেলিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে যাচ্ছে।

শেষ বারের মতো ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, মারজা দরজার হাতলে হাত রাখতে যাবে তখনই দরজাটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে পড়ল দরজার ওপারে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর মুখের দিকে নিবদ্ধ। পুলিশ!

ঘরে ঢোকার আগে দরজায় নক্ করলেন না কেন?

জবাব দেয় না জোল। ঘরে ঢুকে পাল্টা প্রশ্ন করে সে, মনে হচ্ছে বাইরে বেরুচ্ছিলেন?

সে খোঁজে আপনার কি দরকার? মারজার কথায় রুক্ষতা প্রকাশ পায়।

একজন বেঁটে কালো লোক তাকে বাধা দিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, কি হচ্ছে জর্জ? সব সময় ইয়ার্কি! তারপর মারজার দিকে ফিরে বলে, আমার নাম জোল র‍্যাডার। আপনি তো মিস মারজা, তাই না? আমি জেলা-প্রতিনিধির অফিস থেকে আসছি। ওরা হলো সব পুলিশ। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

মারজা ওর ডেস্কের সামনে ফিরে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, এর অর্থ গ্রেপ্তার নয় কি?

হ্যাঁ, আপনি বুদ্ধিমতী, তাই ঠিকই ধরেছেন।

কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কিসের তা জানতে পারি?

জোল তার হাতের কাগজটা মারজার দিকে এগিয়ে বলে, এটা পড়ে দেখুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

দ্রুত কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মারজা মুখ তুলে তাকায়,—আমি একবার আমার এটর্নির সঙ্গে কথা বলতে পারি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। জোল মাথা নাড়ে।

মারজা রিসিভারটা তুলে ডায়াল করে।

হ্যাঁ। এই মাত্র আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। না, না আমি এখন অফিস থেকে বলছি। তাহলে ঐ কথা রইল, ঐখানেই আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে কেমন? রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মারজা তাকাল জোলের দিকে,—আমি প্রস্তুত চলুন।

সিঁড়ির শেষ ধাপে টম কালো মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। জল ভরা চোখ, বুঝি এখনই অশ্রুর বাদল নামবে।

তুমি কিছু ভেবো না টম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছি। এর মধ্যে মিচেলিকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দাও, একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়েছি, তাই ওর কাছে যাওয়া হলো না।

মিস মারজা কি তাহলে বড় রকম বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন মিঃ মার্টিন।

জোকার মার্টিন একবার হেনরি ভিটোর দিকে তাকিয়ে আবার তার দিকে ফিরে বলে,—হ্যাঁ টম, মিঃ কেইস নামে এক ছোকরা তোমার মিস মারজার পেছনে লেগেছে বলে একটু দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ওকে।

ঐ কেইস ছেলেটা? দারুণ বজ্জাত ছেলে ও মিঃ জোকার। টম গম্ভীর হয়ে বলে,—আমার মারজা দিদিমনি তাকে একদিন বিয়ে করতে চায়নি বলেই বোধহয় সে প্রতিশোধ নিতে চাইছে এ ভাবে।

কি বললে? জোকারের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে,—ঐ ছেলেটা মানে রসের বন্ধু, যে ছেলেটা নাচঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো রোজ মারজাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, সে?

হ্যাঁ, সেই ছেলেটাই মিঃ মার্টিন। ঐ ছেলেটাই তো মিচেলির বাবা। টম প্রত্যুত্তরে বলে।

সেকি! তুমি জানলে কি করে? ভিটো এই প্রথম কথা বলল, মারজা তোমাকে বলেছিল?

না, উনি নিজের থেকে কখনো সে কথা বলতে পারেন না। আমি ওর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে মিচেলির বার্থ সার্টিফিকেট দেখেছি। তাতে মিচেলির বাবার নাম লেখা আছে মাইকেল কেইস। ঘর পরিস্কার করতে গিয়ে বহুবার আমি সেটা দেখেছি।

ভিটো উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। এখুনি বাড়ি ফিরে গিয়ে সেই সার্টিফিকেটটা আনতে পারবে টম?

নিশ্চয়ই। টম দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আশ্চর্য। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, অথচ মেয়েটি একবারও আমাদের কাছে মুখ খুলল না এ ব্যাপারে।

তোমার কি মনে হয় ভিটো জিজ্ঞেস করল,—এখনো ও মাইকেলকে ভালোবাসে?

অনেক দিন হল ওর মনের হদিশ পেতে গিয়ে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।

বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে মুখ খুলব না ভাবছি, ভিটো বলে, জেলা-প্রতিনিধিদের কাউকেও জানতে দেবো না। এটা আমার তুরুপের তাস। একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করল,—তোমার কি মনে হয়, কেইস তার মেয়ের কথা জানে?

না। মনে হয় মারজা তাকে বলেনি। যদিও বা কাউকে বলে থাকে, সে রস। আর

এ-খবর রস অন্য কাউকে বলতেই পারে না।

মেয়েটার মনের খবর আমি পেলাম না। ভিটো হতাশ হয়ে বলে, আজ তিনদিন হলো আমি জেলখানায় ওর সঙ্গে দেখা করেছি।

একটা কথাও আমাকে বলেনি। নিজের সম্পর্কে ও কিছু বললে আমার কেস লড়ার পক্ষে সুবিধে হতো।

অদ্ভুত মেয়ে, নিজের ভাল চায় না এমন কোন মেয়ে দেখেছ? মার্টিন মন্তব্য করে, আমি একদিন ঠিকই বলেছিলে হেনরি, মনে আছে?

কি বল তো? ঠিক মনে পড়ছে না। ভিটো মাথা নাড়ল।

কেন মনে নেই, তুমি না বলেছিলে,—এক বিশেষ ধরনের বেশ্যা ও ওর একটা বিশেষ গুণ আছে, একটা বিশেষ চরিত্র আছে, নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল এবং আকাশের মতো উদার যে চরিত্র।

❑ সরকার বনাম মেরিয়ান ফ্লাড ❑

বৃদ্ধ জেলা প্রতিনিধিকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল কথা বলতে গিয়ে। মাইকেল, তুমি কিন্তু তোমার নিজের এবং সরকার বনাম মেরিয়ান ফ্লাড সম্পর্কে সব খুলে বলোনি আমাকে।

হঠাৎ কথাটা শোনা মাত্র আমার মাথায় রাগ চেপে গেল। এই একটা ব্যাপারে আমি উনি কেন কাউকেই বলতে পারি না। তবু প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু বলার আমি বলেছি। ওর গলার স্বরের সঙ্গে সুর চড়িয়ে প্রত্যুত্তরে বললাম, আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার।

হয়তো এ ব্যাপারটা সত্যি তুমি জানো না, যাইহোক, তিনি একটি কাগজ আমার সামনে মেলে ধরে বললেন, পড়ে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে।

একটা বার্থ সার্টিফিকেট। মিচেলি কেইস। পড়তে গিয়ে আমার সারা মুখে রক্ত চলকে উঠল। শিশুর মা'র নাম মারজা, বাবা মাইকেল কেইস। জন্মের তারিখটি দেখে আমি চমকে উঠলাম, আমার সারা শরীরে প্রচন্ড রক্তের স্রোত যেন বয়ে গেল। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, মিচেলির জন্মের দশ মাস আগে মারজার সঙ্গে আমি বেশ কয়েক দিন কাটিয়েছিলাম অসুস্থ হওয়ার পর। এখন বুঝতে পারছি, গতকাল রাত্রে মারজাকে ওর মেয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাতে কেন ও তখন অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তখন আমার একবারও সন্দেহ হয়নি, মিচেলি আমার মেয়ে।

এ কথা তুমি আমাকে আগে কেন বলোনি মাইকেল? রুক্ষ তাঁর কণ্ঠস্বর।

কি করে বলব স্যার, যতটা সম্ভব নরম গলায় বললাম, এই তো প্রথম আমি জানলাম।

এ কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল? বৃদ্ধ খিঁচিয়ে উঠলেন।

এবার আমি আমার রাগ আর চাপতে পারলাম না। আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসে আমার কিছু যায় আসে না।

কিন্তু তুমি কি জান এতে আমাদের মামলার কি ক্ষতি হতে পারে?

অবাক চোখে আমি ওর দিকে তাকালাম।—তা কেন হবে? ভিটো তো আমাদের একটা অভিযোগ অসত্য বলে প্রমান করতে পারেনি।

হেনরি ভিটো আমার পাশেই বসেছিল।—আমি কেন অভিযোগগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব? এই প্রথম সে মুখ খুলল,—কিন্তু এখন না বলে পারছি না।—আদালতের জুরিরা এটা দেখলে কি ধারনা হতে পারে সেটা একবার ভেবে দেখেছেনা? তারা সহজেই বুঝে নেবে, ব্যাক্তিগত প্রতিশোধ নেবার জন্যে এটা একটা মামলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি জানতাম, আপনি একজন ভাল উকিল, আইনের সবচেয়ে ধারাল অস্ত্র দিয়ে বিপক্ষ উকিলকে ঘায়েল করতে পটু আপনি। কিন্তু আপনি যে ব্ল্যাকমেল করার অস্ত্রও প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত তা তো জানতাম না।

ভিটো চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি তাকে এক হাত দিয়ে ঠেলে ফিরিয়ে দিলাম। সেই মূহূর্তে অপারেটার ফোন করে জানাল, এক ভদ্রমহিলা জেলা প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ঠিক আছে, ওকে পাঠিয়ে দাও। বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন।

একটু পরেই দরজা ঠেলে মারজা ঘরে প্রবেশ করল। এলোমেলো সোনালী চুলগুলো ওর হাওয়ায় উড়ছিল। ওর পরণে সেই নীল কোট। গত তিনদিন বিচার চলাকালে এই পোশাকটাই এক নাগড়ে পড়ে আসছে ও। সেই একই চলার ভঙ্গিমা, যা অন্য মেয়েদের থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে ওকে।

সাবধানে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে ভিটোর দিকে তাকিয়ে মারজা জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে কি করতে এসেছেন?

ভিটো হাসলো। জেলা প্রতিনিধির সঙ্গে একটু রফা করতে এসেছি।

দীর্ঘায়ত চোখ তুলে ও এবার আমার দিকে তাকাল, মাইকেল তুমিও কি—

ভিটো তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, আলোচনা হচ্ছে জেলা-প্রতিনিধির সঙ্গে, তোমার বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে নয়।

মারজার সেই আয়ত চোখের দৃষ্টি নিমেষে মিলিয়ে গেল। আমি ওর হাতে মিচিলির বার্থ সার্টিফিকেটটা তুলে দিলাম ধীরে ধীরে। দ্রুত সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার চোখে চোখ রাখল ও। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ওর চোখের মনিদুটো ম্লান, ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এটা তুমি কোথায় পেলে? বলতে গিয়ে ওর গলার স্বর কেঁপে উঠল। আমি ভিটোর দিকে তাকালাম।

এবার সে ভিটোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এটা কোথায় পেলেন?

মৃদু হেসে ভিটো বললেন—টম আমাকে দিয়েছে।

বেশ তো একথা আপনি আমাকে আগে বলেন নি কেন?

তোমার কাছ থেকে বাধা পাব বলে। আমি জানি তুমি তোমার বয়-ফ্রেণ্ডকে আড়াল করতে চাইছ। কিন্তু আমি উকিল, তোমার স্বার্থ রক্ষা করা আমার কর্তব্য, সে তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও।

আমার ভাবনা মিচেলিকে নিয়ে। ও এখন সুখেই আছে। ও জানে ওর বাবা যুদ্ধে মারা গেছে। এখন ও যদি ওব জন্মের ইতিহাস জানতে পারে ওর মনের অবস্থা তখন কি হতে পারে বলতে পারেন?

ওব মার মামলার কারণ জানার চেয়ে সেটা জানা কি খুব খারাপ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! মারজা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, বেজন্মা জানার চেয়ে ঢের ভালো।

কিন্তু আমি যা এখন বলছি তাই শোন। ভিটো এখন জেলা-প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে বলল,—তুমি তাহলে মামলা তুলে নেবে তো?

মামলা তুলে নেওয়া না-নেওযার ভার আমি মাইকেলের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। ওকে আমি কথা দিয়েছি, ওর কাজে আমি কোন বাধার সৃষ্টি করব না। ওকে তুমি জিজ্ঞেস করো।

ভিটো সপ্রশ্ন চোখে তাকাল আমার দিকে।

না, মামলা আমি তুলবো না।

ভুল করছ মাইকেল! ভিটো তাকে শাসিয়ে বলেন, আমি তোমাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাব, বুঝলে?

সেই সুযোগের অপেক্ষায আমি থাকব। আমি তার কথার কোন পাত্তা দিতে চাইলাম না।

তোমার গর্ভনর হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে চুড়মার হয়ে গেল, ভিটো বৃদ্ধ জেলা প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে আবার মেরির দিকে তাকালেন, চলো এবার যাওয়া যাক।

মারজা চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল আমার ডাকে। আমি কাছে গিয়ে ওর একটা হাত আমার হাতে তুলে নিলাম।—একথা তুমি আমাকে আগে জানাওনি কেন?

আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ও বলল, আগে একটা শিশুকে হারাতে হয়েছিল, ওরা ভেবেছিল আমি বোধহয় ওর ভার নিতে পারব না। মারজা ফিসফিসিয়ে বলে, তাই এটাকে আমি আর হারাতে চাই নি।

কই, চলো মারজা। ভিটো আবার তাড়া দিতেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মারজাকে চলে যেতে হলো।

মারজা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর আমি এবার জেলা প্রতিনিধির কাছে ফিরে গেলাম ক্লান্ত পায়।

আমাকে দেখে উনি উঠে দাঁড়ালেন। চলো মাইকেল, কয়েক মিনিটের মধ্যে আদালতের কাজ আবার শুরু হতে যাচ্ছে ধীরে সুস্থে বসা যাক সেখানে।

একটা চাপা উত্তেজনায় সারাটা আদালত কক্ষ থমথম করছিল। বিচারকের আসতে মিনিট কুড়ি দেরী হলো। হেনরি ভিটো নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।—প্রতিবাদী পক্ষ থেকে ভিটো বিচারপতির উদ্দেশ্যে বলেলেম,—জেলা প্রতিনিধির কর্মচারী মাইকেল বেইসকে সাক্ষী দেবার জন্যে হাজির হতে অনুরোধ করছি।

আবার গুঞ্জন, চাপা উত্তেজনা। এমন কি বিচারপতিও অবাক হয়ে তাকালেন ভিটোর

দিকে। অনুরোধটা খুবই অদ্ভুত বলে মনে হয় কৌসুলি মশাই। তবে আমার বিশ্বাস, বিশেষ প্রয়োজনে অনেক ভেবে-চিন্তে এ-অনুরোধ করতে আপনি বাধ্য হয়েছেন, তাই না?

হ্যাঁ, হুজুর, ভিটো প্রত্যুত্তরে বলেন, আমার মক্কেলের প্রতি সুবিচারের জন্যেই মিঃ কেইসকে কিছু প্রশ্ন করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বিচারপতি আমার দিকে তাকালেন, আমি সাক্ষীর আসনের দিকে এগিয়ে যাই। মারজা আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়েছিল করুণ চোখে, ওর মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। ওকে পেছনে ফেলে একটু এগিয়েছি, ওর কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালাম। ওদিকে তখন সাংবাদিকদের ঘন ঘন ফ্লাসবাল্ব জ্বলে উঠেছিল, সেই সঙ্গে জনতার করতালি।

হুজুর, আমি আমার কৌসুলির সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে দু-এক মিনিট সময় ভিক্ষা করছি আপনার কাছে।

চাপা গুঞ্জনে আবার মুখর হলো আদালতকক্ষ। ভিটো তাড়াতাড়ি মারজার টেবিলের সামনে ছুটে গেলেন। এক মুহূর্ত কথা বলে তিনিও বিচারপতির কাছ থেকে দশ মিনিট সময় প্রার্থনা করলেন।

বিচারপতি হাতুড়ি পিটিয়ে দশ মিনিটের জন্যে আদালত মুলতুবি রাখার কথা ঘোষণা করলেন। সাক্ষীর আসন থেকে ফিরে এসে দেখি, ভিটো মারজাকে সঙ্গে নিয়ে পরামর্শ কক্ষে চলে গেছে।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলাম জেলা-প্রতিনিধির ডাকে, তুমি ঠিকই বলেছিলে মাইকেল, মেয়েটি সত্যিই দারুণ সাহসী।

ইতিমধ্যে পরামর্শ কক্ষের দরজা খুলে গেলো। মারজাই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, ভিটো ওকে অনুসরণ করল। একটু পরেই আদালতের কাজ শুরু হলো আবার। ভিটো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার মক্কেল ওর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছে।

বিচারপতি অবাক চোখে তাকালেন মারজার দিকে।—এটা কি সত্যি তোমার ইচ্ছে মিস মারজা?

মারজা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, হ্যাঁ হুজুর।

আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে লিফটের মধ্যে বৃদ্ধ জেলা-প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। এই বিশৃঙ্খলার জন্যে আমিই দায়ী স্যার। উনি কোন জবাব দিলেন না।

ভেবে দেখলাম, নিজের থেকেই আবার বললাম—আমার পদত্যাগ পত্রটা আজই লিখে ফেলব। কাল সকালে আপনার টেবিলে সেটা পৌঁছে যাবে। এবারও উনি কোন সাড়া দিলেন না। নিঃশব্দে লিফট থেকে নেমে গেলেন।

নিজের অফিস ঘরে ফিরে এসে প্রথমেই পদত্যাগপত্রটা লিখে খামের মধ্যে ভরে বেয়ারাকে দিয়ে বৃদ্ধের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর আর কিছু ভাল লাগছে না। ভাবছি জাল আর অ্যালেক ফিরে আসার আগেই সকাল সকাল অফিস থেকে চলে যাবো, ঠিক তখনই ফোনটা আচমকা বেজে উঠল।

হ্যাঁ, মাইকেল কথা বলছি। মাউথপীসে মুখ রেখে বললাম।

আমি মারজা কথা বলছি। অপর প্রান্ত থেকে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।—এখুনি একবার ব্রডওয়ে ককটেল লাউঞ্জে আসবে? তোমার সঙ্গে বিশেষ জরুরি কথা আছে। না বলো না মাইকেল, প্লীজ—

ঠিক আছে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

পেঁজা তুলোর মতোন তুষার পড়তে শুরু করেছিল তখন। দ্রুত পায়ে ককটেল লাউঞ্জে গিয়ে এক কোনায় গিয়ে বসে পড়লাম ওর পাশে।

কি খাবে? জিজ্ঞেস করলাম ওয়েটার সামনে এসে দাঁড়াতে।

কেসিস এবং সোডা। মারজা প্রত্যুত্তরে বলল।

আমার জন্যে জিন। ওয়েটার ফরমাস নিয়ে চলে যেতে আমি ওর দিকে ফিরলাম, আজও তুমি ঐ সব উদ্ভট জিনিষগুলো ছাড়তে পারলে না মারজা?

ওটা আমার এখন জীবনের সাথী হয়ে গেছে মাইকেল, কি করে ছাড়ি বল!

তুমি কি এইভাবেই জীবনটাকে শেষ করে দিতে চাও? এ তো তোমার নিজের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া মারজা!

হতে পারে। রসও এই কথা বলত সব সময়।

আমাদের আলোচনার মধ্যে রসের কথা উঠতেই ভীষণ বিরক্ত হলাম। তাই একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম,—আমাকে কি জন্যে ডেকেছিলে তাতো এখনো বললে না?

হ্যাঁ, প্রসঙ্গটা আমাদের সম্বন্ধে। ধীরে ধীরে নরম হাতটা ও আমার হাতের ওপর রাখলো আলতো করে, ভেবে দেখলাম, এটাই উপযুক্ত সময়।

অনেকদিন পরে ওর উষ্ণ কোমল স্পর্শে আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তবু যতটা সম্ভব অনুত্তেজিত শান্ত গলায় বললাম, তাই নাকি? কিন্তু তোমার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বড্ড বেশী দেরী হয়ে গেছে না?

তার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, আমি ছাড়া আজ আর আমার কাউকে বলার সুযোগ নেই।

আমার রক্তের স্পন্দন তখন নাচতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম ওর কথার প্রতিবাদ করি। কিন্তু ওর মুখ চেয়ে পারলাম না। ওর স্পর্শ, ওর চাহনি, ওর মিনতি ভরা অনুরোধ আমাকে দুর্বল করে দিলো। তাই প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললাম,—তা কে তোমার জামিন হলো?

জোকার মার্টিন।

জোকার মার্টিন? এখন আমার মনে পড়ল, লোকটাকে এ ক'দিন ভিটো ও মারজার সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি আদালতকক্ষে। তার নামে অনেক বদনাম আছে শুনেছি। লোকটি নাকি উঠতি গুণ্ডা-মস্তানদের পাণ্ডা।

মারজা আমার দিকে ঝুঁকে এলো। ওর শরীরের সেই মিষ্টি সুবাস আমার নাকে ভেসে এলো। কতদিন, কতদিন এই মিষ্টি গন্ধটা পাইনি যেন। আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ও বলল,—খুব বেশি দেরি হয় যায়নি মাইকেল। তাছাড়া জেলে থাকার সময় ভালো আচরণ করলে আমার শাস্তির সময় হ্রাস হয়ে বছর দুয়েকে নেমে আসবে নিশ্চয়ই, তখন আমরা

নির্জন কোন জায়গায় গিয়ে নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে পারি। তখন কেউ আমাদের সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও জানতে পারবে না।

আমি ওর কথার কোন উত্তর দিলাম না। ও নিজেই আবার আমার চোখে চোখ রেখে বলল, কি হলো তোমার? চুপ করে রইলে কেন? মাইকেল? আমার জেল হবে বলে তুমি মন খারাপ করছ?

মারজা আমার মনের কথাটা বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছিল। কি করে ওকে বলব, ওর কথা মনে করে আমার বুকটা কেমন হাহাকার করে উঠছে, যন্ত্রণায় বুক ফেটে যাচ্ছে ও জেল খাটবে কথাটা ভাবতে গিয়ে। যাইহোক, এবার নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে প্রসঙ্গটা পাল্টালাম। আচ্ছা মারজা, আমার মেয়েটা কেমন দেখতে হয়েছে? আমার মতো, নাকি তোমার মতো?

তুমি তাহলে তোমার মেয়ের কথাই শুধু ভাবছিলে। আহত স্বরে ও অনুযোগ করল।

হ্যাঁ, ঠিক তাই? ওকে আঘাত দিয়েই বললাম,—আমি হলে আমার মেয়েকে কখনো আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতাম না।

কি করব মাইকেল, তখন যে আমরা দুজন দুটি আলাদা জগতের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু আজ তোমার এমন কি ঘটনা ঘটল যে, তুমি ভেবে নিলে আমরা এখন খুব কাছাকাছি এসে গেছি? আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু কঠিন স্বরেই বললাম, আমি আমার সারাটা জীবন তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, জীবনে এমন কোন গর্হিত কাজ তুমি করবে না। কিন্তু আমার সব অনুমান মিথ্যে হয়ে গেছে। যাইহোক, বাচ্চাটা সম্পর্কে আমাকে ঠকানো তোমার উচিত হয় নি।

কিন্তু ভুলে যেও না মাইকেল, বাচ্চাটা আমার। মারজা দ্রুত হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,—এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে এই বাচ্চাই ছিলো আমার একমাত্র অবলম্বণ। বিশ্বাস করো, তুমি নিজের সম্পর্কে যা ভাবছ, তার থেকে অনেক বেশি আপনজন ও আমার। তাই আমি ওকে হারাতে চাইনি।

হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই বলছি মারজা। তুমি কেবল তোমার নিজের কথাই এতদিন ভেবে এসেছ। একবার ভাবনি আমার কথা। বাচ্চাটা যে আমারও সন্তান তোমার মনে হয় নি সে কথা। আর আজ এতেদিন পরে আমার কথা তোমার মনে পড়ল, তাই না?

এখনো খুব বেশী দেরী হয়নি মাইকেল, এখনও আমরা নতুন করে ঘর বাঁধতে পারি। সুন্দর একটা স্বপ্ন—

না, মেরি, তা হয় না, আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালাম,—তোমার মনে পড়ে, একদিন তুমিই না বলেছিলে, আমরা আমাদের অতীতে আর ফিরে যেতে পারি না! মনে আছে?

হঠাৎ ওর আয়ত দু'চোখে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এলো। থমথমে গম্ভীর মুখে ও উঠে দাঁড়াল অতঃপর। তারপর এক মুহূর্তও আর দাঁড়াল না সে সেখানে, কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলো বাইরের রাস্তায়। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, ওর সোনালী চুলে

ঝিরঝিরে তুষারে ছেয়ে গেলো। সোনালী আর রুপালী রেখায় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত ব্যাঞ্জনা এনে দিলো ওর সারা শরীরে। একটু পরেই একটি গাড়ী থামল ওর সামনে। জানলার ফ্রেমে জোকার মার্টিনের মুখটা চিনতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না।

পরদিন বিচারপতি তার বহু প্রতিক্ষিত রায় ঘোষণা করলেন। যুবতী মেয়েদের সংগ্রহ করে বেশ্যাবৃত্তি করানো, সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে তাদের হাত করা, এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেল করা, এই তিনটে অভিযোগে মারজার জেল হয়ে গেল! ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আদালত কক্ষ থেকে ফিরে আসছি, করিডরে বৃদ্ধ জেলা-প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা হতেই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন, তুমি ভেবেছ কি? তুমি পদত্যাগ করলেই আমি মেনে নেব ভেবেছ? পকেট থেকে আমার পদত্যাগপত্রটা বের করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলেন মেঝের ওপর। তারপর তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে শান্ত গলায় বললেন, বিচারের মানদণ্ড সব সময় ক্ষমার দিকেই ঝোঁকে, বুঝলে? তোমার মতন একজন সম্ভাবনাপূর্ণ ছেলেকে আমি ছেড়ে দেবো ভেবেছ? না, না এ হতে পারে না।

আমি তার সহানুভূতিতে দারুণ অভিভূত হয়ে পড়লাম। ক্ষমা! এত বিশাল প্রশংসার আমি উপযুক্ত কিনা নিজেই বুঝতে পারি না। আমার মুখের ভাষা তখন উধাও। ফ্যালফ্যাল করে কেবল তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার ছিল না আমার। যাইহোক, আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার আগেই তিনি আবার বললেন,—অফিসে ফিরে যাও বৎস, সেখানে তোমার জন্যে একজন অপেক্ষা করছে। বলে তিনি তাঁর অফিস ঘরে ফিরে গেলেন।

ক্লান্ত পায়ে আমি আমার অফিসঘরে ফিরে এলাম অতঃপর। ফাঁকা ঘর। কোথাও মানুষের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। তাহলে কি বৃদ্ধ আমার সঙ্গে রসিকতা করলেন? কথাটা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ দরজার পাশে কৌচের ওপর পোষাকের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকালাম সেদিকে।

একটা বাচ্চা মেয়ে কোচ থেকে নেমে আমার ডেস্কের দিকে এগিয়ে শান্ত গলায় ও বলল,—আমার নাম মিচেলি।

মিচেলি? আমার মেয়ে! ঘটনার আকস্মিকতায় তখন আমি অভিভূত, বাক্যহারা কিছু সময়ের জন্য।

মা বলেছেন, কিছুদিনের জন্য আমি তোমার কাছে থাকবো। তিনি বলেছেন, তুমি আমার দেখাশুনো করবে এখন থেকে। বলে তাকাল আমার সম্মতির অপেক্ষায়।

সেই মুখ, সেই চোখ। এমন কি ওর চুলের রঙও সোনালী, ঠিক মারজার মতোন। আমার বুকটা তখন এক অদ্ভুত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রণাও অনুভূত হলো, ওকে এতোদিন আমি ভুলেছিলাম বলে, নাকি মারজা ওকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল বলে, কে জানে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে আবেগে আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ মামণি, এখন থেকে তুমি আমার, আমি তোমার দেখা-শোনা করব বৈকি।

মিচেলি আমার চোখের কোণে জমা জল মুছিয়ে দিলো ওর নরম কচি কচি হাত দুটি দিয়ে। আমার পুঞ্জিভূত সব যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো। জীবনে এই প্রথম আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম সব পাওয়ার আনন্দে।

অনুবাদ ❑ সৌরেন দত্ত

দি কার্পেট ব্যাগার্স

জোনাস—১৯২৫
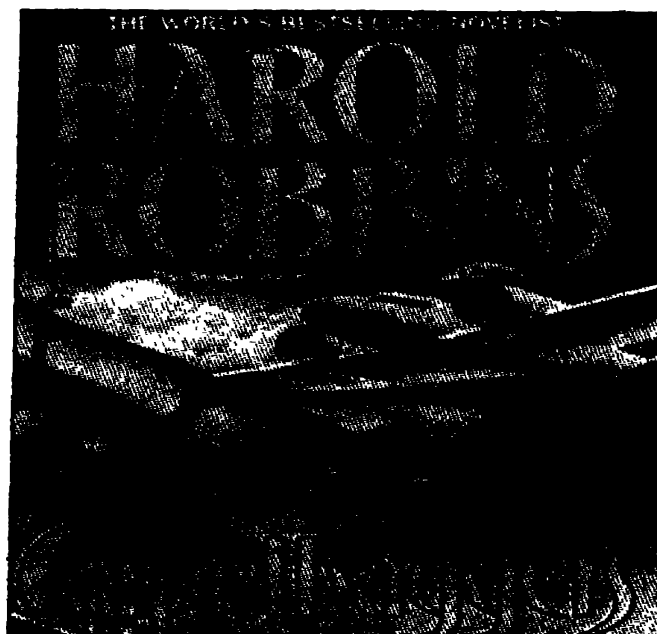
প্রথম পর্ব

বেলা শেষ, নেভাদা মরুভূমিতে সূর্য ডোবার সময় হয়ে এল। দূরে দিগন্তের দিকে চোখ পড়তে মনে হল যেন সাদা বালুর বুকে মুখ থুবড়ে পড়বে বলেই সূর্যটা খসে পড়ছে আকাশ থেকে। রেণো এইমুহূর্তে আমার ঠিক নিচে। খুব আস্তে ওয়াকোর মুখ পূবদিকে ঘোরালাম। বাতাস কেটে এগোতে বাইপ্লেনটাকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে, সোঁ সোঁ আওয়াজ আসছে কানে। ঠিক তখনই বাবার কথা মনে পড়তে হাসি পেল। আমার এই প্লেনটা দেখে বাবা দারুণ হৈ চৈ চেঁচামেচি জুড়েছিলেন, শুধু শুধু ওঁর এককাঁড়ি টাকা খরচ করে এটা কিনেছি ভেবে রাগে গজগজ করছিলেন। কিন্তু গজগজ করার কোনও দরকার যে আদৌ ছিল না তা বাবা তখনও জানতে পারেননি। এটা কিনতে ওঁর একটি পয়সাও খরচ হয়নি, একরকম বরাতজোরেই আমি বাজি জিতে এই বাইপ্লেন-এর মালিক হয়েছিলাম—সে আরেক কাহিনী।

স্টিকটা সমানের দিকে ঠেলতেই প্লেনটা খুব আস্তে পনেরো'শ ফিট নেমে এল। এখন আমি ৩২ নম্বর সড়কের ওপর, পথের দু'ধারের মরুভূমি, রাশি রাশি বালুর দ্রুত ধাবমান অস্পষ্ট ছোপ মনে হচ্ছে। প্লেনের মুখটা দিগন্তের সমরেখায় এনে দু'পাশে কয়েকবার তাকাতেই জায়গাটা নজরে এল—আমার ঠিক সামনে, আন্দাজ আট মাইল তফাতে, মরুভূমির বুকে কুৎসিত ব্যাঙের ছাতার মত সেই কারখানা।

কর্ড এক্সপ্লোসিভস

স্টিক ঠেলে প্লেনটা আরও খানিকটা নিচে নামিয়ে আনলাম, প্লেন থেকে কারখানা এখন বড়জোর একশো ফিট নিচে। ইমেলম্যান টেনে ওপরে উঠে পেছন ফিরে তাকাতে ওদের দেখতে পেলাম। কারখানার বড় বড় জানালাগুলোয় ওরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। উজ্জ্বল রঙিন পোষাক পরা পোড়া তামাটে চামড়ার মেক্সিকান আর রেড ইণ্ডিয়ান যুবতীদের পাশে আছে পুরুষরাও, তাদের পরনে ফ্যাকাশে নীল কারখানার পোষাক। ভয়মাখানো চাউনি মেলে প্লেন নিয়ে আমার ওঠা-নামা দেখছে ওরা। নিজের মনে হাসলাম। বেচারাদের জীবন বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছে। মুখ বদলানোর মত রোমাঞ্চকর কিছু আসল চমক ওদের দেয়া যাক।

ইমেলম্যান-এর হাতলটা জোরে টানতে উঠে এলাম আড়াই হাজার ফিট ওপরে। তারপরেই স্টিক ঠেলে সোজা কারখানার পিচমাখানো ছাদ তাক করে 'ড্রাইভ' দিলাম।

প্লেনের এঞ্জিনের আওয়াজে কানে তালা ধরার জোগাড়। অশান্ত বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত হানছে চোখে মুখে। ভাল করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বুনো জানোয়ারের হিংস্র আক্রোশে বাতাস যেন আমার চোখমুখ ধারালো নখ দিয়ে খুবলে দেহের ভেতরের শিরা আর ধমনী বয়ে রক্তস্রোত মাথায় উঠছে টের পাচ্ছি। কলজের ধুকপুকুনি প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে। ক্ষমতার স্বাদ কেমন জয়স্টিকটা মুঠোয় পুড়ে তার কিছুটা স্বাদ পাচ্ছি।

গোটা পৃথিবী এখন আমার পায়ের নিচে। খেলনা ছাড়া আর কিছু তাকে মনে হচ্ছে না। আমায় থামতে বলবে এমন কেউ এমন কি আমার বাবাও এইমুহূর্তে ধারে কাছে নেই।

চারপাশে ধু ধু সাদা বালুর বুকে কারখানার কালো ছাদ কি অদ্ভুত, যেন ধপধপে সাদা বিছানার ওপর পড়ে আছে কোনও যুবতী, প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনের আশায় উন্মুখ হয়ে আছে। তুলনাটা মনে হতেই কেউ যেন দমবন্ধ করতে সজোরে চেপে ধরল আমার টুঁটি। মা! মাগো, মামণি আমি সত্যিই পালাতে চাইনি। বিশ্বাস করো। আমি বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলাম।

পিং! প্লেনের ডানার সঙ্গে টানা দেয়া একটা তার আচমকা সশব্দে ছিঁড়ে গেল। ক'বার চোখ পিটপিট করে ঠোঁট চাটতে চোখের জলের নোনা স্বাদ জিভে পেলাম। কারখানায় ছাদের কুচকুচে কালো পিচের বুকে ছড়ানো আবছা ধূসর নুড়ি পাথরগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। স্টিক ঠেলে আরও অনেকটা নিচে নেমে এলাম, আন্দাজ আটশো ফিট। বাতাসের বুকে আচমকা পাক খেয়ে চলে এলাম কারখানার পেছনের মাঠে। দেহের সব জোর একত্র করে বাতাস ঠেলে নিখুঁতভাবে প্লেন ল্যাণ্ড করলাম। শরীর আর বইছেনা, লস এঞ্জেলস থেকে একটানা এতদূর উড়ে আসার পরে ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। প্লেনটা দৌড় শেষ করে থমকে দাঁড়াতে এঞ্জিনের সুইচ 'অফ' করলাম। আর ঠিক তখনই দেখতে পেলাম নেভাদা স্মিথ লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে আসছে।

নেভাদার চেহারা একই রকম আছে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এতটুকু পাল্টায়নি। বেশ মনে আছে আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ সেইসময় প্রথমবার দেখেছিলাম নেভাদাকে, বাড়ির সামনের বারান্দা দিয়ে সেদিনও এমনই লম্বা পা ফেলে সে হেঁটে আসছিল। তার সেই সময়ের চেহারা একই রকম আছে, এতটুকু বদলায়নি। নেভাদার হাঁটার ধরনটা আঁটোসাঁটো, হাঁটছে না বলে গড়াচ্ছে বললেই ঠিক বলা হয়। লম্বা পা দুটো ধনুকের মত বাঁকা, যাযাবর উপজাতিদের মত যেন দিনরাত ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ায় নেভাদা, কখনও মাটিতে নামে না। নেভাদার চামড়া বেশ পুরু, দু'চোখের কোনে কাকের পা-এর মত কোঁচকানো ভাঁজ পড়েছে। এসব ষোল বছর আগের কথা, সালটা ছিল ১৯০৯।

সকালবেলা। সামনের দরজার কাছে বড় দোলনায় আধশোয়া হয়ে বাবা রেগো সাপ্তাহিকে চোখ বোলাচ্ছেন, বারান্দার এক কোণে বসে আমি একা নিজের মনে খেলছি। বেলা আটটা, সূর্য ততক্ষণে অনেকটা ওপরে উঠেছে। এমনই সময় কানে এল ঘোড়ার খুরের খপখপ আওয়াজ। বাইরে ফটকের কাছে এসে আওয়াজটা থেমে যেতে খেলা ছেড়ে কৌতূহলের বশে ছুটে গেলাম।

দেখলাম ফটকের সামনে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে, তার পিঠ থেকে নামছে ছোটখাটো গাছের মত লম্বা একটা লোক। থেমে থেমে পা ফেলছে লোকটা। কেন কে জানে সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল ওটা ওর পা ফেলার আসল ভঙ্গি নয়, কোন কারণে নিজের হাঁটাচলার ধরন লুকোতে চাইছিল সে। সামনের একটা থামে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে লোকটা বাড়ির

দিকে এগিয়ে এল। সদর দরজার নিচে সিঁড়ির মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকাল। সেই মুহূর্তে কাগজ সরিয়ে রেখে বাবাও মুখ তুলে তাকালেন, অচেনা লোকটিকে দেখে নেমে এলেন দোলনা থেকে। বাবা লম্বায় পুরো ছ'ফিট দু'ইঞ্চি, থলথলে মাংসল শরীর। টকটকে লালমুখ রোদেপুড়ে তামাটে দেখায়। ঘাড় হেঁট করে বাবা লোকটিকে খুঁটিয়ে দেখলেন।

'আপনিই জোনাস কর্ড?' চোখ কুঁচকে জানতে চাইল অচেনা লোকটি। 'হ্যাঁ', বাবা ঘাড় নাড়লেন। লোকটার মাথায় ছিল চওড়া কানাত বসানো কাউবয় টুপি চিবুকের দিকে আঁটা। হাত দিয়ে ঠেলে সেইটুপি মাথা থেকে সরিয়ে পিঠে ফেলে দিল সে আর তখনই চোখে পড়ল তার একমাথা কুচকুচে কালো চুল।

'শুনলাম আপনার কাজের লোক দরকার তাই এলাম,' লোকটা বলল।

হ্যাঁ বা না দু'টোর একটাও বললেন না বাবা। জানতে চাইলেন, 'তুমি কি কি কাজ করতে পারো?'

লোকটার চোখে মুখে হাসি ফুটলেও তার অর্থ বোঝা যায় না। অন্ততঃ সেই বয়সে ঐ হাসির অর্থ আমার মাথায় ঢোকেনি। একবার বাড়ি তারপর মরুভূমির দিকে তাকাল সে, তারপর আবার তাকাল বাবার দিকে, 'কাজ বলতে গোরু, ভেড়া, ছাগল, এমনকি গাধার পাল আমি চড়াতে পারি। কিন্তু আপনার এখানে দেখছি ওসব পাট নেই। এছাড়া আমি ভাঙ্গা বেড়া সারাতে পারি। কিন্তু আপনার এখানে ত তাও নেই দেখছি।'

'ওটা ভাল চালাতে জানো?' তার কোমরের দিকে বাবা ইশারা করলেন। বাবার চাউনি অনুসরণ করে তাকাতে লোকটার হাঁটুতে ঝোলানো খাপে আঁটা রিভলভারের বাঁট চোখে পড়ল। রিভলভারের বাঁট কালো হয়ে গেছে, হাতুড়ি তেলকালি লেগে জবজবে।

'চালাতে জানি বলেই এখনো টিকে আছি,' সে জবাব দিল।

'কি নাম তোমার?'

'নেভাদা,'

'নেভাদা কি?'

'স্মিথ। নেভাদা স্মিথ।'

বাবার প্রশ্নের ঝুড়ি খালি, আমায় দেখিয়ে লোকটা জানতে চাইল, 'এটি বুঝি আপনার ছোট খোকা?' জবাব না দিয়ে বাবা ঘাড় নাড়লেন।

'ওর মাকে দেখছিনা?'

একনজর তার দিকে তাকিয়ে বাবা একহাতে আমায় মেঝে থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিলেন, তারপর বললেন, 'ওর মা ক'মাস আগে মারা গেছে।' বেশ মনে আছে কথাটা বলতে গিয়ে বাবার গলা এতটুকু কাঁপলনা।

'আমিও তাই শুনেছি,' লোকটা আনমনা গলায় বলল, একপলক তার মুখের দিকে তাকালেন বাবা, ততক্ষণে আমি উঠে বসেছি তাঁর কনুইয়ের উল্টোপিঠে। ওখানে বসে থাকতে থাকতে টের পেলাম তাঁর হাতের পেশিগুলো কেমন যেন শক্ত হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে কিছু আঁচ করার আগেই বাবা আমায় বলের মত ছুঁড়ে দিলেন লোকটার দিকে।

বাঁধানো শান-এ মুখ থুবড়ে পড়ার আগেই অদ্ভুত ক্ষিপ্রহাতে এক হাঁটু ভেঙ্গে লোকটা খপ্ করে এক হাত আমায় লুফে নিল। বুকের ভেতর থমকে যাওয়া দমটা বেরিয়ে এল সজোরে, সেইসঙ্গে কান্না। কান্না থামাতে লোকটা আমায় কাঁধে বসাতে বাবা মুখ খুললেন, অল্প হেসে তার নাম ধরে বললেন, 'নেভাদা, খোকাকে ঘোড়ায় চড়তে শেখাও।' বলে কাগজ নিয়ে ঢুকলেন বাড়ির ভেতরে, যাবার আগে একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না। আমায় কাঁধে তোলার আগে খাপ থেকে এক ঝটকায় রিভলবার টেনে বের করেছিল নেভাদা। তার নল তাক করেছিল বাবার দিকে। বড় হবার অনেক পরে বুঝেছি সেদিন তার হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে আমার চোট লাগলে নেভাদার ঐ রিভলভারের গুলি বাবার কল্‌জে নয়ত খুলি এফোঁড় করে দিত। তার হাতে ধরা রিভলভারটা বিষাক্ত সাপের মত দেখাচ্ছিল। বাবা বাড়ির ভেতরে যেতেই নেভাদা হাতের রিভলভার আবার খাপে পুরল।

'কেমন, খোকাবাবু?' প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল নেভাদার মুখ। কাঁধ থেকে সাবধানে আমায় মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল। 'বড়বাবু কি বললেন শুনলে ত চলে এসো। আমি তোমায় ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সামনের দিকে তাকিয়ে বাবাকে দেখতে পেলাম না। সেই দিনটা আমার মনে থাকবে তার কারণ সেদিন শেষবার বাবা আমায় কোলে নিয়েছিলেন। এরপর নেভাদাই কোলে পিঠে করে আমার বড় করেছে।

প্লেন থেকে নেমে ককপিট-এর ধারে পা তুলে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় নেভাদা এগিয়ে এল। আড়চোখে আমায় দেখতে দেখতে বলল, তুমি দেখছি জব্বর কাজের লোক হয়ে উঠেছো।

'তা কাজের বইকি,' বলে ককপিট থেকে পা নামিয়ে ঘাড় হেঁট করে তার দিকে তাকালাম। বাবার মত আমিও লম্বায় পুরো ছফিট দু'ইঞ্চি, আর নেভাদা খুব বেশি হলে পাঁচ ফিট ন'ইঞ্চি। অভ্যস্ত নই বলে এভাবে ঘাড় হেঁট করে তার দিকে তাকাতে অসুবিধে হয়।

'বাঃ, ভেতরটা বেড়ে দেখতে ত,' আড়ামোড়া ভেঙ্গে নেভাদা প্লেনের পেছনের ককপিটে উঁকি দিল। জিনিসটা বাগালে কি করে?'

'একটা খেলায় বাজি জিতে পেয়েছি,' হেসে বললাম। কিন্তু আমার জবাব যে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছেনা নেভাদার চাউনি দেখেই বুঝলাম। 'বিশ্বাস করো,' আমি বললাম, 'বাজিটা জেতার পরে আমিও লোকটাকে পাঁচশো ডলার জিতিয়ে দিয়েছি।' জবাব শুনে ঘাড় নাড়ল নেভাদা। ঘাড় নাড়ানো দেখে বুঝলাম এতক্ষণে আমার কথা তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। অনেক কিছু শিখেছি তার কাছে। নেভাদাই শিখিয়েছিল, জুয়োর টেবলে কারও ঘোড়ার ওপর বাজি ধরে দিতেই টেবল ছাড়বেনা; যাকে হারিয়ে বাজি জিতলে সে লোকটাকেও পরের দিনের খেলায় কম করে একটা বাজি জিতিয়ে তবে টেবল ছাড়বে।

জুয়োর এটাই রীতি এতে তুমি যা জিতলে তা ত কমবেই না, বরং যাকে হারালে সে নিজেও অন্তত একটা বাজি জিতেছে ভেবে খুশি মনে বাড়ি ফিরবে।'

পেছনের ককপিট থেকে কিছু চকোলেট বের করলাম; নেভাদার দিকে একটা ছুঁড়ে দিতে ও লুফে নিল তারপর আমার দেখাদেখি সেটা প্লেনের সামনের চাকার নিচে সেঁটে রাখল।

'কাজটা খুব ভাল করোনি,' নেভাদা বলল, 'তোমার বাবা ভীষণ চটে আছেন। আজকের পুরো প্রোডাকশনের বারোটা তুমি বাজিয়ে ছাড়লে।'

'ওটা এমন কিছু লোকসান হবে বলে মনে হয় না,' শিরদাঁড়া টানটান করে তার দিকে এগিয়ে এলাম, 'বাবা এত শীগগির খবর পেলেন কি করে?'

হাসল নেভাদা, সেই পুরোনো শুকনো হাসি, 'মেয়েটাকে তুমি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, সেখানকার লোকেরা ওর বাড়ির লোকেদের খবর পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনাল। মারা যাবার আগে মেয়েটা ওদের সব বলেছে।'

'কত চাইছে ওরা?'

'কুড়ি হাজার।'

'তুমি পাঁচ হাজারে ওদের সঙ্গে রফা করতে পারো।'

জবাব না দিয়ে আমার খালি পায়ের দিকে তাকাল নেভাদা, 'জুতো পরে চটপট চলে এসো,' 'সে বলল, 'তোমার বাবা তোমার জন্য বসে আছেন।' বলেই মাঠ ধরে হনহন করে এগিয়ে চলল সে। উবু হয়ে আমার খালি পায়ের দিকে তাকালাম। মাটির গরম পায়ের আঙ্গুলগুলোয় লাগাতে ভারি আরাম লাগছে। দু'পায়ের আঙ্গুলে খানিকক্ষণ বালু চটকালাম। তারপর আবার ঢুকলাম ককপিটে। ভেতর থেকে বের করলাম একজোড়া মেক্সিকান স্যাণ্ডাল। যার আরেক নাম হুয়ারাকো। চটপট পায়ে গলিয়ে মাঠ ধরে নেভাদার পেছন পেছন এগিয়ে চললাম।

জুতোয় আমার বড্ড ঘেন্না, ওতে পায়ের দম বন্ধ হয়ে আসে।

২

পায়ের হুয়ারাকো জোড়ায় বালু উড়িয়ে কারখানায় দিকে চলেছি। বাতাসে গন্ধকের গন্ধ, জানি কারখানায় বারুদ তৈরি করতে গন্ধক লাগে। মেয়েটাকে সে-রাতে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরে একই ধাঁচের গন্ধ নাকে এসেছিল। বাচ্চাটা ওর পেটে আসার আগে আমাদের মিলনের রাতে এমন কোনও গন্ধ দু'জনের কেউ পাইনি।

ম্যালিবু উপকূলে আমার বাগানবাড়িতে সে রাতটা আমাদের কেটেছিল। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া, চারপাশ ঝকঝকে তকতকে ছিমছাম। খোলা জানালা দিয়ে সাগর আর তার ফেনিল ঢেউয়ের গন্ধ ভেসে আসছে। মেয়েটির গায়ের উত্তেজক সুবাস আর তার কামনামদির অস্তিত্বের গন্ধ ছাড়া ঘরের ভেতর আর কিছুই নেই।

বাথরুমে দু'জনেই একসঙ্গে ঢুকেছি, পরনের জামাকাপড় আর অন্তর্বাসের বোঝা খুলছি মিলনের আগে। মেয়েটি একাজে আমার চেয়ে ঢের বেশি ওস্তাদ, তাই আমার আগেই

জামাকাপড় সব খুলে উদোম গায়ে গিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। আমিও সব খুলে বাইরে বেরোলাম। শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবল-এর ড্রয়ার খুলে রবারের কণ্ডোমের প্যাকেট বের করতে ও মুখ তুলে তাকাল। চাপাগলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল 'না, জনি সোনা, এবারকার মত ওসবের দরকার নেই।'

শুনে আমি প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশে সেদিন পূর্ণিমা খোলা জানালা দিয়ে আকাশ ধোয়া জ্যোছ্না বন্যার মত ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ঘরে সেই জোছ্নার আলোয় স্পষ্ট দেখলাম মুখখানা তার মেঝের মত থমথমে। তার কথা শুনে সত্যিই ঘাবড়ে গেলাম। আর তাই বিছানায় ওঠার পরেও ইচ্ছে করেই দূরে দূরে সরে রইলাম।

আমি যে ঘাবড়ে গিয়ে দোটানায় পড়েছি, মাগি ততক্ষণে তা টের পেয়েছে। হাত ধরে টেনে জোর করে ও আমায় ওর ওপর চড়াল। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল "বিশ্বাস করো, জনি, ওসব বাজে জিনিসে আমার বড্ড ঘেন্না। আসলে তোমাকে ত খুব ভালবাসি, তাই তুমি আমার ভেতরে এসেছো একথা ভাবতে ভালো লাগছে।"

ততক্ষণে ওর মতিগতি যা বোঝার বুঝে গেছি, তাই মিলনের আগে একবারের জন্য মনে দ্বিধা এল। পিছিয়ে যাচ্ছি আঁচ করে সে আবার সাহস জোগানের গলায় বলল, "মিছে ভয় পাচ্ছো সোনা, বিশ্বাস করো, আমি খুব হুঁশিয়ার থাকব,' এরপরে আর আমার তর সয়নি। পরিণতির কথা একবারও না ভেবে তার আশ মেটাতে মেতে উঠলাম তার শরীর নিয়ে। আমার কানের কাছে চাপাগলায় কথা বললেও খানিক বাদে তীব্র যন্ত্রণার আওয়াজ বেরোল তার গলা দিয়ে। কানের কাছে মুখ এনে যন্ত্রণায় কাঁদছিল সে। কান্নায় আবেগে বলছিল, 'জনি, আমি তোমায় খুব, খু-উ-ব ভালবাসি, জনি সোনা। বিশ্বাস করো।"

ভাল সে আমায় সত্যিই বেসেছিল। আর সে ভালবাসার ঠেলা কি তা টের পেলাম ঠিক পাঁচ হপ্তা বাদে। ফুটবল খেলে মাঠ থেকে ফেরার পরেপরেই ঘটল ঘটনাটা, মেয়েটাও ছিল সঙ্গে। গাড়িতে সামনের সিটে সে আমার গা ঘেঁষেই বসেছিল। অনেকটা পথ যাবার পরে ও আচমকা হুকুম দেবার গলায় আমায় যা বলল তার অর্থ এবার আমায় ওকে বিয়ে করতে হবে।

কথাটা শুনে আর তার বলার ধরনে মাথায় আগুন চড়ে গেল, ঘাড় ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "বিয়ে? তোমায়? কোন কম্মে?"

সেও তাকাল আমার দিকে, এতটুকু না ঘাবড়ে বাচালের মত বলল, 'আবার জানতে চাইছো কুমারী মেয়ে একটি ছেলেকে বিয়ে করার প্রস্তাব কখন দেয় জানো না?'

ওযে আমার মাথায় চাপতে চাইছে তা বুঝতে বাকি রইল না, তিরিক্ষি মেজাজে বললাম, 'এ আর না জানার কি আছে? দু'জনের মনে বিয়ে করার ইচ্ছে হলেই তারা বিয়ে করে?'

'তাই ত?' সে আরও কাছে এসে বলল, 'তাহলে তোমার ভাষাতেই বলছি, তোমাকে আমার বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে।'

'ধ্যাৎ! সরে বোস!' ঠেলে ওকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমার মনে সে ইচ্ছে কিন্তু এখনও জাগেনি।'

'কিন্তু আমায় খু-উ-ব ভালবাস এ-কথা সে রাতে নিজে মুখে তুমি আমায় বলেছিলে!' বলতে বলতে ও প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি!

'এই কথা!' মুখ ফিরিয়ে উইণ্ডস্ক্রিণের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, 'মিলনের মুহূর্তে পুরুষ আর নারী দু'জনেই কত ভাল ভাল কথা একে অপরকে শোনায়, তাই বলে ওসব কথায় কখনও গুরুত্ব দেয় নাকি?' বলতে বলতে ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করলাম। তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'যতদূর মনে পড়ে তুমি হুঁশিয়ার থাকবে এই কথা তুমি নিজের মুখে আমায় দিয়েছিলে।'

শুনে একটা ছোট ন্যাতার মত রুমাল ও বের করল। তাই দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় বলল, 'জনি, আমি তোমায় খুব খু-উ-ব ভালবাসি। জনি, আমি তোমার বাচ্চার মা হতে চাই।'

তাহলে এই ব্যাপার। যাক, তবু তার নিজের মুখ থেকে কথাটা শুনে আমার ভেতরের তিরিক্ষি ভাবটা কাটল। আমার বাচ্চার মা হতে চায়, জোনাস কর্ড জুনিয়রকে নিয়ে এই ত মুশকিল। গাদা গাদা মেয়ের মুখ থেকে আগেও এই একই কথা একই আবেদন শুনেছে সে। যেমন মেয়েরা তেমনই তাদের মায়েরা, সবাই ভাবেন যুদ্ধের পরে বারুদের কারবার করে আমার বাবা যখন কোটিপতি হয়েছেন তখন আমায় একবার বঁড়শিতে গেঁথে তুলতে পারলে প্রচুর টাকা হাতানোর সুযোগ পাবেন।

'তা এত খুব ভাল কথা, সোজা কথা,' মুখ ফিরিয়ে তাকালাম তার দিকে, 'আমার বাচ্চার মা হতে চাও ত হয়ে যাও।'

আমার কথা শুনে তার হাবভাব নিমেষে পাল্টে গেল, আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'তার মানে তুমি কি আমাদের বিয়ের কথা বলছ?'

'আবার বিয়ের কথা কেন?' প্রবল আপত্তিতে ঘাড় নাড়ালাম, 'বলছিলাম আমার বাচ্চাদের মা হবার জন্য যখন এত ক্ষেপে উঠেছো তখন আর সময় নষ্ট না করে হয়ে যাও।' শুনে সে পিছিয়ে গেল। উৎসাহে ঝলমল তার চোখের মণি ঘোলাটে দেখাল। আচমকা ঠাণ্ডা গলায় বাস্তববাদীর মেজাজে বলল, 'ভুল করছ, ব্যাপারটা এমন নয় যে না হলেই চলবে না। গির্জায় নিয়ে গিয়ে আমার হাতের আঙ্গুলে তুমি আংটি পরিয়ে দেবে, পাদ্রি মন্ত্র পড়বেন, সেই হল ঠিক বিয়ে। তার আগে পেটের আপদটাকে বিদেয় করতে হবে।'

এই কথা! হেসে একটা সিগারেট তার দিকে এগিয়ে দিলাম। "বাঃ, তোমার আসল মতলব বেরিয়ে আসছে পেট থেকে!"

ও সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে চাপতে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলাম। 'কিন্তু জনি,' ও নাক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'পেট খসানোর কাজটা খুব সহজ হবে ভেবোনা, ওতে ভাল খরচ হবে।'

'কত খরচ হবে তাই শুনি?'

'মেক্সিকোর শহরে এক ডাক্তার আছে,' আবার একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে, 'মেয়েরা বলে এসব কাজে ওঁর হাতযশ আছে। ধরো দু'শো ডলার?' জিজ্ঞাসু চোখে সে তাকাল আমার দিকে।

'বেশ, তাই দেব,' চটপট জবাব দিলাম, 'দু'শো ডলারে ঝামেলা যদি মেটে তাহলে আমার পক্ষে তা অবশ্যই লাভজনক। আগের মেয়েটার পেট খসাতে পুরো সাড়ে তিনশো ডলার বেরিয়েছিল আমার পকেট থেকে।' আধপোড়া সিগারেট বাইরে ফেলে এঞ্জিন চালু করলাম। ট্র্যাফিকের ভিড় কাটিয়ে রওনা হলাম ম্যালিবুর দিকে।

'অ্যাই!' ভিতু গলায় ও চেঁচিয়ে উঠল, 'যাচ্ছো কোথায়?'

'সাগরপাড়ে বাগানবাড়িতে,' তার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, 'যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা নিয়ে ওখানে বসে কথা বলা যাবে।'

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলল, ' তোমার কাছ থেকে টাকা খিঁচে নিতে আমার কত ছলাকলা করতে হয়েছে জানলে আমার মায়ের মুখখানা কেমন দেখাবে তাই ভাবছি। মা পইপই করে বলে দিয়েছে পুরুষ ভোলানোর যত ছলাকলা আছে তোমার মন গলাতে তার একটাও যেন বাদ না পড়ে।'

'ভয় নেই,' হেসে বললাম, 'একটাও বাদ পড়েনি।'

'মা বেচারির জন্য এত কষ্ট হচ্ছে, উনি ধরেই নিয়েছিলেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

মা বেচারি! ঐ বুড়ি বেবুশ্যে মাগি নিজের মুখ বন্ধ রাখলে মেয়েটা হয়ত আরও কিছুদিন বাঁচতে পারত।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। শোবার ঘরের টেলিফোন একটানা বেজে চলেছে। রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এলাম, রিসিভার কানে ঠেকাতে ভেসে এল ওর গলা, 'জনি, আমার তলপেট থেকে প্রচুর রক্ত বেরোচ্ছে, রক্তে ঘর ভেসে উঠছে।''

যেটুকু ঘুম চোখের পাতায় এসেছিল রক্তক্ষরণের কথা কানে যেতেই উধাও হল, বিরক্ত হয়েই জানতে চাইলাম, 'কি করে হল?'

'আজ বিকেলেই মেক্সিকো শহরে বেরিয়েছিলাম। তারপর থেকেই ব্লিডিং শুরু হয়েছে,'' মেয়েটি জবাব দিল।

'ব্লিডিং থামাতে পারছিনা। বড্ড ভয় করছে।'

'কোথা থেকে ফোন করছ?' বিছানায় উঠে বসে জানতে চাইলাম।

'আজ বিকেল নাগাদ ওয়েস্টউড হোটেলে উঠেছি, রুম নম্বর নয় শূন্য এক।'

'চটপট শুয়ে পড়ো, আমি এক্ষুণি আসছি।'

'দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি এসো, জনি দয়া করে।'

লস এঞ্জেলসে শহরের ঠিক মাঝখানে ওয়েস্টউড এক বড় হোটেল। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোটিপতি ব্যবসায়ী, রাজা রাণি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আর বিভিন্ন পেশার মানুষ চব্বিশ ঘন্টা এখানে ঢুকছে বেরোচ্ছে। এখানকার কর্মীরাও তাই সদা ব্যস্ত। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে চলছে তাদের জীবন। তাই একতলার রিসেপশনে একটি কথাও

না বলে সোজা এলিভেটরে চাপতে কেউ ফিরেও তাকালনা। ওপরে পৌঁছে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে ন'শো এক নম্বর কামরা খুঁজে বের করলাম। দরজার পাল্লা খোলাই ছিল, ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

মেয়েটা শুয়ে আছে খাটে, রক্তে বিছানা পুরো ভেসে গিয়েছে। বিছানা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে, সস্তা কার্পেট রক্তে মাখামাখি, এমনকি খানিক আগে যে চেয়ারে বসে ও আমায় ফোন করেছিল রক্ত তাতেও লেগেছে। এত রক্ত আগে কখনও দেখিনি। বালিশে মাথা রেখে ও শুয়ে আছে। মুখের চামড়া ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। এত রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে ক্লান্তি আর অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলল। ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল কিন্তু কোনও শব্দ হলনা।

'কথা না বলে চুপটি করে শুয়ে থাকো,' তার মুখের ওপর ঝুঁকে বললাম,' 'আমি ডাক্তার ডাকছি। দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার কথায় আশ্বাস পেয়ে ও চোখ বুঁজল। আমি সরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুললাম। ডাক্তার ডেকে লাভ হত না কারণ ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে কাগজে কোনও কেলেংকারির খবর আবার ছাপা হলে বাবা খুশি হতেন না। এসব কথা ভেবেই ম্যাক অ্যালিস্টারকে ফোন করলাম। ক্যালিফোর্ণিয়ার উনিই বাবার কারবারের আইনঘটিত ব্যাপার স্যাপার দেখাশুনো করেন।

ম্যাক অ্যালিস্টারের খাস আর্দালি ওঁকে ডেকে দিল। গলার আওয়াজ যতদুর সম্ভব শান্ত আর স্বাভাবিক রেখে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, 'আমার এক্ষুণি একজন ডাক্তার আর অ্যাম্বুলেন্স চাই।'

এমন একজন উকিলকে বাবা কেন লাখ লাখ ডলার খরচ করে পুষছেন এক মুহূর্তে তা বুঝতে পারলাম। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে উনি সময় নষ্ট করলেন না। শুধু কে, কোথায়, কখন, ব্যস্। একবারও ঐ জাতীয় কোনও প্রশ্ন করলেন না। হোটেলের নাম আর কামরার নম্বর জেনে সংক্ষেপ বললেন, 'দশ মিনিটের ভেতর ডাক্তার আর অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে যাবে। তোমাদের আইনজীবী এবং পারিবারিক হিতৈষী হিসেবে উপদেশ দিচ্ছি, ওরা এসে পৌঁছোবার আগে তুমি ওখান থেকে পালাও, ব্যাপারটার সঙ্গে এমনিতেই নিজেকে যথেষ্ট জড়িয়েছো। তারপর আর জড়ানোর অর্থ হয়না।'

অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। আড়চোখে খাটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর দু'চোখ বোঁজা। ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে দরজার দিকে পা বাড়াতেই ও চোখ মেলে জেগে উঠল।

'দোহাই জনি,' আকুতি ভরা গলায় সে বলল, 'আমার ভয় করছে, এভাবে আমায় একা ফেলে যেয়ো না।'

পালাতে পারলাম না, পিছু হটে তার শিয়রে বসলাম।

তার একটি হাত দু'হাতের মুঠোয় তুলে নিতে ও আবার চোখ বুঁজল। দশ মিনিটের ভেতর ডাক্তার সমেত অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল হোটেলের দরজায়। হাসপাতালে পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত ও আমার হাত একই ভাবে ধরে রইল।

৩

নেভাদার পেছন পেছন কারখানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের আওয়াজ আর গন্ধ আমায় ঘিরে ফেলল। গন্ধ আর আওয়াজের ঘেরাটোপে নিজেকে রেশমের গুটিপোকার মত মনে হচ্ছে। আমায় দেখে শ্রমিকদের কর্মরত হাত কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল, কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে চাপাগলায় কিছু বলাবলি করল তারা। তাদের কথাবার্তার দু'টি মেক্সিকান শব্দ আমার কানে ঠেকল— 'এল হিজো।' পুত্র বা ছেলে বোঝালেও এর যথার্থ আন্তরিক অর্থ হল 'ব্যাটা এয়েছে।' গর্ব মেশানো আদরের ভাষায় এইভাবেই এরা উল্লেখ করে আমায়। শুনেছি এদের পূর্বপুরুষেরাও গোষ্ঠীপতি বা মোড়লের কাছে এমনিভাবেই নিজের ছেলেদের পরিচয় দিত।

পেল্লায় সব চৌবাচ্চা, প্রেস আর ছাঁচ পেরিয়ে কারখানার পেছনদিকের সিঁড়ির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। বাবার অফিসে যেতে হলে এই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার মুখে ঘাড় ফেরালাম। দেখলাম কয়েকশ' শ্রমিক হাসিমুখে দেখছে আমার। হেসে আমিও হাত নাড়লাম তাদের দিকে। ছোটবেলায় এই সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময়েও একইভাবে ওদের দিকে হেসে হাত নাড়তাম মনে আছে। সিঁড়ির একদম শেষে বাবার অফিস। কারখানার ভেতরে এতক্ষণ যে আওয়াজটা একটানা হচ্ছিল বাবার অফিসের দরজার ওপাশে সে আওয়াজ পৌঁছোয়না। ছোট বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবার অফিসের সামনের দিকে এসে দাঁড়ালাম।

ডেনবি তার ডেস্কে বসে কাজে ব্যস্ত; কাজ বলতে বরাবরের অস্থির ভঙ্গিতে কোনও খসড়া তৈরি করছে। কিছু তফাতে বসে এক যুবতী প্রাণপণে টাইপরাইটারে শব্দের ঝড় তুলছে। বাইরের লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট কৌচে বসেছে একজন পুরুষ তার পাশে এক মহিলা। এক নজর তাকিয়ে বুঝলাম এরা এসেছে বাবার সঙ্গে দেখা করতে। মহিলার পরনে কালো পোষাক, একখানা ছোট সাদা রুমাল আপনমনে দুমড়ে চলেছেন তিনি। দোরগোড়ায় আমায় দেখেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। একঝলক মুখের পানে তাকিয়েই বুঝলাম তিনি কে। মেয়েটার সঙ্গে তার মায়ের মুখের এত সাদৃশ্য যা না দেখলে বিশ্বাস হয়না। চোখে চোখ পড়তেই মহিলা মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

'তোমার বাবা অপেক্ষা করছেন,' ডেনবির গলা নার্ভাস শোনাল। আমি কোনও জবাব দিলাম না। ডেনবি চেয়ার ছেড়ে উঠে সামনের কামরার দরজা খুলে দিতে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

চারপাশে তাকাতে প্রথমেই চোখে পড়ল নেভাদাকে, বাঁদিকে দেয়াল জোড়া বিশাল বুক কেসে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। দু'চোখ আধবোঁজা হলেও সে যে জেগে আছে আর চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বাবার মুখোমুখি চেয়ারে বসে ম্যাক অ্যালিস্টার, ভেতরে ঢুকতে মুখ ফিরিয়ে একবার সে আমায় দেখল। ওককাঠের পেল্লায় ডেস্কের ওপাশে বসে বাবা। চোখমুখ দেখে মনে হয় ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছেন, যে কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেটে পড়বেন।

বাবার অফিসের চেহারা আগে যেমন ছিল তেমনই আছে তার একটুও পাল্টায়নি। কালো ওক কাঠের পুরু প্যানেলের দেয়াল। আর মোটা চামড়ার গদিমোড়া চেয়ার, জানালায় সবুজ মখমলের পর্দা ঝুলছে। বাবার ডেস্কের ঠিক পেছনের দেয়ালে একখানা ফোটো, রাষ্ট্রপতি উইলসনের সঙ্গে বাবা সৌজন্য বিনিময় করছেন। বাবার বাঁ পাশে টেলিফোনের টেবল, সেখানে পাশাপাশি তিনটে টেলিফোন। তাঁর ঠিক লাগোয়া আরেকখানা টেবলে জলের কুঁজো, বুরবোঁ হুইস্কির বোতল আর দু'খানা গ্লাস শোভা পাচ্ছে। হুইস্কির বোতলে এখনও এক তৃতীয়াংশ ভর্তি। ঘড়িতে এখন ঠিক তিনটে বেজে দশ মিনিট। আমার বাবার রোজ এক বোতল হুইস্কি লাগে।

পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম বাবার সামনে। কটমটে চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কেমন আছো, বাবা? সব ঠিকঠাক চলছে ত?'

আমার কথা শুনে বাবার লাল টকটকে মুখ আরও রাঙা হয়ে উঠল, ফুলে উঠল গলা আর ঘাড়ের নীলচে শিরাগুলো। প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বললেন 'থাক্! ঢের হয়েছে। আকাশে সার্কাস দেখতে গিয়ে ভয়ে আমার লোকেদের হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। গোটা দিনের প্রোডাকশনের বারোটা বাজিয়ে এখন এসেছো বাপের সঙ্গে মজা করতে? ইয়ার্কির আর জায়গা পাও নি?'

'মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছ,' বাবাকে বোঝাতে চাইলাম, 'যত শীগগির হয় চলে এসো এই খবরই ত তুমি পাঠিয়েছিলে। আমি তাই যত শীগগির পারি এসেছি।'

কিন্তু বোঝাতে চাইলে কি হবে, অত সহজ কথায় বোঝার পাত্র আমার বাবা নন। যত বোঝাতে যাই ততই ওঁর রাগ বেড়ে যায়। এমনি অদ্ভুত ওঁর রাগ। এই দেখছি শান্ত ঠাণ্ডা মানুষ। তারপরেই এমন কিছু ঘটল যার ফলে ওঁর পারা গেল চড়ে, সে রাগ ঘুড়ির মত আকাশে না চড়া পর্যন্ত কিছুতেই ওঁকে ঠাণ্ডা করা যাবে না।

'ম্যাক অ্যালিস্টার বলার সঙ্গে সঙ্গে কেন তুমি হোটেল ছেড়ে চলে যাওনি? হাসপাতাল পর্যন্ত কেন গেলে? নিজের বুদ্ধিতে চলে এখন কি কাণ্ড বাধিয়েছো জানো? গর্ভপাতজনিত-মৃত্যু ঘটানোর সহায়তা করার অপরাধে যে কোন মুহূর্তে ফৌজদারি আইনে ধরা পড়ার রাস্তা নিজেই তৈরি করেছো।'

বাবার কথার ধরনে এবার আমারও রাগ চড়তে লাগল। আমার নিজের রাগও বাবারই মত। রেগেমেগে আমিও বললাম, 'তোমার উকিল ভদ্রলোক পিঠ বাঁচানোর উপদেশ দিয়েই খালাশ। কিন্তু আমার তখন আর কিউ-বা করার ছিল? শরীরের যত রক্ত ছিল সব বেরিয়ে বেচারি তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভয়ে চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত পারছেনা। ঐ অবস্থায় ওকে একা ফেলে রেখে পালিয়ে গেলে কি খুব বাহাদুরি হত?'

'হ্যাঁ, তাই হত। মগজে ছিটেফোটা বাস্তব-বুদ্ধি থাকলে তুমি সেই বাহাদুরিই দেখাতে। মেয়েটা এমনিতেই মরত, তাই তুমি ওখানে না থাকলেও ওর কিছু যেত আসতনা। বাইরে যারা বসে আছে তারা মেয়েটার বাবা মা, বেজন্মা দুটো আমার কাছে কুড়ি হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করছে, না দিলে থানাপুলিশ করার হুমকিও দিয়েছে। কিন্তু

তুমি পেয়েছো কি? একেক মাগির পেট বানাবে আর সেই বাবদে আমায় কুড়ি হাজার ডলার খেসারত দিতে হবে? একে নিয়ে তিনটে হল। এক বছরের মধ্যে পরপর তিনটে মেয়ের সঙ্গে কেলেংকারি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লে।'

তাহলে অকালে মারা গেল বলে নয়, আসলে কুড়ি হাজার ডলার হাতছাড়া হবে ভেবেই বাবার বুক টাটাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলাম যে টাকা নয়, দুঃখটা আসলে অন্য কোথাও। বাবার চোখের দিকে তাকিয়েই আচমকা তা টের পেয়েছি। বয়স বেড়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারটাই ওঁর দিনরাতের একমাত্র চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিণার সঙ্গে নিশ্চয়ই বাবার ফের অশান্তি বেধেছে। রিণাকে বাবা বিয়ে করেছেন তাও এক বছরের ওপর হয়ে গেল। খুব জাঁকজমক করে রেণোতে হয়েছে সে বিয়ে। কিন্তু তারপরে এখনও কিছুই হয়নি, রিণার এখনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি।

বাবার কথার জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। 'অ্যাই!' পেছন থেকে বাবা হেঁকে উঠলেন, 'যাচ্ছিস কোথায়?'

'লস এঞ্জেলসে ফিরে যাচ্ছি,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'তুমি কি করবে না করবে তা পুরোপুরি তোমার নিজের ব্যাপার, আমাকে ছাড়াই তুমি তা করতে পারবে। বাইরে যারা বসে আছে তাদের হয় টাকা দেবে নয়ত দেবে না। তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। তাছাড়া আমার একটা 'ডেট' আছে।'

'আবার?' ডেস্ক ঘুরে পেছন পেছন তেড়ে এলেন? 'কোন কম্মে?' অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে বললেন, 'আবার একটা মেয়ের বারোটা বাজানোর মতলব?'

'অনেক বকবক করেছো, এবার থামো!' অনর্থক বাজে কথা শুনে এবার আমারও রাগ চড়ছে, বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার বংশধরের এখনও বাচ্চা পয়দা করার ক্ষমতা আছে এটা জেনে তোমার খুশি হওয়া উচিত। নয়ত রিনা হয়ত ভেবে বসবে আমাদের গুষ্টির কারও বাপ হবার ক্ষমতাই নেই।'

রাগ আর উত্তেজনায় বাবার মুখটা যেন দুমড়ে বেঁকে গেল, এমনভাবে দু'হাত মাথার ওপর তুললেন যেন আমায় মেরেই বসবেন। ঠোঁট মুখের ভেতরে ঢুকল, দু'পাটি দাঁত বের করে হিংস্র জানোয়ারের মত চাপাগলায় গর্জে উঠলেন। সেলাই করা চামড়ার মত কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল। পরমুহূর্তে তাঁর মুখের সব রাগ উধাও হল যেন সুইচ টিপে আলো নেভালে যেমন হয় তেমনই টলতে টলতে বাবা এগিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে ফেললাম। এক মুহূর্তের জন্য আমার চোখে চোখ রাখলেন বাবা। তাঁর ঠোঁট নড়ল। স্পষ্ট কানে এল তাঁর কথা—'জোনাস—বাপ আমার।'

পরক্ষণে ঘোলাটে হয়ে এল তাঁর দু'চোখের চাউনি, টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমার ওপর। আমি ধরে ফেলার আগেই গড়িয়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে কার্পেটের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল নেভাদা, উবু হয়ে খুলতে গেল শার্টের বোতাম। কিন্তু ততক্ষণে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি এসব করা অর্থহীন। কারণ বাবা আর বেঁচে নেই।

মেঝেতে কার্পেটের ওপর বাবা পড়ে আছেন, তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে নেভাদা।

ম্যাক অ্যালিস্টার টেলিফোনে ডাক্তারকে খবর দিতে ব্যস্ত। আমি এইফাঁকে বাবার টেবলের পাশে রাখা জ্যাক ড্যানিয়েল হুইস্কির বোতলটা তুলতে যাব ঠিক তখনই ডেনবি একতাড়া কাগজ নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বাবাকে ঐ অবস্থায় দেখে তার কাগজধরা হাতখানা কেঁপে উঠল থরথর করে। 'এখন কি হবে জুনিয়র?' আমার উদ্দেশে বলল সে। 'জার্মাণ কন্‌ট্রাক্টের এসব কাগজপত্রে কে সইসাবুদ করবে?'

আড়চোখে ম্যাক অ্যালিস্টারের দিকে তাকাতে তিনিও সায় দেবার ঢং-এ সূক্ষ্মভাবে ঘাড় নাড়লেন।

'সইসাবুদ যা করার আমি করব'। হুইস্কির বোতলটা না খুলে ডেনবিকে বললাম, 'আর হ্যাঁ, একটা কথা। এখন থেকে আর আমায় জুনিয়র বলবেন না।'

নেভাদা বাবার চোখের পাতা বুঁজিয়ে দিল।

৪

বাবাকে মেঝে থেকে তুলে কৌচে শুইয়ে কম্বল দিয়ে আগাপাস্তলা ঢেকে দিলাম। খানিক বাদে ডাক্তার এলেন; পাতলা ছিপছিপে পেটা শরীর, মাথাজোড়া টাক, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, কম্বল তুলে বাবার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখে বললেন, জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছিল?'

'কোনও কারণে প্রচণ্ড উত্তেজিত হবার ফলে মাথার শিরা ছিঁড়ে গেছে,' ডাক্তার ডেস্কের সামনে এসে বললেন, 'প্রথম স্ট্রোকেই মারা গেছেন বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, ওঁকে এতটুকু ভুগতে হয়নি।' কথা শেষ করে ডাক্তার আমার মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, কলম আর ছাপানো কাগজের প্যাড বের করলেন হাতব্যাগ থেকে। আড়চোখে দেখলাম কাগজের মাথায় বড়বড় হরফে ছাপানো ডেথ সার্টিফিকেট। কলম খুলে খসখস করে কিছু লিখলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আপনারা কি ওঁর মৃতদেহ পোস্ট মর্টেম করাতে চান?'

'তার কোনও দরকার আছে বলে আমি মনে করিনা,' গম্ভীর গলায় আমি বললাম, 'দেখুন, সব ঠিক আছে।'

ডেথ সার্টিফিকেট খানা ডাক্তার এগিয়ে দিলেন। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে দেখি সব ঠিকই আছে যে ডাক্তার আজই আমাদের প্রথম দেখছেন তাঁর দিক থেকে লেখার ভুল হয়নি। নেভাদা এলাকায় এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না কর্ড পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে যে কিছুই জানেনা। বয়সঃ ৬৭। উত্তরজীবীঃ স্ত্রী রিণা মার্লো কর্ড, পুত্র জোনাস কর্ড জুনিয়র।' কাগজটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'সব ত ঠিকই লেখা আছে।'

কাগজটা তুলে নিয়ে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, 'এটা স্বাস্থ্যদপ্তরে আমিই জমা দেব। আমার সেক্রেটারি এর কয়েকটা কপি দিয়ে যাবে।' কথা শেষ করে তিনি খুব ব্যস্ত হাবভাব দেখালেন, যেন সহানুভূতি প্রকাশ করা ঠিক হবে কিনা সে ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে পারছেন না। মনে হল তেমন কিছু প্রকাশ করা উচিত হবে না বলেই স্থির করলেন কারণ পরমুহূর্তে একটি কথাও না বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

'বাইরে যে দু'জন অপেক্ষা করছেন ওঁদের কি বলব?' ডেনবি ভেতরে ঢুকে জানতে চাইল, 'ওঁদের চলে যেতে বলব?'

'আজ চলে যেতে বললেও ওরা আবার ফিরে আসবে,' আমি বললাম, 'ওঁদের ভেতরে পাঠিয়ে দিন।

খানিক বাদে মেয়েটির বাবা মা দু'জনেই ভেতরে ঢুকলেন শোক আর সহানুভূতির ছাপ দু'জনেরই চোখেমুখে।

'মিঃ কর্ড,' মেয়েটির বাবা আমার দিকে তাকালেন, 'সুখকর পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গে দেখা হলনা বলে দুঃখিত।'

'একই কথা আমিও বলব।' সৌজন্য আর শিষ্টাচার বজায় রেখে জবাব দিলাম, মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে সৎলোক বলে মনে হল।

'কি সাংঘাতিক, কি ভয়ানক!' কৌচে বাবার মৃতদেহের দিকে চোখ পড়তে তাঁর স্ত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

মহিলার মুখের দিকেও তাকালাম। মেয়েটিকে তার মায়ের মত দেখতে ছিল বটে কিন্তু তার স্বভাব ছিল শিশুর মত সরল। আর এই মহিলা মতলববাজির ধাত নিয়েই জন্মেছেন।

'কেন শুধু শুধু কাঁদছেন?' আমি বললাম, 'বাবার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দূরে থাক, আগে কখনও তাঁকে দেখেননি পর্যন্ত। আজ এসেছিলেন তাঁর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে; সেখানে ওঁর মৃতদেহ দেখে এইভাবে কান্নাকাটি করা আর যাকে হোক আপনাকে মানায় না। আপনি চোখ মুছুন, শান্ত হোন।'

'ছিঃ!' চাঁছাগলায় মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন। 'একে আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছেন, তারপর সামনে নিজের বাবার মৃতদেহ; এরপরেও এমন কথা আপনার মুখ থেকে বেরোয় কি করে?'

'কি বললেন?' ভণ্ডামি আর আত্মপ্রবঞ্চনা আমার বরদাস্ত হয়না তাই মহিলার দোষারোপ কানে যেতেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম, 'আপনার মেয়ে নাবালিকা কচি খুকু ছিলনা। তার নিজের পুরো সায় না থাকলে আমি তার যা করেছি তা কখনোই করতে পারতাম না। আমার বঁড়শিতে গাঁথার বুদ্ধি ওর মাথায় আপনি না ঢোকালে ওকে হয়ত এভাবে মরতে হত না। আপনি বলেছিলেন জোনাস কর্ড জুনিয়রকে হাতছাড়া করিসনা, পুরুষের মন ভোলানোর যত ছলাকলা আছে সেসবের একটাও বাদ দিসনা। আপনার মেয়ের মুখ থেকেই শুনেছি আপনি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার মতলব এঁটেছিলেন।'

'তার মানে?' রাগে উত্তেজনায় মহিলার স্বামির গলা কাঁপতে লাগল, স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে তোমার মেয়ের পেটে বাচ্চা আসার খবর তুমি আগেই জানতে পেরেছিলে?'

'না, হেনরি, না,' মহিলার গলা শুনে বেশ বুঝলাম ধরা পড়ে বেশ ঘাবড়ে গেছেন

তিনি, 'বিশ্বাস করো, আমি আগে কিছুই জানতাম না। তোমার নাম করে মেয়েকে বলেছিলাম তোদের দু'জনের বিয়ে হলে বেশ হয়। এর বেশি কিছুই বলিনি আমি।'

স্ত্রীর কথা শুনে ভদ্রলোক ভেতরে ভেতরে বেশ চটে যাচ্ছেন তা দেখেই বুঝতে পারছি। ভয় হল। শেষকালে রেগে গিয়ে বৌকে মেরেই না বসেন কিন্তু অতদূর গেলেন না তিনি। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মিঃ কর্ড, আমি সত্যিই দুঃখিত, ভবিষ্যতে আমরা আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসবোনা।' বলেই বুক ফুলিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। 'হেনরি! হেনরি!' স্বামির নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে তাঁর স্ত্রী ছুটলেন পেছন পেছন।

'চোপ্!' বৌকে দাবড়ে উঠলেন তাঁর স্বামি। দরজা খুলে তাঁকে বাইরে বের করে দিতে দিতে বললেন, 'বেশি কথা বলার সাধ কি তোমার এখনও মেটেনি?'

দু'জনেই চলে যাবার পরে ম্যাক অ্যালিস্টারের কাছে এলাম, 'আমার ঝামেলা বোধহয় এখনও পুরো কাটেনি, তাইনা?' জানতে চাইলাম। জবাব না দিয়ে ঘাড় নেড়ে তিনি আমার কথায় সায় দিলেন।

'আপনি বরং এক কাজ করুন,' একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'আগামিকাল সকালে ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার দেখা করুন। ওঁর কারবারের অফিস যেখানে সেখানে চলে যান। হাবভাব দেখে ত মনে হল উনি এবার আপনাকে রেহাই দেবেন। চেহারা দেখে কথাবার্তা শুনে ত ওঁকে সৎলোক বলেই মনে হল।'

'একজন সৎলোকের প্রতিক্রিয়া ঐরকম হবে বলেই মনে করছ তুমি?' মুচকি হেসে বললেন ম্যাক অ্যালিস্টার।

'আসলে কি জানেন,' আড়চোখে বাবার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এই ব্যাপারটা বাবার কাছ থেকেই শিখেছি। প্রত্যেকটি মানুষের দাম আছে এ-কথা উনি বিশ্বাস করতেন। কারও বেলায় সে দাম নিছক টাকাকড়ি, কারও বেলায় মেয়েমানুষ। আবার কারও বেলায় তা যশ, আত্মগৌরব। কিন্তু যে সৎলোক তাকে যেমন কেনা যায় না তেমনই কেনার দরকারও হয়না।'

'তোমার বাবা ছিলেন বাস্তববাদী মানুষ,' ম্যাক অ্যালিস্টার বললেন।

'ভুল!' উকিল মশাইয়ের চোখে চোখ রেখে বললাম,' আমার বাবা ছিল এক ভয়ানক স্বার্থপর আর লোভী খানকির ছাওয়াল। দুনিয়ার সবকিছুই সে নিজের দখলে রাখতে চাইত। মনে হয় এতদিনে আমি ওঁর অভাব পূরণ করার উপযুক্ত হয়েছি।'

'সে তুমি পারবে তাতে সন্দেহ নেই,' আনমনাভাবে থুতনি চুলকোতে চুলকোতে সায় দিলেন ম্যাক অ্যালিস্টার।

'কিন্তু এবার যে আমার প্রচুর সাহায্য দরকার,' আমি বললাম। ম্যাক অ্যালিস্টার উত্তরে কিছু না বললেও তাঁর দু'চোখে কৌতূহল আর লোভ ফুটে উঠল স্পষ্ট দেখলাম।

'এইমুহূর্তে এমন একজন আইনজীবী আমার দরকার যিনি একই সঙ্গে হবেন আমার উকিল, উপদেষ্টা আর বিশেষজ্ঞ। ম্যাক, আমি কি আপনাকে আশা করতে পারি?'

'আমার প্র্যাকটিসের চাপ সামলে তোমার দেবার মত সময় কতটা পাব জানিনা।

জোনাস,' ম্যাক অ্যালিস্টার আস্তে আস্তে বললেন, 'তবে তোমার সাহায্য করতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম।'

ম্যাক অ্যালিস্টার কি বলতে চাইছেন নিমেষে বুঝে ফেললাম, খোলাখুলিভাবে জানতে চাইলাম, 'প্র্যাকটিসের চাপ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? কোর্টে প্র্যাকটিস করে বছরে কত টাকা আয় করেন?'

'তা বছরে ষাট হাজার ডলার ত বটেই।'

'বছরে এক লাখ ডলার পেলে আপনি নেভাদায় আসতে রাজি আছেন?'

'কন্ট্রাক্টের খসড়া আমি তৈরি করব শুধু এই শর্তে।'

প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করে একটা ওঁকে দিলাম আর একটা নিজে নিলাম। দেশলাই জ্বেলে বললাম 'ঠিক আছে।'

'এত টাকা আমার দিতে পারবে এই আত্মবিশ্বাস তুমি পাচ্ছো কি করে?' সিগারেটে আগুন দেবার আগেই ম্যাক প্রশ্নটা করে বসলেন।

'সত্যি বলতে কি খানিক আগেও আমি তা পাইনি। এখন আপনি রাজি আছেন জেনে সেই আত্মবিশ্বাস পাচ্ছি,' বলে দুটো সিগারেট একই সঙ্গে ধরালাম।

হালকা হাসির একটা পরত ওঁর মুখে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। এরপরে ব্যবসার কথা তুললেন ম্যাক। এবার গোড়াতেই বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের একটা মিটিং ডাকতে হবে। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে তোমার কোম্পানির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে হবে। তোমার কি মনে হয় এ-নিয়ে কোনও ঝামেলা বা মতান্তর হবার আশংকা আছে?'

'আমার তা মনে হয় না,' আমি বললাম, 'আমার বাবা লাভের বখরা বিলিয়ে দেবার পক্ষপাতী কোনদিনই ছিলেননা। মোট শেয়ারের শতকরা নব্বুই ভাগ আগাগোড়াই তিনি নিজের নামে রেখে এসেছেন। যতদূর জানি, তিনি উইল করেছিলেন এবং মৃত্যুর পরে উইল অনুযায়ী সেই শেয়ারের পুরো মালিকানা আমার ওপর বর্তাবে।'

'উইলের নকল আছে তোমার কাছে?'

'না, আমার কাছে নেই, তবে ডেনবির কাছে থাকা সম্ভব। বাবা এ-পর্যন্ত যখন যা কিছু করেছেন সে সবের রেকর্ড আছে ওর কাছে।'

ঘন্টা বাজাতেই ডেনবি এসে ঢুকল। 'বাবার উইলের একটা নকল আমায় দিন,' তাকে বললাম। খানিক বাদে ডেনবি উইলের নকল নিয়ে এল। পুরু নীল কাগজে বাঁধানো। ম্যাক অ্যালিস্টারের হাতে দিতে তিনি চটপট তার বয়ানে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

'সবই ত ঠিকঠাক আছে দেখছি,' মুখ না তুলেই বললেন ম্যাক, ' কোম্পানিতে তোমার বাবার যত শেয়ার আছে সে সবের মালিক এখন তুমিই। এবার যত শীগগির সম্ভব এর প্রোবেট নিলেই কাজ মিটবে।'

'রেণোতে জজ হাসকেল-এর আদালতে ওটা পেশ করা হয়েছে,' আমি জিজ্ঞেস করার আগে ডেনবি জবাব দিল।

'মিছিমিছি ধরে না রেখে টেলিফোনে জজসাহেবকে ওটা এখুনি রুজু করতে বলুন,' ডেনবিকে হুকুম দিলাম। সে দরজার কাছাকাছি যেতে পেছন থেকে বললাম, 'আর হ্যাঁ,

জজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলার পরে কোম্পানির ডিরেক্টরদের সবাইকে টেলিফোনে জানান যে আসছে কাল সকালে আমার বাড়িতে ব্রেকফাস্ট টেবলে আমি বিশেষ মিটিং ডেকেছি।'

ডেনবি বেরিয়ে যেতে ম্যাক অ্যালিস্টারের দিকে তাকালাম, 'বলুন ম্যাক, আমার আর কি করার আছে?'

'এইমুহূর্তে করার মত আর কিছু নেই,' গম্ভীরভাবে আস্তে ঘাড় নাড়লেন ম্যাক, একটা ব্যাপার বাদে —ঐ জার্মান কন্ট্রাক্ট। এ ব্যাপারে আমি নিজেও অবশ্য খুব বেশি জানিনা তবে তোমার বাবার মুখেই শুনেছি ওঁর ব্যবসার ক্ষেত্রে এ এক দারুণ সুযোগ। পুরোপুরি এক নতুন ধরনের জিনিস তৈরির ব্যাপার। যতদূর মনে পড়ে জিনিসটার নাম ওঁর মুখেই শুনেছিলাম— প্ল্যাস্টিক।'

ডেস্কে রাখা অ্যাশট্রে-তে আধপোড়া সিগারেট নিভিয়ে বললাম, 'জিনিসটা যাই হোক তার একটা ফাইল ডেনবি-র কাছে আছে,' আমি বললাম, 'আপনি ওটা বাড়ি নিয়ে যান। রাতে একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন তারপর কাল সকালে মিটিং-এর আগে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমায় টেলিফোনে দিন। আমি পাঁচটায় উঠে পড়ব।'

এই প্রথম ম্যাক অ্যালিস্টারের চোখের চাউনিতে এক অদ্ভুত ভাব নেমে আসতে দেখলাম। এক মুহূর্ত পরেই তা মিলিয়ে গেল। তখনই বুঝলাম এই ভাবের আরেক নাম শ্রদ্ধা। 'আমিও পাঁচটায় উঠব, জোনাস,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি।

'আরেকটা কথা, ম্যাক,' উনি দরজার কাছে যাবার আগেই পেছন থেকে বললাম, 'ঐ ফাইল ছাড়া কোম্পানির অন্যান্য অংশীদারদের নামের তালিকা ডেনবির কাছ থেকে জোগাড় করে নিন। মনে হচ্ছে মিটিং-এর আগে ওদের সবার নাম আমার জানা দরকার।'

'হ্যাঁ জোনাস,' ওঁর চোখের চাউনিতে, গলার আওয়াজে খানিক আগের শ্রদ্ধার ভাব আরও প্রবল হয়ে ফুটল, পরমুহূর্তে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'বলো কি ভাবছ?' মুখ ফিরিয়ে নেভাদাকে প্রশ্ন করলাম, 'কেমন মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে বড়কর্তা এবার শান্তিতে ঘুমোবেন।' একটু বেশি সময় ভেবে জবাব দিল নেভাদা।

প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, নেভাদার কথায় মনে পড়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে কৌচের কাছে এসে দাঁড়ালাম, কম্বলটা তুলে বাবার মুখের দিকে তাকালাম। বাবার দু'চোখ বোঁজা, ঠোঁটদুটো ভয়ানক দেখাচ্ছ। ডানকানের পাশে রগের ঠিক নিচে চামড়ার রং নীলচে দেখাচ্ছে; হয়ত ঐখানের শিরা ছিঁড়েছে, মনে মনে বললাম। বাবার জন্য বুকফাটা কান্না কাঁদার প্রাণপণ চেষ্টা করছি, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও একফোঁটা জল আনতে পারছিনা চোখে। বহুবছর আগে আমি যখন খুব ছোট সেইসময় আমায় একহাতে তুলে যেদিন বলের মত ছুঁড়ে দিয়েছিলেন নেভাদার দিকে, সেদিনই বাবা আমায় ত্যাগ করেছিলেন।

পেছনে দরজা খোলায় আওয়াজ কানে আসতে কম্বল নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়ালাম। দোরগোড়ায় ডেনবি দাঁড়িয়ে।

'জেইক প্ল্যাট আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন স্যার' ডেনবি বলল।

'পাঠিয়ে দাও,' বলে চেয়ারে বসলাম, খানিক বাদে জেইক প্ল্যাট দরজা ঠেলে ভেতরে এল। বড়সড় পেল্লায় ভারি শরীর, পা ফেলার ধরনও ভারি গুরুগম্ভীর। দু'হাত মেলে ঘরে ঢুকল জেইক, এগিয়ে এসে কৌচে শোয়ানো বাবার মৃতদেহের দিকে একপলক তাকিয়ে চাপাগলায় বলল, 'উনি সত্যিই খুব বড় মাপের মানুষ ছিলেন, এইভাবে আচমকা চলে যাবার ফলে দারুণ লোকসান হল। অপূরণীয় ক্ষতি। তোমার বাবা সতিাই মহৎপ্রাণ ছিলেন।'

আর তুমি নিজেও কম বড়মাপের অভিনেতা নও, জেইক, তার উদ্দেশে মনে মনে বললুম। মুখে অবশ্য বললুম, 'ধন্যবাদ, জেইক। তোমায় অজস্র ধন্যবাদ।'

'আমায় দিয়ে কোনও কাজ করানোর দরকার হলে নিঃসংকোচ জানাবেন,' জেইক বলল, 'আমি সবসময় আপনার সেবার জন্য .তৈরি আছি।'

'ধন্যবাদ জেইক,' আবার বললাম, 'ভাবতে ভাল লাগছে তোমার মত লোক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।'

'প্ল্যাণ্টে কিন্তু সবাই জেনেছে,' গলা নামিয়ে বলল জেইক, 'এখানকার মজুরদের বেশীরভাগ হয় মেক্সিকান নয়ত রেড ইণ্ডিয়ান। ওদের ধাত ত তুমি জানো, কত সহজে ওরা নার্ভাস হয় তা ত জানো? তোমার হয়ে আমি ওদের আলাদাভাবে কিছু বলব? তুমি যা বলবে তাই হবে। মনে হয় কিছু না বললে ওদের ঠাণ্ডা করা যাবেনা।'

'মনে হয় ঠিকই বলেছো, জেইক,' তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তবে বলতেই যদি হয় তাহলে তোমার বদলে যা কিছু বলার আমার নিজেরই বলা উচিত।'

পছন্দ হোক বা না হোক, ওপরওলার কথায় সবসময় সায় দেয় জেইক, কখনও প্রতিবাদ বা মুখে মুখে তর্ক করেনা। নিজেকে ওপরওলার বসম্বদ প্রমাণ করার নীতি মেনে চলে জেইক। 'আমার প্রস্তাব যে ওর পছন্দ হয়নি তা ওর চাউনি দেখেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু ভেতরের ভাব চাপা দিয়ে সে বলল 'তুমি যখন চাইছো তখন তাই করো, জোনাস।'

'তাই করব,' বলে বেরোতে যাব এমন সময় নেভাদা পেছন থেকে বলে উঠল। 'ওঁর ব্যবস্থা কি হবে?' বুঝলাম ও বাবার কথা বোঝাতে চাইছে, 'যারা কবর দেয় তাদের টেলিফোনে খবর দিয়ে সব দায়িত্ব সঁপে দাও,' একটু থেমে বললাম, 'সবচেয়ে নামী যারা তাদের ডাকবে আর বলবে জাঁকজমকের যেন কমতি না হয়।' কিছু না বলে নেভাদা শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল। 'এসব সেরে তুমি গাড়ির পাশে অপেক্ষা কোর, 'আমি বললাম, 'গাড়িতে চেপে দু'জনে বাড়ি ফিরব।' নেভাদার জবাবের অপেক্ষা না করে পেছনের করিডর দিয়ে বেরিয়ে এলাম, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে সিঁড়ির মাথায় চাতালে এসে দাঁড়ালাম। সামনে তাকিয়ে দেখি কারখানার প্রত্যেকটি মজুর কাজ ফেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেটুকু গুঞ্জন হচ্ছিল জেইক হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। সুইচ টিপে প্রত্যেকটি মেশিন বন্ধ করা হল। চারপাশ যেন থমথমে লাগছে। কারখানার ভেতরে এমন দম বন্ধ করা নিস্তব্ধ পরিবেশ আগে দেখিনি। আমি মুখ খুলতেই সে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল।

'মাই পাদ্রে হা মুয়েরতো, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশ যেটুকু জানি তাইতেই বললুম, 'আমার বাবা মারা গেছেন, কিন্তু আমি তাঁর ছেলে এখনও বেঁচে। যে কাজ তিনি ততদিন চালিয়ে এসেছেন তা বজায় রাখতে পারব বলেই আমার আশা। এই কারবারকে খুব ছোট থেকে এতবড় করে তুলতে তোমাদের মত কর্মঠ শ্রমিকেরা ততদিন যে মদত দিয়েছো তাকে বাহবা দিতে আমার বাবা আর কোনদিন ফিরে আসবেন না এ দুঃখ বোঝানোর ভাষা আমার জানা নেই। তবু শুনে খুশি হবে মারা যাবার আগের মুহূর্তেও তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তিনি ভেবেছিলেন, আর তাই তোমাদের সবার জন্য মাথা পিছু পাঁচ শতাংশ মজুরি আর বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের নির্দেশ উনি লিখিতভাবে দিয়ে গেছেন।'

'কি বলছ জোনাস!' পাশে দাঁড়িয়ে জেইক প্ল্যাট ফিসফিস করে ধমকে আমার কবজি চেপে ধরল। তার হাত ছুঁড়ে বললাম, 'বাবা নেই, তাই ব্যবসার সব কাজকর্ম এখন থেকে আমিই দেখব। ততদিন তোমরা আমার বাবার সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করে এসেছো আমার সঙ্গেও তা করবে এই আশাতেই বুক বেঁধে এতবড় কারবার দেখাশোনার দায়িত্ব আমি নিয়েছি। আমি এ-কারবারের অনেক কিছুই জানিনা তাই সবকিছু শিখতে আমার কিছু সময় লাগবে। আশা করব শেখার জন্য সেই সময়টুকু আমায় তোমরা দেবে। আমার আর কিছু বলার নেই। আমার বাবার আত্মার সদগতি যাতে হয় সেই প্রার্থনা তোমরা সবাই করো এটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আর হ্যাঁ বাবার অকালমৃত্যু উপলক্ষে আজ কারখানার ছুটি ঘোষণা করছি। অশেষ ধন্যবাদ।'

ভাষণ শেষ, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। জেইক এল পেছন পেছন, মজুররা এতক্ষণ ভিড় করে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার কথা শুনেছে। এবার তারা দু'পাশে সরে গিয়ে আমার এগোনোর পথ করে দিল। যেতে যেতে নজরে পড়ল দু'একজনের চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে দরদর করে। যাক, বাবার মৃত্যুতে পুরো বিফলে যায়নি, তাঁর শ্রমিকদের মধ্যে দু'একজন চোখের জল ফেলেছে তাঁর কথা ভেবে।

কারখানায় বাইরে এসে দেখি দিনের আলো তখনও আছে, মাথার ওপর প্রখর সূর্য গনগন করছে, যদিও তার কথা এতক্ষণ মনেই ছিলনা।

কারখানার দরজার ওপাশেই পেল্লায় পিয়ার্স অ্যারোখানা দাঁড়িয়ে, ড্রাইভারের সিটে বসে নেভাদা। পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে জেইক আমার কাঁধে হাত রাখল। ইচ্ছে না থাকলেও ঘুরে তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

'এ তুমি কি করলে বলো ত জোনাস,' প্যানপেনে গলায় কাঁদোকাঁদো হয়ে জেইক বলল,' মজুরি আর বেতন বাড়ানোর কথা আচমকা ওদের বলতে গেলে কেন? এগুলো কতবড় নম্বরী শুয়োরের বাচ্চা তা তুমি না জানলেও আমি জানি। বসার এতটুকু জায়গা উল্লুকগুলোকে দাও, দেখবে তারপরেই এরা শুতে চাইছে। এদের মজুরি কমানোর কথা তোমার বাবা দিনরাত আমাব পইপই করে বলতেন। আর তুমি—'

'আমার ভাষণ তুমি শোননি জেইক?' ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'চটপট সব কিছু শিখে নেবার ক্ষমতা সবার নেই তাও খানিক আগে আমিই বললাম, শোননি সে কথা?'

'তুমি ওদের যা যা বলেছো সব আমি শুনেছি, জোনাস,' জেইক বলল 'আর সেই ব্যাপারেই বলতে চাইছি যে—'

'না জেইক', তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, 'তুমি যে মন দিয়ে আমার একটি কথাও শোননি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি গোড়াতেই বলেছি মাই পাদ্রে হা মুয়ের্তো—আমার বাবা মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ বুঝেছি, কিন্তু—'

'বুঝেই থাকলে এরপরে আবার কিন্তু বলছ কেন, জেইক? তিনি মারা গেছেন, কিন্তু আমি এখনও বেঁচে। আমি এখানেই থাকব আর নিজের ভালো যদি চাও ত মনে রেখো একদিক থেকে আমি কিন্তু পুরোপুরি আমার বাবার মত। নিশ্চয়ই বাবাকে বলতে শুনেছো, 'আমার কাছে যে কাজ করবে তার মুখে থেকে কোনও আজেবাজে ওজর বা অজুহাত শুনতে আমি মোটেও রাজি নই। আমি যখন যেমন বলব তখন তেমনই চলতে হবে। আমার সঙ্গে যাদের মতের অমিল হবে তাকে দিয়ে আমার দরকার নেই, সে যেকোন মুহূর্তে জাহান্নামে চলে যেতে পারে।''

আমার চেয়ে চটপট শিখে নেবার ক্ষমতা যে জেকের আছে তা তার হাবভাব আর গলা শুনেই আঁচ করলাম। আমি ততক্ষণে সামনের দরজা খুলে নেভাদার পাশে বসেছি। সেই অবস্থায় সে থপথপ করতে করতে দৌড়ে এল। দরজার হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে মিনমিন করে বলল, 'জোনাস, আমি তেমন কিছু ভেবে বলিনি, বিশ্বাস করো। আসলে আমি—'

কি আপদ! বেশি মজুরি দিলে যে বেশি কাজ পাওয়া যায় তা এই হাড়ে হারামজাদাকে কিভাবে বোঝাব ভেবে পেলাম না। এই ত গেল বছরেই ফোর্ড তার জ্বলন্ত নজির রেখেছেন—কারখানায় শ্রমিকদের মজুরি উনি বাড়িয়ে দিয়েছেন আর ওঁর মোটরগাড়ির উৎপাদনও বেড়েছে আগের চেয়ে তিনগুণ। মাথা ঘোরাতেই কারখানায় আলকাতরা ঢালা ছাদ চোখে পড়ল।

'জেইক, তাকে ডেকে বললাম,' কারখানায় ছাদটা দেখেছো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ওটার রং পাল্টে সাদা করে দাও,' বলার সঙ্গে সঙ্গে নেভাদা এঞ্জিন চালু করল। ক্লান্তিতে দু'চোখ বুঁজে আসছে, সিটের কুশনে ঠেশ দিয়ে চোখ বুঝলাম।

৫

কারখানা থেকে বাবার নতুন বাড়ির মাঝখানে কুড়ি মাইলের ব্যবধান। খানিক বাদে বাদেই আমার চোখ পড়ছিল ড্রাইভারের পাশে আঁটা আয়নায়, নেভাদা গাড়ি চালানোর ফাঁকে আড়চোখে যে আমায় দেখছে ঐ আয়নার দিকে চোখ পড়তেই দেখছিলাম। তারপরেই প্রচণ্ড ক্লান্তিতে দু'চোখ আমার বুঁজে আসছিল।

আমার বাবা আর আমার মা দু'জনকেই আমি ঘেন্না করি। ভাইবোন থাকলে তাদেরও ঘেন্না করতাম। না, আমি বাবাকে এখন আর ঘেন্না করিনা, তিনি আর বেঁচে নেই, মৃত

লোককে কেউ ঘেন্না করেনা। হাজার হলেও তিনি আমার গর্ভাধারিণী নন, বিমাতা। ঘেন্না নয়, আমি তাঁকে ভালবাসতাম।

ভালবাসতাম বলেই তাকে সেদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। আমি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাবা বলেছিলেন আমি একদম বাচ্চা ছেলে। উনিশে পা দেয়া সত্ত্বেও তাঁর মতে বিয়ের বয়স নাকি আমার হয়নি। কিন্তু বাবা নিজে বাচ্চা ছিলেন না। আমি কলেজে ফিরে যাবার ঠিক এক হপ্তার মধ্যে তিনি নিজেই সে মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন।

কলেজের ছুটি শেষ হবার দু'হপ্তা আগে ক্লাবে রিণার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। ম্যাসাচুসেটস-এ ব্রুকলিন নামে একটা জায়গা আছে সেখান থেকে এসেছিল রিণা। আগে যেসব মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বা যাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি রিণা তাদের কারও মত নয়। প্রখর সূর্যের তাপে এদিকের মেয়েদের গায়ের রং গাঢ় কালচে তামাটে; তারওপর তাদের হাবভাব, চলাফেরা কথা বলার ধরন সবই ছেলেদের মত। দিনের বেলা ছেলেদের পাশে ওদের দেখলে কোনও তফাত চোখে পড়েনা। সেটা পড়ে সন্ধের পরে। তখন ওরা লেভি'স-এর ট্রাউজার্স ছেড়ে স্কার্ট পড়ে। প্রকৃতির খেয়ালে ওদের বুক সমতল, কোমর আর নিতম্বও সরু, খুব কাছ থেকে না দেখলে মেয়ে বলে বোঝা যায় না।

কিন্তু রিণা ছিল সবদিক থেকে ওদের চেয়ে আলাদা, ওদের মত পুরুষালি ধাঁচ বা বৈশিষ্ট ওর চেহারায় ছিলনা। প্রথম যখন দেখি তখন ওর পরণে সুইমিং স্যুট। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, কাঁধদুটো স্বাভাবিক মেয়েদের তুলনায় কিছুটা বেশি চওড়া। কিন্তু ওর দু'টি স্তন ছিল পরিপুষ্ট, বুকের জমি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠা দু'টো ছোটখাটো পাহাড় যেন। সেই দু'টি স্তনের দিকে প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল ভেতরের মাতৃপীযূষ কতনা মধুর যার স্বাদ একবার পেলে সন্তান আর ভুলতে পারবেনা। রিণার বুকের সেই ছোট দু'টি পাহাড়কে আঁকড়ে রেখেছে পাঁজরের উঁচু খাঁচা যা নমনীয় হয়ে নেমে এসে মিশেছে কোমরে, সেখান থেকে আরও নিচে সুডোল সুগোল নিতম্বে।

রিণার চুলের রং ছিল ফ্যাকাশে লাল। একঢাল লম্বা চুল মাথার পেছনে টেনে বাঁধত সে যা ছিল তখনকার ফ্যাশনের ভাষায় 'সেকেলে'। ভুরুজোড়া ছিল উঁচু, অল্প ট্যারা দু'চোখের মাঝখানে ফাঁক ছিল। রিণার চোখের মণিতে ছিল নীলচে আভা। টিকালো খাড়া নাক অল্প পাতলা যা তার রক্তে ফিনিশ প্রভাবের পরিচয় বহন করত। রিণার চেহারায় একমাত্র খুঁত ছিল ঠোঁট—সরু দৃঢ়সংবদ্ধ চিবুকের ওপর বসানো তার ঠোঁটদু'টি ছিল অসম্পূর্ণ। সুইশ ফিনিশিং স্কুলে পড়েছে রিণা, তাই সহবত তার ভালই আয়ত্তে ছিল। রিণা হাসত নিঃশব্দে, দাঁত না দেখিয়ে, মেলামেশ করত দেখেশুনে। প্রথম আলাপের পরে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমায় এমন পটাল সে আমার তখন পক্ষিরাজের মত আকাশে ওড়ার অবস্থা। বিদেশী টান ফুটলেও রিণা কথা বলত খুব নরম গলায়। প্রথম আলাপের পরে ঠিক দশদিনের মাথায় ক্লাবে শনিবার রাতের নাচের আসরে টের পেলাম রিণাকে আমি কতটা কাছে পেতে চাই। খুব ঢিমে লয়ে আঁটোসাটো ওয়ালজ নাচে সামিল

হয়েছে সবাই, ছাদে ঝোলানো নীল আলোগুলো ইচ্ছে করেই নামিয়ে আনা হয়েছে অনেকটা নিচে। এরই মধ্যে আচমকা রিণার তাল কেটে ছন্দপতন হল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার গায়ে খুব জোর', বলেই বুক দিয়ে আমায় সজোরে ঠেশে চেপে ধরল। তার কোমর আর তলপেটের গনগনে আঁচ বয়ে যাচ্ছিল আমার গায়ে। খানিকবাদেই তার জ্বালাপোড়ায় ছটফটিয়ে উঠলাম; রিণার হাত ধরে বেরিয়ে এলাম নাচের আসর থেকে। রিণার মুখে টুঁ শব্দটি নেই, মাথা নিচু করে পেছন পেছন সে আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ডুসেনবার্গ রোডস্টার তৈরি ছিল, ওকে সামনের সিটে তুলে আমি বসালাম পাশে ড্রাইভারের জায়গায়। এঞ্জিন চালু করেই গিয়ার পাল্টে ছুটলাম হাইওয়ে ধরে। নেভাদা মরু অঞ্চলের রাতের গরম বাতাস ঝাপটা মারছে চোখেমুখে। আড়চোখে দেখলাম সিটের পেছনের গদিতে মাথা ঠেশ দিয়ে বসেছে রিণা, দু'চোখে বুঁজে বাতাসের দাপট উপভোগ করছে।

আরও খানিকদদূর যেতে কি খেয়াল চাপল মাথায়। খেজুর বীথির আড়ালে গাড়ি ভিড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে গভীর চুম্বনের রেখা এঁকে দিলাম ওর ঠোঁটে। রিণা নির্বিকার, সে চুমু গ্রহণ করল না। ফিরিয়েও দিলনা। তাকে তাতানোর সাধ হল। কিন্তু স্তনের নাগাল পেতে হাত বাড়াতেই রিণা সে হাত চেপে ধরল। মুখ তুলে সোজাসুঝি তাকাতে দেখি ওর চোখ খোলা। কিন্তু কি যেন পাতলা সূক্ষ্ম আবরণে তা ঢাকা তাই তার চোখের চাউনির মানে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছি। রিণার কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বললাম, 'তোমাকে চাই', রিণার ভাবভঙ্গি এতটুকু পাল্টালনা। কানে এল ওর গলা, 'আমি জানি।'

শুনে উৎসাহিত হলাম, আঁধারে ওর বুকের নাগাল পেতে আবার হাত বাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু এবারেও রিণা আগের মতই আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিল।

পরক্ষণেই 'তোমার রুমালটা দেখি' বলে আমার বুকপকেটে গোঁজা সাদা রুমালটা নিজেই টেনে নিল। সিটের গদিতে মাথা ঠেশ দিয়ে রইল, রুমালটা জড়িয়ে নিল হাতের আঙ্গুলে। আচমকা অদ্ভুত এক পুলকের অনুভূতি জাগল শিরদাঁড়ার গোড়ায়, তারপরেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা যেন কেটেছিঁড়ে ফালফালা করে ফেলল আমায়। যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠলাম সিট ছেড়ে, কাঁপা হাতে সিগারেট বের করে ধরালাম। দেশলাই জ্বালতে চোখে পড়ল রুমালটা দলা পাকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এরপরে আমার মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে নিজে টানতে লাগল রিণা।

'এরপরেও তোমাকে চাই,' যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে বললাম। জ্বলন্ত সিগারেটটা আমার ঠোঁটে গুঁজে ও ঘাড় নেড়ে বোঝাল তা সম্ভব নয়।

'কেন?' জানতে চাইলাম, 'বাধা কোথায়?'

'কারণ দু'দিন বাদেই আমায় দেশে ফিরতে হবে,' সিগারেটের আগুনের আভায় তার মুখখানা দারুণ ফ্যাকাশে দেখাল, 'কারণ ১৯২৩-এর স্টক মার্কেটের বিপর্যয়ে আমার বাবা তাঁর যথাসর্বস্ব খুইয়েছেন। আর তাই এবার একজন ধনী লোককে আমায় বিয়ে

করতেই হবে, এছাড়া আমার বাঁচার পথ নেই, তোমার কথায় রাজি হয়ে সে পথ আমি বন্ধ করতে রাজি নই।'

একমুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার এঞ্জিন চালু করলাম। খেজুর বীথির আড়াল থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে গাড়ি ছুটে চলল আমার বাড়ির দিকে। মাঝপথে একটি কথাও বললাম না। না বললেও রিণার সব প্রশ্নের জবাব আমার কাছে তৈরি ছিল—নিজে ধনী না হলেও ধনীর ছেলে বটে, অথবা ভবিষ্যতে একদিন আমিও ধনী হব।

বাড়িতে পৌঁছে রিণাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে সোজা চলে এলাম বাবার স্টাডিতে। আবছা আলো আঁধারি। ঘরের সব আলো নেভানো, শুধু টেবল ল্যাম্প জ্বেলে বাবা ঝুঁকে কারবারের কাগজপত্রে চোখ বোলাচ্ছেন। আমার পায়ের আওয়াজ কানে যেতে বাবা চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'কিছু বলবে?'

সুইচ টিপেতই গোটা স্টাডি আলোয় ভরে গেল, 'আমি বিয়ে করতে চাই'।

'বাবা চশমার ভেতর দিয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমার কথার অর্থ বুঝতে পারছেন না। কয়েক মুহূর্ত বাদে তা তিনি বুঝলেন। এতটুকু আবেগ না এনে সুস্থ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'তোমার মাথার ঠিক নেই এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।' তারপরেই মুখ নামিয়ে কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'রাত বাড়ছে অযথা আমায় বিরক্ত না করে এবার শুয়ে পড়ো।'

'তুমি বুঝতে ভুল করছ বাবা,' আমি বললাম, 'আমি যা করতে চাই তাই তোমায় বলেছি' বেশ মনে আছে বহুবছর পরে ওঁকে সেদিন আবার বাবা বলে ডেকেছিলাম।

'না,' ধীরে ধীরে বাবা চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'বিয়ে করার বয়স তোমার এখনও হয়নি।'

ব্যস্ এর বেশি আর একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেননি। কাকে বিয়ে করতে চাই, কবে বিয়ে করতে চাই এসব প্রশ্ন আদৌ উঁকি দেয়নি তাঁর মনে। শুধু বললেন, আমার বিয়ের বয়স তখনও হয়নি। 'ঠিক আছে, বাবা,' বলে আমি দরজায় দিকে পা বাড়ালাম, দরজার কাছাকাছি গিয়ে কি মনে হতে বললাম, 'শুধু এইটুকু মনে রেখো তোমায় আগেই বলেছিলাম.........'

'এক মিনিট দাঁড়াও' বাবা পেছন থেকে বললেন, আমি ততক্ষণে বেরিয়ে যাব বলে পা বাড়িয়েছি, দরজার হাতল চেপে ধরেছি মুঠোয়।

'মেয়েটি কোথায়?' বাবা জানতে চাইলেন।

'বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে।'

'কখন ঠিক করলে বিয়ে করবে?' ধূর্ত চাউনি মেলে বাবা তাকালেন আমার দিকে।

'আজ রাতে', জবাব দিলাম।

'আজ রাতে, খানিক আগে।'

'বুঝেছি', বাবা বললেন, 'ক্লাবে শনিবারের নাচের আসরে যেসব পুঁচকে বোকাবুদ্ধু

হাবাগবা মেয়ে নাচের নামে গতর দেখিয়ে ছেলে ছোকরাদের মাথা খায় ও নিশ্চয়ই তাদের একজন? ছেলেকে পাঠিয়ে এসেছে তার বাপের মন ভেজাতে।'

'আমায় ভুল করছ, বাবা,' রিণার পক্ষ নিয়ে বললাম 'ও আদৌ তেমন মেয়ে নয়। আমি যে এখানে তোমায় আমার বিয়ের কথা বলতে এসেছি তাও ও জানেনা।'

'তার মানে?' বাবা বললেন 'ও তোমায় বিয়ে করতে রাজি কিনা এ প্রশ্ন ওকে এখনও করোনি?'

'প্রশ্ন করা দরকার মনে করিনি।' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গলায় বললাম 'ও কি জবাব দেবে আমি জানি।'

'তাহলেও,' বাবা গম্ভীরগলায় বললেন, 'নিয়মরক্ষার খাতিরেও ওর মত আছে কিনা একবার জেনে নিতে বাধা কোথায়?'

জবাব না দিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম, খানিক বাদে হাত ধরে রিণাকে টানতে টানতে নিয়ে এলাম স্টাডিতে, রিণাকে বললাম 'রিণা, ইনি আমার বাবা,' বাবাকে বললাম 'বাবা, এরই নাম রিণা মার্লো।'

ভদ্রতার নিয়ম মেনে রিণা ঘাড় অল্প ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল। বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলে রিণাকে। লক্ষ করলাম তাঁর চোখেমুখে চিন্তার ছাপ ফুটেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে ডেস্ক থেকে উঠে তার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন। 'আমার ছেলে আপনাকে বিয়ে করতে চায়। মিস মার্লো, কিন্তু আমি মনে করি ও এখনও কচি, বিয়ের বয়স এখনও ওর হয়নি। আপনার কি ওকে এখনও খুব কচি মনে হয়না?'

রিণা আমার দিকে তাকাতে স্পষ্ট দেখলাম ওর চোখে উৎসাহের আলো ঝিলিক দিল। পরমুহূর্তে সেই আলো নিভে চোখের চাউনি আবার ঝাপসা দেখাল।

'এটা এমন একটা প্রশ্ন মিঃ কর্ড', বাবার দিকে মুখ তুলে রিণা বলল 'যার উত্তর দিতে অস্বস্তি হয়, বিব্রত হতে হয়। রাত অনেক হল, আপনি আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবেন?'

একটি কথাও না বলে বাবা আমার চোখের সামনে রিণার হাত ধরে বেরিয়ে এলেন স্টাডি থেকে, খানিক বাদে ডুসেনবার্গ এঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ কানে এল।

রাগে তখন আমি এমন দিশাহারা হয়েছি যে কি করব মাথায় আসছে না। বাবার টেবলল্যাম্পটা চোখে পড়তে সেটা তুলে নিয়ে দেয়ালে এক আছাড় মেরে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলাম। এর দু'হপ্তা বাদে কলেজে বাবার টেলিগ্রাম পেলাম; বাবা লিখেছেন—

'আজই সকালে তোমার বান্ধবী রিণাকে বিয়ে করেছি। এইমুহূর্তে আমরা নিউইয়র্কে ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে আছি। ইওরোপে মধুচন্দ্রিমা কাটাতে আগামিকাল লেভিয়াথনে জাহাজে চেপে পাড়ি দিচ্ছি।

বাবা।

খবরটা পড়েই টেলিফোনে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

'বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে মহামূর্খ হয়ে ওঠে তোমার টেলিগ্রাম পড়ে আজ তা জানলাম।' তিনহাজার মাইল দূর থেকে চেঁচিয়ে বললাম, 'টাকা, শুধু কাঁড়ি

কাঁড়ি টাকার লোভে যে ও তোমায় বিয়ে করেছে তা বোঝার মত বুদ্ধি কি তোমার এখনও হয়নি?'

আমার অবস্থা যে বাবা বেশ উপভোগ করছেন তাঁর চাপা হাসি শুনেই তা টের পেলাম। 'মূর্খ যদি কেউ হয় ত সে তুমি জোনাস, আমি নই।' বাবা বললেন, 'তোমার মত পুঁচকে ছোঁড়া নয়, আমার মত সক্ষম বয়স্ক পুরুষ মানুষই ও চেয়েছিল। বিয়ের আগে আমায় দিয়ে এক প্রাক্-বিবাহ সম্পত্তির দলিলেও ও সই করিয়ে নিয়েছে।'

'সত্যি বাবা, তোমার জবাব নেই,' এবার আমিও হাসলাম, 'দারুণ খেল দেখালে বটে এই বয়সে। তা সেই দলিলের খসড়া করল কে, ওর উকিল?'

'না, আমি,' বাবার চাপা হাসি আবার কানে এল, তারপরেই বাবার গলা পুরো পাল্টে গেল, আচমকা গলা ভারি করে বললেন, 'এবার সব কিছু ছেড়ে লেখাপড়ায় একটু বেশি করে মন দাও ত বাপধন; পরীক্ষার ফল যাতে ভাল হয় সেই চেষ্টায় লেগে যাও। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা—যে ব্যাপারে তুমি জড়িয়ে নেই তা নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়োনা। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার নাক গলানো আমার পছন্দ নয়। যাক, এখন রাত বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ হল—তোমার নতুন মা আগেই শুয়ে পড়েছেন, এবার আমিও শুতে চললুম। গুডনাইট, জোনাস।'

নতুন মা! আমার মগজে থেকে থেকে চাপা রাগের আগুন জ্বালিয়ে কি সুখ যে বাবা পান জানিনা, কেনই বা উনি এমন করেন তাও আমার মাথায় ঢোকেনা। হয়ত বারুদের কারবারী বলেই এমনই নেশা চাপে ওঁর মাথায়। বাবার টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ অনেক আগেই কানে এসেছিল। তবু বোকার মত হাতে ধরা রিসিভারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম। রিসিভার নামিয়ে খাটে উঠে শুলাম বটে, কিন্তু সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। ঝিমুনি আসার সঙ্গে সঙ্গে রিণা আর বাবার লাগাম ছেঁড়া সহবাসের উদ্দাম ছবি অশ্লীল ছবির মত ভেসে উঠল। ফলে তখনই ঝিমুনি গেল কেটে। বারবার একই ঘটনা ঘটতে লাগল। শেষরাতে বালিশ থেকে মাথা তুলে দেখি ঘামে বিছানা ভিজে উঠেছে।

কা'র হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুমের ঘোর কেটে গেল। ধীরে ধীরে চোখ মেলতেই নেভাদার মুখ দেখতে পেলাম।

'ওঠো জোনাস,' নেভাদা বলল।

'আমরা বাড়ি পৌঁছেছি।'

সামনের কাঁচের এপাশ থেকে সামনের দিকে তাকাতে দেখলাম পেল্লায় বাড়ির পেছনে অস্ত যাচ্ছে বেলাশেষের সূর্য। মাথায় ঝাঁকুনি দিকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। অদ্ভুত দেখাচ্ছে বাড়িটাকে। বেশ মনে আছে বাবা এ-বাড়ি তৈরি করার পরে দু'হপ্তার বেশি এখানে কাটাইনি আমি। এখন বাবার আর সবকিছুর মত এই বাড়িরও আমিই মালিক।

সিঁড়ির দিকে এগোলাম। রিণা হিসেবী মেয়ে সন্দেহ নেই, সব গুছিয়ে নেবার কথা

আগে থেকেই ও ভেবে রেখেছিল। অবশ্য শুধু এটা ছাড়া। আমার বাবা মারা গেছেন। খবরটা আমিই নিজে মুখে জানাব তাকে।

৬

বারান্দা পেরোতেই সামনের দরজা খুলে গেল। ক্রীতদাস প্রথা যখন চালু ছিল সেইসময় দক্ষিণ আমেরিকার তুলো ক্ষেতের মালিক জমিদারদের সাবেক বিলাসী রুচি অনুকরণ করে বানিয়েছিলেন এই বাড়ি, এবং এর দেখাশোনা করতে নিউ অর্লিয়ন্‌স থেকে রোবেয়ার নামে এক কৃষ্ণাঙ্গকে এনে বহাল করেছিলে বাটলার বা খানসামার চাকরিতে।

লম্বা চওড়া রোবেয়ারকে দেখতে দানবের মত হলেও তার স্বভাব খুব ভদ্র, অদ্ভুত সংযত গলায় কথা বলা তার স্বভাব। তেমনই কাজের দিক থেকে সে খুব দক্ষ। বাবা আর ঠাকুর্দা একসময় ক্রীতদাসের জীবন কাটালেও খানসামার কাজ সম্পর্কে গর্ব অনুভব করার ধাত তাদের কাছ থেকেই পেয়েছে সে। এছাড়া রোবেয়ারের আরেকটা বড় গুণ নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে ওর এক ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাজ করে—রোবেয়ারকে ডাকার কথা মনে এলেই সে এসে হাজির হয়, অনেকটা স্মরণ করলেই দেখা দেবার ধরনে।

'হেলো, মাস্টার কর্ড,' একপাশে সরে সে আমায় ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিল।'

'হেলো রোবেয়ার,' সে দরজা ভেজিয়ে দিতে বললাম, 'এসো আমার সঙ্গে।' নিঃশব্দে পা ফেলে আমার পেছন পেছন বাবার স্টাডিতে এল রোবেয়ার, আড়চোখে দেখলাম তার মুখ শান্ত সমাহিত, দুঃখ বা শোকজনিত কোনও আবেগের ছায়া পড়েনি সেখানে।

'কিছু বলবেনা, মিঃ কর্ড?' স্টাডির দরজা ভেজিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল রোবেয়ার। লক্ষ করলাম মাস্টার ছেড়ে এই প্রথম সে আমায় মিঃ সম্বোধন করল।

'রোবেয়ার।' নিজেকে যতদূর সম্ভব শান্ত রেখে বললাম 'আমার বাবা মারা গেছেন।'

'আমি জানি'। সে বলল, 'মিঃ ডেনবি টেলিফোনে খবর দিয়েছেন।'

'আর সবাই জানে?'

রোবেয়ার ঘাড় নেড়ে বোঝাল আর কেউ খরটা এখনও পায়নি। 'আমি টেলিফোনে মিঃ ডেনবিকে জানিয়েছি, মিসেস কর্ড বেরিয়েছেন।'

'মিসেস কর্ড বাড়ি নেই তা মিঃ ডেনবিকে আমি জানিয়েছি,' রোবেয়ার বলল 'বাড়ির আর সব কাজের লোকেদের কাউকে এখনও কিছু বলিনি।'

দরজার বাইরে কিসের যেন চাপা আওয়াজ হল। 'মনে হচ্ছে দুঃসংবাদটা আপনিই দিতে চান,' বলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে দরজার পাল্লা খুলে ফেলল সে। কিন্তু বাইরে কাউকে চোখে পড়লনা। রোবেয়ার স্টাডি থেকে বেরোতে আমিও তার পেছন পেছন বেরিয়ে এলাম। একতলার হলঘর থেকে লম্বা সিঁড়ি এঁকেবেঁকে ওপরতলার উঠে গেছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে চটপট এক যুবতী ওপরে উঠছে।

'লুইসি', চাপাগলায় নাম ধরে ডাকল রোবেয়ার, তার গলায় কর্তৃত্ব ফুটে বেরোল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতী সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পড়ল। একপলক দেখেই চিনতে পারলাম—রিণার খাস বাঁদী।

'নেমে এসো, বলছি,' কঠিন গলায় হুকুম করল রোবেয়ার। দ্বিধা জড়ানো পায়ে লুইসি নিচে নেমে আসতে স্পষ্ট দেখলাম তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ভয়ের ছায়া।

'কি হল, মিঃ রোবেয়ার?' বলতে গিয়ে লুইসির গলা অল্প কেঁপে গেল।

মুখে কিছু বললনা রোবেয়ার, তার ডান হাতখানা উঠে এল অলসভঙ্গিতে, পরমুহূর্তে তা প্রচণ্ড থাপ্পড় হয়ে আছড়ে পড়ল লুইসির গালে।

'ফের!' চাপাগলায় গর্জে উঠল রোবেয়ার, 'বন্ধ দরজার গায়ে আড়ি পাততে কতবার তোমায় মানা করেছি ভুলে গেছ? তারপরেও খানিক আগে বড়কর্তার স্টাডির দরজার আড়ি পেতেছিলে?'

লুইসির জবাব দেবার অবস্থা নেই, দু'হাতে গাল চেপে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল সে, চোখের জল গড়াতে লাগল গাল বেয়ে।

'ন্যাকার মত আর কাঁদতে হবেনা।' লুইসিকে শাসন করল রোবেরায়, 'যাও রান্নাঘরে যাও, ওখান থেকে এক পাও বেরোবেনা বলছি। আমি খানিক বাদে গিয়ে তোমার সিধে করছি।'

ধমক খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মুখ ঢেকে রান্নাঘরের দিকে দৌড়োল লুইসি। 'ওর আচরণের জন্য আমি মাপ চাইছি, মিঃ কর্ড,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল রোবেয়ার, 'সাধারণত আমার কাজের লোকেরা এমন অসভ্যতা করেনা, কিন্তু এটা এখনও একদম জালি রয়ে গেছে, একে মানুষ করতে গিয়ে আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।' সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরতে রোবেয়ায় দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিল। অনেকটা ধোঁয়া টেনে বললাম 'ওটা কোনও ব্যাপার নয় রোবেয়ার, ওর জন্য আর ঝামেলা পোয়াতে হবে বলে মনে হয়না।'

'হ্যাঁ, কর্তা,' পোড়া দেশলাই কাঠিটা অ্যাশট্রে-তে ফেলে রোবেয়ার সায় দিল। সিঁড়ির দিকে মুখ তুলে তাকাতেই ও বলল, 'মিসেস কর্ড ওঁর কামরায় আছেন।'

'ধন্যবাদ রোবেয়ার', তার মুখের দিকে তাকালাম কিন্তু খানসামার মুখ যেন পাথরে গাঁথা দুর্গ, তার মনের ভাব সেখানে ফোটে না।

'আমি নিজে ওপরে গিয়ে ওঁকে খবরটা দিচ্ছি,' বলে সিঁড়িতে পা রাখতেই পেছন থেকে ডাকল সে, 'মিঃ কর্ড?' কিছু না বলে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

'ডিনার কটায় দেব, কর্তা?'

'আটটা নাগাদ,' একটু ভেবে বললাম।

'ধন্যবাদ কর্তা', বলে ও বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

রিণার কামরায় দরজার বাইরে থেকে আলতো টোকা দিলাম, ভেতর থেকে কোনও সাড়া এল না। হাতল খুলে ভেতরে ঢুকতে বাথরুম থেকে ভেসে এল রিণার গলা।

'লুইসি আমার চানের তোয়ালে এনে দে।' বাথরুমের দরজা খোলা। রিণার ড্রেসিং টেবলের ওপর শেলফে একগাদা তোয়ালে সাজিয়ে রাখা। তাদের ভেতর থেকে বড়সড় একটা নিয়ে লাগোয়া বাথটবের দিকে বাড়িয়ে দিতে যাব কিন্তু তার আগেই কাঁচের

ঠেলা দরজার ওপাশ থেকে উলঙ্গ দেহে বেরিয়ে এল রিণা। শ্বেতপাথরের মত ধপধপে সাদা গায়ের রং, চুলের রং লালচে সোনালি; চুল থেকে ঝরা জল গা বেয়ে গড়াচ্ছে মেঝেতে। লুইসির বদলে আমায় দেখে এক মুহূর্তের জন্য অবাক হল রিণা। এইরকম মুহূর্তে নিজের উলঙ্গ দেহ ঢাকতে মেয়েরা সবরকম চেষ্টা করে। কিন্তু রিণা সে জাতের মেয়েই নয়। লজ্জাস্থান না ঢেকে হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে তোয়ালেটা নিল। তাই দিয়ে চটপট গা ঢেকে ড্রেসিং টেবলের কোণে বসে জানতে চাইল, 'লুইসি কোথায়?'

'নিচে রান্নাঘরে', সংক্ষেপে বললাম।

'তুমি এইসময় এখানে এসেছো শুনলে তোমার বাবা কিন্তু ভীষণ রাগ করবেন।' একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভেজা মুখ মুছতে মুছতে ভয় দেখানো গলায় বলল রিণা।

'বাবা জানতেই পারবেনা।'

'কি করে জানলে যে আমি ওঁকে নালিশ করবনা?'

'তুমি পারবেই না,' সংক্ষেপে বললাম।

হাজার হোক মেয়েমানুষ ত, ঠিক সেইমুহূর্তে ও আঁচ করল কোথাও বড় গোলমাল হয়েছে। আয়নার ভেতর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রিণা বলল, 'জোনাস, তোমার সঙ্গে তোমার বাবার কি ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি হয়েছে?'

জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম। এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকাল রিণা, চাউনি দেখে বুঝলাম আমার জবাব আর হাবভাব দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। একটা ছোট তোয়ালে আমার হাতে দিয়ে বলল।

'জোনাস আমার পিঠটা মুছে দাও না, ওখানে হাত পাইনা। আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসল রিণা, 'দেখছ ত, লুইসিকে কেন দরকার?'

ছোট তোয়ালেটা নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এলাম। গায়ে জড়ানো বড় তোয়ালেটা কাঁধ থেকে খুলে ফেলল রিণা, সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই নরম বেদাগ চামড়ায় লেগে থাকা ছোট ছোট জলবিন্দু তোয়ালে দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে মুছে দিলাম। স্নান করার পরে তার গায়ের সুবাসের উগ্র ঝাঁজ ঠেকল নাকে।

পেছন থেকে কাঁধে ঠোঁট চেপে ধরতেই চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রিণা।

'কি অসভ্যতা হচ্ছে জোনাস। সরো ঠোঁট সরাও বলছি।' চাপাগলায় ধমকে উঠল রিণা, 'আজ সকালেই তোমার বাবা বলছিলেন মেয়েমানুষ পেলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, পুরোপুরি সেক্স ম্যানিয়াক হয়ে উঠেছো। কি তাই বলে আমার ওপর তা হাতে কলমে প্রমাণ করার দরকার নেই!'

রিণার চোখের দিকে সরাসরি তাকালাম, দেখলাম সেখানে ভয়ের লেশমাত্র নেই। নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসে পুরোপুরি ভরপুর। 'হয়ত ওঁর কথাই ঠিক,' হেসে বললাম 'অথবা এমনও হতে পারে যে অল্পবয়সে মানুষের কি দশা হয় তা উনি নিজে বেমালুম ভুলে গেছেন।' বলতে বলতে এক হ্যাঁচকা টানে রিণাকে কাছাকাছি টেনে আনলাম। ওর গায়ে জড়ানো তোয়ালের প্রায় পুরোটাই সে টানে খুলে ঝুলতে লাগল। রিণার ঠোঁটে

ঠোঁট চেপে হাত রাখলাম ওর বুকে। বুক দৃঢ় আর কঠিন হয়ে উঠেছে। টের পাচ্ছি তার কলজের ধুকপুকুনি গেছে বেড়ে।

সেইমুহূর্তে হয়ত ভুল করলাম। আমি ধরে নিলাম রিণার ভেতরের যে আগুন জ্বলে উঠেছে তা আমাকে পুড়িয়ে ছাই করতে চায়। যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেও বলে উঠল, 'কি করছ, জোনাস তোমার কি সত্যিই মাথা খারাপ হল?' তোয়ালেটা মেঝেতে লুটোচ্ছে, সেদিকে না তাকিয়ে আমার দিকে থুতু ছিটিয়ে দিল রিণা, তার বুক তখন হাপরের মত ওঠানামা করছে। 'তোমার বাবা যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারেন সে খেয়াল আছে?' শাসন করার গলায় বলা রিণা।

এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলাম, ফুসফুসের ভেতরে যে চাপটা তৈরি হয়েছিল চাপা দীর্ঘশ্বাস হয়ে তা বেরিয়ে আসতে বললাম, 'ভুল করছ, উনি আর কখনও এখানে আসবেন না।'

'তা—তার মানে?' বলতে গিয়ে রিণার কথা জড়িয়ে গেল, চোখমুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, 'তু-তুমি কি বলতে চাও?'

তার চোখে চোখ রেখে দেখলাম ভীতির ছাপ, অজানা অচেনা ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর চাউনি ফুটে উঠেছে তার দু'চোখে।

'মিসেস কর্ড,' ধীরে ধীরে বললাম, 'আপনার স্বামি মারা গেছেন।'

এক মুহূর্ত মাত্র। তার দু'চোখের মণি উন্মাদের চাউনিতে একবার বিস্ফারিত হল, তারপরেই ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ল সে। তোয়ালেটা মেঝে থেকে তুলে গায়ে জড়াতে জড়াতে শুকনো গলায় রিণা বলল, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা।'

'তাই?' নিজের গলা নিজের কানেই নিষ্ঠুর শোনাল। 'কি বিশ্বাস হচ্ছে না। রিণা? তোমার স্বামির মৃত্যুসংবাদ, নাকি আমার বদলে আমার বাবাকে বিয়ে করে ভুল করেছিলে, অন্যায় করেছিলে? কোনটা?'

কিন্তু আমার কথা ওর কানে গেল বলে মনে হলনা। মুখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকাল রিণাও, চোখ শুকনো হলেও এক শান্ত দুঃখের ছায়া ফুটেছে সেখানে—এক অদ্ভুত সহানুভূতি যা অনুভব করার ক্ষমতা ওর আদৌ আছে কিনা জানা নেই। 'খুব কষ্ট হয়েছিল?' জানতে চাইল সে, 'যন্ত্রণা পেয়েছেন?'

'না,' গম্ভীর গলায় বললাম, 'খুব চটপট ব্যাপারটা ঘটল, একটা স্ট্রোক তাতেই যা হবার হয়ে গেল। বিশাল শরীর নিয়ে যে মানুষটা সিংহের মত গর্জাত, এক মিনিটের মধ্যে সেইই—দু'আঙ্গুলে তুড়ি মেরে বললাম,' এই ত জীবন।'

'শুনে সুখী হলাম,' আমার চোখে চোখ রেখে বলল রিণা, 'বেঁচে থেকে দিনের পর দিন উনি কষ্ট পেতেন তা আমি কখনও চাইতাম না।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে, চোখের চাউনি ঢাকা পড়ল দুর্বোধ্যতায়, 'আমার মনে হয় এবার তোমার যাওয়া উচিত,' বলল রিণা।

রিণার এই চেহারা আমার চেনা, এ সেই রিণা যাকে আমি আলাদা ভাবে পেতে চেয়েছিলাম। সেই দূরের মানুষ, বড্ড হিসেবী, যাকে ধরাছোঁয়া যায় না।

'না,' আমি বললাম, 'যাবনা, আমার বলা এখনও শেষ হয়নি।'

'শেষ করার আছে কি?'

'শেষ করার মত বলার কিইবা আছে?' বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল রিণা, ঠিক তখনই খপ্ করে তার হাত চেপে ধরে কাছে টেনে আনলাম। 'আমাদের সব কথা শেষ হয়নি, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম। শুধু তোমার আর আমার মধ্যে ছাড়া একথা ত আর কাউকে বলা যাবেনা। তোমায় নিজের করে পেতে চেয়েছিলাম বলে একদিন রাতে তোমায় আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমার বদলে পছন্দ করলে আমার বাবাকে কারণ আমার চেয়ে বাবাকেই তোমার সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁস বলে মনে হয়েছিল। অনেকদিন, রিণা আজকের এই মুহূর্তটির জন্য আমার অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে।'

রিণা তাকাল আমার চোখের দিকে। বেশ বুঝতে পারছি এখন আর সে ভীত নয়। বক্তব্যের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ মর্মে মর্মে বুঝতে পেয়েছে সে। এ এমন এক ক্ষেত্র যার বিরুদ্ধে লড়তে মানসিক দিক থেকে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে।

'না!' জোরগলায় প্রতিবাদ করল রিণা, 'তোমার সাহস ত কম নয়।'

মুখে জবাব না দিয়ে তোয়ালেটা একটানে তার গা থেকে খুলে দিলাম। মুখে জবাব দিলাম না, আমার সাহসের দৌড় দেখাতে তোয়ালেটা একটানে খুলে নিলাম তার গা থেকে। উদোমগায়ে রিণা ঘর থেকে দৌড়ে পালাতে গেল কিন্তু তার আগেই হাত ধরে টেনে আবার তাকে কাছে নিয়ে এলাম, আরেক হাতে তার চুলের গোছা মুঠোয় চেপে ধরলাম, তার হাত শক্ত মুঠোয় চেপে পিঠের সঙ্গে ঠেশে ধরে বললাম, 'কি বললে, না, তুমি রাজি নও?'

'ভাল চাও ত হাত ছেড়ে দাও বলছি,' জোরে দম নিতে নিতে ফ্যাশফেঁশে হেঁড়ে গলায় বলে উঠল রিণা, 'আমি একবার চেঁচালেই কাজের লোকেরা সবাই ছুটে আসবে।'

'না, আসবে না,' আমি হাসলাম, 'ওরা বড়জোর ভাববে স্বামি মরেছে এই দুঃখে তুমি চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করছ। রোবেয়ার ওদের সবাইকে রান্নাঘরে আটকে রেখেছে। তোমার পোষা মাগিকে আমি নিজে ডেকে না পাঠালে ওরা কেউ এই ধারও মাড়াবেনা।'

'থামো!' ও করুণ গলায় বলে উঠল, 'তোমার বাবার দোহাই দয়া করে থামো!'

'কেন থামতে যাব শুনি?' আমি বললাম 'উনি মানে তোমার স্বামি কি আমার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন?' বলে আর দাঁড়ালাম না তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলাম শোবার ঘরে। তারই মধ্যে রিণা আঁচড়ে কামড়ে আমার মুখ ক্ষতবিক্ষত করে দিল, পরপর অনেকগুলো কিল আর ঘুঁষিও মারল আমার বুকে।

সাদা সাটিনের চাদরে ঢাকা বিছানায় ছুঁড়ে ফেললাম রিণাকে। গড়িয়ে নেমে যাবার চেষ্টা করতেই আমি লাফিয়ে খাটে উঠে পড়লাম কাঁধ খিম্চে ওকে চিত করে শোয়ালাম। রিণা আমার হাতে প্রচণ্ড জোরে কামড়ে দিল। হুটোপাটি করে পালাতে চাইল। এবার সত্যিই মাথায় আগুন চাপল। রিণার দু'ই হাঁটুর মাঝখানটা আমার হাঁটু দিয়ে চেপে একনাগাড়ে অনেকগুলো চড় মারলাম তার দু'গালে ঠাস ঠাস করে। মার খেতে খেতে

একসময় এলিয়ে পড়ল রিণা, বালিশে মাথা রেখে শান্তভাবে শুয়ে পড়ল। তখনই চোখে পড়ল ওর দু'গালেই আমার পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ পড়েছে।

এক মুহূর্ত দু'চোখ বুঁজে আবার খুলল রিণা। দেখলাম এক বন্য চাউনি ভর করেছে তার দু'চোখে যা আগে কখনও দেখিনি, ঘোলাটে হয়ে উঠেছে দু'চোখ। হেসে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে রিণা আমার মুখটা টেনে আনল তার মুখের কাছে, গভীরভাবে চুমু খেল আমায়। তার উষ্ণ ঠোঁটের বাঁধন থেকে নিজের ঠোঁট কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারলাম না। টের পেলাম আমার দেহের নিচে ওর শরীর ঘনঘন উঠছে নামছে।

'নাও জোনাস, তোমার ইচ্ছেরই জয় হল। যতখুশি যতক্ষণ খুশি আশ মিটিয়ে আমায় ভোগ করো! বহুদিন অপেক্ষা করেছি, কিন্তু আর নয়। আর আমি বসে থাকতে পারব না!' আত্মনিবেদনের লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজল রিণা, তার দেহের ওঠানামা আগের চেয়ে দ্রুততর হল। আমার কানের কাছে মুখ এনে বারবার চাপাগলায় বলতে লাগল, 'জলদি, জোনাস, জলদি, আমি আর একমুহূর্ত থাকতে পারছিনা!' যতবার উঠে পড়তে গেলাম ততবার সে ঘাড় ধরে জোর করে আমায় চেপে ধরল নিজের দেহের সঙ্গে। প্রতিমুহূর্তে মনে হতে লাগল রিণা আমায় গ্রাস করছে। দেহসমেত আমার সমগ্র সত্ত্বা ঢুকে যাচ্ছে তার দেহের বন্দরে।

'আমায় সন্তান দাও, জোনাস,' কানের কাছে তার চাপাগলা বড্ড অসহায় শোনাল, 'লস এঞ্জেলসে তিনটে মেয়েকে পরপর যেমন মা বানিয়ে দিয়েছিলে আমাকেও তেমনই করো, মা বানিয়ে দাও আমায়। নতুন প্রাণসঞ্চার করো আমার দেহে। জোনাস আমায় সন্তান দাও। তোমার বাবা সক্ষম হয়েও আমায় সন্তান দেননি। কেন জানো? শুধু তোমার মুখ চেয়ে জোনাস। পাছে আমার সন্তান তোমার সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেয় শুধু এই ভয়ে সক্ষম হয়েও তোমার বাবা আমার সন্তান দেননি।

'কি? কি বললে?' চমকে উঠতে গিয়েও পারলামনা, ততক্ষণে দু'হাত আর দু'পা দিয়ে রিণা আমার পুরো শরীরটাকে অজগরের মত পাকে পাকে পেঁচিয়ে ধরেছে সে বাঁধন থেকে চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলাম না।

'হ্যাঁ, জোনাস', হাসতে হাসতে বলল রিণা, 'এদিক দিয়ে তোমার বাবা কোনও ঝুঁকি নেননি। আর শুধু এই কারণেই বিয়ের আগে আমাকে দিয়ে উনি চুক্তিপত্রে সই করিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল আমি কখনও তাঁর কাছে সন্তান চাইবনা। আমার চেয়ে তোমার দাম ওঁর কাছে ছিল অনেক বেশি তাই আমার সন্তান দিয়ে উনি তোমায় বঞ্চিত করতে চাননি।'

'তোমার বাবা বেঁচে নেই, এবার তুমি নিশ্চয়ই আমায় অন্তত একটি সন্তান দেবে, তাই ত, জোনাস? সন্তানের সঙ্গে সমানভাবে তুমি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবে, গোটা দুনিয়া জানবে সে সন্তান তোমার নয়, তোমার বাবার। দাও জোনাস, তোমার বাবার মত তুমি আমায় বঞ্চিত কোরনা, তুমি আমায় একটি সন্তান দাও,' বলতে বলতে উঠে বসল রিণা আর ঠিক সেইমুহূর্তে এক ঝটকায় তার হাত পায়ের বাঁধন থেকে নিজেকে

ছাড়িয়ে নিলাম। শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই। রাক্ষসী সব শুষে নিয়েছে। রিণার পায়ের কাছে ছিটকে পড়লাম।

অনেকক্ষণ পরে সুস্থবোধ করতে চোখ মেললাম। দেখলাম বালিশে মাথা রেখে নিজের মনে কাঁদছে রিণা। তাকে একটুও না ঘাঁটিয়ে নিঃশব্দে নেমে এলাম খাট থেকে, রিণা কিছু টের পাবার আগেই বেরিয়ে এলাম শোবার ঘর থেকে। নিজের ঘরে যাবার পথে বারবার মনে হল বাবার ওপর যত অভিমান করিনা কেন, আসলে তিনি সত্যিই আমায় ভালবাসতেন, আমার চোখে ধরা না পড়লেও তিনি আমায় আজীবন স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। তিনি আমায় ভালবাসতেন। কিন্তু কখনও দেখাননি বা জাহির করেননি। ঘরে ঢুকতে গিয়ে টের পেলাম চোখের জল গড়াচ্ছে আমার দু'গাল বেয়ে।

৭

দশ বছর বয়সে একটা ক্ষুদে রেড ইণ্ডিয়ান টাট্টু ঘোড়ার মালিক হয়েছি, তার পিঠে চেপে ছোট পাহাড় আর বালিয়াড়ির চারপাশে পাক খেয়ে ছুটছি। ভেতরে ভয় মাথাচাড়া দিলেও কার ভয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি জানি না। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখি বাবা ওঁর ঘোড়ার পিঠে চেপে আমার পেছন পেছন আসছেন। দেখতে পেলাম বাবার ঘোড়াটার চামড়ার রং ফ্যাকাশে স্ট্রবেরির মত। বাবার জ্যাকেটের বুক খোলা, ওঁর ভারি ঘড়ির চেনটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে। স্পষ্ট কানে আসছে বাবার গলা, 'ফিরে এসো, জোনাস এসো বলছি! আঃ, কি নচ্ছার ছেলে রে বাবা।'

বাবার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমার টাট্টুকে আরও জোরে ছোটার হুকুম দিলাম। হাতের মুঠোয় ধরা ব্যাট দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে পাঁজরে পরপর কয়েকবার আঘাত করলাম যাতে আরও জোরে দৌড়োয়। বেচারায় পাঁজরের চামড়া লাল দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে। দেখতে দেখতে আমি তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেলাম।

আচমকা যেন মাটি ফুঁড়ে নিজের কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে নেভাদা এসে হাজির হল আমার পাশে, ঘোড়ার পিঠে খুব সহজ ভঙ্গিতে বসেছে সে। শান্ত চাউনি মেলে আমার দিকে তাকাল নেভাদা, চাপাগলায় বলল, 'ফিরে যাও, জোনাস, শুনতে পাচ্ছোনা তোমার বাবা তোমায় ডাকছেন? বাবার ডাক শুনেও এড়িয়ে যাচ্ছো, কেমন ছেলে গো তুমি?'

জবাব না দিয়ে আমার ঘোড়াকে আরও জোরে দৌড়ানোর ইশারা করলাম। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম বাবা লাগাম টেনে ওঁর ঘোড়া থামালেন। বিষাদের ছাপ ফুটল তাঁর চোখেমুখে। 'ওকে দেখো, নেভাদা,' অনেকদূর থেকে ওঁর অস্পষ্ট গলা কানে এল। এইমুহূর্তে বিশাল দূরত্ব গড়ে উঠেছে বাবা আর আমার মাঝখানে।

'আমার হাতে সময় মোটে নেই, তাই তুমিই ওর দেখাশোনা কোর। অনেকদূর থেকে বাবার অস্পষ্ট গলা কানে এল। পরমুহূর্তে বাবার ঘোড়া মুখ ঘুরিয়ে দৌড় লাগাল। টাট্টুর গতি থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। বাবাকে পিঠে নিয়ে ওঁর ঘোড়া ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে চলে গেছে, এখান থেকে খুব ছোট দেখাচ্ছে দু'জনকেই। আচমকা

চোখে জল আসায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে ফলে বাবার শরীরের বাইরের রেখাটাও মিলিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। 'বাবা, তুমি যেয়োনা, বাবা, আমায় ছেড়ে যেয়োনা,' বলে খুব জোরে কাঁদার সাধ হল, কিন্তু শব্দগুলো আটকে রইল গলাতেই, ঠোঁট দিয়ে বেরোলনা।

আচমকা ঘুম ভাঙ্গতে স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল চোখ মেলে দেখি ঘামে গা ভিজে চপচপ করছে। বাড়ির পেছনে খোঁয়াড় থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার ডাক কানে আসছে।

খাট থেকে নেমে খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালাম। ভোর পাঁচটায় সূর্য উঠেছে। সাতসকালে তার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। নিচে খোঁয়াড়ে কাজের লোকেরা বেড়ায় ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনে এক সওয়ার এক টাট্টুর পিঠে চেপে তাকে ট্রট শেখাচ্ছে। টাট্টুর চামড়ার রং হলদে, গড়ন কচি হলেও সহ্যশক্তি প্রচুর। মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকালাম। তারপরেই সরে এলাম জানালা থেকে। সামনে টাট্টুর দৌড় ঝাঁপ একপলক দেখে চটপট সরে এলাম জানালা থেকে; বেশ বুঝতে পারছি এমনিই চিকিৎসা আমার দরকার এমন কিছু যা আমার ভেতরের শূন্যতা ঝেঁটিয়ে দূর করবে, দূর করবে আমার মুখের তিক্ত স্বাদ। লেভিস ট্রাউজার্স পরে একটা পুরোনো নীল শার্ট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘরে থেকে।

বারান্দায় যাব বলে পেছনের সিঁড়িতে আসতেই রোবেয়ারের সঙ্গে দেখা। ট্রেতে এক গ্লাস কমলালেবুর রস আর ধোঁয়া ওঠা এক পট গরম কফি নিয়ে ওপরে উঠে এল রোবেয়ার। এতটুও অবাক হলনা আমায় দেখে।

'গুড মর্নিং, মিঃ জোনাস।'

'গুড মর্নিং, রোবেয়ার।'

'মিঃ ম্যাক অ্যালিস্টার আপনার কাছে এসেছেন। ওঁকে স্টাডিতে বসিয়ে এসেছি।'

একমুহূর্তে ইতস্তত করে দেখলাম ঘোড়া খোঁয়ারে ঢোকাবার পরে কোনও এক সময় যাওয়া যাবে, তার চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন সেরে ফেলার জন্য পড়ে আছে সামনে। 'ধন্যবাদ, রোবেয়ার' বলে পথ বাড়ালাম সামনের সিঁড়ির দিকে।

'মিঃ জোনাস' পেছন থেকে রোবেয়ার ডাকতেই আমার পা দুটো আপনিই থেমে গেল, মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

'কাজ করবার নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন ত, মিঃ জোনাস,' রোবেয়ার হাসিমুখে বলল, 'তার আগে পেট ঠেসে সকালের জলখাবার খেয়ে নিন।'

ঘাড় নেড়ে তার কথায় সায় দিয়ে বসে পড়লাম সিঁড়ির মাথায়, রোবেয়ার ট্রে আমার পাশে নামিয়ে রাখল। গ্লাস তুলে কমলালেবুর রস পুরোটা খেলাম। রোবেয়ার কাপে গরম কফি রেখে টোস্টের ঢাকনা তুলল। কফিতে চুমুক দিয়ে বুঝলাম ও ঠিকই বলেছে। ততক্ষণ খিদেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছিল। সেটা এবার চলে যাচ্ছে। প্লেট থেকে একটা টোস্ট তুলে কামড় বসালাম।

সাতসকালে যে পোষাক গায়ে চাপিয়েছি তা চোখে বেখাপ্পা ঠেকলেও ম্যাক অ্যালিস্টার তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করলেন না। স্টাডিতে ঢুকে আমি মুখোমুখি বসতেই সরাসরি

কাজের কথা পারলেন তিনি। 'মাইনরিটি স্টক দিয়ে শুরু করছি,' টেবলে বিছানো কাগজপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন ম্যাক অ্যালিস্টার, রিণা কর্ড আর নেভাদা স্মিথ, আড়াই পার্সেন্ট হিসেবে দু'জনের পাঁচ, জজ স্যামুয়েল হ্যাসকেল আর রেণো-র ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পিটার কোম্যাক, এঁদের দু'জনের মাথাপিছু দু'পার্সেন্ট হিসেবে চার, বাকি এক পার্সেন্ট ইউজিন ডেনবি-র মোট দশ পার্সেণ্ড।

'স্টকের দাম কত?'

'গত পাঁচ বছরে কোম্পানির গড় আয় ধরলে মাইনরিটি স্টকের দাম কম করে পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার। নেট দরের হিসেবে তা ষাট হাজার ডলারও হতে পারে। গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির মুনাফা অনেক কমেছে।'

'তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে?'

মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে যুদ্ধের সময় আমাদের মালের যে চাহিদা তৈরি হয়, শান্তির সময় অনেকখানি নেমে আসে।'

সিগারেট বের করে ধরালাম। গতকাল এই লোকটাকে বছরে এক লাখ ডলারের চাকরিতে বহাল করেছি; কাজটা ঠিক করেছি কিনা তাই নিয়ে এবার সন্দেহ উঁকি দিল মনে। 'এমন কিছু বলুন যা আমি জানিনা,' আমি বললাম।

'গতকাল জার্মান কন্ট্রাক্টে সই করেছো, মনে পড়ছে?' সামনে বিছিয়ে রাখা কাগজগুলোর দিকে আরেকবার তাকিয়ে ম্যাক অ্যালিস্টার বললেন, 'ঐ কাজে হাত দিলে দরকার হবে জেনে তোমার বাবা কোম্যাকের ব্যাংকের কাছে দু'লাখ ডলার ধার চেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা তা দেয়নি।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমাদের এইমুহূর্তে টাকায় কিছুটা ঘাটতি পড়েছে, তাই ত? পোড়া সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটুকু অ্যাসট্রে-তে ফেলে ধীর গলায় বললাম।

'ঠিক তাই,' সায় দিলেন ম্যাক অ্যালিস্টার!

'তা টাকা জোগাড় করতে আপনি কিঁ কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'আমি পদক্ষেপ নিয়েছি 'একথা তোমার মনে এল কি করে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ম্যাক অ্যালিস্টার। তাঁর মনের কথা বোঝার ক্ষমতা আমার আছে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

'তার কারণ বাবার অফিসে ঢুকে দেখেছিলাম আপনি ওঁর মুখোমুখি বসে,' আমি বললাম 'শুধু মরা মেয়েটির বাবা মাকে সামলাবার জন্যই তিনি যে আপনাকে ডাকিয়ে আনেননি এটা বোঝার মত ক্ষমতা আমার আছে, সেজন্য উনি একাই ছিলেন যথেষ্ট। অনেক পরে আমি অফার দিতেই আপনি তা লুফে নিলেন। তার মানে দাঁড়ায় টাকা পাবার ব্যাপারে আপনি নিজে অবশ্যই নিশ্চিত ছিলেন।'

'ঠিক ধরেছো', মুচকি হা লেন ম্যাক অ্যালিস্টার, 'কোম্যাকের ব্যাংক অরাজি হলেও লস এঞ্জেলসের পারোনিয়ার ন্যাশন্যাল ট্রাস্ট কোম্পানি থেকে তিন লাখ ডলারের ব্যবস্থা করেছিলাম। কাজে নামার পরে যাতে ঘাটতি না পড়ে এই ভেবে একটু বেশিই চেয়েছিলাম।'

'ভাল করেছেন' আমি বললাম, 'মাইনরিটি স্টকহোল্ডারদের অংশ কেনার বাবদ ঐ টাকাটা আমার কাজে লাগবে।'

ম্যাক অ্যালিস্টারের দু'চোখ থেকে তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি, হাঁ করে তিনি সেই চাউনি মেলে তাকালেন আমার দিকে।

'এবার তাহলে বলুন,' ওঁর পাশের চেয়ারে বসে বললাম, 'বাবা যে জিনিস নিয়ে এত ক্ষেপে উঠেছিলেন সে সম্পর্কে যা যা জেনেছেন খুলে বলুন। জিনিসটার কি যেন নাম বলেছিলেন প্ল্যাসটিক তাই না?'

৮

স্টেইক, ডিম, আর ঝাল বিস্কিট, ব্রেকফাস্টে এই খাওয়াল রোবেয়ার। এঁটো কাপ প্লেট নিয়ে সে চলে গেছে। যাবার আগে দরজার পাল্লা দুটো টেনে দিয়েছে। গরম কফি শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবার মুখের দিকে তাকিয়ে শুরু করলাম!

'ভদ্রমহোদয়বৃন্দ,' গতকাল আমার বাবার আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কর্ড এক্সপ্লোসিভস-এর মত বিশাল এক কোম্পানির যাবতীয় দায়িত্ব আমার ওপর বর্তানো নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। কোম্পানির যাতে সবদিক দিয়ে ভাল হয় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার কাজে সাহায্য পাব ভেবেই আজ সকালবেলা আপনাদের এখানে আসতে বলেছি।'

'সঠিক পথ দেখাতে আমাদের ওপর অনায়াসে তুমি নির্ভর করতে পারো। বাপ।' টেবলের ওপার থেকে সরু গলায় বললেন পিটার কোম্যাক।

'অশেষ ধন্যবাদ, মিঃ কোম্যাক,' আমি বললাম।

'আমার মতে সবার আগে কোম্পানির একজন নতুন প্রেসিডেন্ট আমাদের নির্বাচন করতে হবে। এবং তিনি হবেন এমনই একজন যিনি আমার বাবার মতই নিজেকে কোম্পানির হিতার্থে উৎসর্গ করতে পারবেন,' বলে টেবলের চারপাশে সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। ডেনবি এককোণে বসে প্যাডে কি সব লিখে চলেছে ঘাড় হেঁট করে। নেভাদা হাতে তৈরি সিগারেট পাকাচ্ছে আপনমনে। লক্ষ করলাম হাসিমাখানো চাউনি মেলে সে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে, তার পাশে শান্তভাবে বসে ম্যাক অ্যালিস্টার। জজ হ্যাসকেল আর কোম্যাক, দু'জনের কারও মুখে কথা নেই। ঘরের ভেতর চাপা নীরবতা, এই নীরবতা কতক্ষণে আরও ভারি হয়ে ওঠে আমি তারই অপেক্ষায় বসে আছি। আমার বাসনা পূরণ হল, কে আমার বন্ধু তা জানতে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

'আপনাদের মধ্যে কেউ এই দায়িত্ব নিতে তৈরি আছেন?' ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা বলের মত সবার সামনে ছুঁড়ে দিলাম।

'তুমি নিজে তৈরি নও?' জানতে চাইলেন কোম্যাক।

'গতকাল পর্যন্ত তাই ভেবেছিলাম,' আমি বললাম 'কিন্তু আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এই দায়িত্ব নেবার পক্ষে আমি আদৌ যোগ্য নই।'

আমার কথায় ডেনবি, হ্যাসকেল আর কোম্যাক, তিনজনেই হাসিহাসি মুখে আমার

দিকে তাকালেন। নিজেদের মধ্যে চটপট দৃষ্টি বিনিময় করলেন তাঁরা। তারপরেই মুখ খুললেন কোম্যাক, 'তুমি সত্যিই বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছো, বাপু জোনাস। তা আমাদের জজ সাহেবের কি মত? জজ হ্যাসকেল বেন্চ থেকে হালে অবসর নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আমার মতে এই কোম্পানির দায়িত্ব বহনের কাজটা তোমার কাছ থেকে উনি স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন।'

'কি জজসাহেব, আপনি নেবেন?'

জজ হ্যাসকেলের দিকে তাকালাম।

'আপনি শেষপর্যন্ত একা সব দায়িত্ব বহন করতে পারবেন ত?'

'আমার নিজের জন্য নয় তা গোড়াতেই বলে রাখছি।' জজ হ্যাসকেল হাসলেন, 'শুধু তোমার সাহায্য করতে চাই বলেই পারব।'

আড়চোখে নেভাদার দিকে তাকাতে দেখি হাসি ফুটে বেরোচ্ছে তার চোখে মুখে। তার দিকে পাল্টা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললাম ''তাহলে ভদ্রমহোদয় বৃন্দ, এর ওপর আমরা ভোট নেব কি?'

এই প্রথম ডেনবি মুখ খুলল, 'এই কোম্পানির লিখিত সনদ অনুযায়ী শুধু স্টকহোল্ডাররাই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে সভা ডাকতে এবং তারপরে বাড়তি যে স্টক থাকবে তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ যাকে নির্বাচন করবেন—'

'তাহলে স্টকহোল্ডারদেরই সভা ডাকা যাক,' বললেন কোম্যাক 'তারপর বেশির ভাগ স্টক যাদের নিয়ে তাঁরা এখানে হাজির আছেন।'

'এটা ভাল আইডিয়া,' জজসাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, 'অবশ্য আমি যদি নিজের স্টকের অধিকারে ভোট দিতে পারি।'

'নিশ্চয়ই পারবে বাবা,' বলে জজ সাহেব একটা কাগজ পকেট থেকে বের করে আমায় দিলেন 'তোমার বাবার উইলে তা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। আজ সকালেই আমি উইলের প্রবেট রুজু করে দিয়েছি। আইনত এখন সবই তোমার।'

জজসাহেবের হাত থেকে উইলটা নিয়ে সবার উদ্দেশে বললাম, 'তাহলে ঐ কথাই রইল। ডিরেক্টদের সভা মুলতবি রইল। স্টক হোল্ডারদের সভা যত শীগগির সম্ভব ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। সভার আলোচ্যসূচির প্রথম বিষয় হবে জোনাস কর্ডের অকাল মৃত্যুর দরুন কোম্পানির একজন প্রেসিডেন্ট ও ট্রেজারার নির্বাচন।'

'আমি জজ স্যামুয়েল হ্যাসকেলকে মনোনীত করছি,' মুচকি হাসলেন কোম্যাক।

'আমি এই মনোনয়ন সানন্দে সমর্থন করছি।' খুব চটপট বলে উঠল ডেনবি।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললাম 'আর কারও মনোনয়ন বাকি আছে? আমি কিন্তু এবার ঝাঁপ বন্ধ করব।'

'আমি জোনাস কর্ড জুনিয়রকে মনোনীত করছি,' দাঁড়িয়ে উঠে বলল নেভাদা।

'ধন্যবাদ,' বলেই জজসাহেবের দিকে মুখ করে চাঁছাছোলা গলায় বললাম, 'এই মনোনয়ন কেউ কি সমর্থন করছেন?'

উত্তেজনায় জজসাহেবের মুখখানা লাল টকটকে দেখাল। মুখ ফিরিয়ে প্রথমে কোম্যাক, তারপরে ডেনবির দিকে তাকালেন তিনি। ডেনবির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

'এই মনোনয়ন কি কেউ সমর্থন করছেন?' আবার বললাম। 'সমর্থন করে থাকলে দয়া করে জোরে বলুন।'

'আমি এই মনোনয়ন সানন্দে সমর্থন করছি,' মিনমিনে গলায় বললেন জজসাহেব। তা বলুন, আমি জানি ওদের দু'জনকেই আমি এবার কব্জা করে ফেলেছি।

'ধন্যবাদ জজসাহেব', হেসে বললাম।

আমায় আর পায় কে। এই মনোনয়নের ফলে আমার কাজ অনেক সহজ হল, কোম্যাক আর জজসাহেব, দু'জনের স্টক পঁচিশ হাজার ডলারে কিনে নিলাম।

আরও একটা দরকারি কাজ সেরে ফেললাম—পুরোনো সেক্রেটারি ইউজিন ডেনবিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলাম। অমন মিনমিনে ধাড়ি বজ্জাতকে দিয়ে আর যাই হোক সেক্রেটারির কাজ হয়না। এ কাজের জন্য দরকার মেয়েমানুষ। তাকিয়ে মুগ্ধ হবার মত সুন্দর যার বুকে এমন কেউ—

ম্যাক অ্যালিস্টারকে সঙ্গে নিয়ে স্টাডিতে বসে কাজ করছি এমন সময় রোবেয়ার এল।

'কি ব্যাপার রোবেয়ার?' মুখ তুলে জানতে চাইলাম।

'মিস রিণা ওঁর কামরায় আপনাকে তলব করেছেন, আজ্ঞে,' মাথা হেঁট করে আদব কায়দা বজায় রেখে জবাব দিল সে।

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে আড়ামোড়া ভাঙ্গলাম। চেয়ারে বসে এইভাবে অর্দ্ধেক দিন কাটানোও আমার বরদাস্ত হয়না।

'একটু অপেক্ষা করুন' ম্যাক অ্যালিস্টার মুখ তুলে তাকাতে বললাম 'আমি একটু ওপর থেকে ঘুরে আসছি।' সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে রিণার ঘরের বন্ধ দরজায় আলতো টোকা দিতেই ভেতর থেকে গলা ভেসে এল।

'এসো, ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকে দেখি আয়নার সামনে বসে রিণা। একটা বড় সাদা ব্রাশ দিয়ে লুইসি তার চুল ব্রাশ করছে। আয়নার ভেতর রিণা সরাসরি আমার দিকে তাকাল।

'আমায় ডেকেছো?'

'হ্যাঁ,' লুইসির উদ্দেশ্যে রিণা বলল 'এখন আমরা কাজের কথা বলব, তুই নিচে যা। ধারে কাছে থাকিস, ডাকলেই চলে আসবি।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে লুইসি বেরিয়ে যেতেই রিণা বলল, 'ও মাগির দরজায় গায়ে কান পাতার অভ্যেস আছে।'

'জানি', দরজার পাল্লা এঁটে দিয়ে বললাম, 'হঠাৎ আমায় ডাকলে কেন? মতলব কি তোমার?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে রিণা বলল, 'তোমার বাবার মৃতদেহ সৎকার হয়ে গেলেই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'কেন, চলে যাবে কেন?' বললাম, 'এটা তোমার বাড়ি মারা যাবার আগে বাবা তোমায় এটা দান করে গেছেন।'

নাক দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে আমার চোখে চোখ রাখল। 'আমার ইচ্ছে তুমি বাড়িটা আমার কাছ থেকে কিনে নাও।'

'এত টাকা আমি পাব কোথা থেকে?'

'ও ঠিকই জোগাড় হবে,' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গলার খোঁচা দিল রিণা, 'তোমার বাবা যখন যা চেয়েছেন সবই পেয়েছেন।'

খুব খুঁটিয়ে তার চোখমুখ দেখলাম, মনে হল বুঝেই ও পা ফেলছে।

'তোমার কত চাই?' খুব হুঁশিয়ার হয়ে জানতে চাইলাম।

'বেশি নয়,' শান্ত গলায় বলল রিণা, 'মাত্র এক লাখ ডলার।'

'কি বলছ তুমি!' চেঁচিয়ে বললাম, 'এ বাড়ির দর বরজোড় পঞ্চান্ন হাজার, তার বেশি কোনমতেই নয়।'

'তা আমি জানি,' রিণা বলল, 'কর্ড এক্সপ্লোসিভস-এ আমার নিজের নামে যা স্টক আছে তা আমি বেচে দিতে চাই।'

'তোমার নিজের নামে স্টক যেটুকু আছে তাতে অত দর উঠবেই নয়,' উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'তোমার নিজের যেটুকু আছে তার দ্বিগুণ স্টক আজই সকালে পঁচিশ হাজরে কিনেছি আমি নিজে।'

'রিণা এবার উঠে এল, কাছে এসে কিছুক্ষণ আমার চোখে চোখ রেখে বলল। 'শোন জোনাস, এতক্ষণ আমি ভদ্রভাবে খুব ঠাণ্ডা মাথাতেই যা বলার বলেছি। তোমার জানা আছে কিনা জানিনা। নেভাদার পারিবারিক সম্পত্তি আইন অনুযায়ী মৃত স্বামীর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ পাবার অধিকার আমার আছে। উইলের যে প্রবেট রুজু করেছো চাইলে আমি তা রুখে দিতে পারি। বুঝতেই পারছো আইন আমার পক্ষে, ইচ্ছে করলে পুরো পাঁচবছর আমি ব্যাপারটার ফয়সলা আদালতে ঝুলিয়ে রাখতে পারি। তখন তোমার এত সব পরিকল্পনার কি দশা হবে, একবারও ভেবে দেখেছো?'

জবাব না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

'তোমার উকিল মশাই ত নিচে বসে আছেন,' রিণা বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো।'

'তুমি আগেভাগেই সব দেখে নিয়েছো মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই দেখেছি', উকিলের বাপ আছে আমার পাশে। জজ হ্যাসকেলের সঙ্গে এনিয়ে টেলিফোনে আমার কথাবার্তা হয়েছে।'

জজ হ্যাসকেল তাই বলো। বন্ধ হয়ে আসা দমটা এতক্ষণে উঠে এল বুকের ভেতর

থেকে। বুড়ো খানকির ছাওয়াল হেরে গিয়ে যে আমায় একহাত দেখে নেবে তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

'আজেবাজে লোকের কাছ থেকে বদবুদ্ধি নিয়ে যা খুশি করতে পারো তুমি,' শক্তগলায় বললাম, 'কিন্তু অত টাকা আমার বা কোম্পানির কাছে এইমুহূর্তে নেই।'

'তুমি যে শেষ পর্যন্ত এই উত্তর দেবে তাও আমি আগেই জানতাম,' বলল রিণা। 'সবদিক বিবেচনা করেই বলছি তোমার বাবার সৎকারের পরে আমায় পঞ্চাশ হাজার দিয়ে দাও, বাকিটা বছরে দশহাজার হিসেবে পাঁচ বছরে মিটিয়ে দেবে বলে লেখাপড়া করে দিও, তাহলেই হবে।'

এ বুদ্ধি যে পাকা মাথা থেকে বেরিয়েছে তা জানার জন্য উকিল লাগেনা।

'তাই হবে,' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললাম,' তুমি তাহলে একবার নিচে এসো। ম্যাক অ্যালিস্টার ওখানে আছেন। আমি ওঁকে দিয়ে দলিলপত্র তৈরি করছি, তুমি নিচে এসে সইসাবুদ যা করার করে যাও।'

'ধ্যাৎ তাও কি হয়?' হাসল রিণা, 'এসব কাজ আমি করব কি করে?'

'কেন' গলা সামান্য চড়ালাম।

'না করার কি আছে?'

'কেন ভুলে যাচ্ছো যে আমি অনাথা বিধবা, এখন আমার শোকের সময়। এই অবস্থায় বিষয়সম্পত্তির কাগজপত্রে সইসাবুদ করতে নিচে নামা আমার আদৌ সাজেনা। এ কাজটা তোমাকেই করতে হবে জোনাস, কাগজপত্র তৈরি করে পাঠিয়ে দাও। আমি সইসাবুদ করে দিচ্ছি।'

৯

ব্যাংক-এর বাড়িটা লস এঞ্জেলস শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত, ট্যাক্সি থেকে আমরা যখন তার সামনে নামলাম তখন কাঁটায় কাঁটায় বিকেল পাঁচটা। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে হেঁটে দু'জনে ব্যাংক-এর পেছন দিকে এলাম। প্রাইভেট লেখা অন্য একটা দরজা খুলে ম্যাক অ্যালিস্টার আমায় নিয়ে এলেন রিসেপশন রুমে।

'মিঃ ম্যাক অ্যালিস্টার দেখছি,' একজন যুবতী সেক্রেটারি মুখ তুলে অল্প হাসল। 'আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আপনি এখনও নেভাদায় আছেন।'

'ছিলাম,' চটপট বললেন ম্যাক, 'মোরোনি ভেতরে আছেন?'

'একটু দেখে নিই,' সেক্রেটারি যুবতীটি বলল, 'কখনও কখনও আমায় না জানিয়েই উনি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যান। আপনারা একটু বসুন।' বলে অন্য একটি দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

'ঠিক এমনি একজন সেক্রেটারি আমার চাই,' ম্যাক অ্যালিস্টারের দিকে তাকালাম। 'ওর মগজে মাল আর তাকিয়ে থাকার মত বুক দুটোই আছে।'

'এমন মেয়ে সস্তায় মেলে না।' হাসলেন ম্যাক, 'হপ্তায় কম করে পঁচাত্তর থেকে আশি ডলার পায়।'

'ভাল জিনিস কিনতে গেলে বেশি দাম ত দিতেই হবে,' আমি বললাম। তাঁর কথা শেষ হতেই ফিরে এল সেই যুবতী। হাসিমুখে বলল।

'মিঃ মোরোনি ওঁর অফিসেই আছেন, মিঃ ম্যাক অ্যালিস্টার আপনারা তো দেখা করতে পারেন।'

ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে এলাম ভেতরের অফিসে। পেল্লায় ঘর, চারদিকে কালো কাঠের প্যানেলের দেয়াল। ঘরের মাঝখানে বিশাল ডেস্কের পেছনে ছোটখাটো দেখতে একজন লোক বসে কাজ করছে। চুলে পাক ধরেছে, দু'চোখে তীক্ষ্ণ কূট চাউনি। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়াল সে।

'মিঃ মোরোণি,' ম্যাক অ্যালিস্টার ইশারায় আমার দেখালেন, 'ইনি জোনাস কর্ড।'

মোরোণির বাড়িয়ে দেয়া হাত নিজের হাতে নিয়ে ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলাম। আর পাঁচজন সাধারণ ব্যাংকারের হাত এ নয়, এ হাতের কব্জিতে যথেষ্ট জোর আছে। কড়া পড়েছে হাতের তালুর শক্ত চামড়ায়। এ হাত যার সে পেশাদার কেরাণি নয়, বহুবছর পরিশ্রম করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে হলাম।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। মিঃ কর্ড বসুন', ইশারায় ডেস্কের সামনে দুটো চেয়ার দেখালেন মোরোণি, তাঁর কথায় অল্প ইটালিয়ান টান আমার কান এড়ায়নি।

'বাবার অকালমৃত্যুতে আপনার কি অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে জানি, মিঃ কর্ড। সব দিক থেকে উনি আর সবার চেয়ে আলদা ছিলেন এটুকু শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন' ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। 'বুঝতেই পারছেন তাহলে পরিস্থিতি এখন অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে।'

'মিঃ মোরোণি।' তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে এটুকু বলতে পারি যে, আপনারা ঋন দিয়েছিলেন কর্ড এক্সপ্লোসিভসকে, আমার বাবাকে বা আমাকে দেননি।'

মোরোণি হাসলেন। 'ভাল ব্যাংকার কোম্পানিকেই টাকা ঋণ দেয় ঠিকই, তবে কোম্পানির কাজকর্ম যে চালায় তাকেও একবার সে খুঁটিয়ে দেখে নেয়।'

'আমার সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়েই বলছি স্যর, আদায় নিশ্চিত করাটাই হল ভাল ব্যাংকারের একমাত্র লক্ষ্য। আমার মনে হয় মিঃ ম্যাক অ্যালিস্টার ঋণ নেবার ব্যাপারে যে চুক্তি আপনার সঙ্গে করেছেন তাতে এর উল্লেখ আছে।'

অল্প হেসে চুরুট ধরালেন মিঃ মোরোণি, ধোঁয়া ছেড়ে তার ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, 'আচ্ছা মিঃ কর্ড, ঋণগ্রহিতার প্রধান দায়িত্ব আপনার মতে কি?'

'ঋণের অর্থকে মুনাফায় পরিণত করা' মোরেণির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম।

'ঋণগ্রহিতার কথা বলেছি, মিঃ কর্ড, ঋণদাতার নয়।'

'আপনি কি বলেছেন তা স্পষ্টভাবে আমি শুনেছি, মিঃ মোরোণি, আর সেই প্রসঙ্গে বলছি যে অর্থ আপনি আমায় ঋণ দিচ্ছেন তাকে মুনাফায় পরিণত করার প্রবণতা না থাকলে সেটা আপনার কাছ থেকে আমার হাত পেতে নেয়াই অর্থহীন।'

'বেশ, কিন্তু সে মুনাফা করার আশা আপনি করছেন কি করে? যে কারবারে হাত দিতে চাইছেন সে সম্পর্কে আপনার ধারণা কতটুকু আছে, মিঃ কর্ড?'

'যতটা থাকা উচিত ততটা আমার নেই, মিঃ মোরোণি। আগামি হপ্তায়, আগামি মাসে, কিংবা আগামি বছরে যতটা ভাল ধারণা আমার তৈরি হবে, ততটা অবশ্যই নেই। কিন্তু এইটুকু জানি আগামীদিনে নতুন পৃথিবীর চেহারাটাই পুরো পাল্টে যাবে। টাকা রোজগারের এমন সব সুযোগ গড়ে উঠবে যা আমার বাবার জমানায় ছিলনা। সেসব সুযোগের সদ্ব্যবহার আমি করব।'

'জার্মাণ কনস্টাক্টের মাধ্যমে এই নতুন জিনিসটার কথা বলছেন ত?'

'আমি যা বলছি তা ওরই অংশবিশেষ বলতে পারেন,' ঝোঁকের মাথায় বলে দিলাম যদিও উনি উল্লেখ করার আগে পর্যন্ত বিষয়টা আমার মনেও আসেনি।

'প্ল্যাস্টিক সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?' জানতে চাইলেন মোরোণি।

'খুবই সামান্য বলতে পারেন।'

'তাহলে এটা খুব লাভজনক হবে এ বিষয়ে এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'কারণ এরই মাঝে ডুপণ্ট আর ইস্টম্যান, এরা প্ল্যাস্টিকের আমেরিকান স্বত্ব কিনতে যেনন আগ্রহী হয়ে উঠেছে তাতে আঁচ করতে পারছি তা কতটা লাভজনক। ওরা যখন যে ব্যাপারে আগ্রহী হয় দেখা যায় তাই লাভজনক বিষয়। এছাড়া, ঐ স্বত্ব জোগাড় করতে আপনি আমাদের যে টাকা ঋণ দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তাও ঐ জিনিসটার কতদূর লাভজনক হবে তার অন্যতম প্রমাণ। এখানকার কিছু কাজ মিটিয়ে আমি ঠিক করেছি জার্মাণি যাব; ওখানে ২/৩ মাস থেকে প্ল্যাস্টিকস তৈরি আর তার প্রয়োগ সম্পর্কে আরও কাজকর্ম শিখব।'

'আপনার অনুপস্থিতিতে এখানে আপনার কোম্পানির কাজকর্ম কে দেখবেন, মিঃ কর্ড? ২/৩ মাস কিন্তু কম সময় নয়, তার মধ্যে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে।'

'মিঃ ম্যাক অ্যালিস্টার দেখবেন, স্যার। উনি আমাদের কোম্পানিতে যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।'

এক অদ্ভুত শ্রদ্ধামাখানা চাউনিতে আমার দিকে তাকালেন মিঃ মোরণি, গম্ভীর গলায় বললেন 'জানি, ব্যাংকের অন্যান্য ডিরেক্টরেরা আমার সঙ্গে একমত হবেননা। তবু আমি আপনাকে ঋণ পাইয়ে দেব। যে কাজে হাত দিতে চলেছেন তার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে ব্যাংকিং ব্যবসার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমাদের এই পায়োনিয়ার ন্যাশন্যাল ট্রাস্ট কর্পোরেশন এইভাবে অবাধ ঋণদানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। হলিউডের ফিল্ম তুলতে আমাদের ব্যাংক সবার আগে টাকা ধার দিত। তার চেয়ে বড় ফাটকাবাজির কারবার আর কিছু আমার মতে হতে পারেনা।'

'ধন্যবাদ, মিঃ মোরাণি,' আমি বললাম মিঃ মোরাণি টেলিফোনের রিসিভার তুলে কাউকে নির্দেশ দিলেন। 'কর্ড এক্সপ্লোসিভস-এর লোন এগ্রিমেন্ট আর চেকটা নিয়ে এসো।' রিসিভার নামিয়ে মুচকি হাসলে মোরাণি। 'আপনি তিন লাখ চেয়েছিলেন মিঃ কর্ড, কিন্তু

আমি পরিমাণ বাড়িয়ে ওটা পাঁচ লাখ ডলার করিয়েছি। আমার মতে সাফল্য আর ব্যর্থতার মাঝখানে বাড়তি কিছু ডলার খরচ হলে এমন কিছু যায় আসেনা।'

'ধন্যবাদ মিঃ মোরাণি' লোন অ্যাপ্লিকেশনে সই করে বললাম,' প্রচুর মুনাফা করতে এই ঋণের টাকা পাথেয় হবে এটা আপনার আমার দু'জনেরই কাম্য।'

'নিশ্চয়ই হবে'। বলে মোরাণি চেকটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। চেকটা মিঃ ম্যাক অ্যালিস্টারের হাতে দিয়ে বললাম, 'আবার আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, মিঃ মোরাণি। আজ রাতে যেভাবেই হোক নেভাদায় ফিরতেই হবে তাই আর বসতে পারছিনা।'

'আজই রাতে ফিরতে হবে?' অবাক হলেন মোরাণি। 'কিন্তু কাল সকালের আগে ত ওখানে যাবার কোনও ট্রেনও নেই।'

'ট্রেন নয়, মিঃ মোরাণি, আমি নিজের প্লেনে চড়ে এসেছি। প্লেনে চড়ে রওনা হলে রাত ন'টা নাগাদ নেভাদায় পৌঁছোতে পারব।'

'দেখবেন মশাই, অনেকগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন,' ভিতু ভিতু গলায় বললেন মোরাণি। 'প্লেন চালাতে গিয়ে খুব উঁচুতে উঠবেন না যেন।'

'আপনার ঘাবড়ানোর কোনও কারণ নেই, মিঃ মোরাণি,' জোর গলায় হেসে উঠলাম। 'প্লেন চালানোর ব্যাপারটা গাড়ি চালানোর মতই নিরাপদ তাছাড়া আমার তেমন কিছু হলে চেকের পেমেন্ট স্টপ করে দেবেন তাহলেই কোনও ঝুঁকি থাকবেনা।'

আমার রসিকতায় মোরাণি আর ম্যাক অ্যালিস্টার দু'জনেই হাসলেন বটে, কিন্তু ম্যাক অ্যালিস্টারের চোখে মুখে আমি ভয়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে দেখলাম। তবে ভয় পেলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না। মোরেণির সঙ্গে করমর্দন করে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। রিসেপশন রুমে কৌচে বসে ছিল একটি লোক, আমরা ঘর থেকে বেরোতেই সে উঠে দাঁড়াল। লোকটিকে দেখে চমকে উঠলাম, বুজ্ ডালটন—বুজ্ ডালটন-পেশাদার পাইলট, বাজি রেখে এরই প্লেন জিতে নিয়েছি আমি।

'কি হে বুজ্,' তার কানের কাছে মুখ এনে বললাম, 'পুরোনো দোস্ত্দের দেখেও মুখ ঘুরিয়ে থাকবে?'

'আরে জোনাস!' চমকে গেলেও হাসিমুখে সে বলল,' 'তুমি এখানে কি করছ?'

'এসেছিলাম মাটি খুঁড়ে সোনাদানা যদি কিছু পাই এই আশায়,' হেসে বললাম, 'তুমি?'

'একই উদ্দেশ্যে বলতে পারো।' হতাশা জড়ানো গলায় বুজ্ বলল, 'কিন্তু লাভ কিছুই হল না।'

'কেন?'

একটা ভাল কন্ট্রাক্ট হাতে এসেছে, লস এঞ্জেলস থেকে সান ফ্রান্সিসকো। মাসে দশ হাজার ডলার, এখান থেকে ওখানে ডাক পাচার করতে হবে। এক বছরের কাজের পাকা গ্যারান্টি। কিন্তু টাকার অভাবে হয়ত শেষ পর্যন্ত আর এগোতে পারবনা।'

'তোমার অসুবিধে কোথায়?'

'এই মুহূর্তে আমার তিনটে প্লেন কেনার টাকা দরকার, কিন্তু ব্যাংক অত ঝুঁকি নিয়ে টাকা ধার দিতে চাইছেন না।'

'তোমার কত টাকা দরকার?'

'পঁচিশ হাজার হলেই চলবে,' বুজ্ বলল, 'তিনটে প্লেন কিনতে কুড়ি হাজার। তারপর আমার প্রথম চেক যতদিন না পাচ্ছি ততদিন তেলের খরচ বাবদ আরও পাঁচ হাজার, একুনে পঁচিশ হাজার।'

'কন্ট্রাক্ট এনেছো?'

'এনেছি, এই যে,' বলে বুজ্ ডালটন পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করল। দেখলাম কন্ট্রাক্টের বয়ান ঠিক আছে। তাতে কোথাও কারচুপি নেই।

'আমি হিসেব করে দেখেছি তিনটে প্লেন চালিয়ে মাসে পাঁচ হাজার ডলার আমি মুনাফা করতে পারব।' জো আরেকটা কাগজ বাড়িয়ে দিল, 'এখানে হিসেব কষা আছে।'

'তোমায় আমি টাকা পাইয়ে দিতে পারি, বুজ্,' আমি বললাম, 'এতে দুটো শর্ত। এক, তোমার কারবারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ স্টক আমার চাই। দুই, এক বছরের ওপর প্লেন বাঁধা রাখার বাবদ যে টাকা পাবে সেটাও আমার চাই। দুটোই কর্ড এক্সপ্লোসিভস কোম্পানির প্রাপ্য হবে।'

'আমি রাজি,' মুচকি হেসে বলল বুজ ডালটন। আমার শর্তে যখন রাজি হয়েছে তখন তার কাজটাও এবার আমায় করে দিতে হবে। বুজ্ ডালটনকে নিয়ে সরাসরি ঢুকলাম নিঃ মোরেণির কামরায়। বুজ্ চেয়েছিল পঁচিশ হাজার, আমার সুপারিশে মোরোণি আরও পাঁচহাজার মোট ত্রিশ হাজার ডলার ঋণ পাইয়ে দিলে তাকে।

এরপরে বাবার সৎকার পর্ব। বাবার আগে নেভাদা রাষ্ট্রে আর কারও মৃতদেহের সৎকার এত জাঁকজমক করে অনুষ্ঠিত হয়নি। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, গভর্ণর পর্যন্ত এলেন ফুলের তোড়া নিয়ে বাবার সৎকারে শেষবারের মত শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে, এটা আমার কাছে অবশ্যই আশাতীত। কারখানায় আগেই ছুটি ঘোষণা করেছিলাম। সৎকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পথঘাট লোকে লোকারণ্য, সারিসারি গাড়ি এগোবোর পথ না পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে। ছোট্ট গির্জার কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। সৎকার পর্ব দেখতে অনেকে গির্জার ঢালু ছাদে উঠে পড়েছে। কড়ি বরগা আঁকড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রের দিকে। গির্জার পিউ-তে রিণাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমিও।

গির্জার পিউ-তে রিণা আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, দুজনেই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছি সৎকার পর্ব। রিণার পরণে কালো পোষাক, কালো ওড়নার আড়ালে ঢাকা পড়েছে মুখ আর একরাশ লালচে চুল। বাবার জুতো জোড়া পরেছি তাই পা দুটো থেকে থেকে টনটন করছে। সৎকারে যোগ দেবার পোষাক পরতে গিয়ে দেখেছি মেক্সিকান স্যাণ্ডাল গোছের একজোড়া হুয়ারাকো গোটা বাড়িতে, আমার নিজের পরার মত জুতো নেই। বাবা এই জুতো জোড়া কিনে রেখে দিয়েছিলেন তাঁর আলমারির তাকে, আমার জুতো নেই দেখে রোবেয়ার আলমারি খুলে এই জুতোজোড়া এনে দিয়েছে। আমি জানি, বাবা

বেঁচে থাকতে এই জুতো একদিনও পরেননি। আমিও লক্ষ্য করেছি আজ প্রথম। আজই শেষ। আর কখনও এই জুতোজোড়া পারবনা।

স্বস্তিবচন আর মন্ত্রপাঠ সেরে পাদ্রির দল সমবেত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সেই আওয়াজ কানে যেতে মুখ তুললাম আর তখনই কফিনে শোয়ানো বাবার মুখখানা শেষবারের মত চোখে পড়ল। পরমুহূর্তে কফিনে ঢাকনা আঁটা হল, পুরু পেরেক মারা হল ঢাকনার ধারে। মনটা অদ্ভুত ফাঁকা লাগছে, বাবার মুখ, তাঁর চেহারার বর্ণনা যেন হারিয়ে গেল আমার মন থেকে।

অনেকের কান্নার শব্দ কানে আসছে। আড়চোখে তাকাতে দেখলাম কারখানার মেক্সিকান মেয়ে মজুরেরা সবাই কাঁদছে। নাক টানার আওয়াজ কানে আসতেই মুখ ঘোরালাম। দেখি আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে জেইক ফ্ল্যাট, তার দু'চোখ ছলছল করছে।

রিণা পাশেই দাঁড়িয়ে স্থির, শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে হাবেভাবে চোখের চাউনিতে শোক বা দুঃখজনিত পরিতাপের চিহ্নটুকু ফুটছেনা। কান্নার আওয়াজ আসছে পেছন থেকে। অনেক লোক কেউ নিঃশব্দে কেউ বা বুকফাটা চিৎকার করে কাঁদছে আমার বাবার জন্য।

এই বিশাল শোকসাগরে কাঁদছেনা শুধু দু'জন—এক, তাঁর স্ত্রী রিণা, দুই, আমি, তাঁর ছেলে।

১০

খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া ভেসে আসছে মরুভূমির দিক থেকে, তাহলেও রাতের গরম ভাব কাটছেনা। একা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছি। চোখে ঘুমের লেশটুকু নেই। গরম সইতে না পেরে শেষকালে বেডশিটখানা গা থেকে পায়ের দিকে সরিয়ে দিলাম। সারাদিনে প্রচুর ধকল গেছে। শুরু হয়েছে বাবার মৃতদেহের সৎকার পর্ব দিয়ে। তারপর মিঃ ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে দিনভর দফায় দফায় নানা ব্যাপারে আলোচনা, পরামর্শ নেওয়া। প্রচণ্ড মানসিক পরিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও ঘুম আসছেনা। রাশি রাশি চিন্তা ঝড়ের বেগে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মগজের ভেতর। বাইরে থেকে দরজার পাল্লায় আওয়াজ হতে চমকে উঠে বসলাম, 'কে?'

আমার গলার আওয়াজ ঘরের ভেতরের নিস্তব্ধতা গেল ভেঙ্গে।

দরজার পাল্লা নিঃশব্দে খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল এক নারীমূর্তি। রিণার মুখখানা স্পষ্ট দেখালেও তার কালো পোষাক আঁধারে ঢাকা পড়েছে।

'জেগে আছো ভেবে এলাম, জোনাস,' বলল রিণা, 'তোমার মত আমিও ঘুমোতে পারছিনা।'

'টাকার কথা ভেবে ঘুমোতে পারছনা?' খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলামনা, 'তোমার চেক আর নগদ টাকা রসিদের সঙ্গে রাখা আছে ড্রেসারের ওপর। রসিদ সই করে ওগুলো নিয়ে যাও।'

'টাকার জন্য নয়। জোনাস,' বলতে বলতে রিণা আরও কয়েক পা এগিয়ে এল।

'তাহলে আর কিসের জন্য, রিণা?' নিজের গলা নিজের কানে অদ্ভুত ঠাণ্ডা শোনাল,

'তুমি কি দুঃখ প্রকাশ করতে, নাকি সহানুভূতি জানাতে এসেছো? নাকি স্বামির শোক ভুলতে সান্ত্বনার বাণী শুনতে এসেছো?'

'এভাবে আমার সঙ্গে কথা না বললেও পারো, জোনাস,' খাটের পাশে দাঁড়িয়ে মাথা হেঁট করে রিণা আমার দিকে তাকাল। 'উনি যেমন তোমার বাবা ছিলেন, তেমনই আমিও ছিলাম তাঁর স্ত্রী। হ্যাঁ, আমি দুঃখিত এটুকু তোমায় বলতে এসেছি।' খুব সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল রিণা।

'কিজন্য দুঃখিত?' আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'স্বামি হিসেবে যেটুকু দিয়েছেন তার বেশি দেননি বলে? এখন দুঃখ হচ্ছে?' তিক্ত-হাসি হেসে বললাম, 'আসলে তুমি ওঁকে কখনও ভালবাসতে পারোনি।'

'না তোমার বাবাকে আমি কখনও ভালবাসতে পারিনি,' শক্তগলায় বলল রিণা, 'কিন্তু আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। ওঁর মত মানুষ আমার জীবনে আগে আসেনি।'

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম। আচমকা ও কাঁদতে শুরু করল। আমার বিছানার ধারে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল।

'ঢের হয়েছে, থামো।' রুক্ষ গলায় বললাম 'কান্নাকাটির সময় এখন আর নেই, সে সময় অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছো।'

মুখ থেকে হাত নামিয়ে রিণা তাকাল আমার দিকে। আঁধারের মাঝে স্পষ্ট দেখলাম চোখের জল দরদর করে গড়িয়ে পড়ছে তার দু'গাল বেয়ে।

'কোন সময়ের কথা বলছ?' ধরাগলায় চেঁচিয়ে উঠল রিণা, 'তোমার বাবাকে ভালবাসতে দেরি করে ফেলেছি বলে? ভালবাসার চেষ্টা আম করিনি ভেবোনা, আসলে ভালবাসার ক্ষমতাই আমার নেই, কেন তা বলতে পারবনা। আমার ধাতই ওরকম। তোমার বাবা তা জানতেন। ব্যাপারটা বুঝতেও পারতেন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার লোভে নয়, শুধু এই কারণেই আমি ওঁকে বিয়ে করেছিলাম। তাও উনি জানতেন। এরপরেও আমি ওঁকে যেটুকু দিয়েছি সেটুকু পেয়েই উনি পরিতৃপ্ত ছিলেন।'

'তাই যদি হয়,' আমি বললাম 'তাহলে এখন তুমি কান্নাকাটি জুড়েছো কেন?'

'কারণ আমার বড্ড ভয় হচ্ছে,' বলল রিণা।

'ভয় পেয়েছো তুমি?' রিণার কথা শুনে হেসে উঠলাম একথা ওর মুখে মানায়না। 'কাকে ভয়, কিসের ভয়?' হাতড়ে হাতড়ে পোষাকের ভেতর থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজল রিণা। আঁধারে ওর দু'চোখ চিতাবাঘের চোখের মত জ্বলছে। 'ভয় পুরুষমানুষকে,' বলল রিণা।

'পুরুষ মানুষকে ভয়?' আমি বললাম। 'তোমার মত মেয়ে যে বরাবর পুরুষমানুষকে তাতিয়ে এসেছে—'

'হ্যাঁগো, গর্দভ, তাই!' রেগেমেগে বলল রিণা, 'পুরুষমানুষের মুখে সেই এক চাহিদা শুনে, তাদের কলংকিত হাত আর ভোগী মনের শরীর দেখতে দেখতে এখন ভয় ধরে গেছে আমার নিজের মনে। কাউকে দেখতে ত বাকি নেই। মুখে প্রেম ভালবাসা স্বপ্ন,

এসব জমকালো ছদ্মবেশের আড়ালে সবারই এক লক্ষ, আমার শরীর। ভয় পেলে তা এমন কি অস্বাভাবিক তুমিই বলো। জোনাস!'

'তোমার মাথার ঠিক নেই!' রাগের মাথায় বললাম, 'আমরা পুরুষেরা সবাই একরকম মোটেও নই।'

'নও! তাই বুঝি?' বলেই ফ্যাঁশ করে দেশলাই জ্বালল রিণা, 'নিজের দিকে তাকাও, জোনাস, নিজের বাবার বৌকে ভোগকরার বাসনা কিন্তু তুমিও বুকের ভেতরে পুষে রেখেছো। তোমার চোখেমুখে সেভাব পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।'

আমার মনের কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু ভেতরের রাগ চাপতে না পেরে এক থাপ্পর মেরে ওর দু'-আঙ্গুলে ধরা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা ফেলে দিলাম। পরমুহূর্তে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। আবেগে থরথর করে কাঁপছে ওর দেহ, পাগলের মত আমার ঠোঁটে, চোখেমুখে চুমু খেতে খেতে বলে উঠল, 'জোনাস, জোনাস! দোহাই, আজকের রাত, শুধু আজকের রাতটুকু আমায় তোমার পাশে শুতে দাও! একা শুতে আমার বড্ড ভয় করছে!'

রিণার আর্তি শুনে সীমাহীন আতংকে আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে এল। তার হাবভাব আর চোখের চাউনি খুঁটিয়ে দেখব বলে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। কিন্তু রাতের নিকষকালো আঁধারে কিছুই স্পষ্ট হল না। ছোঁয়ানো আমার ঠোঁটে তার চোখের নোনতা জলের ফোঁটা পড়তে চমক ভাঙ্গল। রিণার ওপর যে ক্ষোভ আর ক্রোধ দানা বেঁধেছিল আমার মনের গহনে, তার চোখের জলে তা পুরোপুরি ধুয়ে মুছে গেল। এবার শয়তান জেগে উঠল আমার ভেতর তার পিছু পিছু কামনা বাসনার জ্বলন্ত নরকের পথে হাত ধরে এগিয়ে গেলাম দু'জনে।

চোখ মেলতে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ভোরের আলোর ছটা ঘরে ঢুকে মুছে দিচ্ছে রাতের আঁধার। মুখ ফেরাতে দেখি আমার বালিশে মাথা রেখে শুয়ে রিণা। চোখের ওপর হাত রাখা। আলতো করে ওর কাঁধ ছুঁতে ও চমকে উঠল, আমার হাত সরিয়ে চোখ মেলল। দেখলাম চোখের চাউনি শান্ত, পরিষ্কার। আমি আঁচ করার আগেই ও চটপট নেমে পড়ল খাট থেকে। এক অদ্ভুত দিব্য সোনালি আভা জ্যোতির মত ঝলসে উঠছে ওর শরীর ঘিরে। বিছানার পায়ের কাছে পড়ে থাকা কালো পোষাক তুলে পড়ে ফেলল। আমার চোখের সামনে পায়ে পায়ে ড্রেসিং টেবলের কাছে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল রিণা।

'ওপরের ডানদিকের দেরাজে কলম আছে', আমি বললাম।

কলম বের করে চটপট রসিদে নাম সই করল রিণা।

'রসিদে কি লেখা আছে পড়লে না?' আমি জানতে চাইলাম।

'দরকার কি?' মাথা নেড়ে জবাব দিল রিণা। 'আমি তোমায় যতটুকু দিতে রাজি হয়েছি তার বেশি ত তোমার কোনমতেই পাবার কথা নয়।'

ঠিকই বলেছে রিণা। আমার বাবার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তিতে ও নিজের আর কোনও

অধিকার নেই বলে সই করেছে। চেক আর নগদ টাকার বাণ্ডিলগুলো তুলে এগিয়ে গেল রিণা, দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি কারখানা থেকে ফিরে আর আমায় দেখতে পাবেনা।' রিণা বলল, 'তার আগেই আমি চলে যাব।'

'তোমার এখান থেকে কোথাও যেতে হবে না।' তার চোখে চোখ রেখে বললাম।

'না, জোনাস,' বিষন্ন চাউনি ফুটল তার চোখে, 'এখন আর আমায় আটকে রেখোনা। ওতে লাভ হবে না।'

'হতে ও ত পারে।'

'না, জোনাস,' আস্তে কেটে কেটে বলল রিণা। 'বাবার সত্তার খোলস ছেড়ে এবার বেরিয়ে এসো। উনি বড় মাপের মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু তোমায় তোমার নিজের পথে নিজের মত করে আরও বড় মাপের মানুষ হতে হবে।'

পাশের টেবলের দেরাজ খুলে সিগারেট বের করে ধরালাম। বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছিনা। ধোঁয়ায় শ্বাসনালি, কলজে ফুসফুস সব জ্বলছে।

'যাচ্ছি, জোনাস,' বলল রিণা, 'ভাল থেকো এই কামনা করছি।'

'ধন্যবাদ রিণা,' সিগারেটের ধোঁয়ায় গলার আওয়াজ নিজের কানে কর্কশ ঠেকল, 'ধন্যবাদ। রিণা, বিদায়।'

একবারও পেছন দিকে তাকালনা রিণা। দরজা খুলে চটপট বেরিয়ে গেল। খাট থেকে নেমে খোলা জানালায় এসে দাঁড়ালাম। উদিত সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে উঠছে পূবদিগন্ত। বেলা বাড়লে রোদ গায়ে অসহ্য জ্বলুনি ধরবে এখনই টের পাচ্ছি।

দরজা খোলার আওয়াজে চমকে উঠলাম, ভাবলাম রিণা হয়ত মত পাল্টে ফিরে এল। কিন্তু রিণা নয়, এল রোবেয়ার ট্রে হাতে নিয়ে। 'আপনার জন্য গরম কফি নিয়ে এলাম,' হেসে বলল, 'সাতসকালে চুমুক দিলে দিনভর তরতাজা থাকবেন।'

কারখানায় ঢোকার মুখে চোখে পড়ল জেইক প্ল্যাট ক'জন লোক নিয়ে ছাদের কুচকুচে কালো রং ঘষে তুলে সাদা রং-এর পোঁচড়া বোলাচ্ছে। ওষুধ ধরেছে ভেবে হাসি পেল, পা বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

পাঁচটা নাগাদ নেভাদা এসে ঘড়ে ঢুকল 'জোনাস, আজ আমি একটু আগে বাড়ি গেলে তোমার অসুবিধে হবে না ত?'

'অসুবিধে হবে কেন,' আমি বললাম 'তুমি ডুসেনবার্গে চেপে বাড়ি যাও, জেইক না হয় পরে আমায় ওর গাড়িতে পৌঁছে দেবে।'

'দরকার কি,' নেভেদা বলল, 'আমি আমার গাড়ি চালিয়েই যেতে পারব।'

'যাও তাহলে,' আমি বললাম।

'নেভাদা, একটা কথা। বাড়ি ফিরে রোবেয়ারেকে বোল আজও রাত আটটা নাগাদ ডিনার খাব।'

'তাই বলব, জোনাস।'

কাজকর্ম চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে সাতটা বাজল। গাড়ি থেকে নামতেই চোখে পড়ল নেভাদা দু'হাতে একটা বড় ঝোলা ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। 'তুমি এখনই ফিরে এলে?' অবাক হল নেভাদা।

'হ্যাঁ।' হেসে বললাম, 'সকাল সকাল কাজকর্ম শেষ হল। তাই চলে এলাম।'

'তাই বলো।' বলে নিজের গাড়ির পেছনের দরজা খুলে হাতের ঝোলাটা ছুঁড়ে দিল ভেতরে।

'ওটা নিয়ে কোথায় চললে, নেভাদা?' আমি বললাম।

'ওটা আমার,' কর্কশ শোনাল তার গলা।

'তোমার নয় তা বলিনি। বলছি এখন কোথায় চললে?'

'আমি চললাম।'

'শিকারে যাচ্ছ বুঝি?' জানতে চাইলাম। ছোটবেলায় বছরের এই সময় নেভাদা আমায় নিয়ে পাহাড়ে শিকার করতে যেত।

'না, শিকারে না,' নেভাদা বলল।

'এখান থেকে বরাবরের মত চলে যাচ্ছি।'

'এক মিনিট' বাধা দিয়ে বললাম।

'এভাবে তোমার কখনোই যাওয়া হবে না।'

'কেন,' আমার চোখের দিকে তাকাল সে, 'কে বলল পারি না?'

'আমি, আমি বলছি। তোমায় ছেড়ে আমি থাকব কি করে একবারও ভেবেছো?'

'তুমি এখন আর ছোটটি নও, জোনাস। দিব্যি বড় হয়েছো। দিনে তোমায় চান করাতে আর রাতে তোমায় মূতের কাঁথা বদলাতে এখন আর আমার দরকার নেই। ক'দিন ধরে আমি নজর রেখেছি তোমার ওপর, দেখেছি তুমি বড় হয়ে উঠেছো। এখন আর তোমার ওপর আমার খবরদারির দরকার নেই।'

'কিন্তু-কিন্তু,' প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারলামনা। কথাগুলো গলায় এসে আটকে গেল।

'সব কাজই ত একসময় শেষ হবে জোনাস,' শান্তগলায় বলল নেভাদা,'গত ষোলবছর একটানা কাজ করছি তোমাদের কাছে। এখন আর আমার হাতে করার মত কোনও কাজ নেই, কিছু নেই। কাজকর্ম কিছু না করে বসে বসে আমি মাইনে নিতে পারবনা, জোনাস।'

নেভাদার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সে ঠিকই বলেছে। 'টাকাকড়ি কিছু জমিয়েছো?' জানতে চাইলাম।

'গত ষোল বছরে তোমার বাবা আমার মাইনের একটা আধলাও খরচ করতে দেননি। যখন যা দরকার হয়েছে সব উনিই এনে দিয়েছেন।'

'তা কাজকর্ম ছেড়ে এখন কি করবে কিছু ঠিক করেছো?'

'পুরোনো দোস্তদের সঙ্গে হাত মেলাব। কালিফোর্নিয়ার দিকে গেলে কিছু একটা হিল্লে হবে। হাতে কাজ আসবে প্রচুর, দিনরাত মুখ তুলে তাকানোর সময় পাব না।'

কয়েক মুহূর্ত দু'জনের কারও মুখে কথা জোগালনা। তারপর নেভাদা হাত বাড়িয়ে বলল, 'তাহলে চলি, জোনাস।'

কান্নায় চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে টের পাচ্ছি। আর বাধা দিলামনা, তার বাড়িয়ে দেয়া হাত দু'হাতের মুঠোয় চেপে বললাম। 'এসো। নেভাদা। বিদায়।'

আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নেভাদা তার গাড়ির সামনের দরজা খুলে বসল ড্রাইভারের জায়গায়। এঞ্জিন চালু করেই গিয়ার পাল্টাল। গাড়ি বিদ্যুদ্বেগে উধাও হবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে একবার হাত নাড়ল নেভাদা।

'খোজখবর নিয়ো, নেভাদা। মাঝেমধ্যে দেখা কোর।' চেঁচিয়ে বললাম, কিন্তু এতক্ষণে সে বহুদূরে চলে গেছে।

বাড়িতে ঢোকার কিছু পরে রোবেয়ার একটা খাম এগিয়ে নিয়ে এল। 'মিঃ নেভাদা স্মিথ এটা আপনাকে দিতে বলেছেন।'

উত্তেজনায় আমার হাত প্রায় অসাড় হয়ে গেছে, তবু খামের মুখ খুললাম। ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ টেনে বের করলাম। তাতে পেনসিলে গোটা গোটা হরফে লেখা—

জোনাস, বাবা আমার,

আমি তেমন দরের মানুষ হতে পারিনি তাই বিদায় বেলায় এর চেয়ে ভাল আর কিছু তোমায় দিতে পারলামনা। এতদিন প্রত্যেক বছর তোমার জন্মদিনে কিছু না কিছু উপহার দেবার সাধ হয়েছে কিন্তু তোমার বাবা আমায় কখনও টাকা খরচ করে কিছু কেনাকাটা করতে দেননি। আজ তিনি নেই তাই আমায় বাধা দেবার মত আর কেউ নেই। এর ভেতরে তোমার জন্য যৎসামান্য কিছু উপহার আছে, তুমি গ্রহণ করলে শান্তি পাব। আমি রেণোতে উকিলের সঙ্গে দেখা করে যা করার করেছি তাই তোমার ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

তোমার জন্মদিনে আমার শুভেচ্ছা নিও।

তোমার বন্ধু,
নেভাদা স্মিথ

খামের ভেতরে আরেকটা খাম ছিল, সেটা খুলতে চমকে উঠলাম, ভেতরে কর্ড এক্সপ্লোসিভস-এর কয়েকটা স্টক নেভাদার নামে। নিজের নাম কাটিয়ে ওগুলোয় আমার নাম বসিয়েছে নেভাদা।

কাগজগুলো টেবলে রেখে চুপচাপ বসে রইলাম। একটা শক্ত পিণ্ড যেন উঠে আসছে গলা দিয়ে। বাড়িটা খালি হয়ে খাঁ খাঁ করছে। বাবা চলে গেলেন। রিণা গেল। এবার নেভাদাও গেল। সবাই একে একে চলে যাচ্ছে আমায় ছেড়ে। একরাশ স্মৃতির প্রতিধ্বনি ছাড়া এখন আমার ভাগে আর কিছুই নেই।

রিণার শেষ কথাটুকু মনে পড়ে গেল। বাবার সত্তার খোলস ছেড়ে ও আমায় বেরিয়ে আসতে বলেছিল। এখন মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছে ও, এই বাড়িতে একা আমি টিকতে

পারবনা। এ বাড়ি আমায় নয়, আমার বাবার। আমার কাছে চিরকালই এটা আমার বাবার বাড়ি হয়েই থাকবে।

হঠাৎই মনস্থির করে ফেললাম। রেণো-তে একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যাব। সেখানে রেণো-তে কোনও স্মৃতিভারে আমায় জর্জরিত হতে হবেনা। এ বাড়ি আমি ম্যাক অ্যালিস্টারকে দিয়ে দেব। ওঁর বৌ ছেলেমেয়ে আছে। সংসারী লোক। আমার সাতরকম ঝামেলা নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামানোর জন্যই এটা ওঁর দরকার।

নেভাদার চিঠির শেষটায় আমার চোখ আটকে গেল। আমার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে সে। একটা তীব্র যন্ত্রণা তলপেটের ভেতর মোচর দিয়ে উঠল। কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। নেভাদা ভোলেনি, সেই আমায় মনে করিয়ে দিল।

আজই আমার জন্মদিন।

আমি একুশে পা দিলাম।

নেভাদা স্মিথ-এর গল্প

দ্বিতীয় পর্ব

১

রাত ন'টা বেজেছে অনেকক্ষ হল। হাইওয়ে থেকে কিছুদূরে একটা কাঁচা রাস্তা ঘোড়ার খোঁয়াড়ের দিকে গেছে, হাইওয়ে ছেড়ে সেই পথ ধরে বেশ কিছুদূর এগোল নেভাদা, বড় বাড়িটার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে এল সে। ক্যাসিনো থেকে অনেক লোকের হাসির হুল্লোড় ভেসে আসছে, কান পেতে সেই আওয়াজ শুনতে লাগল নেভাদা। খানিক বাদে ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়াল, পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল। 'আরে নেভাদা যে! ভাল আছো ত?'

নিজের নাম শুনেও ঘাড় ফেরালনা নেভাদা, লোকটির উদ্দেশে বলল, 'তারপর? তোমার খবর ভাল ত, চার্লি? শুনলাম ডিভোর্সিরাই এখন বেশি ফূর্তি করছে, মজা লুটছে। কথাটা সত্যি?'

'একশোবার সত্যি,' মুচকি হাসল চার্লি, 'করবে না-ই বা কেন? ওদের সবার বেলায় ডিভোর্স করা একটা কাজের মত কাজ।'

'আমার নিজেরও তাই মনে হয়,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল নেভাদা। 'শুধু ঘোড়ার বদলে মেয়েদের ধরে ধরে সংসারের খোয়াড়ে ঢোকানোর ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি।

'হয়ত এবার হবে,' হাসল চার্লি, 'হাজার হলেও তুমি নিজে এখানকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের মালিক। সময় চলে যাচ্ছে নেভাদা, এবার বিয়ে করে সংসারী হও, থিতু হয়ে

বোস, তারপর এখানকার কারবারে হাত লাগাও।'

কি হবে জানি না।' বলল নেভাদা। 'আসলে ব্যাপার কি জানো, এ থিতু হওয়াই ভগবান আমার কপালে লেখেননি, আমার মন সবসময় ঘুরে বেড়াতে চায়। এখনই মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন এক জায়গায় কাটিয়েছি।'

'যাবার জায়গা কিছু বাকি আছে?' খেঁকিয়ে উঠল চার্লি, 'যেখানে পেরেছে সেখানেই রাস্তা বানিয়ে হতচ্ছাড়ারা দেশটাকে উচ্ছন্নে পাঠিয়েছে। দেরি করে ফেলেছো। নেভাদা, কম সে কম ত্রিশবছর দেরি করে ফেলেছো।'

কিছু না বলে ঘোড়া থেকে নেমে চার্লির কথায় সায় দিল নেভাদা। চার্লি হয়ত ঠিকই বলেছে, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল ত্রিশ বছর দেরি করে ফেলার বা পেছিয়ে যাবার মত কিছুই সে টের পায় না। সবকিছুই তার কাছে আগের মত ঠেকে, এই মুহূর্তেও তাই ঠেকছে।

'মাগিটাকে তোমার কেবিনে থাকতে দিয়েছি,' বলল চার্লি, 'তোমার সঙ্গে খাব বলে মার্থা আর আমি এখনও বসে আছি।'

'তাহলে আমি বরং ওকে এখানে নিয়েই আসি,' বলতে বলতে আবার দরজা খুলে গাড়িতে ঢুকল নেভাদা। 'চানটা সেরেই ফিরে আসছি।'

নেভেদার গাড়ি চালু হতে চার্লি ভেতরে যাবে বলে পা বাড়াল। দোরগোড়ায় গিয়ে পেছনে ফিরতেই দেখল ঘোড়ার খোঁয়াড়ের পেছনে ছোট পাহাড়ের গা বেয়ে পাক খেয়ে খেয়ে গাড়িটা ওপরদিকে উঠছে। খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকল চার্লি।

'কেমন আছে তোমার বন্ধু?' জানতে চাইল মার্থা।

'ঠিক বুঝতে পারছিনা,' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল চার্লি, 'মনে হচ্ছে ও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। ওর হাবভাব কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কেবিনের ভেতরে নিকষকালো আঁধারের ভেতরে ঢুকে নেভাদা হাত বাড়িয়ে দরজার পাশ থেকে তেলের ল্যাম্পটা নিয়ে টেবলে রাখল। দেশলাই কাঠি জ্বেলে সল্‌তেয় আগুন ছোঁয়াল; কয়েক মুহূর্তে ছটফটিয়ে সল্‌তের শিখা স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল। এবার কাঁচের চিমনি পরিয়ে ল্যাম্পটা শেল্‌ফে রাখল সে। 'ইলেকট্রিক আলো জ্বালোনি কেন, নেভাদা?' পেছন থেকে ভেসে এল রিণার গলা।

ল্যাম্পের আলো আমার ভাল লাগে', সহজ সরল শোনাল নেভাদার গলা 'ইলেকট্রিক আলোয় চোখে চাপ পড়ে বেশি, কষ্ট হয়।'

দরজার দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসে রিণা, ল্যাম্পের ম্লান আলোয় তার ফ্যাকাশে মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। রিণার পরণে ফ্যাকাশে নীল জিন্‌স-এর ট্রাউজার্স, তার ওপর ভারি সোয়েটার।

'তোমার শীত লাগছে? বলল নেভাদা। 'ফায়ার প্লেসে এখুনি লকড়ি জ্বালাচ্ছি।'

'আমার একটুও শীত লাগছেনা' ঘাড় নড়ল রিণা।

'গাড়িতে আমার মালপত্র আছে,' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল নেভাদা, 'ওগুলো নিয়ে এসে চানটা সেরে নিই। চার্লি আর মার্থা আমাদের সঙ্গে খাবে বলে বসে আছে।'

'মালপত্র আনতে গাড়ি থেকে?' বলল রিণা, 'চলো, আমিও হাত লাগাচ্ছি।'

'চলো।' কেবিন থেকে দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল। কালো মখমলের বুকে সেলাই করা রূপোর কুচির মত ঝিকমিক করছে ওপরে তারারা, বাজনা আর হাসির হুল্লোড়ের অাবছা আওয়াজ ভেসে আসছে পাহাড়ের নিচের সমতল থেকে।

'ভগবান বাঁচিয়েছেন আমায় ওদের দলে ভিড়তে হয়নি,' অনেক নিচে ক্যাসিনোর দিকে তাকিয়ে বলল রিণা।

'চাইলেও তুমি ভিড়তে পারতে না।' গাড়ি থেকে একটা স্যুটকেস নামিয়ে রিণার হাতে দিল নেভাদা, 'তুমি ঠিক ঐ দলের নও।'

'ওঁকে ডিভোর্স করার কথা একেক সময় মাথায় আসত,' স্বাভাবিক গলায় বলল রিণা, 'গোড়া থেকেই কাজটা ঠিক হয়নি জেনেও ভেতর থেকে কে যেন আমায় ডিভোর্সের ব্যাপারে এগোতে বারবার বাধা দিয়েছে।'

'একবার কোনও চুক্তি করলে তা থেকে সরে আসা যায় না।' বলল নেভাদা।

'ঠিকই বলেছো,' সায় দিল রিণা। গাড়ি থেকে বাকি মালপত্র নামাতে আরও দু'বার নিঃশব্দে আসা যাওয়া করল তারা। কাজ শেষ হলে কেবিনে খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসল রিণা, নেভাদা শার্ট খুলে শোবার ঘরের কোণে ওয়াশবেসিনে এসে দাঁড়াল।

নেভাদার অদ্ভুত ধপধপে সাদা চামড়ার নিচে পেশিগুলো ছোট ঢেউ-এর মত ফুলে উঠেছে। কুচকুচে কালো লোমে ঢাকা বুক পেট পৌরুষ জুগিয়েছে তার চেহারায়। আঁজলা করে জল ছিটিয়ে মুখ আর ঘাড়ের সামনের ফেনা ধুয়ে ফেলল নেভাদা, তোয়ালের জন্য হাত বাড়াল।

রিণার বাড়িয়ে দেয়া তো..য়ালেতে ভাল করে মুখ আর ঘাড় মুছল নেভাদা, তোয়ালে রেখে একটা পরিষ্কার শার্ট গায়ে চ. ়ল। রিণা খুঁটিয়ে দেখছিল। নেভাদা বোতাম লাগাতে যেতে সে তাকে থামিয়ে দিল,' 'দাঁড়াও, বোতামগুলো আমি লাগিয়ে দিচ্ছি'।

হালকা আঙ্গুলে চটপট তার শার্টের বোতামগুলো আঁটল রিণা, আঙ্গুলের ছোঁয়া লাগতে নেভাদার মনে হল বাতাস চুমু খেল তার বুকে। 'তোমার বয়স কত হল, নেভাদা?' বড় বড় চোখ মেলে তার মুখের পানে তাকাল রিণা, 'তোমার চামড়া এখনও কচি ছেলেদের মত রয়ে গেছে।'

জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল নেভাদা।

'বয়স কত হল, বলো না?'

'যতদূর জানি আমি জন্মেছি ১৮৮২-তে,' নেভাদা বলল, 'সেই হিসেবে বয়স এখন দাঁড়ায় পুরো তেতাল্লিশ। আমার মা ছিলেন কিওয়া; সে আমলে ছেলেমেয়ের জন্মদিনের হিসেব রাখার চল ওঁদের মধ্যে ছিল না।'

শার্টটা ট্রাউজারের ভেতরে গুঁজতে গুঁজতে বলল সে। 'তোমায় দেখলে ত্রিশের বেশি মনে হয় না।' বলল রিণা।

'চলো, এবার গিয়ে খেয়ে আসা যাক,' রিণার কথা শুনে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল নেভাদা।

'তাই চলো,' নেভাদার হাত ধরল রিণা। 'হঠাৎ বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।'

খাওয়াদাওয়া সেরে দু'জনে যখন কেবিনে ফিরে এল তার অনেক আগে রাত বারোটা বেজে গেছে। নেভাদা দরজার পাল্লা খুলে দিতে রিণা ভেতরে ঢুকল। নেভাদা পেছন পেছন ঢুকে ফায়ারপ্লেসে জড়ো করা কাঠকুটোয় আগুন ধরাল। আগুন ধরে উঠতে রিণার দিকে তাকিয়ে নেভাদা বলল, 'যাও, এবার শুয়ে পড়ো।'

কিন্তু রিণা না শুয়ে শোবার ঘরে পায়চারি করতে লাগল, নেভাদা হাওয়া দিয়ে ফায়ার প্লেসের আগুন তাতিয়ে তুলল। ঘরের ভেতরটা গরম হয়ে উঠতে উঠে দাঁড়াল নেভাদা, দেয়াল আলমারি খুলে বুরবোঁ স্কচ হুইস্কির বোতল আর গ্লাস বের করে জমিয়ে বসল আগুনের সামনে। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে আলতো চুমুক দিল নেভাদা। গ্লাসের সবটুকু হুইস্কি খেয়ে পায়ের জুতো খুলে ফেলল। জুতোজোড়া চেয়ারের পাশে রেখে এগিয়ে এসে হাত পা ছড়িয়ে কৌচে শুয়ে পড়ল নেভাদা। সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে এমন সময় শোবার ঘরের দরজার বাইরে থেকে ভেসে এল রিণার গলা, 'নেভাদা?'

'কি হল?' ধড়মড় করে উঠে বসল নেভাদা, দেখল দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে রিণা।

'কি হল?' বলে উঠল নেভাদা।

'জোনাস কি আমার সম্পর্কে তোমায় কিছু বলেছে?'

'না।'

'কোম্পানিতে আমার স্টক আর বাড়ির দাম বাবদ জোনাস আমায় একলাখ ডলার দিয়েছে।'

'আমি জানি,' বলল নেভাদা।

'অত টাকা দিয়ে আমার দরকার নেই,' একমুহূর্ত ইতস্তত করে ঘরের ভেতর চলে এল রিণা, 'বলছি অত টাকা আমার দরকার নেই। তোমার দরকার হলে—'

'আমার যা আছে তাতেই চলবে,' অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসল নেভাদা।

'তবু তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'সত্যি বলছ? টাকা তোমার দরকার নেই?'

আবার শব্দ না করে আপনমনে হাসল নেভাদা; টেক্সাসে তার নিজের ছ'হাজার একর জুড়ে ঘোড়ার খোঁয়াড়, ওয়াইল্ড ওয়েস্ট শো-র অর্দ্ধেক মালিকানা। এসব রিণা নিশ্চয়ই জানে না, জানলে ওর চোখমুখের হাব ভাব নিশ্চয়ই দেখার মত হবে। জোনাসের বাপ ছিলেন খাঁটি কারবারী লোক, সম্পত্তি বাড়ানো আর তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অনেক কিছু ওঁর কাছ থেকে শিখেছে সে। 'যতদিন ইমানদারি করবে ততদিনই টাকাকে বন্ধু বলে মনে হবে,' প্রায়ই বলতেন তিনি। 'আমি কি বলছি তা আমি জানি রিণা,' কৌচ থেকে উঠে দাঁড়াল নেভাদা। রিণা কাছাকাছি এসে বলল, 'রাত অনেক হল, ঠাণ্ডার মধ্যে খালি পায়ে আর হেঁটো না।'

আর কথা না বাড়িয়ে শোবার ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল রিণা. দেয়াল আলমারি খুলে একটা কম্বল বের করল নেভাদা। কম্বল নিয়ে খাটের পাশ দিয়ে যাবার সময় নেভাদার হাত ধরে ফেলল রিণা, বলল. 'ঘুম আসছেনা, গল্প করে আমার ঘুম পাড়াও।'

'কি গল্প শুনবে, বলো,' খাটের ধারে বসে পড়ল নেভাদা।

'তোমার নিজের কথা বলো, কবে কোথায় তোমার জন্ম, কোথা থেকে এলে এসব গল্পের মত করে শোনাও।'

'আমার নিজের কথা তেমন বলার মত কিছু নয়,' আঁধারে হাসল নেভাদা, 'যতদূর জানি পশ্চিম টেক্সাসে আমার জন্ম। আমার বাবার নাম জন স্মিথ, মোষ শিকারী হিসেবে তাঁর নাম ছিল। আমার মা ছিলেন কিওয়া রেড ইণ্ডিয়ানদের রাজার মেয়ে, ওর নাম ছিল—' বলতে হবেনা। আমি জানি, 'ঘুমঝড়ানো গলায় বলল রিণা, 'ওঁর নাম ছিল পোকাহোন্টাস।'

'নিশ্চয়ই কেউ বলেছে তোমায়,' বলল নেভাদা, 'ঠিকই শুনেছো, আমার মায়ের নাম ছিল পোকা হোন্টাস।'

'কেউ বলেনি,' জড়ানো গলায় বলল রিণা, 'কোন একটা বইয়ে পড়েছিলাম।' ঘুমের ঘোড়ে মুঠো আলগা হতে নেভাদার হাত ছেড়ে দিল রিণা। ঝুঁকে নেভাদা দেখল রিণার দু'চোখ বোঁজা। আঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। খাটের ধার থেকে কম্বলটা তার গলা পর্যন্ত টেনে দিল নেভাদা। তারপর চলে এল নিজের ঘরে। কৌচে আরেকটা কম্বল বিছিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল; কম্বল দিয়ে নিজের আগাপাশতলা মুড়ে ফেলল। বাবা জন স্মিথ আর মা পোকাহোন্টাস। এ পর্যন্ত কতজনকে এই এক গপ্পো শুনিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তার নিজের জীবনকাহিনী আরও অদ্ভুত' শুনলে হয়ত কেউ বিশ্বাসই করবেনা। এত পুরোনো সে কাহিনী যে আজ তার নিজেরই তা বিশ্বাস হয়না একেক সময়। হ্যাঁ, তখন তার নাম নেভাদা স্মিথ ছিল না, তার আসল নাম ছিল ম্যাক্স স্যাণ্ড। এবং সশস্ত্র ডাকাতি আর একাধিক খুনের অভিযোগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পুলিশ তখন তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

২

ঝড়জল আর রোদ্দুর থেকে কোনমতে বাঁচার মত কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি একখানা খুদে কেবিন, ১৮৮২ সালের মে মাস নাগাদ স্যামুয়েল স্যাণ্ড এক রেড ইণ্ডিয়ান যুবতীর হাত ধরে এসে মাথা গুঁজল সেই কেবিনে।

কাঠের গুঁড়ির তৈরি ছোট কেবিন হলেও স্যামুয়েলের কাছে তাই ছিল বাড়ি, আর সেই কেবিনের ভেতর রাখা একখানা বাক্স তাই ছিল তার চেয়ার, তার বাড়ির একমাত্র আসবাব। রেড ইণ্ডিয়ান যুবতীকে দেখলে বোঝা যায় তার পেটে বাচ্চা এসেছে, ভারি শরীর নিয়ে হাঁটাচলা করে থপথপ করে। নতুন জায়গায় ঠাঁই পেয়েই যুবতী নিঃশব্দে এক মগ কফি তৈরি করে রাখল তার মরদের সামনে।

তার মরদ স্যামুয়েল বাক্সের ওপর ঠায় বসে রইল, মগভর্তি গরম কফি জুড়িয়ে জল হতে লাগল সেদিকে তার হুঁশ নেই। কেবিনের খোলা দরজার বাইরে উত্তর আমেরিকার 'প্রেইরি' বা ঘাসে ছাওয়া ঢেউ খেলানো জমির এখানে ওখান তখনও একটু আধটু তুষার লেগে আছে, বসে থাকতে থাকতে এক আধবার সেদিকে তাকাল সে।

তার রেড ইণ্ডিয়ান গিন্নি ততক্ষণে ফায়ারপ্লেসের আগুনে রাতের খাবার চড়িয়ে দিয়েছে। পদ একটিই—বিন দিয়ে নুনে জড়ানো মোষের মাংস। সন্ধ্যে হওয়া দূরে থাক, সকালবেলায় সূর্য মাথার ওপর চড়তে তখনও ঢের দেরি আসলে মেয়েটি চাপা অস্বস্তি বোধ করছে। সেই অস্বস্তি কাটাতে কিছু একটা করা দরকার বুঝেই তড়িঘড়ি রান্না চাপিয়ে দিয়েছে সে। রান্নার ফাঁকে থেকে থেকে আড়চোখে মরদের দিকে তাকাচ্ছে সে। কিন্তু গিন্নির দিকে মরদের হুঁশ নেই, মগভর্তি গরম কফি কখন জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে দেখেও দেখেনি স্যাম, বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নিজের দুনিয়ার ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে। এই দুনিয়া একান্তভাবে তার নিজের। এখানকার ব্যাপারে স্যাপার কিছুই ঢুকবেনা তার গিন্নির মাথায়, এই দুনিয়ায় তার প্রবেশ নিষেধ। কানেহা বেচারি আর কি করে, রান্নার পাত্রে ফুটন্ত মোষের মাংস আর বিন হাতা দিয়ে এক মনে নেড়ে চলেছে সে। আর কতক্ষণে মরদ তার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাবে তাই ভাবছে।

কি যেন নাম স্যামুয়েলের গিন্নির? হ্যাঁ, কানেহা। এই বসন্তে ষোলয় পা দিয়েছে সে। আগের গ্রীষ্মে তার মরদ এই মোষ শিকারি স্যাম বৌ কিনতে এসে হাজির হয়েছিল তাদের গোষ্ঠীর মোড়লের কাছে। কালো ঘোড়ায় চেপে এসেছিল স্যাম, তার সঙ্গে ছিল একটা খচ্চর, একটা বড় বোঁচকা ছিল সেই খচ্চরের পিঠে।

কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালানো হয়েছে, সেই আগুনে বসানো বড় পাত্রভর্তি মাংসের সুরুয়া ফুট্‌ছে টগবগ করে। বীর যোদ্ধাদের নিয়ে গোষ্ঠীর সর্দার সেই আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। ঘোড়া থেকে নেমে খচ্চরটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল স্যাম। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বসে পড়ল সর্দারের গা ঘেঁষে। হাতের তামাকভর্তি মাটির পাইপে দম দিয়ে সর্দার তা এগিয়ে দিল স্যামের দিকে। জোরে দম দিয়ে স্যাম সেই পাইপ চালান করল পাশের লোকটিকে। হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে পাইপ। সর্দারের হাতে ফিরে আসতে স্যাম এবার স্কচ হুইস্কির বোতল খুলল। দু'ঢোঁক নিট গলায় ঢেলে বোতল তুলে দিল সর্দারের হাতে। সর্দারও দু'তিন ঢোঁক গিলে পাশের লোকের হাতে বোতল চালান করল। হুইস্কির কড়া ঝাঁঝে সর্দারের দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে, গলার ভেতর দিয়ে মদ যেন মাংস মজ্জা সব পুড়িয়ে গলিয়ে ছাই করে দিতে দিতে নিচে নামছে। কাশি পেলেও কাশতে পারলনা সর্দার।

বীর যোদ্ধাদের হাত ঘুরে স্কচের বোতল ফিরে আসতে সেটা সর্দারের সামনে রাখল স্যাম। সামনের দিকে ঝুঁকে গরম সুরুয়া ভর্তি মাটির হাঁড়িতে হাত গলিয়ে তুলে নিল একটুকরো চর্বিজড়ানো সেদ্ধ মাংস। পরম তৃপ্তি সহকারে কিছুক্ষণ চিবিয়ে টুকরোটা গিলে ফেলল স্যাম, সর্দারের দিকে ফিরে বলল 'সত্যি, কুকুরের মাংসটা বেড়ে হয়েছে।'

'কুকুরের জিভে প্রচুর চর্বি ছিল,' সর্দার বলল, 'জিভটা কেটে খুঁটির গায়ে বেঁধে রাখা

হয়েছিল,' খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ, তারপর সর্দার বোতলের দিকে হাত বাড়াতে স্যাম বুঝল কথা পাড়বার এই হল মোক্ষম সময়।

'আমি পেশায় শিকারি,' বলল স্যামুয়েল।

'হাজার হাজার মোষ বন্দুকের গুলিতে মরেছে।'

'লালদেড়ে শিকারির ওইকথা আমরা সবাই জানি,' গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলল সর্দার, 'তাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আজ আমরা গর্বিত।'

'আমার একজন গৃহিনী দরকার,' স্যাম বলল 'তোমাদের সমাজে কানেহা নামে যে কুমারী মেয়েটি আছে তাকে আমার ভারি পছন্দ, গৃহিনী করব বলে আমি তাকে নিয়ে যেতে এসেছি, এখন তুমি আর এই বীর যোদ্ধা ভাইয়েরা অনুমতি দিলেই আমার সাধ মেটে।'

অতিথি লালদেড়ে শিকারির আর্জি শুনে নিঃশব্দে স্বস্তির শ্বাস ফেলল সর্দার। তার মেয়েদের মধ্যে কানেহা সবার ছোট, ওপরের বোনেদের মত বাবা মার আদর জোটেনা তার কপালে, বরং কতদিনে তাকে বিদেয় করতে পারবেন দিনরাত তাই ভাবেন তাঁরা। এর একমাত্র কারণ তার চেহারা। শরীরের গড়ন। রেড ইণ্ডিয়ান সমাজে ছোটখাটো গোলগাল মোটাসোটা মেয়েদেরই আদর, তাদের পুরুষেরাও এই ধাঁচের বৌ চায়। কিন্তু কানেহার দৈহিক গড়ন ঠিক ওর উল্টো—মাত্র পনেরো বছর বয়সেই মাথায় সে এত বেড়ে উঠেছে যে অনায়াসে তাকে ঢ্যাঙা বলা যায়। এরওপর তার গড়ন পাতলা ছিপছিপে, সরু কোমর, মা মাসির ভাষায়, বাচ্চা ধরবার মত জায়গা পেটে নেই বললেই চলে। বয়স হওয়া সত্ত্বেও তার বুক এখনও সমতল, একজোড়া বৃন্ত ছাড়া স্তন এখনও গড়ে ওঠেনি সেখানে। কানেহার মুখের গড়নও বড্ড চোয়াড়ে, লম্বাটে মুখে মাংসহীন চোয়াল—এ মুখ দেখলে কারও চোখ জুড়োয়না। যাক, কুশ্রী কানেহাকে পার করার ব্যবস্থা এত দিনে হল, মনে মনে ভাবল সর্দার, একটা আপদ বিদেয় হবে।

'তোমার পছন্দের তারিফ না করে পারছিনা, লালদেড়ে,' মনের ভাব গোপন রেখে স্যামকে বাহবা দিল সর্দার, 'আমার ছোট মেয়ে কানেহা এতদিনে অনেক বড় হয়ে উঠেছে, পেটে বাচ্চা-ধরার মত যুগ্যিও হয়েছে সে। প্রত্যেক পূর্ণিমায় অনেক রক্ত বেরোয় তার তলপেট থেকে।'

স্যাম এবার উঠে দাঁড়াল, পিছিয়ে এসে খচ্চরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। খচ্চরের পিঠের বোঁচকা খুলে দু'বোতল স্কচ হুইস্কি আর একটা ছোট কাঠের বাক্স বের করল। জিনিসগুলো নিয়ে সে ফিরে এল সর্দারের কাছে, তার সামনে মাটিতে সাজিয়ে রেখে আবার বসে পড়ল আগের জায়গায়।

'বীর যোদ্ধা ভাইয়েরা যে সম্মান আমায় দেখিয়েছে তার প্রতিদানে আমিও তাদের জন্য অল্প কিছু উপহার এনেছি।' স্কচ হুইস্কির বোতলগুলো সর্দারের সামনে সাজিয়ে রেখে ছোট কাঠের বাক্সটা খুলল স্যাম। সর্দার আর তার সঙ্গে বাকি সবাই দেখল রং বেরং-এর পুঁতির মালা আর খুচরো গয়না বাক্সের ভেতরে থরেথরে সাজানো।

'লালদেড়ে শিকারির আনা উপহার পেয়ে কিওয়ার বীর যোদ্ধারা সবাই খুশি হয়েছে,'

ঘাড় নেড়ে বলল সর্দার, 'কিন্তু এও ঠিক যে কানেহা বরাবরের মত মরদের সঙ্গে চলে যাবার পরে তার গোষ্ঠীর লোকেদের অনেক কষ্ট সইতে হবে। রান্না, সেলাই ফোঁড়াই, চামড়ার জিনিসপত্র তৈরি, কানেহার অনেক গুণ। তাকে হারালে আমাদের প্রচুর লোকসান হবে।'

'সে লোকসান আমি পূরণ করে দেব,' জোরগলায় বলল স্যাম, 'আমার মালপত্র যে বয়ে এনেছে সেই খচ্চরটা আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। এছাড়া দেব দুটো আস্ত মোষের মাংস। তাছাড়া এটাও দেব,' বলে একটা বড় মোড়ক খুলে ফেলল স্যাম, ভেতর থেকে বেরোল একটা আস্ত সাদা মোষের ছাল, রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে খুবই পবিত্র। সাদা মোষ এমনিতেই দুর্লভ, চামড়ার কারবারী জানে একটা সাদা মোষের চামড়া দশটা সাধারণ কালো মোষের চামড়ার সমান।

একটি মেয়েমানুষ শিকারি স্যাম-এর আজ বড্ড দরকার। গত পাঁচ বছর ধরে চামড়ার কারবার করে মন্দ আয় করেনি সে, কিন্তু যা তার খুব দরকার সেই মেয়েমানুষ একজনও আজও জোগাড় করতে পারেনি সে। বাজারের বেবুশ্যেদের সঙ্গে রাতের পর রাত কাটিয়ে স্যাম ক্লান্ত। না, পারিশ্রমিক ত বটেই, দুনিয়ার ধনদৌলত উজাড় করে দিলেও পুরুষমানুষের সব চাহিদা মেটাতে পারেনা তারা। ওদের অনেক দেখেছে স্যাম, এবার তার নিজের একজন মেয়েমানুষ চাই যে হবে একান্তভাবে তার একার, সেই মেয়েমানুষের ওপর আর কারও অধিকার থাকবেনা।

দুর্লভ সাদা মোষের চামড়া উপহার পেয়ে কানেহার বাবা কিওয়া সর্দারও খুব খুশি। মৃত্যুর পরে ঐ চামড়ায় মুড়ে কবর দেয়া হলে পরলোকের সুরম্য বনভূমিতে অনন্ত কাল শিকার করতে পারবে সে। লালদেড়ের কাছ থেকে যে উপহার সে পেয়েছে তা আশাতীত, এর ওপর বাড়তি কিছু দাবি করবেনা।

'আমার ছোট মেয়ে কানেহাকে খবর দাও,' সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে জোরগলায় ঘোষণা করল, 'কানেহাকে গিয়ে বলো লালদেড়ে ওর বর হয়ে এসেছে। খুব ভাল খাসা বর, এককাঁড়ি উপহার এনেছে। কানেহাকে বলো লালদেড়ে বর এখুনি ওকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে। রওনা হবার আগে কানেহাকে সেজেগুজে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বলো।'

সর্দার কুলপ্রথা অনুযায়ী চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে ঘোষণা করলেও খবরটা কানেহার কানে পৌঁছে দেবার দরকার ছিল না কারণ পাশেই একটা তাঁবুর ভেতরে বসে সব শুনছিল সে। লালদেড়েকে আগেও দেখেছে সে। কখনও ভরদুপুরে তার বাপ যখন কারও সালিশি শুনতে ব্যস্ত সেইসময় তার খাবার নিয়ে গেছে কানেহা, পথে লালদেড়ের মুখোমুখি হয়েছে; হয়ত কোনও দরকারে সেও আসছে তার বাবার কাছে। তাকে দেখে ঘোড়া থামিয়েছে লালদেড়ে, ঠিক তখনই তার চোখে কানেহার চোখ পড়েছে; বাপের বয়সী লালদেড়ের চোখের চাউনিতে অপার ভালবাসার নিশানা চিনতে পনেরো বছরের কানেহার এতটুকু ভুল হয়নি। মুচকি হেসে একপাশে সরে তার ঘোড়াকে এগিয়ে যাবার পথ করে দিয়েছে কানেহা।

'খুব ভাল বর জুটেছে তোর, কানেহা,' বলতে বলতে প্রতিবেশী বৌয়েরা ঢুকল তাঁবুর

ভেতরে। পুঁতির মালা, সাদা মোষের চামড়া, ছ'বোতল স্কচ হুইস্কি দিয়েছে তোর বাবাকে, আর দিয়েছে পুঁতির মালা। সেই সঙ্গে দুটো গোটা মোষের মাংস ভোজের জন্য। খুব ভাল বরাত তোর, দেখে নিস্। এ মরদ ত খুব সুখে রাখবে তোকে, জীবনভর চলবে তোর পায়ে পায়ে দেখে নিস।' তাদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে বেজে উঠল ঢাকের বাজনা। ফুটল আনন্দোৎসবের বোল। কানেহার হাঁটু ছাড়ানো একরাশ লম্বা চুলের দু'টি বিনুনি ঝুলছিল কাঁধের দু'পাশে, বৌগুলো সেই বিনুনি খুলে লম্বা চুল আঁচড়ে দিল যত্ন করে। কানেহাকে নগ্ন করে তার পা থেকে কোমর পর্যন্ত পুরু করে মাখালো ভালুকের চর্বি যা যুবতীদের সন্তানধারণের ক্ষমতা বাড়ায়। কনে সাজানোর কাজটুকু সেরে মেয়েরা বিদায় নিল। এরপরে তাঁবুতে ঢুকল গুণিন দু'হাতে দুটো মাঝারি মানুষের হাড় নিয়ে। একটা হাড় কানেহার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বুলিয়ে সব অশুভ আর দুষ্ট আত্মার কুনজর দূর করল, তাঁবুর চার কোণ নেচে নেচে মন্ত্র পড়ে অশুভশক্তির ক্ষমতা খর্ব করল। তারপর সে হাড় ঝোলায় পুরল গুনিন, দ্বিতীয় হাড়টি কানেহার হাতে তুলে দিল সে। কানেহা সে হাড় শ্রদ্ধাভরে মাথায় ছোঁয়ালো। তারপর কপালে, কানে, নাকে, গালে, ঠোঁটে ছুঁইয়ে নিয়ে এল গলায়, সেখান থেকে বুকের স্তনবৃন্তে। তারপর তলপেট ও জননাঙ্গে সেই হাড় ছোঁয়াল কানেহা। গুনিনের ইশারায় এরপর সেই হাড় নিজের জননাঙ্গে প্রবেশ করাল কানেহা। গুনিন ভারিগলায় মন্ত্র পড়তে শুরু করল, আর প্রায় একইসঙ্গে বাইরে ঢাকের বোল চরমে পৌঁছোল। রক্ত গড়াচ্ছে কানেহার তলপেটের নিচ থেকে, সেই রক্ত দু'পা বেয়ে ঝরে পড়ছে তাঁবুর মাটিতে। গুনিনের মন্ত্র পাঠ শেষ হতে রক্তাক্ত কানেহা নগ্ন দেহে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। বাইরে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিবেশী বৌ মেয়েরা। কানেহার দিকে একপলক তাকিয়ে তারা নিজেরা যে যার বিয়ের স্মৃতি রোমন্থনে মেতে উঠল। সেদিকে কান দিল না কানেহা, কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা সর্দারের তাঁবুতে এসে ঢুকল সে। তার বর লালদেড়ে সেখানে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

'দেখেছো, আমার মেয়ের তলপেট থেকে কত রক্ত ঝরছে?' স্যামের দিকে তাকিয়ে গর্বের সঙ্গে বলল কানেহার বাবা কিওয়া গোষ্ঠীপতি, 'ও তোমার অনেকগুলো ছেলে পেটে ধরবে।'

'ঠিক বলেছো,' সায় দিল লালদেড়ে স্যাম, 'আমার অনেকগুলো ছেলে ও পেটে ধরবে। আমি ওকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি, আর তাই আমার বীর যোদ্ধা ভাইদের ভোজে আরও একটা গোটা মোষের মাংস উপহার দিচ্ছি।'

'দেখেছিস কেমন বর পেয়েছিস, কানেহা?' আহ্লাদ চাপতে না পেরে ছোট মেয়েকে শুধোলো সর্দার, 'কেমন রাজার মত মন, দেখেছিস? যা, মা, তুই এবার নদীতে তাড়াতাড়ি চান সেরে আয়। বেলা থাকতে থাকতে তোদের রওনা করিয়ে দিই।'

খুশি আর লজ্জায় মাথা হেঁট করল কানেহা, নগ্নদেহে তাঁবু থেকে বেরিয়ে সে ছুটে গেল নদীর দিকে। দেবতারা তার প্রার্থনা শুনেছেন, লালদেড়ে তাকে পেয়ে সত্যিই খুশি।

কেবিনের ভেতরে বড় বাক্সটার ওপর বসে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্যাম

ভাবছে মোষের পালের দেখা আর মিলছেনা কেন। ওরা আসছেনা কেন। প্রশ্নের জবাবে কে যেন তার ভেতর থেকে বলে উঠল, ওদের দেখা আর মিলবেনা। গত কয়েক বছরে যখন তখন শিকার করার ফলে বুনো মোষের পাল প্রায় ঝাড়ে বংশে শেষ হয়ে এসেছে।

অনেকক্ষণ পরে মুখ ফেরাল স্যাম, হুকুম করার গলায় বলল, 'মালপত্র সব বেঁধে ফ্যালরে কানেহা, আমরা এখুনি অন্য জায়গায় চলে যাব।'

বেলা পড়ে এসেছে, সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। একটি কথাও না বলে কানেহা গেরস্থালির জিনিসপত্র সব এক এক করে আবার গুছিয়ে নিল। স্যাম বাইরে গিয়ে খচ্চর দুটোকে এনে গাড়িতে জুতল। তারপর ফিরে এল কেবিনে। কানেহা ততক্ষণে তৈরি। কিন্তু প্রথম বোঁচকাটা তুলে এগোতেই শুরু হল প্রসবযন্ত্রনা। কানেহার হাত থেকে বোঁচকা পড়ে গেল, টাল সামালতে না পেরে সে নিজেও পড়ে গেল কাঠের মেঝেতে। মুখ ফুটে কিছু বলল না কানেহা, বড় বড় চোখ মেলে শুধু তাকাল স্যামের পানে।

'কি হল। ব্যথা শুরু হয়েছে?' বলল স্যাম, কানেহার হাবভাব দেখে সন্দেহ উঁকি দিল তার মনে।

মুখে কিছু না বলে শুধু ঘাড় নাড়ল কানেহা।

'এসো, আমার হাত ধরো,' স্যাম হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। ততক্ষণে ব্যথার প্রথম কামড়টুকু দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে, স্যামের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরলনা কানেহা, ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, তোমার মদতের দরকার নেই। আমি কিওয়া সর্দারের মেয়ে। এসব মেয়েদের ব্যাপার, আমাকেই সামলাতে দাও।'

'ঠিক আছে,' কানেহার কথার ওপর আর কিছু বলতে পারলনা স্যাম। 'আমি বাইরে আছি,' বলে পাইপ আর তামাকের থলে নিয়ে কেবিনের দোরগোড়ায় পা ঝুলিয়ে বসল সে। সন্ধে হল, রাতের আঁধারে ঢাকা পড়ল বনানী আর দূরের সারিসারি পাহাড়। খানিক বাদে বনের গাছপালার ভেতর থেকে চাঁদ যেন লাফিয়ে উঠে পড়ল নীলচে আকাশে। স্যামের খিদে নেই, পাইপ টানতে টানতে চাঁদের শোভা দেখতে লাগল বিভোর হয়ে। সময় আপনিই বয়ে চলল।

রাত তখন দুটো কি তিনটে। বসে বসে ঝিমুচ্ছিল স্যাম, আচমকা কেবিনের ভেতরে কোণের দিক থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ কানে যেতে জেগে উঠল সে। চোখ মেলে তাকাতে দেখল অগুণতি নীল হিরের কুচির মত তারায় ভরে উঠেছে রাতের পরিষ্কার আকাশ। খানিক বাদে আবার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে আর বসে থাকতে পারলনা স্যাম, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ভেতরে, সেখানে কয়েক ফালি কাঠ দিয়ে তৈরি খাড়া করা দেয়ালের মত পার্টিশন। সেই দেয়ালের ওপার থেকে বেরিয়ে এল কানেহা, স্যামের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে।

'এই দ্যাখো,' ফায়ারপ্লেসের পাশে পেতে রাখা দলাপাকানো কম্বলখানা দু'হাতে তুলে মরদের সামনে নিয়ে এল কানেহা। গর্বভরা গলায় বলল। 'কেমন ফুটফুটে ছেলে হয়েছে তোমায়, চোখ মেলে দ্যাখো।'

'তাই ত দেখছি,' বলে দু'হাতে পেতে কম্বলের ওপর নরম কাপড়ে শোয়ানো সেই

ধপধপে ফর্সা মাংসপিণ্ডের মুখখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। 'বাবা গো, আবার হাত পা নাড়ছে,' খুশি চাপতে না পেরে বলল স্যাম। 'দ্যাখো ধাটা আমার মত নীল চোখ পেয়েছে।'

'আর আমার মত কুচকুচে কালো চুল,' বলল কানেহা। স্যাম মুখ নামিয়ে শিশুর মুখে দাড়ি দিয়ে সুড়সুড়ি দিতেই তার ছেলে আবার কান্না জুড়ল।

'দাও, আমার কোলে দাও,' বলে হাত বাড়িয়ে ছেলেকে স্যামের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিল কানেহা।

পরদিন সকালেই তারা কেবিন ছেড়ে চলে গেল নতুন আশ্রয়ের খোঁজে।

৩

ডজ সিটির সীমানার প্রায় কুড়ি মাইল দূরে স্যাম তার বৌ আর বাচ্চাকে নিয়ে নতুন ঘর বাঁধল। খচ্চরটানা গাড়ি থাকায় এবার তার রুজিরও হিল্লে হল, স্থানীয় কারবারীদের সব রকম মাল বইবার কাজে গাড়িটা ভাড়ায় খাটাতে লাগল সে।

ছোট দু'ঘরের কেবিনে বাবা মার স্নেহ ভালবাসার বড় হয়ে উঠতে লাগল স্যামের ছেলে ম্যাক্স। ছেলেকে নিয়ে কানেহার খুশির অন্ত নেই। তবু এক্কেক সময় তার মনে হয় দেবতারা তাকে আরও সন্তান দিচ্ছেন না কেন। তবে এনিয়ে কোনও ক্ষোভ নেই তার মনে; রেড ইণ্ডিয়ান বলেই যা পেয়েছে তা নিয়েই তৃপ্ত কানেহা।

স্যামের নিজেরও ধাত অনেকটা সেইরকম, যেটুকু পাচ্ছে তাই সেটুকু নিয়েই সে পরিতৃপ্ত। এমনিতে সে একাচোরা ধাঁচের মানুষ, বছরের পর বছর সমতলে কাটনো সত্ত্বেও তার স্বভাব এতটুকু পাল্টায়নি। চুপচাপ নিজের মধ্যে সবসময় গুটিয়ে থাকার ফলে শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে তার বদমেজাজী হাড়কিপ্টে বলে বদনাম রটেছে। স্যাম একসময় বুনো মোষ শিকার করত তা আজ আর অজানা নয়। ফলে শহরের নিচুতলায় বাসিন্দাদের মধ্যে এই গুজবও ভেসে বেড়াচ্ছে যে গভীর জঙ্গলে মোষ শিকার করতে গিয়ে স্যাম একসময় গুপ্তধন পেয়েছিল—তাল তাল সোনা। সেইসব সোনা জঙ্গল থেকে ও এনে রেখেছে নিজের কেবিনে। এত এত সোনা। কখন কে লুঠে নেবে, কার ভোগে লাগবে, দিনরাত এইসব ভাবনায় মাথা গরম থাকে বলেই কারও সঙ্গে মেলামেশো করেনা স্যাম। ফূর্তিবাজীর ধারেকাছে যায় না। এই কারণেই সে হাড়কিপ্টে আর বদমেজাজী।

শ্বেতাঙ্গ বাপের ছেলে হলেও মায়ের দিক থেকে অনেক রেড ইণ্ডিয়ান বৈশিষ্ট্য পেল ম্যাক্স—মাত্র এগারো বছর বয়সে বুনো হরিণের মত দৌড়োয় সে, রেকাবি ছাড়াই এক লাফে চাপে ঘোড়ার পিঠে, সেখানে বসার জন্য তার জিন্-এর দরকার হয় না। শিকারে হাতে খড়ি দিতে স্যাম তাকে .২২ বোর-এর রাইফেল কিনে দিয়েছে। সেই রাইফেল দিয়ে একশো গজ পাল্লার ভেতর যে কোন লক্ষ্য ভেদ করতে পারে ম্যাক্স। ধপধপে ফর্সা-রং নিয়ে জন্মালেও ম্যাক্সের চামড়া এখন তামাটে হয়েছে, চোখের মণির রং সমুদ্রের মতন নীল। আর রেড ইণ্ডিয়ানদের মতই মাথায় লম্বা চুল রেখেছে সে।

একদিন রাতে খেতে বসে স্যাম ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল। 'উজ সিটিতে নতুন স্কুল তৈরির ফাণ্ডে দশ ডলার চাঁদা দিয়েছি, ম্যাক্স, তোকে ঐ স্কুলে ভর্তি করব।'

'কেন?' বাপের কথা শুনে ঘাবড়ে গেল ম্যাক্স, 'আমার স্কুলে ভর্তি করাবে কেন?'

'তোকে লেখাপড়া শেখাব তাই,' বলল স্যাম।

'লেখাপড়া শিখে কি হবে?' ওজর তুলল ম্যাক্স।

'লেখাপড়া শিখলে অনেক কিছু জানা যায়।'

'তুমিও ত লেখাপড়া কিছুই জানোনা।' বলল ম্যাক্স, 'না শিখেও ত দিব্যি চলছে।'

'দিনকাল বড্ড চটপট পাল্টে যাচ্ছে যে,' বলল স্যাম, 'আমি যখন তোর বয়সী ছিলাম তখন সবকিছু জানার জন্য লেখাপড়া না শিখলেও চলত। কিন্তু এখন দুনিয়ার চেহারাই গেছে পাল্টে গেছে, লেখাপড়া না শিখলে চলবে না।'

'যাও, আমি কিছুতেই স্কুলে যাব না,' ছেলেমানুষী জেদী গলায় বলল ম্যাক্স।

'যাবিনা মানে?' গর্জে উঠল স্যাম, 'স্কুলে তোকে যেতেই হবে। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি। ওলসেনের আস্তাবলের পেছন দিকে তোর থাকার শোবার ব্যবস্থা আমি করে এলাম। আর এখন তুই বলছিস স্কুলে যাবিনা। ওসব বজ্জাতি চলবেনা আগেই সাফ বলে রাখছি!''

''কি হল কি তোমার?'' ব্যাপার না বুঝলেও বাপ আর ছেলের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে তা আঁচ করে কিওয়া ভাষায় জানতে চাইল কানেহা।

'হবে আবার কি,' বৌয়ের বাপের বাড়ির ভাষাতেই জবাব দিল স্যাম। 'তোমার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করছি, এদিকে ও বলছে স্কুলে যাবে না।'

'স্কুল!' অবাক চোখে একবার ছেলে। আর একবার স্বামির মুখের দিকে তাকাল কানেহা।

'সেখানে কি হয়?'

'সেখানে ভর্তি হলে অনেক কিছু শেখা যায়, অনেক জ্ঞান হয়,' সংক্ষেপে বলল স্যাম।

'তাহলে তোমার ছেলে স্কুলে যাবে,' রান্নার জোগাড় করতে করতে বলল কানেহা, 'আমি বলছি তোমার ছেলে ঠিক স্কুলে ভর্তি হবে। ও যেতে না চাইলে তুমি ঘাড় ধরে ওকে নিয়ে যাবে, আমি কিছু বলব না।'

মাকেও বাবার কথায় সায় দিতে দেখে চুপ করে গেল ম্যাক্স। পরের সোমবারেই ম্যাক্সকে ভাল জামাকাপড় পরিয়ে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে এল স্যাম। স্কুলের প্রিন্সিপাল মহিলার বাড়ি দক্ষিণ আমেরিকায়, দেখলে মনে হয় হাড় আর চামড়া ছাড়া একটুকরো মাংস গায়ে নেই, নেই রক্তের ছিটেফোঁটাও।

'গুড মর্ণিং, মিঃ স্যাণ্ড,' হাসিমুখে মহিলা স্যামকে অভিবাদন জানালেন।

'গুড মর্ণিং ম্যাডাম,' স্যাম বলল, 'আপনার স্কুলে ভর্তি করব বলে ছেলেকে নিয়ে এলাম।'

'ছেলে?' মহিলা অবাক হয়ে স্যামের চারপাশে তাকালেন, স্যাম ছেলেকে আলতো খোঁচা মেরে চাপাগলায় বলল, 'চুপ করে না থেকে বলো, ভাল আছেন ম্যাডাম?'

'এই যে আমি, ম্যাডাম,' বুক ফুলিয়ে বলল ম্যাক্স, 'ভাল আছেন ত?'

এতক্ষণে তার দিকে মহিলার নজর পড়ল, অবাক চোখে যে তাকে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে বললেন, 'ও মা ছেলে কোথায়? এত দেখছি রেড ইণ্ডিয়ান! এই বুঝি আপনার ছেলে?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম,' স্যাম স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ওর মা রেড ইণ্ডিয়ান।'

'কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে ত আমরা ভর্তি করিনা। মহিলা তড়বড় করে বললেন, 'আমার স্কুলে শুধু সাদা চামড়ার ছেলেমেয়েরাই পড়ে।'

মহিলা পেছন ফিরতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই স্যাম থমথমে গলায় হেঁকে উঠল, 'থামুন! থামুন বলছি!' মহিলা ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়াতে স্যাম বলতে লাগল।

'শুনুন ম্যাডাম। আপনাদের ধর্মে সাদা চামড়া আর রেড ইণ্ডিয়ানদের তামাটে চামড়া নিয়ে কি লেখা আছে আমি জানিনা। জানার ইচ্ছেও নেই। ধর্মের ব্যাপার স্যাপার আপনি নিজে কতটা মানেন তা জানার ইচ্ছে মাত্র আমার নেই। আপনার নিজের দেশ কোন মুলুকে? চেহারা দেখে ত মনে হচ্ছে ভার্জিনিয়ায়। ভার্জিনিয়া জায়গাটা কিন্তু এখান থেকে দু'হাজার মাইল দূরে; তারওপর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য স্কুল করবেন বলে এই সেদিন আপনি বাজারে মিটিং করেছেন, প্রত্যেক দোকানদারের মত এই বাবদ দশ ডলার আমার কাছ থেকেও আদায় করেছেন। বাজারে যে মিটিং করেছিলেন সেখানে একবারও বলেননি রেড ইণ্ডিয়ান মায়ের ছেলেরা আপনার স্কুলে ভর্তি হতে পারবেনা। বললে আমি দশ ডলার চাঁদা কখনোই দিতাম না। শুনুন ম্যাডাম, ভালো চান ত আমার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে নিন, নয়ত পরের গাড়ি ধরে এখান থেকে কেটে পড়ুন। আমায় চটিয়ে আপনি স্কুলের কারবার চালাতে পারবেন না আগেই বলে রাখছি।'

'বটে?' প্রতিবাদ করলেন প্রিন্সিপাল, 'এত বড় কথা? জানেন, আপনার ছেলেকে ভর্তি করলে আর সব বাবা মায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এই স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে নিতে পারেন?

'যাদের নিয়ে ভয় পাচ্ছেন,' স্যাম বলল, 'সেই বাবাদের সবারই দোকান আছে আমার দোকানের আশেপাশে। আমার স্ত্রী যে রেড ইণ্ডিয়ান তা ওদের কারও অজানা নয়। সেদিন বাজারে যখন মিটিং করেছিলেন তখন ওদের একজনও কিন্তু আমার ছেলের জাতের কথা তুলে আপত্তি তোলেনি।'

'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন তখন আপনার ছেলেকেও আমি স্কুলে ভর্তি করে নিচ্ছি,' হালে পানি না পেয়ে বললেন মহিলা, 'তবে ওকে একটু ভদ্রলোকের মত তৈরি করে নিয়ে আসুন। এত লম্বা চুল, জন্মের পরে এই চুলে কাঁচি পড়েছে বলে ত মনে হচ্ছে না। চুল ছাঁটিয়ে ভদ্র সমাজের ছেলেমেয়েদের মত জামাকাপড় পরিয়ে নিয়ে আসুন ওকে আজই ভর্তি করে নিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ। ম্যাডাম,' মাথা অল্প ঝুঁকিয়ে ছেলেকে তখনই বাজারে নিয়ে এল স্যাম, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল ছাঁটিয়ে সাদা চামড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের পছন্দসই শার্ট, শর্টস, জ্যাকেট, ট্রাউজার্স, জুতো আর মোজা ছেলের মাপ মতন কিনে দিল স্যাম। নিজের দোকানে নিয়ে

গিয়ে নতুন সাজে ছেলেকে সাজানোর পরে সে বলে উঠল, 'বাবা, এবার কি আমার আর সবার চেয়ে আলাদা দেখাচ্ছে?'

'হ্যাঁ বাবা,' ছেলের কথা শুনে কেন জানি স্যামের বুকের ভেতরটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল, ম্যাক্সের মুখখানা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল 'তুমি আর সবার চেয়ে একশোবার আলাদা। এই দুনিয়ায় সবাই সবার চেয়ে আলাদা। মানুষ ত বটেই। এমন কি আমার ঘোড়া আর খচ্চরগুলো পর্যন্ত, কেউ কারও মত নয়। জঙ্গলের বুনো মোষগুলোও নয়। সবাই সবার মত একরকম হয়েও সবাই সবার চেয়ে আলাদা ম্যাক্স।'

ম্যাক্স সেদিনই স্কুলে ভর্তি হল, বাবা মাকে ছেড়ে অনেকদূরের ওলসেনের আস্তাবলে সহিসরা যেখানে থাকে তার পেছনের একটা খুপরি হল তার নতুন আস্তানা। মন দিয়ে লেখাপড়া করার দরুন স্কুলের প্রিন্সিপালের সুনজরে পড়ল ম্যাক্স, রেড ইণ্ডিয়ান বংশোদ্ভুত বলে যিনি একদিন ঘেন্নায় তাকে স্কুলে ভর্তি করতে চাননি ম্যাক্সের পরীক্ষার ফল আর লেখাপড়ার আগ্রহ দেখে তিনিই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

গরমের ছুটিতে ম্যাক্স তার জামাকাপড় আর বইপত্র ঝোলায় পুরে বাড়ি এল। শীতের সময় তুষার পড়ে তাদের বাড়ির যা ক্ষতি হয়েছে, ছুটির গোড়ার দিনটা বাবার সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে সেগুলো সারাল সে। ছেলেকে সকাল সকাল খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে স্যাম তার ঘোড়ার জিন সারাতে বসল।

ম্যাক্স-এর মা কানেহা তফাতে বসে একমনে তার কাজ দেখছিল হঠাৎ ইংরেজিতে মরদের নাম ধরে ডাকল সে 'স্যাম' বলে।

গিন্নির মুখে নিজের নাম শুনে চমকে উঠল স্যাম। কানেহা জীবনে এই প্রথম তার নাম ধরে ডাকল। রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েরা না ডাকলে কখনও তাদের মরদের সঙ্গে কথা বলে না। মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে বলল কানেহা, 'আমাদের ছেলের মুখে শুনলাম ও নাকি স্কুলে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া শিখছে, ফলও খুব ভাল করছে। সত্যি?'

'সত্যি,' অবাক চোখে কানেহার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জবাব দিল স্যাম, 'ছেলে সত্যিকথাই বলেছে।'

'ছেলের জন্য গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে,' বলল কানেহা। 'তার বাপের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভাবিয়ে তুলেছে।'

'আবার কি হল?' জানতে চাইল স্যাম।

'ছেলের মুখে শুনলাম সাদা চামড়ার কিছু ছেলে ওকে বলেছে ওর রক্ত নাকি ওদের মত লাল নয়।'

'যারা এসব বলে তারা তোমার ম্যাক্সের মতই ছেলেমানুষ। কানেহা,' বলল স্যাম 'এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়োনা, ম্যাক্সকেও মাথা ঘামাতে মানা কোর।'

কানেহার গাল আলতো হাতে ছুঁল স্যাম, কানেহা সেই হাতে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি বলি কি স্কুলের ছুটির মধ্যে ম্যাক্সকে একবার ওর দাদামশাইয়ের তাঁবু দেখিয়ে আনলে কেমন হয়? যে রক্তের ধারা বইছে ওর শরীরে সেই রক্তের আদি অন্ত এসবও ত ওর শেখা দরকার।'

জবাব না দিয়ে কানেহার চোখের পানে তাকাল স্যাম, মনে হল কানেহা ভাল পরামর্শই দিয়েছে। গরমের ছুটির কয়েকটা দিন দাদামশাইয়ের তাঁবুতে কাটালে ধূর্ত শেয়ালদের ভিড়ে পরিপূর্ণ বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় কিভাবে লড়াই করে টিকে থাকতে হয় তা তার ভালই শেখা হবে।

'ঠিকই বলেছো তুমি।' বলল স্যাম, 'গরমের ছুটি থাকতে থাকতেই ওকে আমি নিয়ে যাব ওর দাদামশাই আর আমার বীর যোদ্ধা ভাইদের কাছে।'

স্যাম জানে তার বয়স এখন পুরো চুয়ান্ন, কানেহার এখনও ত্রিশ পেরোয়নি। বিয়ের আগে যেমন ছিল কানেহা এখনও তেমনই পাতলা, ছিপছিপে, সঠাম গড়ন। আর সব রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মত যৌবনে মুটিয়ে যায়নি। বহুবছর পরে বুকের ভেতর কলজের অশান্তি ধুকপুকুনি আবার অনুভব করল স্যাম, কানেহাকে নিবিড়ভাবে কাছে পেতে রক্তস্রোত উদ্বেল হয়ে উঠছে। কানেহার কালো চুলে হত বুলিয়ে দিতে দিতে তাঁর মুখখানা তুলে ধরল স্যাম। মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'কানেহা, আমার সোনা মেয়ে, তোমায় আমি ভালবাসি।'

কানেহার হরিণের মত গভীর কালো চোখ জলে ভরে উঠল, নিবিড় গলায় বলল, 'আমিও তোমাকে ভালবাসি আমার সোনা বর। আমার মনের মত মরদ।'

জীবনে এই প্রথমবার কানেহার ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমু খেল স্যাম।

৪

দেখতে দেখতে তিনটি বছর এইভাবে কেটে গেল। এক শনিবার দুপুরবেলা। ওলসেন-এর আস্তাবলের পেছনে গাড়িবোঝাই খড়ে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাক্স, বেলচায় খড় নিয়ে তুলে রাখছে ওপরের বিশাল চওড়া তাকে। ম্যাক্সের পড়নে শুধু হরিণের চামড়ার ব্রিচেস, প্রখর সূর্যের তাপে তার চামড়ার রং পোড়া কালচে তামাটে হয়ে গেছে। বেলচা ডুবিয়ে খড় তোলার সময় ঢেউ-এর মত ফুলে উঠছে পিঠের পেশি। ঘোড়ার খুরের খপ্‌খপ্ আওয়াজ কানে আসতে হাতের কাজ না থামিয়ে কান খাড়া করল ম্যাক্স; খানিক বাদে ঘোড়ায় চেপে তিনজন অচেনা লোক এসে নামল খড়বোঝাই গাড়ির কাছে। ঘোড়ার পিঠে বসে তারা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তাকে।

এরকম কত লোক আসাযাওয়া করে তাই তাদের পাত্তা দিলনা ম্যাক্স। একমনে ঘোড়ার খোরাকি খড় গাড়ি থেকে বেলচায় তুলতে লাগল সে।

'অ্যাই ইনজান্ (রেড ইণ্ডিয়ানের অপভ্রংশ), স্যাণ্ডের ছোঁড়াটা গেল কোথায়?'

'এই যে হেথায়,' বেলচা বোঝাই খড় তাকে তুলে বেলচার হাতলে ভর দিয়ে তাদের দিকে তাকাল ম্যাক্স, 'আমারই নাম ম্যাক্স স্যাণ্ড।'

'তোমায় নয় হে,' একে অপরের দিকে তাকিয়ে চোখের চাউনির নীরব ভাষায় কি যেন বলাবলি করল।

'তোমার বাবাকে দরকার।'

জবাব না দিয়ে ম্যাক্স তাদের মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখল। তার গভীর নীল চোখের চাউনির অর্থ আঁচ করতে পারলনা তারা।

'তোমার বাবা ত মাল বইবার জন্য গাড়ি ভাড়া দেন,' প্রথম যে লোকটি কথা বলেছিল সেই বলল, 'কিন্তু স্টেজলাইনে গিয়ে দেখি ঝাঁপ বন্ধ, ধারেকাছে একটি লোকও নেই।'

'থাকবে কি করে?' বলল ম্যাক্স, 'আজ শনিবার, কাজকর্ম চুকিয়ে বাবা ঝাঁপ বন্ধ করে দুপুরেই বাড়ি চলে গেছে, পরশু সোমবারের আগে ঝাঁপ আর খুলবেনা।'

'এক গাড়ি মাল আছে আমাদের সঙ্গে,' দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'যেতে হবে অনেকদূরে সেই ভার্জিনিয়া সিটি, আমাদের একটু তাড়া আছে। তোমার বাবার সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে বোঝাতাম কেন এত তাড়াহুড়ো করছি।

'বাবার সঙ্গে দেখা করতে হলে আপনাদের বসে থাকতে হবে', আরেক আঁটি খড় বেলচায় তুলল ম্যাকস, 'আমার এদিকের কাজকর্ম সারতে সারতে সূয্যি ডুবে আঁধার হয়ে যাবে, আমিই তখন না হয় আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব বাবার কাছে।'

'সে ত অনেক সময়ের ব্যাপার।' প্রথম লোকটি এতক্ষণ বাদে আবার মুখ খুলল, 'আমরা কারবারী লোক সন্ধের আগেই এখান থেকে আমাদের রওনা হতে হবে। তোমার হাত খালি হওয়া তক বসে থাকা আমাদের চলবেনা। তার চেয়ে এক কাজ করো। তোমাদের আস্তানার হদিশ দাও। আমরাই গিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে যা বলার বলছি।'

খড়ের আঁটি তোলা নামিয়ে মুখ ফেরাল ম্যাক্স, তিনজনের মুখ এক এক করে খুঁটিয়ে দেখল। তিনজনেরই মাথায় চওড়া কানাত দেয়া টুপি থাকায় পুরো মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছেনা। তিনজনেরই কোমরের নিচে হাঁটুর কিছু ওপর ঝুলছে রিভলভার সমেত চামড়ার খাপ। খনি মজুর বা তার বাবা স্যাম যাদের মালপত্র রোজ বয়ে নিয়ে যায় তাদের মত নয়, তিনটে লোককে দেখে নেহাত গুণ্ডা বদমাস ছাড়া আর কিছু বলে মনে হচ্ছে না।

'আমার আর ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে আমার হাত খালি হয়ে যাবে,' বলল ম্যাক্স, 'তখন আমি তোমাদের বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারব।' 'আরও দু'ঘন্টা', প্রথম লোকটা খিকখিক করে হেসে বলল, 'তুমি হাসালে। একবার ত বললাম বাপু আমাদের বড্ড তাড়া, হাতে এতটুকু সময় নেই। তোমার বাবা যেতে না চাইলে আমরা আর কাউকে ভাড়া করব। গাড়ি ভাড়া দেবার লোকের ত অভাব নেই। তবে অন্য লোক ভাড়া নিয়েছি শুনলে কিন্তু তোমার বাবা খুব খুশি হবে না তা আগেই বলে রাখছি। তাই আবার বলছি, তোমাদের আস্তানা কোনদিকে বলে দাও, আমরা তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে যা বলার বলে নিচ্ছি। তুমি শুধু পথের হদিশটা বলে দাও।'

'উত্তরের পথ ধরে কুড়ি মাইল গেলেই বনের মুখে কেবিন দেখবেন,' ম্যাকস বলল, 'ওটাই আমাদের আস্তানা'।

তিনজনে আর দাঁড়াল না। ম্যাক্সের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছুটল উত্তরদিকে, যাবার আগে ম্যাক্সকে একটা ধন্যবাদও দিলনা। 'একটা রেড ইণ্ডিয়ান মাগীর ভাতার হয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মাটিতে পুঁতে স্যাম বুড়োর দিন ভালই কাটছে,

কি বলো?' দূর থেকে অস্পষ্ট কথার টুকরো ভেসে এল হাওয়ায়। কথাগুলো শুনে চাপা আক্রোশে দাঁতে দাঁত পিষল ম্যাক্স, আপনমনে খড়ের আঁটি তুলতে লাগল সে।

প্রত্যেক শনিবার বিকেলে স্কুল ছুটি হলে ঘোড়ায় চেপে বাড়ি ফেরে ম্যাক্স।

সেদিনও তাই ছেলের অপেক্ষায় বসে আছে কানেহা। আওয়াজ তার কানে এল ঠিকই তবে একটা নয়। অনেকগুলো ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজ হতে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিতে চমকে উঠল কানেহা দেখল ম্যাক্স নয়। তিনটে ঘোড়ার পিঠে তিনটে অচেনা লোক বসে। তাদের মাথায় চওড়া কানাত দেয়া টুপি আর কোমরে খাপে আঁটা রিভলভার। চাউনি দেখে লোকগুলোকে তার খুব ভাল মনে হলনা। দরজায় পাল্লা এঁটে ভেতর থেকে হুড়কো এঁটে দৌড়ে গেল কানেহা তার মরদের কাছে, ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলল, তিনজন অচেনা লোক এসেছে। ম্যাক্স উঠে এসে দরজা অল্প ফাঁক করে দেখল তাদের।

'দোর বন্ধ করে রাখো,' পেছন থেকে বলে উঠল কানেহা, 'আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে ওরা বাজে লোক, খারাপ লোক। ঠিক আমাদের জাতের 'আপাশে' ইণ্ডিয়ানদের মত খুনোখুনি ছাড়া যারা কিছুই বোঝেনা। ওদের ভেতরে ঢুকতে দিওনা।'

'দিনরাত ঘরে বসে থাকতে থাকতে তোমার এই রোগ ধরেছে, জোর গলায় হেসে উঠল স্যাম। এখন অচেনা মুখ দেখলেই সন্দেহ করো। ওরা নিশ্চয়ই শহরে যাবার জন্য গাড়ি খুঁজছে। তাই এসেছে আমার কাছে।'

'কিন্তু ওরা ত শহরের দিক থেকেই এসেছে মনে হচ্ছে,' বলল কানেহা। কিন্তু সেকথা কানে না তুলে স্যাম এগিয়ে এসে দোর খুলে দিল।

'তুমিই স্যাম স্যাণ্ড?' জানতে চাইল তাদের একজন।

ঘাড় নাড়ল স্যাম, 'ঠিক ধরেছেন। বলুন আপনাদের কি সেবায় লাগতে পারি?'

'আমরা যাব ভার্জিনিয়া সিটি,' লোকটি বলল, 'সঙ্গে এক গাড়ি বোঝাই মালপত্র আছে।' জামার হাতায় মুখ মুছে বলল সে, 'আজ বিশ্রি গরমও পড়েছে!'

'সেত বটেই। আসুন আগে ভেতরে এসে জিরিয়ে নিন, ঠাণ্ডা হোন,' অভ্যর্থনার গলায় বলল স্যাম, 'তারপর কাজের কথা হবে।'

শুনেই ঘোড়া থেকে নেমে অচেনা লোক তিনটে ঢুকল কেবিনে। 'হুইস্কি আর চারটে গেলাস নিয়ে এসো।' কানেহার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল স্যাম। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনারা বসুন, বলুন ত। কি মাল নিয়ে যেতে হবে?'

'সোনা, তাল তাল সোনা।'

'সোনা?' চমকে উঠল স্যাম, 'কিন্তু গাড়ি বোঝাই হবার মত সোনা পাবেন কোথায়?' অবাক গলায় শুধোল স্যাম, 'এত সোনা কোথাও আছে বলে ত আমার জানা নেই।'

'ওসব আমরা শুনতে চাইনা,' বলতে বলতে তিনজনেই খাপ থেকে রিভলভার বের করে তাক করল স্যামের দিকে, নিষ্ঠুর গলায় বলল, 'আমাদের কাছে পাকা খবর আছে

এক ওয়াগান বোঝাই সোনা আছে তোমার হেপাজতে। জানের মায়া এতটুকু থাকলে সেই সোনা এখুনি বের করে দাও। নয়ত মরো।'

'বন্দুক খাপে গুঁজে কথা বলুন' নিজেকে যতদূর সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল স্যাম, 'যা শুনেছেন সব বাজে গালগপ্পো। ওয়াগান বোঝাই সোনা থাকলে বুনো মোষ মেরে আর দিনরাত মালগাড়ি চালিয়ে এত কষ্ট করতে যাব কেন তা একবার ভেবেছেন?'

'ফের গুল দিচ্ছো?' বলতে বলতে তাদের একজন এগিয়ে এল, হাতের মুঠোয় ধরা রিভলভারের নল দিয়ে থাপ্পর মারার মত এক ঘা কষাল স্যামের মুখে। স্যাম এই আঘাতের জন্য তৈরি ছিল না। টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল সে। পড়ে গিয়ে ওঠার চেষ্টা করল না স্যাম, অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল লোকগুলোর দিকে। রিভলভারের লোহার নলের আঘাতে তার মুখের চামড়া কেটে গেছে, রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে।

'প্রাণে বাঁচতে চাইলে এখনও বলে ফ্যাল্ সোনা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস।' বলতে বলতে লোকটা নিচু হয়ে রিভলভারের নল দিয়ে খোঁচা মারল স্যামের নাকে, নয়ত এরপরে তোকে আর তোর ঐ রেডইণ্ডিয়ান মাগিটাকে গুলি ফুঁড়ে শিক কাবাব বানিয়ে ছাড়ব।'

আহত স্যামের তখন আর প্রতিবাদ করার মত অবস্থা নেই, আগুন হানা চাউনি মেলে সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তিন মূর্তিমান শয়তানের দিকে।

কেবিনের ভেতরের হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে, সেই হাওয়ায় তিষ্ঠোনো যাচ্ছে না। চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে কেবিনের মাঝখানে ছাদের সঙ্গে ঠেস দেয়া মজবুত কাঠের খুঁটির সঙ্গে স্যামকে দাঁড় করিয়ে কষে বাঁধল তারা। রিভলভারের নলের এক ঘায়ে প্রৌঢ় স্যামের নাকের হাড় গেছে ভেঙ্গে, কপালের ক্ষতস্থান আর নাক থেকে রক্ত পড়ছে দরদর করে। রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে তার দাড়িতে, বুকভর্তি লোমের ঘন জঙ্গলে। স্যামের মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর, চোখ মেলে তাকানোর ক্ষমতা এইমুহূর্তে তার নেই। কিছু তফাতে চেয়ারের পায়ার সঙ্গে দুষমনেরা কানেহাকে বেঁধেছে। একদৃষ্টে আহত স্বামির অসহায় মুখের দিকে সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে আছে কানেহা। পেছনে চেয়ারে বসে তিন শয়তানের চাপাগলায় কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছে কানেহা কিন্তু বাঁধন মজবুত হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকাতে পারছেনা সে।

'আমার মনে হচ্ছে স্যাণ্ড সত্যি কথাই বলছে,' দুষমনদের একজন বলে উঠল 'হয়ত সত্যিই ওর কাছে সোনা নেই।'

'সোনা ঠিকই আছে,' প্রথম যে লোকটা স্যামের গায়ে হাত তুলেছিল সে বলল, 'আসলে ব্যাটা বড্ড একগুঁয়ে। ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। ওর মত যারা বুনো মোষ শিকার করে বেড়ায় তাদের রগ আশ্চর্য তোমার চেয়ে বেশি চিনি।'

'কিন্তু এভাবে ওর মুখ থেকে একটা কথাও তুমি আদায় করতে পারবেনা।' বেঁটে লোকটা বলল, 'তার চেয়ে ব্যাটাকে আর ওর মাগিটাকে আগে খতম করো। তারপরে চলো আমরাই খুঁজে দেখি সোনার হদিশ মেলে কিনা।'

'যা করছি ঠিকই করছি,' প্রথম লোকটা জবাব দিল 'সোনা কোথায় আছে তা ওর মুখ থেকেই শুনব।' বলে চারপাশে একপলক তাকিয়ে লোকটা এসে দাঁড়াল রান্নার জায়গায়। চিমটে দিয়ে উনুন থেকে একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা তুলে ফিরে এল সে, স্যামের সামনে চিমটেটা এনে চাপা গলায় বলে উঠল, 'সোনা কোথায় এখনও বলো। নইলে....'

স্যামের বোঁজা চোখ দুটো খুলে গেল, যন্ত্রণাকাতর গলায় জবাব দিল, 'সোনা আমার কাছে নেই, কোনও দিনও ছিলনা, ভগবানের দোহাই। আমার কাছে থাকলে আরও আগেই তার হদিশ দিতাম।'

'ফের মিছে কথা। মজাটা দ্যাখ তাহলে।' বলে চিমটেয় ধরা জ্বলন্ত কয়লার টুকরোটা সে চেপে ধরল স্যামের ঘাড়ে।

অসহ্য যন্ত্রণায় বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল স্যাম, ঘাড়ের চামড়া, মাংস পুড়ে দলা পাকিয়ে গেল। চামড়াপোড়া দুর্গন্ধে ঘর ভরে উঠল।

'সোনা নেই রে শয়তানের দল।' গুঙিয়ে উঠল স্যাম, 'আবার বলছি একটুকরো সোনাও আমার কাছে নেই।'

চিমটেয় ধরা জ্বলন্ত ময়লায় টুকরোটা ফেলে দিয়ে লোকটা কয়েক পা পিছিয়ে এল। টেবিলে রাখা হুইস্কির বোতল খুলে নিট কয়েক ঢোঁক গলায় ঢেলে এগিয়ে গেল ভেতর দিকে, এক বালতি জল এনে ঢেলে দিল স্যামের মাথায়।

'এবার হতচ্ছাড়া মাগিটাকে ঠেসে ধর।' প্রথম লোকটির সঙ্গী দু'জন একসঙ্গে বলে উঠল 'মাগি রেডইণ্ডিয়ান, অসভ্য। ব্যাটার সামনে মাগিটাকে চেপে ধরে ছালচামড়া ছাড়িয়ে দে।'

প্রস্তাবটা প্রথম লোকটার মনে ধরল। কোমরের বেল্টে আঁটা শিকারীর ছুরি বা হান্টিং নাইফ খুলে সে কানেহার বাঁধন কেটে দিল। ধমকে বলল, 'ওঠ মাগি, জংলি বুনো, অসভ্য। উঠে দাঁড়া বলছি।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল কানেহা। লোকটা এবার পেছন থেকে ছুরি দিয়ে তার কোমরের বাঁধন কেটে ফেলতে ঘাঘরা খসে পড়ল।.

এই মুহূর্তে কানেহা সম্পূর্ণ উলঙ্গ, একটুকরো সুতোর আবরণও নেই তার দেহে। বাঁ হাতের মুঠোয় কানেহার চুল খামচে ধরল সে, ডান হাতের ছুরির ফলা চেপে ধরল পিঠে, তারপর কানেহা আঁচ করার আগেই বাঁ হাঁটু মুড়ে মারল এক গুঁতো কোমরে। কানেহা ব্যথায় অস্ফুট আর্তনাদ করতেই ধমকে উঠল সে 'চোপ্। এগো। এগিয়ে চল্। রেড ইণ্ডিয়ান খানকি। সাদা মানুষকে বশ করে ঘর বাঁধা হয়েছে। তোর ঘর বাঁধা বের করছি। চল্। এগিয়ে যা।' বলতে না বলতে কোমরে আবার হাঁটুর গুঁতো।

দাঁতে দাঁত টিপে যন্ত্রণাটা সয়ে গেল কানেহা আর কোনও যন্ত্রণাকাতর শব্দ করলনা সে। চুলের মুঠি ধরে ঠেলতে ঠেলতে হতভাগিনী কানেহাকে বাকি দুই সঙ্গির সামনে এনে দাঁড় করাল শয়তানটা। বুক ফুলিয়ে বলল, বছর পনেরো আগে এক শুয়োরের বাচ্চা রেডইণ্ডিয়ানের গায়ের ছালচামড়া আস্ত ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম। কাজটা খুব সোজা। ঠিক জানোয়ারের ছাল ছাড়ানোর মত। কিভাবে কাজটা করতে হয় মন দিয়ে দেখো।'

বলতে বলতে কানেহার পেছন থেকে সামনে চলে এল সে। চিবুকের নিচে গলা থেকে ছুরি দিয়ে যৌনাঙ্গ পর্যন্ত চামড়া লম্বালম্বি চিরে ফেলল।

'ছেড়ে দে ওকে! ওকে ছেড়ে দে সাত বাপের ব্যাটা! আবার বলছি আমার কাছে এক টুকরো সোনা নেই!' কানেহার অবস্থা দেখে নিজের যন্ত্রনা ভুলে চেঁচিয়ে উঠল স্যাম।

'ভয় পেয়োনা মরদ আমার!' রক্তঝরা দেহের তীব্র যন্ত্রণা উপেক্ষা করে বলে উঠল কানেহা। হাত বাড়াতে মরদের মুখের নাগাল পেল সে। 'আমার পূর্বপুরুষের আত্মারা সব দেখছেন, তাঁদের আক্রোশ থেকে এরা মোটেও পার পাবে না।'

'আমার চোখের সামনে এরা তোমায় এত কষ্ট দিচ্ছে,' অসহায়ভাবে কাঁদতে কাঁদতে কিওয়া ভাষায় আক্ষেপ করল স্যাম, 'বেঁচে থেকেও কিছু করতে পারছিনা।'

'শুয়োরের বাচ্চার তেল এখনও মজেনি দেখছি!' ছুরি হাতে লোকটা জুতো পরা পায়ে এক লাথি মারল স্যামের মুখে, 'এবার ওর সামনে ওর মাগিটাকে নিয়ে একটু খেলাধূলো করা যাক। অ্যাই, মাগিকে উপুর করে মেঝেতে শুইয়ে দে, তারপর ওর হাতদুটো টেবলের পায়ার সঙ্গে কষকষিয়ে বেঁধে ফ্যাল!' বলতে বলতে কোমরে আঁটা রিভলভারের খাপসমেত বেল্ট খুলে ফেলল সে, সঙ্গি দু'জনের উদ্দেশে বলল, 'আগে আমি, তারপর তোড়া যা খেলাধূলো করার করবি। ওকি, মাগিটা দাপাচ্ছে দেখছিসনা! হারামজাদীর পা দুটো খুব জোরে দু'পাশে টেনে ধর্! তোদের হয়ে গেলে মাগির ছাল চামড়া আস্ত ছাড়িয়ে দেব। অপদার্থ মরদটা বসে বসে দেখুক আর ভেউ ভেউ করে কাঁদুক। ওর হিসেব হবে একদম শেষে! 'কথা শেষ করে কানেহার পেছনে এসে দাঁড়াল শয়তান।

ওলসেনের ঘোড়ার পিঠে চেপে ম্যাক্স যখন এল তখন সন্ধে।

সূর্য অনেকক্ষণ আগে ডুবলেও চারপাশে আঁধার নামেনি। ওলসেনের ঘোড়ায় চেপে ম্যাক্স যখন এল তখন প্রায় সাতটা। ঘোড়ার পিঠে বসে কেবিনের দিকে তাকাতে চমকে উঠল সে। আর সব দিনে এমনি সময় কেবিনের ভেতর থেকে ঘর গেরস্থালির নানারকম আওয়াজ কানে আসে, বাবা বাড়ি থাকলে মার সঙ্গে তার চড়াগলায় কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু আজ সেসব কিছুই কানে আসছেনা। সব কেমন যেন থমথম করছে। চিমনির দিকে চোখ পড়তে আরও চমকে গেল ম্যাক্স—রোজের মত পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছেনা কেন? মা কি এখনও উনুন ধরায়নি? একটা অদেখা অজানা ভয় চারপাশ থেকে যেন গিলে খেতে আসছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে একলাফে নেমে পড়ল ম্যাক্স, লাগামটা কাছের একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সামনের দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল ম্যাক্স। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছেনা। মোমবাতি, ল্যাম্প কিছুই জ্বলছেনা টেবলের ওপর। রক্তিম গোধূলির আলো আঁধারিতে ম্যাক্স দেখল কেবিনের মাঝখান ছাদের সঙ্গে ঠেশ দেয়া বড় খুঁটিতে বাঁধা তার বাবা স্যামের দেহটা একপাশে এলিয়ে পড়েছে। দেশলাই জ্বেলে ল্যাম্প ধরালো ম্যাক্স। তার আলোয় দেখল বাবার দেহে প্রাণ নেই। মাথার পেছনদিকটা ফেটে উড়ে গেছে। স্যামের মুখের ভেতর বন্দুকের নল

গুঁজে কেউ গুলি ছুঁড়েছে বুঝতে তার বাকি রইলনা। স্যামের নিষ্প্রাণ চোখদুটো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তার মুখের দিকে, সে চাউনির অর্থ বুঝতে পারলনা ম্যাক্স।

মুখ ফিরিয়ে পাশে তাকাতে ম্যাক্স দেখল রক্তমাখা তালগোল পাকানো একরাশ মাংসপিণ্ড পড়ে আছে মেঝেতে। সেটা যে তার মা কানেহার মৃতদেহ অনেক কষ্টে তা বুঝল ম্যাক্স কারণ লম্বা একঢাল কালো চুল ছাড়া সেই মাংসপিণ্ডের মধ্যে সনাক্ত করার মত আর কিছু তার চোখে পড়লনা।

সব হারানোর দুঃখকে ছাপিয়ে উঠল ভয়, সীমাহীন আতংক। সেই আতংকে ম্যাক্স অনুভব করল তার সর্বাঙ্গ অসাড় করে তুলছে। ঠিক তখনই চেতনা যেন নতুন করে জাগিয়ে তুলল তার সত্ত্বাকে, ম্যাক্স দেখল সে ভয়ে জ্ঞান হারায়নি। সর্বাঙ্গ অসাড়ও হয়নি, দিব্যি খাড়া আছে। বন্যার মত কান্নার বেগ বুকের ভেতর থেকে উঠে এসে আটকে গেল গলার শ্বাসনালির কাছে। ম্যাক্স বমি করতে চাইল, কিন্তু পারলনা, ভেতর থেকে একরাশ টক জল বেরিয়ে এল। ঐ বীভৎস নারকীয় পরিবেশের মধ্যে থাকতে না পেরে টলতে টলতে বেরিয়ে এল ম্যাক্স, মাটিতে উপুড় হয়ে ভেঙ্গে পড়ল বুকফাটা কান্নায়। তার চোখের নোনা জল মিশল ঘাসে ছাওয়া মাটিতে। কাঁদতে কাঁদতে একসময় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স, কেবিনের পেছনে বড় মাটির চৌবাচ্চায় রাখা জলে অনেকক্ষণ মাথা ডুবিয়ে রইল। খানিকবাদে মাথা তুলে এপাশ ওপাশ খুঁজে তার বাবার ঘোড়ার হদিশ পেল না ম্যাক্স, কিন্তু খচ্চরে টানা গাড়িটা ঠিক জায়গাতেই আছে দেখল। কেবিনের পেছনে ছোট্ট খোঁয়াড়ে তার মায়ের পোষা ভেড়া আর মুর্গিও অক্ষত আছে দেখল ম্যাক্স।

কিছু একটা করার জন্য সংকল্পিত হবার প্রেরণা থেকে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে স্পষ্ট অনুভব করল সে। এভাবে বসে কান্নাকাটি করা আর দুঃখ অনুভব করার মানে হয় না। মৃতদেহ দুটোর সৎকার করার দায়িত্বও আছে। কথাটা মাথায় আসতেই তার চোয়াল শক্ত হয়ে এঁটে বসল। মাটি খুঁড়ে কবর দেবার আয়োজন এই মুহূর্তে তার হাতের কাছে নেই, বাপ মায়ের মৃতদেহের সৎকার অন্যভাবে করবে সে।

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে গাদাগাদা লকরি নিয়ে এল ম্যাক্স। কেবিনের দুটো কামরায় মেঝে থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত থাকে থাকে সাজানো সেগুলো। যত লকড়ি ছিল সব এনে সাজানোর পরে বেরিয়ে এল সে। খোঁয়াড় থেকে মুর্গি আর ভেড়া চারটেকে বের করে তুলল খচ্চরে টানা গাড়িতে, তারপর গাড়িটা এনে দাঁড় করাল কেবিনের সামনে। আবার কেবিনে ঢুকল ম্যাক্স, কালো পিচ ভর্তি বালতিটা ভাঁড়ার থেকে বের করে এনে রাখল দোরগোড়ায়। একটা উঁচু তাকে তার বাবা রাইফেল আর পিস্তল রাখত, সে জায়গাটা হাতড়াল ম্যাক্স, কিন্তু ও দুটোরও হদিশ পেলনা। তবে তাকের একপাশে হাতড়ে অন্য দুটো জিনিস পেল সে। হরিণের চামড়ার শার্ট আর ঘোড়ায় চড়ার ব্রিচেস, দুটোই তার মাপের, তার মা ক'দিন আগে নিজে হাতে বানিয়েছে। জিনিসদুটো ভাঁজ করে সঙ্গে নেবার সময় তার দু'চোখ ছলছলিয়ে উঠল। আস্তিনে চোখ মুছে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ম্যাক্স, দু'হাতে বালতি তুলে সামনে সাজিয়ে রাখা লকড়ির স্তূপে সবটুকু পিচ ঢেলে উজাড় করে দিল। এরপরে দু'পা পিছিয়ে দরজার বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়াল ম্যাক্স, দেশলাই জ্বেলে ছুঁড়ে দিল

কালো পিচ ঢালা লকড়ির স্তূপে, পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে নিচে নেমে এল সে, ওলসেনের ঘোড়াটা গাড়ির সঙ্গে বেঁধে উঠে পড়ল গাড়োয়ানের জায়গায় তার বাবা স্যাম যেখানে বসত। মুখ দিয়ে আওয়াজ করে হাওয়ার বুকে চাবুক হাঁকাল ম্যাক্স। আওয়াজ হল সাঁই! সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগাল খচ্চরের পাল। শহরে যাবার রাস্তার কাছে এসে পেছনে তাকাল ম্যাক্স, দেখল তাদের কেবিন যেখানে ছিল সেখানে উজ্জ্বল কয়লা রং-এর আগুনের একটা গোলা আকাশের নাগাল পেতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

চারটে ভেড়া আর ষোলটা মুর্গি সমেত খচ্চরে টানা গাড়িটা ওলসেনকে একশো ডলারে বিক্রি করে দিল ম্যাক্স, তার ঘোড়টাও চেয়ে নিল। মায়ের বয়সী ওলসেনের বৌ একবাটি সুপ খাইয়ে দিল ম্যাক্সকে। খাওয়ার ফাঁকে টেবলে মাথা রেখে খানিকক্ষণ ঘুমিয়েও নিল ম্যাক্স। ওলসেনের বৌ মানা করা সত্ত্বেও ঘোড়ায় চেপে তিন খুনের খোঁজে সেদিনই রওনা হল ম্যাক্স। ডজ সিটি ছেড়ে বহুদূর যাবার পরে কাঁচামাটির পথে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের ছাপ চোখে পড়তে ঘোড়া থেকে নামল ম্যাক্স; চারজোড়া খুরের মধ্যে দু'জোড়া খুব হালকা, আদৌ মাটিতে চেপে বসেনি। পিঠে সওয়ার ছিল না বলেই মাটিতে খুরের হালকা দাগ পড়েছে। এই খুরের দাগও তার খুব চেনা। এ তার বাবা স্যামের ঘোড়া, বদমাশগুলো তার বাবা মাকে খুন করে পালাবার সময় কেবিনের বাইরে বাঁধা এই ঘোড়াটা নিয়ে গেছে।

ঘোড়ার পায়ের দাগ অনুসরন করে আরও বহুদূরে গেল ম্যাক্স। সন্ধের আগে এসে পৌঁছোল বড় বড় ঘাসে ছাওয়া এক ছোট পাহাড়ি এলাকায়। এইখানে ঘোড়া থেকে নামল ম্যাক্স। চড়ে বেড়াবার জন্য ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল। ঘোড়া আপনমনে ঘাস খাচ্ছে সেই ফাঁকে সামনে একটা গাছ থেকে তেকোনা ডাল ভেঙ্গে নিল ম্যাক্স, মাটি থেকে একটা বড় পাথর তুলে মজবুত চামড়া দিয়ে বাঁধল সেই ডালে। এবার সেটা হয়ে দাঁড়াল এক ছোটখাটো মুগুর। গত বছর গরমের ছুটিতে দাদামশাইয়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছিল ম্যাক্স, দুষমনের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে কিওয়া বীর যোদ্ধাদের এই অস্ত্র বানিয়ে নিতে দেখেছে সে।

সূর্য ডোবার কিছু পরে চাঁদ উঠল মাথার ওপর। ঘোড়ার পিঠে চেপে চাঁদের আলোয় এগিয়ে চলল ম্যাক্স।

অনেকটা পথ এগোনোর পরে ঘাসের জঙ্গলের আড়াল থেকে কিছুদূরে আগুনের শিখা তাঁর চোখে পড়ল। কানে এল ঘোড়ার ডাক। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ম্যাক্স, মুগুর হাতে এগোল নিঃশব্দে পা টিপে। আরও কিছু এগাতে বড় ঘাসের আড়াল থেকে দেখতে পেল আন্দাজ দু'শো গজ দূরে আগুন জ্বালানো হয়েছে কাঠকুটো জ্বেলে। তার ওপর ফ্রাই প্যানে কিছু রান্না হচ্ছে। একটা গাছের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে আগের জায়গায় ফিরে এল ম্যাক্স। ঘাসের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল রান্না শেষ। ফ্রাইপ্যান আগুন থেকে নামিয়ে লোকটা হাত দিয়ে খাবার তুলে মুখে পুরছে। লোকটার পেছনে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা একটা ঘোড়া। এ ঘোড়াটা তার বাবা স্যামের নয়। কিন্তু একজন কেন, বাকি দু'জন গেল কোথায়? প্রশ্নটা মনে উঁকি দিলেও ম্যাক্স তার জবাব খুঁজে পেলনা।

সঙ্গে রাইফেল রিভলভার দুটোই আছে কিন্তু ম্যাক্স লক্ষ করেছে দুটো ছোট পাথুরে টিবির মাঝখানে লোকটা বসে আছে। পাল্লার মধ্যে পেলেও রাইফেলের গুলি লক্ষভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে ষোল আনা। সেটুকু ঝুঁকি নিতে রাজী নয় সে। দাদামশাই-এর উপদেশ মনে পড়ল ম্যাক্সের—শিকারকে ক্লান্ত হতে দাও, সে ঝিমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। একই কথা বলছিল জন, —"তুমি যাদের পিছু নিতে যাচ্ছো ম্যাক্স, মনে রেখো তারাও তোমারই মত মানুষ। তাদেরও খিদে পায়, ঘুম পায়। কাছাকাছি কোথাও ঘুমোনোর জন্য আশ্রয় নেবে, আর তখনই ওদের তুমি নাগালের মধ্যে পাবে।"

দাদা মশাই-এর উপদেশ মেনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ম্যাক্স। ঘাসের ওপর শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। একসময় ঘুম ভাঙ্গতে চোখ মেলল সে, দেখল চাঁদ উঠে এসেছে মাথার ওপর। রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে মুগুর বাগিয়ে ধরে ঘাসের ওপর পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল ম্যাক্স।

কাঠকুঠোর আগুন নিভে গেছে অনেকক্ষণ। অঙ্গারটুকু এখনও জ্বলছে ধিকধিক করে। আগুন থেকে খানিকটা তফাতে লোকটা পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ডানহাতের মুঠোয় রিভলভার ধরা, তর্জনি ট্রিগারে। তফাতে দাঁড়িয়েও মুখখানা চিনতে তার কষ্ট হল না। ম্যাক্সের বেশ মনে আছে, এই লোকটাই গতকাল দুপুরে তাদের আস্তানার খোঁজ করছিল। মাথায় কানাত দেয়া টুপি থাকলেও মুখের একটা পাশ দেখেই তাকে চিনতে পেরেছে ম্যাক্স। হাঁটু গেড়ে বসে একটা নুড়ি তুলে ঘুমন্ত লোকটার পা টিপ করে ছুঁড়ে মারল সে। নুড়িটা পায়ে লাগতেই লোকটার ঘুম গেল ভেঙ্গে, একটা অশ্লীল গালি দিয়ে রিভলভার হাতে উঠে বসল সে। কিন্তু রিভলভার ছোঁড়ার সুযোগ আর সে পেলনা তার আগেই পেছন থেকে বাঘের মত ম্যাক্স লাফিয়ে পড়ল, লোকটা ঘাড় ঘোরানোর আগেই হাতে তৈরি মুগুরের এক ঘা ম্যাক্স হানল তার চাঁদিতে।

একসময় রাতের আঁধার কেটে হালকা আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, সূর্য ওঠার কিছু আগে গোঙানির আওয়াজে ম্যাক্সের ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলতে দেখল আহত লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে, তার মাথার পেছনদিকের অনেকটা জায়গা কেটে ফেটে গেছে, সেখান থেকে দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে একদিকের চোয়াল বেয়ে। ম্যাক্স উঠে দাঁড়াল, পায়ের জুতো দিয়ে ঠোক্কর মেরে লোকটাকে উল্টে চিত করে দিল। আরও খানিকবাদে সূর্য উঠতে চোখে মুখে রোদ এসে পড়ল। উঠে বসতে গিয়ে লোকটা পড়ে গেল, আর তখনই লক্ষ করল যে তার হাত পা একসঙ্গে বাঁধা। ঘাড় ফেরাতে ম্যাক্সকে দেখতে পেল সে আঙ্গুলে ছুরির ধার পরখ করছে ম্যাক্স। 'তুমি আবার কোত্থেকে এসে জুটলে বাপু?' ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে বলল সে 'তোমার মতলব কি?'

'আমি তোর বাপ, চিনতে পারছিস না?' সহজ গলায় জবাব দিল ম্যাক্স, 'মতলব কি তা একটু বাদেই টের পাবি। তার আগে বল্ কোন শুয়োয়ের বাচ্চার হুকুমে আমার মা বাবাকে খতম করেছিন?'

'আমি কাউকে খতম করিনি।' ম্যাক্সের ছুরির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তেরিয়া মেজাজে জবাব দিল লোকটা।

'আগে আমার মা বাবাকে খতম করেছিস, তারপর বাবার পোষা ঘোড়াটাকে চুরি করে পালিয়েছিস্!' বলতে গিয়ে ম্যাক্সের গলা আপনা থেকেই চড়ে গেল।

'তোর বাপ ঐ ঘোড়া আমায় বেচেছে।'

'মিছে কথা!' গর্জে উঠল ম্যাক্স, 'দশ হাজার ডলারের অফার পেয়েও আমার বাবা ঐ ঘোড়া বেচেননি, আর তুই ত কোথাকার ছারপোকা!'

'ছেড়ে দে!' লোকটা কঁকিয়ে উঠল। 'আমায় ছেড়ে দে!'

'ছেড়ে দেব বলেই ত তোকে বেঁধেছি রে উল্লুকের বাচ্চা!' ধমকে উঠল ম্যাক্স, কেন আমার বাবা মাকে খুন করেছিন আগে বল্। ছেড়ে দেবার কথা তারপরে ভাবব!'

'ডর্ট খুন করেছে তোর বাবা মাকে,' আচমকা বলল লোকটা, 'আমি শুধু তোর মার ঠ্যাং দুটো ফাঁক করে ধরেছিলাম। ডর্ট আর বেঁটে ওস্তাদ সোনা চাইল, তোর বাবা কিছুতেই দিলনা। তাইতে খুন চড়ে গেল ডর্ট-এর মাথায়........। নেরে রেড ইণ্ডিয়ান খানকির ছাওয়াল! এবার আমায় ছেড়ে দে!' প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। ম্যাক্স দেখল ভয়ের চোটে পেচ্ছাব করে ফেলেছে সে। ট্রাউজার্সের কাপড় চুঁইয়ে হলদে জল গড়াচ্ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। সেই মুহূর্তে আদিম সভ্যতার সহজাত প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিল তার সত্ত্বায়, হাতের মুঠোয় পাওয়া শিকারকে খেলিয়ে মারার বাসনা চাপতে পারলনা ম্যাক্স। কোনও জবাব না দিয়ে ছুরি উঁচিয়ে এগিয়ে আসতেই বদমাশটা ভয়ে জ্ঞান হারাল। ঘাড় হেঁট করতে ম্যাক্স দেখল বেহুঁশ হলেও লোকটার দু'চোখ কপালে উঠেছে। ছুরির ধারালো ফলা দিয়ে তার দু'চোখের চামড়া চিরে ফেলল সে। হতভাগার দশা কল্পনা করে নিজের মনে হাসল সে। যতদিন বাঁচবে ততদিন দিনরাত চোখ মেলে কাটাতে হবে তাকে, চোখ বন্ধ করতে পারবেনা। ঘুম পেলেও ঘুমোতে পারবেনা।

সাজাটা ঠিক মনের মত হলনা। বেহুঁশ বদমাশটাকে একা ফেলে রেখে ঘাসের ঝোপের দিকে পা বাড়াল ম্যাক্স। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল যা সে খুঁজছিল—লাল পিঁপড়ের বাসা। আলতো করে তুলে এনে ট্রাউজার্সের ফ্লাই খুলে ঢুকিয়ে দিল তার পুরুষাঙ্গে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে লাল পিঁপড়েয় ছেয়ে গেল তার শরীর। চোখ, নাক, কান, মুখ, সব ছিদ্র দিয়ে দলে দলে লাল পিঁপড়ে ঢুকতে লাগল। জ্ঞান ফিরে এল তার অল্প কিছুক্ষণ বাদে, হাত পা বাঁধা অবস্থায় লাল পিঁপড়ের কামড়ে দাপাতে লাগল। ম্যাক্সের দিকে চোখ পড়তে অশ্লীল ভাষায় তার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল।

'আমি রেড ইণ্ডিয়ান মায়ের ছেলে জানিস ত?' তফাতে দাঁড়িয়ে বলে উঠল ম্যাক্স। 'তোর মত চোর, খুনে আর ধর্ষণকারীদের রেড ইণ্ডিয়ানরা এমনি সাজা দেয়।'

প্রখর সূর্যের তাপে হাত পা বাঁধা অবস্থায় এক জায়গায় পড়ে রইল। চোখের চামড়া নেই তাই চোখ বুঁজতে পারছেনা। শুধু পিঁপড়ে নয়, রক্তের গন্ধ পেয়ে ডাঁশ, বোলতা, মশা আরও সব পোকা মাকড় ছুটে এসেছে, তাদের কামড় খেয়ে দাপাতে দাপাতে তিনদিনের মাথায় বদমাশটা মরল। ম্যাক্স তফাতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল তার মরণযন্ত্রণা। এবার এগিয়ে এসে ছুরি দিয়ে গোল করে চুলসমেত তার চাঁদির চামরা কেটে নিল সে।

মরা বদমাশটার চাঁদির ছাল নিয়ে ম্যাক্স এসে চাপল ঘোড়ার পিঠে। লাগাম ধরে

বদমাশটার ঘোড়াও নিয়ে চলে এল উত্তরে কিওয়া রেড ইণ্ডিয়ানদের মুলুকে। নাতি এসেছে খবর পেয়ে প্রৌঢ় সর্দার দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। দাদামশাইকে দেখে ঘোড়া থামাল ম্যাক্স, কাছে দাঁড়ানো এক যুবকের হাতে লাগাম দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াল একপাশে। 'আমি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি,' মার কাছে শোনা নিখুঁত কিওয়া-তে বলল ম্যাক্স, 'আমার বাবা মা দু'জনেই খুন হয়েছে।'

সর্দার চুপচাপ শুনল, তার মুখের একটি পেশিও স্থানচ্যুত হল না। তিন খুনির একজনের কেটে নেয়া চাঁদির চামড়া বেল্ট থেকে খুলে দাদামশাইয়ের সামনে মাটিতে রাখল ম্যাক্স। 'তিনখুনের একটা মরেছে আমার হাতে, এই তার চাঁদির কেটে নেয়া চামড়া।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাক্স, কিওয়া রীতি অনুযায়ী বলল, 'হে প্রধান, হে মহান গোষ্ঠীপতি, মা-বাবার মৃত্যুর শোক যাপন করতে আমি এসেছি আমার দাদামশাইয়ের তাঁবুতে।'

'আমাদের আগের জমানা আর নেই, ভাই,' পায়ের কাছে পড়ে থাকা দুষমণের চাঁদির চামড়ার দিকে তাকিয়ে সর্দার বলল, 'সাদা মানুষেরা সব জমি দখল করে নিয়েছে। ওরা দয়া করে যেটুকু জমি দিয়েছে সেখানেই কোনমতে টিকে আছি আমরা, এভাবে আর ক'দিন চলবে তাও জানিনা। মাঝে মাঝে ভয় হয় সাদারা বোধহয় আমাদের সবাইকে মেরে এই জমিটুকুও কেড়ে নেবে। যাক, সাদা সেপাইরা তোমায় এদিকে আসতে দেখেনি ত?'

'কেউ দেখেনি' ম্যাক্স বলল।

'আমি ওদের পেছনের পাহাড় বেয়ে এসেছি।'

মাটিতে পড়ে থাকা চাঁদির কেটে নেয়া চামড়ার ফালিটার দিকে আবার তাকাল সর্দার। গর্বে তার বুক ভরে উঠেছে। আজ কানেহা আর তার সাদা চামড়ার মরদ লালদেড়ে স্যাম, কেউ বেঁচে নেই। না থাকলেও তাদের একমাত্র ছেলে তার মায়ের বংশের রীতি মেনে বদলা নিয়েছে। একসময় যুদ্ধে নিহত শত্রুদের চাঁদির চামড়া কেটে আনত বীর যোদ্ধারা, তাঁবুর ভেতরে পোঁতা খুঁটিতে টাঙ্গানো থাকত সেগুলো। সাদা চামড়ার মানুষদের জমানায় রেড ইণ্ডিয়ান সমাজে এখন আর আগের মত সাম্প্রদায়িক লড়াই বাঁধেনা। খুঁটিটাও অনেক দিন হল ফাঁকা পড়ে আছে। কতদিন পড়ে কানেহার ছেলে আজ পুরোনো রীতি মেনে এক দুষমণের চাঁদির চামড়া কেটে এনেছে। মাটি থেকে চামড়াটুকু তুলে সামনের খুঁটিতে টাঙ্গিয়ে দিল সর্দার, তারপর তাকাল ম্যাক্সের দিকে। শান্ত গলায় বলল, 'গাছের অনেক শাখাপ্রশাখা থাকে। কতগুলো শাখাপ্রশাখা ঝড়ে ভেঙ্গে পড়লে নয়ত কাটা হলে তাদের আত্মারা থাকার জায়গা খুঁজে বেড়ায়। তখন সেই আত্মাদের একটু ঠাঁই করে দিতে গাছের তরুণ শাখা প্রশাখাদের তোমার মত এগিয়ে আসতে হয়। উষ্ণশী থেকে একটা পালক খুলে ম্যাক্সের দিকে বাড়িয়ে ধরে সর্দার বলল, 'শোন ম্যাক্স ক'দিন আগে আমার এক বীর যোদ্ধা ঘোড়া থেকে আচমকা পড়ে গিয়ে মারা গেছে। ওর পছন্দের কুমারী মেয়েটি নদীর ধারে এক তাঁবুতে একা দিন কাটাচ্ছে। প্রণয়ীর আত্মা ওর দেহে আশ্রয় নেবার আগে তুমি এখনই গিয়ে মেয়েটিকে অধিকার করো।'

'এখনই?' অবাক হয়ে দাদামশাইয়ের দিকে তাকাল ম্যাক্স।

'হ্যাঁ। এখনই।' সর্দার বলল।

'এই মুহূর্তে। যুদ্ধ আর বদলা নেবার নেশা রক্তে থাকতে থাকতে সঙ্গিনী বাছতে হয়। সঙ্গিনী গ্রহণ করার এই হল সেরা সময়।' বলে হাতে ধরা পালকটা নাতির হাতে গুঁজে দিল সর্দার।

একটি কথাও না বলে দাদামশাইয়ের দেয়া পালক হাতে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ম্যাক্স, একরাশ রেডইণ্ডিয়ান যুবক যুবতীর কৌতূহলী চোখের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল নদীর দিকে। নদীর ধারে একটাই তাঁবু, একপাশের ঢাকা তুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। তাঁবুর ভেতরে কাউকে দেখতে পেলনা ম্যাক্স, মেঝেতে পাতা চামড়ার শতরঞ্জির ওপর পা মেলে বসল সে।

খানিক বাদে একটি মেয়ে ভেতরে ঢুকল। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ভিজে সপসপ করছে। জল গড়াচ্ছে চুল থেকে। ভেজা কাপড় লেপ্টে আছে গায়ের চামড়ার সঙ্গে। ম্যাক্সকে দেখে থমকে দাঁড়াল সে। ম্যাক্স তাকিয়ে দেখল মেয়েটি নেহাতই বাচ্চা। বয়স তার বড়জোড় চোদ্দ কি পনেরো। তার বেশি নয়। এই বালিকাকে সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করতে দাদামশাই কেন তাকে পাঠালেন আচমকা সেই সত্য উপলব্ধি করল সে। হাতের মুঠোয় ধরা পালকটা মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল ম্যাক্স, 'ভয় পেয়োনা। তুমি আর আমি একে অপরের অশুভ আত্মাগুলোকে দমন করতে পারব ভেবেই মহান গোষ্ঠীপতি আমাদের মিলনের নির্দেশ দিয়েছেন।'

৬

মালগাড়ির ওয়াগণ থেকে নামানো হচ্ছে গোরু মোষের পাল। তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ঢোকানো হচ্ছে অস্থায়ী খোঁয়াড়ে। ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল ম্যাক্স। লম্বা পা ফেলে ঢাল বেয়ে নেমে এল সমতলে; পালের শেষ পশুটি খোঁয়াড়ে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর ভেতরে ঢুকে গেট নামিয়ে দেল। ঘামে জামা ভিজে জবজব করছে; টুপি খুলে জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মুছল ম্যাক্স। ভুরু কুঁচকে তাকাল প্রখর সূর্যের দিকে। সেই টেক্সাস থেকে কানসাস সিটি পর্যন্ত মালগাড়ির'ওয়াগানে গাদাগাদি হয়ে এতদূর এসেছে পশুগুলো, মাথা নিচু করে দল বেঁধে এগিয়ে চলেছে তারা। পথের শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও যে শেষ ঘনিয়ে এসেছে কিভাবে যেন ওই পশুগুলো টের পায়। এই খোঁয়াড় থেকেই যে কসাইখানায় যেতে হবে তা এরা টের পায় আগে থেকেই।

বেড়ার ওপারে খোঁয়াড়ের মালিক মিঃ ফ্যারার বসেছেন, গোরুমোষের ব্যাপারীরা দরাদরি করছে তাঁর সঙ্গে। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে সেখানে এনে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাক্স।

'সবকটা খোঁয়াড়ে ঢুকেছে ত?' জানতে চাইলেন মিঃ ফ্যারার।

'হ্যাঁ মিঃ ফ্যারার,' বলল ম্যাক্স।

'সবকটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। বাইরে একটাও পড়ে নেই।'

'আমার গুণতিতে মোট এগারোশ দশটা হল,' ব্যাপারীদের একজনকে বললেন ফ্যারার 'তুমি গুণেছো?'

'আজ্ঞে আমার হিসেবেও তাই আসছে,' ব্যাপারী জবাব দিল।

'তাহলো ঐ কথাই রইল,' উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ফ্যারার,' চেকটা তৈরি করে রেখো। আজ বিকেলে তোমার অফিস থেকে নিয়ে নেব।'

'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।' ব্যাপারী বলল, 'আমি একটু বাদেই গিয়ে চেক লিখে রাখছি।'

'চলো হে ম্যাক্স, হোটেলে চলো।' বলতে বলতে মিঃ ফ্যারার নিজের ঘোড়ায় চাপলেন। 'হোটেলে গিয়ে ভাল করে সাবান মেখে চান না করলে গোরু মোষের বিটকেল গন্ধ গা থেকে যাবে না।'

'যা বলেছেন আজ্ঞে,' শার্ট আর ব্রিচেস টেনেটুনে ঠিকঠাক করতে করতে সায় দিল ম্যাক্স, 'আমারও একই হাল হয়েছে, গোরুমোষের গন্ধ চেপে বসেছে গায়ে।'

ম্যাক্সের ফিটফাট জামাকাপড়ের দিকে একপলক তাকিয়ে খুশিতে শিস দিয়ে উঠলেন মিঃ ফ্যারার। ম্যাক্সের পরনে সাদা হরিণের চামড়ার শার্ট আর ব্রিচেস, পায়ে উঁচু হিলের কাউবয় জুতো আয়নার মত চকচক করছে। ম্যাক্সের একমাথা কুচকুচে কালো চুল বেড়ে কাঁধ ছুঁয়েছে। হলদে সোনালি রংয়ের রুমাল গলায় বাঁধা, গাঢ় তামাটে চামড়ার সঙ্গে অদ্ভুত খাপ খেয়েছে রুমালের রং।

'জব্বর ড্রেসখানা ত চাপিয়েছো ম্যাক্স।' আবার শিস দিলেন মিঃ ফ্যারার। 'এটা জোগাড় করলে কোথা থেকে?'

'এ দুটোই আমার মায়ের তৈরি,' বলল ম্যাক্স। 'মারা যাবার আগে এটাই তাঁর তৈরি শেষ পোষাক।'

'এই পোষাকে তোমায় জাত রেড ইণ্ডিয়ান-এর মত দেখাচ্ছে, ম্যাক্স', হাসলেন মিঃ ফ্যারার।

'ভুল কিছু বলেননি,' হাসল ম্যাক্স।

'আমি সত্যিই রেড ইণ্ডিয়ান।'

'পুরোপুরি নও বাপু।' মিঃ ফ্যারারের মুখের হাসি নিমেষে মিলিয়ে গেল। 'তুমি হলে গে যাকে বলে দো-আঁশলা। অর্দ্ধেক সাদা মানুষ অর্দ্ধেক রেড ইণ্ডিয়ান। তোমার বাবার চামড়া ছিল সাদা তা আমি জানি। মানুষটা সত্যিই ভাল ছিল। স্যাম স্যাণ্ডের সঙ্গে কতবার শিকারে গেছি তার হিসেব নেই। অথচ সেই বাপের জন্য তুমি এতটুকু গর্ববোধ করোনা।'

'না, মিঃ ফ্যারার,' বাধা দিল ম্যাক্স। 'আমি আমার বাবার জন্য সত্যিই গর্বিত। কিন্তু বাবা আর মা দু'জনকেই সাদা চামড়ার লোকেদের হাতে খুন হতে হয়েছে একথা ত আমি ভুলতে পারব না।' বলতে বলতে রিভলভারের খাপ আঁটা চওড়া বেল্ট উরুতে বাঁধল ম্যাক্স।

'তুমি কি এখনও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছো?' জানতে চাইলেন মিঃ ফ্যারার, 'অনেকদিন ত হল এবার ওসব পাগলামি ছাড়ো। শান্ত হও।'

'মাফ করবেন কত্তা,' ম্যাক্স মুখ তুলে বলল, 'আমি তা পারব না।'

'কানসাস সিটি বিশাল জায়গা,' বললেন মিঃ ফ্যারার 'ওখানেই ওকে খুঁজে পাবে এতটা নিশ্চিত তুমি হচ্ছ কি করে?' 'লোকটা সত্যিই এখানে থাকলে আমি ঠিকই ওকে খুঁজে বের করব,' আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গলায় বলল ম্যাক্স। 'এখানেই ওকে আসতে হবে। এর হিসেব করে তারপরে আরেক ব্যাটার খোঁজে আমায় যেতে হবে পশ্চিম টেক্সাসে।'

'যে সাজ সেজেচো তাতে আবার উল্টোটা না হয়।' একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন মিঃ ফ্যারার। 'তুমি লোকটার হদিশ পাবার আগে সেই তোমায় খুঁজে না বের করে।'

'আমি ত সেটাই চাইছি,' শান্তগলায় বলল ম্যাক্স। 'কি জন্য মরতে হচ্ছে আমি তা ওকে আগে ভাগে জানাতে চাই।'

'এই নাও আশি ডলার, ম্যাক্স।' মিঃ ফ্যারার একগাদা নোট তুলে দিলেন ম্যাক্সের হাতে, 'তোমার চারমাসের মজুরি, আর এই নাও আরও ষাট ডলার, পোকার খেলে তুমি এই টাকা জিতে ছিলে। মোট একশো চল্লিশ ডলার।'

'ধন্যবাদ, মিঃ ফ্যারার।' টাকাগুলো না গুণেই ব্রিচেসের পেছনের পকেটে গুঁজে রাখল ম্যাক্স।

'আবার বলছি ম্যাক্স। তুমি এসব বদলা নেবার ধান্দা ছেড়ে আমার সঙ্গে চলো।' মিঃ ফ্যারার অনুরোধের সুরে বললেন।

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মিঃ ফ্যারার।' ম্যাক্স একগুঁয়ের গলায় বলল, 'তা হয় না।'

'আরে বাপু, তুমি আমার ছেলের মত বলেই বলছি। জীবন ভোর একটা মানুষের ওপর ঘেন্না মনের ভেতর পুষে রাখা যায় না। ওতে মন খারাপ হয়। তা থেকে স্বাস্থ্য খারাপ হয়।'

'হলেও আমার কিছু করার নেই, মিঃ ফ্যারার,' কেটে কেটে বলল ম্যাক্স।

'আমার মায়ের মাই কেটে নিয়েছিল ঐ খানকির ছাওয়াল। তারপর ওটাকে তামাকের থলে বানিয়ে ব্যবহার করছে ভাবতে পারেন? এ দুঃখ আমি কোনদিনও ভুলতে পারবনা।' বলতে বলতে দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিল ম্যাক্স, বাইরে দাঁড়িয়ে সেদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন মিঃ ফ্যারার।

'তুমি আগে হুইস্কিটুকু খেয়ে নাও।' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল মেরি গ্রেডি, 'আমি এই ফাঁকে কাপড় খুলছি।'

একমুহূর্তে মেরির দিকে তাকাল ছেলেটা। তারপর চটপট চুমুক দিল হুইস্কির গ্লাসে। গ্লাস খালি করে কাশতে কাশতে চেয়ার ছেড়ে উঠে সে বসে পড়ল খাটের ধারে। 'অত তাড়াহুড়ো করে হুইস্কি খায় কেউ?' মাথার ওপর দিয়ে পোষাক গলাতে গলাতে বলল মেরি, 'আস্তে আস্তে চুমুক দিতে হয়। এখন কেমন লাগছে?'

ছেলেটা মুখ তুলতেই মেরি দেখল নেশায় আমেজ লেগেছে তার দু'চোখে।

'এ-এখন ঠি-ঠিক আছে।' নেশাজড়ানো গলায় জবাব দিল ছেলেটা, 'আসলে একসঙ্গে এত মদ খাওয়ার অ-অভ্যেস নেই কিনা ত-তাই।'

'হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ো,' 'ঝোলা মেঝেতে ফেলে না দিয়ে ছেলেটার কাঁধের ওপর বিছিয়ে দিল মেরি। 'কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো চোখ বুঁজে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে ছেলেটা তাকিয়ে রইল মেরির দিকে। কি মনে হতে হাত বাড়িয়ে ছেলেটার কাঁধে অল্প ধাক্কা দিল মেরি। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল ছেলেটা এটা কোনও সংকেত ভেবে নেশায় টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। রিভলভারের বাঁটের নাগাল পেতে হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত নামাতে পারলনা সে, নেশা ততক্ষণে তার স্নায়ুতন্ত্রকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে টলে পড়ল খাটের ধারে।

মেরি যেন এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিল। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে তার চোখের পাতা টেনে টুনে দেখল। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে নিজের মনে হাসল সে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তাকাল সামনের দিকে।

মেরি দেখল রাস্তার ওপারে মদ আর জুয়ার আড্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তার দালাল। জানালায় পাল্লা দু'বার ওঠালো নামালো মেরি। দালালের চোখে তা ধরা পড়ল। সংকেতের অর্থ বুঝে সে রাস্তা পেরিয়ে পা বাড়াল হোটেলের দিকে। দালাল দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। মেরি ততক্ষণে জামাকাপড় গায়ে চাপিয়েছে।

'এ হতভাগাকে কাত করতে বড্ড বেশি সময় নিলে,' কর্কশগলায় বলল দালাল 'এত সময় লাগল কেন?'

'কি করব বল?' বলল মেরি, 'ছেলেটি অদ্ভুত, মদ মোটেও ছোঁবেনা। অনেক বলে কয়ে তবে গিলিয়েছি। বাচ্চা ছেলে মুখে এখনও দুধের গন্ধ, আমার সঙ্গে রাত কাটানোর কোনও সাধ ওর নেই।'

'ছোঁড়ার সঙ্গে মালকড়ি কেমন আছে?' জানতে চাইল দালাল।

'জানিনা,' জবাব দিল মেরি। তবে ওর পেছনের পকেটে টাকা আছে দেখেছি। টাকাটা নিয়ে চলো অন্য কোথাও যাই। এই হোটেলে উঠলেই আমার গা কেন জানিনা থেকে থেকে শির শির করে। মন মেজাজ বিগড়ে যায়।'

কিন্তু এসব কথা মেরির দালালের কানে গেল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সে ছেলেটির পেছনের পকেট হাতড়ে এক গোছা নোট বের করে আনল, চটপট গুনে বলল, 'একশো ত্রিশ ডলার।'

'একশো ত্রিশ ডলার?' দু'হাতে দালালের গলা জড়িয়ে ধরল মেরি। তার কানের কাছে মুখ এনে সোহাগ ঝরানো গলায় বলল, 'সেত অনেক টাকা! চলোনা। বাকি রাতটুকু দু'জনে ফূর্তি করে কাটাই।' দালালের ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল মেরি, 'চলো রাতটুকু বাইরে কোথাও কাটিয়ে আসি।'

'বাইরে রাত কাটাবে?' অদ্ভুত চোখে দালাল তাকাল মেরির দিকে। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? সবে এগারোটা বেজেছে। এখনও কম করে আরও তিন হতভাগার পকেট সাফ করার খেল্ দেখাতে পারো তুমি।' বলেই মুখ ফিরিয়ে ঘুমন্ত ছেলেটার মুখখানা

খুঁটিয়ে দেখে দালাল বলল, 'কাউবয় নয়। ওকে দেখে আমার রেড ইণ্ডিয়ান বলে মনে হচ্ছে।'

'ঠিকই বলেছো,' সায় দিল মেরি, 'ও তাই। ও এমন একটা লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে যার তামাকের থলে রেড ইণ্ডিয়ান মেয়ের মাই-এর চামড়া কেটে তৈরি', বলে হাসল মেরি 'ও যাকে খুঁজছে তাকে আমি চেনার ভান করে একথা বের করে নিয়েছি ওর পেট থেকে।'

'ছোঁড়ার সঙ্গে ত রিভলভারও আছে দেখছি।' গলা নামিয়ে দালাল বলল, 'ও সত্যিই যাকে খুঁজছে তাকে খবরটা আগাম দিয়ে কিছু রোজগার করা যায় কিনা দেখি।'

'তাহলে সে লোকটাকে তুমি চেনো?' জানতে চাইল মেরি। 'হয়ত চিনি,' দালাল বলল, 'আমি এগোলাম।'

ছেলেটা সত্যিই যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, রাত দুটো নাগাদ মেরির দালাল তার হদিশ পেল। গোল্ডেন ঈগল বার-এর পেছনের বড় কামরার লোকটা আরও অনেকের সঙ্গে তখন তাসের জুয়ো খেলছে।

'মিঃ ডর্ট,' পেছন থেকে লোকটার কাঁধে আলতো টোকা দিল মেরির দালাল, 'আপনার সঙ্গে দুটো কথা ছিল,' গলা নামিয়ে বলল সে।

'কে হে হারামজাদা?' আড়চোখে তাকাল ডর্ট, 'এত রাতে জ্বালাতে জুয়োর আড্ডায় ঢুকেছো কোন মতলবে? খেলতে চাও ত বসে যাও, নয়ত বিদেয় হও। খামোকা আমায় জ্বালাচ্ছো কেন?'

'বিরক্ত করার জন্য মাফ চাইছি, মিঃ ডর্ট,' ভয়ে ভয়ে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল দালাল। 'একটা গোপন খবর আপনাকে দেব বলেই এত রাতে ছুটে এসেছি।' বলতে বলতে টেবলের ওপর পড়ে থাকা তামাকের থলের দিকে তার চোখ পড়ল।

'কি তোমার গোপন খবর?'

'আজ্ঞে ঐ থলেটার ব্যাপারে কিছু বলতে চাই,' ইশারায় তামাকের থলেটা দেখাল দালাল।

'রেড ইণ্ডিয়ান মাগির মাই কেটে তৈরি ঐ থলে?' বলল ডর্ট, 'দেখেই লোভ হয়েছে? কিন্তু ও জিনিস ত আমি হাতছাড়া করব না চাঁদু!'

'ভুল করছেন, মিঃ ডর্ট,' দালাল বলল, 'ওটা ব্যবহার করার কোনও সাধ আমার নেই। আমি শুধু একটা খবর আপনাকে দেব বলে এতদূর ছুটতে ছুটতে এসেছি।'

'কি খবর চটপট বলে ফ্যাল্।' ডর্ট এই প্রথম অসহিষ্ণু হল। 'এত ভণিতা করার কি আছে?'

'খবরটা আপনাকে বিক্রি করব বলে ছুটে এসেছি মিঃ ডর্ট,' দালাল বলল, 'একটা রেড ইণ্ডিয়ান ছোঁড়া শহরের সব জায়গায় আপনাকে পাতি পাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে।' বলতে বলতে দালালের গলা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল থরথর করে। 'ছোঁড়ার সঙ্গে রিভলভার আছে দেখেছি।'

'রেড ইণ্ডিয়ান ছোঁড়া?' চিন্তিত শোনাল ডর্টের গলায়, 'কেমন দেখতে ছোঁড়াটাকে?'

সংক্ষেপে চটপট ছেলেটার চেহারার বর্ণনা দিল দালাল।

'চোখ,' কর্কশ গলায় ডর্ট বলল, 'ওর চোখের রং কি নীল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' সায় দিল দালাল। 'হোটেলে আমারই পোষা এক মাগিকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করছিল ছোঁড়া। তখনই দেখেছি ওর চোখের রং নীল।'

'ঠিকই দেখেছো,' সায় দিল ডর্ট।

'ওর মায়ের চোখের রংও অমনি নীল ছিল বেশ মনে আছে।' বলতে বলতে তামাক ভর্তি থলেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে পকেটে পুরল ডর্ট।

'এই হল আমার খবর', দালাল বলল, 'এবার তাহালে ওর কি হিসেব করবেন?'

'কি হিসেব করব?' দালালের মুখের দিকে তাকাল ডর্ট, তাকাল টেবলের চারপাশে দাঁড়ানো জুয়াড়িদের দিকে। ঝোঁকের মাথায় বলল, 'করার ত একটাই আছে—খতম্। কাজটা বছরখানেক আগেই সেরে ফেলা উচিৎ ছিল। যাক গে তা সেই ছোঁড়া আছে কোথায়?'

'কোথায় আছে আমি জানি।' দালাল জবাব দিল, 'আমি আপনাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাব ওর কাছে। চাইলে এখনই যেতে পারেন।'

দালালের সঙ্গে হোটেলে এল ডর্ট, কিন্তু একতলায় হোটেল ক্লার্ক বলল, ম্যাক্স নামে সেই ছেলেটা খানিক আগে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। যাবার আগে বলে গেছে আগামিকাল দুপুর দুটোয় গোরু মোষের খোঁয়াড়ে তাকে পাওয়া যাবে। ঘরভাড়া বাবদ এক ডলার ছেলেটা বাকি রেখে গেছে তা আদায় করতে হোটেল ক্লার্ক আগামিকাল দুপুরে দেখা করতে যাবে তার সঙ্গে।

'এই নাও তোমার বাকি ঘরভাড়া,' একটা রূপোর ডলার ডর্ট হোটেল ক্লার্কের সামনে ছুঁড়ে দিল। 'তোমার হয়ে এটা আমিই ওর কাছ থেকে আদায় করে নেব।'

পরদিন দুপুরবেলা। দুটো বাজতে বেশি দেরি নেই। খোজা করা বলদগুলোকে ম্যাক্স ঠেলেঠুলে খাবার খোঁয়ারে ঢোকাচ্ছে, বেড়ায় ঠেশ দিয়ে তাই দেখছেন তার মনিব মিঃ ফ্যারার। পাশে আরেকজন লোক বেড়ায় ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে সেও তাকিয়ে আছে ম্যাক্সের দিকে। 'ছেলেটা ঘোড়ার নাড়িনক্ষত্র সব জানে,' ম্যাক্সকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন মিঃ ফ্যারার।

'তা হবে', পাশে দাঁড়ানো লোকটি নিস্পৃহ গলায় মন্তব্য করল। হাতে পাকানো সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে বলল, 'দেশলাই হবে?'

'আরে নিশ্চয়ই। এই নিন,' বলে মিঃ ফ্যারার পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করতেই লোকটার হাতে ধরা তামাকের থলের দিকে তাঁর নজর গেল। পলক না ফেলে তিনি তাকিয়ে রইলেন জিনিষটার দিকে।

'হাঁ করে কি দেখছেন?' জানতে চাইল লোকটা, 'ওর মধ্যে এত দেখার কি আছে?'

'আপনার তামাকের থলেটা দেখছি,' বললেন ফ্যারার। 'এমন অদ্ভুত তামাকের থলে আগে দেখিনি কিনা।'

'দেখবেন কি করে।' হাসতে হাসতে লোকটা বলল, 'এ জিনিস ত দোকানে মিলবেনা।

আসলে এটা এক রেডইণ্ডিয়ান মাগির কেটে নেয়া মাই। চামড়াটা খুব নরম। এর ভেতরে তামাক রাখলে খুব নরম থাকে।'

আচমকা ফ্যারার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার জায়গায় আমি হলে এমন কাজ করতাম না। রেড ইণ্ডিয়ান হলেও মানুষ ত, তার মাই কেটে তামাকের থলে বানানো আপনার মোটেও উচিত হয়নি,' কথাগুলো তিনি ইচ্ছে করেই জোরে জোরে বললেন যাতে ম্যাক্স-এর কানে যায়।

শেষ বলদটাকে খাবার খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে এগিয়ে এল ম্যাক্স। 'আমার কাজ শেষ। মিঃ ফ্যারার।' মুচকি হেসে বলল সে।

'অনেক খেটেছো, নাও একটা সিগারেট বানিয়ে খাও' বলে লোকটা তার তামাকের থলে ছুঁড়ে দিতেই ম্যাক্স তা লুফে নিল। 'ধন্যবাদ,' বলে থলের দিকে তাকাতেই তার মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। বারবার ভুরু কুঁচকে লোকটার দিকে তাকাতে লাগল সে। আঙ্গুলের ফাঁকে চেপে ধরা তামাকের থলেটা পড়ে গেল মাটিতে, ভেতর থেকে খানিকটা তামাক ছিটকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

'এবার তোমায় চিনেছি', বিষাক্ত সাপের ফোঁশফোঁশ করার গলায় বলতে বলতে পিছিয়ে গেল ম্যাক্স।

'তুমি সেই তিনজনের একজন।'

'ঠিক বলেছিস,' বলতে বলতে কোমরে খাপে আঁটা রিভলভারের বাঁট ছুঁল ডর্ট, নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, 'তুই যে সেই লাল দেড়ে স্যাম শুয়োরের বাচ্চা তা একবার দেখেই আমি আঁচ করেছি। তা বল্, চিনতে পেরে তুই আমার কি করবি?'

'ম্যাক্স, সরে যাও?' তফাতে দাঁড়িয়ে কর্শক গলায় হুঁশিয়ার করলেন মিঃ ফ্যারার 'এর নাম টম ডর্টচ, এ শহরের সেরা বন্দুকবাজ। চোখের পলকে রিভলভার ছোঁড়ে।'

'তাতে কিছুই আসে যায় না। মিঃ ফ্যারার,' ডর্টের চোখে চোখ রেখে বলল ম্যাক্স। 'ওকে অ্যাদ্দিন বাদে যখন পেয়েছি তখন আজ আমি ওর জান না নিয়ে ছাড়বনা।'

'বাতেল্লা বন্ধ কর, দো আঁশলা রেড ইণ্ডিয়ান খানকির বাচ্চা!' ধমকে উঠল ডর্ট, 'বন্দুক বের কর্!'

'অত তাড়া কিসের!' নিজেকে শান্ত রেখে ম্যাক্স বলল, 'আমার মাকে যেমন ধীরে সুস্থে মেরেছিলে আমিও তেমনি ধীরে সুস্থে হাতে সময় নিয়ে খতম করব তোমায়।'

'ভাল চাস্ ত বন্দুক বের কর্ বলছি!' রাগে, উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল ডর্টের মুখ, দেখি তোর হিম্মত—'

'আবার বলছি তাড়াহুড়ো করে তোমায় মারব না।' শান্ত গলায় ম্যাক্স বলল, 'তোমার মাথায় বা কলজেতে নয়। দুটো গুলি ছুঁড়ব আমি, একটা তোমার অণ্ডকোষে আরেকটা তলপেটে। তুমি দাপাতে দাপাতে মরছ তা আমি এইখানে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখব।'

তার নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ঘাবড়ে গেল ডর্ট, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মনের সবটুকু ঘেন্না এসে জড়ো হয়েছে ম্যাক্সের চোখেমুখে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে তাকিয়ে আছে সে তার দিকে।

মিঃ ফ্যারার ভয়ে ভয়ে দেখছিলেন দু'জনকেই, ডর্টের বন্দুকবাজি দেখতে একপাল মানুষ এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে বেড়ার ওপাশে। ডর্ট নিজের রিভলভার ছুঁল, কিন্তু খাপ থেকে টেনে বের করার সময় পেলনা তার আগেই ম্যাক্স নিজের রিভলভার বের করে ডর্টের অণ্ডকোষ তাক করে গুলি ছুঁড়ল। ডর্টের হাত থেকে রিভলভার খসে পড়ল। প্রচণ্ড যন্ত্রনায় দুহাতে দু'পায়ের মাঝখানটা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল সে, রক্তে দু'হাত ভরে উঠল। রিভলভার হাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ম্যাক্স তার সামনে দাঁড়াল। 'খানকির বাচ্চা।' ম্যাক্সকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল ডর্ট, মাটি থেকে রিভলভার তুলে তার দিকে তাক করল। কিন্তু এবারও ডর্টের আগে গুলি ছুঁড়ল ম্যাক্স, পরপর দু'বার। একটা তলপেটে, আরেকটা বুকে। গুলি খেয়ে উল্টেচিত হয়ে পড়ল, কেঁপে উঠল তার শরীর। ম্যাক্স রিভলভার হাতে এসে দাঁড়াল তার মাথার কাছে। ডর্টের মৃত্যু যন্ত্রনার ছটফটানি দু'চোখ ভরে উপভোগ করতে লাগল। তার রিভলভারের নলের মুখ দিয়ে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

গ্রেপ্তার হল ম্যাক্স, দু'দিন বাদে সরকারপক্ষ থেকে দুটো প্রস্তাব দেয়া হল তাকে— এক হয় মানুষ খুনের অপরাধে সে আদালতে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াক, নয়ত সেনাবাহিনীতে যোগ দিক।

পূর্ব পরিকল্পনা কার্যকর করতে নয়। নিছক আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই সে খুন করেছে আদালতে তা প্রমাণ করার সুযোগ সে পাবে সরকারপক্ষ থেকে এমন প্রতিশ্রুতির আভাসও দেয়া হলো কিন্তু সাক্ষিদের ওপর ভরসা ম্যাক্সের এতটুকু নেই তাই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার সাহস পেলনা সে।

এমন একজন লোকের সঙ্গের ম্যাক্সের দেখা করার দিনক্ষণ পাকা হয়ে আছে যার নাম তখনও পর্যন্ত জানে না সে।

৭

অস্থির ভাবে ছটফট করছে নেভাদা। ঘরের ভেতর সে ছাড়া আরও কেউ আছে আধো ঘুমের মধ্যে এমন একটা অনুভূতি থেকে থেকে তার হচ্ছে। সিগারেটের জন্য হাত বাড়াতেই হাতটা এসে পড়ল কোটের গায়ে আর সেই আঘাতে তার ঘুমের ঘোর গেল কেটে। তখনই মনে পড়ল সিগারেট দেশলাই সব আছে ডানদিকের বুকপকেটে। হাতড়ে হাতড়ে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে দেশলাই কাঠি জ্বালাল সে। দেশলাই কাঠির বারুদের আলোয় সেই মুহূর্তে রিণাকে দেখতে পেল নেভাদা। দেখল প্রায় উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসে রিণা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তারই মুখের দিকে। সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা দম টেনে নিল নেভাদা, ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে এক ফুঁকে দেশলাই নিভিয়ে বলল 'মিছিমিছি বসে আছো কেন? আমি ত ধরেই নিয়েছিলাম অনেকক্ষর আগে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো।'

'বিশ্বাস করো নেভাদা,' গভীর প্রশ্বাস নিয়ে বলল রিণা 'আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি তাই অনেক চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারছিনা।'

'ভয়, রিণা ভয় পেয়েছো বলছ?' ঠাট্টার চোখে তাকাল নেভাদা, 'কাকে ভয়? কিসের ভয়?'

'আমার পরিণতি কি হবে তখন ভেবে ভয় পাচ্ছি, নেভাদা।' এতটুকু না নড়ে জবাব দিল রিণা।

'সেকি!' নিঃশব্দে হাসল নেভাদা, আশ্বাসভরা গলায় বলল, 'গোটা জীবনই ত পড়ে আছে তোমার সামনে। তাহলে আর কাকে ভয়?'

'তা আমি জানি, নেভাদা।' ফিসফিস করে চাপাগলায় বলল রিণা। আঁধারে তার মুখখানা দেখাচ্ছে উজ্জ্বল প্রতিবিম্বের মত, 'এসব কথা বলে আমি নিজেকে বোঝাই। কিন্তু বললেও এসব কথা এখন আর আমার নিজের বিশ্বাস হয় না।'

'নেভাদা!' আচমকা মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রিণা। কৃপাপ্রার্থীর গলায় আর্তনাদ করে উঠল। 'আমায় দয়া করে বাঁচাও! তুমি ছাড়া আমার বাঁচানোর মত আর কেউ নেই!'

'অস্থির হয়ো না,' রিণার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল নেভাদা, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় নেয়।'

'সে সময় আর কখন আসবে, নেভাদা?' হাত বাড়িয়ে রিণা তার হাত ধরে কর্কশ ধরা গলায় বলল, 'হাজার বুঝিয়ে বললেও বিশ্বাস করবেনা। চিরকাল এই অদ্ভুত মানসিক অনুভূতির শিকার হতে হয়েছে আমায়। যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন থেকে শুরু করে জোনাস কর্ডের বাবাকে বিয়ে করার আগে পর্যন্ত, এই এক অনুভূতি বারবার বিপর্যস্ত করেছে আমায়।'

'মনে হচ্ছে কোনও এক সময় সবাইকেই ভয় পেতে হয়েছে, রিণা।'

'কিন্তু সে ভয় আমার মত নয়।' আতংকে রিণার গলা তখনও কর্কশ শোনাল, 'জানি কোন ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে ভুগে অকালে আমায় মরতে হবে। নেভাদা। ভেতরে ভেতরে আমি তা টের পাই। বিশ্বাস করো।' বলে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে।

কি করবে বুঝতে না পেরে চুপচাপ বসে রইল নেভাদা, রিণা হাপুসনয়নে কাঁদছে, আনমনে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সে বলল, 'তুমি পূর্বদিকে একবার যাও, দেখবে জীবনের চেহারাটাই সেখানে পুরো পাল্টে গেছে। কমবয়সী ছেলেছোকরা ওখানে গিজগিজ করছে, সেই সঙ্গে—'

রিণা হাত তুলতে কথার মাঝখানে থেমে গেল নেভাদা, দেখল ভোরের প্রথম আলোকছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রিণার দেহসৌষ্ঠব, জলে ভরে উঠেছে দু'টি বড় বড় চোখ।

'কমবয়সী ছেলেছোকরার লোভ দেখাচ্ছ, নেভাদা?' বিদ্রুপের সুরে বলল রিণা, 'ওদের নিয়েই আমার যত ভয়। তোমার কি মনে হয় না এই ভয়টুকু না পেলে মাঝবয়সী বাবাকে ছেড়ে জোনাসকেই আমি বিয়ে করতাম?'

জবাব না দিয়ে মুখ বুঁজে রইল নেভাদা।

'পুরুষ মানুষেরা সবাই একইরকম' একটু থেমে আবার খেই ধরল রিণা। ঠোঁট দুটো

মুখের ভেতরে নিয়ে থুতু ছেটানোর ঢং-এ বলল, 'শুধু শরীর, আর শরীর। শরীর ছাড়া আমার কাছ থেকে আর কিছু ওদের চাওয়ার নেই।' অদ্ভুত চোখে রিণার দিকে তাকিয়ে রইল নেভাদা, নারীসুলভ বিষঢালা গলায় কাঁচা খেউরের মত এসব কথা শুনে ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল সে। রিণা চুপ করতে মুখ খুলল নেভাদা।

'তুমি কি আশা করছ, রিণা?' খোলাখুলিভাবে জানতে চাইল নেভাদা, 'এসব কথা তুমি আমায় শোনাচ্ছ কেন?'

'কারণ আমি চাই তুমি আমাকে জানো।' বলল রিণা, 'আমি কি ধাঁচের তা তুমি বোঝ এটাই আমি চাই। এ পর্যন্ত কোনও পুরুষ আমায় জানার বা বোঝার চেষ্টা করেনি।'

সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে ঠোঁটের কাছে এসে পড়েছে, ঠোঁট জ্বলে যাচ্ছে তার উত্তাপে, চটপট সিগারেটটা নিভিয়ে বলল নেভাদা, 'তা এত লোক থাকতে আমাকে বেছে নিলে কেন?'

'কারণ তুমি কচি লোকটি নও,' চটপট জবাব দিল রিণা 'তুমি পরিপূর্ণ পুরুষ মানুষ।'

'আর তুমি,' হাসল নেভেদা। 'নিজেকে তোমার কি মনে হয়?'

'আমি?' অবজ্ঞা ঝরানো চাউনি হেনে বলল রিণা, 'আমার নিজেকে সমবয়সী 'সমকামী' নারী বলে মনে হয়।' রিণার জবাব শুনে হো হো করে হেসে উঠল নেভাদা।

'হেসোনা!' ধমকের সুরে বলল রিণা। 'এর মধ্যে পাগলামির কিছু নেই। ব্যাটাছেলে আর মেয়ে ছেলে, দু'জাতের মানুষের সঙ্গেই জীবন কাটিয়েছি, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়েছি তাদের সঙ্গে। মেয়েমানুষের সঙ্গে দেহমনের সম্পর্ক যতটা ভালভাবে চটপট গড়ে উঠেছে পুরুষ মানুষের বেলায় তা হয়নি।' তিক্ত হাসি হাসল রিণা, 'সব পুরুষমানুষই বোকা হাঁদা। ওরা যা চায় তাই ওদের বিশ্বাস করানো এত সোজা যা বলার নয়। ওদের নিয়ে আমি খুব ভাল খেলাধূলো করতে পারি।'

'হয়ত এখনও পর্যন্ত কোনও খাঁটি মানুষের ধারেকাছে তুমি আসতে পারোনি।' নেভাদার গলায় অহমিকা মাথা চাড়া দিল, 'তাই মনে যা আসছে তাই বলছ।'

'মোটেও না!' প্রতিবাদের সুরে বলল রিণা। পরমুহূর্তে নেভাদা অনুভব করল কম্বলের নিচে হাত গলিয়ে রিণা তার পুরুষাঙ্গ ছুঁয়েছে। জড়বুদ্ধি নেভাদা কিছু বুঝে ওঠার আগেই রিণা নেভাদার কম্বল মুঠো করে ছুঁড়ে ফেলল একপাশে তারপর তার তলপেটে নিজের মুখ চেপে ধরল সজোরে। তলপেটের চারপাশে আর নিচে রিণার জিভ সুড়সুড়ি দিচ্ছে টের পেয়ে রেগে গেল নেভাদা। চুলের মুঠি ধরে রিণার মাথাটা সরিয়ে পেছন দিকে ঠেলে সে বলল 'অ্যাই, এসব হচ্ছে কি শুনি? তুমি আমার পেছনে লেগেছো কেন?'

'তুমিই সেই লোক যে আমায় সঠিকভাবে অনুভব করতে শিখিয়েছে,' ফিসফিস করে জবাব দিল রিণা, জোরে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে, উত্তেজনায় লাল চোখমুখ দেখে বোঝা যায় উদগ্র আসঙ্গলিপ্সার তাড়নায় স্থানকাল পাত্র ভুলে গেছে সে। 'দয়া করো নেভাদা, দয়া করো। দোহাই তোমায়!' বড়বড় চোখ মেলে বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল রিণা, 'কিভাবে আমি আমার ভালবাসা দিয়ে তোমায় ভরিয়ে দিতে পারি দয়া করে তা প্রমাণ করতে দাও।'

কি মনে হতে আচমকা কৌচ থেকে নেমে দাঁড়াল নেভাদা, পায়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের সামনে। একপাশে জমানো লকড়ি থেকে দু'একটা তুলে নিয়ে আগুন উসকে লকড়ি গুঁজে দিল আগুনে। উত্তাপ বেড়ে উঠতে মুখ ফিরিয়ে রিণার দিকে তাকাল নেভাদা। দেখল রিণা তখনও কৌচের সামনে মেঝেয় একভাবে বসে, অদ্ভুত চাউনি মেলে দেখছে তাকে।

'তোমাকে যখন এখানে আসতে বলেছিলাম রিণা' ধীরপায়ে কৌচের কাছে ফিরে এসে বলল নেভাদা, 'তখন ভেবেছিলাম ঠিক কাজই করছি।' বলে কৌচে বসল নেভাদা, হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। রিণা সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল। সরস গলায় বলল, 'বলো, নেভাদা। তারপর?'

দেশলাই-এর আগুন প্রতিফলিত হল নেভাদার দু'চোখে। আগুন নিভে যেতে সে বলল, 'রিণা, তুমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ সে লোক আমি নই।'

'না, নেভাদা।' তার গালে আলতো করে আঙুল ছোঁয়াল রিণা। 'তোমার একথা সত্যি নয়।'

'হয়ত নয়।' বলল নেভাদা। পরমুহূর্তে হালকা হাসির রেখা ফুটল তার ঠোঁটে। 'কিন্তু এখন দেখছি তোমার পক্ষে আমি খুব কমবয়সী। শুধু তোমার শরীরটুকু এ ছাড়া তোমার প্রতি আমার আর কোনও মোহ নেই।'

অবাক হয়ে এক মুহূর্ত তার দিকে তাকাল রিণা তারপর সেও হাসল। উঠে দাঁড়িয়ে নেভাদার ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা একরকম ছিনিয়ে নিল রিণা। তারপর নিজের ঠোঁট ছোঁয়াল। এরপরে হেঁটে আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রিণা। নেভাদার দিকে মুখ করে গভীর ভাবে কয়েকবার দম দিল সে।

'হয়ত এতে ভালই হল।' বলতে বলতে নেভাদার ছড়িয়ে দেয়া দু'হাতের মাঝখানে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলল রিণা, 'এবার আমরা বন্ধু হতে পারব।'

৮

'শো নিয়ে ঝামেলা পাকিয়েছে,' বলল ক্যাশিয়ার।

আড়চোখে নেভাদা তাকাল রিণার দিকে। টিকেট বিক্রির ওয়াগানের ভেতরে বসে সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, ওয়াইল্ড ওয়েস্ট শো দেখছে মন দিয়ে। খোলা মাঠে একাধিক ঘোড়ার খুরের খপ্খপ্ আওয়াজ আর থেকে থেকে অভিনেতাদের কানফাটানো চিৎকার তাদের ফিরিয়ে আনল বর্তমানে।

'কি এমন ঝামেলা, শুনি।' রিণার দিক থেকে ঘাড় ফেরাল নেভাদা। 'ঝামেলা বলে ঝামেলা।' হতাশা ফুটে বেরোল ক্যাশিয়ারের গলায়, 'আমাদের শো বুক করা হয়েছে বাফেলো বিল কোডি শো-র ঠিক এক হপ্তা পরে, পুরো গ্রীষ্মকালের জন্য এই ব্যবস্থা। ভেবে দেখলেই বুঝবেন এর ফলে এবারের সিজনে আমাদের কিছু না হোক কম করে চল্লিশ হাজার ডলার লোকসান হবে।'

অনুষ্ঠানের আঙিনা থেকে ভেসে এল বিউগলের আওয়াজ—আক্রমণের সংকেত।

কাঠের চেয়ারে বসে নেভাদা কাগজে তামাক পুড়ে মন দিয়ে সিগারেট বানাতে লাগল। অনুষ্ঠান এতক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভয়ঙ্কর লড়াকু জংলি রেড ইণ্ডিয়ানদের হাতে অবরুদ্ধ মাটি কাটা পাইওনিয়ার্স বাহিনীকে উদ্ধার করতে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে ঘোড়সওয়ার বাহিনী। সিগারেট পাকিয়ে ঠোঁটে গুঁজল নেভাদা।

'আপনার চোখের সামনে এমন একটা বাজে বিশ্রি ব্যাপার ঘটল কিভাবে তাই আমার মাথায় ঢুকছেনা?' ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে জানতে চাইল সে।

'বিশ্বাস করো নেভাদা।' চটপট জবাব দিল ক্যাশিয়ার, 'এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এসব কিছুর জন্য এজেন্ট একাই দায়ী বলে আমার ধারণা।'

জবাব না দিয়ে নেভাদা গম্ভীর মুখে সিগারেট ধরাল।

'এবার তুমি কি করবে?' ভিতু গলায় জানতে চাইল ক্যাশিয়ার।

'কি আবার করব।' অনেকটা ধোঁয়া ভেতরে নিয়ে বলল নেভাদা, 'এই সিজ্ন-এর মত শো বন্ধ রাখব।'

'চল্লিশ হাজার ডলার লোকসান করেও?' আঁতকে উঠল ক্যাশিয়ার, 'এত লোকসান সয়ে টিকে থাকার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

ক্যাশিয়ারের চোখমুখ খুঁটিয়ে দেখল নেভাদা, 'উত্তেজনায় লোকটার মুখখানা যে লাল হয়ে উঠেছে তা তার চোখ এড়ালনা। শো-এর সঙ্গে আমার মালিকানা সম্পর্ক, লাভ হোক চাই লোকসান হোক সে আমি বুঝব,' মনে মনে ভাবল নেভাদা। লোকসান হলেও তা ত ওর নিজের পকেট থেকে যাবে না তাহলে ও এত ঘাবড়ে যাচ্ছে কেন?

'এই লোকসান এখন সইতে না পারলে আমরা টিকতে পারবনা,' জোরগলায় বলল নেভাদা, 'এছাড়া অন্য উপায়ই বা কোথায়?' বলে উঠে দাঁড়াল নেভাদা। সিগারেট ঠোঁটে চেপে খোলা জানালা দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। দেখল, জংলি আদিম রেড ইণ্ডিয়ানেরা ঘোড়ায় চেপে ঝাঁকে ঝাঁকে পালাচ্ছে আর সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার বাহিনী হাতিয়ার উঁচিয়ে তাদের পিছু নিয়েছে।

'মিসেস কর্ডকে নিয়ে আমি রেল স্টেশনে যাচ্ছি,' ক্যাশিয়ারের দিকে তাকাল নেভাদা, ওখান থেকে ফেরার পথে আমি এজেন্টের অফিসে যাব। আমি না ফেরা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন।'

'তাই হবে, নেভাদা' বলল ক্যাশিয়ার।

রিণার হাত ধরে ওয়াগন থেকে নেমে এল নেভাদা। শো শেষ, রেড ইন্ডিয়ান আর ঘোড়সওয়ার সাজা অভিনেতারা লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে ঢোকাচ্ছে খোঁয়াড়ে, তার মধ্যে এ ওর নাম ধরে চেঁচামেচি করছে, সেইসঙ্গে হাল্কা নেশাজড়ানো গলায় গালিগালাজ করছে। ঘোড়াগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে এরপর যে যার ওয়াগনে ঢুকে মুখের রং কালি ধুয়ে মুছে ভদ্র জামাকাপড় পরবে।

পায়ে পায়ে হেঁটে মাঠ পেরোল দু'জনে। গাড়ির কাছাকাছি এসে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল রিণা। আকুলভাবে বলল, 'নেভাদা, দয়া করে আমায় তোমার সঙ্গে থাকতে দাও।'

'এ ব্যাপারে, আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া যা হবার হয়ে গেছে রিণা' নেভাদা বলল, 'আবার নতুন করে সে প্রসঙ্গ তুলছ কেন?'

'কিন্তু নেভাদা,' ঐকান্তিক চাহনি মেলে তাকাল রিণা। 'বিশ্বাস করো। পূর্বাঞ্চলে আমার করার মত কিছু নেই। এখানে অন্ততঃ নানারকম অনুষ্ঠান, আর উত্তেজনার মধ্যে বেঁচে থাকার অনুভূতিটুকু পাওয়া যায়—'

'ছেলেমানুষী কোরনা,' মৃদু ধমক দিল নেভাদা, 'তুমি পরিণত নারী। এই জীবন এখন ওপর ওপর ভাল লাগলেও হপ্তাখানেক বাদে ভীষণ একঘেয়ে ক্লান্তিকর ঠেকবে।'

'আমায় থাকতে দিলে এই সিজ্‌নে তোমার যা লোকসান হবে তার অর্দ্ধেক আমি বহন করব,' চটপট বলল রিণা।'

তীক্ষ্ণ চাউনি মেলে রিণার দিকে তাকাল নেভাদা। ক্যাশিয়ারের সঙ্গে সে যখন শো-এর লোকসানের ব্যাপারে কথা বলছিল সেইসময়.ওয়াগানের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রিণা যুদ্ধের নকল মহড়া দেখছে এটাই ধরে নিয়েছিল নেভাদা। কিন্তু তাদের ব্যবসায়িক কথাবার্তার পুরোটাই রিণা কান খাড়া করে শুনেছে তা আঁচ করতে পারেনি সে।

'সে ক্ষমতা তোমার নেই, রিণা,' সংক্ষেপে বলল নেভাদা।

'তুমি নিজে বুঝি বইতে পারবে?' রুখে দাঁড়াবার ঢং-এ বলল রিণা।

'একশোবার,' আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গলায় বলল নেভাদা। 'তোমার চেয়ে বেশি বইতে পারব।'

হতাশ চোখে কয়েক মুহূর্ত নেভাদার দিকে তাকিয়ে নেভাদার গাড়িতে উঠে বসল রিণা। স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে ওঠার আগে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না।

'তুমি আমায় চিঠি লিখবে ত, নেভেদা?' ট্রেনে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল রিণা।

'কথা দিতে পারছিনা' বলল নেভাদা, 'আসলে চিঠিপত্র লেখার ধাত আমার নেই।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে ত?' জেদি গলায় জানতে চাইল রিণা 'আমার চিঠির জবাব দেবে ত?'

জবাব না দিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল নেভাদা।

'মাঝে মাঝে একা লাগলে ভয়ভয় করলে তোমার কাছে আসতে দেবে ত?'

'রাগ করার কি আছে,' বলল নেভাদা। 'তাহলে আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকে কি লাভ?'

'বন্ধু?' রিণার দু'চোখ ছলছল করে উঠল। ধরাগলায় বলল, 'সত্যিই তুমি খুব ভাল বন্ধু, নেভাদা। এমন বন্ধু পাওয়া যায়না।' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নেভাদার ঠোঁটে চুমু খেল রিণা। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও ছাড়ল। অনেকক্ষর পর্যন্ত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তার দিকে হাত নাড়ল রিণা। ট্রেন দূরে মিলিয়ে যেতে নেভাদা স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এল। কয়েক পা এগিয়ে একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সে। সামনে গায়ে গায়ে ঘেঁষা রোগা জীর্ণ সিঁড়ির ধাপ বেয়ে এল ওপরে ধুলোর পলেস্তারা মাখা বারান্দায়। সামনে কাঠের কামরা। তার রং চটা দরজাতে অপটু ছাঁদে লেখা—**ড্যানিয়েল পিয়ার্স—বুকিং এজেন্ট।**

দরজা খুলে কামরার ভেতরে পা দিল নেভাদা, ভেতরে অফিস যার চেহারার বাইরের বারান্দার মতই জীর্ণ, ধুলোমাখা বিশৃঙ্খল। সামনের ডেস্কে একগাদা কাগজপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ানো, অফিসের কাজে লাগে এমন অনেক টুকিটাকি জিনিসও ছড়ানো আছে তার মধ্যে। টেবলের ওপাশে বসে একটি মেয়ে একমনে কাজ করে চলেছে। নেভাদাকে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে। কিছুদিন আগে লাগানো হেনার আভাস এখনও রয়ে গেছে তার চুলে। মাড়ি বের করে অভদ্রের মত মেয়েটি খেঁকিয়ে উঠল, 'কাকে চাই?'

'ড্যান পিয়ার্স আছেন?' স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইল নেভাদা।

নেভাদার গায়ে পুরোনো জীর্ণ চামড়ার জ্যাকেট। পরণে ফ্যাকাশে লেভিস জিনসের ট্রাউজার্স, মাথায় চওড়া কানাত দেয়া কাউবয় টুপি। কয়েক মুহূর্ত এসব খুঁটিয়ে দেখে মেয়েটি বলল, 'চাকরির ধান্দায় এসে থাকলে আগেই বলে রাখছি সে গুড়ে বালি, এখানে ওসব মিলবেনা।'

'আপনি ভুল করছেন,' চটপট বলল নেভাদা। 'চাকরি নয়। আমি এসেছি মিঃ পিয়ার্সের কাছে।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'না।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া উনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না।' অভদ্রের মত বলল মেয়েটি।

'ওঁকে একবার গিয়ে বলুন' আমি ওয়াইল্ড ওয়েস্ট শো থেকে এসেছি,' নেভাদা বলল, 'শুনলে উনি ঠিকই দেখা করবেন।'

'বাফেলো বিল শো?' ওয়াইল্ড ওয়েস্ট শো-র নাম শুনে কৌতূহলী হল মেয়েটি।

'না।' ঘাড় নাড়ল নেভাদা, 'আমি আসছি দ্য গ্রেট সাউথ-ওয়েস্ট রোডিও শো থেকে।'

'ও, বুঝেছি, বুঝেছি,' কৌতূহল নিমেষে মুছে গেল মেয়েটির মুখ থেকে। 'ঐ যে কি আরেকটা শো আছে সেখান থেকে আসা হচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছেন,' ঘাড় নেড়ে সায় দিল নেভাদা। 'ঐ যে কি আরেকটা শো, আমি সেখান থেকে আসছি।'

'কিন্তু সাহেব ত এখন নেই,' বলল মেয়েটি।

'কোথায় গেলে পাব ওঁকে?'

'তা বলতে পারবনা। যতদূর জানি উনি মিটিং করতে গেছেন।'

'কোথায়, কতদূরে?' গলা অল্প চড়াল নেভাদা। তার গলায় চোখের চাউনিতে এমন কিছু ফুটল যা দেখে মেয়েটি আর এড়িয়ে যেতে পারলনা, মুখ ফুটে বলে ফেলল 'উনি নর্ম্যান পিকচার্সে গেছেন। একটা ওয়েস্টার্ন ছবির খদ্দের জোগাড় করার ব্যাপারে ওদের সঙ্গে ওঁর জরুরি কথাবার্তা আছে, এর বেশি কিছু আমি নিজেও জানিনা।'

'সেখানে যাব কিভাবে?'

'ওয়ার্নার্স চেনেন ত? ওয়ার্নার্স ছাড়িয়ে ইউনিভার্সালের পাশ কাটিয়ে ল্যাংকারশিম বুলেভার্ড-এর দিকে কয়েক পা এগোলেই নর্ম্যান পিকচার্সের অফিস দেখতে পাবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলে বেরিয়ে এল নেভাদা।

ল্যাংকারশিমে পৌঁছোতে ইউনিভার্সাল স্টুডিওর সামনে মাটিতে দাঁড় করানো এক পেল্লায় বোর্ড নেভাদার চোখে পড়ল তাতে লেখা—

ইউনিভার্সাল পিকচার্স পরিবেশিত

দ্যা হোম অফ টম মিক্স অ্যাণ্ড টনি

দেখুন

রাইডার্স অফ্ দ্য পারপল সেজ

ইউনিভার্সাল পিকচার প্রযোজিত

কয়েক মিনিট বাদে ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এর সামনে দিয়ে যাবার সময় আরেকটি বোর্ড তার চোখে পড়ল তাতে বিজ্ঞাপনের বয়ানে লেখা—

ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর পরিবেশনায়

মিল্টন সিল্‌স অভিনীত

দ্য সী হক্

এক ভিটাগ্রাফ প্রযোজনা

এরপরে প্রায় পাঁচ মাইল পথ হেঁটে নর্ম্যান স্টুডিও-র সামনে আবার বিশাল বোর্ডে বিজ্ঞাপন দেখতে পেল নেভাদা—

বার্ণার্ড বি নরম্যান প্রোডাকশনস সব তারকাদের নিয়ে পরিবেশন করছে

দ্য শেরিফ অফ্ পিসফুল ভিলেজ

সর্বস্তরের তারকাদের নিয়ে তোলা ছবি। স্টুডিওর বিশাল গেটে দাঁড়ানো দারোয়ান তার পথ রুখতেই নেভাদা জানতে চাইল 'ড্যান পিয়ার্স ভেতরে আছেন?'

'একটু দাঁড়ান, একবার দেখে নিই,' বলে দারোয়ান কাছেই একটা বুথে গিয়ে ঢুকল। একটা কাগজে চোখ বুলিয়ে ফিরে এসে বলল, 'মনে হচ্ছে উনি আপনার জন্যই বসে আছেন। ওঁকে পাবেন পেছন দিকে। এই পথ ধরে সোজা পেছন দিকে চলে যান, ঠিক পেয়ে যাবেন।'

দারোয়ান সরে দাঁড়াতে ঘোড়ার পিঠে চেপে স্টুডিওর ভেতরে ঢুকল নেভাদা। দু'পাশে প্রচুর লোকের ভিড় তাই আস্তে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। স্টুডিওর ভেতরে পরপর কতগুলো বাড়ি পেরোনোর পরে নেভাদা এক নির্জন জায়গায় এসে পৌঁছোল, এখানে চারপাশে ঝোপঝাড় আর কিছু নকল পাহাড় ছাড়া আর কিছু নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সামনের পাহাড়টার নিচে বসানো বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা পিসফুল ভিলেজ-এর সেট এখানেই, গাড়ি পার্ক করুন। বোর্ডে আঁকা তীর চিহ্ন দেখে আরও কয়েক পা এগোতে সে দেখল পথের একধারে অনেকগুলো গাড়ি আর ট্রাক দাঁড়িয়ে। একটা ট্রাকের পাশে একটা লোক টুল পেতে বসে আপনমনে সিগারেট টানছিল। গাড়ি থেকে নেমে নেভাদা তার কাছে এসে জানতে চাইল, 'ড্যান পিয়ার্স কি এখানে আছেন?'

'উনি কি পিসফুল-এর ক্রু-তে আছেন?' মুখ না তুলে লোকটা পাল্টা প্রশ্ন করল।

'তাই ত মনে হচ্ছে,' না বুঝে বলে বসল নেভাদা।

'উনি দলবল নিয়ে সামনের ঐ পাহাড়টার ওপরে আছেন।' লোকটা বলল, 'ওখানে গেলেই ওঁকে পেয়ে যাবেন।'

পাহাড়টার চূড়ায় উঠে নেভাদা দেখল একটু নিচে একদল লোক জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে।

'স্টার্ট ক্যামেরা? ওরা আসছে!' তাদের মধ্যে একজন ভারী গলায় হেঁকে উঠল। নেভাদা দেখল সে যেখানে দাঁড়িয়ে তার ঠিক নিচেই মেঠোপথ ধরে একটা দূরপাল্লার ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসছে। বাঁক নেবার মুখে গাড়ির চালক গাড়োয়ানের সিট থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল রাস্তার ওপাশে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলো জোয়ালের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল ফলে গাড়িটা পুরো উল্টে গড়িয়ে পড়তে লাগল পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে। ধূলোয় চারদিক ভরে উঠল।

'কাট্! কাট্! গেল যা!' খানিক আগের সেই গলার চিৎকার আবার শোনা গেল। 'না রাসেল, তুমি সত্যিই এবার ডোবালে! এত আগে গাড়ি থেকে লাফ মারতে কে বলল তোমায়? তুমি লাফিয়ে পড়ার পরে ফিল্মে গাড়ির চল্লিশটা ফ্রেমও উঠলনা তার আগেই ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়ল! না! সব বারোটা বাজিয়ে দিলে হে!'

গাড়োয়ানের মুখে কথাটি নেই, টুপি দিয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে সে ভিড়ের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

নেভাদাও চূড়ো থেকে নেমে এল নিচে, ভিড়ের মধ্যে ড্যান পিয়ার্সকে কিছুক্ষণ খুঁজে বেড়াল কিন্তু তার হদিশ পেল না।

ফিল্মের বড় কৌটো নিয়ে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখে আগ্রহ ভরে এগিয়ে গেল সে, জানতে চাইল, 'ড্যান পিয়ার্সকে দেখছিনা। উনি গেলেন কোথায়?'

'আমি জানি না,' লোকটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। সামনে নিকারবোকার পরা এক যুবককে ইশারায় দেখাল, 'একে জিজ্ঞেস করুন, ও বলতে পারবে।' শুনেই নেভাদা অন্য লোকটিকে একই প্রশ্ন করল, 'ড্যান পিয়ার্স কি এখানে আছেন?'

'খানিক আগেও ছিলেন।' লোকটা বলল, 'তারপর ওঁর একটা টেলিফোন এল, সেটা ধরতে উনি সামনের অফিসে গেছেন।'

'ধন্যবাদ', বলল নেভাদা। 'আমি অপেক্ষা করব,' বলে তামাক বের করে কাগজে পুরে সিগারেট পাকাতে লাগল সে।

'পিয়ার্স কি সেই হতচ্ছাড়া স্টান্টম্যানটাকে নিয়ে এল?' খানিক আগের খনখনে গলা আবার হেঁকে উঠল।

'পিয়ার্স সে লোকটাকে টেলিফোন করতে গেছেন।' এইটুকু বলতেই তার চোখ পড়ল নেভাদার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে সে জোর গলায় জবাব দিল, 'এক মিনিট স্যার, কথা বলছি আপনার সঙ্গে।' নেভাদার দিকে তাকিয়ে বলল 'তাহলে আপনিই কি সেই লোক যার জন্য পিয়ার্স সাহেব বসে ছিলেন?'

'তাই ত মনে হচ্ছে,' কিছু না ভেবে জবাব দিল নেভাদা।

'আসুন আমার সঙ্গে,' বলে লোকটা তাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল ইউনিটের

ক্রু-র দিকে। ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে লম্বা দেখতে একটি লোক কি যেন দেখছে, তার কাছে এসে সঙ্গি লোকটি ইশারায় নেভাদাকে দেখাল, 'আজ্ঞে এই সেই লোক যার অপেক্ষায় পিয়ার্স এতক্ষণ বসেছিলেন।'

যাকে লক্ষ করে বলা সে ঘুড়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত দেখল নেভাদাকে তারপর পাশের খাড়া উঁচু পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল তুলে বলল, 'ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নদীতে লাফিয়ে পড়তে পারবে? ঘোড়ার পিঠে চেপে লাফাতে হবে কিন্তু।' তার কথা শেষ হতে ঝুঁকল নিভাদা, দেখল খাড়া পাহাড়ের নিচে প্রচণ্ড বেগে নদী বয়ে যাচ্ছে। লোকটির কথা অনুযায়ী তাকে ঘোড়ার পিঠে চেপে কম করে ষাট ফিট নিচে লাফিয়ে পড়তে হবে। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফাতে হিসেবে যা দাঁড়াবে পনেরো ষোল ফিট।

'ওখানে পঁচিশ ফিট মাটি খোঁড়া আছে,' লোকটি আবার বলল, কথা বলার ধরন দেখে নেভাদা বুঝল এই লোকটিই ছবির পরিচালক। জলের ভেতর পঁচিশ ফিট গর্ত মানে যথেষ্ট গভীর, মনে মনে হিসেব করল নেভাদা। এবং ঘোড়ার পিঠে চেপে লাফিয়ে পড়লেও কাজটায় যথেষ্ট ঝুঁকি আছে।

'কি হে, কি ভাবছ?' পরিচালক খোঁচা দিয়ে বলল, 'জবাব দিতে এতক্ষণ লাগে? এ আর এমন কি আমি যতদূর জানি এর চেয়ে অনেক বড় বড় বিপদের মুখে জান হাতে নিয়ে তুমি শট দিয়েছো। আজ এই পঁচিশ ফিট শুনেই ঘাবড়ে গেলে? তাহলে আর তোমাকে দিয়ে—'

'মনে হচ্ছে পারব' বলল নেভাদা। 'আমি পারব না একথা একবারও বলিনি। তা আমায় দেবেন কত?'

'তুমি পারবে? সত্যিই পারবে?' গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল পরিচালক, 'যাক যথেষ্ট হিম্মত আছে এমন একটা লোক এতক্ষণে তাহলে পাওয়া গেল। পারিশ্রমিকের কথা বলছিলে না? আমরা সাধারণ স্টান্টের বেলায় শট পিছু নব্বুই ডলার দিই, তা তোমার না হয় পুরো একশো ডলারই দেব।'

'আপনি ভুল করছেন,' হাসল নেভাদা, 'স্টান্টম্যান নই, আমি এসেছি ড্যান পিয়ার্সের খোঁছে।'

'তোমরা কাউবয়েরা সবাই একরকম।' অবজ্ঞায় মুখ বেঁকিয়ে লোকটি বলল, 'শুধু মুখেই বড় বড় বাতেল্লা, কাজের বেলায় হিম্মতের ছিটেফোঁটাও নেই।'

কয়েক মুহূর্ত লোকটার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নেভাদা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে টের পেল তার রাগ ধাপে ধাপে মাথায় চড়ছে। পরিচালকের কথায় নয়, আসলে ড্যান পিয়ার্সের খোঁজে এসে তাকে না পেয়ে ভেতরে ভেতরে রেগে উঠছে সে। ঠাণ্ডামাথায় নেভাদা বলল, 'শুনুন মশাই, আপনি আর যাকে কি দেন আমি জানতে চাইনা। তবে আমায় দিয়ে ঐ ষ্টান্ট রাইড-এর শট নিতে হলে পুরো পাঁচশো ডলার পারিশ্রমিক দিতে হবে, তার কম নয়।'

'কি বললে, একলাফে একেবারে পাঁচশো?' পরিচালক হাসল, 'হলিউডের অভিনেতারা

কেউ যে এই শট দিতে রাজি হয়নি তা নিশ্চয়ই শুনেছো কারও মুখ থেকে তাই এত বেশি দর হাঁকছো?'

জবাব না দিয়ে মুখ বুঁজে রইল নেভাদা।

'ঠিক হ্যায়, পাঁচশোই দেব,' পরিচালক বলল। 'তুমি তাহলে ওদিকে চলে যাও। ওখানে ঘোড়া আছে, তার পিঠে চেপে দৌড়োনোর জন্য তৈরি হও। এদিকে একটা শীট্ বাকি আছে, তুমি তৈরি হতে হতে সেটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি।'

ঘোড়াটা মাদী, তবে ভাল জাতের, একবার পিঠে হাত বুলিয়েই টের পেল নেভাদা। তার বাড়িয়ে দেয়া মিশ্রি পুরোটা খেল, আদর করে নাক ঘষল তার গায়ে। ঘোড়াদের ধাত খুব ভাল জানে নেভাদা, এই মাদী ঘোড়াটা যে তার ইচ্ছেমতন ছুটতে রাজি এসব তারই লক্ষণ।

ঘোড়ার পিঠে চেপে ওপাশের খাড়া পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে চূড়ার কাছাকাছি উঠে গেল নেভাদা। ঘাড় ফেরাতে দেখল সেট তৈরি, ক্যামেরার লেন্স তার দিকে তাক করা। পরিচালক তাকে মুখ ফেরাতে দেখেই হাত নামিয়ে ছোটার ঈশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছোটাল সে। চূড়া থেকে নেমে এসে খাড়া পাহাড়ের গা থেকে নিচে নদী লক্ষ করে ঘোড়া সমেত লাফ দিল নেভাদা। লাগাম ধরে আঁকড়ে বসে থাকতে থাকতে সে টের পেল নিচের দিকে চোখ পড়তে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে গেছে, তার কলজের ধুকপুকুনি গেছে বেড়ে। দুপাশের রেকাবি থেকে জুতো পরা পা খুলে নিল সে, জলে পড়ার আগের মুহূর্তে ছিটকে লাফিয়ে পড়ল জিন থেকে। জলে পড়েই সাঁতরে তীরে চলে এল নেভাদা। ডাঙ্গায় উঠে দেখল ঘোড়াটা জল থেকে উঠতে পারছেনা। ঘাড়া তুলে অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে, দু'চোখের চাউনিতে তীব্র যন্ত্রনা তার নজর এড়ালনা।

'সাব্বাশ! এমন শট লাখে একটা হয়।' বলতে বলতে পরিচালক এগিয়ে এল, 'নাঃ, আপনি পেশাদার স্টান্টম্যান না হলেও ওদের চেয়ে কম বাহাদুর নন দেখছি।'

'ওসব পরেও বলার সময় পাবেন,' ইশারায় জলের মধ্যে পড়ে থাকা অসহায় ঘোড়াটাকে ইশারায় দেখাল নেভাদা, 'বেচারির পিঠের হাড় ভেঙ্গে গেছে, ও আর উঠে দাঁড়াতে পারবেনা। এই অবস্থায় গুলি করে মারা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। জল ক্রমেই বাড়ছে, ও আর ঘাড় তুলে রাখতে পারছেনা, এক্ষুণি কিছু না করলে বেচারি তলিয়ে যাবে!'

'ওটা আমিও লক্ষ করেছি,' খুব স্বাভাবিক গলায় বলল পরিচালক, 'আমার সঙ্গে অবশ্য রিভলভার আছে, কিন্তু এতদূর থেকে রিভলভারের গুলি ওর কপালে নাও বিঁধতে পারে। আপনি ও নিয়ে ভাববেন না, আমি রাইফেল আনতে লোক পাঠিয়েছি!'

তার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন রাইফেল নিয়ে এল, নেভাদা তাই দিয়ে ঘোড়ার দু'চোখের মাঝখানে টিপ করে পরপর দু'বার গুলি ছুঁড়ল। ঘোড়ার ঘাড়টা এলিয়ে ডুবে গেল। রক্তে নদীর অনেকটা জল লাল হয়ে উঠল। রাইফেল ফিরিয়ে দিতে পরিচালক সিগারেট অফার করল। সিগারেট ধরিয়ে বুক ভরে সবে দম দিয়েছে এমন সময় একটি লোক প্রচণ্ড জোরে ছুটতে ছুটতে এসে তাদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরিচালকের

দিকে তাকিয়ে কর্কশগলায় বলল, 'দুঃখিত, মিঃ এলস্টার। কিন্তু বিশ্বাস করুন, অনেক খুঁজেও আমাদের স্টান্ট রাইডার হতচ্ছাড়ার হদিশ পেলাম না। রাস্কেলটা কোন মাগির গোয়ালে ঢুকে বসে আছে কে জানে! থাক, কথা দিচ্ছি আগামিকাল আরেকজন স্টান্টম্যান ঠিক এনে হাজির করব।'

'সেকি, পিয়ার্স,' অবাক চোখে তার দিকে তাকাল পরিচালক, 'এতটা পথ এলে। কেউ তোমায় বলেনি যে ঐ শট নেয়া হয়ে গেছে, এই শটের জন্য আর কোনও স্টান্টরাইডার আমাদের দরকার নেই?'

'না। বলেনি ত,' অবাক হল ড্যান পিয়ার্স, 'কে শট দিল তাহালে, কাকে দিয়ে কাজ সারলেন?'

'ইনি করেছেন,' ইশারায় নেভাদাকে দেখাল পরিচালক, 'এঁর শট তোমায় ঐ স্টান্টরাইডারের চেয়ে হাজার গুণ ভাল উতরেছে!'

'কার কথা বলছেন?' হাসল ড্যান পিয়ার্স, স্টান্ট রাইডার হতে যাবে কেন। এত আমাদের নেভাদা, নেভাদা স্মিথ, গ্রেটসাউথ ওয়েস্টার্ন রোডেও আর ওয়াইল্ড ওয়েস্ট শো-এর মালিক। তারপর। বলো নেভাদা তুমি এখানে এসে জুটলে কি করে?'

'এসেছিলাম তোমারই খোঁজে,' বলল নেভাদা, 'তোমার হদিশ না পেয়ে পাকেচক্রে এঁদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। যাক্‌গে, এবার বলোত, ড্যান, আমাদের শো-কে পিছিয়ে দিতে কোডি শো-এর মালিক কত হাজার ডলার ঘুষ দিয়েছে তোমায়?'

'রেখে দাও ওসব ছেঁদো ব্যাপার!' ড্যান পিয়ার্স জবাব দেবার আগেই পরিচালক ডন এলস্টার এসে দাঁড়াল দু'জনের মাঝখানে। নেভাদাকে বলল, 'তোমার মত একজন লোকই আমার দরকার, স্মিথ আমার কথা শোন, তোমার ঐসব শো বেচে দিয়ে আমাদের সঙ্গে চলে এসো। আজ যা করলে এই স্টান্টম্যানের কাজই করবে। গোড়ায় আমি তোমায় ফি হপ্তা আড়াইশো ডলার দেব।'

'একদম নয়!' অত সস্তায় নেভাদা স্মিথকে পাওয়া যায় না ডন এলস্টার!' জোরগলায় বলে উঠল ড্যান পিয়ার্স- 'ওর কাছ থেকে ভাল কাজ পেতে হলে গোড়ায় হপ্তা পিছু এক হাজার ডলার দিতে হবে!'

নেভাদা কিছু বলতে যেতেই ড্যান পিয়ার্স হেঁকে উঠল, 'চোপ্‌! নেভাদা। ভুলে যেয়োনা আমি তোমার এজেন্ট, তোমার পেশায় সমরকম ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব তুমি নিজেই আমায় সঁপে দিয়েছো। এসব ব্যাপারে আমি যে সিদ্ধান্ত নেব তা মেনে নিতে তুমি বাধ্য। শুনুন মশাই,' ডন এলস্টারের দিকে তাকাল ড্যান পিয়ার্স, ঈশারায় নেভাদাকে দেখিয়ে বলল, 'নিজের কানেই শুনলেন আমি এঁর এজেন্ট। নেভাদা সত্যিসত্যি যদি স্টান্টম্যানের পেশা গ্রহণ করতে চায় তাহলে একঘন্টার মধ্যে আমি ওকে নিয়ে যাব হলিউডে, সেখানে ওর কাজের অভাব হবে না। তার আগে ওকে একবার ইউনিভার্সাল আর ওয়ার্নারেও নিয়ে যাব। নেভাদাকে পেলে ওরা লুফে নেবে। এসব ভেবে তারপর অফার দিন।'

'হপ্তা পিছু পাঁচশো ডলার,' ড্যান পিয়ার্সের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল ডন এলস্টার, 'এই আমার শেষ অফার।'

'তাহলে ত ফয়সলা হয়েই গেল,' নেভাদার হাত ধরে টানল পিয়ার্স, 'চলে এসো নেভাদা। তোমায় একবার ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এ নিয়ে যাই। তোমায় পাবার জন্য স্টুডিও গুলো সব হা পিত্যেশ করে মরছে। তোমায় পেলে ওরা টস মিক্সকে ঠিক পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে।

'ঠিক আছে বাপু,' ডন এলস্টার হেঁকে উঠল, 'গোড়ায় নেভাদাকে আমি হপ্তা পিছু সাড়ে সাতশো ডলারই না হয় দেব।'

'গোড়ায় প্রথম ছ'মাসের জন্য,' বলল ড্যান পিয়ার্স, 'তারপর হপ্তাপিছু হাজার ডলার। তারপর ছ'মাস পরপর বছরে মোট দু'বার মজুরি বাড়াতে হবে।'

'ঠিক আছে যা চাইছেন তাই দেব,' পাছে শিকার হাতছাড়া হয় এই ভেবে ডন এলস্টার রাজি হল পিয়ার্সের প্রস্তাবে, তার সঙ্গে করমর্দন করে নেভাদার হাতে হাত মেলাল। 'আপনার নামটি কি ভাই?' গলা নামিয়ে জানতে চাইল ডন এলস্টার।

'স্মিথ, নেভাদা স্মিথ।'

'বয়স কত?'

'ত্রিশ, মিঃ এলস্টার,' নেভাদা মুখ খোলার আগে বলে উঠল ড্যান পিয়ার্স।

'প্রচারে সুবিধের কথা ভেবে আমরা সবার কাছে বলব উনত্রিশ,' বলল ডন এলস্টার। নেভাদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হাতে পিয়ার্সের চিমটি খেয়ে মুখ বুঁজল সে। 'আপনারা একবার আমার সঙ্গে অফিসে আসুন,' ডন এলস্টার বলল, 'নেভাদাকে নরম্যানের কাছে গিয়ে বলতে পারব 'পিসফুল ভিলেজ'-এর শেরিফকে এতদিনে খুঁজে পেয়েছি।'

শেরিফ! পরিচালক এলস্টার-এর কথা শুনে নেভাদার হাসি পেল। তার মত এক জেলপালানো-কয়েদীর কপালে শেষপর্যন্ত শান্তিরক্ষক পুলিশপ্রধান শেরিফের কাজ জুটল। সেই ব্যাজ বুকে আঁটার সুযোগ পাবে সে। এখবর শুনলে যাদের সঙ্গে একসময় কাটিয়েছে জেলের সেইসব কয়েদীদের হাবভাব, চাউনি না জানি কেমন হবে। অবশ্য বাস্তবে নয়। ফিল্মে ঐ ব্যাজ বুকে এঁটে শেরিফের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তাকে।

৯

সে বছর বসন্তকালের গোড়ার দিকেই ম্যাক্স এসে পৌঁছোল নিউ অরলিয়নস-এ। গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, পথেঘাটে কি নারী কি পুরুষ, সবার মনে আনন্দ সবার চোখে খুশির চাউনি। এই আনন্দ আর খুশি দোলা দিল তাকেও।

ঘোড়ায় চেপে পশ্চিম টেক্সাসে পাড়ি দেবার আগে দু'টো দিন নিউ অরলিয়নস-এ কাটাবে বলে স্থির করল ম্যাক্স। রোজ ভাড়ার হিসেবে ঘোড়াটা গাড়োয়ানদের আস্তাবলে রেখে নিজে উঠল এক ছোট হোটেলে। অল্প কিছু খেয়ে পোষাক পাল্টে ফূর্তির মতলবে সে হোটেল ছেড়ে বেরোল। মদ খেয়ে ঢুকল জুয়োর আড্ডায়। খানিকবাদে বাজিতে হেরে টাকাকড়ি আর ঘোড়া সবই খোয়াল! যার কাছে বাজিতে হারল ম্যাক্সের ঘোড়াটা নিয়ে সে সরাসরি জানতে চাইল, 'সবইত খোয়ালে নিজের বলতে কিছুই রইলনা। বাড়ি ফেরার ঘোড়াটাও গেল। এবার কি করবে?'

'এই মুহূর্তে আমার দরকার একটা বাঁধা রোজগার।' ম্যাক্স বলল, 'হাতে কাজকর্ম কিছু থাকলে দিন না, আমার এখন দু'বেলা খাবার সংস্থানও নেই।'

'এই অবস্থায় কেউ জুয়ো খেলে?' চাপা ধমকের সুরে লোকটা বলল, 'আক্কেল দেখে বলিহারি যাই। কেমন কাজ হলে ভাল হয়?'

'যে কোন কাজ,' ম্যাক্স বলল। 'কাজ করব তার কোনও বাছাবাছি নেই। ঘোড়া, গোরু, শুয়োর, ভেড়া, মুর্গি এদের মেজাজ আমি ভাল জানি। এইসব জানোয়াড়ের খোঁয়াড়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার আছে।'

'আরে ওটা,' ম্যাক্সের কোমরে ঝোলানো খাপে আঁটা রিভলভার ইশারায় দেখাল জুয়াড়ি, 'ওটা চালানোর অভিজ্ঞতা আছে?'

'আগে আর্মিতে ছিলাম,' ম্যাক্স সত্যি কথাই বলল, 'স্পেনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পরেই আমার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাই ওটা ভালই চালাতে জানি।'

ম্যাক্সের কথায় লোকটা হয়ত গুরুত্ব দিলনা; তার কথা শেষ হতেই আচমকা ঝাঁপিয়ে পরে ম্যাক্সের কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে গেল সে। কিন্তু তার আগেই খাপ থেকে রিভলভার বের করেছে ম্যাক্স, লোকটার চোখের চাউনি দেখে এমন কিছু ঘটার আশঙ্কা আগেই করেছিল সে।

'সাবাস!' সরে এসে বাহবা দিল জুয়াড়ি, 'নাঃ, তুমি দেখছি সত্যিই খুব চটপট হাতিয়ার তুলতে পারো।'

'বললাম আমি লড়াই ফেরত লোক তবু সেকথা কানেই তুললে না,' স্বাভাবিক গলায় বলল ম্যাক্স, 'যার তার সঙ্গে এসব ছেলেমানুষি করতে যাওয়া কেন? গুলি ছুটে এক্ষুণি একটা ঝামেলা বাঁধাতে!' বলতে বলতে রিভলভার আবার খাপে পুরে ফেলল সে।

'কাজ দেবার আগে সবাইকে বাজিয়ে নিতে হয়, বুঝলে না?' হাসল জুয়াড়ি, 'শোন বাপু। মনে হচ্ছে তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারব। তবে আগেই বলে রাখছি তোমার মনিব কিন্তু বেবুশ্যে মেয়েমানুষদের বাড়িউলি মাসি। এমন লোকের কাছে কাজ করতে আপত্তি নেই ত?'

'আগেই ত বলেছি দাদা আমার এক্ষুনি একটা কাজ দরকার,' ম্যাক্স বলল, 'মনিব বেবুশ্যেদের বাড়িউলি হোক চাই না হোক তাতে কিছু যায় আসে না।'

পরদিন সকালে সেই জুয়াড়ি ম্যাক্সকে নিয়ে এল শ্বেতপাথরের তৈরি এক বাড়িতে, বাড়ির ভেতরে ঐশ্বর্য আর বিলাসের ছড়াছড়ি দেখে অবাক হল ম্যাক্স— দেয়াল, জানালায় সব দামি রঙিন রেশমের পর্দায় ঢাকা। একটি নিগ্রো কাজের মেয়েকে দিয়ে ম্যাক্সের সঙ্গি ভেতরে খবর পাঠিয়ে দিল, খানিক বাদে কাজের মেয়েটি এসে জানাল তার মালকিন মিস প্লুভিয়ার এক্ষুনি আসবেন। তিনি তাদের বসতে বলেছেন।

'কই, কোথায় তোমার লোক?' মিহি সুরেলা যুবতীর গলা কানে যেতে চমকে উঠল ম্যাক্স, ঘাড় ফেরাতে দেখল দুধের মত গায়ের রং, লম্বা পাতলা ছিপছিপে এক যুবতী তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। যুবতীর পরনে ঘরোয়া ঢোলা সাটিনের রাত পোষাক,

এক ঢাল কালো চুল কোমর দাপিয়ে হাঁটু ছুঁয়েছে। ভদ্র রীতি মেনে ম্যাক্স উঠে দাঁড়াতে তার সঙ্গি বলল। 'মিস প্লুভিয়ার, এ হল ম্যাক্স স্যাণ্ড, আপনার দেহরক্ষির দায়িত্ব ওকে স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন।'

'এত দেখছি একদম বাচ্চা ছেলে, কচি ছেলে,' কাছ থেকে তাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল যুবতী।

'আপনার ত কাজ নিয়ে কথা,' বলল জুয়াড়ি 'আসলে ওর মুখের গড়নটাই ঐরকম। ও আগে আর্মিতে ছিল। এই সেদিন স্পেনের সঙ্গে যে যুদ্ধ হল তাতে ও লড়েছে।'

'কাজের লোক ঠিকই,' যুবতী বলল, 'কিন্তু জামাকাপড় বড্ড নোংরা দেখলে গা ঘিনঘিন করে।'

'ফ্লোরিডা থেকে এতদূর ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি, ম্যাডাম,' এতক্ষণে মুখ খোলার সাহস পেল ম্যাক্স, 'জামায় ধুলোবালি লাগার আর দোষ কি।'

'স্বাস্থ্য, গড়ন, কথাবলার ঢং সবই ভাল।' বলল মিস প্লুভিয়ার, 'শুধু ভাল পরিষ্কার পোষাক দরকার। না, একেই আমার চাই।' বলে কয়েক পা পিছিয়ে গেল যুবতী। জানালার পাশে ড্রেসিং টেবলের সামনে টুলে বসে ম্যাক্সকে লক্ষ করে বলল, 'এখানে তোমার কি কাজ করতে হবে জানো ত?'

'আজ্ঞে না। ম্যাডাম।' ঘাড় নাড়ল ম্যাক্স।

'তুমি হবে আমার দেহরক্ষি', যুবতী বলল, 'যতক্ষণ জেগে থাকব ততক্ষণ আমায় পাহারা দেয়াই হবে তোমার কাজ। এখানে আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে তোমাকে। মাইনে পাবে একশো ডলার। থাকা খাওয়ার খরচ বাবদ তা থেকে বাদ যাবে কুড়ি ডলার, হাতে পাবে আশি ডলার। একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখছি বাপু, এবাড়িতে আর যে সব মেয়েরা থাকে তাদের কারও সঙ্গে কোনও ছলছুতোয় তোমার গল্পগুজব করা চলবে না। বুঝলে, কি বললাম?'

'আজ্ঞে বুঝেছি,' ঘাড় নাড়ল ম্যাক্স।

'তাহলে কথাবার্তা ত সব পাকাই হয়ে গেল।' মিস প্লুভিয়ার ম্যাক্সের সঙ্গি জুয়াড়িকে হুকুম দেবার গলায় বলল, 'বসে না থেকে এবার ওকে আমার দর্জির কাছে নিয়ে গিয়ে ছ'টা সুটের মাপ দাও—ছ'টা সাদা, ছ'টা কালো। পোষাক হাতে পেলে তবে ত ও কাজ শুরু করবে, তাই দর্জি ব্যাটাকে জলদি হাত চালাতে বোল।'

'আমি এক্ষুনি চললুম।' জুয়াড়ি উঠে দরজার দিকে পা বাড়াতে ম্যাক্স তার পেছন পেছন এগোল। দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফেরাতে দেখল যুবতী ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে লম্বা চুলে ব্রাশ চালাচ্ছে।

'ধন্যবাদ, ম্যাডাম।' মুচকি হেসে বলল ম্যাক্স।

'ম্যাডাম নয়।' ঘাড় না ফিরিয়ে যুবতী বলল, 'আমায় মিস প্লুভিয়ার বলবে।'

নতুন জায়গায় চাকরি করতে এসে কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন রাত তিনটে নাগাদ গোটা বাড়ি টহল দিচ্ছে ম্যাক্স; জুয়োখেলার আড্ডা থেকে বেরিয়ে বিশ্রাম নেবার জায়গায়

এল সে, দেখল কাজের মেয়েরা একতলায় কামরাগুলো ঝাড়পোঁছ করছে। 'জেকব, সব দরজায় ভেতর থেকে তালা দেয়া হয়েছে ত?' বাড়ির দশাসই চেহারার নিগ্রো দারোয়ানকে প্রশ্ন করল ম্যাক্স।

'হ্যাঁ মিঃ স্যাণ্ড,' জবাব দিল জেকব।

'ভাল।' হেসে সিঁড়ির দিকে এগোল ম্যাক্স, দু'পা গিয়েই থেমে পেছন ফিরে জানতে চাইল, 'মিঃ ডার্সি চলে গেছেন?'

'না, মিঃ স্যাণ্ড,' জবাব দিল জেকব, 'উনি মিস এলিনয়ের কামরায় রাত কাটাচ্ছেন। মিঃ ডার্সিকে নিয়ে ভাববেন না। বেশি চেঁচামেচি করলে আমি ওঁকে গোল্ড রুমে ঢুকিয়ে আটকে রাখব।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ম্যাক্স। গত কয়েক মাস ধরে এই ডার্সি লোকটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।

এবাড়ির প্রত্যেকটি মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে সে। তাতেও শান্ত হয়নি। হালে বাড়ির মালকিন মিস প্লুভিয়ারের সঙ্গে অন্তত একটা রাত কাটানোর বায়না ধরেছে সে। ডার্সির মনমেজাজ যে আজ খুব ভাল নেই তা ম্যাক্স জানে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ম্যাক্স, সামনের ঘরের ভেজানো দরজায় অল্প টোকা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ম্যাক্স দেখল তার মালকিন মিস প্লুভিয়ার তখনও জেগে, ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে আয়নায় সে নিজের মুখ দেখছে, একজন খাস পরিচারিকা ব্রাশ চালাচ্ছে তার লম্বা একঢাল চুলে। 'ভেতর থেকে সব দরজায় তালা দেয়া হয়েছে, মিস প্লুভিয়ার,' আয়নার মালকিনের চোখে চোখ পড়তে বলল ম্যাক্স।

'আর ডার্সি,' ভুরু কোঁচকালো মিস প্লুভিয়ার। 'সে কোথায়?'

'মিস এলিনয়ের কামরায় ঢুকেছে শুনলাম।' বলল ম্যাক্স। 'জেকব বলেছে বেশি ঝামেলা করলে গোল্ড রুমে ঢুকিয়ে রাতভর আটকে রাখবে।'

'ঠিক আছে,' আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে বলল মিস প্লুভিয়ার। পেছন থেকে আরও কাছে এগিয়ে এল ম্যাক্স, মালকিনের পেছনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকাল। মিস প্লুভিয়ার ইশারা করতেই খাস পরিচারিকা ব্রাশ রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকাল ম্যাক্স। সেখানে ফুটে ওঠা দুশ্চিন্তার ছাপ তার চোখ এড়ালনা।

ম্যাক্সের চোখে ফুটে ওঠা দুশ্চিন্তার ছাপ ধরা পড়েছে তার মালকিনের চোখেও, সোহাগ ভরা গলায় সে বলল, 'তোমায় খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে সোনা, এত ভাবছ কেন?'

'ভাবনা ডার্সিকে নিয়ে,' চিন্তার কারণ মুখ ফুটে জানাল ম্যাক্স, 'ওর আজকের হাবভাব আমার ভাল ঠেকছেনা। মনে হচ্ছে ওকে আজকের মত এখান থেকে খেদিয়ে দেয়া উচিত।'

'চাইলেই কি তা করা যায়?' হাসল মালকিন, 'কত বড় বংশের ছেলে ও তা ভুলে গেলে চলবেনা।' বলে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মালকিন, দু'হাতে ম্যাক্সের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল তার দু'গালে। তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, আসলে আমার ছোট্ট সোনা রেড ইণ্ডিয়ানের মনে হিংসে হচ্ছে, বেশ বুঝতে পারছি। ওর কাছ থেকে পাছে

ডার্সি আমায় ছিনিয়ে নেয়, এই ভাবনায় বেচারি থাকতে পারছেনা। এ যাক, তুমি ওকে নিয়ে এত ভেবোনা। দেখে নিয়ো দু'দিন বাদেই ডার্সি আমার কথা ভুলে গিয়ে আবার অন্য কোনও মেয়েকে নিয়ে মেতে উঠবে। ব্যাটাছেলেদের স্বভাব এমনই, এসব আমি আগেও দেখেছি।'

আরও খানিকক্ষণ বাদে মালকিন শুয়ে পড়ল, হাত ধরে ম্যাক্সকে ডেকে পাশে শোয়ালো। দুধের মত সাদা ধপধপে চাদরে মালকিনের অপরূপ দেহবল্লরীর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। নরম হাতের আঙ্গুলে মালকিন তার দেহের রন্ধ্রগুলোতে আলতো সুড়সুড়ি দিচ্ছে টের পেল ম্যাক্স, টের পেল উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে ভেতরে ভেতরে। খানিক বাদে মালকিন তার দিকে মুখ তুলে তাকাতে চোখ বুঁজল ম্যাক্স।

'প্রিয় আমার .... সোনা আমার .... আমার ছোট্ট রেড ইণ্ডিয়ান সোনাটা ...' অস্ফুটস্বরে বলা মালকিনের সোহাগ মাখানো শব্দগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ম্যাক্স, কপালে, গালে, ঠোঁটে, চিবুকে, গলায় মালকিনের ঠোঁটের উষ্ণ ছোঁয়া অনুভব করছে। 'ইস্! দেখেছো কাণ্ড!' তার তলপেটে হাত দিয়ে হালকা রসিকতার সুরে বলল মালকিন, 'তোমার এটা ত তেতেপুড়ে একেবারে কামান হয়ে উঠেছে দেখছি, এবার গোলা দাগলেই হল!'

মালকিনের মাথায়, কপালে উড়ে আসা চুলে হাত বোলাতে লাগল ম্যাক্স। ভয়ভয় মেশানো এক অপূর্ব সুখানুভূতির ছোঁয়া কেউ বুলিয়ে দিল তার মনে, হৃদয়গ্রন্থীতে। সেই ছোঁয়াটুকু ধরে রাখতে চোখ বুঁজল সে। ব্যাটাছেলের দেহে মনে সুখের সাড়া জাগানোর এত কায়দা মেয়েরা শেখে কোত্থেকে। চোখ বুঁজে নিজেকে প্রশ্ন করল সে। স্রোতের মত আনন্দ বয়ে যাচ্ছে তার ভেতরে। চোখ বুঁজেও স্পষ্ট টের পাচ্ছে ম্যাক্স। এই স্রোতের উৎস কোথায়? কয়েক মুহূর্ত দম বন্ধ করে রইল সে, এই অনির্বচনীয় সুখ যেন তার সত্ত্বার দু'কূল ছাপিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছে এক গভীর অতলে, এই সুখ এই পরিতৃপ্তির স্বাদ আগে সে পায়নি কখনও।

বাইরে দরজার গায়ে মৃদু টোকা পড়তে ম্যাক্সের বোঁজা চোখ আপনিই খুলে গেল, মুখ ফেরাতেই দরজার পাল্লা গেল খুলে। ভেতরে ঢুকল ডার্সি। ঘরে নরখাদক বাঘ দেখার মত চমকে উঠল ম্যাক্স। নিমেষে অভাবিতের মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি হল সে।

'বেড়োও। হতচ্ছাড়া!' রসভঙ্গে ক্ষিপ্ত মালকিন প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল। 'গন্ধে গন্ধে শেষকালে এ ঘরে এসে সেঁধিয়েছো! এত সাহস তোমার হল কবে থেকে?'

'খামোকা মুখ খারাপ করছ, মিস প্লুভিয়ার?' মালকিনের দিকে তাকিয়ে বোকার মত হাসল ডার্সি, একতাড়া নোট পকেট থেকে বের করে বলল, 'দ্যাখো, খালি হাতে তোমার ঘরে রাত কাটাতে আসিনি। এখানে পুরো একহাজার ডলার আছে, সব তোমার!' ডার্সির নেশাজড়ানো গলায় কথাগুলো স্পষ্ট ফুটলনা।

'খবরদার, এদিকে এক পা এগোবেনা!' বলে নগ্ন দেহেই খাট থেকে নেমে পড়ল মালকিন, 'ভাল চাও ত ঐ টাকা নিয়ে এক্ষুণি বিদেয় হও, যাও বলছি!' উত্তেজিত মালকিন ইশারায় দরজা দেখাল।

'কিন্তু আমি যে আজকের রাতটুকু তোমার সঙ্গে কাটাব বলে ছুটে এসেছি, মিস

প্লুভিয়ার,' চাপাগলায় কর্কশ সুরে বলল ডার্সি, 'হে ঈশ্বর, তুমি এত নিষ্ঠুর।'

'কেন মিছিমিছি ঝামেলা করছেন, মশাই?' ম্যাক্স গলা চড়াল। 'মিস প্লুভিয়ার আপনাকে বারবার চলে যেতে বলছেন তারপরেও যাচ্ছেন না কেন? যান, বেরোন! যান বলছি।'

'কে বললে কথাটা?' ম্যাক্সের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বলল ডার্সি, 'খানিক আগে নিচে আমার দুর্দশা দেখে খুব হেসেছিলি, তাই না? আমি বারবার বাজিতে গোহারা হারছি আর তুই তত গলা ফাটিয়ে হাসছিস! কিন্তু এবার যে আমার একার হাসার পালা। বাছাধন! বলতে বলতে আচমকা ছুরি বের করে ম্যাক্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডার্সি। ম্যাক্স বিদ্যুদ্বেগে সরে যেতেই ডার্সির ছুরি বসে গেল সাদা সাটিনের তৈরি বিছানার চাদরে। ডার্সি ছুরি তুলে সরে যেতেই ম্যাক্স একটা মাঝারি বালিশ দু'হাতে ধরে বর্মের মত নিজেদের সামনে তুলে ধরেই কয়েক পা পিছিয়ে এল ম্যাক্স, খাপে আঁটা রিভলভার সমেত বেল্টখানা একটা চেয়ারের ঠেশ দেয়ার শার্টে ঝোলানো। গুটি গুটি পায়ে সেদিকে এগোল ম্যাক্স, ডার্সিকে হুঁশিয়ার করে বলল, 'চোট লাগার আগে ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো, নয়ত .....'

'একবার বেঁচেছিস বলে বারবার বাঁচবি ভেবেছিস?' কুটিল হাসি ফুটল ডার্সির ঠোঁটে, 'সন্ধের পর থেকে আমার দুর্দশা দেখে তুই প্রাণভরে হেসেছিস এবার আমার হাসবার পালা।' বলেই ছুরি উঁচিয়ে ফের তেড়ে এল সে, ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাক্সের ওপর।

'কড়াত্'' চাপা বাজপড়ার আওয়াজে গর্জে উঠল ম্যাক্সের রিভলভার। গুলি এসে বিঁধল ডার্সির বুকে। কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ডার্সি, হাতের মুঠোয় ছুরি ধরেই মুখ থুবরে পড়ল সে, মেঝেতে মুখ গুঁজে পড়ল উপুড় হয়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করে নগ্নদেহেই সে নেমে এল খাট থেকে। ডার্সির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার নাড়ি পরীক্ষা করল। নাড়ি থেমে গেছে বুঝে হাতখানা নামিয়ে দু'চোখ পাকিয়ে মালকিন তাকাল ম্যাক্সের দিকে, চাপা ধমকের গলায় বলল, 'তুমি ওকে খুন করলে! বুদ্ধু কাঁহিকা। এবার কি হবে?'

অবাক চোখে ম্যাক্স তাকাল মালকিনের দিকে, দেখল চাপা উত্তেজনায় তার দুটি স্তন ঘন ঘন উঠছে নামছে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম গড়াচ্ছে বুকের সমতল থেকে। 'গুলি না ছুঁড়ে আমার আর কি করার ছিল?' মালকিন তার দোষ ধরছে কেন তাই বুঝে উঠতে পারলনা সে। 'নিজের চোখেই ত দেখলেন ও ছুরি নিয়ে বারবার তেড়ে আসছে।'

'এলেই বা' বলল মালকিন, 'তাই বলে গুলি ছুঁড়ে খুন করে ফেলবে? মেরে বেঁহুশ করে দিতে পারতে ওকে!'

'কি দিয়ে মারতাম?' ভেতরের রাগ এবার ফুটে বেরোল তার মুখ দিয়ে আর তখনই ম্যাক্সের খেয়াল হল সে নিজেও তার মালকিনের মতই নগ্ন। নিজের পুরুষাঙ্গ ইশারায় দেখিয়ে বলল সে, 'এটা দিয়ে ওকে মারতে পারতাম এটাই বলতে চাইছেন ত?'

ম্যাক্স চটেছে আঁচ করে নিমেষে নিজেকে সামলে নিল মালকিন, ঢোলা রাতপোষাকটা গায়ে চাপিয়ে দরজা খুলে মুখ বের করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল গুলির আওয়াজ শুনে বাড়ির বাসিন্দারা এসে জুটেছে কিনা। কাউকে দেখতে না পেয়ে দরজা এঁটে ভেতর

থেকে ছিটকিনি তুলে দিল মালকিন, ম্যাক্সের সামনে এসে পোষাকটা খুলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে, তার দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে চুমু খেয়ে বলল, 'না গো তুমি আমার ওপর রাগ কোরনা। বুনো ঘোড়া আমার। আমি ত তোমারই, শুধু তোমারই। নাও, এবার আশ মিটিয়ে যা খুশি করো আমার সঙ্গে। অ্যানা লুইস প্লুভিয়ার বড্ড অসহায়। ম্যাক্স, তাকে একটু দয়া করো!'

'চলো শোবে চলো,' ম্যাক্স তার মালকিনকে দু'হাত ধরে তুলতে গেল। কিন্তু মালকিন রাজি হলনা। তার তলপেটে মাথা ঘষতে ঘষতে বলল, 'না, বিছানায় নয়। এইখানে, মেঝেতে শোব। তুমি শোবে না আমার পাশে?' সস্তা কার্পেট পাতা মেঝেতে ডার্সির রক্তাক্ত লাশের পাশে শুয়ে ম্যাক্স সারারাত তার মালকিনের শরীরের খিদে মেটাল। পরদিন ভোরবেলা তার মালকিন অ্যানা লুইস প্লুভিয়ার লোক পাঠিয়ে থানা থেকে পুলিশ আনিয়ে খুনের দায়ে ধরিয়ে দিল তার দেহরক্ষি ম্যাক্স স্যাণ্ডকে।

'কি পেয়েছেন আপনারা!' ডেপুটি শেরিফের সঙ্গে হাতে হাতকড়া বাঁধা ম্যাক্সকে দেখে জেল ওয়ার্ডেন খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এটা জেলখানা, মশাই, সংশোধনাগার নয়। এই সহজ সরল সত্য আপনার ওপরওয়ালারা ভুলে যান কেন বলতে পারেন?'

'চোখের চাউনি দেখে যদি একে সাধুপুরুষ ভাবেন ওয়ার্ডেন,' আধপোড়া চুরুট চিবুতে চিবুতে ডেপুটি শেরিফ ম্যাক্সকে ইশারায় দেখালেন, 'তাহলে বলব আপনি এখনও লোক চিনতে শেখেননি।' ম্যাক্সের সাজার রায়ের কপি ওয়ার্ডেনের সামনে রাখলেন তিনি, 'সাধু সেজে থাকলেও এটা পয়লা নম্বরের শয়তান। উল্লুকের বাচ্চাটা নিউ অরলিয়ন্স-এ এক খানকির ডেরায় গুলি ছুঁড়ে একটা লোককে খুন করেছে।'

'তাহলে ত গুণের অবতার বলতে হয়,' খাপ থেকে চশমা খুলে চোখে আঁটতে আঁটতে ওয়ার্ডেন বললেন, 'চার্জ কি-মার্ডার?' 'নাঃ,' ডেপুটি জবাব দিলেন 'আগ্নেয়াস্ত্রের বেআইনি প্রয়োগ। আত্মরক্ষা করতে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে তা প্রমান হয়েছে। আর তাই এবারের মত প্রাণে বেঁচে গেল। মার্ডার চার্জ প্রমাণ হলে অনেক আগেই গাছের ডালে লটকে দিতাম। থ্যাক্, থুঃ।' টেবলের নিজে রাখা বালতির মত বিশাল পিকদানিতে থুতু ফেললেন ডেপুটি শেরিফ।

'তা তুমি বাপু এত জায়গা থাকতে ঐ খান্‌কির ডেরায় ঢুকেছিলে কেন?' ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ওয়ার্ডেন।

'আজ্ঞে আমি ওখানে চাকরি করতাম কিনা,' বলল ম্যাক্স 'ওখানকার মালকিনের আমি ছিলাম বডিগার্ড।'

'বডিগার্ড ছিলে বলেই কাউকে তুমি খুন করতে পারোনা।' ম্যাক্সের চোখের দিকে ধূর্ত চাউনি ছুঁড়ে বললেন ওয়ার্ডেন, 'সে এক্তিয়ার তোমার নেই।'

'আজ্ঞে লোকটা ছুরি উঁচিয়ে বারবার তেড়ে আসছিল আমায় মারবে বলে,' ম্যাক্স বলল, 'পরপর দু'বার ছুরি ফসকানোর পরে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছি।'

'তাহলে আর বলার কিছু নেই।' ওয়ার্ডেন তাকালেন ডেপুটি শেরিফের দিকে 'আপনারাই

বা কেমন লোক, মশাই? সত্যি কথা বলছে জেনেও ওকে আদালতে হাজির করালেন কেন? এরকম গাদাগাদা কেস ত আপনারা চেপে যান?'

'আমারও ত ওপরওয়ালা আছে, ওয়ার্ডেন,' অসহায়ভাবে হাত ওল্টালেন ডেপুটি শেরিফ, 'তদন্তের দায়িত্ব আমার হাতে থাকলে এ-কেস আদালত পর্যন্ত যেতে দিতাম না। তবে নিউ অরলিয়ন্স-এর ডাসিদের নাম শুনেছেন ত? যে খুন হয়েছে সে ওদেরই বাড়ির ছেলে। ওদের প্রচুর টাকা, আর ওপরমহলে প্রভাবও আছে। ওরা একে ফাঁসিতেই ঝোলাতে চেয়েছিল। কিন্তু ঐ নিজের প্রাণ বাঁচাতে গুলি চালিয়েছে প্রমাণ হওয়ায় ব্যাপারটা ততদূর গড়ালনা। নিন, এবার সইসাবুদ করে আপনার মাল আপনি বুঝে নিন।'

কোন কথা না বলে ওয়ার্ডেন কয়েদীর চালানে সই করে দিলেন। ডেপুটি শেরিফ ম্যাক্সের হাতকড়া খুলে বললেন, 'যাও বানচোত্, জেলের খাওয়া খেয়ে এবার শরীরের তেল মজাও।' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'কত বয়স হে তোমার?' ম্যাক্সকে প্রশ্ন করলেন ওয়ার্ডেন।

'উনিশ চলছে।'

'সবে উনিশ?' অবাক হলেন ওয়ার্ডেন, 'এত কম বয়সে খানকির ডেরার মালকিনের বডিগার্ডের কাজ পেলে কি করে?'

'আমি আগে আর্মিতে ছিলাম।' ম্যাক্স বলল, 'স্পেনের লড়াই শেষ হলে আমারও মেয়াদ ফুরোল। আমার তখন একটা চাকরি খুব দরকার, আমি লড়াই ফেরত শুনে চেনা জানা একজন আমায় চাকরিটা পাইয়ে দিল। চাকরিটা পেয়ে বেঁচে গেলাম নয়ত না খেয়ে মরতে হত।'

'বেশ,' ওয়ার্ডেন চশমার আড়াল থেকে কুতকুতে চোখে তার দিকে তাকালেন। 'এবার মন দিয়ে শোন, এখানে নতুন কয়েদী এলেই আমি গোড়ায় তার চর্বি ঝরানোর ব্যবস্থা করি, তোমার বেলাতেও তাই করব। কই, মাইক! অ্যাই মাইক! গেলি কোথায়?'

সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যের মত চেহারার এক মাঝবয়সী নিগ্রো এসে ভেতরে ঢুকল। সেলাম ঠুকে বলল,

'এসে গেছি আজ্ঞে, বলুন কি করতে হবে?'

'এ নতুন এসেছে' ইশারায় ম্যাক্সকে দেখালেন ওয়ার্ডেন। 'একে নিয়ে গিয়ে এক্ষুণি দশ ঘা বেত লাগাও!'

'চলে এসো খোকন,' বলে নিগ্রো মাইক ম্যাক্সের কব্জি চেপে ধরল।

'যাও বাছা', মুখ টিপে হাসলেন ওয়ার্ডেন, 'আগের দিনে জেলে নতুন কয়েদী এলে তার মাথা মুড়িয়ে শিক গরম করে কপালে নয়ত পিঠে নম্বর দেগে দিত, তারও আগে হাঁটুর পেছনের শিরা চিরে দিত। পয়লা দিনে বেত খেলে কি হবে জানো ত? যদ্দিন এখানে থাকবে, তদ্দিন গায়ের টাটানিটা মনে থাকবে। কোনও ঝামেলা পাকানোর সাহস হবে না।'

তাঁর কথা শেষ হতে মাইক দরজা খুলে ম্যাক্সকে জেলের পেছনে নিয়ে এল। কয়েক পা যেতে সে বলল, 'বেত মারব শুনে ঘাবড়ে যেয়োনা খোকন। পয়লা মারটা খুব জোরে

মারব ঠিকই যাতে চামড়া কেটে যায়। পরের ন'টা ঘা তাই সয়ে যাবে, তেমন লাগবেনা· দেখে নিয়ো।'

মেয়াদ খাটতে এসে গোড়াতেই জেল সম্পর্কে অনেক খবর ম্যাক্স জেনে ফেলল। জেলের বাইরে পুব, পশ্চিম আর দক্ষিণে বিশাল পাঁক। তাতে যে কোন জীব পা দিলেই নিমেষে তলিয়ে যাবে অতলে। উত্তর দিকে ওসব ঝামেলা নেই, সেখানে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত শুধু ধানক্ষেত, সেই ক্ষেতে চাষ করে ক্যাজুন রেড ইণ্ডিয়ান শ্রেণীর ঠিকে চাষীরা, ধানক্ষেত ছাড়িয়েই তাদের গ্রাম। জেল তৈরি হবার পরে গত কুড়ি বছরে কয়েদীরা একাধিকবার জেল ভেঙ্গে ওদিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি, পলাতক কয়েদীদের ধরে ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে সরকারের তরফ থেকে মাথা পিছু কুড়ি ডলার পুরস্কার দেবার ঢালাও ব্যবস্থা আছে। সেই টাকার লোভে ক্যাজুন চাষীরা পলাতক কয়েদীদের ধরে এনে তুলে দেয় জেল কর্তৃপক্ষের হাতে। যারা ধরা পড়েনা তারা পালাতে গিয়ে অসাবধানে বিশাল পাঁকে ডুবে মরেছে কর্তৃপক্ষ এটাই ধরে নেন। এই জেল তৈরি হবার পরে গত কুড়ি বছরে ঐরকম ঘটনা মাত্র দু'বার ঘটেছে।

জেলের পেছনের আঙ্গিনায় কয়েদীদের থাকার জন্য ছোট ছোট কোঠাঘর আছে। মাইকের মত পুরোনো কয়েদী যারা জেল কর্তৃপক্ষের চোখে বিশ্বস্ত তারাই নজর রাখে কয়েদীদের ওপর। জেলের পরিভাষায় এদের উল্লেখ করা হয় ট্রাস্টি বলে।

ম্যাক্স জেলে আসার কয়েক মাস পরের ঘটনা। মে মাসের এক সকালে জেলের এক প্রহরী ট্রাস্টি মাইককে জানাল কয়েদী জিম রিভ্‌সকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'দ্যাখো গে হয়ত পায়খানায় গেছে,' মাইক বলল। 'ওদিকটায় একবার খুঁজে দ্যাখো।'

'সেখানে আগেই দেখে ফেলেছি,' বলল প্রহরী, 'জিম পায়খানায় যায়নি।'

'তাহলে ব্যাটাচ্ছেলে পালিয়েছে, এটাই ধরে নিতে হয়,' মাইক বলল। 'হয়ত কাল রাতের বেলা দেয়াল টপকে পালিয়েছে।'

'জিম কিন্তু কাজটা খুব ভাল করলনা,' বলেই প্রহরী টানটান হয়ে দাঁড়াল, 'আর ত চুপ করে থাকা যায় না, খবরটা এইবেলা ওয়ার্ডেনকে দিয়ে আসি।'

কয়েদী পালানোর খবর কানে যেতেই ওয়ার্ডেন গুণতির হুকুম দিলেন। রান্নাঘরের সামনে জলখাবার আর কফির মগ হাতে নিয়ে তারা বেঁধে দাঁড়াল সবাই। তখনই ম্যাক্স দেখল প্রহরীদের একজন ঘোড়ায় চেপে ছুটে যাচ্ছে ক্যাজুনদের গ্রামের দিকে। গুণতি শেষ হলে মাইক জলখাবার আর কফির মগ নিয়ে তারা কোঠাঘরের বাইরের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসল। নিগ্রো মাইক এসে বসল তার পাশে।

'একজন কয়েদী পালিয়েছে,' যেতে যেতে মাইকের উদ্দেশে বলল ম্যাক্স, 'পালাতেই পারে। তাই নিয়ে এত হৈ চৈ কেন?'

'হৈ চৈ হবে না মানে?' ম্যাক্সের প্রশ্ন শুনে গলা সামান্য চড়াল মাইক, 'এখানে সরকারের হুকুমে তোমায় আমায় পাঠানো হয়েছে তা ভুলে যেয়োনা। আমরা পালিয়ে গেলে বা আমাদের মধ্যে কেউ আত্মহত্যা করলে ওয়ার্ডেনকে সরকারের কাছে কতরকম কৈফিয়ত

দিতে হবে জানো? জিম বোকা, বড্ড বোকা। কাল দুপুরের আগেই ও ঠিক ধরা পড়বে। দেখো।'

মাইকের অনুমান সত্যি প্রমাণিত হল। পরদিন সকালে ব্রেকফস্ট খাবার ফাঁকে ম্যাক্স দেখল খোলা ওয়াগনে জিম বসে, তার দু'পাশে গাদা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে দু'জন ক্যাজুন চাষী, হাতের রাইফেলের নল তাক করে আছে তারা জিম-এর মাথার দিকে।

ওয়ার্ডেনের হুকুমে জিম রিভসকে উলঙ্গ করে একটা থামের সঙ্গে বাঁধা হল, তারপর কয়েদীদের সবার সামনে মাইক গুনে গুনে দশ ঘা বেত মারল তার পিঠে। সাজা এখানেই শেষ হল না, দু'জন ট্রাস্টি একটা চাকা লাগানো খাঁচা এনে হাজির করল, বেত মারা শেষ হতে উলঙ্গ অবস্থায় জিমকে ঢোকানো হল সেই খাঁচায়। খাঁচার চারদিকে পুরু লোহার গরাদ, ওপরেও তাই, ভেতরে দাঁড়ানো, বসা বা শোবার জায়গা নেই। চারপেয়ে বুনো জানোয়ারের মত কোনভাবে উবু হয়ে থাকতে হয়। ওয়ার্ডেন জিমকে একটানা ত্রিশদিন ঐ খাঁচায় আটকে রাখার হুকুম দিলেন। ত্রিশদিন খাঁচার ভেতরেই জানোয়ারের মত মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে জিমকে। শুধু পাউরুটি আর জল ছাড়া আর কিছু খেতে দেয়া হবে না তাকে। অন্যান্য কয়েদীদের এই বলে হুঁশিয়ার করা হল, সাজার এই ত্রিশদিন যেন তারা কেউ জিমের সঙ্গে একটি কথাও না বলে। যে কথা বলবে তার কপালেও জুটবে একই সাজা।

১০

জলখাবারের প্লেট আর কফির মগ নিয়ে অন্যদিকে সরে এল ম্যাক্স যাতে খাঁচার ভেতর বন্দী জিম রিভস-এর মুখ খেতে খেতে তার চোখে না পড়ে। মাইকও এসে বসল তার পাশে, তার কপাল ঘেমে উঠেছে। কথা না বলে মাংস আর বিনসেদ্ধ মুখে পুরে একমনে চিবোতে লাগল সে। তার মুখের দিকে চোখ পড়তে ম্যাক্সের খাবার ইচ্ছেটা চলে গেল, খাবার ভর্তি প্লেটখানা সরিয়ে রেখে সিগারেট পাকিয়ে জ্বালাল সে। 'তুমি সত্যিই খাবে না?' জানতে চাইল মাইক, 'তাহলে তোমার প্লেটটা দাও, আমি খাই। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।'

একমুহূর্ত তার দিকে তাকাল ম্যাক্স, পরমুহূর্তে প্লেট উল্টে খাবারগুলো মাটিতে ফেলে দিল।

'তোমার হল কি বলো ত,' ম্যাক্সের কাণ্ড দেখে অবাক হল মাইক, 'আমায় দিতে না চাও দেবেনা, কিন্তু তাই বলে খাবারগুলো শুধু শুধু নষ্ট করলে কেন?'

'এ্যদ্দিনে বুঝেছি নিজে কয়েদী হয়েও কেন তুমি ট্রাস্টি সেজেছো,' ঘৃণাভরা গলায় বলল ম্যাক্স, 'ওয়ার্ডেনকে খুশি করতে সুযোগ পেলেই তুমি কয়েদীদের ধরে ধরে ঠ্যাঙাও নিজেকে ওরই দলের একজন বলে ভেবে সুখ পাও!'

'এই ক'মাস দিনরাত দেখে আমর এই চিনলে?' আহত গলায় বলল মাইক।

'আমার যা মনে হল তাই বললাম,' শান্ত নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল ম্যাক্স। 'আমায় তুমি চিনেছো ঘোড়ার ডিম?' আস্তে কেটে কেটে বলল মাইক, 'বহুদিন আগে এখানে

মেয়াদ খাটতে এসে নিজের চোখে দেখেছি বেত মেরে কয়েদীদের গায়ের ছাল চামড়া তুলে নিতে, ঐরকম বেধড়ক মার খেয়ে কয়েদীরা তখন দু'তিনদিন বাদেই মরে যেত। ভাল ব্যবহার আর চালচলনের জন্য বারো বছর আগে ওয়ার্ডেন আমায় সাধারণ কয়েদী থেকে ট্রাস্টি বানিয়েছিলেন। নিজের হাতে নতুন পুরোনো অনেক কয়েদীকে বেত মেরেছি কিন্তু মরা দূরে থাক, আমার বেত খেয়ে কারও ছালচামড়া ওঠে নি। কপাল না পুড়লে কেউ এখানে আসে না তা আমি জানি, তারপরে তাদের মারধর করার প্রবৃত্তি আমার হয়না এটা মনে রেখো। জিম রিভ্স একটা পাজির পাঝাড়া শয়তান, বদের বাসা। ওর মত পাহাড়ে বজ্জাতের গায়ে হাত তুলতে আমার ভাল লাগেনা কিন্তু ট্রাস্টির দায়িত্ব যখন পেয়েছি তখন মারধর ত একটু আধটু করতেই হবে তা সে যেই হোক।'

মাইক যে কথাগুলো মন থেকে বলছে তার বলার ধরন শুনেই তা বুঝল ম্যাক্স, এও বুঝল যে একটানা এতদিন জেলের ভেতরে কাটানোর দরুন মাইকের আত্মা বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। একটি কথাও না বলে হাতে সিগারেট পাকিয়ে মাইকের দিকে এগিয়ে দিল সে। মাইক তা ঠোঁটে চেপে দিব্যি খোশমেজাজে টানতে লাগল।

পুরো একমাস খাঁচার ভেতর জানোয়ারের জীবন কাটিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জিম রিভস, খাঁচা থেকে ছাড়া পাবার পরে জেল থেকে কিভাবে পালানো যায় তাই ভেবে সময় কাটাতে লাগল সে। একা পালানোর ঝুঁকি অনেক বুঝতে পেরে পরিকল্পনা সফল করতে কয়েদীদের ভেতর বিশ্বস্ত দোসর খুঁজতে লাগল জিম। একদিন রাতে ম্যাক্স খেয়েদেয়ে নিজের বাংকে চোখবুঁজে শুয়ে আছে, আচমকা কাঁধে আলতো টোকা পড়তে চোখ মেলল সে, সঙ্গে সঙ্গে তার কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় জিম রিভ্স বলল, 'ভয় নেই, আমি জিম। শোন, এখানে আমার মন আর টিকছেনা। যে কারণ হোক আমায় পালাতেই হবে।'

'এত আমাদের সবার মনের কথা।' বলল ম্যাক্স। 'কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এখান থেকে পালাতে পারেনি এটাই দুঃখের ব্যাপার।'

'অনেক ভেবে পালানোর পথ একটা বের করেছি,' একই চাপাগলায় বলল জিম, 'কিন্তু একার কাজ নয়, কম করে দু'জন লোক দরকার। আর তাই তোমার কাছে এসেছি।'

'কেন, আমি কেন।' অবাক হল ম্যাক্স, 'লম্বা মেয়াদে যারা সাজা খাটতে এসেছে তাদের কাছে যাওনি কেন?'

'যাইনি কারণ ওদের বেশির ভাগই শহুরে চোর, গুণ্ডা, ছেনতাইবাজ, খুনে ডাকাত, পাঁকে নামবার কথা শুনলেই পিছিয়ে যায় এমন ভিতুর ডিম। বন্দুক আর বাতেল্লা এছাড়া ওদের আর কোনও হিম্মত নেই?'

'তোমার নিজের মাথা যে সত্যিই খারাপ তাতে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ নেই,' আধশোয়া হয়ে বসে বলল ম্যাক্স, 'পাঁকে ভর্তি জমির পরে চল্লিশ মাইল শুধু চোরাবালি, তাছাড়া আছে মানুষ খেকো কুমির, আর হিংস্র কামটের পাল, কখন ছুটে

এসে করাতের মত ধারালো দাঁত দিয়ে পা কেটে নেবে টেরও পাবে না। পালানোর পথ একটাই আছে—উত্তরে গ্রামের পাশ কাটিয়ে।'

'এবার পালাবার আগে আমিও তাই ভেবেছিলাম,' অন্ধকারেও জিমের বিষন্ন হাসি ম্যাক্সের কান এড়ালনা। 'ভেবেছিলাম বেড়া টপকেই রাস্তায় পড়ব। কিন্তু বেড়া টপকে ওপারে নামার পরে ধরা পড়ে গেলাম গ্রামের লোকেদের হাতে। ওরাই আমায় ধরে জেলে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।'

ম্যাক্স কোনও মন্তব্য করলনা। তার বাংকের পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে জিম বলল, 'পালানোর পক্ষে একমাত্র আদর্শ জায়গা হল পাঁকে ভর্তি জমি, ভেবে দেখলাম, হাতে একটা নৌকো আছে, তাই—'

'নৌকো!' চাপা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ম্যাক্স।

'আমরা নৌকো পাব কোত্থেকে?'

'পাব কোত্থেকে তাই না?' আঁধারে চারপাশে চোখ বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল জিম, 'জোগাড় করতে হয়ত সময় নেবে, কিন্তু এখান থেকে আমার পালানোর সময়ও খুব বেশি দূরে নেই জেনো। বর্ষা আসছে, এইসময় বড় বড় ধানক্ষেতে মালিকদের কাছে ওয়ার্ডেন আমাদের ভাড়া খাটায়। জেলের কয়েদীদের দিয়ে কম খরচে কাজ করানো যায়। এই বাবদ পাওয়া টাকার পুরোটাই ওয়ার্ডেন নিজের পকেটে পোরে, সরকারকে একটা আধলাও দেয় না। কয়েদীদের খাটিয়ে জেলের কত আয় হল সে খোঁজ সরকার রাখেনা। যা বলছিলাম। এই বর্ষায় ধানক্ষেতের প্রায় পুরোটাই ডুবে যায় জলে, চলাফেরা করতে তখন নৌকো দরকার হয়। এবার বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি?'

'না, বুঝতে পারলাম না।' জিমের মতলব আঁচ করলেও তা কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে ম্যাক্সের সন্দেহ আছে, তার কথায় সেই সন্দেহের ভাব ফুটে বেরোল।

'বুঝতে পারলেনা, না বুঝতে চাইছোনা?' আঁধারে জংলি জানোয়ারের মত জ্বলে উঠল জিম রিভ্‌সের চোখ। 'জীবনের দুটো বছর তাহলে এই জেলের নরকেই পচে মরতে চাও, ম্যাক্স? নষ্ট করার মত ঐটুকু সময় সত্যিই আছে তোমার হাতে?'

'আমায় একটু ভাবতে দাও,' দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল ম্যাক্স। 'আমি পরে এব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

ম্যাক্স এ নিয়ে আর কথা বলতে আগ্রহী নয় জেনে জিম দ্রুতপায়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে ভেতরে এসে ঢুকল ট্রাস্টি মাইক। ম্যাক্সের বাংকের কাছে এসে দাঁড়াল মাইক, সে জেগে আছে বুঝে গলা নামিয়ে বলল, 'পাঁকে ভর্তি জমির ওপর দিয়ে পালাতে জিম রিভ্‌স তোমায় সঙ্গে নিতে চাইছে ত?'

'তুমি জানলে কি করে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ম্যাক্স।

'শুধু তুমি কেন,' মাইক বলল, 'জেলের প্রত্যেক কয়েদীর কাছে গিয়ে জিম একই কথা বলছে, যাকে বলছে সেই-ই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।'

'তাই বলো,' ম্যাক্স আশ্বস্ত হল।

'জিমের কথায় ভুলোনা, খোকন।' নরমগলায় বলল মাইক, 'বাইরে থেকে যাই মনে

হোক কাজটা কিন্তু খুব সহজ হবে না। ঘেন্নায় ওর গলা পর্যন্ত বিষিয়ে উঠেছে। তাই ধরা পরে তোমায় সহজ হলেও ওর কিছুই তাতে যাবে আসবে না।'

জবাব না দিয়ে বাংকের ওপর হাত পা টানটান করল ম্যাক্স। আঁধারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা মনে পড়ল খানিক আগে জিম রিভ্‌স তাকে এই জেলে দু'বছর কাটানোর কথা বলছিল। না। সত্যিই দুটো বছর সে নষ্ট করতে পারবেনা। মনে মনে হিসেব কষল ম্যাক্স, আর দু'বছর বাদে সে একুশে পা দেবে।

১১

'আহারে, একেই বলে খাওয়া!' প্লেটভর্তি মাছ মাংসের দু'তিনরকম পদ, চর্বির তেলে ভাজা আলু, একরাশ সবজি সেদ্ধ, পাঁউরুটি আর বড় দানার গরম ভাতের গন্ধ নাক ভরে নিয়ে বলল জিম রিভ্‌স, 'মানুষকে গতরে খাটিয়ে তাকে এমনই পেট ভরে খেতে দিতে হয়। এত আর আমাদের ওয়ার্ডেন নয় যে কয়েদীদের মাংস খাওয়ানোর সরকারি টাকা রাতারাতি হজম করে দু'বেলা ডিম আর আলুসেদ্ধ গেলাবে? এরা নিজেরা গরীব চাষী তাই জন মজুরদের পেট ভরে খাওয়াতে জানে। ওয়ার্ডেনের ত গুণের শেষ নেই, সরকারকে না জানিয়ে আমাদের জেলের বাইরে মজুরের খাটনি খাটিয়ে সেই মজুরি পুরছেন নিজের পকেটে। এসব খবর জানাজানি হলে সরকার আমাদের সঙ্গে ওকেও জেলে পুরবে। জেলে ঢোকার প্রথম দিন ওয়ার্ডেন আমাদের সবাইকে বেত মেরে গায়ের ছালচামড়া তুলেছে, ওর বেলায় সে কাজটা আমি করব, ওর ওপর আমার অনেকদিনের রাগ জমে আছে.....।

অন্য কয়েদীরা হাঁ করে শুনছে জিম রিভ্‌স-এর বকবকানি। ম্যাক্স সেদিকে কান না দিয়ে একমনে খেয়ে যাচ্ছে। খাবারটা সত্যিই ভাল দিচ্ছে এরা। অন্তত জেলের খাবারের চেয়ে হাজারগুন ভাল। ক'হপ্তা পরপর একদিন কতগুলো চামড়া ঢাকা হাড় মাংসের নামে যা দেয়া হয় তাদের মুখ বুঁজে তাই খায় কয়েদীরা।

'তারপর ম্যাক্স?' মাংস চিবুতে চিবুতে তার দিকে তাকাল জিম রিভ্‌স। 'চারপাশে এত মাগি, এদের ভেতর থেকে একটাকে খেলিয়ে তুলতে পেরেছো। বাপধন?'

'না, পারিনি।' ঘাড় নেড়ে জবাব দিল ম্যাক্স, 'আমার শরীর আর বইছেনা, কানের কাছে ফাল্‌তু বকবক কোর না।' খালি প্লেট সরিয়ে দু'হাতে পায়ের গোড়ালি ঘষতে লাগল সে। পায়ে লোহার বেড়ি পরে সারাদিন হাঁটুসমান জলে দাঁড়িয়ে ধান রুইতে হয়েছে। দুপায়ের গোড়ালির ছাল উঠে টাটাচ্ছে।

'শরীর বইছেনা?' খেঁকিয়ে উঠল জিম, 'ক্যাজুন মেয়েদের মত খাসা মাগি হাজার খুঁজলেও দুনিয়ার কোনও মুলুকে মিলবেনা তা জানো হে দোঁ আশলা রেডইণ্ডিয়ান ছোকরা?'

'এতক্ষণ একটা কথার মত কথা বলেছো।' জিম রিভ্‌সের পাশে বসা কয়েদীটি সায় দিল, 'এমনই একটা মাগির জন্য আমি জেল ছেড়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এখানে পড়ে পড়ে ধান রুইতে পারি। তুমি ভাই একটু ওয়ার্ডেনকে বলে কয়ে দ্যাখোনা যদি আমাকে এখানে রাখতে ওঁকে রাজি করাতে পারো কিনা!'

'ধ্যাৎ!' কনুই দিয়ে পাশের লোকটির মুখে জোরে গুঁতো মারল জিম, 'মাল না খেয়েই হতচ্ছাড়ার নেশা হয়েছে, মাগির নেশাতেই গলা জড়িয়ে আসছে!'

'কি রে, ওয়ার্ডেনের পুষ্যিপুত্তুর?' গায়ে পড়ে মাইককে তাতাতে চাইল জিম, 'দু'একটা মাগি তোর বরাতে জুটল, না কি ম্যাক্সের মত নিরিমিষ খেয়ে তোরও শরীর বইছেনা?'

মাইক জবাব না দিয়ে একমনে খেতে লাগল। মাইক যে তাকে পাত্তা দিচ্ছে না বুঝতে পেরে রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠল জিম, তাকে রাগানোর উদ্দেশে বলল, ''আমরা সবাই পায়ে শেকল পরে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ধান রুইছি, আর তুমি শুয়োয়ের বাচ্চা হাতে রাইফেল দোলাতে দোলাতে আমাদের পাহারা দিচ্ছ। এভাবে গাঁইয়া মাগিগুলোকে বুঝিয়ে দিচ্ছ তুমি আমাদের ওপরওলার লোক, বন্দুক হাতে আমাদের ওপর নজর রাখাই তোমার কাজ। তোর মত কেলে নিগ্রোরা আমাদের চেয়ে মাগিদের বেশি গতরের সুখ দিতে পারে তা আমি জানি রে। কেলে খানকির ছাওয়াল! তোর পাশে একটা রাত শোবার আশায় ওরা হা-পিত্যেশ করে মরছিল তা আমার চোখ এড়ায়নি।'

মাংসের ঝোলে পাউরুটি ডুবিয়ে অনেকক্ষণ আয়েশ করে খেল মাইক, খাওয়া শেষ হলে একফালি ন্যাকড়ায় হাত মুছে উঠে দাঁড়াল সে।

'অ্যাই কেলে শুয়োরের বাচ্চা।' চোখ পাকিয়ে মাইকের দিকে তাকাল জিম, তাকে রাগানোর মতলবে বলল, 'কথার জবাব না দিয়ে চলে যাচ্ছিস যে [illegible] মেথরকে নিয়ে শোবার আগে তোর দিদা তোর বাবাকে এমনি [illegible] নাকি রে কুত্তা?'

জিমের উদ্দেশ্য সফল হল। এত গালিগালাজ শোনার পরে মাইক নিজের মাথা আর ঠিক রাখতে পারলনা। এগিয়ে এসে একহাতে টুঁটি চেপে জিম রিভ্‌সকে চেয়ার থেকে তুলে দু'বার ঝাঁকুনি দিয়ে বলল। 'মুখ সামলে কথার বলবি রে, বানচোত! ভুলে যাসনে আমি ট্রাস্টি আর তুই জেলের এক ছিঁচকে কয়েদী! সুস্থ থাকতে চাইলে এবার থেকে বাপু সামলে চলিস, যা মনে আসবে তাই বলতে যাস্‌নে!' বলে টুঁটি টিপে ধরে জিমকে মাইক ছুঁড়ে ফেলল দেয়ালে—ছিটকে এক কোণে পড়তে দেয়ালে ঠুকে জিম রিভ্‌সের মাথা গেল কেটে, হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে চিতপাত হয়ে পড়ে দু'চোখে আগুন জেগে মাইকের দিকে তাকাল জিম, বিড়বিড় করে বলল, 'দাঁড়া, ব্যাটা কেলে ভূত! আগে একবার জেল থেকে বেরোই, তারপর তোকে ছারপোকার মত দু'আঙ্গুলে পিষে মারব!' এতক্ষণ মুখ বুঁজে থাকলেও জিমের আচরেণ তার ওপর চটেছিল ম্যাক্স, মাইক তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে মনে মনে মাইককে বাহবা জানাল সে।

খেয়েদেয়ে কয়েদীরা যে যার খাটে শুয়ে পড়ল, খানিক বাদে জেলের রক্ষিরা এসে খাটের পায়ার সঙ্গে তাদের পায়ের শেকল মজবুত করে আঁটল, ঘরে ঢোকার দরজার গা ঘেঁষে একটিমাত্র জানালা তার চৌকাটে জ্বলন্ত মোমবাতি বসিয়ে চলে গেল তারা। সিগারেট ধরিয়ে হাত পা টানটান করল ম্যাক্স, কানে এল জিম সমেত অন্যান্য কয়েদীদের

গলা—ক্যাজুন মেয়ে বৌরা কখন গোপনে নৈশ অভিসারে আসবে তাদের সঙ্গে সহবাসের আশায় রাতের ঘুম পালিয়েছে চোখ থেকে।

'সারাদিন ত বকবক করছ, 'একজন কয়েদীর গলা শুনতে পেল ম্যাক্স, 'কিন্তু ধরো শেষটায় মাগিগুলো যদি না আসে, তখন?

'অত ছটফট না করে সবুর করতে শেখো। দোস্ত,' আরেকজন জবাব দিল 'সবুরে মেওয়া ফলে তা ত জানো। না এসে যাবে কোথায়? এখানে আসার জন্য ওরাও তোমার আমার মত হেদিয়ে মরছে, সে খবর রাখো? আসবে না বললেই হল? ওদের বাপের বাপ, তার বাপ, গুষ্টিতে যত মাগি আছে সব একে একে এসে হাজির হবে। ভাল খাওয়া দাওয়া হয়েছে। এই বেলা একটু জিরোও, পেটের ভার নামতে দাও নয়ত সময় এলে গতর খেলাবে কি করে?'

'আঃ, পারছিনা! আমি আর এ মুহূর্ত টিকতে পারছি না!' ঘরের কোণ থেকে এক কয়েদীর চাপা আর্তনাদ ভেসে এল, 'সারাদিন জলের ভেতর ধান রুইতে রুইতে শুধু এই মাগিগুলোর কথা ভেবেছি, এদিকে ওদের আসার নামগন্ধও নেই—'

কয়েদী ত নয়, হতাশ নাগর একেকজন। তাদের সমবেত গলার হা-হুতাশে ছোট সেই ঘরের পরিবেশ কয়েক মুহূর্তে যেন বিষিয়ে উঠল। চিত হয়ে শুয়ে ম্যাক্স, ঘুম পালিয়েছে চোখ থেকে, ঘামে তার কপাল ভিজে উঠছে, চাপা উত্তেজনার দপ্‌দপ্ করছে কানের দু'পাশের রগ, কলজের ধুকধুকুনিও গেছে বেড়ে। কোমরের নিচের দিকটা তেতেপুড়ে উঠছে, শক্ত হয়ে উঠছে দু'পায়ের সন্ধিস্থল, আচমকা জেগে ওঠা জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠছে মগজের ভেতরটা। সেই অস্থিরতা শিরদাঁড়া বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে শিরা আর ধমনীতে। এইভাবে চোখে মেলে জেগে থাকা কষ্টকর। কাঁপা-হাতে পাকানো সিগারেট ঠোঁটে চেপে সিগারেট ধরাল ম্যাক্স, দম নিল ফুসফুস ভরে।

'খোকন, ঠিক আছো ত?' সামনের দিক থেকে ভেসে এল মাইকের গলা।

'আমি ঠিক আছি, মাইক,' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল ম্যাক্স।

'ওটা ছাই হবার আগে একটু বাড়িয়ে দিও, খোকন,' মাইক বলল, 'দম দিতে না পেরে গলা শুকিয়ে গেছে।'

দু'তিনটে টান দিয়ে সিগারেট এগিয়ে দিল ম্যাক্স। পোড়া তামাকের আবছা আগুণের আভায় মাইকের ঘাসে ভেজা কুচকুচে কালো মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেল সে।

'আর এট্টু অপেক্ষা করো। খোকন,' আশ্বাস দেবার গলায় বলল মাইক, 'মাগিগুলো থাকতে পারছেনা। মোমবাতিটা নিভে গেলেই ওরা দল বেঁধে ঢুকে পড়বে। গতরের সুখ দেবার কাজটা মেয়েমানুষ আধারেই সারতে চায় তা সে বিয়ে করা বৌ হোক আর অসতী বেবুস্যে হোক। এসব বোধবুদ্ধি এই বুদ্ধুগুলোর নেই বলেই হা-পিত্যেশ করে মরছে।'

মাইকের কথা শেষ হতে না হতে জানালার চৌকাটে বসানো মোমবাতির সলতের আগুন দপদপ করতে করতে গেল নিভে। ঘরে আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ক্যাজুন যুবতীরা দল বেঁধে ভেতরে ঢুকতে লাগল। খালি পায়ে হাঁটাচলা করায় কোনও আওয়াজ না হলেও কাঠের মেঝেতে অনেক জোড়া পায়ের হাঁটাচলার দরুন ফিসফিসানির

মত এক চাপা প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এতক্ষণ উপুড় হয়ে শুয়েছিল ম্যাক্স। আঁধারে মেয়েগুলোর মুখের আদল আঁচ করার আশায় চিত হয়ে শুল সে। কিন্তু ঘন আঁধারে একপাল চলমান ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়লনা। পরমুহূর্তে কপালে নরম ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগতে চমকে উঠল সে।

'তুমি বুড়ো, না জোয়ান, না চ্যাংড়া?' কানের কাছে যুবতীর অচেনা গলা ধ্বনিত হল।

'জোয়ান,' ফিসফিস করে জবাব দিল ম্যাক্স। সঙ্গে সঙ্গে কপাল থেকে সরে এসে হাতখানা তার হাত চেপে ধরল আলতো করে, অচেনা সেই যুবতী তার হাতখানা বোলালো নিজের মুখে কপালে গালে কানের লতিতে, উদ্ধত নাকের পাটায় পাতলা ঠোঁটে। যুবতীর চামড়ার নরম উত্তাপ স্পষ্ট অনুভব করল ম্যাক্স, টের পেল তার আঙ্গুলের ছোঁয়ার তার পাতলা দু'টি ঠোঁট কেঁপে উঠছে থেকে থেকে।

'কেমন লাগছে আমায় ছুঁতে,' ফিসফিস করে জানতে চাইল গাঢ় আঁধারে আবৃত সেই নিশীথিনী।

'ভাল,' একই চাপাগলায় জবাব দিল ম্যাক্স।

'আমায় তোমার পাশে আজকের রাতটুকু শুতে দেবে?'

'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে যুবতী খাটে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। মাতৃগর্ভের উষ্ণ পেলব ছোঁয়া তার দেহে বহুদিন পরে অনুভব করল ম্যাক্স, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে যুবতীর বুকের উন্নত দু'টি স্তনের মাঝখানে নিজের মুখখানা চেপে ধরল, তখনই তার মনে পড়ল বড় হবার পরেও মায়ের বুকে এইভাবে রোজ রাতে মুখ গুঁজত সে। কানেহা তাই নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করত তার বাবার সঙ্গে। কান্নায় তার দু'চোখ বারবার ঝাপসা হয়ে এল, অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রাখল সে, মায়ের পবিত্র স্মৃতি জোর করে সরিয়ে দিল মন থেকে।

আধো ঘুম। আধো জাগরণের মধ্যে দু'টি দৈহিক সত্ত্বার মিলিত হবার আনন্দ কিভাবে কেটে গেল ভাল করে টের পাবার আগেই ভোরের আলো ফুটল আকাশে, যেভাবে রহস্যময়ীর মত নিঃশব্দে এসেছিল সেইভাবে ক্যাজুন যুবতীরা কয়েদী প্রণয়ীদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

চারদিনের মাথায় জিম রিভ্‌স পা চালিয়ে এল ম্যাক্সের কাছে, ম্যাক্স রোজের মতই হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ধান রুইছে। তার গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় জিম বলল, 'কেলে ভূতটা ধারে কাছে নেই দেখেই এলাম। শোন ম্যাক্স, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

কিছু না বলে ম্যাক্স চোখ তুলে তাকাতে জিম বলল, 'এখান থেকে পালানোর একটা ব্যবস্থা হয়েছে। একটা নৌকো জোগাড় হয়েছে।'

'কি?'

'গলা নামিয়ে ফিসফিস করে কথা বলো,' হুঁশিয়ার করল জিম, 'জেলের দক্ষিণে সাইপ্রেস গাছগুলো দেখেছোত। আমাদের জেলে ফেরার পরদিনই ওটা সেখানে পৌঁছে যাবে।'

'কি করে জানলে?'

'যে মাগিটাকে সেদিন বাগিয়েছি তাকে দিয়েই নৌকোটা ওখানে নিয়ে আসব।'

'মেয়েটা শেষ পর্যন্ত সব ভণ্ডুল করবে না ত?'

'আরে না বাপু, সে ভয় নেই।' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জিম বলল, এখানকার সব মাগির ধাত একরকম। ওকে বলেছি আমায় এখান থেকে পালাতে সাহায্য করলে ওকে নিউ অরলিয়ন্স-এ নিয়ে যাব। সেখানে দু'জনে ঘর বাঁধব। শুনেই মাগির হয়ে গেছে। বলেছে ঠিক নৌকো নিয়ে আসবো। মাগি থাকে এখান থেকে কিছু দূরে। পালানোর পরে আমাদের খোঁজাখুঁজি যত দিন বন্ধ না হয় তদ্দিন ওর ডেরাতেই নামব ঠিক করেছি।' কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল জিম। ম্যাক্সের জবাবের অপেক্ষা না করে লম্বা পা ফেলে চলে গেল অন্যদিকে।

রাতে ম্যাক্সের পাশেই খেতে বসল মাইক, অনেকক্ষণ মুখ বুঁজে একমনে খাবার পরে আচমকা বলল, 'তুমি তাহলে জিম রিভ্স-এর সঙ্গে নৌকোয় চেপে পালাবে ঠিক করেছে। খোকন?'

'খবর এরই মাঝে রটে গেছে?' আড়চোখে তাকাল ম্যাক্স।

'এখানে কারও কোনও খবর চাপা থাকে না, খোকন,' মুখ টিপে হাসল মাইক।

'আমি এখনও কিছু ঠিক করিনি,' বলল ম্যাক্স।

'তোমার খালাস পাবার আর মাত্র দেড়বছর বাকি, খোকন,' মাইক বলল 'এর মাঝে এতবড় ঝুঁকি নিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরোনা।'

'এর মধ্যে ঝুঁকি কি দেখলে?'

'ঝুঁকি নেই?' চাপাগলায় বলল মাইক, 'পালানোর খবর রটে গেলে নৌকোয় চেপে পালিয়েছো তাও জানাজানি হবে। ক্যাজুনদের আরও নৌকো আছে, বন্দুক যে আছে তা নিজের চোখে দেখেছো। ওরাই তোমাদের ধরে জেলে ফিরিয়ে আনবে। তারপরে কি সাজা পেতে হবে তা ত জিম রিভ্স-এর বেলাতেই দেখেছো। না, খোকন, আমার কথা শোন, জিমের কথায় নেচে ওর সঙ্গে পালানোর ঝুঁকি তুমি নিয়োনা। ধরা পড়লে ওয়ার্ডেনের হুকুম তামিল করতে বেত মেরে তোমার ছালচামড়া তুলে নিতে আমি বাধ্য হব। দোহাই তোমায়। ঐ অপ্রিয় কাজটা করতে আমায় বাধ্য কোর না। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই, তাই তোমার গায়ে হাত তুলতে আমার খুবই খারাপ লাগবে।'

মাইকের কথা শুনে হাসল ম্যাক্স, তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এই নরকে পচে মেয়াদ খাটি বা পালাই, চিরকাল তোমায় আমার বন্ধু হিসেবেই জানব, মাইক।'

'বুঝেছি, পালানোর ব্যাপারে তুমি মন স্থির করেছো,' বলে মাইক খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

পরদিন রাতে নির্দিষ্ট সময়ে জিম রিভ্স আর ম্যাক্স স্যাণ্ড, দু'জনেই জেলের বেড়া

টপকে লাফিয়ে পড়ল ওপারে। জেলের দক্ষিণে সার বেঁধে দাঁড়ানো সাইপ্রেস গাছগুলোর দিকে কাদাজল ভেঙে ছুটল দু'জনে।

কিন্তু তাদের ছোটাছুটিই সার হল। গাছগুলোর পেছনে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ক্যাজুন চাষীদের ঘরের সেই যুবতীর হদিশ পেলনা তারা যে দু'দিন আগে জিম রিভ্‌স-এর সঙ্গে দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হয়ে তার অনুগত হয়ে পড়েছিল। তাকে পালাতে সাহায্য করতে নৌকো জোগাড় করবে বলে কথা দিয়েছিল। সারি সারি সাইপ্রেস গাছের পেছনে ছোটবড় কোনও নৌকো তাদের চোখে পড়ল না।

'খানকি মাগি!' চাপাগলায় গর্জে উঠল জিম রিভ্‌স, 'কথা দিয়েও মাগি আমার সঙ্গে বেইমানি করল!'

১২

কয়েকটি মুহূর্ত. তারপরেই পরিস্থিতি কাজে লাগাতে জিম রিভ্‌সের হাত ধরে টানতে টানতে হাঁটুজলের ভেতর দৌড়াল ম্যাক্স। কোথায় কোনদিকে মুক্তির নিশ্চিন্ত আশ্রয় তা কেউ জানে না, ফেরার পথ নেই শুধু এটুকু জেনেই পাগলের মত ছুটতে লাগল দু'জনে। ছুটতে ছুটতে কতবার পড়ে গেল তারা, তার ঠিক নেই।

থেকে থেকে জঙ্গলি আগাছা গতি হ্রাস করতে জলের ভেতর সাপের মত তাদের পা ধরল পেঁচিয়ে; সে সব অগ্রাহ্য করে আবার ছুটল তারা। খানিকদ্দূর যেতে জল বেড়ে উঠল কোমরের কাছাকাছি। আর তখনই পেছনে অনেকদ্দূর থেকে কানে এল হিংস্র ডালকুত্তার চিৎকার।

'দৌড়োও ম্যাক্স! যত জোরে পারো দৌড়োও!' চাপাগলায় বলে উঠল জিম, 'ওয়ার্ডেন ওর কুকুর দুটো লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের পেছনে!'

জিমের এই হুঁশিয়ারি ম্যাক্সকে প্রাণপনে দৌড়োনোর নতুন প্রেরণা জোগাল। এখন না দৌড়ে উপায়ও নেই, ধরা পড়লে মাইক বা অন্য ট্রাস্টির দশ ঘা বেত, তারপর খোলা আকাশের নিচে উলঙ্গ দেহে একমাস জানোয়ারের খাঁচায় বন্দিজীবন যাপন। না, সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সে পারবেনা।

ছুটতে ছুটতে দু'দিন দু'রাত কি করে কেটে গেল ভাবতে পারে না ম্যাক্স, এইটুকু মনে পড়ে একসময় সমতল ছাড়িয়ে একটা ছোট টিলার ওপর উঠে বিশ্রাম নিয়েছিল তারা। সেখানে গাছের ডাল কেটে বল্লমের মত ছুঁচোলো করে জল থেকে ছোট মাছ গেঁথে তুলেছিল। আদিম প্রথায় কাঁচা মাছ খেয়ে খিদে মিটিয়েছিল দু'জনে। রেড ইণ্ডিয়ানদের কৌশলে কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালিয়েছিল ম্যাক্স, সেই আগুনের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল জিম। বুনো পোকামাকড়ের কামড়ে তার হাত পা মুখ বীভৎসভাবে ফুলে উঠেছে, জ্বরের তাড়সে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে থরথর করে। জিমকে আগুনের পাশে শুইয়ে ডাল কেটে তৈরি বল্লম নিয়ে তার পাশে জেগে বসেছিল ম্যাক্স, এমন সময় ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হল জেলের ট্রাস্টি নিগ্রো মাইক রাইফেল নিয়ে।

'আগুন জ্বেলেছো কেন,' ইশারায় আগুন দেখিয়ে ধমকে উঠল মাইক, 'দূর থেকে চোখে পড়তেই ত বুঝলাম তোমরা এখানে আছো।'

'ওর জ্বর এসেছে তাই জ্বেলেছি'। ঘুমন্ত জিমকে ইশারায় দেখাল ম্যাক্স। মাইক তাদের নাগাল পেয়েছে, মনে মনে ভাবল সে, এবার নিশ্চয়ই রাইফেল উঁচিয়ে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে জেলের পুরোনো নরকে। জেল থেকে পালানোর খেলা তাহলে এখানেই শেষ।

'জ্বর হয়েছে, মাথার কাছে আগুন জ্বালিয়েছো। ঠিক আছে,' আগুনের পাশে গাঁট হয়ে বসল মাইক, কোলের ওপর রাইফেল রেখে ভেজা হাত পা আগুনে সেঁকতে সেঁকতে বলল, 'কিন্তু তারপর এখানে থাকা তোমার উচিত হয়নি।'

'না থেকে করব কি,' প্রতিবাদ করল ম্যাক্স, 'কোথায় যেতাম?'

'দৌড়ে আরও দূরে পালিয়ে যেতে', বলল মাইক।

'অসুস্থ এই লোকটাকে একা এখানে ফেলে রেখে?' ঘাড় নাড়ল ম্যাক্স। 'না, মাইক, আমি তা পারতাম না। ধর্মে তা সইত না।'

'যার জন্য এত ভাবছো সে কিন্তু অন্য ধাতের মানুষ।' ঘুমন্ত জিমকে ইশারায় দেখাল মাইক। 'ওর জায়গায় তুমি অসুস্থ হলে ও তোমাকে একা ফেলে রেখেই পালিয়ে যেত।'

'কিন্তু আমার ত সত্যিই অসুখ করেনি,' বলল ম্যাক্স।

'বাজে কথা বলে ঢের সময় নষ্ট করেছো। খোকন,' আচমকা রাইফেল তুলল মাইক, 'আর নয়। এবার পালাও।'

'তার মানে?' মাইকের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকাল ম্যাক্স, 'কি বলতে চাও তুমি?'

'ফের বাজে কথা!' ধমকে উঠল মাইক 'তোমায় পালাতে বললাম না? যাও, পালাও!'

'কিন্তু ওর কি হবে?' ইশারায় ঘুমন্ত জিমকে দেখাল ম্যাক্স। 'ওকে অসুস্থ অবস্থায় এখানে ফেলে পালাব? তারপর যদি—'

'তারপর ওয়ার্ডেনের সেপাইরা খুঁজতে খুঁজতে এখানে এলে ওকে ধরবে,' স্বাভাবিক গলায় বলল মাইক, 'জেলে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ঢুকিয়ে দেবে জানোয়ারের খাঁচায়। শুধু পাঁউরুটি আর জল খেয়ে পুরো পঁয়তাল্লিশ দিন ব্যাটাকে ন্যাংটো হয়ে কাটাতে হবে সেখানে।'

'পঁয়তাল্লিশ দিন!' মাইকের কথা শুনে চমকে উঠল ম্যাক্স। জেল পালানো কয়েদী ধরা পড়লে পালানোর দিন-পিছু পনেরো দিন হিসেবে খাঁচার ভেতর কাটানোর নিয়ম। তার মানে—

'তার মানে?' বিস্ময় চাপতে না পেরে মুখ ফুটে বলেই ফেলল ম্যাক্স।

'তার মানে জেল থেকে তোমাদের পালানোর পরে পুরো তিন দিন কেটে গেছে,' হাসল মাইক, 'জেল এখন এখান থেকে অনেক দূরে। কি হল, তোমায় না পালাতে বললাম?' বলতে বলতে আচমকা রাইফেল তুলে নিল সে, 'বাঁচতে চাইলে পালাও ম্যাক্স, আমার সামনে থেকে পালাও নইলে—'

'নইলে গুলি করে মারবে এইত?' বেপরোয়া গলায় জবাব দিল ম্যাক্স। 'হাতে যখন

রাইফেল আছে তখন গুলি করে তুমি আমায় মারতেই পারো, মাইক। কিন্তু জিমকে একা এখানে ফেলে রেখে আমি পালাতে পারবনা!'

'বুঝেছি!' রাইফেল নামিয়ে হাসল মাইক, 'যতটা ভেবেছিলাম তুমি তার চেয়েও ঢের বেশি বোকাবুদ্ধু।'

'সে তুমি যা খুশি বলতে পারো।' বলল ম্যাক্স, 'একসঙ্গে যখন দু'জনে পালিয়েছি, এখন যখন ধরা পড়েছি। তখন ফিরেও যাব একই সঙ্গে।'

'ঠিক আছে,' হার মানা ক্লান্ত গলায় বলল মাইক, 'আগুনটা আগে নেভাও।'

কথা না বাড়িয়ে কাঠকুটো জড়ো করে জ্বালানো আগুনটা লাথি মেরে জলে ফেলে দিল ম্যাক্স। জলের দিকে একবার তাকাল মাইক তারপর কচি বাচ্চাকে বিছানা থেকে তোলার ভঙ্গিতে জিম রিভ্সকে মাটি থেকে তুলে নিল কাঁধে। ম্যাক্স ততক্ষণে টিলা থেকে নেমে যেখানে এসেছিল সেদিকে হাঁটছে।

'কোথায় চললে খোকন?' পেছন থেকে মাইকের হেঁড়ে গলা ভেসে এল, 'পাঁকে ভরাট জমির ওমুড়ো এখান থেকে পুরো চল্লিশ মাইল দূরে।'

'চল্লিশ মাইল!' মাইকের কথা শুনে থমকে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক্স, দেখল মাইকের মুখে হাসি।

'ব্যাপার বুঝলে না?' সহজ গলায় বলল মাইক, 'এত দূরে একবার যখন এসে পড়েছি তখন তোমাদের মত ঐ জেলের নরকে ফিরে যাবার সাধ নেই। এখন আমি আর জেলের কয়েদী নই। ট্রাস্টিও নই।' অবাক চোখে কিছুক্ষণ মাইকের দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাক্স, তারপর বলল, 'কিন্তু এর ফল কি হতে পারে ভেবে দেখেছো? আমাদের নাগালে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে বলে ওরা যদি তোমায় ধরে—'

'ধরলে ত আমায় একা ধরবেনা।' আচমকা বেপরোয়া গলায় বলল মাইক, 'তোমরাও পার পাবে না। সে যখনকার ব্যাপার তখন দেখা যাবে। এবার থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু, ম্যাক্স। তা মনে রেখো।'

জলা আর পাঁক পেরিয়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে লোকালয়ের কাছে আসতে তাদের আরও সাতদিন কাটল। জলের ছোট মাছ আর গেঁড়ি গুগলি ধরে আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে এই ক'দিন কোনরকমে খিদে মেটাল তারা। জ্বর সারলেও জিমের শরীর ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে, হলদেটে হয়েছে চোখের সাদা অংশও। পথ্য আর পুষ্টির অভাবে অল্প হেঁটেই ঝিমিয়ে পড়ছে সে।

'ঐ দ্যাখো ধোঁয়া, জঙ্গলের শেষ মাথায় পৌঁছে দূরের আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল ম্যাক্স', 'ওটা চিমনির ধোঁয়া না হয়েই যায় না। তার মানে আমরা শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছি। এবার তাহলে ভালমন্দ কিছু পেটে পড়বে।'

'পেটে পড়ার রেস্ত কোথায়?' ব্যাঙ্গের সুরে বলল জিম, 'শহর যখন, তখন বড় দোকান নিশ্চয়ই ধারেকাছেই আছে। জায়গাটা বের করে আজই রাতে হানা দিতে হবে।

ক্যাশ ভেঙ্গে মোটা রকম কিছু হাতিয়ে নিতে হবে। আবার এটা আমাদের ধরার ফাঁদও হতে পারে। তাই মিছিমিছি ঝুঁকি নেবনা।'

ম্যাক্স কিছু না বলে তাকাল মাইকের দিকে। মাইক ঘাড় নেড়ে সায় দিল। গাছের উঁচু ডালে বসে তিনজনে মিলে দিনভর জায়গাটা বুঝে নিল তারপর গভীর রাতে গাছ থেকে নেমে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেখল যেখান থেকে দিনের বেলা ধোঁয়া বেরোচ্ছিল সেটা আসলে এক মাঝারি আকারের বিভাগীয় বিপণি। রাতের পাহারাদার ধারে কাছে নেই, দোকানের সদর দরজার পাল্লার বাইরে থেকে শুধু একটা তালা ঝুলছে। আশপাশ ভাল করে দেখে তালা ভাঙ্গল জিম রিভ্স, রাইফেল হাতে মাইককে দোরগোড়ায় পাহারায় দাঁড় করিয়ে ম্যাক্সকে নিয়ে সে ঢুকল ভেতরে। ভেতরে অনেক দোকান, জামাকাপড় থেকে রেস্তোরাঁ, চুলছাঁটার সেলুন এমনকি আগ্নেয়াস্ত্রের দোকানও আছে। রেস্তোরাঁয় বসে অনেকদিন পরে পেট পুরে খেল তিনজনে। টিনে ভর্তি কিছু খাবার ঝোলায় পুরে সঙ্গে নিল। আগ্নেয়াস্ত্রের দোকান থেকে তিনটে ভাল রিভলভার আর প্রচুর কার্তুজ নিল। সবশেষে ক্যাশ ভেঙ্গে কুড়ি ডলার হাতিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। চার পাঁচদিনের মত রসদ এখন সঙ্গে আছে। দু'দিন বাদে ঘোড়াও জোগাড় করল তারা, সেই ঘোড়ায় চেপে চারদিন বাদে কাছে এক ছোট শহরে হাজির হল তিনজনে। গভীর রাতে সবার চোখ এড়িয়ে ঢুকল স্থানীয় একটি ব্যাংকের শাখায়। সেখানকার ভল্ট ভেঙ্গে দু'হাজার ডলার হাতিয়ে নিয়ে তারা পাড়ি দিল টেক্সাসের দিকে।

১৩

ফোর্ট ওয়ার্থ রেল স্টেশন। জিম রিভ্স-এর মেয়ে ট্রেনে চেপে আসছে তার বাবার কাছে। তাকে রিসিভ করতে ম্যাক্স মাইককে নিয়ে এসেছে স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে একসময় তার মন ফিরে গেল অতীতে। সাড়ে তিন বছর আগে একরাতে মাইক আর জিম রিভ্সকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে সে এসেছিল ফোর্টওয়ার্থ নামে এই ছোট শহরে নগদ সাত হাজার ডলার সঙ্গে নিয়ে। সাত হাজার ডলার কেউ মুখ দেখে তাদের দেয়নি, একটা ব্যাংক লুট করে ঐ টাকা জোগাড় করেছিল তারা। লুঠ করার সময় ব্যাংকের দু'জন কর্মচারি বাধা দিল, ম্যাক্সের গুলি খেয়ে খতম হল তারা।

এরপর নতুন জীবন গড়ার পথে এগোল জিম রিভ্স, কেল্লা শহর ফোর্ট ওয়ার্থের পঁয়ষট্টি মাইল দক্ষিণে এক ছোট জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সেলুন বার আর জুয়োর আড্ডা খুলল সে। সৌভাগ্য তার সঙ্গি হল, দু'বছর পূর্ণ হবার আগেই প্রচুর টাকা জমল হাতে, এলাকার গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠল সে। নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে জিম এবার জুয়োর আড্ডার কাছেই বাড়ি কিনে ব্যাংক করল। ব্যাংকিং-এর কারবারেও অভাবিত লাভের মুখ দেখল সে, সেই লাভের টাকা পুঁজি করে এবার জমি কেনাবেচার কারবারে হাত দিল জিম রিভস, আশেপাশে যত জমি সব কিনতে লাগল সে। জমি কেনাবেচার কারবার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক কাছে আসতে হল তাকে। শহরের বাসিন্দারা এবার তাকে মেয়র পদে নির্বাচনে দাঁড় করানোর কথা ভাবতে লাগল।

একদা ব্যাংক ডাকাত ও জেল পালানো কয়েদী জিম রিভ্‌স এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর টাকা আর সুনাম দুটোই পেল। জিম ভেবে দেখল কবে সে কি করেছে তা সত্যিসত্যি কেউ মনে রাখেনি, সে এখন ভদ্রসমাজের বাসিন্দা, সম্ভ্রান্ত ধনী মানুষ। ঠিক এইমুহূর্তে নিজের পরিবার থাকলে নতুন ছদ্মবেশটা তার চূড়ান্ত রূপ নেবে।

গোপনে খোঁজখবর নিয়ে জিম জানল তার স্ত্রী দশবছর আগে নিউ অরলিয়ন্‌স-এ মারা গেছে। তার একমাত্র মেয়ে বেটি আশ্রয় পেয়েছে মামাবাড়িতে। জিম রিভ্‌স তার কাছে আসতে বলে জবাবী টেলিগ্রাম পাঠাল মেয়েকে, মেয়ে পাল্টা টেলিগ্রামে খবর পাঠাল মার্চের পাঁচ তারিখে ট্রেনে চেপে সে আসছে ফোর্টওয়ার্মে।

নিউ অরলিয়ন্‌স থেকে আসা এক্সপ্রেস ট্রেন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এসে থমকে দাঁড়াল ফোর্টওয়ার্ম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। এঞ্জিনের চাপা গর্জন আর যাত্রিদের হৈ চৈ-এ ম্যাক্সের চিন্তাজাল কেটে গেল, অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল সে। ট্রেনের কামরার বন্ধ দরজাগুলো খুলে ততক্ষণে যাত্রিরা মালপত্র হাতে নামতে শুরু করেছে, তাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাইক বলল, 'ঝোঁকের মাথায় চলে এলে, কিন্তু মেয়েটাকে ত আগে কখনও দেখোনি তাহলে ওকে চিনবে কি করে?'

'আমি ত কোন ছার' জবাব দিল ম্যাক্স, 'দশবছর আগে মেয়েকে কেমন দেখতে ছিল তা জিম নিজেই ভুলে গেছে।' তাহলেও বাপের মুখের কিছু আদল নিশ্চয়ই মেয়ে পেয়েছে।'

যাত্রিদের ভিড় হালকা হয়ে এলে তাদের চোখে পড়ল ফুটফুটে দেখতে একটি মেয়ে মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মের এক কোণে দাঁড়িয়েছে, থেকে থেকে মুখ তুলে আশপাশের মানুষদের দেখছে সে। বয়স খুব বেশি নয়। কৈশোর পেরিয়ে সবে পা দিয়েছে যৌবনে।

'ঐ মেয়েটির মুখের সঙ্গে জিমের মুখের আদল আছে,' ম্যাক্স বলল। 'মনে হচ্ছে ও কারও অপেক্ষায় আছে। দেখা যাক।' বলে এগিয়ে এসে মেয়েটির সামনে দাঁড়াল সে, টুপি অল্প তুলে জানতে চাইল, 'মাফ করবেন। আপনি মিস রিভ্‌স। নিউ অরলিয়ন্‌স থেকে এসেছেন?'

'ওঃ, আপনি আমায় সত্যিই বাঁচালেন,' খুশির হাসি ঝলমল করে উঠল মেয়েটির চোখেমুখে।

'এখানে চেনাশোনা কেউ নেই, বাপি আমার টেলিগ্রাম পেল কিনা তাও বুঝতে পারছিনা।'

'উনি টেলিগ্রাম করেই আমায় পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যেতে,' বলল ম্যাক্স, 'আমি ম্যাক্স স্যাণ্ড, আপনার বাবার বন্ধু ও সহযোগী।'

'বাবা নিজের ব্যবসার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন এটাই আশা করেছিলাম,' অভিমানের গলায় বলল মেয়েটি।

এমনই ব্যস্ত যে গত দশ বছরে আমার খোঁজখবর নেবার কথা ওঁর একবারও মনে আসেনি।'

বাপের জেলখাটার খবর মেয়ে জানেনা তার কথা শুনে এটাই ধরে নিল ম্যাক্স, স্বাভাবিক

গলায় বলল, 'কাজের লোক যারা তারা সত্যিই নিজেদের বাড়ির লোকেদের কথা ভাবার সময় পায় না। প্যালেস হোটেলে আপনার জন্য কামরা ভাড়া নেয়া হয়েছে। আপনি ক'দিন সেখানেই থাকবেন। স্নান সেরে খাওয়াদাওয়া সেরে ভাল করে ঘুমিয়ে নিন। আপনার বাবা কিন্তু এখান থেকে আরও দূরের এক শহরে আছেন। আগামিকাল সকালে আপনাকে নিয়ে আমি সেদিকে পাড়ি দেব।'

স্টেশন থেকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে জিম রিভ্‌সের মেয়েকে তার হোটেলে পৌঁছে দিল ম্যাক্স, এই সময়টুকুর মধ্যে মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলল সে।

হোটেল থেকে মেয়েকে নিজের খামার বাড়িতে নিয়ে এসেছে জিম রিভ্‌স, দু'দিন বাদে ভর দুপুরবেলা ম্যাক্স গিয়ে হাজির হল সেখানে। সামনের একটা খুঁটিতে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে, ভেতরে ঢুকে একটা ভেজানো দরজার পাল্লায় আলতো টোকা মারল। খানিক বাদে দরজা খুলে গেল, ম্যাক্স দেখল সামনে দাঁড়িয়ে জিমের মেয়েটি, ফোলা ফোলা চোখমুখ দেখে বুঝতে পারল খানিক আগে অনেক চোখের জল ফেলেছে সে।

'ওঃ, আপনি!' ম্যাক্সকে দেখে অপ্রস্তুত হল বেটি, 'আসুন এ-ঘরে আসুন,' বলে তাকে নিয়ে এল বসার ঘরে।

'বেটি, তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন?' অন্তরঙ্গ গলায় জানতে চাইল ম্যাক্স। 'খুব কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়েছো। কেন, বাবা বকেছে?' বলে তাকে ধরতে যেতেই পলকে পিছিয়ে গেল বেটি, তার চোখের দিকে তাকিয়ে আহত গলায় বলল, 'খবরদার, আমায় ছোঁবেন না! যা বলার ওখানে দাঁড়িয়ে বলুন। আমার দিকে মোটেও হাত বাড়াবেন না!'

'কি হল তোমার, বেটি?' গতরাতে বিয়ে করবে বলে যে কথা দিয়েছে কয়েক ঘন্টা বাদে তার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণ কিছুই আঁচ করতে পারলনা ম্যাক্স। বলল, 'হঠাৎ এমন খারাপ ব্যবহার করছ কেন বলতে পার?'

'জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হচ্ছে না?' ধরা গলায় বলল বেটি। 'আপনি একজন জেল পালানো কয়েদী, খুনের আসামি, একথা আগে বলেননি কেন? কেন বলেননি আপনি দো আঁশলা, রেড ইণ্ডিয়ান রক্ত আছে আপনার দেহে? হায়, ছিঃ ছিঃ এমন একটা লোক্‌কে আমি না জেনে ভালবাসা উজাড় করে জিতে নিয়েছিলাম? বলুন, কেন এসব কথা চেপে রেখেছিলেন?' উত্তেজিত গলায় ধমকে উঠল বেটি। 'আমার বাবার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার লোভে, তাই না? ভেবেছেন কি আপনি? আমায় বিয়ে করে বাবার এত কষ্ট করে জমানো ধনদৌলতের মালিক হয়ে বসবেন? সব জানার পরে আপনার সে মতলব হাঁসিল হতে আমি দেবনা মিঃ ম্যাক্স স্যাণ্ড! আপনি এইমুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যান, ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে বিপদে পড়বেন আগেই বলে রাখছি! যান, বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।'

ম্যাক্স বুঝল বেটিকে বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা, টাকাকড়ি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি সব পাবার পরে জিম রিভ্‌স এবার নিজের কলঙ্কিত অতীতটা মুছে ফেলতে উদ্যত হয়েছে,

আর তাই ম্যাক্সের অতীত তুলে ধরেছে তার মেয়ের কাছে। বেটি যে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তা বুঝেই যে জিম বিশ্বাসঘাতকতা করল তাতে সন্দেহ নেই।

ম্যাক্সের সঙ্গে সে নিজেও যে একই জেল থেকে পালিয়েছে একথা নিশ্চয়ই মেয়েকে বলেনি জিম, একবার জেল থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ার পরে কি আজব সাজা তাকে পেতে হয়েছিল নিশ্চয়ই তাও চেপে গেছে সে।

জিম রিভ্‌স-এর খামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘোড়া ছোটাল ম্যাক্স, বেশ কয়েক বছর আগে জেল থেকে পালানোর পরে দক্ষিণ আমেরিকার পাঁকে ভর্তি গভীর জঙ্গলে অসুস্থ জিমকে দেখিয়ে নিগ্রো মাইকের বলা কথাগুলো এতদিন পরে নতুন করে বাজতে লাগল তার কানে, মাইকের কথায় অসুস্থ জিমকে ফেলে পালাতে রাজি হয়নি সে, শুনে মাইক হেসে বলেছিল, 'জিমের জায়গায় তুমি অসুস্থ হলে ও কিন্তু তোমায় এখানে ফেলে রেখে ঠিক পালাত।'

ব্যাংকে ঢুকে সোজা জিম রিভ্‌স-এর ঘরে এসে ঢুকল ম্যাক্স। বিশাল রোল ডেস্কের ওপারে বসে কাজ করছিল জিম। ম্যাক্সের চাউনি আর হাবভাব দেখে চমকে বলল, 'ব্যাপার কি, তুমি এইসময় হঠাৎ কি মনে করে, ম্যাক্স? বোস! একটু জিরোও।'

'আমায় ঠাণ্ডা করতে এসোনা।' রিভ্‌স বিষঢালা গলায় বলল ম্যাক্স। 'আমার সম্পর্কে মেয়েকে ত ভালই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছো দেখলাম!'

'ওঃ, এই ব্যাপার?' চেয়ারে ঠেস দিয়ে বেহায়ার মত হাসল জিম, 'এজন্য তুমি রেগেমেগে ছুটে এসেছো?'

'হ্যাঁ, তাই,' ম্যাক্স বলল।

'গতকাল রাতে যেখানে ও আমায় বিয়ে করবে বলেছে সেখানে আজ ওর মুখ থেকে এসব কথা শুনতে হল।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ম্যাক্স বলল, 'আমি চললুম, রিভ্‌স, তোমার কারবারে আমার যে পুঁজি খাটছে তা আমায় দিয়ে দাও।'

'একাই যাবে?' দাঁত বের করে হাসল জিম, 'কেলে ভূতটাকে সঙ্গে নেবেনা?'

'আমরা আমাদের পাওনা বুঝে নিয়ে তারপর যাব।'

'যেতে তখন চাইছ। তখন তোমাদের আর ধরে রাখবনা,' বলে জিম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিন্দুক খুলে একতাড়া নোট রাখল ম্যাক্সের সামনে। টাকাগুলো তুলে নিয়ে গুণে দেখল ম্যাক্স পাঁচশো ডলার।

'একি দিচ্ছ!' গর্জে উঠল সে, 'এখানে ত মাত্র পাঁচশো ডলার আছে!'

'ঠিক তাই,' কেটে কেটে বলল জিম, 'তুমি এর চেয়ে বেশি কি আশা করো?'

'জিম রিভ্‌স,' গলা চড়াল ম্যাক্স, 'সাত হাজার ডলার নিয়ে আমরা একরাতে ফোর্টওয়ার্থে এসেছিলাম, হিসেবমত ঐ টাকায় আমার একার অংশ তেইশশো ডলার। কাউকে অংশ না দিয়ে ঐ সাতহাজার ডলারের পুরোটাই পুঁজি করে তুমি মদ আর জুয়ার আড্ডা খুলেছিলে। ঐ কারবারে তুমি প্রচুর লাভের মুখ দেখেছো তা কিন্তু চাপা নেই। অংশীদার হিসেবে মাইক আর আমার ঐ কারবারের মুনাফায় মাথাপিছু পাওনা পাঁচ হাজার ডলার, তার কম নয়!'

'এ নিয়ে আমি তর্ক করতে রাজি নই,' জিম রিভ্‌স বলল 'হাজার হলেও এটা ঠিক আমরা বহুদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি। মানে আমি শুধু তোমার আর আমার কথা বলছি। তোমার দাবি এখুনি মিটিয়ে দিচ্ছি।' বলে নগদ পাঁচ হাজার ডলার সিন্দুক থেকে বের করে ম্যাক্সের হাতে তুলে দিল জিম রিভ্‌স। ম্যাক্স টাকাটা গুণে পকেটে রেখে এগোল পেছন থেকে জিম বলল, 'অত সহজে এখান থেকে পার পাবে এমন ভেবোনা, ম্যাক্স।'

তার কথায় কান না দিয়ে ম্যাক্স বাইরে বেরিয়ে এল, মদের দোকানের পাশ কাটিয়ে কয়েক পা যেতে পেছন থেকে হেঁড়ে গলায় কে বলে উঠল, 'দাঁড়াও, কথা আছে।'

ঘুরে দাঁড়াতে ম্যাক্স দেখল স্থানীয় শেরিফ তাঁর দু'জন ডেপুটিকে সঙ্গে নিয়ে তাকে থামার ঈশারা করছেন। তাঁদের তিনজনেরই হাতে রিভলভার, ম্যাক্স দেখল জিম রিভসও আছে তাদের সঙ্গে।

'ব্যাপার কি শেরিফ?' বলতে বলতে এগিয়ে এল ম্যাক্স।

'ওকে তল্লাশি করুন, শেরিফ,' বলে উঠল জিম রিভ্‌স, 'খানিক আগে ও আমার সিন্দুক থেকে নগদ পাঁচ হাজার ডলার চুরি করেছে, তল্লাশি করলেই টাকাটা পেয়ে যাবেন।'

'চুরি করেছি!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাক্স, 'শেরিফ, বিশ্বাস করুন ওটা আমার পাওনা টাকা।'

'চোপরাও চোর কাঁহিকা!' বলে শেরিফ চাপাগলায় হুকুম দিতেই ডেপুটি দু'জন দু'পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাক্সের ওপর; তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে নগদ পাঁচহাজার ডলার আর রিভলভার বের করে আনল তারা।

'দেখলেন ত!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল জিম রিভ্‌স, 'কি বলেছিলাম! দেখুন ঠিক বলেছিলাম কিনা!'

'এ বজ্জাতটাকে এখুনি হাজতে ঢোকাও,' শেরিফ বলল, 'ব্যাংকার রিভ্‌সের সিন্দুক খুলে টাকা চুরি করা! এমন কেস ঠুকে দেব যাতে লম্বা মেয়াদের জেল হয়! তখন বাছাধন বুঝবে মজা!'

'মাইক নামে ওর এক নিগ্রো দোস্ত আছে,' শেরিফকে বলল জিম, 'এখন মদের আড্ডায় গেলেই ব্যাটাকে পেয়ে যাবেন। ওর মতলবেই ম্যাক্স ছোঁড়াটা এ কাজ করেছে। আপনি এক্ষুণি ঐ কেলে ভূত মাইককে ধরে হাজতে ঢোকান।'

উত্তেজনার বশে জিম রিভ্‌স খেয়াল করেনি পাশেই মদের আড্ডায় খোলা জানালার পাশে বসে মাইক খানিক আগে যা ঘটল তার পুরোটাই গোড়া থেকে দেখেছে। শেরিফের ডেপুটিরা ম্যাক্সের হাতে হাতকড়া পরাচ্ছে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাইক, মদের দাম মিটিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে উধাও হল। শেরিফ মদের আড্ডায় ঢুকে অনেক খোজাখুঁজি করেও মাইকের হদিশ পেলেন না।

গভীর রাত, কাজকর্ম সেরে ব্যাংকের লোকেরা অনেক আগেই যে যার বাড়ি চলে গেছে। ব্যাংকের মালিক জিম রিভ্‌স সিন্দুক ভাল করে বন্ধ করে দরজা জানালা ভেতর থেকে এঁটে বাইরে এল। দরজায় তালা এঁটে পায়ে পায়ে এগোল মদের আড্ডার দিকে, ওখানে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে তার ঘোড়া।

জিম রিভ্‌সের মনে আজ আর খুশি ধরে না— ম্যাক্সকে চুরির দায়ে বামাল ধরা পড়েছে, বিচারে তার লম্বা মেয়াদের সাজা নিশ্চয়ই হবে, কেলে ভূতটাকে ও এই ফাঁকে ফাঁসাতে পারলে ভাল হত। জেলের ভেতরে তার পুরোনো জীবনের এই দুই সাক্ষিকে খতম করার লোকের অভাব হবে না। আর তখন সে হবে পুরোপুরি নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, অতীতের কথা ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে দিনরাত আর এদের মন জুগিয়ে চলতে হবে না।

ঘোড়ার কাছাকাছি আসতেই গাঢ় আঁধারের ভেতর চামড়ার চাবুক সজোরে আছড়ে পড়ল জিম রিভ্‌সের পিঠে। চমকে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরে ঘুরে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আরেক গা এসে পড়ল তার চোখে মুখে। সেটা সামলে ওঠার আগে আবার, ... আবার। বুকফাটা আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল জিম, চাবুক কিন্তু থামলনা, সমানবেগে আছড়ে পড়তে লাগল তার বুকে চোখেমুখে।। সঙ্গে রিভলভার থাকলেও জিম নিরুপায় যে হাত চাবুক হাঁকাচ্ছে তা ভাল করে নজরে পড়ছেনা, গুলি চালাবে কাকে তাক করে। চাবুকের ঘায়ে জামা ছিঁড়ে কুটিকুটি হল, ফালাফালা হল বুক পেটের চামড়া। জিম রিভ্‌সের রক্তে ভেসে গেল চারদিক তবু চাবুক থামার নামটি নেই। উঠে দাঁড়িয়ে পালানোর ক্ষমতা জিম রিভ্‌স হারিয়েছে অনেক আগেই, পড়ে পড়ে মার খেতে খেতে পরিত্রাহী আর্তনাদ করতে লাগল সে। একসময় আর্তনাদ করার ক্ষমতাটুকুও তার আর রইলনা।

শেষবারের মত গোঙানির মত আওয়াজ তুলে চিরদিনের জন্য তার গলা স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের আড়াল থেকে চাবুক হাতে বেরিয়ে এল নিগ্রো, থুড়ি, কেলে ভূত মাইক। জিম রিভ্‌স-এর দিকে তাকিয়ে একবার হাসল সে। বুটপরা পায়ে মাইক টেনে এক লাথি মারল বেইমানের মুখে, তারপর মনের সুখে আরেক ঘা হাঁকল তার মুখে। জিম রিভ্‌স অনেক আগেই জ্ঞান হারিয়েছে। তার বড়বড় দুটো চোখ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে মাইকের দিকে। ক্ষতবিক্ষত জিম রিভ্‌সের সে রাতে বাড়ি ফেরা হল না। অজ্ঞান অবস্থায় রক্তাক্ত দেহে পথের ধুলোর ওপর শুয়েই শেষ নিঃশ্বাস ফেলল সে।

পরদিন ভোরবেলায় শেরিফের ডেপুটি কয়েদীকে জলখাবার দিতে এসে হাজতের দরজা খুলে চমকে উঠল। হাজত ফাঁকা ভেতরে কয়েদী নেই। ডেপুটি দেখল হাজতের একটিমাত্র জানালায় দু'টি শিক কেউ যেন গাছের ডাল ভাঙ্গার মত ভেঙ্গে উপড়ে ফেলেছে। মানুষ খুনের খবর পেয়ে বেলার দিকে শেরিফ এলেন, দেখলেন ব্যাংকের কিছু তফাতে মদের দোকানের সামনে বড় গাছের পাশে ধুলোর ওপর পড়ে আছে এক পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ, চারপাশে জমে থাকা রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে। শেরিফ লক্ষ করলেন মৃত লোকটির পরনের জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, বুক পেটের চামড়া ফালাফালা হয়ে বেরিয়ে এসেছে কলজে, অন্ত্র, পিলে, নাড়িভুঁড়ি। মৃতের মুখখানা দেখে চমকে উঠলেন শেরিফ, বললেন 'আরে এ যে দেখছি ব্যাংক মালিক জিম রিভ্‌স। কি ভয়ানক কাণ্ড। এইত গতকালই দেখা হল ওঁর সঙ্গে, শেষকালে এমনি বেঘোরে মরল লোকটা।'

'শেরিফ,' ডেপুটিদের একজন বলল, 'ধারালো অস্ত্র বলে মনে হলেও খুনি চাকু ছুরি চালায়নি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু খুনের হাতিয়ারটা কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'চাবুক,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন শেরিফ, 'খুনি যেই হোক, সে চাবুকে রিভ্‌সের ছালচামড়া সব ছাড়িয়ে নিয়েছে। লাশ সদরে চালান দাও ময়না তদন্ত করতে হবে।'

১৪

স্প্যানিশে গ্রামটার নাম খুব বড় তাই আমেরিকানদের তা উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়। এইকারণে তারা গ্রামটার নাম দিয়েছে গর্ত। যখন আর কোথাও যাবার জায়গা নেই, পুলিশ যখন দিনরাত ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তাড়া করে ফিরছে, পরপর কয়েক রাত যখন দু'চোখ থেকে ঘুম বিদায় নেয় তখন গর্তই একমাত্র জায়গা সেখানে নিশ্চিন্ত আশ্রয় জোটে। জায়গাটা সীমান্তের ওপারে মেকসিকোতে সেখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আইন অচল। তবে এও ঠিক যে পলাতকদের পক্ষে গর্তে থাকা খাওয়ার খরচ অনেক। সীমান্ত থেকে চার মাইল দূরে হলেও খাঁটি আমেরিকান হুইস্কি এখানে মেলে যদিও তার জন্য দাম দিতে হয় চারগুণ।

গ্রামের সরাইখানার মালিক জানালার ধারে টেবলে বসে নিজের মনে টেকুইলা চাখছে এমন সময় আমেরিকান দু'জন ঢুকল, দরজার কাছে একটা টেবলে মুখোমুখি বসল তারা। দু'জনের মধ্যে একটা লম্বা, দশাসই চেহারার নিগ্রো, অন্যটা বেঁটেখাটো। দোআঁশলা, গায়ে রেড ইণ্ডিয়ান রক্ত আছে দেখলেই বোঝা যায়। বেঁটে লোকটা বসেই দু'গ্লাস টেকুইলার অর্ডার দিল। কৌতূহল মাখানো চোখে সরাই-মালিক তাকাল তাদের দিকে। এই সরাইখানাতেই উঠেছে ওরা। ক'দিন বাদেই চলে যাবে আর সবার মত। গোড়ায় সরাই-এ উঠেই ফুটানি মারতে শুরু করে, ভারি গলায় খাবার দাবারের অর্ডার দেয়, সবসময় সেরা জিনিষটি পেতে টাকা ওড়ায় দু'হাতে। সেরা থাকার ঘর, সেরা হুইস্কি আর রাত কাটানোর জন্য দামি মেয়েমানুষ। তারপর টাকাকড়ি কমার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে খরচের মাত্রা। দামি সেরা ঘর থেকে সবচেয়ে সস্তায় মোটামুটি থাকা যায় এমন কামরায় নেমে আসে, মেয়েমানুষের নেশা যায় ছুটে। সবশেষে, সেরা দামি হুইস্কি ছেড়ে যখন টেকুইলা গলায় ঢালে তখনই বোঝা যায় বাছাধনের কেটে পড়ার সময় হয়ে এসেছে।

লোক দুটো সবে টেকুইলার গ্লাসে চুমুক দিয়েছে কি দেয়নি এমনই সময় বারের এপাশে দাঁড়ানো বড়সড় গাঁট্টাগোট্টা হোঁতকা লোকটার নজর পড়ল তাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসে দাঁড়াল বেঁটে লোকটার গা ঘেঁষে, তার নিগ্রো সাথীকে ইশারায় দেখিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'ওকে এই মুহূর্তে বিদেয় হতে বলো। এখানে কেলে নিগ্রো ভূতেদের আমরা ঢুকতে দিইনা!'

কিন্তু তার সেই হুমকিতে কান না দিয়ে বেঁটে লোকটা নিজের মনে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

'কথা কানে গেল না বুঝি?' ষণ্ডামার্কা হোতকা লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে

সঙ্গে নিগ্রো লোকটির হাত থেকে টেকুইলা ভর্তি গ্লাস কেড়ে নিয়ে আছড়ে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল সে। কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গার ঝনঝন আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। হোতকাকে একটু শিক্ষা দিতে নিগ্রো লোকটি চেয়ার ছেড়ে উঠতে যেতে তার ছোটখাটো সঙ্গি চোখের ইশারায় নিরস্ত করল, নিগ্রো আবার বসে পড়ল চেয়ারে। নিজের গ্লাস সঙ্গির সামনে রেখে এবার ছোটখাটো লোকটি উঠে দাঁড়াল, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সরাইওয়ালার সামনে।

'কি মশাই,' হোত্‌কা লোকটাকে ইশারায় দেখিয়ে সে স্পষ্টভাষায় জানতে চাইল, 'ঐ শুয়োরের বাচ্চা যা বলছে, তা ঠিক? এখানে নিগ্রোদের ঢোকা নিষেধ?'

'না সে নয়,' সরাইওয়ালা বিনীত হাসল, 'খাবার আর মদের দাম যে মেটাতে পারবে সেই-ই এখানে ঢুকতে পারবে। এ ব্যাটা এখানকার ফুটো মাস্তান, ধারে মদ গেলে। ওর কথায় কান দেবেন না!'

ছোটখাটো লোকটি তাই শুনে ফিরে গেল নিজের টেবলে; হোত্‌কা ষণ্ডাটা তখনও দাঁড়িয়েছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানকার যিনি মালিক তিন এইমাত্র বললেন আমার বন্ধুর এখানে আমার মতই ঢোকার অধিকার আছে।'

'আরে রাখুন মশাই!' হোঁত্‌কা খেঁকিয়ে উঠল, 'ও ব্যাটা মালিককে চিনতে বাকি নেই, ব্যাটা মহা তেলবাজ। ঠিক আছে, আপনার দোস্ত এই কেলে ভূতের ব্যবস্থা আমি তাহলে নিজেই করছি!' বলতে বলতে কোমরের খাপ থেকে এক ঝটকায় রিভলভার টেনে বের করল সে।

কিন্তু বের করাই সার হল। নিগ্রো লোকটির দিকে রিভলভার তাক করতেই ঘরের ভেতর বাজ পড়ার আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে কাটা গাছের মত বুকে হাত দিয়ে হোঁতকা লোকটা লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। নিজের রিভলভার খাপে পুরে ছোটখাটো লোকটা আবার এসে দাঁড়াল সরাইওয়ালার সামনে। বিনীতভাবে বলল, 'আপনার দোকানের শান্তিভঙ্গ করার জন্য মাফ চাইছি। আমি আগে গুলি না ছুঁড়লে আমার বন্ধুকে ঠিক খুন করত।'

'আমি এতক্ষণ ধরে সব দেখেছি। সরাইওয়ালা হেসে বলল 'আপনি অন্যায় কিছু করেননি।' হোত্‌কার রক্তাক্ত লাশ ইশারায় দেখিয়ে সরাইওয়ালা বলল 'ওর মত ছারপোকার বেঁচে থাকা বেআইনী।'

খানিকটা টেকুইলা এক ঢোকে গিলে লেবুর টুকরোয় কামড় বসাল ম্যাক্স। টেকুইলার ঝাঁঝে জমে থাকা গলার ভেতরটা লেবুর রসে পুরো সাফ হয়ে গেল।

'কি গো,' মাইকের দিকে মুখ তুলে তাকাল ম্যাক্স, 'আর ক'দিন চলার মত রেস্ত সঙ্গে আছে?'

'তা আরও তিন হপ্তার মতও বটেই'। একমুহূর্ত হিসেব করে জানাল মাইক।

'এবার একটা বেশ বড়সড় দাঁও মারতে হবে, বুঝলে?' সিগারেট পাকিয়ে ধরাল ম্যাক্স, 'মোটা রকম কিছু হাতে এলে নেভাদা নয়ত ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে ছোটোখাটো

কোনও কাজ কারবারে হাত লাগাব। এসব জায়গায় টাকাকড়ি বেশিদিন হাতে থাকে না।'

'ঠিকই বলেছো,' ঘাড় নেড়ে সায় দিল মাইক, 'তাছাড়া এবার আমাদের আলাদা হয়ে যে যার পথে এগোতে হবে। পেছনের ফেউ গুলো কিন্তু জানে যে আমরা একসঙ্গেই আছি। কখনও আমায় দেখলে বুঝবে তুমি আছো ধারে কাছেই। এসব ভেবেই এবার আমাদের আলাদা হওয়া দরকার।'

'আমি এতদিনে তোমার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। তাই ত মাইক?' হাসতে গিয়ে মুখভর্তি টেকুইলা থুতুর মত ছেটালো ম্যাক্স, হাত বাড়িয়ে আরেকটা লেবুর টুকরো নিয়ে কামড় বসাল।

'ওকথা বলছ কেন,' মাইক বলল, 'আমি কি একবারও তা বলেছি? আসলে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট, এবার কোথাও থিতু হয়ে বসে নতুন করে জীবনটা গড়ার চেষ্টা করো যাতে এইভাবে পালিয়ে বেড়াতে না হয়।'

'সে কি,' গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল মাইক, 'আমরা যে একদিন একসঙ্গে থাকব বলে কসম খেয়েছিলাম তা এত শীগগির ভুলে গেলে? না মাইক, তোমার ওসব কথায় আমি ভুলছিনা। এবার মোটা টাকা হাতে এলেই দু'জনে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি জমাব।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এক ঢ্যাঙ্গা, লালচুলো কাউবয়, ম্যাক্স আর মাইকের পাশে একটা খালি চেয়ারে বসে বলল।

'সোনার চাঁদেরা দু'জনেই যখন একসঙ্গে আছো তখন চার্লি ডব্স ঠিক সময়েই এসে পড়েছে বলতে হয়। তবে তোমাদের ঐ টেকুইলা আমার ধাতে সইবেনা বাপু। বারটেণ্ডার, এখানে একবোতল হুইস্কি দিয়ে যাও। আর তিনটে গ্লাস।'

গ্লাস আর হুইস্কির বোতল টেবলে রেখে বারটেণ্ডার চলে গেল। তিনটে গ্লাসে হুইস্কির সঙ্গে জল মেশাল চার্লি ডব্স।

'ব্যাপার কি, চার্লি,' ম্যাক্স জানতে চাইল, 'তুমি আবার কি মনে করে এখানে ফিরে এলে? আমি ত ভেবেছিলাম তুমি রেনোর পথে পাড়ি দিয়েছো।'

'ঠিকই বলেছো,' হুইস্কিতে চুমুক দিল চার্লি, 'কিন্তু একটা বড় দাঁও-এর খবর পেয়ে আর বসে থাকতে পারলাম না তাই ফিরে এলাম।'

'কি রকম দাঁও?' জানতে চাইল ম্যাক্স, 'ভাল করে ঝেড়ে কাশো।'

'এটা একটা নতুন ব্যাংক,' গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল চার্লি, 'তেলের খোঁজে টেক্সাসে খোঁড়াখুড়ি শুরু হবার কথা গতবছর তোমায় বলেছিলুম মনে পড়ে? ঐ খোঁড়াখুঁড়ির কাজকর্ম দেখব ভেবে উত্তরদিকে এগোলাম,' বলে চার্লি থামল। গ্লাসে আরও খানিকটা হুইস্কি ঢেলে জল মিশিয়ে এক ঢোঁকে গিলে বলল, 'দেখলাম মাটির নিচে তেলের হদিশ ওরা সত্যিই পেয়েছে। ওফ্! সে এক দারুণ ব্যাপার, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। মজুররা মাটি খুঁড়ছে, খুঁড়েই চলেছে। খুঁড়তে খুঁড়তে কুয়ো তৈরি হল, কিন্তু জলের বদলে সেই কুয়োয় মিলল তেল, অঢেল তেল। নল ডুবিয়ে সেই তেল তুলে

পিপের পর পিপে ভর্তি করে পাঠাচ্ছে পূবদিকে। এতসব কাণ্ডের সব টাকা জোগাচ্ছে মাত্র একটা ব্যাংক যার কথা খানিক আগে বললুম।'

'কাজটা জব্বর মনে হচ্ছে।' ম্যাক্স বলল, 'তা যুক্তি কিছু রয়েছে?'

'কাজের মতলব যার মাথা থেকে বেরিয়েছে সে ওদিকের স্থানীয় লোক,' বলল চার্লি, 'তবে একা সামাল দিতে পারবেনা তাই লোক খুঁজছে। আমরা হ'গে সেই লোক, এককথায় জোগানদার। মালকড়ি যা হাতে আসবে তার দু'ভাগ নেবে ও নিজে, আমরা মাথাপিছু এক ভাগ।'

'ভালই ত মনে হচ্ছে,' ম্যাক্স তাকাল মাইকের দিকে, 'তোমার কি মনে হচ্ছে?'

'কাজে হাত দেবে কবে?' গ্লাসের হুইস্কি পুরো গলায় ঢেলে শুধোল মাইক।

'নতুন বছর পড়ার ঠিক পরেই,' চার্লি তার দিকে তাকাল।

'নতুন খোঁড়াখুঁড়ি বাবদ ঐসময় দেদার টাকা জমা পড়বে ব্যাংকে,' তিনটে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে সে বলল, 'দ্যাখো, রাজি থাকলে কালই রওনা হতে হবে। ওখানে পৌঁছোতে আমার পুরো তিন হপ্তা লেগেছিল।'

১৫

ভিড় ঠেলে চার্লি ডব্স-এর পেছন পেছন সেলুনে ঢুকল ম্যাক্স। ভেতরে জুয়োর আড্ডায় এসে জুটেছে তেলের খনির যত কুলিকামিন আর ভাগ্যান্বেষী কাউবয়। তাদের চারপাশে তিন সারিতে দাঁড়িয়ে গাদাগাদা লোক, জুয়োর নেশায় এসেছে সবাই। কতক্ষণে সামনের দলের খেলা শেষ হবে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

'কেমন, বলেছিলুম কিনা?' খুশিতে খলখল করে হেসে উঠল চার্লি, ম্যাক্সের কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বলল, 'এ শহরে পয়সা চারদিকে উড়ছে, শুধু চোখ কান খোলা রেখে তা মুঠোয় চেপে ধরা।' বলতে বলতে তাকে ভেতরে বারের কাছে টেনে এনে দাঁড় করাল। একটা লম্বাপানা লোক দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে চার্লিকে দেখে সে বলল, 'দেখে ত মনে হচ্ছে অনেকদূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছো।'

'ঠিক তাই, এড্,' চার্লি সায় দিল।

'বাইরে এসো, কথা আছে।'

এড্ একটা রূপোর ডলার বারের ওপর রেখে দরজার দিকে পা বাড়াল, ঠিক তখনই ম্যাক্সের চোখে তার চোখ পড়ল।

ম্যাক্সও সেইমুহূর্তে তাকাল তার চোখের পানে, ভাবলেশহীন ফ্যাকাশে তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ।

এড্-এর বয়স চল্লিশের শেষকোঠায়, হলদে ঝুরো একজোড়া গোঁফ ঠোঁটের ওপর ঝুলছে। লোকটাকে ম্যাক্স-এর খুব চেনা মনে হল। কিন্তু আগে কবে কোথায় দেখেছে মনে করতে পারলনা। তবে এই মুখ, এই চাউনি সে আগে দেখেছে এমন অনুভূতি তার হল।

লোকটা ততক্ষণে লম্বা পা ফেলে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চার্লি আগেই গিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছে তার সঙ্গে। ম্যাক্স গিয়ে পৌঁছোতেই লোকটা আরেকবার তাকে দেখে রাগরাগ গলায় চার্লিকে বলল 'আমি তোমায় চারজন লোকের কথা বলেছিলাম ভুলে গেলে?'

'মোটেও ভুলিনি,' চটপট জবাব দিল চার্লি,' আরও একজন সঙ্গে এসেছে, সে শহরের বাইরে উঠেছে।'

'বেশ করেছো,' এড্ বলল।

'তোমরা ঠিক সময়মত এসে পৌঁছেছো। শুক্রবার, মানে আগামিকাল রাতে ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আর ক্যাশিয়ার দু'জনেই অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাজ করবে ব্যাঙ্কের ভেতরে। যেসব মজুর তেলের কূয়ো খুঁড়ছে পরশু শনিবার ওদের হপ্তার মজুরি দিতে হবে কিনা, তাই। বেলা দশটা নাগাদ প্রেসিডেন্ট আর ক্যাশিয়ার দু'জনেই ভেতরে ঢোকে। কাল ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওদের দু'জনকে ধরে পেছনে সিন্দুকের কাছে নিয়ে যাব, ওদের দিয়েই সিন্দুক খোলাব। তাহলে আর আমাদের সিন্দুক ভাঙ্গতে হবে না।'

'বুঝেছি,' চার্লি বলল। 'আমায় কি করতে হবে বুঝে নিয়েছি। তুমি কি ভাবছ, ম্যাক্স?'

'প্রেসিডেন্ট আর ক্যাশিয়ারের সঙ্গে বন্দুক থাকে?'

'থাকাই ত স্বাভাবিক,' বলল এড্।

'কেন, বন্দুকবাজিতে তুমি ভয় পাও নাকি?'

'না, তা নয়,' মাথা নেড়ে বলল ম্যাক্স, 'পরিস্থিতি কি দাঁড়াতে পারে তা আগে থেকে জেনে রাখছি।'

'আমাদের হাতে কত আসবে বলে তোমার ধারণা?' জানতে চাইল চার্লি।

'কম করে পঞ্চাশ হাজার ডলার ত বটেই,' এড্ বলল, 'তার বেশিও হতে পারে।'

'পঞ্চাশ হাজার?' খুশি চাপতে না পেরে শিস দিয়ে উঠল চার্লি, 'আই ব্বাস্! বাপের জন্মে একসঙ্গে এত টাকা দেখিনি!'

'ছেলেমানুষি কোর না!' চাপাগলায় ধমক দিল এড্, 'যা বলি মন দিয়ে শোন। সবাই একসঙ্গে চলে আসবে, এখানে আসার পরে কারও মুখে টুঁ শব্দটিও যেন না শুনি। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় ব্যাঙ্কের পেছনে আমরা সামিল হব। কি বললাম কানে গেল?' এড্ সবার মুখের দিকে একে একে তাকাল, সবাই ঘাড় নেড়ে বোঝাল তার কথার সারমর্ম বুঝেছে। কয়েক পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এল এড্। ম্যাক্সের কাছে এসে বলল, 'তোমার মুখখানা খুব চেনা চেনা লাগছে, মনে হচ্ছে আগে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছিনা।'

'এমন ত কতই হয়,' হাসল ম্যাক্স, 'এত জায়গায় ঘুরেছি যুদ্ধে লড়েছি, কবে কখন কার চোখে পড়ে গেছি সব কি মনে থাকে? তবে আমারও তোমায় খুব চেনা চেনা লাগছে।'

'ঠিক বলেছো।' এড্ বলল। 'এমন ত কত লোককেই একেকসময় চেনা মনে হয়। দেখা যাক, কাল রাতে হয়ত মনে পড়বে কবে কোথায় তোমায় দেখেছি,' বলে পা বাড়াল

সামনের দিকে। এড্ চোখের আড়ালে যতক্ষণ না গেল ততক্ষণ পেছন থেকে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ম্যাক্স, তারপর চার্লিকে বলল, 'তোমার এই এড্ লোকটা সম্পর্কে আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, কে যেন আমার ভেতর থেকে বলছে ওর আসল পরিচয় আমার জানা উচিত ছিল।'

তার কথার ধরনে হেসে উঠল চার্লি, হাসতে হাসতে বলল, 'নাও ঢের হয়েছে, এবার চলো এগোনো যাক। মাইক নিশ্চয়ই আমাদের জন্য বসে আছে।'

'সবাই তৈরি হও!' কর্কশ চাপাগলায় হুকুম দিল এড্, 'ওরা আসছে!'

দরজার কাছে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়েছে ম্যাক্স, দরজার ওপাশে শিকারের অপেক্ষায় একইভাবে দাঁড়িয়ে এড্ আর চার্লি। ম্যাক্সের কান খাড়া—বাইরে থেকে দু'জোড়া পা ব্যাঙ্কে ঢুকেছে ঠিক টের পেয়েছে সে, পায়ের আওয়াজ ক্রমে এদিকে এগিয়ে আসছে তাও টের পাচ্ছে সে।

এড্-এর সংকেত পেতেই দুজোড়া পা দরজা পেরিয়ে এপাশে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংকেত পাঠাল এড্। আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে সেই দু'জোড়া জুতোর মালিকদের ওপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'কি, হচ্ছে কি এসব—' দু'জনের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আততায়ীদের একজন বেঁটে মুগুর দিয়ে একঘা বসাল তাঁর মাথায়। পরমুহূর্তে মেঝেতে কারও পড়ে যাবার ভারি আওয়াজ হল।

'প্রাণে বাঁচার সাধ থাকলে টুঁ শব্দটি করবেন না দাদা।' আহত লোকটির কানের কাছে মুখ এনে বলল এড্, তারপর হুকুম দিল, 'হাঁ করে দেখছ কি, এদের দু'জনকে নিয়ে যাও পেছনের ঘরে! যা যা শিখিয়েছিলুম সব ভুলে গেলে এরই মাঝে?'

ম্যাক্স আহত লোকটিকে টানতে টানতে নিয়ে এল পেছনের একটি ঘরে।

'ব্যাটা এখানেই পড়ে থাক!' আহত লোকটিকে ইশারায় দেখাল এড্, হুকুম দেবার গলায় ম্যাক্সকে বলল, 'তুমি সদর দরজার কাছে যাও, দেখে এসো ধারে কাছে কেউ আছে কিনা!'

ম্যাক্স শুনেই দৌড়োল। সদর দরজার কাছে এসে আলতো করে পাল্লা খুলে বাইরে উঁকি দিল, ফিরে এসে বলল, 'ধারে কাছে কেউ নেই।'

'এমনটাই তো চাই,' বলল এড্, 'এবার তাহলে কাজে হাত দেয়া যাক। আহত বেহুঁশ লোকটির সঙ্গির দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল সে, 'নাও, এবার চটপট সিন্দুক খোল।'

যাকে বলল তার বয়স পঞ্চাশের ওপর মেঝেতে পড়ে থাকা আহত লোকটির দিকে আতঙ্ক মাখানো চোখে তাকিয়ে বলল, 'সিন্দুক আমি খুলতে জানিনা। ইনি মিঃ গর্ডন, ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট, সিন্দুকের তালার কম্বিনেশান শুধু উনিই জানেন।'

'ব্যাটা অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে মট্‌কা মেরে পড়ে আছে,' ইশারায় ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টকে দেখাল এড্, 'ওকে জাগাও, টেনে তোল।'

হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে ম্যাক্স বেহুঁশ প্রেসিডেন্টের চোট পরীক্ষা করল, মুখ তুলে

এড্‌কে বলল। 'এঁর ঘুম আর ভাঙ্গবেনা, তুমি মেরে এঁর খুলি ফাটিয়ে দিয়েছো, ঘিলু বেরিয়ে গেছে।'

'সর্বনাশ!' তার কথা শুনে অন্য লোকটি আক্ষেপের সুরে বলল, ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে।

'প্রেসিডেন্ট গেছে ত কি হয়েছে,' অন্য লোকটির সামনে এসে হুমকি দেবার গলায় বলল এড্‌, 'তুমি আছো, ভালোয় ভালোয় এবার সিন্দুকটা খুলে ফ্যালো।'

'কি-কিন্তু আমি যে সিন্দুক খুলতে জানিনা,' লোকটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল। 'সিন্দুকের তালার কম্বিনেশন আমি জানি না!'

'জানো না শিখে নাও!' বলে লোকটির মুখে আচমকা এক ঘুঁষি মেরে বসল এড্‌, মার খেয়ে সামলাতে না পেরে লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সামনে ডেস্কের ওপর।

'তোমরা বিশ্বাস করো!' কাঁদোকাঁদো গলায় লোকটি বলল, 'সত্যিই আমি সিন্দুক খুলতে জানি না। মিঃ গর্ডন ছাড়া আর কেউ ঐ সিন্দুক খুলতে জানে না।'

'ফের বাজে কথা?' এড্‌ আরেকটা ঘুঁষি মারল তাকে, 'বাঁচতে চাও ত সিন্দুক খোল বলছি!'

'শোন ভাই,' মার খেয়ে লোকটার ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরছে, কাঁদোকাঁদো গলায় সে সামনের ডেস্ক দেখিয়ে বলল, 'ঐ ডেস্কের দেরাজে চার হাজার ডলার রাখা আছে, ওটা নিয়ে আমায় ছেড়ে দাও। দোহাই, আমায় আর মেরোনা। সিন্দুকের কম্বিনেশন আমি সত্যিই জানি না।'

ছুটে এসে সামনের ডেস্কের দেরাজ খুলে ফেলল এড্‌, ভেতরে রাখা নোটের বাণ্ডিল খামচে বের করে এনে পুরে ফেলল নিজের জ্যাকেটের পকেটে। ফিরে এসে আবার সে দাঁড়াল লোকটার সামনে, ভয়ে সে তখন মেঝেতে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে কাঁদছে ভেউভেউ করে।

'নাকি কান্না কেঁদে আমায় ভোলাতে এসোনা,' ধমকে উঠে আবার তার মুখে মারল এড্‌, 'এখনও বলছি সিন্দুক খোল।'

'জানিনা,' মার খেয়ে কঁকিয়ে উঠল সে, এড্‌ লাথি মারতে যেতেই ম্যাক্স তার কাঁধে হাত রেখে শান্তগলায় বলল, 'কেন মিছিমিছি মারধোর করছ! ও হয়ত সত্যিকথাই বলছে।'

একমুহূর্ত ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে পা নামাল এড্‌, বলল, 'হয়ত ও জানেনা ঠিকই। কিন্তু না জানলেও কি করে সত্যিকথা বের করতে হয় তা আমার জানা আছে, এই যে তুমি, ম্যাক্স না কি যেন তোমার নাম ত! এখানে ভিড় না বাড়িয়ে তুমি সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও বাইরে থেকে কেউ ভেতরে না ঢোকে সেদিকে নজর রাখো!'

ম্যাক্স প্রতিবাদ না করে আবার গিয়ে দাঁড়াল সদর দরজার কাছে। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল পথঘাট জনশূন্য। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল সে। 'আর সব গেল কোথায়?' এড্‌ তাকাল চার্লির দিকে। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারকে ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'এই খানকির বাচ্চাকে চেয়ারের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে ফ্যাল্‌, তারপর সিন্দুক কিভাবে খুলতে হয় তা আমি দেখছি।'

এড্-এর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল ম্যাক্স, পিছিয়ে আসতে দেখল ঘর গরম করার আগুনের চুল্লির সামনে উবু হয়ে বসেছে এড্, কয়লা খোঁচানোর লোহার শিকখানা পুরে দিয়েছে চুল্লির ভেতরে। চার্লি ততক্ষণে ক্যাশিয়ারকে বেঁধে ফেলেছে চেয়ারের সঙ্গে এড্-এর মতলব আঁচ করতে না পেরে বলল, 'তুমি কি করতে চাও বলো ত বাপু?'

'তেমন কিছুই নয়,' হিংস্র হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে বলল এড্,''লোহার শিকখানা আগে তেতে পুড়ে গনগনে হয়ে উঠুক তারপর ওটা গুঁজে দেব ওর দু'চোখের ভেতর। দেখব তখন সিন্দুকের তালার কম্বিনেশন ওর মুখ দিয়ে বেরোয় কিনা।'

'এক মিনিট, এড্,' প্রতিবাদের সুরে বলল চার্লি, 'যদি তোমার মনে হয় ও মিথ্যে বলছে তাহলে এক গুলিতে খতম করে দাও, ঝামেলা মিটে যায়। নয়ত শুধুশুধু বেচারার চোখ দুটো নষ্ট করে কি লাভ?'

'তোমাদের এখনকার জমানার ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে এই হল মুশকিল,' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এড্। চার্লির মুখের কাছে হাত এনে মুঠো পাকিয়ে বলল, 'সাহস বা কলজের জোর কিছুই তোমাদের নেই। চোখের জল দেখলেই গলে যাও। খতম করে দিতে ত বললে। কিন্তু খতম করলে তখন ত ওকে দিয়ে আর সিন্দুক খোলাতে পারবেনা!'

'ঠিক,' চার্লি আবার প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কম্বিনেশন জানা না থাকলেও সিন্দুকের তালা ও খুলতে পারবেনা।'

'আমার কাজ পছন্দ না হলে কেটে পড়তে পারো,' হিংস্রগলায় চেঁচিয়ে উঠল এড্, 'সিন্দুকের ভেতর নগদ যে পঞ্চাশ হাজার ডলার আছে তার পুরোটা আমি একাই নেব।'

ম্যাক্স আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলনা। পায়ে পায়ে আবার ভেতরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এড্-এর গলা তখনই তার কানে এল—

'বিশ্বাস করো। চার্লি, এই দাওয়াই-য়েই কাজ হবে। আজ থেকে ঠিক বারো বছর আগে রাস্টি হ্যারিস, টম ডর্ট আর আমি তিনজনে এক আধবুড়ো মোষ শিকারিকে ঠিক এই দাওয়াই দিয়েছিলাম। শুয়োরের বাচ্চার বৌটা ছিল রেড ইণ্ডিয়ান, টম ডর্ট মাগির মাই কেটে তাই দিয়ে দিব্যি তামাকের থলে বানিয়ে ছিল। বিশ্বাস করো—'

ম্যাক্স স্পষ্ট টের পেল তার পেটের ভেতরটা ঘুলিয়ে উঠছে। মাথা টলছে। হয়ত পড়েই যেত, পাশের দেয়াল ধরে কোনমতে নিজেকে সামলে নিল। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুঁজল ম্যাক্স, সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সেই বীভৎস দৃশ্য বহুদিন বাদে আবার দেখতে পেল সে—তার বাবার মৃতদেহ কেবিনের ছাদের আংটার সঙ্গে বাঁধা দড়িতে ঝুলছে, মা কানেহার রক্তাক্ত দেহটা তালগোল পাকানো মাংসপিণ্ড হয়ে গড়াচ্ছে মেঝেতে। কমলা রং-এর আগুনের শিখায় বন্দি বাড়িটাও স্পষ্ট দেখতে পেল সে।

ম্যাক্সের মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে আসছে। ঝাঁকুনি দিতেই বমি উঠে আসায় অনুভূতি হল, আর দেরি না করে দৌড়ে ভেতরের ঘরে এল সে। এড্ তখনও চুল্লির সামনে উবু হয়ে বসে। চার্লি ফ্যাকাশে মুখে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

'লোকটার নাম ছিল স্যাম্', এড্ চার্লির উদ্দেশে বলতে লাগল, 'স্যাম স্যাণ্ড, ব্যাটা

ছিল হাড়কিপ্টে। যে খুপরিতে থাকত তার ভেতর গাদাগাদা সোনার তাল ব্যাটা লুকিয়ে রেখেছে খবর পেয়ে আমরা তিনজন হানা দিয়েছিলাম,' বলতে বলতে মুখ তুলতেই এড় দেখল তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাক্স। ঝুঁকে পড়ে আগ্রহ সহকারে শুনছে তার অতীতের কৰ্কীর্তি।

'তোমার এখানে কি চাই?' ম্যাক্সকে ধমকে উঠল এড়, 'তোমায় না সদর দরজায় দাঁড়াতে বললুম—'

তার কথায় কান না দিয়ে মুখখানা আরও ঝোঁকাল ম্যাক্স, এড়-এর কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'তা সেই কিপ্টে বুড়োর খুপরি থেকে সেদিন তুমি সত্যিই গাদাগাদা সোনা পেয়েছিলে?' এড় চমকে উঠল তার এই প্রশ্নে, ম্যাক্সের মুখে এই প্রশ্ন আশা করেনি সে।

'পাওনি এড়,' ম্যাক্স বলল। 'কারণ ওখানে একতিলও সোনা ছিল না।'

'তুমি জানলে কি করে?' একদৃষ্টে তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে জানতে চাইল এড়, 'তোমায় কে বলল?'

'আমি জানি এড়,' ম্যাক্স অদ্ভুত শান্ত গলায় জবাব দিল, 'কারণ সেদিন তোমরা যাদের খুন করেছিলে সেই স্যাম স্যাণ্ড আর তার রেড ইণ্ডিয়ান বৌ ছিল আমারই বাবা মা। এড়, ভাল করে চেয়ে দ্যাখো। আমি স্যাম স্যাণ্ডের ছেলে ম্যাক্স। ম্যাক্স স্যাণ্ড।'

এড়-এর চোখের চাউনি নিমেষে পাল্টে গেল, ম্যাক্স বুঝল এতক্ষণে এড় তাকে চিনতে পেরেছে। এড় রিভলভার বের করে তুলে ধরল, কিন্তু ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ার আগেই ম্যাক্সের লাথিতে এড়-এর রিভলভার হাত থেকে খসে ছিটকে পড়ল। কিলবিল করে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে রিভলভার কুড়িয়ে আনাল এড়। আবার তাক করল ম্যাক্সের দিকে। কিন্তু ম্যাক্স এবারও তাকে গুলি ছোঁড়ার অবকাশ দিলনা। এড় ট্রিগার টেপার আগেই চুল্লি থেকে গনগনে লাল কয়লা খোঁচানো শিকখানা বের করে নিল ম্যাক্স। এড় আঁচ করার আগেই সেটা পরপর দু'বার তার দু'চোখে গুঁজে দিল সে।

চোখ হারানোর যন্ত্রনায় ছটফট করে বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল এড়, ট্রিগারে চাপ লাগতে রিভলভারের একটা গুলি ম্যাক্সের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বিঁধে গেল ঘরের ছাদে।

রিভলভার খসে পড়েছে এড়-এর হাত থেকে, বীভৎস দেখাচ্ছে তার মুখখানা, রক্তমাংস চোখের মণির সঙ্গে দলা পাকিয়ে বেরিয়ে এসে ঝুলছে দুই অক্ষিকোটর থেকে, দু'হাত মেলে চারদিকে অসহায়ভাবে হাতড়াচ্ছে অন্ধ এড়, মাংসপোড়া গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে ঘরের ভেতরের বাতাস।

বারো বছর! মা বাবার তিন খুনির শেষ লোকটিকে কাবু করে ওপরের দিকে তাকাল ম্যাক্স, দু'চোখ জলে ভরে আসছে কিন্তু কান্নাকাটি করার সময়টুকু পেল না সে। তার আগেই চার্লি ছুটে এসে তার কব্জি চেপে ধরে বলল, 'বাঁচতে চাও ত পালাও এখান থেকে। বাইরে শব্দ শুনতে পাচ্ছি, পুলিশ এল বলে।'

'চলো!' বলে ক্লান্ত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল ম্যাক্স। বাইরে মাইক দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া নিয়ে। ঘোড়ার পিঠে চেপে আধঘন্টার কম সময়ে শহর ছেড়ে ছুটল ওরা

তিনজন—ম্যাক্স, মাইক, আর চার্লি। কিন্তু ততক্ষণে ব্যাংকে ডাকাত পড়ার কথা রটে গেছে চরদিকে, সশস্ত্র পুলিশবাহিনী গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়া চেপে ছুটে আসছে তাদের ধাওয়া করে। শহর ছেড়ে পালাবার মুখে কয়েকটা গুলি এসে বিঁধল মাইকের পিঠে। বাঁ হাতের মুঠোয় লাগাম শক্ত করে চেপে ঘাড় ফেরাল মাইক, রিভলভারের অব্যর্থ লক্ষে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল ক'জন সশস্ত্র পুলিশ, একইভাবে ছুটতে ছুটতে পেছনদিকে গুলি ছুঁড়ল ম্যাক্স আর চার্লি, পুলিশদলকে পেছনে ফেলে পাহাড়ি পথে উধাও হল তারা।

রকি পর্বতমালার নিচে ছোট একসারি পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত গুহায় আহত মাইককে এনে তুলল ম্যাক্স আর চার্লি। তাদের দু'জনকে রেখে চার্লি দু'দিন বাদে চলে গেল। গুহার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মাইক, ম্যাক্সকে ডেকে তাকে একা রেখে চলে যেতে বলল।

'তা হয় না,' মাথা নাড়ল ম্যাক্স, 'তোমায় এই অবস্থায় একা ফেলে রেখে আমি কখনোই একা চলে যেতে পারবনা, মাইক।'

'ম্যাক্স' মাইক বলল, 'তুমি আর আমি, দু'জন ত এ-পর্যন্ত বন্ধুর মত কাটিয়েছি, তাই না?'

'একশোবার,' ঘাড় নেড়ে সায় দিল ম্যাক্স।

'তোমার সঙ্গে জেনে শুনে খারাপ ব্যবহারও করিনি আমি, তাই না?'

'নিশ্চয়ই, মাইক,' ম্যাক্স বলল, 'কিন্তু বাজে বকবক না করে তুমি এবার একটু জিরোও।'

'আমার একেবারেই জিরোনোর সময় এসে গেছে, ম্যাক্স,' করুণ হাসল মাইক, 'হাজার চেষ্টা করেও তুমি আমায় ধরে রাখতে পারবেনা। দাও, একটা সিগারেট পাকিয়ে আমার ঠোঁটে গুঁজে দাও।'

সিগারেট তৈরি করে মাইকের ঠোঁটে গুঁজে দিল ম্যাক্স, দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে বলল, 'আর বাজে কথা নয় মাইক, সিগারেট খেয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।'

'ঘুমোতে ত আমি চাইছি ম্যাক্স, কিন্তু তার আগে আরেকটু কাজ যে বাকি আছে। শোন, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমার কোমরের বেল্টটা খুলে ফ্যালো ত!'

ঝুঁকে ম্যাক্স মাইকের কোমরের বেল্ট খুলে ফেলল, হাতে নিয়ে মাইক বলল, 'এবার একটু স্বস্তি লাগছে।' বেল্টের ভেতর দিকে চামড়ার থলে খুলে ফেলল মাইক, ভেতরে হাত গলিয়ে একতাড়া নোট বের করে বলল, 'এখানে নগদ পাঁচ হাজার ডলার আছে, ম্যাক্স। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গতরে খেটে এ টাকা আমি রোজগার করেছি, একফোঁটা পাপের ছোঁয়া এতে নেই। মারা যাবার আগে এটা তোমায় দিয়ে গেলাম, এই টাকা দিয়ে নিজে যাহোক কোনও কারবার করো, খুনজখম, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, এসব বরাবরের মত ছেড়ে দাও।'

জবাব না দিয়ে ম্যাক্স সিগারেট পাকিয়ে নিজে ধরাল। 'ম্যাক্স,' মাইক বলতে লাগল, 'এই ডাকাতি, খুনজখমের কারবারে ফয়দা হতে তোমার কম করে ত্রিশ বছর দেরি হয়ে গেছে। এসবের দিন শেষ হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। তাই চাইলেও এ পথে বেশিদিন

তুমি টিকতে পারবেনা,' বলতে বলতে উত্তেজনা চাপতে না পেরে কাশল মাইক, কাশির সঙ্গে এক ঝলক কাঁচা রক্ত উঠে এল গলা দিয়ে।

'ওসব বলে আমায় তুমি ভোলাতে পারবেনা, মাইক,' ম্যাক্স বলল, 'তোমায় একা এখানে ফেলে রেখে কোনমতেই আমি যেতে পারবনা।'

'ম্যাক্স,' অভিমানের সুর ফুটল মাইকের গলায়, 'তাহলে এক অযোগ্য লোককে নতুন জীবন শুরু করতে জেল থেকে পালাতে সাহায্য করেছি, একথা জেনেই কি মরতে হবে আমায়? ম্যাক্স জবাব দেবার আগে তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল মাইক।' আমায় ধরে ধরে একবার গুহার মুখের কাছে নিয়ে যাবে, ম্যাক্স?'

মাইকের হাত শক্ত মুঠোয় চেপে ধরতে গিয়ে চমকে উঠল ম্যাক্স, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। পা ফেলতে গেলেই রক্ত গড়াচ্ছে পিঠের ক্ষতস্থান থেকে। তবু ঐ অবস্থায় মাইককে গুহার মুখের কাছে এনে দাঁড় করিয়ে দিল ম্যাক্স।

'ম্যাক্স হাতে আর বেশি সময় নেই,' হাত বাড়িয়ে বহুদূরে উপত্যকার দিকে দেখাল মাইক, 'ঐ দ্যাখো, ঘোড়সওয়ার পুলিশ বাহিনী শিকারি কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে এতদূর এসে পৌঁছেছে। এবার ওরা আশপাশের প্রত্যেকটা পাহাড়ে মরিয়া হয়ে আমাদের খুঁজবে। যে ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে আমরা পালিয়ে এতদূর এসেছি, নিশ্চয়ই মাটিতে তাদের খুরের ছাপ দেখে এতদূর ধাওয়া করে এসেছে ওরা। ম্যাক্স, আর উপায় নেই, আজ হোক কাল হোক, ওরা আমাদের হদিশ ঠিকই পাবে আমি ত এমনিতেই মরতে বসেছি, নিজেকে নিয়ে তাই ভাবছিনা। আমার ভাবনা তোমায় নিয়ে। তোমায় পেলে ওরা এখানেই কুকুরের মত গুলি করে মারবে। ম্যাক্স, এখনও সময় আছে, ওরা তল্লাশি শুরু করার আগেই তুমি গিরিখাত ধরে পালাও, সীমান্ত পেরিয়ে যতদূরে পারো চলে যাও।

ম্যাক্স আর প্রতিবাদ করলনা। মুখ বাড়িয়ে দেখল মাইক ঠিকই বলেছে, ঘোড়সওয়ার পুলিশের এক বিশাল বাহিনী নিচে বহুদূরে জমায়েত হয়েছে, তাদের পরনে হালকা খাকি পোষাক, মাথায় চওড়া কানাত দেয়া খাকি টুপি। এতদূর থেকেও প্রত্যেকটি সওয়ারের পিঠে বাঁধা রাইফেল তার চোখে পড়ল। গুহার মুখের কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে মাইক, ম্যাক্স বিদায় নেবার আগে তাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল সে, তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'যা বললাম মনে রেখো, এবার থেকে সোজা পথে হাঁটবে জীবনভর। চুরি, ডাকাতি, বন্দুকবাজি এসব আর নয়। কেমন কথা দিচ্ছ ত, ম্যাক্স।'

'জি', কথা দিলাম, মাইক।'

'মনে রেখো শপথ ভাঙ্গলে নরকের জ্বালা আজীবন তোমায় তাড়া করে বেড়াবে।' দুষ্টু ছেলেকে ভয় দেখানো গলায় বলল মাইক, 'যাবার আগে একটা কাজ করে দিয়ে যাও, ম্যাক্স, আমার রাইফেলটা এনে দাও।'

রাইফেল এনে মাইকের হাতে দিল ম্যাক্স, আর একটি কথাও না বলে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। খানিক দূরে গাছের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়ার পিঠে চেপে দুই পাঁজরে বুটের চাপ দিতেই গিরিখাত ধরে ঘোড়সওয়ার বাহিনী যে পথে এগিয়ে

আসছে তার উল্টোদিকে ছুটল ঘোড়া। কিছুদুর এগোতে পেছনে রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল। ম্যাক্স আঁচ করল মাইক ধরা পড়ার ভয়ে গুলি ছুঁড়ে নিজের জীবন শেষ করল।

দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলার পরে গোড়ার অস্বস্তিবোধ করল ম্যাক্স। থেকে থেকে নিজেকে তার নিরাবরন, উলঙ্গ বলে মনে হতে লাগল। কামানো মুখে হাত বোলাতে বোলাতে রান্নাঘরে ঢুকল সে।

'কে!' রান্নাঘরের এক কোণে ছোট টেবলে খেতে বসেছিল চার্লি, ম্যাক্সকে দেখে গোড়ায় চমকে উঠল সে, কয়েক মুহূর্ত পরে চিনতে পেরে বলল, 'তাই বলো, তুমি! আমি ত দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'তুমি ত ভারি কচি দেখ তোমার আসল বয়স যে খুব কম তা এবার বুঝতে পারছি,' হাসিমুখে বলল চার্লির গিন্নি, 'দাড়িগোঁফের জঙ্গল সাফ করে সুন্দর দেখাচ্ছে মুখখানা।'

শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ম্যাক্স, চার্লির মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল, 'এবার কিন্তু আমায় চলে যেতে হবে, চার্লি।'

'কেন?' অবাক হল চার্লি, 'চলে যাবে কেন?' এই খোঁয়াড় কেনার অর্দ্ধেক টাকা ত তুমি দিয়েছো। এ জায়গার ওপর অর্দ্ধেক মালিকানা তোমারও আছে, এখন চলে যাব বললেই হল?'

কয়েক মুহূর্ত চার্লির মুখের পানে তাকিয়ে সিগারেট পাকিয়ে ধরাল ম্যাক্স, হেসে বলল, 'ছেলেমানুষি নয়। ভেবে দ্যাখো, এখানে পুরো তিনটে মাস একসঙ্গে কাটালাম দু'জনে। এত ছোট জায়গায় তিনটে লোকের থাকা চলে না।'

চার্লি জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। ম্যাক্সের কথায় যুক্তি আছে জানে তাই প্রতিবাদ করল না সে।

'কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যাবে কোথায়?' বলল চার্লির গিন্নি মার্থা, 'দক্ষিণ পশ্চিমে যত শেরিফ আছে তাদের সবার অফিসে ফেরারি কয়েদী ম্যাক্স স্যাণ্ডের ছবি ঝুলছে, বহু আগে হুলিয়া জারি হয়েছে তোমার নামে; শুধু পুলিশ নয় চাইলে যে কেউ এখন তোমায় ধরে তুলে দিতে পারে পুলিশের হাতে।'

'এখন দাড়িগোঁফ নেই তাই ধরা পড়ার ভয়টা কম,' বলল ম্যাক্স। 'দাড়িগোঁফ নেই দেখে চার্লি নিজেও যে গোড়ায় চিনতে পারেনি তা ত নিজে চোখেই খানিক আগে দেখলে।'

'ভোল পাল্টাতে দাড়িগোঁফ কামিয়েছো বেশ করেছো,' বলল চার্লি, 'এবার নামটাও পাল্টানো দরকার, একটা লাগসই নাম ভেবে বের করো দেখি।'

'কথাটা আমিও ভেবেছি,' সায় দিল ম্যাক্স, 'ভেবে চিন্তে একটা যুতসই নাম নিতে হবে। নিজেকে যখন সত্যিই পালাটাতে হবে তখন সবদিক থেকেই পাল্টানো ভাল।'

ক'দিন ধরে আকাশ পাতাল অনেক ভাবল ম্যাক্স, কিন্তু মনের মত নাম একটাও এলনা মাথায়। নাম এল শেষ মুহূর্তে নেভাদায় বারুদের কারবারি কোটিপতি জোনাস কর্ড আর তার বাচ্চা ছেলের সামনে জোনাস জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে একটা নাম

তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল যেন সত্যিই ওটা তার পৈতৃক নাম—স্মিথ। নেভাদা স্মিথ। অদ্ভুত হলেও নামটা ম্যাক্সের নিজের কানে ভারি সুন্দর শোনাল, নেভাদা স্মিথ নামটা যেন ম্যাক্স স্যাণ্ডের জন্মান্তর ঘটাল।

বাচ্চা ছেলেটা এতক্ষণ নিজের মনে খেলছিল, নেভাদা তার কাছে দাঁড়াতে মুখ তুলে তাকাল সে। ভয়মেশানো চোখে প্রথমে নেভাদা তারপর তার হাতের মুঠোয় চেপে ধরা রিভলভারের কালো নলের দিকে তাকাল সে। রিভলভার কোমরের খাপে ভরে ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল নেভাদা, শান্ত গলায় বলল, 'কেমন ছোটবাবু তোমার বাবা কি বললেন শুনলে ত?'

কোনও জবাব না দিয়ে ছেলেটা নেভাদার পায়ে পায়ে অনুগতের মত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, নেভাদা তার ঘোড়ার কাছে যেতে সে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। লাগাম ধরে ঘোড়াকে কাজের লোকেরা যেখানে থাকে সেখানে নিয়ে এল নেভাদা, ঘোড়ার পিঠ থেকে বিছানা খুলে দেয়ালের সঙ্গে আঁটা বাঙ্কে বিছানা পাতল, টুকিটাকি অন্যান্য জিনিস রাখল একপাশে। নিজের সব জিনিস সাজিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াতে নেভাদা দেখল ছেলেটা অবাক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

'তুমি সত্যিই থাকবে এখানে?' ছেলেটি জানতে চাইল।

'হুঁম, তাই ত মনে হচ্ছে,' হেসে জবাব দিল নেভাদা।

'সত্যি?' নেভাদার জবাব যেন তার বিশ্বাস হলনা, 'বরাবরের মত থাকবে এখানে? আর সবার মত চলে যাবেনা ত? আমার মা যেমন চলে গেছে?'

বাচ্চাটার চোখের দিকে তাকিয়ে তার মায়া পড়ে গেল। হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে বলল, 'তুমি যতদিন চাইবে আমি ততদিন থাকব।'

শুনে খুশিতে ডগমগ ছেলেটা দু'হাতে নেভাদার গলা জড়িয়ে ধরল, তার চিবুকে নিজের গাল চেপে আদর করে বলল, 'এবার তা'লে আমায় ঘোড়ায় চড়া শেখাও।'

'আমি এক্ষুণি আসছি,' বলে উঠে দাঁড়াল নেভাদা, রিভলভারের খাপ আঁটা চামড়ার বেল্টটা কোমর থেকে খুলে বাঙ্কের ওপরে দেয়ালে গাঁথা একটা পেরেকে ঝুঁলিয়ে ফিরে এল, ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল, প্রখর রৌদ্রে ঘোড়া ছোটাল নেভাদা।

মাইককে দেয়া কথা রেখেছিল নেভাদা স্মিথ, জীবনে আর কখনও সেই বেল্ট কোমরে আঁটেনি সে।

১৬

বেলাশেষের রোদে ট্রেনের কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নামল রিনা। তাকে দেখেই দামি বাহারি শোফারের উর্দিপরা এক যুবক দৌড়ে এসে দাঁড়াল, অভিবাদনের ভঙ্গিতে টুপি ছুঁয়ে বলল 'আপনি মিস মার্লো?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল রিনা। মিঃ স্মিথ স্টুডিও-তে মিটিং-এ ব্যস্ত আছেন, নিজে আসতে

পারেননি বলে মাফ চেয়েছেন। ভদ্র মার্জিত ভঙ্গিতে বলল শোফার, 'উনি বলেছেন পরে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'ধন্যবাদল,' বলল রিনা।

'আমার সঙ্গে আসুন,' শোফার পথ দেখিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে তাকে বাইরে নিয়ে এল, 'গাড়ি সামনেই পার্ক করা আছে।'

শোফারের পেছন পেছন ঝকঝকে কালো রং-এর পিয়ার্স-অ্যারো লিমুজিনের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল রিনা। তার হাতের মালপত্র নিয়ে সামনের দরজা খুলে দিল শোফার। ঢুকতে গিয়ে দরজার হাতলের ওপর প্রতীকের মত খোদাই করা দুটি সোনালি হরফ বিকেলের রোদ ঝলমল করে উঠল এন এস।

ভেতরে ঢুকে মোটা গদিতে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল রিনা। সিগারেট ধরিয়ে গাড়ির ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সোনালি দুটি হরফের একই প্রতীক গাড়ির ভেতরেও তার চোখে পড়ল।

সিটের পিঠে মাথা ঠেশ্ দিয়ে গা এলিয়ে দিল রিণা। রিণা জানে যার অতিথি হয়ে এসেছে সেই নেভাদা স্মিথের চল্লিশ একর বিস্তৃত ঘোড়ার খোঁয়াড় আছে, আর আছে ক্যালিফোর্ণিয়ার বেভারলি হিলস-এ নিজের বাড়ি যে বাড়িতে ঘর আছে মোট ত্রিশখানা, নেভাদা স্মিথের এসব সম্পত্তির বিবরণ খবরের কাগজ পড়ে জেনেছে সে। কিন্তু কোন কিছু পড়ে জানা আর তা নিজের চোখে দেখার মধ্যে বিস্তর ফারাক। চোখ বুঁজে মনটাকে ভাবনাশূন্য করতে চাইল রিণা। আর তখনই প্রায় মাস পাঁচ ছয় আগের একটা ঘটনা তার মনে পড়ে গেল, সে তখন সবে পূর্বাঞ্চল থেকে ঘুরে এসেছে।

রিণার মনে পড়ে গেল হপ্তার বাজার করতে নিউ ইয়র্কে গিয়েছিল সে। পথে বাবার এক ঘনিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক ব্যাংকের কারবারে কোটি কোটি ডলার কামিয়েছেন। যেচে বললেন একটি ফিল্মের প্রিমিয়ারে যাচ্ছেন, রিণাকে সঙ্গি হিসেবে পেলে খুশি হবেন। কথায় কথায় ভদ্রলোক এও বললেন যে ঐ ছবি তুলতে তিনিও কিছু টাকা ঢেলেছেন।

'কি নাম ছবির?' জানতে চাইল সে।

'দ্য শেরিফ অফ পিসফুল ভিলেজ,' ব্যাংকার ভদ্রলোক বললেন, 'প্রযোজনা পরিবেশনা নর্ম্যান গোষ্ঠীর। বার্ণি নর্ম্যান নিজে আমায় বলেছে এমন সেরা ওয়েস্টার্ণ ছবি এর আগে কেউ তোলেনি।''

''ওয়েস্টার্ণ ছবি আমার বড্ড একঘেয়ে লাগে,' ছবির গোত্র শুনে রিণা বিরক্তিতে নাম কুঁচকে বলল 'আমি নিজে ঐ এলাকায় বহুদিন কাটিয়েছি, গাদা গাদা ওয়েস্টার্ণ ছবির সুটিং....ও দেখেছি। সেই এক গপ্পো, এক টেনশন, এক পরিণতি। ওসব দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে।'

'সবই ত পুরোনো,' ভদ্রলোক বললেন, 'নতুনের চেহারায় পরিবেশন করা হচ্ছে। নর্ম্যানের মুখে শুনলাম এ ছবির মুখ্য ভূমিকায় এক নতুন লোককে নিয়েছে, নামটা ভারি

মজার—নেভাদা, নেভাদা স্মিথ। নর্ম্যান বলছে ওয়েস্টার্ণ ছবির হিরোদের মধ্যে ও সবার সেরা—'

'এক মিনিট—' বাধা দিয়ে বলল রিণা। 'নতুন অভিনেতার কি নাম বললেন?'

'নেভাদা স্মিথ', ব্যাংকার ভদ্রলোক বললেন 'এখনকার শিল্পীরা সবাই ত বাজারি নাম নিচ্ছে, তাদের ভিড়ে এ নাম যেমন সেকেলে তেমনই অদ্ভুত।'

'আমি যাব,' নিমেষে মন স্থির করল রিণা 'আমি ঐ ছবির প্রিমিয়ারে যাব, আমায় নিয়ে চলুন।'

বাবার বন্ধুর সঙ্গে আলো ঝলমলে সিনেমা হলে ঢুকল রিণা, সুসজ্জিত পুরুষ আর দামি জড়োয়ার গয়না পরা নারীদের মাঝখানে বসে অধীর আগ্রহে তাকাল সামনের সাদা পর্দার দিকে। চারপাশে সমবেত দর্শকদের চাপাগলায় গুঞ্জন ছবি দেখানো শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন যাদুর মত থেমে গেল।

ছবির শেষ অংশটুকু এখনও ভোলেনি রিণা,—ছোট্ট একফালি ঘর। ভেতরে বিষণ্ণ পরিবেশ, সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'দ্য পিসফুল ভিলেজ'—এর শেরিফ নিজের গুলিভরা রিভলভার দেরাজ থেকে বের করে কোমরে আঁটা বেলটের খাপে ঝোলাল। ক্যামেরার লেন্স এখন তার মুখের ওপর। মুখের চামড়ার ছোট রোমকূপ, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম সব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে; এত নিখুঁত ক্যামেরার কাজ যে শেরিফের শ্বাসপ্রশ্বাসও যেন অনুভব করছে রিণা। কি মনে হতে খাপ থেকে রিভলভার বের করে চোখের সামনে নিয়ে এল শেরিফ। নলের ভেতর তাকিয়ে কি দেখল, তারপর আবার গুঁজল খাপে। এবার তার মুখে ফুটে ওঠা ক্লান্তি দেখতে পেল রিণা, দেখতে পেল দুই ঠোঁটে ফুটে ওঠা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কঠোর যন্ত্রণা, চৌকো মুখে রেড ইণ্ডিয়ানের হনু ফুটল ক্যামেরার লেনসে। কিন্তু এসব কিছুকে ছাপিয়ে গেল শেরিফের দু'টি চোখে, সে চোখের চাউনি সিটের সঙ্গে এঁটে রাখল তাকে।

সে চোখের চাউনিতে স্থির প্রশান্তির পাশাপাশি ফুটেছে মৃত্যুকে পদানত করার দৃঢ় অভিব্যক্তি। এ চোখের চাউনিতে মৃত্যুভয়ের হদিশ মেলেনা।

শান্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে শেরিফ বেরিয়ে এল ঘর থেকে, বাইরে বেরোতে প্রখর সূর্যের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। রোদ্দুর থেকে বাঁচতে চওড়া কানাতাদেয়া টুপিটা চোখের ওপর নামিয়ে সে হাঁটতে লাগল। রাস্তা জনশূন্য, আশপাশের বাড়ির জানালায় খড়খড়ি খুলে নারী পুরুষ কৌতূহলী চোখে দেখছে তাকে তাদের সমবেত গায়ে বিঁধলেও শেরিফ অটল অবিচল, মুখ ফিরিয়ে একবারও তাকাচ্ছেনা সে। ক্যামেরার লেন্সে শেরিফের পেছন দিকটা ধরা পড়েছে, অসহ্য গরমে রং-জ্বলা ফ্যাকাশে শার্ট ঘামে ভিজে জবজব করছে, তালিমারা জিনসের ট্রাউজার্সের সেলাই ছিঁড়ে সুতো ঝুলছে। শেরিফের সরু পা দুটো ধনুকের মত অল্প বাঁকা। একটানা ঘোড়ার পিঠে অনেকদিন চাপলে পা এমনই ধনুকের মত বেঁকে যায়। রোদ পড়ে বুকের বাঁদিকে আঁটা ধাতুর তৈরি শান্তির রক্ষকের সরকারি ব্যাজ ঝকঝক করছে।

এরপর দুষ্টচক্র ধ্বংস করতে প্রতিপক্ষকে শয়তানকে বধ করতে বারবার নিশ্চিত

মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া। রিণার এখনও মনে আছে শেরিফের ডান হাত নেমে এল তার কোমরের কাছে। কিন্তু রিভলভার বের করে তুললনা, প্রতিপক্ষের চোখের পলক পড়ার আগেই কোমরের কাছে মুঠোয় চেপে ধরা রিভলভার বারবার গর্জে উঠল। মারাত্মক আহত প্রতিপক্ষ মাটিতে পড়ে, তার মুখের কাছে শেরিফের মুখ, ক্যামেরায় দু'জনের চোখ ফুটে উঠল। প্রতিপক্ষের চোখে যুদ্ধে হেরে যাবার কালিমা, শেরিফের দু'চোখে সূর্যাস্তের বিষণ্ণতা। কয়েকবার থরথর করে কেঁপে প্রতিপক্ষের রক্তাক্ত দেহ চিরদিনের মত থেমে গেল, মৃতের আত্মার উদ্দেশে সম্মান জানাতে বাঁহাতে টুপি অল্প তুলল শেরিফ, কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে মৃতদেহের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর গরম রিভলভার খাপে ভরে পিছিয়ে এল, আগের মত বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগল নির্জন পথে। এবার জনতা দলে দলে বেরিয়ে এল রাজপথে। কৃতজ্ঞ চাউনি মেলে তারা তাকাল তার দিকে, কিন্তু তাদের মুখের দিকে তাকিয়েও এগিয়ে চলল সে। হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির কাছে আসতে তার পা দুটো যেন আপনিই থেমে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে এক যুবতী বধূ বেরিয়ে এল সামনের বারান্দায়। শেরিফ পায়ে পায়ে এসে থমকে দাঁড়াল তার সামনে। ক্যামেরায় ফুটল যুবতী বধূর মুখ। শেরিফের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে প্রিয়জনকে হারানোর বাঁধভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে। অশ্রুসজল চোখে শেরিফ একবার তাকাল সেই সদ্যবিধবার মুখের দিকে, বুক থেকে শান্তির রক্ষকের সরকারি ব্যাজ খুলে ছুঁড়ে ফেলল তার পায়ের কাছে। মেয়েটি তার স্বামির হত্যাকারীর এই আত্মত্যাগ আশা করেনি, পায়ের কাছে পড়ে থাকা ব্যাজের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ তুলল সে, নিঃসঙ্গ মানুষটি ততক্ষণে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছে, মেয়েটি তার দিকে কয়েক পা এগোল। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। শেরিফ এগিয়ে চলল, তার মুখে ফুটে উঠেছে সীমাহীন হতাশা। শহরের মানুষকে শান্তি দেবার বিনিময়ে একটি প্রাণ তাকে ছিনিয়ে নিতে হল এই দ্বন্দ্ব তাকে প্রতি পলে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী করে তুলছে। হাঁটতে হাঁটতে নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল শেরিফ। তাকে নিয়ে ঘোড়া ছুটল অদূরে পাহাড়ের দিকে। ঘোড়ার পিঠে বসা ঋজু অটল মানুষটির মাথা বারবার ঝুঁকে পড়ছে, বিকেলের রোদে, এইখানেই ছবির সমাপ্তি।

'খুব ভাল ছবি,' হলের আলোগুলো জ্বলে ওঠার পর পাশে বসা বাবার বন্ধু গলা ঝেড়ে বললেন, 'নতুন শিল্পী হলেও ছেলেটি চমৎকার অভিনয় করেছে। নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে।'

'আমারও' বলতে গিয়ে তার গলার ভেতরটা ভারি হয়ে উঠল।

'ঐ যে বার্ণি নর্ম্যান এসেছে,' তার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বাবার বন্ধু বললেন, 'এসো ওকে একটু কংগ্র্যাচুলেট করে আসি।'

খবরের কাগজের লোক, শুভার্থী, বন্ধু আর ধান্দাবাজের ভিড় কাটিয়ে দু'জনে এসে দাঁড়াল বার্ণি নর্ম্যানের সামনে। রিণা দেখল ভদ্রলোককে দেখতে গাঁট্টাগোঁট্টা, ভারি চোয়াল, উজ্জ্বল গর্বিত চোখের চাউনি। রিণার সঙ্গে আলাপ হবার পরে বার্ণি তাকালেন ব্যাংকার

ভদ্রলোকের দিকে, হেসে বললেন, 'কি মশাই, কেমন লাগল নেভাদা স্মিথকে? টম মিক্সকে নিয়ে আরেকখানা ছবি করবেন নাকি?'

'টম মিক্স? সেটা আবার কে?' বলে হো হো করে হেসে উঠলেন রিণার বাবার বন্ধু।

'আপনাকে বলে রাখলুম এ ছবি কম করে বিশ লাখ ডলার মুনাফা করবে।'

ব্যাংকারের পিঠে আলতো চাপড় মারলেন বার্ণি নর্ম্যান, 'তার আগে নেভাদা স্মিথকে আমি আরেকটা ছবিতে নিচ্ছি।'

পাহাড়ের নিচে গাড়ি মোড় নিতে চোখ মেলল রিণা, জানালার কাঁচের কাছে চোখ আনতে দেখল বাইরে লোহার খোলা ফটকের ভেতর ঢুকে পড়েছে লিমুসিন, পাহাড়ের গায়ে সরু পাকদণ্ডি পথে এগিয়ে চলেছে চূড়ার দিকে। পাহাড়চূড়ায় প্রাসাদের মত বিশাল বাড়িটার ধপধপে সাদা ছাদে পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়া সূর্য খুনরাঙা একরাশ কমলা রং ঢেলে দিয়েছে। লোহার গেটের মাথায় এন আর এস হরফ দু'টির অবস্থান তার চোখ এড়াল না। এখানে কি করতে এলাম? এক অদ্ভুত আনকোড়া অনুভূতি এই প্রশ্ন জাগাল রিণার মনে। এই নেভাদাকে সে চেনেনা। আগে দেখেনি কখনও। কি মনে হতে আচমকা উন্মত্তের মত পার্স খুলে ফেলল রিণা। ভেতরের খোপ হাতড়ে বের করল একখানা কেবলগ্রাম, নেভাদারই পাঠানো। ওটা পেয়ে অনেকটা শান্ত হল সে, ভাঁজ খুলে তাকাল ক্ষুদে হরফগুলোর দিকে।

গত মাসে সুইজারল্যাণ্ড থেকে নেভাদাকে টেলিগ্রাম করেছিল সে।

তারও তিনবছর আগে নেভাদার সঙ্গে তার শেষ যোগাযোগ হয়েছিল। এই তিনটে বছর শুধু পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছে রিণা—নিউইয়র্ক, বোস্টন, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, রোম, ম্যাদ্রিদ, কন্সটান্টিনোপল। যেখানে গেছে সেখানেই সেই এক পার্টি, অবাধ যৌনতা, জৈব ক্ষুধাতুর মানুষ আর তাদের কেচ্ছা কেলেংকারির ভয়ানক পরিণতি; পাশাপাশি তার সঙ্গ কামনা করে এমন আবেগপ্রবণ মানুষ আর তাদের লোভী সঙ্গিনীর পাল। এদের হাত থেকে বাঁচতে প্রচণ্ড ভয় তাকে এক দেশ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে অন্য দেশে। ভয়ের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিঃসঙ্গতা, একসময় রিণা দেখেছে সে সত্যিই একা, নিদারুণভাবে একা।

গলা দিয়ে উঠে আসা তেতো পিত্তরসের মত সুইজারল্যাণ্ডের স্মৃতি উঁকি দিল মনে। সকালের সূর্যের আলো মুখে পড়ায় ঘুম গিয়েছিল ভেঙ্গে, চোখ মেলতেই মনে পড়েছিল জায়গাটা জুরিখ। খেয়াল হয়েছিল বিছানার চাদরের নিচে তার গায়ে কাপড় চোপড় কিছু নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ। পাশে টেবলে নিজের জলের কুঁজোর বদলে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই চোখে পড়তেই বুঝেছিল সে আর কারও ঘরে রাত কাটিয়েছে। ঘরের মালিককে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সিগারেট ধরাল রিণা, বুক ভরে দম নেবার সঙ্গে সঙ্গে দোর খুলে ভেতরে ঢুকল এক মাঝবয়সী যুবতী, তার একরাশ কালো চুলের কথা এখনও ভোলেনি সে।

'এই যে খুকুমণি, ঘুম ভাঙ্গল এতক্ষণে?' বলতে বলতে খাটের কাছে এগিয়ে এল সে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই জড়িয়ে ধরে চুমু খেল দু'গালে। রিণার গা রি রি করে উঠল। তার দু'হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলল, 'কে তুমি?'

'সে কি! আমায় চিনতে পারছনা সোনা, এত শীগগির ভুলে গেলে?'

রিণা জবাব দেবার আগে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এক মাঝবয়সী পুরুষ হাতে শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে। লোকটির পরনে কিছুই নেই, সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

'নাও, সাতসকালে শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে খোয়াড়ি ভাঙ্গো। পার্টিটা বড্ড এক ঘেয়ে লাগছিল শেষের দিকে,' বলে হাতে ধরা বোতল রিণার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে প্রবলভাবে হাত নেড়ে অনিচ্ছা জানাল। দু'হাতে চেপে ধরল কানের দু'পাশের রগ, 'মাথা ধরেছে ত,' লোকটি বলল, 'দাঁড়াও, আমি তোমায় এখুনি অ্যাসপিরিন এনে দিচ্ছি', বলে শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই বেরিয়ে গেল সে।

'কিছুই মনে আসছে না।' অচেনা যুবতীর দিকে তাকাল রিণা,' আমি কোথায়?'

'তুমি এখন জুরিখে বাছা, ফিলিপ্পির বাড়িতে,' জবাব দিল সেই যুবতী।

'ফিলিপ্পি?' জানতে চাইল রিণা, এই যে লোকটা এইমাত্র বেরিয়ে গেল ওরই নাম বুঝি ফিলিপ্পি?'

'ধ্যাত্?'' বিরক্ত হয়ে জবাব দিল যুবতী 'ও ত আমার বর কার্ল, তোমার কিছুই মনে পড়ছে না।?'

তার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে আবার ভেতরে ঢুকল কার্ল, তার বাঁহাতে সেই শ্যাম্পেনের বোতল আর ডান হাতে কয়েকটা অ্যাসপিরিণের বড়ি। তার পেছন পেছন কিছু তফাতে লম্বা চওড়া লালচে ফর্সা দেখতে এক মাঝবয়সী পুরুষ এল ভেতরে, রিণার সামনে খাটের ওপর কয়েকটা রঙিন ফোটো ছড়িয়ে বলল, 'দ্যাখো ত রিণা, ফোটোগুলো পছন্দ হচ্ছে কিনা?'

মাথা নিচু করে একপলক ফোটোগুলোর দিকে তাকাতেই প্রচণ্ড ঘেন্না বমির মত তার গলার কাছে উঠে এল। ফোটোগুলো তার ঠিকই, কিন্তু এমন সময় তোলা হয়েছে যখন তার দেহে পোষাক নেই। তাকে ঘিরে মদের গ্লাস হাতে মনের সুখে দাপাচ্ছে এই দু'পেয়ে ধাড়ি উল্লুকের বাচ্চা দু'টো। আর হ্যাঁ, মাগিটাও ভিড়েছে তাদের সঙ্গে।

'সত্যিই তোমার ছবি তোলার জবাব নেই, ফিলিপ্পি' অচেনা যুবতীটি ফোটোগুলো খুঁটিয়ে দেখে ড্রেসিং গাউন পরা লোকটির দিকে তাকাল, 'আমরা আশ মিটিয়ে পার্টি করছি তার মধ্যে দিব্যি টুকটুক করে কখন ক্যামেরার শাটার একের পর এক টিপেছো টেরই পাইনি।'

'এবার আমি জামাকাপড় পরব?' রিণা এক এক করে তাদের মুখের দিকে তাকাল 'আপনারা দয়া করে বাইরে যান।' একটি কথাও না বলে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পোষাক পাল্টে ঘরের আসতেই অপদার্থগুলো আবার ছেঁকে ধরল তাকে, 'আপনার

পার্স ফেলে যাচ্ছিলেন, মিসেস কর্ড,' বলে কার্ল তার পার্স বাড়িয়ে দিল। হাতে নিয়ে মুখ খুলতেই রিণা অবাক, পার্সের ভেতর সেই জঘন্য ফোটোগুলো কিভাবে চলে এসেছে বুঝতে পারলনা।

'ওগুলো আমিই আপনার পার্সে পুরে দিয়েছি, মিসেস কর্ড,' শয়তানি হাসি ফুটল কার্লের মুখে, 'নেগেটিভগুলো আছে আমার কাছে। ওগুলো ফেরত চান? তাহলে আসুন কফি খেতে খেতে কথা বলা যাক। দরাদরির ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন....''

পুরো দশহাজার ডলারের বিনিময়ে নেগেটিভগুলো সেই ব্ল্যাকমেলারের হাত থেকে ফেরত পেল রিণা; তাদের চোখের সামনে ওগুলো পুড়িয়ে ছাই করল। বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে অনেক দূরে এক ভদ্র হোটেলে উঠল, সেখান থেকে টেলিগ্রাম পাঠাল নেভাদা স্মিথকে। টেলিগ্রামের বয়ানে রিণা লিখল।

'নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে কাটাতে আগের চেয়ে ভীত হয়ে পড়েছি। তুমি কি এখনও আমায় বন্ধু বলে মনে করো?'

রিণা

পরদিন সূর্য ডোবার আগেই কেবলগ্রামে জবাব এল, সেইসঙ্গে পাঁচ হাজার ডলারের ক্রেডিট আর জুরিখ থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া যাবার বিমানের টিকেট।

জবাবে শুধু লেখা ''আমি এখনও তোমায় বন্ধু বলে মনে করি।

নেভাদা''

চেয়ারের পিঠে ঠেশ দিয়ে ঘরের ভেতর এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে নেভাদা। টানটান উত্তেজনার.....হাওয়া কোন এক ফাঁকে ঢুকে পড়েছে ভেতরে, তার নীরব ঝাপটা লেগে সবার চোখের চাউনিতে ফুটেছে চাপা উদ্বেগ।

'প্রশ্নটা টাকাকড়ির নয়, বার্ণি,' প্রখর আত্মবিশ্বাসের মসৃণ হাসি ফুঠল ড্যান পিয়ার্সের ঠোঁটে, 'একটা খাঁটি ওয়েস্টার্ণ ছবি তোলার ব্যাপারে অনেকদিন ধরে চিন্তাভাবনা করছি। জোলো বানানো প্লট নয়, অতীতে ওয়েস্ট-এর যে ভয়ংকর, হিংস্র চেহারা ছিল তারই ওপর ছবিটা তুলব, সত্যকাহিনী ভিত্তিক ছবি। এই জাতীয় ছবি তোলার এখনই উপযুক্ত সময় এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'বিশ্বাস করো ড্যান।' সামনে রাখা পুরু নীল কাগজে মোড়া স্ক্রিপ্টের গায়ে হাত বোলাল বার্ণি নর্ম্যান, 'স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমি ভাবছিনা, চমৎকার স্ক্রিপ্ট হয়েছে, আপনার কি মত?' সমর্থনের আশায় পরিচালক ভন এলস্টারের দিকে তাকাল সে।

'এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি পুরো একমত,' পাতলা ছিপছিপে চেহারার পরিচালক টাকে হাত বুলিয়ে সায়, 'দিল এমন উন্নতমানের স্ক্রিপ্ট আমার চোখে খুব কমই পড়েছে।'

'তাহলে ছবি তুলতে আটকাচ্ছে কোথায়?' জানতে চাইল ড্যান পিয়ার্স।

'একটু আগেই সময়ের কথা বলছিলে না?' ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ল বার্ণি নর্ম্যান, 'আমার মতে তাড়াহুড়ো করে এই ছবি তোলার সময় এটা নয়। খবর কিছু রাখো? 'দা লাইটস অফ নিউ ইয়র্ক' নামে একটা ছবি ওয়ার্ণার্স কোম্পানি শীগগিরই বাজারে

ছাড়ছে, সে ছবিতে শিল্পীরা সবাই কথা বলবে, হাসবে, কাঁদবে. গান গাইবে। এ ছবির নাম হবে টকি। ওয়ার্ণার্স কোম্পানির দেখাদেখি আরও যারা আছে সবাই টকি ছবি তৈরি করবে। আর একবার তা শুরু হলে আমরা যারা সাইলেন্ট ছবি তৈরি করছি তাদের দিন ফুরিয়ে আসবে।'

'ইয়ার্কি পেয়েছো?' হেসে উঠল ড্যান পিয়ার্স, 'টকি ছবিতে শিল্পীরা কথা বলবে, হাত পা নাড়বে, গান গাইবে? যারা এসব দেখতে চায় তারা নাটক দেখতে যাবে, সিনেমা হলে ভিড় করবে কোন দুঃখে?'

'তোমার মুখে কথা নেই কেন, নেভাদা।' বার্ণি নর্ম্যান তাকাল নেভাদার দিকে 'আমাদের সঙ্গে কাজ শুরু করার পরে আমরা কেউ কি একদিনের জন্য খারাপ ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে? তোমার কি আরও টাকাকড়ি দরকার? দরকার হয় মুখ ফুটে বলো, এমনি মুখ বুঁজে থেকো না।'

'আমি কি একবারও টাকাকড়ি চেয়েছি?' হাত বাড়িয়ে খোলা বাক্স থেকে একটা চুরুট তুলে নিল নেভাদা। 'ফি হপ্তায় দশ হাজার ডলার করে পাচ্ছি। ইনকাম ট্যাক্সের রেট এক লাফে বেড়ে সাত পার্সেন্ট হলেও আমি মাথা ঘামাবনা। আসলে এই স্ক্রিপ্টটা আমারও মনে দাগ ফেলেছে, এমন সত্যকাহিনী আগে একটাও চোখে পড়েনি।'

এইটুকু বলেই থেমে গেল নেভাদা, মন চলে গেল একবছর আগের একটি দিনে ঐ সময় সে 'গানফায়ার অ্যাট সানডাউন' ছবিতে কাজ করছে। ঘটনাটা ঘটেছিল স্টুডিওর সেটে—শুটিং-এর আগে নেভাদা একদিন মেকআপ নিচ্ছে এমন সময় পাতলা রোগাটে ফ্যাকাশে রং এক ছোকরা এসে দাঁড়াল সামনে। চশমার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে হাসিমাখা চোখে তাকিয়ে ভদ্রভাষায় বললো, 'মিঃ স্মিথ, একটু বিরক্ত করব আপনাকে। বেশি না। মিনিটখানেকের বেশি সময় নেবনা।'

নাম না জানলেও ছেলেটি যে স্টুডিওর স্ক্রিপ্ট লেখকদের একজন জানে নেভাদা, মেকআপম্যানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! ইয়ে নামটা কি যেন—'

'মার্ক ওয়েণস,' চটপট জবাব দিল ছেলেটি।

'বলুন, মার্ক,' হাসল নেভাদা। 'কি করতে পারি আপনার জন্য?'

'ওয়েস্ট-এর বন্দুকবাজদের ওপর টানা দু'বছর বিস্তর পড়াশুনো করেছি,' বলল মার্ক, 'সাউথওয়েস্ট-এর শেষ বন্দুকবাজদের একজনকে নিয়ে একখানা স্ক্রিপ্ট আমি লিখেছি, সেটা আপনাকে পড়াব বলে এনেছি।'

'নিশ্চয়ই পড়ব,' হাসিমুখে বলল নেভাদা। নামী তারকা হবার এই এক জ্বালা। রাম, শ্যাম, যদু, মধু সবাই রাতারাতি স্ক্রিপ্ট লিখে এনে পড়ার জন্য সাধাসাধি করে, সবারই এক দাবি—এমন স্ক্রিপ্ট আগে কেউ লেখেনি। অনেকসময় ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হলেও তাদের ফেরানো যায়না কারণ এমনই গাদা গাদা স্ক্রিপ্টের ভেতর থেকে একেক সময় বেরিয়ে আসে একখানা জাতের গল্প—অমূল্যরতন।

'কি নাম দিয়েছেন স্ক্রিপটের?'

'পলাতক,' পুরু নীল কাগজে মোড়া স্ক্রিপ্টের তাড়া বাড়িয়ে দিয়েছিল ছেলেটি। স্ক্রিপ্টের তাড়াটা হাতে নিয়ে নেভাদার খুব ভারি ঠেকেছিল, আর পাঁচটা সাধারণ স্ক্রিপ্টের চেয়ে আকারে প্রায় তিনগুণ ঠেকেছিল। 'একটু বেশি হয়ে গেছে, তাই না?' কথাটা মুখ ফুটে বলেও ফেলেছিল সে।

'বড় হয়েছে মানছি,' ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল মার্ক, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন চাই না করুন, ওটা ছোট করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এতে যা লেখা আছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, সাউথওয়েস্ট সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনো করে আর খোঁজখবর নিয়ে তবেই আমি স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে হাত দিয়েছি।'

স্ক্রিপ্ট হাতে নিয়ে নেভাদা মেকআপম্যানের দিকে মুখ ফেরাল। একটু ভেবে বলল 'তা আপনার সেই পলাতক যে এই স্ক্রিপ্টের মুখ্য চরিত্র, তার শেষকালে কি হল?'

'অনেক জায়গায় ঘুরে অনেকের কাছে খোঁজ নিয়েছি' মার্ক জবাব দিল,' কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটার সত্যি কি হল সে কোথায় গেল এসব প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারেনি।'

'একসময় স্থানীয় পুলিশও তার হদিশে চারপাশ চষে ফেলেছিল কিন্তু হদিশ পায়নি। পুলিশের ধারণা ছেলেটা পাহাড়ের দিকে কোথাও চলে গিয়েছিল, পরে সেখানেই রোগে ভুগে নয়ত হিংস্র জানোয়ারের হাতে মারা যায়।'

'নতুন গল্পের চাহিদা বরাবরই আছে' বলেছিল নেভাদা। পুরোনো নায়কদের বারবার দেখতে দেখতে দর্শকদেরও ক্লান্তি আসে, আসে বিরক্তি। তা আপনার স্ক্রিপ্টের সেই নায়কের নামটি কি?'

'স্যাণ্ড,' মার্কের গলা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এসেছিল, 'তার নাম ম্যাক্স স্যাণ্ড।'

হাতের মুঠোয় ধরা স্ক্রিপ্টখানা আপনিই খসে পড়ল মাটিতে, মুখের সব রক্ত যে শিরদাঁড়া বেয়ে নিচের দিকে ছুটে চলেছে মেক আপ নিতে নিতে তা স্পষ্ট টের পেয়েছিল নেভাদা। আনমনাভাবে বলেছিল। 'নামটা কি যেন বললেন?'

'লোকটার আসল নাম ছিল ম্যাক্স স্যাণ্ড' মার্ক তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল 'তার মা ছিল রেড ইণ্ডিয়ান। দরকার হলে এ নামটা পাল্টে দেয়া যায়। মিঃ স্মিথ, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন। আপনার চোখ মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন? বলতে বলতে মাটি থেকে স্ক্রিপ্টের তাড়া তুলে নিয়েছিল মার্ক।

'ধন্যবাদ মিঃ ওয়েণস আমি ঠিকই আছি,' বলে স্ক্রিপ্টখানা হাত বাড়িয়ে মার্কের হাত থেকে নিয়েছিল নেভাদা। 'সত্যি, আপনি অনেক খেটেখুটে কাজটা করেছেন।'

বাড়িতে ফিরে এসে সেই স্ক্রিপ্টে চোখ বোলাতে পারেনি নেভাদা। নায়কের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে মানসিক ধাক্কা খেয়েছিল তার প্রভাব তখনও যায়নি। তবু একরকম জোর করেই স্ক্রিপ্ট পড়তে শুরু করল নেভাদা। খানিকটা পড়েই বুঝল মার্ক ওয়েণস সত্যিই খেটেখুটে এক দুর্দ্ধর্ষ স্ক্রিপ্ট খাড়া করেছে, তার আগের জীবনের আদি অন্ত সবই ফুটে উঠেছে ওতে। একদিন সন্ধের পরে লাইব্রেরিতে স্ক্রিপ্ট সামনে নিয়ে বসে আছে সে এমন সময় পরিচালক ভন এলস্টার এসে ঢুকল।

'কিহে,' এলস্টার জানতে চাইল।

'এটা নিয়ে কতদিন মাথা ঘামাচ্ছে?'

'তা হয়ে গেল হপ্তাখানেক,' জবাবে দিল নেভাদা।

'লেখকরা ত ক'দিন পরেপরেই নতুন নতুন স্ক্রিপ্ট এনে হাজির করছে। আপনি এটা দেখেছেন? ভাল লেগেছে?'

'ভাল লেগেছে বললে খুব কমই বলা হবে,' জবাব দিল ভন এলস্টার। 'এই স্ক্রিপ্টের ভিত্তিতে যে ছবি হবে তা হবে এক মহৎ শিল্পকর্ম। নায়ক ম্যাক্স স্যাণ্ডের চরিত্র তুমি করতে রাজি থাকলে এ-ছবির পরিচালক হতে আমার আপত্তি নেই।'

সে রাতে অনেক চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারছিল না নেভাদা। মার্ক ওয়েণস-এর মুখখানা বারবার তার মনে পড়ছিল। মার্ক-এর সত্যকাহিনী ভিত্তিক স্ক্রিপ্ট-এর নায়ক বাস্তবের ম্যাক্স স্যাণ্ড যে সে নিজে এটা মার্ক আঁচ করেছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছেনা সে, হলিউডের সাইলেন্ট বা নির্বাক ওয়েস্টার্ণ ছবির শ্রেষ্ঠনায়ক নেভাদা। নেভাদা স্মিথ। পাশাপাশি ভন এলস্টার-এর কথাও তার মনে পড়ল। মার্ক-এর স্ক্রিপ্ট পড়ে এলস্টার মুগ্ধ, নেভাদা ঐ কাহিনীর নায়ক ম্যাক্স স্যাণ্ডের চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি থাকলে ঐ ছবি পরিচালনা করতে সে রাজি। মার্ক-এর চোখে ধরা না পড়লেও ভন এলস্টার তাকে অতীতের জেলপালানো কয়েদী ম্যাক্স স্যাণ্ড বলে সন্দেহ করছে কিনা এই প্রশ্ন উঁকি দিল তার মনে। শিয়রে ল্যাম্প তখনও জ্বলছে। সেই আলোর শিখার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে আপনমনে অনেককিছু ভাবল নেভাদা। ভেবে এটাই বুঝল যে নিঃসঙ্গতার অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আর মানুষের অধিকারের প্রতি পদে বঞ্চিত হবার দুঃখে জর্জরিত একটি মানুষ একসময় তার নিজের মত করে বাঁচার মানে খুঁজে পেয়েছে এমনই এক জীবনদর্শনের ছাঁচে ফেলে মার্ক ওয়েণস ম্যাক্স স্যাণ্ড চরিত্রটি গড়েছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই যে সব অপরাধ তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তাদের কোনটিই নিজে ঘটায়নি সে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে মাফিয়ার মত সামিল হতে গিয়ে সেসব অপরাধে ঘটনাক্রমে জড়িয়ে পড়েছে ম্যাক্স-ম্যাক্স স্যাণ্ড।

সে নিজে অভিনয় না করলেও গল্পের টানে অন্য নায়ক জোটাতে দেরি হবেনা তা জানে নেভাদা, জানে গল্প শোনার পরে বার্ণি নর্ম্যান চুপ করে বসে থাকতে পারবে না। ছবি প্রযোজনা করতে তার হাতদুটো নিশপিশ করবে। ছবি একবার তৈরি হলে হবে চিন্তার কারণ, যেহেতু ছবির পরিণতি দেখে ম্যাক্স স্যাণ্ডের কি হয়েছিল তা ধরে ফেলার মত লোকের অভাব হবে না। অতএব, নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্যই গল্পের ছবি প্রযোজনা করতে হবে তাকে। নিজে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফুঁ দিয়ে ল্যাম্প নিভিয়ে শুয়ে পড়ল নেভাদা। পরদিন সকালে স্টুডিওতে গিয়ে ডেকে পাঠাল মার্ক ওয়েণসকে, নগদ এক হাজার ডলারে তার কাছ থেকে 'পলাতক' নামের স্ক্রিপ্ট কিনে নিল সে।

'স্ক্রিপ্ট ত কিনলে' পরদিন বার্ণি নর্ম্যানের অফিসে ঢুকতে বার্ণি নর্ম্যান তাকাল নেভাদার দিকে, 'এবার আমার কথাটা শোন। বছরখানেক ওটা দেরাজবন্দী করে রেখে

দাও। ততদিনে টকিওয়ালাদের দৌড়ও আমাদের দেখা হয়ে যাবে, তখন সবদিক দেখে ভেবে চিন্তে নাহয় এগোনো যাবে।'

বার্ণির কথায় সায় না দিয়ে নেভাদা তাকাল ড্যান পিয়ার্সের দিকে, পিয়ার্সের চাউনির খোঁচা নজর এড়ালনা। নেভাদা বেশ বুঝল সে অভিনয় ছেড়ে এবার ছবি প্রযোজনার কাজে সত্যিই হাত দেবে কিনা, পিয়ার্স তা এখনও বুঝে উঠতে পারছেনা।

'ইউনাইডেট আর্টিস্ট পরিবেশক গোষ্ঠী তৈরি করে চার্লি চ্যাপলিন আর মেরি পিকফোর্ড অভিনেতাদের কি উপকার করেছেন তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।' বলল নেভাদা। 'অভিনেতাদের নিজের পছন্দমত ছবি তৈরি করার ওটাই একমাত্র পথ।'

'বেশ, নেভাদা,' ড্যান পিয়ার্সের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল বার্ণি নর্ম্যান, ছবি তোলার ব্যাপারে আমি চুক্তি করব তোমার সঙ্গে—ছবি তোলার খরচ যাবতীয় খরচ বাবদ আমি তোমার পাঁচলাখ ডলার দেব। শর্ত একটাই, ঐ টাকায় যতটা ফিল্ম তোলা হবে তার নেগেটিভের খরচ তোমার বইতে হবে।'

'তার মানে পুরো পনেরো লাখ ডলার।' বলে উঠল ড্যান পিয়ার্স,' এত টাকা নেভাদা পাবে কোথা থেকে, কে দেবে?'

'কেন, ব্যাংক দেবে,' হাসল বার্ণি নর্ম্যান, 'আমাদের টাকা ত ওরাই জোগায়। তুমি ভেবোনা নেভাদা। টাকা পাবার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব, তোমার কোনও ঝামেলা পোয়াতে হবেনা। ছবি তোলা হলে তার একশ ভাগ মালিকানা তোমারই থাকবে। আমরা যে টাকা ঢালব সেটা আর ছবি পরিবেশনার পারিশ্রমিকটুকু শুধু নেব। খোঁজ নিয়ে দেখো চ্যাপলিনের ইউনাইটেড আর্টিস্টস-এর চেয়ে এ-চুক্তি ভাল কিনা। তোমাকে আমরা নিজেদের মধ্যে কতটুকু পেতে চাই এটা তারই প্রমাণ কেমন, নেভাদা, তুমি রাজি?'

নেভাদার মুখে কথা নেই, মাথা নিচু করে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মার্ক ওয়েণস-এর সেই নীল কাগজে মোড়া স্ক্রিপ্ট-এর দিকে। জোনাসের বাবার একটা কথা তার হঠাৎ মনে পড়ল। সিনিয়র কর্ড বলছেন নিজের টাকা না হলে জুয়ার হারজিতে আনন্দ নেই। ছবিটা ভাল বাজার না পেলে ব্যাংকের সব টাকা কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝিয়ে দিতে হবে, বার্ণি নর্ম্যান তখন পাশে এসে দাঁড়াবেনা। কিন্তু এসব চিন্তা মাথায় নিয়ে ত এগোনা যাবেনা। বসে থাকাই সার হবে।

'ঠিক আছে, বার্ণি' ভেতরের জেদ প্রেরণা জোগাল নেভাদাকে,' তোমার সঙ্গে চুক্তি করতে আমি রাজি।'

এইসব করেই দিনটা কেটে গেল বার্ণির। অফিস থেকে নেভাদা বেরিয়ে দেখল সূর্য ডুবে গেলেও হালকা আলোর রেশ তখনও আছে। ড্যান পিয়ার্সও বেরিয়ে এসেছে। নেভাদা দেখল সে গোমড়া মুখে ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছে। চোখে চোখ পড়তে পিয়ার্স বলল। 'একবার আমার অফিসে এসো না। কিছু কথা বলার ছিল।'

'ওসব কালকের জন্য তুলে রাখো,' বলল নেভাদা। 'বাড়িতে অতিথি এসেছে ইওরোপ থেকে, বসে আছে আমার জন্য।'

'বলছি ভবিষ্যতের কথা না ভেবে এতবড় ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হল?' বলতে বলতে দু'জনেই যে যার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল।

'উপায় নেই ড্যান,' প্রখর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর নেভাদা জবাব দিল, 'সুসময়ের নাগাল পেতে হলে ঝুঁকি নেয়া ছাড়া পথ কোথায়? টাকা রোজগারের কথা ভেবেই আমার এই জুয়োখেলায় নামতে হচ্ছে।'

'তুমি ত হেরেও যেতে পারো,' একগুঁয়ের মত শোনাল পিয়ার্সের গলা।

'আমি হারবনা পিয়ার্স। দেখো,' গাড়ির দরজায় হাত বুলিয়ে বলল নেভাদা, 'আমরা কেউ হারবনা, হারতে পারিনা।'

'এ খেলায় অভিজ্ঞতা নেই বলেই হুঁশিয়ার করছি,' বলল পিয়ার্স 'এই যে নর্ম্যান সবকিছুতে রাজি হচ্ছে, আর বারবার মুনাফার কথা শোনাচ্ছে এই ব্যাপারটাতেই আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আমাদের লোকসানের ফাঁদে ফেলার মত কিছু নিশ্চয়ই ও হাতে রেখে দিয়েছে।'

'ড্যান, তুমি আমার এজেন্ট,' হাসল নেভাদা।' তোমার দোষ নেই, এজেন্টমাত্রই খুঁতখুঁতে সন্দেহপ্রবণ হয়, আর এও শোন, বাধ্য হয়েছে বলেই বার্ণি আমায় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। লোকসানের ভয় থাকলে ও আমার ব্যাপারে কখনোই ঝুঁকি নিতনা।' দরজা খুলে চালকের আসনে বসল নেভাদা। 'তাহলে ঐ কথাই রইল, 'কাল সকাল দশটা নাগাদ আমি তোমার অফিসে যাচ্ছি।' 'ঠিক আছে', বলতে বলতে নিজের গাড়ির দরজার কাছাকাছি গেল ড্যান পিয়ার্স, কি ভেবে আবার পিছিয়ে এসে নেভাদার গাড়ির দরজার কাছে এসে বলল। 'আসলে এই টকি ছবির ব্যাপারটায় অনেকের মত আমিও ঘাবড়ে গেছি। আমার কাছে খবর আছে আরও কিছু কিছু ফিল্ম কোম্পানি নাকি টকি ছবি তৈরি করার কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে।'

'বেড়াবেনা।' বলল নেভাদা, 'ওটা ওদের মাথাব্যথা ওরা যা খুশি করুক।' এঞ্জিন চালু করতে করতে বলল, আমাদের ছবি বাজারে পাবার আগেই লোকে টকি ছবির কথা বিলকুল ভুলে যাবে।'

•

খাটের ধারে ছোট টেবলে রাখা টেলিফোন বেজে উঠতেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে রিসিভার তুলল রিণা, আর তখনই দেখল নেভাদা স্মিথ নাম আর পদবির প্রথম হরফ দুটো ডায়ালে টেলিফোন নম্বরের পাশে জ্বলছে।

'হেলো।'

'কেমন আছ রিণা?'' উল্টোদিক থেকে নেভাদার চেনা গলা ভেসে এল। 'জমিয়ে বসেছো ত?'

'নেভাদা!' চমকে উঠল রিণা।

'কি হল, সঙ্গে আরও লোক জুটিয়ে এনেছো নাকি?'

'না, আমি একাই এসেছি,' হাসল রিণা,' তোমার এই বাড়ি স্বপ্নের মত ঠেকছে।'

'স্বপনপুরী বলতে চাও?' নেভাদা বলল। 'আমার কাছে কিন্তু এটা নীড় ছাড়া কিছু

নয় যেখানে রাতের বেলা স্বস্তিতে দু'চোখ বুঁজতে পারি।'

'তোমাকে বলব বলে অনেক কথা জমিয়ে রেখেছি যে,' রিণা বলল, 'তুমি কখন বাড়ি ফিরবে?'

'ফিরব মানে?' নেভাদার হাসির আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল রিণা,' আমি ত বাড়িতেই আছি। বার-এ বসে আছি তোমার জন্য।'

'আমি এক্ষুণি আসছি,' বলেই থমকে গেল রিণা,' কিন্তু বারটা ঠিক কোন দিকে বলোত, এতবড় জায়গায় কোনটা কোনদিকে কিছুই বুঝতে পারছিনা।'

'তুমি যেখানে আছো সেখানে বসে থাকো। এ বাড়িতে কয়েকজন রেড ইণ্ডিয়ান গাইড আছে আমি তাদের একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রিণা এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে। লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে বোলানোর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে দরজার গায়ে টোকা দেবার মৃদু আওয়াজ হল। এগিয়ে এসে দরজা খুলতেই চমকে উঠল রিণা। রেড ইণ্ডিয়ান পোষাকে সামনে দাঁড়িয়ে নেভাদা স্বয়ং।

'মাপ করুন, ম্যাডাম।' মুচকি হাসল নেভাদা।' বিশ্বাস করুন। গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম আমি ছাড়া আর একজনও রেড ইণ্ডিয়ান নেই।'

'ওঃ নেভাদা!' বলে দু'হাতে পুরোনো বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ গুঁজল রিণা, তার চোখের জলের ছোঁয়ায় নেভাদার বাহারি সাদা শার্ট ভিজে উঠল।

জোনাস—১৯৩০

তৃতীয় পর্ব

ককপিটে বসে ডানদিকে তাকাতে চমকে উঠলাম। আলোর রেশনাই-এ সাজানো লস এঞ্জেলস-এর পুরোটাই এই মুহূর্তে ডানদিকের ডানার নিচে চলে এসেছে।

বাজ্ বসেছে পাশে গা ঘেঁষে, ওর কানের কাছে মুখ এনে বললাম, 'দ্যাখো, আমরা ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

'আমরা তাহলে একটা নতুন রেকর্ডও করে ফেললাম, বলো!'

'চুলোয় যাক রেকর্ড!' আমি বললাম,' ডাক পৌঁছে দেবার ঐ কন্ট্রাক্ট যে করেই হোক আমার চাই?'

'পাব নিশ্চয়ই,' সায় দিয়ে বাজ্ সামনে ড্যাশবোর্ডে আলতো চাপড় মারল,' এই খুকুমণিই ওটা আমাদের পাইয়ে দেবে।'

আমাদের নিশানা বারব্যাংক, ওদিকে যাবার পথ ধরব যাব, বারব্যাংক, তার আগে শহরের ওপর একপাক ঘুরলাম। চিকাগো থেকে লস এঞ্জেলসে ডাক আনা নেয়ার কন্ট্রাক্ট একবার বাগাতে পারলে আমাদের ইন্টার কন্টিনেন্টালের কারবার গোটা দেশে ছড়িয়ে

পড়তে দেরি হবেনা। লস এঞ্জেলসের পরে চিকাগো থেকে নিউ ইয়র্ক ডাক দেয়ানেয়ার কন্ট্রাক্ট তখন সহজেই বাগানো যাবে।

কাগজে পড়ছিলাম ফোর্ড কোম্পানি এবার তিন এঞ্জিনের নতুন প্লেন তৈরি করবে,' বাজ্ বলল, 'ভেতরে কম করে ত্রিশ বত্রিশজন লোক আরাম করে বসতে পারবে।'

'সে প্লেন কবে নাগাদ ওরা বাজারে ছাড়বে?'

'তা দু'তিন বছর ঠিকই লেগে যাবে,' বলল বাজ্।

'ঠিক বলেছো,' আমি বললাম, 'দু'তিন বছরের আগে কোনমতেই নয়, তার বেশিও হতে পারে। কিন্তু ফোর্ডগুষ্টির মুখের দিকে তাকিয়ে ত আমাদের বসে থাকলে চলবেনা। সে সময় আমাদের হাতে নেই। ওদের প্লেন তৈরি হয়ে বাজারে আসতেই পুরো পাঁচবছর লেগে যেতে পারে, অতদিন বসে থাকা আমাদের পোষাবে না। খুব বড়জোর দু'বছর, তার মধ্যে আমাদের তৈরি হয়ে মাঠে নামতেই হবে।'

'দু'বছর?' অবিশ্বাসের চাউনি হেনে বাজ্ আমার চোখের দিকে তাকাল। 'না, না, অত কম সময়ের মধ্যে এতবড় কাজ আমরা সামলে উঠব কি করে?'

'তাই নাকি?' আমি পাল্টা তাকালাম তার দিকে,' এখন আমাদের ক'টা প্লেন ডাক দেয়ানেয়া করছে?'

'প্রায় চৌত্রিশটা', বাজ্ বলল।

'নতুন ডাকের কন্ট্রাক্ট পেলে তখন ক'টা প্লেন চলবে?'

'চৌত্রিশের দুই নয়ত তিনগুণ,' বলেই ধূর্তচোখে আমার চোখের দিকে তাকাল সে,'তোমার মতলবটা কি খুলে বলো ত, ঝেড়ে কাশো!'

'প্লেনে ডাক দেয়-নেয়া করে আমরা যা কামাচ্ছি তা চেয়ে ঢের বেশি কামাচ্ছে যারা ঐসব প্লেন বানাচ্ছে,' আমি বললাম।

'প্লেন বানানোর সাধ যদি হয়ে থাকে ত বলব তোমার মাথা খারাপ হয়েছে,' বাজ্ বলল, 'প্লেন তৈরির একটা কারখানা গড়তেই পুরো দু'বছর লেগে যাবে।'

'হিসেবটা করেছো,' আমি বললাম, 'কিন্তু কারও চালু কারখানা কিনলে অত সময় লাগবে না।'

'রোলসরয়েস, লকহিড, মার্টিন, কার্টিসরাইট,' এরা কেউ চালু কারখানা বেচবেনা,' একটু ভেবে বলল বাজ্ 'একমাত্র হাতে আছে উইনথর্প। আর্মি কন্ট্রাক্ট হাতছাড়া হবার পর থেকে ওরা লোক ছাঁটাই করতে শুরু করছে।'

'না, এবার দেখছি তুমি সত্যিই মাথা খাটাচ্ছো বাজ্। তা ভাল,' বলে চুপ করে গেলাম।

'ওসব কিছু নয়,' ককপিটের টিমে আলোয় আমার দিকে তাকাল বাজ্, 'আসলে উইনথর্প বুড়োর জমানায় আমি ওঁর কাছে চাকরি করেছি। আমায় কখনও ছাঁটাই করবেন না বলে উনি কসম খেয়েছিলেন—'

এইমুহূর্তে আমরা বারব্যাংক এয়ারপোর্টের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছি। বাজ্-এর কথার জবাব না দিয়ে রাণওয়ের দক্ষিণের দিকে মোড় নিয়ে রাণওয়ের দক্ষিণে চলে এলাম।

উইনথর্পের প্লেন তৈরির কারখানাটা ঠিক এখানেই ছিল। এখন সেখানে জোরালো দুটো সার্চ লাইট পাশাপাশি জ্বলছে।

'বাজ্ একবার পাশে তাকাও,' বলে সার্চলাইটের কাছাকাছি প্লেনটা নিয়ে এলাম। পুরোনো কারখানায় আলকাতরা মাখানো ছাদে বড় বড় সাদা হরফে লেখা 'কর্ড এয়ারক্র্যাফট, ইনকরপোরেটেড' যে বাজ্-এর চোখে পড়েছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। ডাইভ দিয়ে কারখানায় পাশে নিখুঁত ল্যাণ্ড করলাম। খালি পায়ে কর্কপিট থেকে লাফিয়ে নামতেই ছেঁকে ধরল খবরের কাগজের রিপোর্টারেরা, ফোটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বাল্বের আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমায় চোখ পিটপিট করতে দেখে এক রিপোর্টার বলে উঠল, 'মিঃ কর্ড, আপনি কি ক্লান্ত?'

'কে বললে?' না কামানো গালে হাত ঘষে হাসলাম, 'আমি পুরোপুরি তাজা, ঠিক মরসুমি ফুলের মত,' পাথরকুচিতে পায়ে খোঁচা লাগতে ফিরে এলাম প্লেনের পাশে, বাজ্-এর নাম ধরে চেঁচিয়ে বললাম, 'শুনছ? আমার জুতো জোড়া ছুঁড়ে দাও!'

হাসতে হাসতে বাজ্ আমার জুতোজোড়া জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল। পায়ে জুতো গলাচ্ছি এই অবস্থায় কাগজের লোকেরা পরপর কতগুলো শট নিয়ে নিল।

বাজ্ প্লেন থেকে নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়াতে ওরা আরও কয়েকটা শট নিল। বাজ্ আর আমি হ্যাঙ্গারের দিকে পা বাড়াতে এক রিপোর্টার ছোঁড়া বলে উঠল, 'ঘরে ফেরার পরে কেমন লাগছে?'

'ভাল।'

'সত্যি ভাল, খুব ভাল,' বলল বাজ্।

বাজ্ ভুল বলেনি, ঠিক পাঁচ দিন আগে প্যারিসের লা বুর্গেটে প্লেনে চেপেছি। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নিউ ইয়র্ক, চিকাগো, লস এঞ্জেলস এত পথ পাড়ি দিয়েছি পাঁচ দিনের মধ্যে।

'প্লেন চালিয়ে চিকাগো থেকে লস এঞ্জেলস পাড়ি দেবার রেকর্ড ভেঙ্গেছেন আপনি!' একটা কাগজ নাড়তে নাড়তে বলল সে, 'তাতে এই উড়ানে আপনি পাঁচটা রেকর্ড ভাঙ্গলেন এটাই দাঁড়াচ্ছে!'

'বেশি নয়, দিনে একটা করে,' হেসে বললাম, 'তাতে কিছু যায় আসেনা।'

'কিন্তু তাতে কি ডাক দেয়ানেয়ার কন্ট্রাক্ট আপনার হাতে আসবে?' জানতে চাইল আরেকজন।

জবাব দেবার আগেই চোখ পড়ল সামনের দিকে, দেখি ওদের পেছনে হ্যাঙ্গারে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে ম্যাকঅ্যালিস্টার আমার উদ্দেশে পাগলের মত হাত নাড়ছে।

'এত ব্যবসার ব্যাপার-স্যাপার' ওদের কাটানোর জন্য বললাম 'এসব প্রশ্নের জবাব পাবেন আমার পার্টনার মিঃ বাজ্‌কে ধরলে, আপনারা আমার ছেড়ে ওকে ধরুন।'

আর যায় কোথায়। শুনেই ওরা আমায় ছেড়ে বাজ্‌কে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল। এইফাঁকে পা চালিয়ে আমি ম্যাক অ্যালিস্টারের কাছে পৌঁছে গেলাম।

'আমি ত ভাবলাম তুমি ঠিক সময়ে এসে পৌঁছোতেই পারবনা।'

ম্যাক অ্যালিস্টারের গলার বিরক্তি আর দুশ্চিন্তা ফুটে বেরোল।

'কেন,' আমি বললাম আমার ফিরতে ফিরতে ন'টা বাজবে ততো আগেই আপনাকে বলেছিলাম।'

'আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি,' আমার হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন ম্যাক অ্যালিস্টার, 'এবার সোজা ব্যাংকে হাজির হব. ওঁদের বলেছি তোমার নিয়ে ফিরব।'

'এক মিনিট,' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম। 'ওঁদের বলতে কাদের কথা বলছেন?'

'হাই স্পিড ইঞ্জেকশন শেল্ড-এর সাবলাইসেন্স পেতে যে ব্যবসায়ীগোষ্ঠী তোমার দেয়া দর দিতে রাজি হয়েছেন, ম্যাক অ্যালিস্টার বললেন, 'এমনকি ডু পন্ট গোষ্ঠী ও এবার গাটছড়া বাঁধছে ওঁদের সঙ্গে।' আমার হাতখানা আবার নিজের মুঠোয় নিয়ে ম্যাক অ্যালিস্টার গাড়ির দিকে পা চালালেন।

'একটু দাঁড়ান,' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'গত পাঁচদিন পাঁচরাত এক মুহূর্তের জন্য আমি ঘুমুতে পারিনি। এখন আর শরীর বইছেনা। আমি কাল ওঁদের সঙ্গে দেখা করব।'

'আগামিকাল?' চেঁচিয়ে উঠলেন ম্যাক অ্যালিস্টার, 'কিন্তু ওঁরা যে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন!'

'অপেক্ষা করুন যত পারেন,' আমি বললাম,' তাতে আমার কিছু যায় আসেনা।'

'কিন্তু ওঁরা তোমার এক কোটি ডলার দিচ্ছেন!'

'ওঁরা আমায় কিছুই দিচ্ছেন না,' বলতে গিয়ে গলা আপনিই অল্প চড়ে গেল,' যে পেটেন্ট আমরা কিনেছি তা কেনার সুবর্ণসুযোগ ওঁদেরও ছিল। ওঁরা সবাই সে-বছর ইওরোপে আঁটোসাটো হয়ে বসেছিলেন। কেউ একচুল হেলেননি। এবার ওঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন যে এটা না হলে চলবেনা তাই আমার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এসেছেন। সেক্ষেত্রে ওঁরা স্বচ্ছন্দে আগামিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন।' বলতে বলতে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম, ভেতরে ঢুকে বললাম, 'সোজা বেভার্লি হিলস হোটেল চালাও।'

'আগামিকাল?' পাশে বসে ভাঙ্গা গলায় ম্যাক অ্যালিস্টার বললেন, 'কিন্তু ওঁরা যে আর অপেক্ষা করতে চাইছেন না।'

ততক্ষণে শোফার এঞ্জিন চালু করেছে, এয়ারপোর্ট এলাকা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। ম্যাক অ্যালিস্টারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মুখ টিপে হাসলেও তাঁর কথা ভেবে কষ্ট হল। এইসব কূপমণ্ডূক কারবারীদের রাজি করাতে ওঁকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানেনা।

'শুনুন।' গলা নামিয়ে বললাম, 'বিশ্বাস করুন আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারছিনা। ঘন্টা দুয়েক একটানা আগে আমায় ঘুমোতে দিন। তারপর আমরা কথাবার্তা যা বলার বলব।'

'তাতে রাত তিনটে বাজবে,' আঁতকে উঠলেন ম্যাক।

'ঠিক ধরেছেন,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম,' এক কাজ করুন বরং, ওঁদের আমার

হোটেলের সুটে নিয়ে আসুন। ততক্ষণে আমি ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঁদের জন্য অপেক্ষা করব।

বেভার্লি হোটেলে আমার সুটে অপেক্ষা করছিল মণিকা উইনথ্রপ. সিগারেট মুখে নিয়ে ঢুকতেই ও দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল। আমার দু'গালে নাক চেপে ধরে চুমু খেয়েই ফ্যাঁশ করে উঠল, 'কি কড়া দাড়ি রে বাবা!' বলে উঠল মণিকা, 'নাক, ঠোঁট সব পুড়ে গেছে।'

'এখানে কি করছ?' আমি বললাম, 'তোমার না এয়ারপোর্টে থাকার কথা ছিল।'

'ছিল ত,' কাঁদোকাঁদো গলায় চটপট জবাব দিল মণিকা, 'কিন্তু পাছে বাবা দেখে ফেলে এই ভয়ে শেষপর্যন্ত আর যাওয়া হলনা।'

'ক'দিন একটানা প্লেন চালিয়ে ভীষণ বিটকেল গন্ধ হয়েছে গায়ে,' শোবার ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, 'গরমজলে গলা ডুবিয়ে চান না করলে এ গন্ধ যাবেনা। তুমি এইফাঁকে একটা ড্রিংক তৈরি করো ত,' চানের আগে চাখব।'

'তোমার ড্রিংক আমি তৈরি করে রেখেছি,' বরফকুচির ওপর বুরবোঁ হুইস্কি ভর্তি একটা বড় গ্লাস নিয়ে এল মণিকা। 'টবে গরম জলও দেয়া আছে।'

'আমি এখানেই আসব তুমি জানলে কি করে?' তার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে আলতো চুমুক দিলাম, 'কে বলল?'

'কেউ বলেনি,' হাসল মণিকা, 'রেডিওর খবরে শুনলাম। শোন তোমার গায়ের গন্ধটা আমার খুব ভাল লাগছে। এখুনি সাবান ঘষে ওটা তুলে ফেলোনা।'

আরও খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে গ্লাস নামিয়ে রাখলাম। শার্ট খুলে ঢুকলাম বাথরুমে। দরজা ভেজাতে পেছন ফিরতেই দেখি মণিকা কোন ফাঁকে ঢুকে দরজায় ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই বলল, 'এখুনি গায়ে জল দিয়োনা, তোমার গায়ের এই মরদের গন্ধ আগে আমায় বুক ভরে নিতে দাও।' বলেই দু'হাতে গলা জড়িয়ে প্রাণপণে আমায় জাপটে ধরল মণিকা। চুমু খেতে যেতেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল। উশ্‌খুশ্‌ করতে করতে মুখ গুঁজে দিল আমার কাঁধে, বুক ভরে দম নিতে নিতে ওর থরথর কেঁপে কেঁপে ওঠা দিব্যি অনুভব করছি, কানে আসছে ওর মৃদু গোঙানি, শরীরের ভেতরে যত গরম ছিল সব ঢেলে আমায় উজাড় করে দিচ্ছে মণিকা, তার হল্‌কায় আমায় গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরতে দেখি দু'চোখ আধবোঁজা, ওর শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠল। গলা দিয়ে আবার বেরোল গোঙানি, তেষ্টায় ফেটে চৌচির শুকনো মাটি জল চাইছে আকাশের কাছে। বেল্ট আলগা করতে আমার ট্রাউজার্স খসে পড়ল কোমর থেকে, পা দিয়ে ওটা একপাশে সরিয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেশ দেয়া ভ্যানিটি টেবলে ওকে চিত করে শোয়ালাম। মণিকার দু'চোখ এখনও বোঁজা; দু'হাত শক্ত করে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে, এবার দু'পা দিয়ে আমার কোমর বেড়িয়ে ধরল সে। মণিকা একটা বাঁদর আর আমি নারকেল গাছ, হাতে পায়ে জড়িয়ে সেই গাছ বাইছে সে। মণিকাকে

এই মুহূর্তে দেখে ঠিক তেমনই লাগছে। ফোঁশফোঁশ্ করে ফেলা ওর গরম নিঃশ্বাসের বাতাস লেগে আমার কান আর ঘাড়ের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে।

আরাম আর তৃপ্তির গোঙানি আবার মুখ দিয়ে বেরোতে তার কানের কাছে মুখ এনে বললাম, 'আস্তে দম নাও, আমি ত গেলাম।'

'আঃ কি আরাম!' আমার কাঁধে নাক ঘষে বলল মণিকা, 'কি খাসা জংলি বনমানুষের গন্ধ!'

বাথটবের কুসুম কুসুম নরম গরম জলে শরীরের সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। পিঠে সাবান ঘষতে যেতে মণিকা সাবানশুদ্ধ আমার হাত চেপে ধরল। সাবান আর তোয়ালেটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'দাও, আমি ঘষে দিচ্ছি।' বলে আমার জবাবের তোয়াক্কা না করে সাবান মাখা ভেজা তোয়ালে ঘষতে লাগল আমার পিঠে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঐ ঘষটানোর আমেজে আমার দু'চোখে বুঁজে এল। 'বাঃ বেশ আরাম দিতে শিখেছো ত,' আমি বললাম, 'থেমোনা, ঘষে যাও।'

'হাতে পায়েই শুধু বড় হয়েছো,' মার মত শোনাল মণিকার গলা, 'আসলে তুমি এখনও শিশু আছো। নাও, এবার চিত হয়ে শোও দেখি, সাবানটা ধুয়ে দিই।' চোখ না খুলেই টবের জলে চিত হয়ে শুলাম। টের পাচ্ছি মণিকার তোয়ালে বুক থেকে তলপেট ছাড়িয়ে আরও নিচে নামছে। খানিকবাদে তলপেটের নিচের দিকটা অদ্ভুত শিরশির করে উঠতে চোখ মেলে তাকালাম। দেখি মণিকা হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার খোকনের দিকে। চোখে চোখ পড়তে হেসে ফেলল মণিকা, 'তলপেটের দিকে ইশারা করে চাপাগলায় বলল, 'তোমার এটাকে কেমন পুঁচকে আর অসহায় দেখাচ্ছে।' জবাব না দিয়ে তার দিকে তাকালাম, দেখি তার দু'চোখের চাউনি কুয়াশার মত কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে। এ চাউনি আমার চেনা। কোনও কথা না বলে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে মণিকাকে টেনে আনলাম জলের নিচে, চুমু খেতে গিয়েও টের পাচ্ছি জলের ভেতর দিয়ে ওর তোয়ালে আমার বুক আর তলপেটে ওঠানামা করছে।

'ক'রাত না ঘুমিয়ে তোমার গায়ের জোর বেশ বেড়ে গেছে।' চাপাগলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল মণিকা। আমি হেসে উঠতেই বেরসিক টেলিফোন বেজে উঠল। চমকে উঠে মণিকা আমায় ছেড়ে দিল। জল থেকে বেরিয়ে উদোম গায়ে ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম।

'এত রাতে কে হ্যা?' রিসিভারে মুখ রেখে গর্জে উঠলাম।

'আমি জোনাস,' উল্টোদিক থেকে চেনা বুড়োটে গলা ভেসে এল, 'ওঁদের নিয়ে লবিতে অপেক্ষা করছি।'

শুয়ারের বাচ্চা ম্যাক অ্যালিস্টার! বানচোত্ আর টেলিফোন করার সময় পেল না।

'আপনি কি পেয়েছেন বলুন ত?' গলা সামান্য চড়ালাম, 'আপনাকে ত রাত তিনটেয় আসতে বললাম!'

'ঘড়ির দিকে তাকালেই দেখবে এখন ঠিক তিনটে বেজেছে। আমরা ওপরে যাব?

আমার সঙ্গে উইনথর্পও আছেন, বলছেন তোমার সঙ্গে ওঁর বিশেষ দরকার।'

উইনথর্প, তার মানে মণিকার বাবা। ঠিক এটাই খানিক আগে চেয়েছিলাম,' ওপরে এলেই দেখে ফেলবে আমার সুটে ওর কন্যারত্ন উদোম গায়ে বসে আছে।

'না,' জোরগলায় বললাম।

'আমার চান এখনও শেষ হয়নি। ওঁদের বরং বারে নিয়ে গিয়ে মদ খাওয়ান।'

'কথাটা আমার মাথাতেও এসেছিল,' বললেন ম্যাক অ্যালিস্টার, 'কিন্তু হোটেলের বার ত অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।'

'খুব ভাল কথা। আমি তাহলে লবিতে যাচ্ছি, ততক্ষণ ওখানেই অপেক্ষা করুন।'

'আঃ, জোনাস, তুমি কেন বুঝতে চাইছোনা এসব ব্যবসার কথাবার্তা আর চুক্তি, লবিতে বসে এসব হয়না। হাজারটা মানুষ চারপাশে আসাযাওয়া করছে, তাদের মাঝখানে প্রাইভেসি বলে কিছু থাকেনা। তাছাড়া যাঁরা এসেছেন এটা তাঁদেরও পছন্দ হবেনা। খুলে বলো ত, তুমি আমাদের ওপরে তোমার স্যুটে নিয়ে যেতে চাইছনা কেন?'

'কারণ আপনারা আসার অনেক আগে একটা মাগি এনে ঢুকিয়েছি এখানে।'

'তাতে হলটা কি?' টেলিফোনে ম্যাক অ্যালিস্টারের হাসিমাখা গলা কানে এল,' আমার সঙ্গে যারা এসেছেন তাঁর সবাই উদ্ধার মনের মানুষ, এনিয়ে ওঁরা কিছু মনে করবেন না।'

'মনে অবশ্যই করবেন কারণ সে মাগীর নাম মণিকা উইনথর্প।'

কয়েক মুহূর্ত ম্যাক অ্যালিস্টার চুপ করে রইলেন, তারপর ধাক্কার চোট সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার বাবা প্রায়ই বলতেন তুমি থামতে জানোনা। কথাটা কতদূর সত্যি তা অ্যাদ্দিনে বুঝতে পারছি। তুমি পারছো ত, জোনাস?'

'আমি ত এখনও শিশু; আগে আপনার মত বুড়ো ভাম হই তখন না হয় থামতে শিখব।'

'সে তোমার খুশি। কিন্তু এখানে লবিতে বসে কথাবার্তা বলা এঁদের পছন্দ হবেনা আবারও বলছি।'

'ওঁদের প্রাইভেসি চাই, এইত? ঠিক আছে। এলিভেটর দুটো থেকে খানিক তফাতে পুরুষদের পোযাক পাল্টানোর যে ঘর আছে ওখানে বসেই না হয় কথাবার্তা বলা যাবে, আপনি দয়া করে আর ব্যাগড়া দেবেন না। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আসছি। ম্যাক অ্যালিস্টার জবাব দেবার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। মণিকার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'চটপট একটা তোয়ালে দাও ত, তোমার বাপ শুয়োরের বাচ্চা এতরাতে দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে আমার সঙ্গে মিটিং করতে। ব্যাটাচ্ছেলের সঙ্গে কাজের কথা সেরে খানিক বাদেই ফিরে আসছি।'

কামাবার সময় পাইনি তাই পাঁচদিনের গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়েই নেমে এলাম নিচে? দেখলাম ম্যাক অ্যালিস্টার ভুল বলেন নি, দুনিয়ার অষ্টম আশ্চর্য দেখার

চোখে উপস্থিত সবাই তাকাচ্ছেন আমার দিকে। আমার চোখ আর কান খাড়া আছে। ওঁদের একজন চাপাগলায় আমায় গালাগাল দিলেও তা আমি ঠিক শুনতে পেলাম।

'মিটিং মিটিং-এর মতই হবে, ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, 'গালিগালাজকে তোয়াক্কা না করে বললাম, 'আসলে ওপরে আমার সুটে জায়গা খুব কম। তারওপর একটা বাক্স এনেছি সুটের অর্দ্ধেকের বেশি জায়গা সেটা একাই দখল করেছে।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম উপস্থিত অধিকাংশেরই চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাসের ছায়া, ওপরে আমার স্যুটে ওঁদের নিয়ে না যাবার কারণ হিসেবে যা ব্যাখ্যা করলাম তা এঁরা সত্যি বলে হজম করতে পারছেন না, যাক গে মরুক গে।

'যাই বলো জোনাস মিটিং করতে যে জায়গা তুমি বেছে নিয়েছো তা এককথায় আদর্শ মানতেই হবে,' ভাষণ দেবার ঢং-এ গলা কাঁপিয়ে বললেন ম্যাক অ্যালিস্টার।

বুড়োটা অনেকক্ষণ ধরে ভ্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করছে, এবার ওকে একটু টাইট দেয়া দরকার। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে মেপে নিলাম।

'বসে পড়ুন ম্যাক,' গলা অল্প চড়ালাম, 'সেই কখন থেকে বিনেপয়সায় ভাষণ দিচ্ছেন। আমার খামোকা জ্ঞান না দিয়ে নিজের ট্রাউজার্সের ফ্লাই এঁটে নিন। বোতামগুলো অনেকক্ষণ হল খুলেছে, এবার ভেতরের জিনিসটা খসে পড়বে। আয়নার সামনে একমিনিট দাঁড়ানোর সময়ও পাননি, নাকি? এই খোলা ফ্ল্যাই নিয়েই এঁদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাতবিরেতে, কেমন ভদ্রলোক মশাই আপনি?'

ম্যাক অ্যালিস্টারের রেগে লাল হওয়া মুখ আর বাকি সবার নিঃশব্দ হাসিমুখ দেখে বুঝলাম তীরটা গেঁথেছি ঠিক জায়গায়।

ম্যাক অ্যালিস্টার ঝানু উকিল, আমার বাবার আমলের পাখোয়াজ লোক, এবার তিনি উপস্থিত সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর তখনই বুঝলাম আমার কাছ থেকে সাব-লাইসেন্স পাবার উদ্দেশ্যে তিনটে বড় নামজাদা কেমিক্যাল কর্পোরেশন জোট বেঁধে আলাদা এক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে।

প্রথম টাকাকড়ি এই প্রতিষ্ঠানই দেবে, সেইসঙ্গে হবে উৎপাদিত পণ্যের রয়্যালিটির গ্যারাণ্টার।

'টাকার গ্যারাণ্টার কে হচ্ছেন?' প্রশ্নটা আচমকা ছুঁড়ে দিলাম।

'ইনি, মিঃ শেফিল্ড হবেন,' অভ্যাগতদের একজনকে ইশারায় দেখালেন ম্যাক অ্যালিস্টার, 'ইনি মানে মিঃ শেফিল্ড জর্জ স্টুয়ার্ট ইনকরপোরেটেড-এর অন্যতম পার্টনার।'

লোকটির দিকে সরাসরি তাকাতে মুখখানা কেমন চেনা ঠেকল যেন বহুদিন আগে কোথাও দেখেছি। একটু ভাবতেই সব মনে পড়ে গেল।

মার্টিন শেফিল্ড, হার্ভার্ড স্কুল অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট-এর এম এ। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ১ম বিশ্বযুদ্ধে যান, ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হবার আগে মেজরের পদে প্রোমোশন পান। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি দখল করার পুরস্কার হিসেবে তিনটি পদক অর্জন করেন। দেশের অন্যতম সেরা পোলো খেলোয়াড়। বয়স বেয়াল্লিশ। যদিও দেখলে পঁয়ত্রিশের বেশি মনে হয় না। মনে পড়ে গেল বছর দশেক

আগে এই মার্টিন শেফিল্ড নিজের প্রতিষ্ঠানের মানে আমাদের কারবারের কিছু শেয়ার কিনতে এসেছিলেন, কিন্তু বাবা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হন নি। একরকম ধুলোপায়েই বিদেয় করে দিয়েছিলেন লোকটিকে। পরে আমাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, 'এসব প্রস্তাব বাইরে থেকে যত লাভজনকই দেখাক না কেন, ভবিষ্যতে যেন ভুলেও এই ফাঁদে পা দিও না, জোনাস। একবার অন্য প্রতিষ্ঠানের হাতে তোমার কারবারের শেয়ার চলে গেলে আর দেখতে হবেনা, ধীরে ধীরে ওরাই তোমার কারবার গিলে ফেলবে। লোক দেখানো মালিকানা তোমার হাতে থাকলেও কারবার চালানোর সব কলকাঠি চলে যাবে ওদের হাতের মুঠোয়। টাকা দিয়ে তোমায় মুখ এমনভাবে বন্ধ করবে ওরা যখন ওদের কাজকর্ম মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা থাকবেনা তোমার সামনে। ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু এরা বোঝেনা। যা সবসময় রেখে দেয় এরা নিজের হাতের মুঠোয়। এদের সঙ্গে কাজ কারবার করার আগে ভাল করে বাজিয়ে নেবে।'

'প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও পাইনি,' মিঃ শেফিল্ডের দিকে তাকিয়ে বললাম,' আমার পাওনা টাকার গ্যারান্টার কিভাবে হবেন আপনি?'

এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের সবার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মিঃ কর্ড,' বলতে গিয়ে নাকের ওপর বাইফোক্যাল প্যাশনে চশমার কাঁচের আড়ালে চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল। শেফিল্ডের গলায় প্রখর আত্মবিশ্বাস ফুটেছে যে কারণে আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়া তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় ঠেকছে। স্টুয়ার্ট, লেম্যান, মরগ্যান, এইসব নামজাদা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেখানে চুক্তি হয়েছে সেখানে আলাদা গ্যারাণ্টারের প্রশ্ন আসে কিকরে এটাই বোঝাতে চান তিনি। চাইলেও অত সহজে তাঁকে রেহাই দিতে রাজি নই আমি। শান্তগলায় বললাম, 'মিঃ শেফিল্ড, আপনি এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। আমার পাওনা টাকায় গ্যারাণ্টার কে হবেন এটাই আমি জানতে চেয়েছি। ব্যাংক, বা শেয়ারের দালালি, দুটো কারবারের কোনটাই আমার নেই। অকালে বাবা মারা যাওয়ায় স্কুল ছেড়ে আমায় কাজে ঢুকতে হয়েছে। আমি যতদূর জানি, ব্যাংকের কাছে টাকা ধার চাইলে ব্যাংক বাড়ি, জমি, সম্পত্তির দলিল, বণ্ড শেয়ার, বা ঐরকম কিছু নিজেদের কাছে বাঁধা রাখতে চাইব। আমি এটুকুই বলতে চাইছি।' মিঃ শেফিল্ডের পাতলা ঠোঁটে ধারালো হাসি ফুটল, 'যেসব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরা এখানে আছেন। আপনার পাওনা টাকা মেটানোর ক্ষমতা তাঁদের একজনেরও নেই এটাই কি আপনার ধারণা?'

'ভুল করছেন, মিঃ শেফিল্ড,' গলার আওয়াজ যতদূর সম্ভব ভদ্র আর নরম রেখে বললাম, 'একথা একবারও আমি বলিনি। আসলে ব্যবসায়ে আমার চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ এমন অনেক লোক ত এখনও বেঁচে আছেন। তাঁরাই বলেছেন এসব ব্যাপারে সবসময় শর্ত হয় না। তাছাড়া বাজারের হাল কি খারাপ হয়েছে তা ত নিজের চোখেই দেখছেন— দেশের যেখানে সেখানে একের পর এক ব্যাংক ফেল পড়ছে। পরে কি ঘটতে পারে একথা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনা। আমার পাওনা টাকা কিভাবে মেটানো হবে শুধু সেইটুকু আমি জানতে চাই। বাস, তার বাইরে কিছু নয়।'

'নতুন যে প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে তার থেকেই আপনার পাওনা মেটানো হবে।'

'তাই বলুন,' হেসে বললাম, 'তাহলে ব্যাপার এই দাঁড়াচ্ছে যে আমি যে লাইসেন্স আপনাদের দেব তার সাহায্যে মুনাফা করে আপনারা আমার পাওনা টাকা মেটাবেন, এই ত?'

'ব্যাপারটা ত তাই দাঁড়াচ্ছে,' সায় দিলেন মিঃ শেফিল্ড।

'সে ত অনেক দিনের ব্যাপার, বহুসময় লাগবে,' সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'পুরো টাকাটা আমায় আপনারা একবারে কেন দেবেন না তাই তা বুঝতে পারছিনা!'

'আপনার পাওনার পরিমাণ কিন্তু খুব কম নয়, মিঃ কর্ড—এক কোটি ডলার। এইসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও অত টাকা একবারে মেটানো খুব কষ্টকর।'

'ওহো, বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবেনা,' মুখখানা বোকাসোকা ভাল মানুষের মত করে বললাম, 'টাকাটা তাহলে আপনারা আগাম দেবেন এটাই বলতে চাইছেন ত?'

'ভুল করছেন, মিঃ কর্ড, আমি একবারও তা বলিনি। আমরা শুধু কাঁচামালের বিমা করাচ্ছি আর সেইসঙ্গে নতুন কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি জোগাড় করছি। এতেই কয়েক কোটি ডলার খরচ হয়ে যাবে।'

'আপনার দালালি বাবদ পাওনা টাকাটাও নিশ্চয়ই এর অন্তর্ভুক্ত?'

'অবশ্যই,' হাসলেন মিঃ শেফিল্ড, 'সেটাই ত নিয়ম।'

'মিঃ কর্ড,' ত্যারছা চাউনি মেলে আমার দিকে তাকালেন মিঃ শেফিল্ড, আমরা এই চুক্তির ব্যাপারে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি তা হয়ত আপনার পছন্দ নয়, তাই না?'

'মোটেও তা নয়, মিঃ শেফিল্ড,' তাচ্ছিল্যের গলায় বললাম, 'আর পছন্দ করা না করার আমি কে? অন্য লোককে ডেকে কারবার চালানোর ব্যাপারে জ্ঞান দেয়া আমার কাজ নয়, নিজের মাথা ঘামাবার মত অনেক ঝামেলা আমার আছে।'

'কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের প্রস্তাব কতদূর কার্যকর হবে তা নিয়ে অনেক সন্দেহ জমে আছে আপনার মনে।'

'সন্দেহ হওয়াই ত স্বাভাবিক,' তাঁর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আপনাদের আগ্রহ দেখে গোড়ায় ভেবেছিলাম সত্ত্বগুলো হাতে পেয়েই আপনারা আমার পাওনা এককোটি ডলার আমায় দিয়ে দেবেন। কিন্তু এখন দেখছি এক কোটি ডলার দেবেন বলে আপনারা আমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। দুটোর মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক আছে।'

'এই ধরনের চুক্তিতে আপনার তাহলে আপত্তি আছে?'

'আপত্তি থাকবে কেন, দেনাপাওনার ব্যাপারটা বুঝে নেবার জন্যই এসব বলা।'

'যাক, তাহলে এবার সইসাবুদ যা করার সেরে ফেলা যাক,' স্বস্তির হাসি ফুটল মিঃ শেফিল্ডের ঠোঁটে।

'দাঁড়ান মশাই, অত তাড়া কিসের,' আমি বললাম, আর সঙ্গে সঙ্গে হাসি মিলিয়ে গেল তাঁর ঠোঁট থেকে। 'শুনুন মশাই, আপনাদের সঙ্গে হাত মেলাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এতবড় ঝুঁকি নিতে গেলে এত কমে হবেনা। সাফ বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ। এককোটি নয়। পুরো দেড়কোটি ডলারের গ্যারান্টি না পেলে আপনাদের সঙ্গে কোনরকম চুক্তি করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

শুনে থ' মেরে গেলেন সবাই, তারপর সমবেত গুঞ্জন ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলেন তাঁরা। 'কিন্তু মিঃ কর্ড, আপনি ত প্রথমে এক কোটি ডলারেই রাজি হয়েছিলেন,' বললেন মিঃ শেফিল্ড।

'না, মোটেও হইনি,' তাঁর চোখে চোখ রেখে গলা অল্প চড়ালাম, 'আপনাকে আমি এই প্রথম দেখছি।'

'এক মিনিট, জোনাস,' বেরসিকের মত আগ বাড়িয়ে এই বেহাল পরিস্থিতির সবটুকু মজা নষ্ট করে দিলেন।' কিন্তু আমার বেশ মনে আছে তুমি গোড়ায় এক কোটি ডলারের অফারে রাজি হয়েছিলে।'

'আপনি বুঝতে ভুল করেছেন,' আমি বললাম, 'ওঁরা অফার দিয়েছেন, আমি শুধু শুনেছি, হ্যাঁ না কিছু বলিনি।'

'তুমি রাজি হবে ধরে নিয়ে এতদিন আমি তোমার হয়ে এঁদের সঙ্গে দফায় দফায় কথাবার্তা বলেছি, আলোচনা করেছি। কিন্তু তুমিও শুনে রাখো জোনাস এইরকম চুক্তির মধ্যে আমি নেই। যে চুক্তি গোড়ায় হয়েছে তার ভিত্তিতে সইসাবুদ না হলে আমি পদত্যাগ করছি।'

'সে আপনার না পোষালে অবশ্যই চলে যেতে পারেন,' নিরাসক্ত গলায় বললাম।

'নিজের ওজন বুঝে এখনও চলতে শিখলেনা এই হল তোমায় নিয়ে মুশকিল!' রেগেমেগে বলে বসলেন ম্যাক অ্যালিস্টার, 'এই সেদিনও তোমার নাক টিপলে দুধ বেরোত আমার বেশ মনে আছে—।

'এই সম্পত্তিটা আমার, আর আপনি উকিল, এই হল আপনাকে নিয়ে মুশকিল!' রাগে আমার মেজাজ চড়তে লাগল, 'আমার সম্পত্তি আমি বেচব কি বিলিয়ে দেব সে পুরোপুরি আমার ভাবনা, যা ভাল বুঝব করব। আপনি নিছকই আমার বেতনভুক কর্মচারি বই কিছু নন তা মনে রাখবেন।'

ম্যাকের অপমানে রাঙা মুখ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছাই-এর মত ফ্যাকাশে সাদা হয়ে এল, এই মুহূর্তে তার মনে যেসব ভাবনা ওঠা পড়া করছে ছবির মত তারা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে, বছরে এক লাখ ডলার পারিশ্রমিক সেইসঙ্গে মুনাফার ওপর বোনাস। বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার খরচ, সব কোম্পানির টাকায়। বছরে যাট হাজার ডলারের স্বাধীন পেশা কেন ছেড়ে দিলেন তাই ভেবে এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই ওর খুব আফশোস হচ্ছে।

হঠাৎ রেগেমেগে এত কথা বলার জন্য নিজের ওপর রাগ হলেও ম্যাক অ্যালিস্টারের জন্য মন এতটুকু খারাপ হচ্ছেনা। আমার প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার সময় নিজের ইচ্ছেমত চুক্তিপত্র তৈরি করেছেন উনি নিজে হাতে, খুঁটিয়ে না দেখেই আমি তাতে সই করেছি। যখন যত টাকা চেয়েছেন তখনই পেয়েছেন। কাজেই আমার বিরুদ্ধে ওঁর কোনও অভিযোগ থাকার কথা নয়। এক এক করে সবার মুখের পানে তাকালাম। দেখি সবাই একবার ম্যাকঅ্যালিস্টারকে একবার আমাকে দেখেছেন। ম্যাকের জন্য মন খারাপ না হলেও পরিস্থিতি সামাল দিতে নিমেষে সুর পাল্টে ফেললাম।

'নিন, ম্যাক, যা হয়েছে তা আর মনে পুষে রাখবেন না।' তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'যা বলেছি ভুলে যান। একটা ত নয়, আরও অনেক চুক্তিতে সইসাবুদ বাকি, আপনার নতুন কনট্র্যাক্টের খসড়াও তৈরি করতে হবে। আমার কাছ থেকে আর কেউ আপনাকে ছিনিয়ে নেবে তা কিন্তু আমি হতে দেবনা।'

'ঠিকই বলেছো, জোনাস।' সায় দিলেন ম্যাক। লক্ষ করলাম তাঁর চোখমুখ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। 'আসলে ব্যাপার কি জানো, পাঁচদিন না ঘুমিয়ে একটানা প্লেন চালিয়ে তোমার শরীর যেমন বইছেনা তেমনি এই চুক্তির ব্যাপারে কাজকর্ম করে আমার নিজের শরীরও আর বইছেনা। আমাদের দুজনেরই এখন টানা বিশ্রাম দরকার। অনিচ্ছাকৃত ভুল বোঝাবুঝির জন্য মাফ চাইছি।'

'মাননীয় সুধীবৃন্দ,' আমি কিছু বলার আগেই অভ্যাগতদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন ম্যাক অ্যালিস্টার, 'আসলে দোষ আমার। আপনাদের ক্ষতি হোক তা আমি কখনোই চাইবনা। আসলে মিঃ কর্ডকে বুঝতে আমার ভুল হয়েছিল। আমি আপনাদের সবার কাছে এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য মাফ চাইছি।'

একটা বিশ্রি নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরের ভেতর। কয়েক মুহূর্ত টু শব্দটি নেই কারও মুখে, তাই দেখে টয়লেটের দিকে পা বাড়িয়ে হেসে বললাম, 'তাহলে প্রমাণ হচ্ছে আজকের এই মিটিং পুরোপুরি মাঠে মারা যায়নি।'

'আপনি দর দিয়েছেন, এবার আমাদের পালা,' টয়লেট থেকে ফিরে আসতে মিঃ শেফিল্ড বললেন, 'আপনি চাইছেন দেড়কোটি, আমি বলছি এক কোটি পঁচিশ লাখ।'

কাজ হাঁসিল করতে এঁরা অস্থির হয়ে উঠেছেন বলেই মিঃ শেফিল্ড এভাবে দরাদরি করছেন বুঝতে পারলাম। প্রথমে নারাজ হবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে বদ বুদ্ধি এল মাথায়। বললাম, 'মিঃ শেফিল্ড, আমার বাবার মুখ থেকে আপনার কথা অনেক শুনেছি। উনি বলতেন আপনি খাঁটি খেলোয়াড় তাছাড়া যে কোন জিনিস নিয়ে জুয়ো খেলেন। যে কোন জিনিসের ওপর বাজি ধরেন।'

'ঠিকই শুনেছেন,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন মিঃ শেফিল্ড।

'আসুন একটু বাজি ধরা যাক,' চার ফিট দূরে টয়লেট ইশারায় দেখালাম। 'অতদূরে না গিয়ে টয়লেটে না ঢুকে এখান থেকে তাক করে এখানে হিসি ফেলতে হবে আপনাকে। ফেলতে পারলে আপনার অফার মত এক কোটি পঁচিশ লাখেই আমি রফা করব, না পারলে এক কোটি পঞ্চাশ লাখ ডলারের একটা আধলা কম আমি নেব না।'

'মিঃ কর্ড?' অস্পষ্টভাবে মিঃ শেফিল্ড আমার নাম উচ্চারণ করলেন। হাঁ করে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, বিস্ময়াহত চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'আপনি অনায়াসে আমায় জোনাস বলে ডাকতে পারেন', আমি বললাম। বিব্রত দেখাল মিঃ শেফিল্ডকে। অসহায় চোখে সঙ্গিদের মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

'অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই, মার্টিন, ম্যাহ্‌লোন কেমিক্যালের মালিক বলতেন, 'বুক বেঁধে চান্স নাও, লেগে যেতেও পারে।'

খানিক ইতস্ততঃ করে ম্যাক অ্যালিস্টারের দিকে তাকালেন মিঃ শেফিল্ড, কিন্তু ম্যাক

এমন ভাব দেখালেন যেন এই প্রথম তাঁকে দেখছেন। অগত্যা ট্রাউজার্সের ফ্লাই খুলে টয়লেটের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন মিঃ শেফিল্ড। মুহূর্তে তাঁর লালচে হলদে হিসি সোজা গিয়ে ঠিকরে পড়ল টয়লেটের ভেতরে।

'সাবাশ মিঃ শেফিল্ড!' আমি হাসলাম, 'আপনি বাজি জিতেছেন। আমি আপনার দেয়া অফার এক কোটি পঁচিশেই রাজি। এবার থেকে মিঃ শেফিল্ডের বদলে আপনাকে মার্টিন বলে ডাকতে পারি ত?'

'একশো বার' পাতলা হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে। 'মার্টিন' তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে গম্ভীরগলায় বললাম।' 'সবাই দেখছে যে, ট্রাউজার্সের ফ্লাই জলদি আটকান।'

৩

চুক্তিতে দেনাপাওনার ব্যাপারটা ম্যাক অ্যালিস্টার নতুন করে উল্লেখ করার পরে দু'পক্ষের সইসাবুদ পর্ব মিটল। সবাইকে বিদায় জানিয়ে লবি থেকে যখন বেরোচ্ছি তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে চারটে। এলিভেটারের কাছে আসতে অ্যামস উইনথর্প পেছন থেকে কাঁধে আলতো টোকা দিল।

'ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে অ্যামস', ঘাড় না ফিরিয়ে বললাম, 'কথাবার্তা কিছু বলার থাকলে কাল সকাল পর্যন্ত মুলতুবি রাখুন।'

'থাক, থাক, তোমার ঘুমের কথা আর বলতে এসোনা। ও আমার ঢের জানা আছে। শোন জোনাস, আমার ব্যাপারটা খুব জরুরি। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় নেই।'

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। কিন্তু আমায় ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে অ্যামস টেনে এনে বসালেন লবির কৌচে।

'ঠিক আছে, কি এমন জরুরি ব্যাপার বলো শুনি।' গ্যাঁট হয়ে বসে বললাম।

'আমার আরও দশ হাজার ডলার চাই, জোনাস,' অ্যামস বললেন, 'টাকাটা না হলে চলবে না।'

অ্যামসের হাতে টাকা কখনও থাকেনা তা জানি, তবু অবাক হয়ে বললাম, 'খুব দরকার? কেন, শেয়ার বেচার টাকাগুলোর কি হল?'

'গেছে, সব গেছে,' অ্যামস বলল, 'বাজারে আমার ধার দেনা তা ত তোমার অজানা নয়।'

'জানি, চেনা অচেনার মধ্যে এমন লোক কম আছে যে অ্যামসের পাওনাদার নয়। সেইসব পাওনা আর আগের বৌদের খোরপোষের দাবি মেটাতেই যে ওর পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। অ্যামসের জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। দেশের সেরা এয়ারক্র্যাফট ডিজাইনার হিসেবে লোকে একডাকে অ্যামস উইনথর্পকে চেনে। লোকটাকে পেলে লাভ হত ঠিকই, কিন্তু আমি নিরুপায়। অ্যামসের সঙ্গে একটা রক্তচোষা জোঁকের কোনও তফাত নেই, টাকার গন্ধ পেলে আর ছাড়তে চাইবে না।

'কিন্তু তোমার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তাতে এমন আগাম টাকা দেবার কোনও শর্ত নেই, অ্যামস,' আমি বললাম।

'তা জানি বলেই তোমায় অনুরোধ করছি, জোনাস,' অ্যামস বলল, 'কথা দিচ্ছি এই শেষ। আর কখনও আগাম টাকা চাইবনা। বিশ্বাস করো চাই না করো। টাকাটা চাইছি আমার মেয়ে মণিকার জন্য।'

'মণিকা?' এবার আমার অবাক হবার পালা, 'ওর আবার কি হল?'

'মেয়েটা আমার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওকে সামলানো আমার কম্মো নয়, তাই মণিকাকে ইংল্যাণ্ডে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দেব ঠিক করেছি।'

'মেয়ে কি এমন বেসামাল হয়েছে বলবে?'

'বয়সের দোষ আর কি,' মুচকি হাসল অ্যামস,' আমায় না বললেও মণিকা যে কোনও ছোঁড়ার প্রেমে পড়েছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ছোঁড়াকে হাতে পেলে খুনই করে ফেলব। আমার মেয়ের মাথা বিগড়ে দিচ্ছে। এত সাহস!'

'তুমি নিজে কথা বলেছো মেয়ের সঙ্গে?' বললাম, 'মণিকাকে ডেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছো?'

'চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি,' অ্যামস বলল, 'এখনকার ছেলেমেয়েদের হাল ত জানো, স্কুলে থাকতেই ওদের সব বজ্জাতি শেখা হয়ে যায়। ভাবতে পারো, মণিকা যখন এইটে পড়ে তখন একদিন ওর ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স থেকে একগাদা মেয়েদের 'কণ্ডোম' পেয়েছিলাম। তবেই ভেবে দ্যাখো কি বিশ্বপাকা মেয়ে! কি করব! ওকে ত আর দিনরাত ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে পারিনা।'

'তা পারোনা ঠিকই,' আমি বললাম, 'তবে বন্ধুর মত মেয়েকে শোধরানোর চেষ্টা করতে পারো।'

'এইত মুশকিল!' জিভ দিয়ে তালুতে শব্দ করল অ্যামস। 'শেষরাতে জ্ঞান দিতে শুরু করলে। নিজের ছেলেমেয়ে এসব করলে এমনই জ্ঞান দিতে আসতে না। শোন, জোনাস, টাকাটা দেবে?'

'দরকার বলছ যখন তখন নিশ্চয়ই দেব,' একরাশ বিরক্তি বহু কষ্টে চেপে বললাম, 'দশ হাজার নয়, আমি তোমায় পঁচিশ হাজার ডলার দেব, অবশ্য এক শর্তে।'

'শর্ত, তার মানে?' অ্যামসের চোখের চাউনিতে ভীতি ফুটল।

'কর্ড এয়ারক্র্যাফট থেকে তোমায় সরে দাঁড়াতে হবে।'

'কিন্তু জোনাস, তুমি ভুল করছ!' অ্যামসের গলা থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল, 'নতুন যে প্লেন-এর নকশা এঁকেছি আর্মি তা লুফে নেবে।'

'টাকাটা নিয়ে কেটে পড়ো, অ্যামস', বলে কৌচ থেকে উঠে এলিভেটরে ঢুকলাম।

বিছানার ওপর ডাঁই করে রাখা আমার পাজামার ওপর হাত পা ছড়িয়ে চোখ বুঁজে পড়েছিল মণিকা। আমার পায়ের আওয়াজ কানে যেতে চোখ মেলে উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত আমার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'সব ভালয় ভালয় চুকে গেছে ত?'

জবাব না দিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। আমি ট্রাউজার্স খুলে ফেলতে ও একটা পাজামা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'আমার বাবা কি করতে এসেছিল?'

'পদত্যাগপত্র দিতে,' শর্টস খুলে পাজামার পা গলিয়ে বললাম। 'কেন, পদত্যাগপত্র দিল কেন?'

'তোমারই জন্য,' আমি বললাম, 'অ্যামস বললেন কাজকর্ম ঢের করেছেন। এবার উনি বেশি সময় তোমার সঙ্গ দিতে চান তাই.....'

'ব্যস্ তাহলে আর কি,' হঠাৎ হেসে উঠল মণিকা। 'উনি বললেন আর তাই শুনে আমি কৃতার্থ হব এটাই উনি ধরে নিয়েছেন। যখন সত্যিই দরকার ছিল তখন হাজার চোখের জল ফেলেও বাবার মন এতটুকু ভেজাতে পারিনি। সঙ্গ দেয়া দূরে থাক, আদর করে একবারও কাছে ডাকেননি। আর আজ যখন দরকার নেই তখন উনি এসেছেন আমায় সঙ্গ দিয়ে দয়া করতে। বাবাগিরি ফলাতে এসেছেন! এখন আর ওঁকে আমার দরকার নেই।'

'সত্যিই এখন আর ওঁকে তোমার দরকার নেই?'

'না, সত্যিই নেই,' বলতে বলতে খাট থেকে নেমে এল মণিকা, আমার বুকে মুখ গুঁজে শিশুর মত বলল, 'এখন যখন তোমায় পেয়েছি তখন আর কাউকে আমার দরকার নেই। বাবা, ভাই, প্রেমিক, তুমিই আমার সব।' বলতে বলতে গভীর আবেগে ওর দুচোখ বুঁজে এল।

'ভোর হতে আর বাকি নেই, সোনা।' মণিকার চুলে হাত বুলিয়ে বললাম, 'চলো এবার শোবে চলো।

দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল মণিকা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। মাত্র উনিশ বছরের এই যুবতীর জন্য সহানুভূতি উথলে এল বুকের ভেতর থেকে।

পরদিন সন্ধ্যায় রেণোর ছোট গির্জায় মণিকাকে বিয়ে করলাম।

৪

বঁড়শিতে মাছি গেঁথে নিয়ে এলাম জলের ওপর। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ট্রাউট মাছটা ঘুরঘুর করছে দেখতে পেয়েছি, এবার মাছিটাকে গিলতে এসেই ও ডেকে আনবে নিজের মরণ। ফসফরাসের প্রভার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে জলের সীমাটুকু। মাছিটাকে গেলার জন্য মাছটা তৈরি হয়েছে। আমার নাগালের মধ্যে ওটা এসে গেছে। গিলতে দেখলেই হ্যাঁচকা টান মারব বলে তৈরি আমিও। মাছির চারপাশে ঘুরছে মাছ, যে কোনো মুহূর্তে গিলে ফেলবে। ঠিক এমনি সময় পেছন থেকে মণিকা জোরগলায় চেঁচিয়ে উঠল 'জোনাস! তোমার ফোন এসেছে!' সেই চিৎকার শুনে আমার ছিপধরা হাতখানা উঠল কেঁপে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে হতচ্ছড়া ট্রাউট সাঁতরে চলে গেল বহুদূরে আমার নাগালের বাইরে।

ছিপ ফেলে উঠে দাঁড়াতেই মণিকা বলল, 'লস এঞ্জেলস থেকে এক মহিলা ফোন করেছেন, বলছেন খুব জরুরি। চটপট গিয়ে লাইনটা ধরো।'

'মহিলার নামটা জিজ্ঞেস করার কথাও কি মাথায় আসেনি?'

'না বাপু, আসেনি,' চোখে চোখ রেখে হাসল মণিকা, 'কি হল, যাও। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে?'

'মহিলাকে লাইনটা ধরতে বলো গে,' আমি বললাম, 'বলো মিনিটখানেকের ভেতর আসছি।'

ঘাড় নেড়ে মণিকা পা চালিয়ে ঢুকে পড়ল কেবিনের ভেতর। ছিপের সুতো গোটাতে গোটাতে ভাবলাম মহিলা কে, আমায় দিয়ে তাঁর এমন কি দরকার। শহর থেকে দূরে এই পাহাড়ি এলাকার ছোট কেবিনে আমার হনিমুন কাটানোর কথা খুব কম লোকই জানে। ছোটবেলায় নেভাদার পিঠে চেপে এখানে অনেক বেড়াতে এসেছি। বাবার খুব সাধ ছিল এখানে আসার, কিন্তু সে সাধ তাঁর পূর্ণ হয়নি।

সন্ধ্যের আঁধার নেমেছে, গাছপালার আড়াল থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁপোকার একটানা আওয়াজ।

কেবিনে ঢুকে ছিপটা দেয়ালে ঠেকিয়ে রাখলাম। টেলিফোনের পাশে একটা টুলে বসে মণিকা মন দিয়ে ফ্যাসান ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে।

'হেলো,' রিসিভার তুলে বললাম।

'মিঃ কর্ড?'

'হ্যাঁ।'

'এক মিনিট' উল্টোদিক থেকে অপারেটরের গলা ভেসে এল, 'লস এঞ্জেলস, আপনার লোক লাইন ধরে আছেন।'

ক্লিক শব্দের শেষে ভেসে এল পরিচিত যুবতীর গলা, 'জোনাস?'

'কে, রিণা?'

'হ্যাঁ, গত তিনদিন ধরে তোমায় ফোন করার চেষ্টা করছি। তুমি কোথায় গেছ, কবে ফিরবে কেউ বলতে পারছেনা। শেষকালে মনে পড়ে গেল এই কেবিনের কথা। মনে পড়ল ওখানে হনিমুন কাটানোর সাধের কথা বহুবার শুনেছি তোমার মুখে। কপাল ঠুকে লেগে পড়লাম, তোমায় পেয়ে গেলাম।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি মণিকা একমনে ম্যাগাজিন পড়ছে। কিন্তু ওর কান যে আমার কথাবার্তার দিকে খাড়া হয়ে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'কাগজে তোমার বিয়ের খবর পড়লাম।' রিনা বলল, 'অভিনন্দন নিও। তোমার কচি বৌটি বেশ ফুটফুটে দেখতে, ও সুখী হোক এই কামনা করছি।'

'তুমি ওকে আগে দেখেছো?'

'না। কাগজে ফোটো দেখেছি।'

'ধন্যবাদ, এবার বলো ব্যাপার কি, হঠাৎ আমার তলব কেন?'

'তোমার সাহায্য আমার দরকার। জোনাস, বড্ড দরকার।'

'সাহায্য মানে আরও কিছু টাকা চাই, এই ত? তা আরও দশ হাজার ডলার তোমায় দিতে আমি তৈরি।'

'ধরেছো ঠিকই জোনাস আমার সত্যিই টাকা দরকার। তবে দশ হাজারে কিছু হবেনা, আরও চাই।'

'কত চাই বলেই ফ্যালো।'

'বিশ লাখ ডলার।'

'কি!' আমি আঁতকে উঠলাম, 'এত টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?'

'আমার জন্য চাইছিনা, বিশ্বাস করো,' ভাঙ্গাগলায় রিণা বলল, 'চাইছি নেভাদার জন্য। বেচারা ভীষণ মুশকিলে পড়েছে, টাকাটা না পেলে ওকে সব খোয়াতে হবে।'

'সেকি! কাগজে ত পড়েছি ও ফিল্মে অভিনয় করে প্রচুর টাকা কামাচ্ছে। বছরে পাঁচ লাখ ডলার।

'তা করছে, কিন্তু—'

'কিন্তু কি—'

'নিজে একটা ছবি প্রযোজনা করবে বলে নেভাদা হাতে নগদ যত টাকা ছিল সব লাগিয়ে দিয়েছে। পাকা একটি বছর ধরে ঐ ছবি তুলেছে ও কিন্তু এখন পরিবেশকরা কেউ ছবিটা বাজারে ছাড়তে চাইছেনা।'

'কেন চাইছেনা। ছবিটা বাজে?'

'ঠিক উল্টো জোনাস, ছবিটা দারুণ! আসলে এখন টকি ছবির রেওয়াজ শুরু হয়েছে কিনা তাই পরিবেশকরা দল বেঁধে ছুটছে তার পেছনে, টকি জানো ত—যে ছবিতে চরিত্ররা হাত পা নেড়ে কথা বলে। লড়াই করে, চুমু খায়, আরও অনেক কিছু করে।'

'তা সবাই যার পেছনে ছুটছে ঐরকম একটা টকি ছবিই নেভাদাকে তুলতে বলোনা। তাহলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়।'

'আগেই ত বললাম জোনস, একবছর ধরে ছবিটা তুলছে নেভাদা, টকির আজকের এই রমরমার কথা কেউ তখন আঁচ করতে পারেনি। এখন সবক'টা ব্যাংক ওকে ধার শোধ করতে চাপ দিচ্ছে, তাছাড়া নরম্যানও আর আগাম দিতে চাইছেন না, বলছেন উনি নিজের প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন।'

'বুঝতে পেরেছি, নেভাদাকে তোমার বাঁচাতেই হবে, জোনাস, এই ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওর গোটা জীবন। একবার পা ফসকালে ও জীবনে আর উঠে দাঁড়াতে পারবেনা।'

'টাকার পরিমাণ ত অনেক,' আমি বললাম, 'তাছাড়া এতগুলো টাকা ওকে আমি দিতে যাবই বা কেন?'

'সেকি জোনাস। তোমার মুখ থেকেই না শুনেছিলাম নেভাদা তার নিজের যাবতীয় শেয়ার তোমার নামে দিয়ে দিয়েছিল।'

'ঠিক শুনেছিলে,' আমি বললাম।

'কিন্তু তার দর বিশ লাখ ডলার নয়।'

'নয়!' ওপাশে রিণা গলা শুনে অবাক হল, 'এখন ঐ শেয়ারের বাজারদর কত হবে শুনি?'

রিণার প্রশ্ন শুনে থমকে গেলাম। 'আমি জানি, এইমুহূর্তে না হলেও আজ থেকে বছর তিনেক বাদে ঐ শেয়ারের বাজার দর বিশ হাজার ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

'নেভাদার যখন এতই দরকার তখন নিজে আমায় ফোন করলেই পারত।'

'দাম্ভিক বা অহংকারি যাই বলো নেভাদা বরাবর মাথা উঁচু করে চলেছে, আজও তাই চলছে। তাই সরাসরি তোমায় বলতে ওর আত্মসম্মানে বেঁধেছে।'

'ওকে সাহায্য করার পেছনে তোমার কি স্বার্থ?'

'কারণ নেভাদা আমার বন্ধু' চটপট জবাব দিল রিণা, 'আমার নিজের যখন সাহায্য দরকার হয়েছিল তখন একটি প্রশ্নও করেনি ও।'

'শোন রিণা টেলিফোন করলে বলেই বলছি আমি আগে থেকে সাহায্যের ব্যাপারে কোনও প্রতিশ্রুতি দেবনা, তবে আজ রাতের ফ্লাইটেই লস এঞ্জেলস পৌছোচ্ছি এটা ঠিক। ওখানে তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?'

'আমি এখনকার মত নেভাদার কাছেই আছি, তবে ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমিও চাইছিনা। আমি টেলিফোন করে তোমায় আনিয়েছি এটা নেভাদা জানুক তা আমার ইচ্ছে নয়।'

'বেশ,' আমি বললাম, 'আজ রাত বারোটা নাগাদ বেভার্লি হিলস হোটেলে থাকব।'

'বেশ, আমি বেভার্লি হিলস হোটেলে উঠব, রাত বারোটা নাগাদ ওখানেই চলে এসো।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

'মহিলাটি কে জানতে পারি?' ম্যাগাজিনের পাতা থেকে চোখ তুলে জানতে চাইল মণিকা।

'অবশ্যই পারো, উনি আমায় বাবার বিধবা স্ত্রী। শোন মণিকা, হাতে সময় বেশি নেই, জামাকাপড় সব গোছগাছ করে ব্যাগে ভরো। আমাদের এখুনি রওনা হতে হবে। তোমায় বাড়িতে রেখে আমি প্লেন ধরতে বেরোব। ব্যবসার কাজে আজ রাতেই আমার লস এঞ্জেলস যেতে হবে।'

'সেকি!' কাঁদো কাঁদো গলায়, বলল মণিকা, 'তুমি কথা দিয়েছিলে পুরো দু'হপ্তা হনিমুনে কাটাবে, তার মধ্যে আর কোথাও পা বাড়াবে নয়। সবে পাঁচটা দিন কেটেছে। এখনই চলে যাবে? লোকে কি ভাববে?'

'কাজ পড়লে দিন তারিখের হিসেব মেনে চলা যায়না। মণিকা, তাছাড়া কে কি ভাবল না ভাবল তাতে আমার কি আসে যায়?'

'না, আমি যাব না!' বাচ্চা মেয়ের মত কান্না জুড়ল মণিকা, রাগে জুতোপরা পা ঠুকতে লাগল মেঝেতে।

'না যেতে চাওত থাকো!' গলা চড়িয়ে বললাম, 'আমি গাড়ি আনতে যাচ্ছি তার মধ্যে তৈরি হয়ে নাও। ফিরে এসে তৈরি হওনি দেখলে তোমায় এখানে রেখে আমি একাই চলে যাব দেখে নিয়ো। আমায় চিনতে তোমার এখনও বাকি আছে, খুকুমণি!'

গাড়ি নিয়ে কেবিনের সামনে এসে দু'বার হর্ণ দিতে মণিকা ব্যাগ হাতে ছুটে বেরিয়ে এল। গোটা পথ একটি কথাও না বলে গোমড়া মুখে বসে রইল সিটের কোণে।

বাড়ির দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে এঞ্জিন চালু করতে মুখ [illegible] গলায় জানতে চাইল, 'তুমি কবে নাগাদ ফিরবে?'

'সেটা যে কাজ হাতে নিয়ে যাচ্ছি তা শেষ হবার ওপর নির্ভর করে, তবে যাতে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি সেই চেষ্টাই করব।'

'না, না আমার জন্য তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই,' বলে মণিকা আর দাঁড়াল না। নতুন বিয়ের কনেটি হাত নেড়ে বিদায়টুকুও জানালনা, গটগট করে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

মেজাজটা তেতেপুড়ে ছিল, আমার ওয়াকো-র ককপিটে বসে জমি থেকে পঁচিশ হাজার ফিট ওপরে ওঠার পরে মেজাজ খানিকটা ঠাণ্ডা হল।

৫

পুরু নীল কাগজে মোড়া স্ক্রিপ্টখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল রিণা। আমার চোখ আপনিই গিয়ে পড়ল তার ওপর, দেখলাম সময় তার সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটাও কেড়ে নিতে পারেনি। আগের মতই লম্বা পাতলা ছিপছিপে বেতের মত শরীর তার বজায় রয়েছে, গিরিখাতের ধারে মুখ উঁচু করা পাশাপাশি একজোড়া পাহাড় চুড়োর সঙ্গে আজও তার স্তনের তুলনা করতে মন চায়। কিছুই কি পাল্টায় নি? হ্যাঁ, পাল্টেছে, পাল্টেছে তার চোখের চাউনি। রিণার চোখের চাউনিতে আজ নিশ্চয়তা ফুটেছে যা আগে দেখিনি। 'এসব পড়ার ধাত আমার নেই বললেই চলে,' স্ক্রিপ্টখানা পাশে টেবলে রেখে বললাম।

'জানতাম তুমি এমনি কিছু বলবে,' মুচকি হাসল রিণা, 'তাই ছবিটা তোমার দেখাবার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছি। ওরা সবাই তোমার জন্য বসে আছে।'

'আচ্ছা সে হবে'খন। এখন তুমি এখানে কতদিন আছো তাই বলো।'

'ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পর থেকেই বলতে পারো, তাও প্রায় দেড়বছর ত বটেই।'

'এতদিন নেভাদার ওখানেই আছ?' ঘাড় নেড়ে সায় দিল রিণা।

'রাতে ওর পাশে শোও?'

'না শোবার কি আছে? নেভাদা আমার মনের মতন পুরুষ।'

'আর তুমি?' জানতে চাইলাম, 'তুমিও কি নেভাদার মনের মতন মেয়েমানুষ?'

'আমার ত তাই মনে হয়,' আমার চোখে চোখ রেখে জবাব দিল রিণা। 'তবে কে কার মনের মত কিনা তাতে কিছুই যায় আসেনা।'

'জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তাই জিজ্ঞেস করলাম,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কোন আকর্ষণে এতদিন এখানে পড়ে আছ তাই ভাবছি।'

'তুমি যা ভাবছ তা নয়,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল রিণা।

'তাহলে কি টাকা কড়ির ব্যাপার?'

'তাও নয়,' ঘাড় নাড়ল রিণা।

'আসলে ও একজন খাঁটি মানুষ। দেখলাম এমনি মানুষই আমার দরকার। ছেলে ছোকরারা আমার উপযুক্ত নয়।'

খোঁচাটা যে আমাকেই দেয়া তা বুঝতে পেরেই এই প্রসঙ্গে ছেদ টানলাম। 'চলো এবার যাওয়া যাক, 'রুক্ষ গলায় বললাম, 'হাতে সময় খুব বেশি নেই।'

অন্ধকার প্রোজেকশন রুমে রিণার ডানপাশে বসলাম, আমার ডানদিকে বসেছে ছবির পরিচালক ভন এলস্টার।

ছবি শুরু হল, নির্দিষ্ট সময়ের পরে শেষও হল। দেখলাম রিণা মিছে কথা বলেনি। সত্যিই এ এক মহান যুগান্তকারী ছবি। অবশ্য একজনের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে সে হল নেভাদা, নেভাদা স্মিথ। দেহ মন নিংড়ানো এক অদ্ভুত সহজাত শক্তিবলে ছবির প্রতিটি মুহূর্ত ধরে রেখেছে সে যা প্রতিভাত হয়েছে পর্দার বুকে। যতদিন ছোট ছিলাম ততদিন নেভাদার এই অদ্ভুত শক্তি আমি অনুভব করেছি। কিন্তু ছবির পর্দায় সে শক্তির প্রকাশ আরও বিশাল। আরও ব্যাপক। গল্পের শুরুতে নেভাদা যখন ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে তখন তার বয়স মাত্র ষোল। গল্পের শেষ মুহূর্তে সে যখন ঘোড়া ছুটিয়ে উধাও হচ্ছে পাহাড়ের বুকে তখন সে পঁচিশ বছরের পরিপূর্ণ যুবক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়। ছবি দেখতে দেখতে তার আসল বয়স কত তা একবারও মনে এলনা।

ছবি শেষ হতে সিগারেট ধরিয়ে বুক ভরে দম নিলাম। এতক্ষণ টান টান বসে থাকার উত্তেজনায় হাঁটু দপদপ করছে।

'দেখলাম আপনার ছবি,' ছবির পরিচালক ভন এলস্টারের দিকে তাকালাম, 'কিন্তু নিউ অর্লিয়নস-এর বেশ্যাপট্টির ঐ বাড়িউলি মাসি আর জেলপালানো আসামির মেয়ে ছাড়া ছবিতে নারীচরিত্র একটিও নেই এটাই কেমন অদ্ভুত লাগছে।'

'আমি নিরুপায়, মিঃ কর্ড,' ভন এলস্টার হাসলেন, 'ওয়েস্টার্ণ ছবিতে কিছু কিছু জিনিস বাদ দিতে হয় তার মধ্যে একটি হল নারী চরিত্র।'

'কেন?'

'কারণ দর্শক ছাড়াও ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে যারা জড়িত তারা চায় গল্পের নায়কের চরিত্রবান শক্তিশালী, শত্রুজয়ী আর পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বজায় থাকুক। নায়ক হাজারটা অপরাধ করুক ক্ষতি নেই। কিন্তু বিয়ের আগে কুমারীর সঙ্গে সহবাসজনিত অপরাধ তাকে দিয়ে করানো চলবে না।'

'বাঃ বেশ বলেছেন,' হেসে বললাম, 'আরেকটা প্রশ্ন করব তার জন্য আগে থেকেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি। যেভাবে ছবিতে মিউজিক জুড়েছেন সেইভাবে চরিত্রগুলোকে দিয়ে কথা বলাতে তো পারেন?

'সে ত আমিও চাই,' ভন এলস্টার বললেন, 'কিন্তু নির্বাক ছবির প্রোজেকশন স্পিড সাউণ্ড ফিল্ম বা টকির প্রোজেকশন স্পিডের চেয়ে আলাদা। বিভিন্ন চরিত্রের ডায়লগের স্পিডে টকি ফিল্মের প্রোজেকশন হয়, কিন্তু নির্বাক ছবির প্রোজেকশন স্পিড আরও দ্রুত, ডায়লগ আর গল্পের অ্যাকশনের ওপর নির্ভরশীল।'

কিছু না বুঝে যন্ত্রের মত মাথা নাড়লাম, সব না বুঝলেও ওঁর কথায় যুক্তি আছে এটুকু বেশ বুঝতে পারছি। আর সব কারবারের মতই এই শিল্পের ভেতরেও যে প্রবৃত্তি আছে তাও বুঝতে পারছি, আর এও বুঝতে পারছি যে এই কারবার আর প্রবৃত্তি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে তুলছে।

'আমার সঙ্গে হোটেলে চলুন।' ভন এলস্টারকে বললাম, 'এ ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা বলার আছে।'

'রাত চারটে বাজে,' বাধা দিয়ে রিণা বলল, 'তাছাড়া নেভাদাকে বাদ দিয়েই এসব কথাবার্তা চালানো কি ঠিক হচ্ছে?'

'বেশ ত,' সহজগলায় বললাম, 'আমি হোটেলে ফিরে যাচ্ছি, কাল সকাল আটটায় তুমি ওঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

'আটটা হলে ত ভালই হয়,' বলল রিণা।'

'মিঃ কর্ড, আমি আপনাকে আপনার হোটেলে নামিয়ে দিচ্ছি।'

'মিঃ কর্ড,' এলস্টার বললেন, 'চলুন বাড়ি ফেরার পথে আপনাকে হোটেলে নামিয়ে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ,' আড়চোখে রিণার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'রিণা ফেরার পথে আমায় নামিয়ে দেবে।'

গাড়িতে ওঠার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখ বুঁজে রইল রিণা, হোটেলের কাছাকাছি এসে বলল, 'ভন এলস্টার ঘাবড়ে গেছেন। উনি আগে কখনও টকি ফিল্ম তোলেন নি। এটা দিয়ে হাত পাকাতে চান। এটা বড ছবি, একবার লেগে গেলে পরপর কাজ হাতে আসবে।'

'তুমি বলছ উনি ঘাবড়ে গেছেন?'

'এই টকি ছবি শুরু হবার পর গ্রেটা গার্বো থেকে জন গিলবার্ট সবাই ঘাবড়েছেন। টকি ছবিতে শেষপর্যন্ত ওঁদের ক্যারিয়ারের কি হাল হবে তা কেউ জানেন না। আমি শুনেছি জন গিলবার্টের গলা খুব বাজে শোনায় বলে এম জি এম ওদের পরের কোনও ছবিতে ওঁকে নেবে না ঠিক করেছে।'

'নেভাদার গলা কেমন আসছে?'

'ভাল খুবই ভাল, এইত সেদিন ওর সাউণ্ড টেস্ট হল।'

'যাক, একটা দুর্ভাবনা গেল।'

'তুমি এ ছবিটা করবে?'

'আমার করার মত কিই-বা আছে?'

'বুক বেঁধে এগোলে প্রচুর টাকা কামাতে পারতে।'

'দরকার কি,' আমি বললাম, 'আমি যেভাবেই হোক প্রচুর টাকা কামাব।'

'তুমি একটুও পাল্টাওনি।' ঠাণ্ডা হয়ে এল রিণার কণ্ঠ। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'কি, কথাটা ঠিক বলছি ত?'

'কেন পাল্টাতে যাব শুনি,' জোরে ঘাড় নাড়লাম, 'কোন হতভাগা পাল্টায়?' তার

হাতখানা ধরে বললাম, 'আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে ঐ নেভাদা। এই আপদটাকে বিদেয় করতে মনকে কতটা তৈরি করেছো?'

'যদি সত্যিই কাজে আসে তাহলে সবকিছু বিলিয়ে দিতে আমি তৈরি,' চোখে চোখ রেখে জবাব দিল রিণা। এই এক কথা এর আগে আরও কত মেয়ের মুখে শুনেছি তার হিসেব দিতে পারবনা। একটা চাপা দুঃখবোধ উঠে এল গলা পর্যন্ত, রিণার হাত ছেড়ে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে।

'জোনাস, জোনাস,' খোলা দরজা দিয়ে ঝুঁকে বলল রিণা, 'তুমি কি মনস্থির করেছো?'

'এখনও নয়,' চাপা গলায় জবাব দিলাম,' আরও অনেক কিছু আমার এখনও জানতে আর বুঝতে বাকি।'

'ওঃ তাই বলো,' হতাশ ভঙ্গি করে পিছিয়ে গেল রিণা।

'তাই বলে মন খারাপ কোরনা,' আমি বললাম, 'ছবিটা তুলব ঠিক করলে সবার আগে আমিই টাকা নিয়ে আসব।'

'তোমায় যতদূর জানি,' রিণা বলল তাতে আর কিছু আশা করিনা।' বলে শোফারকে ইশারা করে গাড়ি স্টার্ট করতে বলল।

রিণার লিমুজিন চলে যেতে হোটেলে ঢুকলাম। ঘরে এসে স্ক্রিপ্ট পড়তে বসলাম। পড়া শেষ হতে পাক্কা দেড়ঘন্টা লাগল। কাগজপত্র রেখে বিছানায় শুতে এসে দেখি রাত শেষ হয়ে এসেছে। ছ'টা বাজতে দেরি নেই।

৬

টেলিফোনের একটানা আওয়াজ মাথার ভেতর একটানা হাতুড়ি ঠুকছে। চোখ মেলে তাকালাম হাতঘড়ির দিকে—কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাড়ে সাতটা। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুললাম।

'হেলো জোনাস কর্ড বলছি......'

'গুড মর্ণিং, মিঃ কর্ড, ভন এলস্টার বলছি। আপনার কথামত সাতসকালে চলে এসেছি, অবশ্য এখনও আটটা বাজেনি। আমার সঙ্গে মিঃ নর্ম্যানও এসেছেন, আমরা একতলায়, হোটেলের লবিতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি, যখন বলবেন তখনই.........

'থামুন মশাই!' আমি দাবড়ে উঠলাম, এই নর্মানটা কে আবার! কাল ত ওকে দেখিনি!'

'হেঁজিপেঁজি লোক নন, মিঃ কর্ড, উনি নর্মান পিকচার্সের মালিক বার্ণাড বি নর্মান। কাল যে ছবিটা দেখলেন সেটা এঁরাই বাজারে ছাড়ছেন।'

'তা ওঁকে এখানে এনেছেন কেন?'

'নেভাদার সঙ্গে ত আপনার দেখা করার কথা, তার আগে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে আপনার সুবিধে হবে ভেবেই ওঁকে নিয়ে এসেছি।'

'তার মানে? শুনুন মিঃ এলস্টার, আপনার কথার মানে এখনও আমার মাথায় ঢুকছেনা।'

'এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না? মিঃ কর্ড, আপনি নেভাদার সঙ্গে যে

চুক্তি করতে চলেছেন মিঃ নর্মান সে ব্যাপারে আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন এটাই বলতে চাইছি।'

'সাহায্য? কেন, কোন কম্মে? শুনুন মিঃ এলস্টার, নেভাদাকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি, ওর সঙ্গে আমার কাজের ব্যাপারে আর কারও সাহায্যের দরকার হবে না।'

'তাহলে আগে ভাগেই কথাটা জানিয়ে রাখছি। মিঃ কর্ড,' চাপাগলায় ভন এলস্টার বললেন, 'নেভাদাকে নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। কিন্তু ওর এজেন্ট ভ্যান পিয়ার্স খুব চৌখোস লোক। ওর মুখোমুখি হবার আগে মিঃ নর্মান কতগুলো ব্যাপার আপনাকে আগাম জানিয়ে রাখতে চান।'

রিসিভার হাতে রেখেই সিগারেট ধরালাম। ভন এলস্টার লোকটা যত ভাল পরিচালকই হোক সে যে যথেষ্ট বুদ্ধিমান তাতে সন্দেহ নেই। আমার টাকার গন্ধ পেয়েই কাল রাতেই ওর মনিবকে হুঁশিয়ার করেছে। তবে এদের মতলবটা এইমুহূর্তে আঁচ করতে না পারলেও নেভাদার পক্ষে এরা কেউ যে ভাল নয় তা বেশ আঁচ করতে পারছি। নেভাদাকে তাহলে এই দুষ্টচক্রের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।

'শুনুন মিঃ এলস্টার,' গলা অল্প চড়ালাম, আপনারা এখন নিচে লবিতেই বসে গপ্পোগুজব করুন, কফি খান, ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টান, আমি খানিক আগে চোখ মেলেছি, এখনও টয়লেটে যাইনি। সব সেরে জামাকাপড় পাল্টে খবর দেব। ততক্ষণ একদম বিরক্ত করবেন না বলে রাখছি।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে আবার রিসিভার তুললাম, হোটেলের অপারেটরকে একটা নম্বরে লাইন দিতে বললাম। খানিক বাদে টনি মোরোনির চেনা ঘুম-জড়ানো গলা কানে এল 'হেলো।'

'টনি, আমি জোনাস বলছি। সাতসকালে তোমাব ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য দুঃখিত।'

'আরে ও ঠিক আছে, ঠিক আছে,' টনি বলল, 'হপ্তায় এক আধদিন সাতসকালেই আমার ঘুম ভাঙ্গে। ভাল কথা, জোনাস। খবরের কাগজে তোমার বিয়ের খবর পড়লাম। আমার অভিনন্দন নিও।'

'ধন্যবাদ,' বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কাল এখানে আসার পর থেকে মণিকার কথা একবারও মনে আসেনি। 'হেলো টনি, নেভাদা স্মিথের নতুন ছবি তোলার টাকা কি তোমরা ধার দিয়েছো?'

'কোন ছবি, 'পলাতক?'

'হ্যাঁ।'

'হ্যা। আমরাই দিয়েছি।'

'ছবির গল্প কেমন?'

'এককথায় অসাধারণ, টকি হলে আরও ভাল হত। তবু বলব, অসাধারণ ছবি।'

'এত ভালই যখন বলছ, তখন ধারের টাকাটা এখনই ফেরত পাবার জন্য তাগাদা করছ কেন?'

'তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও, জোনাস,' টনি বলল, 'এর পেছনে তোমার কি স্বার্থ?'

'সত্যি বলতে কি, তা আমি নিজে এখনও জানি না, টনি। তবে নেভাদা আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু। ব্যাপারটা কি ঘটছে আমি তাই জানতে চাই। তোমরা এখনই টাকার জন্য তাগাদা করছ কেন?'

'আমাদের কাজকর্ম কিভাবে চলে তা ত তোমার অজানা নাই, জোনাস,' টনি বলল, 'নিজের বিষয় সম্পত্তিগত জামানত নর্মান পিকচার্স কোম্পানির গ্যারান্টির ওপর ভরসা করে আমরা নেভাদাকে টাকাটা ধার দিয়েছিলাম। এখন মাঝখান থেকে বার্ণি নর্মান কিছু পুরোনো ছবি নতুন করে টকিতে তুলবে বলে নিজে ধার চাইছে আর তাই নেভাদাকে টাকা ধার দেবার আগে যে গ্যারান্টি দিয়েছিল তা তুলে নিতে চাইছে। তুমিই বলো এক্ষেত্রে নেভাদার কাছে ধারের টাকা ফেরত চাওয়া ছাড়া আমাদের আর কি করণীয় থাকতে পারে?'

টনির কথায় গোটা ব্যাপারটা জলের মত স্পষ্ট হয়ে গেল। ভন এলস্টার আর বার্ণি নর্ম্যান আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে নিচে লবিতে বসে আছে। আমি নেভাদাকে ছবির ব্যাপারে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে এসেছি আঁচ করে ওরা আগে ভাগে এসে হাজির হয়েছে আমাকে হাত করতে। উদ্দেশ্য একটাই, নেভাদা যাতে টাকাকড়ি না পেয়ে পথে বসে।

'দেনার টাকা শুধতে না পারলে নেভাদার কি হবে?' আমি জানতে চাইলাম।

'সেক্ষেত্রে প্রথমে ছবি, তারপরে ওর বিষয়সম্পত্তি সব আমাদের দখলে আসবে।' টনি বলল, 'ঐ ছবিতে বাণি নর্মান চার লাখ ডলার চেয়েছে, তাই ছবিটা ওকেই দেব। ছবি বাজারে ছাড়বার পরে ওরা যা মুনাফা করবে, তা থেকে আমাদের পাওনা টাকা শোধ করবে। আমাদের পাওনা মেটানোর পরে উদ্বৃত্ত যা থাকবে তা পাবে নেভাদা।'

'আরেকটা কথা, টনি, নেভাদার এই ছবিটা টকিতে তুলতে কত খরচ পড়তে পারে?'

'তা দশ লাখ ডলার ধরে রাখো।'

'এত টাকা ঢেলে লাভ হবে?'

'ছবি তোলার ব্যাপারে ব্যবসায়িক অভিমত না দিলেও এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট যা পেয়েছি তাতে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি এই ঘোড়ার ওপর বাজি ধরা যায়।'

'অশেষ ধন্যবাদ টনি, এবার একটা অনুরোধ। পাওনা টাকা আদায়ের আইনানুগ ব্যবস্থাগুলো দিন দু'একের জন্য মুলতুবি রাখো। এ বিষয়ে আজ কিংবা কাল খোলাখুলিভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলব। বার্ণি নর্মান নিজের গ্যারান্টি তুলে নিয়েছে নিক, তার জায়গায় হয়ত আমিও গ্যারান্টি দিতে পারি।'

'তাতে তোমার আরও লাখ দশেক খসবে।'

'তা খসে খসুক, সেজন্য আমি তৈরি আছি। আচ্ছা, রাখছি তাহলে।'

'পরে কথা হবে,' বলে টনি লাইন ছেড়ে দিল। হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তে হাতটা আপনিই চলে যাচ্ছিল টেলিফোনের দিকে, কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে হাত গুটিয়ে নিলাম।

ভন এলস্টার আর বার্ণি নর্মান দুই শুয়োরের বাচ্চা আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে নিচে লবিতে বসে আছে। থাকুক বসে। ওদের সঙ্গে এত সহজে আমি দেখা করছিনা। তার চেয়ে এই ফাঁকে চানটা সেরে নিই ভেবে বাথরুমের দিকে পা বাড়াতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

'হেলো, মিঃ কর্ড? ভন এলস্টার বলছি লবি থেকে। মিঃ নর্মানকে নিয়ে আমি এখনও বসে আছি। ইয়ে হয়েছে......' আচমকা গলা খাদে নামাল এলস্টার যেন দারুণ মতলব আঁটছে এমনি ভাবে বলল, 'নেভাদা ওর এজেন্টকে নিয়ে একটু আগে এলিভেটরে ঢুকল, রিণাও এসেছে ওদের সঙ্গে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। ওরা আমাদের দেখতে পায়নি।'

'ভাল খবর দেবার জন্য অশেষ ধন্যবাদ,' গম্ভীর গলায় বললাম।

'কিন্তু আপনার সঙ্গে কখন দেখা হচ্ছে, মিঃ কর্ড?'

'আমার দেখা আর পাবেননা আপনারা,' সহজ স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'যথেষ্ট দেরি হয়েছে। মনে হচ্ছে এবার আমায় নেভাদা আর ওর এজেন্টের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে হবে। আপনার মনিব নর্মান সাহেবকে বলে দেবেন ওঁর কথা আমার মনে থাকবে, দরকার হলে ভবিষ্যতে যোগাযোগ করার কথা ভাবব।'

ভন এলস্টার জবাব না দিয়ে ফোঁস্ করে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর সেই আওয়াজ কানে আসতে বেদম হাসি পেল। ভারি ইচ্ছে হল ওর মুখখানা কেমন দেখাচ্ছে আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার দেখি। রিসিভার নামিয়ে রেখে শার্ট আর ট্রাউজার্স সবে পাল্টেছি ঠিক তখনই বাইরে থেকে টোকা পড়ল দরজায়।

'সোজা ভেতরে চলে এস,' খাটে বসেই জোরগলায় চেঁচিয়ে বললাম। জুতোজোড়া রেখেছি খাটের ওপাশে, সেটা পায়ে গলানোর ধৈর্য এখন নেই, তাই খালি পায়েই চলে এলাম বসার ঘরে। দেখি রিণা কৌচে গা এলিয়ে বসে। আর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নেভাদা, পাশে একজন অচেনা লোক। 'এই যে জোনাস,' বলে হাত বাড়িয়ে দিল নেভাদা।

'নেভাদা!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে তার হাতখানা জড়িয়ে ধরলাম দু'হাতে।

কয়েক মুহূর্ত আমার মুখে দিকে তাকিয়ে নেভাদা বলল, 'তোমার মুখখানা তোমার বাবার মত হয়ে উঠছে জোনাস, বাপ আমার! তোমার খবর কাগজে পড়লাম—প্যারিস থেকে টানা প্লেন-চালিয়ে লস এঞ্জেলসে এসেছো। তারপরে শুনলাম বিয়ে করেছো। তা বৌকে এনেছো ত? এসো, চাঁদ মুখখানা একবার দেখি।'

'এবার আমি একাই এসেছি, নেভাদা ওকে বাড়িতে রেখে এসেছি।' বললাম আমি।

'কাজটা ভাল করোনি,' শাসন করার গলায় বলল নেভাদা। খুঁটিয়ে আমার মুখ দেখে বলল, 'আমি আরও তোমার বৌকে দেখব ভেবেই ছুটে এলাম। ও হ্যাঁ,'....পাশে দাঁড়ানো লোকটিকে ইশারায় দেখিয়ে নেভাদা বলল, 'ইনি আমার এজেন্ট, ড্যান পিয়ার্স।'

'কাল রাতে আপনাদের ছবি দেখলাম।' পিয়ার্সের সঙ্গে করমর্দন সেরে বললাম, 'চমৎকার ছবি হয়েছে। ওটা আবার নতুন করে তুলতে হবে এটাই দুঃখের ব্যাপার।'

'আমি ভেবেছিলাম টকি ছবির মেয়াদ বেশি দিন নেই,' বলল নেভাদা।

'নেভাদা,' নেভাদার এজেন্ট ড্যান পিয়ার্স মুখ খুলল, গলা অল্প চড়িয়ে বলতে লাগল,

'আসলে ঘটনা যা ঘটেছিল তা খুলে বলো।' বলে নিজেই বলতে লাগল, 'আসলে নেভাদা সাইলেন্ট ছবি করতে চেয়েছিল, কিন্তু শুটিং শুরু করার পরে আমরা দেখলাম হিসেবে ভুল হয়ে গেছে, এটা টকি ছবি হলে দারুণ জমবে। আমরা তখন এটাকে টকি ছবি করার কাজে হাত দিলাম কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারলাম না।' .

'কেন?'

'বার্ণি নর্মান আমাদের এগোতে দিলেন না,' বলল পিয়ার্স, 'ঐ সময় ওঁর হাতে একটাই মাত্র সাউণ্ড স্টেজ ছিল আর সেটা উনি ওঁর নিজের একটা ছবি তোলার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। উনি আমাদের বারবার তাড়া দিতে লাগলেন, বললেন 'হয় জলদি কাজ শেষ করুন। নইলে আমি আমার গ্যারাণ্টি তুলে নেব।'

'ছবিটা টকি করতে আর কত লাগবে?'

'তা প্রায় দশ লাখ ডলার ত বটেই,' আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল নেভাদা।

'ঐ টাকার পুরোটাই আমি দেব,' আমি বললাম, 'তবে এক শর্তে। ছবির মালিক হব আমি। আমি যেমন চাইব ঠিক সেভাবে ছবিটা করতে হবে, এ বিষয়ে পরে কোনও তর্কবিতর্ক চলবে না। যাকে যা বলব তাকে মুখ বুঁজে তাই করতে হবে।'

নেভাদার ঘাড় নাড়া দেখে বুঝলাম আমার শর্তে সে রাজি। এই ধাঁচের কথা আগে আমার বাবার মুখে প্রায়ই শুনত সে।

'তা ত হল,' পিয়ার্স বলল, 'কিন্তু ছবি তোলার কাজ কতটুকু জানেন আপনি?'

'কিছুই জানিনা,' স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'আপনারা টকি ছবি তোলার কাজ কতটুকু জানেন?'

ড্যান পিয়ার্সের মুখে উত্তর জোগাল না, তবে আমার মনোভাব যে ও ধরতে পেরেছে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে তা বুঝতে পারলাম।

'তোমার কিছু বলার থাকলে এই বেলা বলে ফ্যালো।'

নেভাদার দিকে তাকিয়ে বললাম।

'আমি কিছুই জানিনা।' শান্ত গলায় বলল নেভাদা, 'তোমাকে একটা দারুণ ঝুঁকির দিকে এগিয়ে দিচ্ছি এইটুকু বেশ বুঝতে পারছি। আমার নিজের হারাবার কিছু নেই।'

'ভুল বললে' চটপট বলে উঠল ড্যান পিয়ার্স, 'ছবি ভাল না হলে তোমার ক্যারিয়ারের দফারফা?'

'হেলো, টনি,' নেভাদা আর তার এজেন্টের সামনেই ব্যাংকে টনি মোরোনিকে টেলিফোনে বললাম, 'ছবি তোলা বাবদ নেভাদাকে যে টাকা ধার দিয়েছো তা শোধ করার সব দায়দায়িত্ব কর্ড এক্সপ্লোসিভসের নামে করে দাও।'

'ধন্যবাদ জোনাস,' টনির হাসির আওয়াজ কানে এল, 'তোমার খোজখবর নেবার ধরন দেখেই আঁচ করেছিলাম শেষকালে উদ্ধার করতে তুমিই এগিয়ে আসবে।'

'তাই বুঝি?'

'নিশ্চয়ই, ব্যাংকের কারবার করি বলেই এটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

'পরে দেখা হবে,' রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ছবি তোলার

কাজে হাত দেবার আগে একটা পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে—ভন এলস্টারকে দিয়ে আমার চলবে না। ওকে আমি ছাঁটাই করলাম।'

'কিন্তু এ লাইনে ওর অভিজ্ঞতা প্রচুর, জোনাস,' নেভাদা বলল, 'আমার প্রত্যেকটা ছবির ওই ছিল পরিচালক। সত্যি বলতে কি, একদিন ঘটনাচক্রে ঐ ভন এলস্টারই আমায় খুঁজে বের করেছিল।'

'ভন এলস্টার একটা পয়লা নম্বরের শুয়োরের বাচ্চা!' আমি বললাম, 'তুমি ঝামেলায় পড়েছো দেখেই ও তোমায় ফাঁসিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিল। আজ সকাল সাতটায় ও নর্মানকে নিয়ে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। নিখরচায় কিছু উপদেশ আমায় দেবে ভেবেছিল। কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে দেখা করিনি।'

'কেমন, এবার বিশ্বাস হল ত?' নেভাদার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল ড্যান পিয়ার্স। 'যখন বলেছিলাম আড়াল থেকে তোমায় ফাঁসাতে নর্মান এলস্টারকে হাত করেছে তখন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারোনি। কথাটা যে সত্যি তা এবার নিজ কানেই শুনলে।'

নেভাদা জবাব না দিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। আমি বললাম, 'নেভাদা, তোমার ভাল লাগুক চাই না লাগুক, আমি কিন্তু একটা নতুন কাজে হাত দিয়েছি। এটা আমার ছবি, আমি যা বলব, তাই হবে শেষ কথা।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল নেভাদা। 'আপনাকে একটা দায়িত্ব দিচ্ছি,' ড্যান পিয়ার্সের দিকে তাকালাম, 'আজ, কাল, পরশু এই তিনদিনে কয়েকটা টকি ছবি আমায় দেখান। পরশুর পরের দিন সবাইকে নিয়ে আমি নিউ ইয়র্ক যাব। টকি ছবি তোলার আসল কাজ ওখানেই শুরু হবে। মঞ্চে নাটক পরিচালনার ভাল অভিজ্ঞতা আছে। মনমতন এমন কাউকে ওখানে থাকার সময় যদি পাই তাহলে তাঁকেও নিতে পারি আমাদের সঙ্গে । দেখা যাক। কি হল নেভাদা তুমি আবার মুখ টিপে হাসছ কেন?'

'ঐ যে খানিক আগে বললাম,' আমার চোখে চোখ রেখে আবার মুখ টিপে হাসল নেভাদা, 'যত দিন যাচ্ছে ততই তুমি চলনে বলনে হুবহু তোমার বাবার মত হয়ে উঠছো। ব্যাপারটা চোখে পড়ছে তাই হাসছি।'

তার বলার ধরনে এবার আমারও হাসি পেল। আর ঠিক এখন ব্রেকফাস্টের ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ভেতরে এল ওয়েটার। নেভাদা আর ড্যান পিয়ার্স দু'জনেই চান করতে ঢুকল বাথরুমে। রিণা ছাড়া এইমুহূর্তে আমার পাশে আর কেউ নেই। রিণা আমার ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে তার চাউনি দেখেই তা বুঝতে পারছি। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে তার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে গলা নামিয়ে কি যেন বলল রিণা তারপরে রিসিভারটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল। 'নাও, তোমার বৌ কথা বলবে।'

'হেলো মণিকা।' মাউথপিসের কাছে ঠোঁট এনে যতদূর সম্ভব মিষ্টিগলায় বললাম।

'চোপ্!' ওপাশ থেকে রেগেমেগে ধমকে উঠল মণিকা, 'ব্যবসার জরুরি কাজে না গেলেই নয় বলে আমায় বুঝিয়ে দিব্যি কেটে পড়লে! এইমাত্র যে মাগিটা ফোন ধরল সেটা কে দয়া করে বলবে? গলা শুনে ত রাস্তার মেয়েছেলে বলেই মনে হল। এবার

নিশ্চয়ই বলবে ইনি তোমার সেই বিমাতা। রিণা, তোমার আগেই যাকে তোমার বাবা বিয়ে করে বসেছিলেন?'

'ঠিকই ধরেছো, মণিকা,' নিজেকে যতদূর সম্ভব শান্ত রেখে বললাম, 'রিণাই ফোন ধরেছিল।'

উল্টোদিক থেকে জোরে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ কানে আসতে বুঝলাম দারুণ চটে গেছে মণিকা।

৭

মরিসে বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট, হালে এম আইটি থেকে এরোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং আর ডিজাইনে স্নাতক হয়েছে। নিজে পেশাদার বিমান চালক না হলেও মরিসে এখনকার সেই প্রজন্মের ছেলে উচ্চাশা পূরণ করতে যারা আকাশে হাঁটতে পারে। এতক্ষণ ধরে ও এমন একটা প্লেনের নকশা আমার সামনে খাড়া করতে চাইছে দুটি মোটর ও একটিমাত্র ডানার ওপর নির্ভর করে যা যে কোনও জিনিস আকাশের বুকে বয়ে বেড়াতে সক্ষম হবে।

'আমার মাপজোকের হিসেব যদি ঠিক থাকে তাহলে পাইলট আর কো-পাইলট ছাড়া কম করে আরও কুড়িজন যাত্রি এই প্লেন বইতে পারবে। একবার ট্যাংকে তেল ভরে নিলে একটানা দু'ঘন্টা স্বচ্ছন্দে উড়তে পারবে।'

'তার মানে এখান থেকে ট্যাংকে তেল ভরে নিউ ইয়র্কে পাড়ি দিলে শুধু মাঝপথে একবার শিকাগোয় নামতে হবে বলছেন?' অবিশ্বাস ফুটল বাজ-এর গলায়, 'না মশাই, এতটা বিশ্বাস করতে পারছিনা!'

'বিশ্বাস করা না করা অবশ্যই আপনার ব্যাপার মিঃ ডালটন,' বলল মরিসে, 'কিন্তু আমার হিসেবে তাই দাঁড়াচ্ছে।'

'তুমি চাইলে বোকার মত টাকা ওড়াতে পারো,' বাজ ডালটন তাকাল আমার দিকে, 'কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই। এমনই দিবাস্বপ্ন দেখতে গিয়ে আমি আগে বিস্তর টাকা নষ্ট করেছি।'

'এইরকম একটা প্লেন বানাতে আপনার কত খরচ পড়বে? মরিসেকে প্রশ্ন করলাম।

'তা কম করে হলেও চার পাঁচ লাখ ডলার ত বটেই,' বলল মরিসে, 'তারপরে উৎপাদন পুরোদমে শুরু হলে ওটা নেমে দাঁড়াবে আড়াই লাখে।'

'একটা প্লেন বানাতে পাঁচ লাখ ডলার খরচ?' কর্কশ গলায় হাসল বাজ, 'এ একেবারে পাগলামো।'

ট্রেনে চেপে সাগরের এপার থেকে রওনা হলে ওপারে পৌঁছাতে লাগে পুরো চারদিন, ভাড়ার পরিমাণ চারশো ডলারের ওপর। এছাড়া আছে খাওয়া। চারদিনের খাওয়া খরচ ধরে যাত্রি পিছু ভাড়া পাঁচশো ডলারের বেশি পড়ে। মরিসের নকশা মেনে যে প্লেন তৈরি হবে তাতে যাত্রিপিছু ভাড়া দাঁড়াবে উড়ান পিছু সাতহাজার ডলার, মালপত্রের ভাড়া নিয়ে ওটাই দাঁড়াবে সাড়ে আট হাজারে। হপ্তায় পাঁচবার ট্রিপ মারতে পারলে

কুড়ি হপ্তারও কম সময়ে আমাদের সব খরচ খরচা উঠে আসবে। তারপর থেকে আমরা লাভের মুখ দেখতে শুরু করব, আর প্রতি উড়ানে যাত্রিদের খাওয়াতেও পারব।'

বেলা প্রায় ন'টা। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ছবির প্রথম সিন আজ 'টেক' হবে, আমি স্টুডিওতে চললাম।'

'চুলোয় যাক ওসব,' রাগে লাল হয়ে উঠেছে বাজ-এর মুখ, গম্ভীর গলায় বলল, 'গত দেড় মাস ধরেই ত দেখছি, কাজকর্ম সব ফেলে যখন তখন ছুটছো স্টুডিওয়। তুমি ওখানে ছবি তুলবে আর আমরা এখানে মাথা ঘামাব প্লেনের নকশা কি হবে তাই নিয়ে। না ঘামিয়েও রেহাই নেই, আরও যারা আছে এ লাইনে আমাদের পেছনে ফেলে তারা এগিয়ে যাবে।'

'মরিসে,' আমি বললাম, 'আপনি প্লেন তৈরির কাজে হাত লাগান।'

'আচ্ছ জোনাস,' বাধা দিল বাজ ডালটন, 'প্লেন তৈরির টাকা জোগাবে কে, ইন্টারকন্টিনেন্টাল এয়ার লাইনস? তা যদি ভেবে থাকো তাহলে বলব খুবই ভুল করেছো। মনে রেখো কোম্পানির অর্দ্ধেক শেয়ারের মালিক আমি নিজে।'

'আর বাকি অর্দ্ধেকের মালিক হল কর্ড এক্সপ্লোসিভস,' আমি জোরগলায় বললাম, 'এছাড়া ইন্টার কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইনস-এর প্লেনগুলো সব পাঁচ লাখ ডলারে বাঁধা আছে কর্ড এক্সপ্লোসিভস-এর কাছে। ধার মেটানোর সময় কিন্তু ঢের আগে পেরিয়ে গেছে বাজ, চাইলে আমি কোম্পানির সব প্লেনের দখল এখনই নিতে পারি।'

আচমকা বেল্টের নিচে এমন ঘা দেব বুঝি ভাবতে পারেনি বাজ তাই কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে সে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে তার মুখের রং স্বাভাবিক হল, চোয়ালের আঁটো পেশি ঢিলে হয়ে হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'তোমার হাবভাব আমার আরও আগে আঁচ করা উচিত ছিল, জোনাস,' হেসে বলল সে, 'যে রাতে জুয়োয় হেরে তোমার হাতে আমার সাধের 'ওয়াকো' প্লেনখানা তুলে দিয়েছিলাম সেদিনই তোমার কাছ থেকে আমার শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল।'

'মিছিমিছি মন খারাপ কোরনা, বাজ,' আমিও এবার পাল্টা হাসলাম। 'তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল প্লেন চালাও। আমি বলি কি প্লেন চালানো তোমার ব্যাপার, তুমি ওটা নিয়েই থাকো, ব্যবসার ব্যাপার স্যাপার সব আমায় বুঝতে দাও। কথা দিচ্ছি আমি তোমায় কোটিপতি তৈরি করে তবে ছাড়ব।' বলে আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে চেপে স্টুডিওর দিকে রওনা হলাম।

গুড মর্ণিং আর গুডলাক মিঃ কর্ড, শুনতে শুনতে গাড়ি নিয়ে ঢুকলাম নরম্যান স্টুডিওয়, পার্কিং লটে আমার নাম লেখা মার্কার চোখে পড়তে গাড়ি পার্ক করে নেমে এলাম। এক্সিকিউটিভ ডাইনিং রুমে ঢুকে এগোতে এগোতে চোখে পড়ল জানালার ধারে এককোণে একটা টেবলে আমার নাম লেখা কার্ড বসানো। কেতার অন্ত নেই। শুধু নাম লেখা টেবলই নয়। স্টুডিওর হাতায় আমার থাকার জন্য একটা বাংলোও আছে। বিলাসবহুল আধুনিক জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণের পাশাপাশি দু'জন তরতাজা

যুবতী সেক্রেটারিও আছে সেখানে। পেছনের দরজা খুলে বাংলোয় ঢুকে অফিসে কিছুক্ষণ বসলাম। সেক্রেটারি দু'জনের মধ্যে স্মার্ট আর চটপটে সুশ্রী চেহারার যুবতীটি আমায় দেখে এগিয়ে এল নোটবই আর পেনসিল হাতে। মাথা অল্প হেঁট করে সপ্রতিভ গলায় বলল, 'গুড মর্ণিং, মিঃ কর্ড, ডিক্টেশন দেবেন?'

'ধন্যবাদ,' ঘাড় নেড়ে বললাম, 'পরে দরকার হলে ডাকব।'

যুবতী আমার টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলল, 'মিঃ কর্ডের অফিস থেকে বলছি। উনি জানতে চাইছেন ওদিকে কাজ কতদূর এগোল।' চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ কানে রিসিভার ঠেকিয়ে রাখল সে তারপরে রিসিভার নামিয়ে বলল, 'প্রোডাকশন টিম বলছে ন'নম্বর স্টেজ-এ রিহার্সাল শেষ। এবার ওরা টেক-এর জন্য তৈরি। ওরা জানতে চাইছে আপনি ওখানে যাবেন কিনা।'

'বলুন আমি যাচ্ছি,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'এদিক দিয়ে সোজা কিছুদূর গেলেই ন'নম্বর স্টেজ-এ পৌঁছে যাবেন। মিঃ কর্ড, বাংলোর বাইরে এসে যুবতী হাত তুলে জায়গাটা বোঝানোর চেষ্টা করল। 'ওটা স্টুডিওর একদম শেষ মাথায় পড়বে।'

লাল ইঁট বাঁধানো পথ ধরে এগোচ্ছি ত এগোচ্ছি পথ আর ফুরোয় না। বিরক্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে চোখে পড়ল স্টুডিও চত্বরের ভেতর একটা বাড়ির গায়ে কে যেন একখানা বাইসাইকেল ঠেশ দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সিদ্ধান্ত নিতে সময় নষ্ট না করে এগিয়ে এসে আশেপাশে তাকালাম। ধারে কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে সাইকেলে চেপে এগোলাম। খানিকদূর যেতে না যেতেই কানে এল পেছন থেকে চিৎকার। ঘাড় না ফিরিয়ে সাইকেলের মালিকের উদ্দেশে হাত নেড়েই স্পিড বাড়িয়ে পাগলের মত ছুটলাম।

ন'নম্বর স্টেজটা স্টুডিওর শেষমাথায় হওয়ায় সব চাইতে বড় যে সুবিধে হয়েছে তাহল আশপাশের স্টুডিওর আওয়াজ বা বাইরের হৈ হল্লা এখানে পৌঁছোয় না।

একটা লোক ন'নম্বর স্টেজ-এর দরজার পাল্লা খুলছিল। সময় মত ব্রেক না চাপায় আমি সাইকেল নিয়ে হুড়মুড় করে প্রায় তার গায়ের ওপর এসে পড়ি আর কি। লোকটা ঘুরে দাঁড়াতে দেখি বার্ণি নরম্যান।

'কি ব্যাপার, মিঃ কর্ড,' বার্ণি বললেন, 'আপনি আবার কষ্ট করে সাইকেলে চাপতে গেলেন কেন, টেলিফোনে বলে দিলেই আমরা গাড়ি পাঠিয়ে আপনাকে নিয়ে আসতাম।'

'হাতে সময় ছিলনা বার্ণি, তাই এভাবে এ আসতে বাধ্য হয়েছি,' আমি বললাম। সাইকেলটা ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে বার্ণির সঙ্গে ঢুকলাম স্টুডিওর ভেতরে।

স্টুডিওর ভেতরে নিউ অর্লিয়নস-এর বেশ্যাবাড়ির সেট, সেই বাড়ির মালকিন রূপসী মিস প্লুভিয়ারের কাছে এসেছে কিশোর ম্যাক্স তাঁর দেহরক্ষির চাকরির উমেদার হয়ে। দু'জনের প্রথম দেখা, কথাবার্তা, এই হবে আজকের শুটিং-এর বিষয়।

বাড়িউলি মিস প্লুভিয়ারের রোলেখ আছে সিন্থিয়া র‍্যান্ডাল, বার্ণি নরম্যানের মতে সেরা অভিনেত্রী। ওর মত এক সেক্স অ্যাপিল বা যৌন আবেদন আর কোনও চলচ্চিত্র

অভিনেত্রীর মধ্যে নেই। ঢল ঢল যৌবন নাকি গলে গলে পড়ে তার অঙ্গে। তবে বার্ণির এই সিন্থিয়া প্রশস্তি আমি মানিনা। স্তনের গড়ন যার ভাল নয় সে মেয়ে আমার ভাল লাগেনা তা তার মুখশ্রী যত সুন্দরই হোক না কেন। এদিক ওদিক তাকাতে চোখে পড়ল সেট-এর একদিকে পাতা ড্রেসিং টেবল-এর সামনে বসে সিনথিয়া। দু'জন মেকাপ ম্যান তার মুখে রং মাখাচ্ছে, একজন হেয়ার ড্রেসার চালু ফ্যাশনে তার চুল বেঁধে দিচ্ছে।

সেট-এর আরেক কোণে আমার দিকে পেছন ফিরে ম্যাক্স স্যাণ্ড চরিত্রের শিল্পী নেভাদা কথা বলছে রিণার সঙ্গে। আমি কাছে যেতেই ঘুরে দাঁড়াল নেভাদা আর তার মুখের দিকে চোখ পড়তে অদ্ভুত ঠাণ্ডা স্রোত মগজের ভেতর বয়ে জাগিয়ে তুলল আমায় ছোটবেলার স্মৃতি। এই কাহিনীর গোড়াতেই উল্লেখ করেছি নেভাদাকে যখন প্রথম দেখি তখন আমি ছিলাম নিতান্তই শিশু। তার নিজের বয়সও সেসময় ছিল কম। কিন্তু মেকাপ নেবার ফলে সেদিন তার বয়স যা ছিল আজ তার চেয়েও কম দেখাচ্ছে। কিভাবে নেভাদা এটা করেছে জানিনা; শুধু চেহারাই নয়। তার দু'চোখের মণিতেও এইমুহূর্তে ঝিলিক দিচ্ছে কমবয়সী ছেলেদের চাউনি।

'এসেছো জুনিয়র?' মৃদু হাসল নেভাদা, 'তাহলে এবার শুরু করা যাক।'

'হ্যাঁ,' অবাক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললাম, 'এবার শুরু করা যাক।'

'সবাই যে যার জায়গায় যান।' বার্ণির সহকারীদের মধ্যে একজন হেঁকে উঠল।

'এবার আমায় যেতে হবে,' বলে সেটের দিকে এগোল নেভাদা। মোহাবিষ্ট চাউনি রিণার দু'চোখে। সেট-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে। খানিকটা গোটানো তার নিয়ে একজন ঠেলেঠুলে যাচ্ছে, তাকে পাশ কাটাতে গিয়ে আরেকজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি আর কি। কিছু একটা হয়ে যাবার আগে আমি নিজেই সরে এলাম সেট থেকে। হাঁটতে হাঁটতে সাউণ্ড বুথ-এর গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম, এখানে দাঁড়িয়ে সেট-এর কুশীলবদের হাত পা মুখ নাড়া সব পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, কানেও আসছে তাদের ডায়ালগ, তখনই চোখে পড়ল বুথ-এর ভেতরে সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট প্রায় হামলে পড়েছেন সামনে কন্ট্রোল বোর্ডের ওপর, মাথায় বাঁধা বেল্টে ইয়ারফোনের ঠুলি দুটো গোঁজা দু'কানে, ঐ অবস্থায় তিনি একের পরে এক ডায়াল ঘুরিয়ে চলেছেন। কিন্তু হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি যে মনের মত ফল পাচ্ছেন না তাঁর চোখমুখ দেখে তা বুঝতে কষ্ট হলনা। চাপাগলায় প্রায় ফিসফিস করে শপথ উচ্চারণ করছেন ভদ্রলোক, আর প্রাণপণে ডায়াল ঘোরাচ্ছেন।

'আপনার মেশিন বিগড়েছে বুঝি?' ভদ্রলোকের পেছনে এসে জানতে চাইলাম। টকি ছবি তুলতে এত খরচ কেন হয় তা এবার জলের মত পরিস্কার হয়েছে আমার কাছে, দশবার চেষ্টা করেও একটা মনের মত শট নিতে পারেননি পরিচালক, তবু আবার চেষ্টা করছেন তিনি।

'মেশিন বিগড়ায় নি,' বলে সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট তাকালেন আমার মুখের দিকে। সেই চাউনি দেখে বুঝলাম আমি কে তা জানতে তাঁর বাকি নেই।

'আজ্ঞে গণ্ডগোল অন্য জায়গায়,' ভদ্রলোক বললেন, 'এত চেষ্টা করেও গলার আওয়াজ স্বাভাবিক করতে পারেছিনা।'

'গলার আওয়াজ মানে নেভাদার?'

'আজ্ঞে না, ওর নয়,' সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট বললেন, 'মুশকিল বেঁধেছে ম্যাডামকে নিয়ে। বড্ড খোলা আর নাকি শোনাচ্ছে ওঁর গলা, কি করব ভেবে পাচ্ছিনা।'

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কানে এল নেভাদার গলা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার কথার জবাব দিলেন শ্রীমতি র‍্যানডাল। শুনে মনে হল একটা একটা ক্ষুধার্ত মেনি বেড়াল রান্নাঘরে ঢুকতে না পেয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদছে। না, বার্ণি নরম্যান লোকটার দেখছি বোধবুদ্ধি বলে কিছুই নেই। একি সেরা অভিনেত্রীর গলা, না কি কাতর আর্তনাদ? এই আর্তনাদ কানে গেলে শরীর তেতে গরম হওয়া দূরে থাক গরম শরীর ঠাণ্ডা মেরে যায়। ছিঃ! নিউ অর্লিয়েনস হল লোচ্চাদের স্বর্গ, সেখানকার বেশ্যাবাড়ির মালকিন-এর গলা এমন বিশ্রি হবে এত ভাবাই যায় না, রেকর্ডিস্ট ভদ্রলোক তাঁর ইয়ারফোন খুলে আমার কানে গুঁজে দিয়েছিলেন। সিনথিয়া র‍্যানডালের গলার নমুনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঠুলিজোড়া কান থেকে খুলে আবার তুলে দিলাম তাঁর হাতে। তারপরে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম সেট-এর ভেতরে।

'কাট্!' কে যেন জোরগলায় চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে থেমে গেল। দু'চোখে অবাক চাউনি নিয়ে সবাই তাকাল আমার দিকে। যার গলা শুনে বিরক্ত হয়েছি সেই সিনথিয়া আমায় দেখে ঠোঁটে মৃদু হাসি ফোটালেও তার দু'চোখের চাউনিতে ফুটে ওঠা ভীতি আমার নজর এড়াল না।

'মিঃ কর্ড!' আমায় সেটে ঢুকতে দেখে দূর থেকে ছুটে এলেন বার্ণি নরম্যান। সিনথিয়ার প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কোথাও কোনও গোলমাল হয়েছে?'

'হ্যা, হয়েছে' সিনথিয়া র‍্যান্‌ডালকে ইশারায় দেখিয়ে বললাম, 'এটাকে আমি ছাঁটাই করছি, এক্ষুণি এইমুহূর্তে ভাগান একে।'

'তা হয় না, মিঃ কর্ড!' জোরগলায় বললেন বার্ণি, 'এই ছবিতে অভিনয় করবেন বলে উনি আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন।'

'বুঝতে পারছি আপনার কথা, কিন্তু আমার সঙ্গে ওঁর কোনও চুক্তি হয়নি।'

'মিঃ কর্ড, আপনি কি করছেন তা জানেন না!' ভয়ে বার্ণির টকটকে ফর্সা মুখ ততক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, 'এটা আপনার মোটেই উচিত হচ্ছে না। মিস র‍্যান্‌ডাল কতবড় নামী শিল্পী তা আপনার জানা নেই বলেই—'

'উনি ঠাকুর দেবতা পেটে ধরলেও আমার কিছু যায় আসেনা,' একপলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চোখ তুলে চাইলাম। 'ঠিক পাঁচ মিনিট সময় আপনাকে দিচ্ছি তার মধ্যে ওঁকে যদি এই সেট থেকে সরিয়ে নেন ত ভাল। নয়ত ছবি তোলার কাজ আমি শুধু বন্ধ করব তাই নয়। সেইসঙ্গে চুক্তিভঙ্গ আর ক্ষতিপূরণের দাবিতে আপনার নামে এমন মামলা জুড়ব যা ভাবলে আপনার আক্কেল গুড়ুম না হয়ে যাবে না!'

ফাঁকা সেটে নিজের নাম লেখা ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আছি। দূর থেকে চোখে পড়ল সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট ভদ্রলোক এখনও দু'কানে দুটো ছিপি এঁটে ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন কন্ট্রোল বোর্ডের দিকে। রাত দশটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ আগে, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে শরীর। নিজের অজান্তে দু'চোখ কখন যেন বুঁজে এসেছিল টের পাইনি।

পায়ের আওয়াজ কানে যেতে চট্‌কা ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে ড্যান পিয়ার্স। সিনথিয়ার জায়গায় আর কোনও শিল্পী পাওয়া যায় কিনা টেলিফোনে অন্য স্টুডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই চেষ্টা করে চলেছে।

'কিছু হল?' সরাসরি জানতে চাইলাম, 'কাউকে পেলেন?'

'চেষ্টা ত করছি,' পিয়ার্স বলল, 'কিন্তু তেমন কাউকেই হাতের কাছে পাচ্ছিনা। গ্রেটা গার্বোকে পাবার আশায় এই খানিক আগে কথা বললাম এম জি এম-এর সঙ্গে। কিন্তু ওরা রাজি হল না। স্রেফ বলে দিল গার্বোকে নিয়ে টকি ছবি তোলার পরিকল্পনা ওদের নিজেদেরই আছে। এই অবস্থায় ওঁকে ছাড়া সম্ভব নয় ওদের পক্ষে?'

'মেরিওন ডেভিকে পাওয়া যায় না?'

'সে চেষ্টা করতেও বাকি রাখিনি,' বলল পিয়ার্স, 'চরিত্রটা মেরিওনের খুব পছন্দ হয়েছে ঠিকই কিন্তু টকি ছবিতে কাজ করতে পারবে কিনা তা নিয়ে ওর নিজের মনেই সন্দেহ আছে। এইসব দেখে শুনে এখন মনে হচ্ছে সিনথিয়া র‍্যানডালকে দিয়ে ধরে বেঁধে কাজটা করিয়ে নিলে হয়ত ভাল হত। শুটিং হোক চাই না হোক, স্টুডিওর ভাড়া বাবদ রোজ ত্রিশ হাজার ডলার কিন্তু আপনাকে গুণতেই হবে।'

'সিনথিয়াকে দিয়ে ধরে বেঁধে কাজ হয়ত এখনও করিয়ে নেয়া যায়,' আমি বললাম, 'কিন্তু তারপরের কথাটা একবারও ভেবেছেন? রিলিজ হবার পরে ছবিতে ওর গলার আওয়াজ শুনেই ত সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে; ছবি ক'দিন চলবে? না মশাই, তার চেয়ে ছবির কাজ আমি এইমুহূর্তে বন্ধ করতে রাজি তবু যাকে একবার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি হাতে পায়ে ধরে তাকে আবার ফেরাতে যাবনা।'

'তাহলে বরং দেখি নিউইয়র্ক থেকে কোনও অভিনেত্রীকে নিয়ে আসা যায় কিনা—'

'অত সময় আমাদের হাতে নেই,' আমি বললাম, 'হাতে সময় মাত্র দশদিন, একেকদিন তিন হাজার ডলার স্টুডিওর ভাড়া—

'ভাবলাম তোমার হয়ত খিদে পেয়েছে তাই নিয়ে এলাম,' বলতে বলতে এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসে হাজির হল রিণা।

'আহা, ঠিক এমনি একখানা যদি পেতাম,' স্যাণ্ডউইচ চিবোনোর ফাঁকে আক্ষেপ করল পিয়ার্স।

'তার মানে?' অবাক চোখে তাকালাম পিয়ার্সের মুখের দিকে, 'আপনি রিণাকে ঐ চরিত্রে কাজ করাতে চান, এইত?'

'ঠিক তাই,' হেসে সায় দিল পিয়ার্স, 'এই ত দিব্যি বুঝেছেন। মিস মার্লোর গলা সাউণ্ড ট্র্যাকে এইরকম শোনালে আর দেখতে হবেনা চ্যাংড়া দর্শকরা দলে দলে লাফ

দেবে হলের দোতলার বারান্দা থেকে। বসুন বার্ণি, পাশে বসেছে বার্ণি, তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনার নিজের কি মনে হয়?'

'ড্যান যা বলছে তা অসম্ভব কোনমতেই নয়,' সায় দিলেন বার্ণি।'

'তাহলে চলুন ওকেই ধরা যাক,' বলে উঠে দাঁড়ালাম,' দিনে ত্রিশ হাজার ডলার ভাড়া মানে অনেক টাকা, কিছু না করে তা শুধুশুধু খরচ করা যায় না।'

মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড় করিয়ে চিত্রনাট্য দেখে মিস প্লুভিয়ারের দু'একটা ডায়লগ পড়ার কথা বলতে রিণা প্রথমে ভাবল আমি ঠাট্টা করছি। গলা উতরে যেতে পুরো টিমকে ডাকিয়ে তার স্ক্রিন টেস্ট নিলেন বার্ণি। আমরা যে তাকে নিয়ে সত্যিই ঠাট্টা করছিনা তা ততক্ষণে বুঝেছে রিণা, নেভাদার সঙ্গে তার প্রথম মোলাকাতের শট নিতে নিতে রাত দুটো বাজল।

অভাবনীয় সাফল্যের ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে রিণা, শট নেয়া শেষ হলে তাকে বললাম, 'এখন রাত দুটো, এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি গিয়ে কয়েকঘন্টা ঘুমিয়ে নাও। কাল সকাল ন'টায় শুটিং শুরু হবে, তার আগে ওয়ার্ডরোবে গিয়ে তোমার পোষাকের যা মাপ দেবার দিতে ভুলোনা।'

'আঃ জোনাস,' রিণা বলল, 'ঠাট্টার ত একটা সীমা থাকা দরকার, না কি?'

'আমি যে তোমায় নিয়ে ঠাট্টা করছিনা। তা কি এখনও বোঝনি?' গলা অল্প চড়িয়ে বললাম, 'আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি ঘড়ি ধরে ঠিক সকাল ন'টায় আমরা শুটিং শুরু করব। আমি নই, রিণা তুমিই আমায় টেলিফোনে ডেকেছিলে। কথাটা দয়া করে মনে রেখো।' বলে তাকালাম নেভাদার দিকে, তার দু'চোখে দুর্বোধ্য চাউনি। সেইসঙ্গে তার দু'চোখের অকপট সরলতা আমায় অভিভূত করল।

'ও যাতে সময়মত হাজির হয় তা দেখো,' নেভাদাকে লক্ষ করে বললাম কথাটা আমার নিজের কানেই রুক্ষ ঠেকল।

৮

এক চোখ মেলে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ঠিক দুটো বেজেছে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতরটা যন্ত্রণায় টনটন করতে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ড্যান পিয়ার্স, নেভাদার এজেন্ট ড্যান পিয়ার্স।

'এই যে মিঃ কর্ড, ঘুম ভাঙ্গল? ওফ্ কাল রাতটা যা মেহনত করে কাটল! বলতে বলতে এক গ্লাস টমেটোর জুস বাড়িয়ে দিল সে, 'এটা টুক করে খেয়ে নিন, দেখবেন মাথার ভেতরের জ্যাম ভাবটা কেটে গেছে।'

গ্লাসটা নিয়ে কয়েক চুমুকে পানীয়টুকু শেষ করে দেখি ড্যান ঠিকই বলেছে খানিক আগেও মাথার ভেতরে যে চিনচিনে ব্যথাটা শুরু হয়েছিল সেটা আর নেই। চারপাশে তাকিয়ে দেখি বিছানা লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। জানতে চাইলাম, 'মেয়েগুলো গেল কোথায়?'

'আমি ওদের পাওনা মিটিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ভাল করেছেন,' খাট থেকে মেঝেতে নেমে বললাম, 'এবার তাহলে একবার স্টুডিওয় যেতে হয়, ওদের ত সকাল ন'টায় শুটিং শুরু করার কথা।'

'আমি স্টুডিওতে টেলিফোনে বলে দিয়েছি রাত দুটো পর্যন্ত জেগে থাকার ফলে আপনি আজ আর গা তুলতে পারছেন না সম্ভব হলে বিকেলে যাবেন। যা ধকল গেল কাল রাতে।'

জবাব না দিয়ে পিয়ার্সের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলাম, সত্যিই বড্ড ধকল গেছে কাল রাতে।

কাল রাত দুটোর অনেক পরে দু'জনে একই সঙ্গে বেরিয়েছিলাম সেট থেকে। পিয়ার্সের সঙ্গে গাড়ি ছিল না তাই ওকে শহরের মাঝামাঝি এলাকা পর্যন্ত লিফট আমিই দিয়েছি। ফেরার পথে খিদেয় আমাদের দু'জনেরই পেটে আগুন জ্বলছিল। পিয়ার্স নিজেই নিয়ে গেল এক খাবারের ঠেক-এ সেখানে পাতি মোদো মাতালদের মাঝখানে বসে বিফ স্টেক আর বুরবোঁ খেয়ে পেট ভরালাম। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে পিয়ার্স আমায় নিয়ে এল ওর বাড়িতে। এখানে বিছানায় রাতের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য কয়েকটা মেয়ে জোগাড় করল সে। এসব ব্যবস্থা অবশ্য সব এজেন্টই করে। তবু বলব রাতটা কাল বেশ আরামেই কেটেছে।

স্টুডিও থেকে কাল রাতে ফেরার পথে যে প্রচণ্ড রাক্ষুসে খিদে ভর করেছিল সেটা এতক্ষণ বাদে আবার ফিরে এসেছে। শোবার ঘরের লাগোয়া টয়লেটে চান সেরে বেরিয়ে দেখি খানা তৈরি –পিয়ার্সের জাপানি কাজের ছোঁড়াটা আমি চান করার ফাঁকে ডিমের পুর দিয়ে একরাশ সসেজ ভেজেছে। টোস্ট দিয়ে প্রায় ডজনখানেক সসেজ সাবাড় করে একাই চার কাপ কফি খেলাম। অবশ্যই দুধ আর চিনি ছাড়া। কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিতে পিয়ার্স হেসে বলল, 'এখন শরীরটা কেমন লাগছে বলুন।'

'খুব ভাল লাগছে,' বলতে গিয়ে আমিও হাসলাম। সত্যিই অনেকদিন বাদে খুব হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে। কিন্তু কাজের প্রসঙ্গ ভুলে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। কে যেন আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিল। 'গতকাল রাতে কাজকর্মের কথা কি যেন বলছিলেন?'

গতকাল রাতে ফেরার পথে কাজকর্মের কথা হচ্ছিল পিয়ার্সের সঙ্গে। সবে পরিচয় হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে যা আমি সচরাচর করিনা। কিন্তু ড্যান পিয়ার্সকে আর পাঁচটা লোকের চাইতে আলাদা বলেই মনে হয়েছিল। আর তাই আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার প্রতি। অল্প সময়ের আলাপেই বুঝেছিলাম সে যেমন ধুরন্ধর তেমনই ইস্পাতের মত কঠিন, নিজের কি দরকার তা ভালমতই সে জানে। কিছুদিনের জন্য হলেও ড্যান পিয়ার্সকে আমার দরকার।

'আজ সকালেই আমার এজেন্সি এম সি এ-কে বিক্রি করে দিলাম,' হাসতে হাসতে বলল পিয়ার্স।

'কেন?'

'কারণ আপনার সঙ্গে হাত মেলাব, তাই।'

'পিয়ার্স,' আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে আপনি আগে ভাগেই আমার সম্পর্কে একটু

বেশি আশা করে বসেছেন। আমি কিন্তু ফিল্ম লাইনের লোক ত নই, হবার সাধও নেই। বিশেষ ব্যক্তিগত কারণে এই একটি ছবিতে টাকা ঢালছি। এই প্রথম এই শেষ। এ ছবির কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি ত পাততাড়ি গুটিয়ে কেটে পড়ব, তখন আপনি কি করবেন?'

'এত আপনার মুখের কথা,' হাসল পিয়ার্স' কিন্তু আমি জানি ভেতরে ভেতরে এই লাইনের ওপর আপনার এমন টান পড়ে গেছে যে হাজার চেষ্টা করলেও আপনি সরে দাঁড়াতে পারবেন না। শুধু এই একটা নয় জুয়োর মত এরপরে আপনি একের পর এক ছবিতে টাকা ঢালবেন। এ আমার চ্যালেঞ্জ।'

'ধরুন যদি তাই হয় ত আপনি সেখানে আমায় কি সাহায্য করবেন, আমার কোন কাজে আপনি লাগবেন?'

'ফিল্ম লাইনে ছবি তুলতে গেলে যতরকম সমস্যা দেখা দেয় সেসব মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমার আছে,' বলল পিয়ার্স।

'এ লাইনের সব ঘ্যাঁৎঘোঁত আমার জানা। আপনি কাজের লোক, ব্যস্ত মানুষ। আপনার সময়ের অনেক দাম, শুধু স্টুডিও আর শিল্পীদের নিয়ে পড়ে থাকলে আপনার চলবে না। আপনার অনুপস্থিতিতে সেসব আমি সামলাব।'

'এ আর এমন কি ব্যাপার,' অনিচ্ছুক গলায় বললাম, 'মাইনে করা লোক রাখলে এসব দিক সেই-ই সামলাত। এমন কিছু বলুন যা এমনিতে ভাবা যায়না অথচ তাতে আমার দু'পয়সা সাশ্রয় হতে পারে।'

'তাও ভেবেছি,' বলল পিয়ার্স, 'রিণা কাল যেভাবে সব ক'টা টেস্টে উতরেছে তাতে চিত্রনাট্যে কিছু এদিক ওদিক ঘটিয়ে কম করে চার লাখ ডলার ইচ্ছে করলেই আমরা বাঁচাতে পারি।'

'কিভাবে?'

'চিত্রনাট্য ধরে এগোতে গেলে পুরো পাঁচদিন আমাদের বাইরে শুটিং করতে হবে, মিঃ কর্ড,' বলল পিয়ার্স, 'আমি বলব বাইরের কাজ কমিয়ে নিউ অর্লিয়নসের কাজ বাড়ান। ওসব এখানেই একের পর এক ঘটিয়ে দিন। চিত্রনাট্যে অল্প কিছু অদলবদল করতে হবে তাতে। বাইরে শুটিং-এর খরচ অনেক। তার ওপর স্টুডিওর মাইক্রোফোনগুলোর যা হাল। বাইরে ওগুলো কেমন কাজ করবে তা আগে ভাগে হলফ করে কেউ বলতে পারবে না।'

'কিন্তু আপনার কথা মতন চিত্রনাট্যে অদলবদল ঘটালে নেভাদার কাজ যে অনেক কমে যাবে!' পিয়ার্স বলল, 'এখন এজেন্সি বেচে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ও এম সি-এর সম্পত্তি হয়েছে, নেভাদার ভাবনা তাই ওরাই ভাবুক। আপনার মত আমিও টাকা কামাতে এসেছি মশাই, টাকাই এখানে বড় কথা। সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই।'

'আপনাকে কি দিতে হবে?'

'বাঁধা মাস মাইনে নয়,' পিয়ার্স বলল, 'ছবি তুলতে আপনার যা খরচ হবে তার শতকরা দশ ভাগ, সেইসঙ্গে নিজের পকেট থেকে যেটুকু খরচ করব সেটুকু পুষিয়ে দেবেন। ব্যস্ তাহলেই হবে।'

'বেশ, আমি রাজি।'

পিয়ার্সকে নিয়ে যখন স্টুডিওতে এলাম তখন বেলা তিনটে। স্টেজ নাইনে ঢুকে দেখি সেটের ভেতর শোরগোল পড়ে গেছে। পরের শট টেক হবার জন্য তৈরি হচ্ছে সবাই। নেভাদাকে দেখলাম সেট-এর একধারে দাঁড়িয়ে, মুখে রং মেখে সেও তৈরি। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে রিণাকে দেখতে পেলামনা। সাউন্ড বুথ-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রেকর্ডিস্ট ভদ্রলোক কান থেকে ছিপি মার্কা ইয়ারফোন খুললেন। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দেখে মনে হল মেজাজটা ভালই আছে।

'কি মশাই,' বললাম, 'আজ আর কোনও অসুবিধে নেই আশা করি, ম্যাডামের গলা কেমন আসছে?'

'ধন্যবাদ, চমৎকার আসছে,' বলেই উনি ছিপি দুটো আবার দু'কানে গুঁজে কন্ট্রোল বোর্ডের ডায়ালগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

নেভাদার কাছে এসে বললাম, 'বলো নেভাদা, রিণার অভিনয় কেমন হচ্ছে বলো।'

'গোড়ায় আর সবার মতই একটু নার্ভাস ছিল, তারপরে এখন ওটা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে। ওর ভেতরে অভিনয় প্রতিভা যে এতদিন চাপা ছিল তা এতদিন টেরও পাইনি। স্ক্রিপ্টে আমার ডায়ালগের 'কিউ' ঠিক সময়মত ধরিয়ে দিচ্ছে রিণা যা ভাবাই যায়না।'

'সবাই যে যার জায়গায় যান!' চেঁচিয়ে উঠল সহকারী পরিচালকদের একজন।

পরিচালককে ক্যামেরার দিকে যেতে দেখে নেভাদা সেট-এর ধার থেকে ঢুকল ক্যামেরা রেনজ-এর ভেতরে। ঠিক তখনই রিণা এসে ঢুকল সেটে। রিণার সাজ দেখে চমকে উঠলাম, লালচে সোনালি একরাশ চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। খুব আঁটোসাটো 'ব্রা' বুকে বাঁধবার ফলে স্তনদুটি বুকের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে ফলে তাকে দেখাচ্ছে কমবয়সী ছেলেছোকরার মত। ভুরুর লোম উপড়ে কালো পেনসিলের রেখা এমন বিশ্রি বেমানানভাবে আঁকা হয়েছে যে দেখেই মেজাজ গরম হয়ে যায়।

'বাঃ, খাসা মেকাপ হয়েছে,' আড়চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আমার মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করে খোসামুদে গলায় বলল ড্যান পিয়ার্স, 'এ যেন অতীতের পাতা থেকে উঠে আসা মিস প্লুভিয়ার স্বয়ং।'

'ধ্যাৎ, কি যা তা বলছেন!' আমি খেঁকিয়ে উঠলাম 'মিস প্লুভিয়ার না ছাই! ওকে দেখে মেয়েমানুষ বলে মনেই হচ্ছেনা!'

'তখনকার জমানায় মিস প্লুভিয়ারের মত বয়স্ক পাতিতারা এমনই সাজগোজই করত,' অবিচলিত গলায় বলল পিয়ার্স, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খাসা মেকাপ, একদম চরিত্রানুগ।'

'আপনি মেকাপের ছাই বোঝেন।' জোরগলায় বললাম, 'আবার বলছি ওকে মেয়েমানুষ বলে মনেই হচ্ছে না। আর আপনার চরিত্রানুগ শব্দটির জবাবে বলব, এমনই বিশ্রি মদ্দা-মার্কা মেকাপ করা মাগি এই শহরে আকছার মিলবে, মাত্র এক ডলার খরচ করলে যাদের পাওয়া যায়।'

'বুঝতে পেরেছি এই মেকাপ আপনার পছন্দ নয়,' মৃদু হাসল পিয়ার্স, 'তা বেশ, ছবিটা যখন আপনি এত খরচ করে তুলছেন তখন আপনার পছন্দ অপছন্দের কথা সবাইকে ভাবতে হবে বইকি। আপনার পছন্দ না হলে মিস মার্লোর মেকাপ অবশ্যই পাল্টাতে হবে।'

স্বাভাবিক গলায় বললেও তার কথায় যে খোঁচাটুকু ছিল তাতেই রাগে আমার গা চিড়বিড় করে উঠল। একবার ভাবলাম কাজকর্ম সব বাতিল করে সেট ছেড়ে বেরিয়ে যাই। কিন্তু সবার সমবেত প্রচেষ্টার কথা ভেবে নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখলাম। পিয়ার্সকে বললাম, 'পরিচালককে একবার আমার কাছে আসতে বলুন।'

দশ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করে পরিচালক মিঃ ক্যারল ছুটে এলেন। ভিতু ভিতু গলায় বললেন, 'আমায় ডেকেছেন, মিঃ কর্ড?'

'এই মেকাপ আর পোষাক কি আপনি অনুমোদন করেছেন?' ইশারায় রিণাকে দেখালাম।

'আজ্ঞে আমি নই, মিঃ কর্ড,' বলতে গিয়ে মিঃ ক্যারলের গলা কেঁপে গেল। 'নেভাদা সাজ পোষাকের দপ্তর ওয়ার্ডরোব-এ ফোন করে বলেছে রিণার সাজপোষাক যেন নিখুঁত আর চরিত্রানুগ হয়।'

'নেভাদা বলেছে বললেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিঃ কর্ড।'

'থাক, আপনি এবার যেতে পারেন' বলে পিয়ার্সের দিকে তাকালাম, 'আমি অফিসে যাচ্ছি, দশ মিনিটের মধ্যে সবাইকে ওখানে হাজির হতে বলুন।'

'তাই হবে, জোনাস।'

একটি কথাও না বলে পায়ে পায়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম।

৯

স্টুডিওর ভেতরে আমার অফিসে এসে জড়ো হল সবাই। আমার ডেস্ক-এর বাঁদিকে ইজিচেয়ারে বসেছে ড্যান পিয়ার্স, নতুন পরিচালক মিঃ ক্যারল বসেছেন তার গা ঘেঁষে। খানিক তফাতে একটা বড় কৌচে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে নেভাদা আর রিণা। তাদের খানিক তফাতে বসেছেন ক্যামেরাম্যান। তাঁর গা ঘেঁষে বসেছেন মেকাপম্যান কম বয়সী যুবতীকে পাশে নিয়ে। গড়ন পাতলা ছিপছিপে হলেও মাথার বেশির ভাগ চুল অকালে পেকে গেছে অথচ মুখখানা এখনও কচি দেখায় তাই ওপর থেকে দেখে তাঁর বয়স আঁচ করা যায় না। আমার দুই যুবতী সেক্রেটারির একজন প্যাড আর পেনসিল নিয়ে বসেছে ডেস্ক-এর ডানপাশে।

'কাল রাতের স্ক্রিন টেস্ট আপনারা সবাই দেখেছেন।' একটা সিগারেট ধরিয়ে ইশারায় রিণাকে দেখালাম। 'কাজ খুবই ভাল হয়েছে। কিন্তু আজ বিকেলে আমি সেট-এ ঢোকার পরে এই মহিলাকে দেখতে পাইনি কেন?'

কারও মুখে কোনও কথা নেই, সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। গম্ভীর গলায় বললাম, 'রিণা উঠে দাঁড়াও।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রিণা, আর সবার মত সে-ও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'কি মশাই,' এক এক করে সবাইকে দেখে তাকালাম পরিচালকের দিকে। রিণাকে ইশারায় দেখিয়ে বললাম, এর নাম কি বলুন ত?'

'আজ্ঞে ওর নাম যে রিণা মার্লো তা সবাই জানে, মিঃ কর্ড।' জবাব দিলেন পরিচালক।

'তাহলে ওকে রিণা মার্লোর মত দেখাচ্ছেনা কেন বলতে পারেন?' গলা অল্প চড়িয়ে বললাম, 'ক্লারা বো, মেরিওন ডেভিস আর সিনথিয়া র‍্যাণ্ডাল, এদের তিনজনকে একসঙ্গে তালগোল পাকালে যে চেহারা দাঁড়াত ওকে দেখাচ্ছে ঠিক তেমনই!'

'আমার মনে হয় আপনার বুঝতে ভুল হচ্ছে, মিঃ কর্ড!' চেহারা দেখে যার বয়স আঁচ করা যায়না স্টুডিওর সাজপোষাক দপ্তরের ইনচার্জ সেই যুবতী হঠাৎ বলে উঠলেন। চোখ ঘুরিয়ে তাকালাম তাঁর দিকে, 'নাম কি আপনার?'

'আমার নাম আইলীন গেলার্ড,' আমার চোখে চোখ রাখল যুবতী, 'পেশায় কসটিউম ডিজাইনার, অভিনেত্রীদের পোষাকের নকশা আমিই তৈরি করি।'

'বুঝেছি, মিস গেলার্ড, বুঝেছি।' আমি বললাম, 'এবার কোন ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছিনা যদি বুঝিয়ে বলেন ত ভাল হয়।'

'ফ্যাশনের কথাটা মনে রেখেই মিস মার্লোর সাজপোষাকের কথাটা ভাবতে হবে, মিঃ কর্ড,' শান্তভাবে বললেন মিস গেলার্ড, 'যে আমলের ছবি পোষাক তৈরির নকশা আঁকার সময় সেই আমলের চেহারা ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গে লেটেস্ট ফ্যাশনের কথাটাও মনে রাখতে হবে কারণ ফিল্মে অভিনেত্রীরা যে ধাঁচের পোষাক পরে তাই পরে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। পোষাকের নতুন ফ্যাশন দেখতেই মেয়েরা সিনেমা দেখে। সাজপোষাকের নিত্য নতুন রেওয়াজ আসে ফিল্ম থেকে।'

'আপনি যাই বলুন না কেন মিস গেলার্ড,' আমি অধৈর্য গলায় বললাম, 'ফ্যাশন করতে গিয়ে একটা মেয়েকে ছেলে সাজানোর কি অর্থ তা আমার মাথায় ঢুকছেনা। তাছাড়া পর্দার বুকে এমনি পোষাক পরা কোনও মেয়েকে সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন দর্শকরা গ্রহণ করবে বলে আমার মনে হয় না।'

'মিস গেলার্ডকে খামোখা দোষ দিওনা, জোনাস' রিণার পাশ থেকে বলে উঠল নেভাদা।' আমার কথা মতন উনি রিণার জন্য ঐ পোষাকের নকশা এঁকেছেন।'

'তুমি মিস গেলার্ডকে ফরমায়েস দিয়েছিলে?' নেভাদার দিকে তাকালাম।

নেভাদা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। 'ছবির পেছনে যখন এতগুলো টাকা ঢেলেছি তখন এসব ভাবনা এখন থেকে আমারই ওপর ছেড়ে দাও,' নিজেকে যতদূর সম্ভব শান্ত রেখে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'তুমি শুধু নিজের অভিনয়ের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও, তার বাইরে ফিল্মের যা কিছু সব আমার কাঁধে চাপিয়ে দাও।'

নেভাদা জবাবে কিছু না বললেও তার ঠোঁট আর চোয়াল আঁটো হতে বুঝলাম আমার কথার মানে বুঝতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়েছে ভেতরে ভেতরে, সেই ক্ষোভ ফুটে উঠল তার

চোখের চাউনিতেও। মুখ ফিরিয়ে নেবার মুহূর্তে চোখে পড়ল এক অদ্ভুত নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভাব চোখে ফুটিয়ে রিণা তাকিয়ে আছে নেভাদার দিকে।

'রিণা!' হেঁকে বললাম, 'এখানে বসে না থেকে টয়লেটে যাও! মুখের ঐ ছাই পাঁশ ভাল করে ধুয়ে সাফ করে তোমার স্বাভাবিক মেকাপ লাগাও।'

একটি কথাও বলে উঠে পড়ল রিণা। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকল টয়লেটে। ঘরের ভেতর বাকি সবাই বসে আছে নিস্প্রাণ পাথরের মূর্তির মত, টুঁ শব্দটি করছে না কেউ। খানিক বাদে আগের রং চং ধুয়ে মুছে স্বাভাবিক মেকাপে রিণা ফিরে এল—ঠোঁট, চোয়াল, ভুরু সব এখন আগের মত স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। চাঁদির ওপর চূড়ো করে বাঁধা খোঁপা খুলে ফেলায় সোনালি চুলের রাশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে দু'কাঁধে। কিন্তু এরপরেও রিণার দিকে তাকিয়ে আমি স্বস্তি পেলাম না। তার পা থেকে মাথা এইটুকু জমির ভেতর কোথাও যেন একটা দারুণ ফাঁক রয়ে গেছে যা আমার চোখে এইমুহূর্তে ধরা পড়ছেনা। হয়ত পড়তে সময় নেবে। কিন্তু আমার কপাল ভাল অবশ্যই বলতে হবে তাই সেই সময়টার জন্য খুব বেশিক্ষণ হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হলনা, খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল রিণার শরীরটা দেখাচ্ছে সরলরেখার মত। অবাক হয়ে দু'হাতে দু'চোখ ঘষে ভাল করে তার দিকে তাকালাম। না, আমার দেখতে ভুল হয়নি। ঐত দাঁড়িয়ে রিণা যেন খাতার বুকে স্কেলের গায়ে পেনসিলে আঁকা এক সরলরেখা। ব্যাপার কি, রিণার বুক আচমকা সমতল হল কি করে? প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে, গম্ভীর গলায় বললাম, 'রিণা, ভেতরে গিয়ে বুকের ভেতরে আঁটা বলগা এক্ষুণি খুলে ফ্যালো!'

একটি কথাও না বলে আবার টয়লেটে গিয়ে ঢুকল রিণা, জামার ভেতরে বুকে আঁটা আঁটো বেল্টের বলগা খুলে বেরিয়ে এল। রিণার উদ্ধত বুকের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে তাকে পরিপূর্ণ নারী বলে মনে হল।

'এইত বেশ মানিয়েছে,' আমি বললাম, 'এবার আমরা শট নেব।'

'তা হয় না, মিঃ কর্ড,' মিস গেলার্ড ওজর তুললেন, 'এই সাজে ওঁর শট নেয়া যাবেনা। হাঁটাচলা করায় সময় মিস মার্লোর বুক বড্ড বেশি দোলে, ওঠানামা করে।'

'এতে আপনার আপত্তির কি আছে?' হেসে বললাম, 'রিণা ত পুরুষ নয়, নারী, পূর্ণযুবতী। হাঁটাচলা করার সময় ওর স্তন দুলবে এটাই ত স্বাভাবিক।'

'কিন্তু পর্দায় বুকে সেটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে যে মিঃ কর্ড,' খুকি খুকি গলায় আবদার করলেন মিস গেলার্ড, 'তখন আর ওটা মোটেও স্বাভাবিক দেখাবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মিঃ লী-কে জিজ্ঞেস করুন। উনি নিজে ত ক্যামেরাম্যান, দেখুন উনি কি বলেন।'

'মিস গেলার্ড ঠিকই বলেছেন, মিঃ কর্ড,' ক্যামেরাম্যান মিঃ লী বললেন, 'পর্দার বুকে বুকের দুলুনি সত্যিই বিশ্রি দেখাবে।'

'বেল্ট দিয়ে হবে না,' মিস গেলার্ড বললেন, 'ম্যাডামের জন্য নতুন ধরনের ব্রা-র ব্যবস্থা করতে হবে।'

'দেখুন জোগাড় করতে পারেন কিনা,' আমি সায় দিলাম।

মিস গেলার্ড-এর নতুন ব্রা পরে রিণা খানিকবাদ এসে দাঁড়াল আমার সামনে। খানিক আগে যে বেল্টের বলগা আর লাগাম মিস গেলার্ড তার বুকে এঁটেছিলেন এটা তার চেয়ে ভাল মানতেই হবে, তবু কোনরকম বাঁধনছাড়া তার বুক যতটা সুন্দর লেগেছিল এটা বুকে আঁটায় তা লাগল না। রিণাকে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। কিন্তু তাতে লাভ হল না, নতুন ব্রা পরানোর ফলে তার বুক একই রকম সমতল হয়ে রইল।

'রিণার ব্রা আমার পছন্দ হয়নি জেনে মিস গেলার্ড আবার তাকে নিয়ে গেলেন নিজের দপ্তরে, খানিকবাদে আরেকটা ব্রা পরিয়ে এনে হাজির করলেন তাকে। এবারের ব্রা-র ভেতরে অনেক সূক্ষ্ম তার-এর কারিকুরি আছে যার ফলে বুকের সমতল খানিকটা মাথা উঁচু করে দাঁড়াল ঠিকই কিন্তু আমি যেমনটি চাইছি সেইভাবে রিণার পা ফেলার তালে তালে তা দুলে উঠছেনা।

'আপনার এই ব্রা-র তারগুলো কেটে ছেঁটে আরও ছোট করা যায়না?' মিস গেলার্ডকে প্রশ্ন করলাম।

'তা সম্ভব নয়, মিঃ কর্ড,' বললেন মিস গেলার্ড, 'কিছু মনে করবেন না। ম্যাডামের বুক নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন, বলবেন মিঃ কর্ড? ওঁর পা দু'টো কি একবারও আপনার নজরে পড়ছেনা? এত আকর্ষণীয় পা খুব কম মেয়েরই আছে কিন্তু—

'কিছু মনে করবেন না মিস গেলার্ড,' বিনীতভাবে বললাম, 'আপনি পুরুষ নন, তাই আপত্তি কোথায় এবং কেন, হাজার বলেও তা আপনাকে বোঝাতে পারবনা।'

'কিন্তু ব্রা-র তারগুলো কেটে ছেটে ছোট করা যাবেনা,' মিস গেলার্ড বললেন, 'তাতে ঢিলে হয়ে গোটা ব্রা একসময় খসে পড়ে যেতে পারে।'

'এখনই নিরাশ হবেন না, মিস গেলার্ড,' আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'বিশ্বাস করুন, হাল ছেড়ে দেবার মত কিছুই হয়নি। আমার ওপর ভরসা রাখুন, ঠিক যে জিনিসটা চাইছি সেটা আগে দেখাই, তখন হয়ত কাজটা করা আপনার পক্ষে কঠিন হবেনা।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম রিণার মুখোমুখি, জগঝম্প ব্রা-টা ইশারায় দেখিয়ে হাত পেতে বললাম, ওটা খুলে আমার হাতে দাও।'

আবেগহীন নিরাসক্ত ভাব চোখেমুখে ফুটিয়ে মুখ ফিরিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল রিণা। কয়েক সেকেণ্ড বাদে এগিয়ে এসে ব্রা-টা গুঁজে দিল আমার বাড়িয়ে দেয়া হাতের মুঠোয়। তখনই লক্ষ করলাম পাছে ঢোলা পোষাকটা খসে পড়ে যায় এই ভয়ে বাঁ হাতের আঙুলে গলার কাছটা খিচে উঁচু করে ধরে আছে সে। ব্রা-টা ডেস্কের ওপরে রেখে দু'হাতে রিণার ঢোলা পোষাকটা টেনে এতটাই নিচে নামিয়ে দিলাম যার ফলে বোঁটা থেকে কিছু তফাতে দু'টি স্তনের ওপর তা দু'টি চতুর্ভুজ তৈরি করল। আমার তামাটে হাতের মুঠোর ওপর রিণার দু'টি স্তন যেন রাতের আকাশে পূর্ণিমার যমজ চাঁদের মত ঝলমল করতে লাগল।

'দেখছেন ত,' মিস্ গেলার্ডের উদ্দেশে বললাম, 'পারবেন এ জিনিস তৈরি করতে?'

'আপনি যা চাইছেন তা দেয়া সম্ভব নয়, মিঃ কর্ড,' বললেন মিস গেলার্ড,' 'তারওপর

উনি কচি বাচ্চা নন, পূর্ণযুবতী যার ব্রা-র মাপ আটত্রিশ। আপনি যা চাইছেন সেইভাবে ওঁর বুক ঠেস দিয়ে টেনে ধরে রাখার মত ব্রা নেই। আমি ফ্যাশন ডিজাইনার, মিঃ কর্ড, এঞ্জিনীয়ার নই।'

'ধন্যবাদ, রিণা,' বলে রিণার ঢোলা পোষাক ছেড়ে দিয়ে তাকালাম মিস গেলার্ডের দিকে, 'আপনি এঞ্জিনীয়র নন্ এই কথাটাই আমার মনে করিয়ে দিলেন তাই না মিস গেলার্ড? যত মেজাজ নিয়েই বলুন না কেন, কথাটা বলে আপনি যে কি উপকার করলেন তা বলে বোঝাতে পারব না। সত্যি বলতে কি, সবার সঙ্গে মিটিং করে এই একটা কাজের কথা আদায় করতে পেরেছি আপনার মুখ থেকে। দেখা যাক, রিণার ব্রা তৈরি করার বুদ্ধি বাতলাবেন এমন এঞ্জিনীয়ার হাতের কাছে কেউ আছেন কিনা।' বলে।' বলে চেয়ারে বসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নম্বর ঘোরালাম।

মরিসে অফিসেই ছিলেন, আমার টেলিফোন পেয়ে ঠিক কুড়ি মিনিটের ভেতর এসে হাজির হলেন স্টুডিওতে।

'আসুন, মরিসে, আমি বললাম, 'একটা জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে সমাধানের জন্য আপনার মদত দরকার।'

'সমস্যাটা কি আগে বলুন, মিঃ কর্ড,' মরিসের গলা শুনে বেশ বুঝলাম ফিল্ম স্টুডিওর ভেতরে পা দিয়ে তিনি বেশ হকচকিয়ে গেছেন। পরমুহূর্তে স্বাভাবিক গলায় বললেন। 'আপনার জন্য সমস্যার জট ছাড়াতে আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখবনা।'

'রিণা, উঠে দাঁড়াও,' বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। বিস্মিত মিস গেলার্ডের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কি করব বলুন, আপনি এঞ্জিনীয়র নন একথাটা আপনার মুখ থেকে শোনামাত্র আমার কেমন জেদ চাপাল, তাই ত টেলিফোন করে এঁকে আনালাম। ইনি কিন্তু সত্যিই এঞ্জিনীয়র, এরোপ্লেনের নকশা তৈরি করেন, দেখা যাক ঠিক যে জিনিসটা আমি চাইছি তার একটা নকশা উনি তৈরি করতে পারেন কিনা।'

রিণার ব্রা-র নকশা তৈরি করতে জলজ্যান্ত একজন এঞ্জিনীয়রকে সত্যিই ডাকিয়ে আনব মিস গেলার্ড তা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই তিনি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন মরিসের দিকে। এইফাঁকে আমি কাজের কথা পাড়লাম—'বুঝলেন মরিসে,' রিণাকে ইশারায় দেখিয়ে বললাম, 'এঁর একটা ব্রা নিয়ে খুব বড্ড মুশকিলে পড়েছি। এমন একটা ব্রা এঁকে পরাতে চাই যা বুকে আঁটলে এর স্তন দু'টি পা ফেলার তালে তালে দুলবে। আপনাকে অনুরোধ করছি ঐরকম একটা ব্রা-র নকশা আপনি আমায় তৈরি করে দিন।'

'ব্রা-র নকশা আঁকব আমি?' কালো হয়ে উঠল মরিসের মুখ, 'আপনি ঠাট্টা করছেন, মিঃ কর্ড?'

'ঠাট্টা?' মরিসের চোখে চোখ রাখলাম, 'না মরিসে, ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি এই ব্রা-ঘটিত সমস্যার সমাধান একমাত্র আপনিই করতে পারেন।'

'কিন্তু আমি ত এরোনটিক্যাল এঞ্জিনীয়র।' আমতা আমতা করে বললেন মরিসে। 'ব্রা সম্পর্কে কোনও ধারণাই যে আমার নেই, মিঃ কর্ড।'

'নেই, জেনেই ত আপনাকে ডাকিয়ে আনলাম,' মরিসকে আশ্বাস দেবার গলায় বললাম, যে থিওরি মেনে প্লেনের নকশা আঁকেন সেই থিওরি আপনি এখানেও কাজে লাগাতে পারেন।'

মরিসের মুখে কথাটি নেই, দম বন্ধ করে মুখ কাঁচুমাচু করে একমনে আমার কথা শুনে যাচ্ছেন তিনি।

'কয়েক হাজার পাউণ্ডের বোঝা বহন করতে হবে এই কথা মাথায় রেখেই ত প্লেনের নকশা আঁকেন আপনি।' আমি বললাম, 'সেই একই থিওরি এখানেও এমনভাবে কাজে লাগান যাতে ব্রা-র কাপদুটো এঁর দুটি স্তন আলতো করে ধরে রাখে। বলেই মুখ ফিরিয়ে তাকালাম মিস গেলার্ডের দিকে, মরিসকে দেখিয়ে গম্ভীর গলায় হুকুম দিলাম। 'এঁর যখন যা যা দরকার হবে সব হাতের কাছে এগিয়ে দেবেন।'

'মনে হচ্ছে একটা কোন উপায় বের করা যাবে,' একদৃষ্টে রিণার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা মুখ ফিরিয়ে মিস গেলার্ডকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কাছে ক্যালিপার্স আছে? থাকলে একবার নিয়ে আসুন দয়া করে।'

'ক্যালিপার্স?' মিস গেলার্ড যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'ক্যালিপার্স? ও দিয়ে আমাদের কি হবে, কোন কাজে লাগবে?'

'সেকি!' অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকালেন মরিসে, 'ক্যালিপার্স ছাড়া ম্যাডামের বুকের মাপ নেব কি করে?'

'আমার কাছে না থাকলেও স্টুডিওর এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে নিশ্চয়ই আছে।' বলে মরিসের হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে এগিয়ে চললেন মিস গেলার্ড, কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে বললেন, 'রিণা আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে।'

ঘন্টাখানেক বাদে নকশা আঁকা এক তাড়া কাগজ হাতে নিয়ে ফিরে এলেন মরিসে আমার নাকের সামনে কাগজগুলো নেড়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে এবার সমস্যার সমাধান হবে। যেখানে চাপ পড়ছে সেখানকার মূল কেন্দ্রে বা বিন্দুতে পৌঁছোনোর পরে দেখা গেল কাজটা জলের মত সহজ। ম্যাডামের বুকের একেকটি স্তনের ওজন দু'পাশে টানাটান হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে চাপ-এর মূল ভিত্তিটা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে দু'টি স্তনের ঠিক মাঝখানে সমতলে।

মরিসের মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে শুনছি, তাঁর স্তনসংক্রান্ত এঞ্জিনীয়ারিং-এর ব্যাখ্যা শুনে সত্যিই মাথা ঘুলিয়ে উঠল। কিন্তু আমার মানসিক অবস্থা নিয়ে মরিসের মাথা ব্যথা নেই, তিনি সমানে নিজের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত বিদ্যেবুদ্ধি উৎসাহ সহকারে জাহির করতে লাগলেন।

......'ত যা বলছিলাম। এটা সমস্যা ঠিকই—ক্ষতিপূরক সমস্যা। ব্রা-র ভেতরে ম্যাডামের স্তন দু'টিকে যাতে আঁটোসাটোভাবে ধরে রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যে চাপকে কাজে লাগানোর একটা উপায় খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ব্যাপারটা আঁচ করে ইংরেজি 'ভি' হরফের আকারের একফালি সরু তার ব্রা-র ভেতরে এমনভাবে ঠেশে গুঁজে দিলাম যাতে তা ম্যাডামের দুই স্তনের মধ্যবর্তী সমতলকে ছুঁয়ে থাকে

সাসপেনশন প্রিন্‌সিপল বা নিলম্বন নীতি আর কি, বুঝলেন কিনা, মিঃ কর্ড?'

'আপনার হাতের কাজ, বুঝতে কি বাকি থাকে, মরিসে?' সায় দিয়ে বিজ্ঞের মত হাসলাম, 'তখনই জানতাম এত সমস্যা থেকে আমায় উদ্ধার করার মত লোক একজনই আছেন, তাই ত সাত তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাকিয়ে আনলাম।'

'ঝোলানো সেতু যে তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি হয় সে সম্পর্কে কোনও ধারণা আপনার আছে?'

'যেটুকু আছে তা নিতান্ত ভাসাভাসা,' হেসে বললাম।

'নিজের বিপরীত ভর যত চাপ প্রয়োগ করে ততটা চাপ তৈরি হয় যা সেই ভর-কে যথাস্থানে রাখে এই হল তত্ত্বের মূলকথা।'

মরিসের ব্যাখ্যা মাথায় কিছুই ঢুকলনা, শুধু দায়সারা ভাবে ঘাড় নেড়ে বোঝালাম খুব বুঝেছি। তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, মরিসের এই তত্ত্বে শেষরক্ষা হবে কিনা আমি শুধু তাই জানতে আগ্রহী।

উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলনা। আরও খানিক বাদে মিস গেলার্ড ঢুকলেন রিণাকে নিয়ে।

'মুখ তুলে হাঁটুন, রিণা......' বললেন মিস গেলার্ড, 'মিঃ কর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ান.....।'

তাঁর নির্দেশ মত রিণা মুখ তুলে বুক চিতিয়ে পা ফেলে এসে দাঁড়াল আমার ডেস্কের সামনে। তার বুকের উদ্ধত দু'টি স্তনের দিকে চোখ পড়তে এবার আমার নিজেরই লজ্জায় মাথা নুয়ে এল। আর ঠিক এটাই আমি চাইছিলাম।

'কেমন, এবার ঠিক আছে ত? আজ স্টুডিওয় পা দেবার পরে এই প্রথম কথা ফুটল রিণার মুখে, 'এবার ঠিক মানানসই হয়েছে ত?' ঠিক যে হয়েছে তা আমার নোয়ানো মাথা দেখেই টের পেয়েছে রিণা তাই আর কিছুনা বলে সরে দাঁড়াল সে।

'আরেকটা ব্যাপার মনে রাখবেন, মিস গেলার্ড,' মুখ তুলে বললাম, 'কাল সকালে শট নেবার সময় ওকে সাদার বদলে কালো গাঢ় তামাটে রং-এর পোষাক মনে করে পরিয়ে দেবেন। মিস মার্লো নয়, নিছক বাজারের মেয়েমানুষ, আমি চাই সরল সত্যটা আপনারা আগাগোড়া মাথায় রাখুন।'

রিণার দু'চোখে যে আগুন ঝলসাচ্ছে তার দিকে না তাকিয়েও তা আঁচ করলাম। এটা বিছানা নয়, স্টুডিওর অফিস, তা যেন খেয়ালই নেই তাই ইচ্ছে করেই চরিত্রের বদলে তার নাম উল্লেখ করে খোঁচাটুকু দিলাম।

'আপনি যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমন কাজ পাবেন মিঃ কর্ড,' আশ্বস্ত করার গলায় বললেন মিস গেলার্ড, 'আমার ত এখন মনে হচ্ছে মিস মার্লো জন্য এবার ব্রা-র জগতে এক নতুন ফ্যাশন চালু হবে। ছবিটা একবার 'রিলিজ' হোক, তারপরে দেখবেন এই নতুন ব্রা কেনার হুজুগ শুরু হয়।

রিণার ব্রা-সংক্রান্ত সমস্যায় সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে আমার মিটিং-ও শেষ হল, সবাই একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নেভাদা উঠতে যেতেই চোখ টিপে তাকে বসার

ইশারা করলাম। ঠিক তখনই আমার দুই রূপসী সেক্রেটারীর একজন একটা খাতা নিয়ে এসে দাঁড়াল ডেসকের গা ঘেঁষে।

'কি চাই তোমার?' আমি জানতে চাইলাম, 'এই খাতায় কি নিয়ে এলে?'

'আজকের মিটিং-এর মিনিট,' সেক্রেটারী মিষ্টি হেসে জবাব দিল।

'এসব কোন কম্মে লাগবে?'

'কোম্পানির এটাই নিয়ম, স্যর,' সে বলল, 'সব এক্সিকিউটিভ মিটিং-এরই মিনিট তৈরি করা হয় তারপর তার টাইপ করা কপি সবার হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়।'

'দেখি, আমায় দাও, আমি এর সদগতি করছি,' বলে খাতাটা নিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করলাম। তার চোখের সামনে দেশলাই কাঠি জ্বেলে পাতাগুলোয় আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিলাম বাজে কাগজের ঝুড়িতে। সেক্রেটারী ভয় মাখানো চাউনি মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'যাও, আমার খেল্ খতম।' তাকে বললাম 'এবার চটপট কেটে পড়ো। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, ভবিষ্যতে আর কোনও মিটিং-এর মিনিট অফিসের বাইরে বিলি হয়েছে কানে এলে কিন্তু বক্ষে নেই, পরদিন থেকে তোমায় চাকরি খুঁজতে হবে। কথাটা দয়া করে মনে রেখো।'

সেক্রেটাবী ব্যাজার মুখে চলে যেতে হাসি চাপতে পারলনা নেভাদা।

'কিছু মনে কোরনা, নেভাদা,' তার দিকে তাকিয়ে বললাম,' গোড়া থেকেই অফিসের এসব অব্যবস্থার লাগাম না টেনে ধবলে পরে মুশকিলে পড়তে হবে।'

'আমি কিছুই মনে করিনি, জুনিয়র,' বলল নেভাদা। 'তোমার বাবাও এইভাবে চিন্তাভাবনা করতেন। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন যাচ্ছি।'

নেভাদা বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল ড্যান পিয়ার্স, একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল সে।

'পিয়ার্স,' সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে চিত্রনাট্য খানিকটা অদল বদল না করলেই নয়, আপনি এখুনি চিত্রনাট্যকারকে পাঠিয়ে দিন।'

'আমি ঠিক এটাই শুনব আশা করেছিলাম,' মুচকি হেসে বলল পিয়ার্স।

১০

ঠিক চারমাসের ভেতর ছবি তৈরির কাজ পুরোপুরি শেষ হল। তারও দু'হপ্তা বাদে একদিন অনুষ্ঠিত হল প্রিমিয়ার শো। আমার যেতে একটু দেরি হয়েছিল। হলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে শুধু সারি সারি কালো মাথা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লনা। প্রচার বিভাগের একটি লোক আমায় দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। হলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা সুবিধাজনক সিটে বসালো। ব্যালকনির চারপাশে তাকাতে বার্নি নরম্যান থেকে শুরু করে অনেককেই চোখে পড়ল। আমার দু'পাশে বসেছে দু'জোড়া কমবয়সী ছেলেমেয়ে যাদের চ্যাংড়া বলা যায় অনায়াসে।

হল অন্ধকার হতে পর্দার বুকে বড় হরফে ফুটে উঠল

জোনাস কর্ড-এর পরিবেশনায়—

ক্রেডিট টাইটেলে কুশিলবদের নাম দেখানোর পর্ব শেষ হতে শুরু হল ছবির গল্প. মিনিট দশেক বাদে কানে এল দু'পাশের ছোঁড়া দুটো গলা নামিয়ে বলছে, "........ধ্যাৎ, এ সেই একঘেয়ে বস্তাপচা ওয়েস্টার্ণ! চুরি, ডাকাতি, খুন, পুলিশ, মাগিবাজী, ফাঁসি, এই ছকের বাইরে কিছু নয়" খানিক বাদে রিণার আবির্ভাব ঘটল। তাকে দেখেই থেমে গেল ছোঁড়াদুটো, আড়চোখে দেখলাম হাঁ করে তাকিয়ে আছে পর্দার দিকে যেন গিলে খাবে চোখ দিয়ে। দুটো ছোঁড়াই যে তাদের দুই বান্ধবীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে হলের আবছা আলো আঁধারিতে তা ঠিকই চোখে পড়ল। মিস প্লুভিয়ারের মেকাপে রিণা নেভাদাকে নিজের পাশে শোয়াতে ছোঁড়াদুটোর একটার মুখ থেকে পুলক মেশানো চাপা সিৎকার ধ্বনি 'ইশ্!' বেরিয়ে এল। এ ছবি হিট করবেই আঁচ করে একটা সিগারেট ধরালাম। শো শেষ হতে নিচে নেমে এলাম, দেখলাম লবির এককোণে দাঁড়িয়ে রিণার ওপর হামলে পড়েছে রিপোর্টারেরা। বার্ণি নরম্যান তাকে সামলাচ্ছেন নিজের মেয়ের মত।

ড্যান পিয়ার্স দাঁড়িয়েছিল আমারই জন্য, চোখে চোখ পড়তে ছুটে এল, হেসে বলল। 'জোনাস, আপনি ঠিকই হিসেব কষেছিলেন, রিণা একাই কামাল করেছে। দেখবেন সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে এ ছবি থেকে কম করে এক কোটি ডলার মুনাফা হবে।'

'সে যখন হবে তখন দেখা যাবে,' মুনাফার প্রসঙ্গে কান না দিয়ে বললাম, 'শুনুন, এদিকের ঝামেলা চুকে গেলে রিণাকে সোজা নিয়ে আসবেন আমার হোটেলে।'

ঘাড় নেড়ে চলে গেল ড্যান। হোটেলে ফিরতে ফিরতে বেলা একটা বাজল। হালকা ডিনার সেরে নিজের ঘরে একটা বুরবোঁর বোতল নিয়ে সবে বসেছি এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল। উঠে দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকল রিণা। দরজা ভেজিয়ে দিতে রিণা বলল, 'নেভাদাকে বলে এসেছি তোমার কাছে যাচ্ছি। তারপর বলো, কি ব্যাপার?"

'ওকে বলার দরকার কি ছিল?' আমি বললাম।

'ছিল বইকি,' হাসল রিণা, 'আমি যে নেভাদাকে শীগগিরই বিয়ে করছি তা বোধহয় তোমার জানা নেই। তোমার দোষ নয়, খবরটা তোমাকে আমিই আগে দেব বলে নেভাদাকে মুখ খুলতে মানা করেছিলাম।'

'না!' রিণার কথা শুনে এত জোরে গর্জে উঠলাম যা শুনে নিজেই থমমত খেলাম। 'না, ওকে তোমার বিয়ে করা চলবে না। ওকে বিয়ে করলে আমি তোমার পথের কাঁটা হব! ব্যাটা বুড়ো তিনকাল এসে এককালে ঠেকেছে এখন বিয়ে করার সাধ জেগেছে। ওসব ভাবনা ছাড়ো! এ ছবি বাজারে ছাড়া পেলে আমি তোমায় পরপর আরও কতগুলো ছবিতে নামাব। সেসব ছবিতে তুমিই হবে প্রধান নারীচরিত্র। নেভাদাকে তোমায় ভুলতেই হবে।'

'তা সম্ভব নয়, জোনাস,' অদ্ভুত দৃঢ় শোনাল রিণার গলা, 'যেদিন আমার প্রয়োজন হয়েছিল সেদিন এই নেভাদাই এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, আমায় সাহায্য করেছিল। এখন ওর পালা। আমাকে ওর দরকার, খুব দরকার।'

তার কথায় দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠল আমার মাথার ভেতর, সেই আগুনের হলকায় গোটা শরীর নিমেষে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেল। একদিন রিণা ছিল আমারই প্রণয়িনী, কিন্তু আমার বাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে আমায় ভুলে তাঁকে বিয়ে করতে এককথায় রাজি হয়েছিল। আজ এতদিন পরে আবার সেই একই খেলা খেলতে পা বাড়িয়েছে সে, শুধু বাবার জায়গায় এবার এসেছে নেভাদা, এবারও আমায় বঞ্চিত করে তার সঙ্গে ঘর বাঁধতে চলেছে সে।

'আর আমি? আমার কি হবে?' দু'হাতে রিণার কাঁধদুটো শক্ত করে ধরে ঝাঁকুনি দিলাম, 'আমি কি নেভাদার জন্য তাকে বাঁচানোর জন্য এতদূর ছুটে এসেছি? না রিণা, আমি এসেছি শুধু তোমার জন্য! তোমাকে যে আমার খুব দরকার এ কথাটা তোমার একবারও মনে হয়নি?'

'না, জোনাস,' দু'চোখ পাকিয়ে কিছুক্ষণ আমার চোখে চোখ রেখে বলল রিণা, 'নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই তোমার দরকার নেই। নয়ত নিজের কচি বৌটাকে একা ফেলে রেখে এতদূর ছুটে আসতেনা। মায়া মমতা, অনুভূতি, এসব কিছুই তোমার মধ্যে নেই জোনাস, থাকলে তুমি তার কাছে ফিরে যেতে, নয়ত তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে এখানে।'

'রিণা!' আবার চেঁচিয়ে উঠলাম 'দোহাই আমার বৌকে এসবের মধ্যে টেনে এনোনা।'

আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে এক ঝটকা দিল রিণা আর তাই তে ওর পোষাকের সামনে দিকটা ছিঁড়ে কোমর পর্যন্ত বেরিয়ে এল। উত্তেজনায় উদ্ধত হয়ে উঠল তার দু'টি স্তন। সেদিকে চোখ পড়তেই টের পেলাম আমার ভেতরে বাতাস পড়ে গেছে, এখুনি ঝড় উঠবে।

'রিণা!' তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলে উঠলাম। 'রিণা, আমায় বাঁচাও, একটু দয়া করো!'

আমার ঠোঁট থেকে নিজের ঠোঁট সরিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারলনা রিণা। একসময় দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল সে। আর ঠিক তখনই বাইরে থেকে দরজা খুলে কারা যেন ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'দূর হও!' পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এখানে ঢুকেছো কেন, যাও বেরিয়ে যাও।'

'না জোনাস, এবার এত সহজে যাচ্ছিনা আমরা।' ঘরের ভেতর তৃতীয় কেউ জবাব দিল গলাটা খুব চেনা ঠেকল।

রিণাকে ঝটিতি শোবার ঘরের দিকে ঠেলে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আমার শ্বশুর অ্যামস উইনথর্প সঙ্গে একজন অচেনা লোক, তাদের পেছনে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমার কচি বৌ মণিকা। মণিকার পেটের দিকে চোখ পড়তে বুঝলাম সে কম করে পাঁচ মাসের পোয়াতি।

'ওকে দূরে কোথাও পাঠাতে আগে আমায় দিয়েছিলে দশ হাজার ডলার মনে পড়ে জোনাস?' চিবিয়ে চিবিয়ে হাসিমাখা গলায় বলল অ্যামস, 'এবার এই চরম নাটকীয় মুহূর্তে ওর হাত থেকে রেহাই পেতে কত খেসারত গুণতে হবে ধারণা আছে তোমার?'

বেশ মনে আছে প্রথম পরিচয়ের পরে এক মাস পূর্ণ হবার অনেক আগেই বিয়ে করেছিলাম মণিকাকে তখনই তার পেটে দু'মাসের বাচ্চা।

অ্যামসের বিদ্রূপের জবাব না দিয়ে নিজের মনে শাপশাপান্ত করলাম নিজেকে। মনে পড়ল বাবা বলতেন কম বয়সে পুরুষ মানুষ যে বোকামি করে তা হল দুনিয়ার সেরা আহাম্মকি। বাবার সেই কথা কি নিদারুণ সত্যি তা এইমুহূর্তে আমার চেয়ে হাড়ে হাড়ে আর কে বুঝবে। রিণাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাবা জিতেছিলেন সেই কবে। তাঁর মৃত্যুর পরে এতদিন পরে তিনি যেন আমায় আবারও হারিয়ে দিলেন।

ঠিকই বলেছিলেন বাবা আমার মত আহাম্মক দুনিয়ার আর দু'টি নেই।

রিণা মার্লোর গল্প

চতুর্থ পর্ব

১

রিণার শরীর ভাল নেই, ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। বিছানার চাদরে গা ঢেকে আপাতত ম্যাগাজিন পড়ে সময় কাটাচ্ছে সে। কিছুক্ষণ একটানা পড়ার পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রিণা, নির্দিষ্ট পাতার কোণ মুড়ে ম্যাগাজিনটা নামিয়ে রাখল বুকের ওপর।

রিণার খাটের কাছে বড় আর্মচেয়ারে শুয়ে আইলিন গেলার্ড দিবানিদ্রায় বিভোর, কাগজের খসখস শব্দে তাঁর ঘুমটা গেল ভেঙ্গে। রিণাকে মন দিয়ে ম্যাগাজিন পড়তে দেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলেন তিনি, এখন সেই ম্যাগাজিন তার বুকের ওপর পড়ে আছে দেখে ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন, 'রিণা, আপনার কিছু লাগবে?'

'না, ধন্যবাদ,' পাশ না ফিরে তাঁর দিকে মুখ ঘোরাল রিণা, 'ক'টা বাজল?'

'কাঁটার কাঁটায় তিনটে।'

'ডাক্তার কখন আসবেন বলেছেন?'

'বিকেল চারটে,' বললেন মিস গেলার্ড। 'আপনার কিছু দরকার হলে আমায় বলতে পারেন, সংকোচ করবেন না।'

'মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন,' বলে রিণা ম্যাগাজিনখানা বুকের ওপর থেকে তুলে খানিকক্ষণ তার পাতা ওল্টাল, তারপরে আবার চাদরের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'এভাবে বিছানায় পড়ে থাকা কি অসহ্য ব্যাপার বলে বোঝানো যায়না। কবে ছাড়া পাব কে জানে।'

'এত অধৈর্য হবেন না!' চেয়ার ছেড়ে উঠে খাটের কাছে এলেন মিস গেলার্ড, আশ্বাস দেবার গলায় বললেন, 'ডাক্তার শীগগিরই আপনাকে ছেড়ে দেবেন, কিন্তু ছাড়া পাবার পরে দেখবেন মনে হবে এখানে গা হাত পা ছড়িয়ে আরও কিছুদিন শুয়ে থাকলেই ভাল হত। ওদিকে ফিল্ম স্টুডিও আপনার জন্য হা পিত্যেশ করে মরছে। কার কাছে যেন শুনলাম 'মাদাম পাঁপাদুর' ছবির কাজ আপনার শরীর খারাপের জন্য আটকে আছে, আপনি ছাড়া পেলেই ঐ ছবির কাজ শুরু হবে। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এই ত গতকালই টেলিফোনে বার্নি নরম্যানের সঙ্গে কথা হল। বার্নি বললেন এ ছবির প্রচুর সামাজিক গুরুত্ব আছে, তাই একজন নামী লেখককে দিয়ে চিত্রনাট্য লেখাচ্ছেন। উনি বললেন স্টুডিওর হেঁজিপেঁজি লিখিয়েরা এ ছবির চিত্রনাট্যে দাঁত বসাতে পারবে না।'

'সামাজিক গুরুত্ব আছে ভাল কথা, শুনতে বেশ লাগে। তা বার্নির সেই বড় আর নামী লেখকটি কে, নাট্যকার ইউজিন ও' নীল?'

'সবই জানেন দেখছি,' ব্যাজার মুখে বললেন মিস গেলার্ড, 'তাহলে আর আপনাকে নতুন করে কি বলব?'

'না, বিশ্বাস করুন,' ঘাড় নাড়ল রিণা, 'সত্যিই আমি এসবের কিছুই জানিনা, আগে কিছুই শুনিনি। এটা স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লাম, লেগে গেল। আপনি আরও যা জেনেছেন বলুন। বার্নি টেলিফোনে আর কি বললেন?'

'বার্নি বললেন, ইউজিন ও' নীলের লেখা শেষ হলেই চিত্রনাট্যের একটা কপি আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন।'

অসুখের মধ্যে এমন একটা খবর শুনে সত্যিই খুশি হল রিণা, তার মন ভরে উঠল— বহুদিন আগের শুকিয়ে যাওয়া প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার স্রোতের উৎস যেন ঐ খবর শুনে আচমকা খুলে গেল এমনি এক সুখের অনুভূতি আপ্লুত করল তাকে। হলিউডের হেঁজিপেঁজি লিখিয়েরা কেউ নয়, কালজয়ী বিদগ্ধ আমেরিকান নাট্যকার ইউজিন ও' নীলের লেখা চিত্রনাট্যের একটি নারীচরিত্রে অভিনয় করবে সে। ও নীলের লেখা শেষ হলে বার্নি চিত্রনাট্যের একটা কপি তাকে পাঠাবেন বলেছেন মিস গেলার্ডকে। অবশ্য তার আগে তাকে ছুটি পেতে হবে এই হাসপাতাল থেকে যা নির্ভর করছে তার পুরোপুরি সেরে ওঠার ওপরে। কথাটা মনে মনে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে খানিক আগে যে উৎসাহ উদ্দীপনার প্রবল স্রোত শিরায় শিরায় বইতে শুরু করেছিল তাতে যেন ভাঁটা পড়ল। তারপরেই প্রচণ্ড মানসিক ক্লান্তি আর অবসাদ আবার আগের মত গ্রাস করল রিণাকে। কাহিনীর সামাজিক গুরুত্ব আছে। খানিক আগে মিস গেলার্ডের মুখ থেকে শোনা ঐ কথাটা মনে পড়তে তার হাসি পেল, শুধু বড় বড় ফাঁকা বুলি। রুজভেল্ট রাষ্ট্রপতি হবার পর থেকেই এমনি বড় বড় বুলি আওড়ানোর রেওয়াজ চালু হয়েছে তা লক্ষ করেছে সে।

'ক'টা বাজল দেখুন না?' ক্লান্ত গলায় অনুরোধ করল রিণা।

'বেশি নয়,' হাসলেন আইলিন গেলার্ড, 'সবে তিনটে বেজে দশ।'

'সেই কখন থেকে ঠায় বসে আছেন.' বালিশে মাথা রাখল রিণা,' এবার বাইরে গিয়ে একটু কফি খেয়ে আসুন।'

'আপনি আমার জন্য একদম ভাববেন না.' হাসলে আইলিন, 'আমি ঠিক আছি।'

'না, ঠিক নেই,' জেদী গলায় বলল রিণা. 'সারাদিন এইভাবে ঠায় বসে থাকলে কেউ ঠিক থাকেনা। আমি বলছি একবার উঠুন, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসুন। ডাক্তার আসার আগে ফিরে আসবেন তাহলেই হবে।'

আর কথা না বাড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আইলিন। একভাবে বসে থাকতে থাকতে তাঁর নিজেরও একঘেয়ে লাগছিল। পায়ে পায়ে খাটের কাছে এসে দাঁড়ালেন আইলন, দেখলেন রিণার বড় বড় দু'টি চোখ বোঁজা। একমাথা সোনালি সাদা চুলের কয়েকটি অবিনাস্ত গুছি উড়ে এসে পড়েছে ছোট কপালে, হেঁট হয়ে সেগুলো সযত্নে ব্রাশ করে দিলেন, তার নীলচে ফ্যাকাশে গালে খুব আলগোছে চুমু খেয়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন কেবিন থেকে। বাইরের ঘরে যুবতী নার্স বসে খাতায় কি যেন লিখছে। তাঁকে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে।

'উনি ঘুমোচ্ছেন,' আইলিন বললেন, 'আমি একটু কফি খেয়ে এখুনি আসছি। ততক্ষণ আপনি একটু নজর রাখবেন।'

'নিশ্চয়ই, মিস গেলার্ড,' 'হাসল যুবতী নার্স, 'আপনি নিশ্চিন্তে যান। তাছাড়া উনি যখন ঘুমোচ্ছেন তখন চিন্তার কারণ নেই। ওঁর একমাত্র চিকিৎসাই হল শান্তিতে ঘুমোনো।'

ক্যান্টিনে ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল ডাক্তারের সঙ্গে, দু'কাপ কফি নিয়ে মুখোমুখি বসলাম দু'জনে।

'রিণা ঘুমোচ্ছেন,' ডাক্তার গরম কফিতে চুমুক দিতে বললেন আইলিন।

'বাঃ, খুব ভাল.' বাইফোকাল চশমার কাঁচের ওপাশ থেকে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার, 'ওঁর আত্মীয়স্বজনেরা কেউ কাছাকাছি থাকেন? মানে প্রয়োজন খবর পাঠানো যাবে এমন কাউকে চেনেন আপনি?'

'না,' আইলিন বললেন, 'যতদূর জানি তেমন কোনও আত্মীয়-স্বজন ওঁর নেই।' কথাটা বলেই চমকে উঠলেন তিনি। ডাক্তার এখনই আত্মীয়স্বজনের খোঁজ করছেন কেন, কি ইঙ্গিত করছেন তিনি? তবে কি রিণা—'

মনের ভাব চাপতে না পেরে আশংকার কথাটা উগরে দিলেন তিনি, এখুনি আত্মীয় স্বজনের খোঁজ করছেন কেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে—' কথাটা শেষ করতে না পেরে মাঝপথেই থেমে গেলেন আইলিন গেলার্ড।

'আমি এখুনি কিছুই ধরে নিচ্ছিনা,' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলেন ডাক্তার, 'তবে কখন কি ঘটে যায় সেকথা ভেবে এসব কেসে আমরা আগেভাগে আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নিই, এই হল ব্যাপার।'

'আমি যতদূর জানি খবর দেবার মত ওঁর কোনও আত্মীয় স্বজন ধারে কাছে নেই,' একই কথা বললেন আইলিন।

'ওঁর পতিদেবতাটি কোথায়?'

'কে, কার কথা বলছেন?' ডাক্তারের শ্লেষ মাখানো প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন আইলিন।

'ওঁর স্বামি কোথায় জানতে চাইছি,' ছুঁচোলো চোখে তাকালেন ডাক্তার, 'বুঝতেই পারছেন, আমি নেভাদা স্মিথের কথা বলছি। রিণার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছিল এটাই ত শুনেছিলাম।'

'ঠিকই শুনেছিলেন,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন আইলিন, 'কিন্তু তিনবছর আগে ওঁদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

'তারপর আর বিয়ে করেননি উনি? তিনবছর ত কম সময় নয়!'

'করেছিলেন বইকি,' বিরক্তি মেশানো গলার জবাব দিলেন আইলিন, 'চলচ্চিত্র পরিচালক ক্লড ডানবারের নাম আশা করি শুনেছেন, ওঁকেই বিয়ে করেছিলেন রিণা।'

'সে বিয়ের পরিণতিও কি ডিভোর্স?'

'না,' রুক্ষগলায় বললেন আইলিন, 'ঐ বিয়ের একবছরের মধ্যে ক্লড আত্মহত্যা করেন।'

'খুবই দুঃখজনক ব্যাপার,' বললেন ডাক্তার,' আসলে গত কয়েক বছরে নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম কিনা তাই এসব খবর জানতেই পারিনি।'

'ওঁর ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট পেয়েছেন?'

'পেয়েছি,' ঘাড় নাড়লেন ডাক্তার।

'কেসটা কি লিউকোমিয়া?' বলতে গিয়ে আইলিন গেলার্ডের গলা কেঁপে গেল।

'না, এনকেফেলাইটিস?'

'না, এনকেফেলাইটিস,' কেটে কেটে বললেন ডাক্তার, 'এই রোগের আরেক নাম ঘুমের অসুখ।'

'তাহলে রিণার সেরে ওঠার আশা আছে?'

'থাকলেও তা খুব সামান্য,' আইলিনের চোখের দিকে তাকালেন ডাক্তার, 'প্রাণে বাঁচলেও ওঁর হাল কি দাঁড়াবে এত আগে বলা যাবেনা।'

'তার মানে?' ডাক্তার সাংঘাতিক কিছু চেপে যাচ্ছেন আঁচ করে ক্ষুব্ধ হলেন মিস গেলার্ড, 'যা বলতে চান খুলে বলুন।'

'আমি যা বলতে চাইছি তা হল এনকেফেলাইটিস এক জাতের ভাইরাস বা সংক্রামক রোগের বীজাণু যা বাসা বাঁধে মানুষের মগজের ভেতরে,' ডাক্তার ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'এখন একটানা চার পাঁচ দিন ওঁর প্রচণ্ড জ্বর হবে। গায়ের তাপমাত্রা যাবে অস্বাভাবিক বেড়ে, এটাই এ রোগের লক্ষণ। মগজের ভেতর ঐ ভাইরাসের তীব্রতা বাড়লেই জ্বর বাড়বে। সত্যি বলতে কি, জ্বর ছেড়ে গেলে তখনই আমরা জানতে পারব ওঁর মস্তিষ্কের কতটা ক্ষতি হয়েছে, তার আগে নয়।'

'মস্তিষ্কের ক্ষতি?' বড় বড় ভীতি মাখানো চোখে তাকালেন আইলিন, 'তার মানে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে যাবে বলছেন?'

'আমি কিছুই বলছিনা, 'ডাক্তার বললেন, 'অনেকরকম ক্ষতি হতে পারে। ওঁর মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে, দেহের আংশিক বা পুরোপুরি পক্ষাঘাত হতে পারে, এমনকি উনি নিজের আর ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের নামও চিরদিনের মত ভুলে যেতে পারেন। স্ট্রোক

হলে যেমন হয় হুবহু তেমনি, মস্তিষ্কের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হল এটা তারই ওপর নির্ভর করে।'

ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন আইলিন, ভয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসছিল। সেটা লক্ষ করে ডাক্তার বললেন, 'কি হল? আপনার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে কেন? জোরে ক'বার শ্বাস নিন ত, তারপরে এক গ্লাস জল পুরো খেয়ে ফেলুন।'

এক গ্লাস জল পুরো খাবার পরে সুস্থবোধ করলেন আইলিন, বললেন, 'আমাদের করবার মত কিছুই কি নেই ডাক্তার?'

'আমরা সাধ্যের ত্রুটি রাখছিনা,' ডাক্তার বললেন, 'আসলে এই রোগবীজাণু সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই আমাদের অজানা রয়ে গেছে। গরম দেশগুলোতে সাধারণত পোকামাকড়ের কামড় থেকে এই রোগ সংক্রামিত হয় জানি। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমেত অন্যান্য দেশে এই রোগ সংক্রমনের কোনও যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানসম্মত কারণ এখনও জানা যায়নি।'

'গরম দেশের কথা বললেন বলেই মনে পড়ল,' আইলিন বললেন, 'তিন মাস আগে ছবি তোলার কাজে আমাদের আফ্রিকা যেতে হয়েছিল।'

'জানি,' ডাক্তার বললেন, 'মিস মার্লো আমায় এখবর আগেই দিয়েছেন। শুনেই পোকার কামড় সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছিল আমার মনে।'

'কিন্তু পোকা কি তাহলে একা ওঁকেই কামড়েছে?' আইলিন বললেন, 'আমাদের সঙ্গে যারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর কেউ ত অসুস্থ হন নি। অথচ ঐ তিন মাস আমরা সবাই একসঙ্গে থেকেছি, খাওয়া দাওয়া করেছি, ঘোরাঘুরি করেছি। তাছাড়া ওখানে থাকার সময় কোনও পোকা ওঁকে কামড়েছে বলে শুনিনি।'

'দেখুন আমি খানিক আগেই বলেছি এরোগ সম্পর্কে আমাদের জানতে এখনও বাকি আছে।'

'এত প্রাণশক্তি রিণার ভেতরে,' ডাক্তারের দিকে চেয়ে আপনমনে বললেন আইলিন, 'ওঁর বদলে এ-রোগ আমার হলনা কেন?' ওঁর যে আমার চেয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা বেশি দরকার।'

'চিকিৎসক হিসেবে এপ্রশ্ন জীবনে কতবার শুনেছি তার হিসেব নেই,' সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে তাঁর হাতে হাত রাখলেন ডাক্তার, 'এতদিনের চিকিৎসকের অভিজ্ঞতায় এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি আমি।'

'এ সম্পর্কে ওঁকে কোনরকম আভাস দেয়া কি ঠিক হবে?' কৃতজ্ঞতার চোখে ডাক্তারের দিকে তাকালেন আইলিন গেলার্ড।

'তাতে লাভ কি হবে,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন ডাক্তার, 'তার চেয়ে ওঁকে ওঁর স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে দিন।'

কেবিনের ভেতর প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অবসাদ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে রিণাকে, চোখ

মেলে তাকানোর ক্ষমতাটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। ঐ অবস্থায় আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে বন্ধ দরজার বাইরে কাদের যেন চাপা গলায় কথাবার্তার ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল তার কানে। এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ভেসে বেড়ানোর মত অনুভূতি হচ্ছে, চারপাশে যা কিছু আছে সব কেমন অদ্ভুত ঝাপসা আর আবছা ঠেকছে। সেই অদ্ভুত আবছা আর ঝাপসা ঘোরের ভেতর এক স্বপ্নের গভীরে ডুবে আগাপাশতলা এলিয়ে গেল রিণা। খুব ছোটবেলায় দেখা মৃত্যুর স্বপ্ন এতবছর বাদে চারপাশে থেকে ঘিরে ধরেছে তাকে। বালিশে মুখ গুঁজে স্বপ্নে বিভোর রিণার মুখে ফুটে উঠল একটুকরো দুর্বোধ্য হাসি।

২

মার্লোদের বাড়ির পেছনের আঙ্গিনায় অনেকগুলো আপেল গাছ সার বেঁধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, তাদের ছায়ায় সবুজ ঘাসের জমিতে বসে ছোট্ট রিণা মিছিমিছি ঘরকন্না খেলছে তার পুতুলদের সঙ্গে।

'অ্যাই সুসি,' কালো চুলে ভর্তি ছোট মেয়ে পুতুলটার কানের কাছে মুখ এনে ধমক দিল সে, 'কতবার বলেছিনা, খেতে বসে অমন অসভ্যের মত গপগপ করে খাবার গিলতে নেই। বয়স বাড়ছে, ভদ্রতা সভ্যতা এসব আর কবে শিখবে? বিয়ের পরে লোকের যত নিন্দেমন্দ ত আমাকেই শুনতে হবে, সবাই আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে, 'এই হল সুসির মা রিণা, মেয়েকে ভদ্র চালচলন মোটেও শেখায়নি।'

সুসির জবাব দেবার ক্ষমতা নেই, বড় বড় নিষ্প্রাণ চোখে সে তাকিয়ে থাকে তার ক্ষুদে পাতানো মায়ের মুখের দিকে।

'এই ত, দিলে ত খাবারের প্লেটটা উল্টে!' বড়দের ঢং নকল করে আক্ষেপের সুরে বলল রিণা, 'ঝোলে তরতরকারীতে ফর্সা জামাকাপড়ের বারোটা বাজল। ওফ্, আর পারিনা আমি তোদের নিয়ে। নাঃ সুসি, আমার মেরে না ফেলে দেখছি তুমি শান্ত হবেনা। এই অবেলায় এখন আবার জামাকাপড়ের ডাঁই কাচতে বসব। সাবান ঘষে ঝোলের দাগ তুলতে হবে নয়ত স্কুলে আন্টিরা বকুনি দেবে। বেশ হয়েছে, আমি নোংরা জামাকাপড় কেচে সাফ করব, ওগুলো না শুকনো পর্যন্ত তোমার উদোম গায়ে শুইয়ে রাখব। থাকো শুয়ে বিছানায়। সেই হবে তোমার উচিত সাজা!' বলতে বলতে পুতুলের গায়ের জামাকাপড় খুলে ফেলল রিণা, চোখ পাকিয়ে বলল, 'আজ শুধু এইটুকু বকুনি দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, সুসি। কিন্তু হুঁশিয়ার। আর কখনও এমনি করে জামাকাপড় নষ্ট করলে আস্ত রাখবনা বলে দিচ্ছি। সে কথা মনে রেখে যা বজ্জাতি করার কোর, বাছা।' একপাশে সরিয়ে রেখে আরেকটা মেয়ে পুতুল তুলে নিল রিণা, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ঠিক মত খাওয়া দাওয়া করছ ত, মেরি? যখন যা জুটবে, পেট ভরে তাই খাবে, তবে না শরীর ভাল হবে। আর শরীর ভাল থাকলে দেখবে মনও ভাল আছে।'

খেলতে খেলতে মুখ তুলে কখনও সখনও তার চোখ গিয়ে পড়ে অদূরে দাঁড়ানো পেল্লায় বাড়ি দিকে। বাড়িতে প্রচুর লোকজন থাকলেও একা নিজের মনে থাকতেই

ভালবাসে ছোট্ট রিণা। বাড়ির বাইরে আপেল গাছের ছায়ায় বসে একা একা আপনমনে তার সময় কাটানোর কথা বাড়ির বাসিন্দাদের অনেকেই জানে, তাই কাজের লোকেদের মধ্যে যারা স্নেহপ্রবণ তাদের কেউ কেউ কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে তাকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ির ভেতরে। রিণার মা বার্থা—ওস্টারল্যাগ মার্লোদের বাড়ির রাঁধুনি, মেয়েকে ঢুকতে দেখে বিনা কারণেই সে ধমকে ওঠে, বাড়ির বাইরে আঙ্গিনায় মাটিতে বসে খেলতে খেলতে মেয়ে পাছে দূরে কোথাও চলে যায় এই ভয়ে তাকে পুতুল নিয়ে রান্নাঘরের দরজার বাইরে বসে খেলতে বলে বার্থা।

মায়ের ধমক মুখ বুঁজে হজম করে রিণা, কিন্তু ভুলেও সে রান্নাঘরের দরজার পাশে খেলাতে বসেনা। বসবেই বা কি করে—একে রান্নাঘরের উনুনের আগুনের অসহ্য তাপ, তারওপর কাছেই আস্তাবল, সেখানকার ঘোড়াদের মলমূত্রের বিটকেল গন্ধ সবসময় বাতাসে ভেসে আসে। মার্লো পরিবারের কর্তা বা গিন্নি দু'জনের কেউ ত কখনও গাছের নিচে বসে তার খেলা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাননা। তাহলে মা কেন এ নিয়ে যখন তখন তাকে বকাঝকা করে, অনেক ভেবেও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়না ছোট্ট রিণা।

মার্লো পরিবারের কর্তা হ্যারিসন তাঁর স্ত্রী জেরাল্ডিনের একমাত্র ছেলে রোনাল্ডকে রিণার সমবয়সী অনায়াসে বলা চলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সে মাঝেমাঝে রিণার খেলার সঙ্গি হয়। কখনও রিণার পুতুলের জন্য করা মিছিমিছি রান্না চেখে দেখার ভান করে রোনাল্ড, আবার কখনও দু'জনে দৌড়ঝাঁপ হুড়োহুড়ি করতে করতে ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। শোবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে তাদের দু'জনকে একসঙ্গে খেলতে দেখে রোনাল্ডের মা জেরাল্ডিনের বুক ভেঙ্গে যায়, ভাবেন একটি মেয়ে থাকলে সে রোনাল্ডের খেলার সঙ্গি হত। একটি কন্যাসন্তানের বাসনা তাঁর বহুদিনের, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে এখন আর তা সম্ভব নয়।

সম্ভব না হলেও করুণাময় ঈশ্বর যে অন্যভাবে তাঁর সে মনোবাসনা পূর্ণ করবেন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি শ্রীমতী জেরাল্ডিন মার্লো। রিণার মা রাঁধুনি বার্থা একদিন আচমকা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেল তাঁরই বাড়িতে। বার্থার স্বামি ছিল পেশায় নাবিক, জাহাজডুবিতে তার মারা যাবার কথা বার্থার মুখ থেকেই জানতে পেরেছিলেন জেরাল্ডিন। বার্থা মারা যাবার পড়ে রিণাকে অনাথাশ্রমে পাঠানোর সদুপদেশ অনেক হিতৈষীই দিয়েছিলেন, কিন্তু সেসবে কান না নিয়ে তাঁরা স্বামি স্ত্রী আইনসম্মতভাবে রিণাকে দত্তক নিলেন, ওস্টারল্যাগের বদলে রিণার নতুন পদবি হল মার্লো।

৩

বড় সড় একখানা ছাতার নিচে ক্যানভাসের চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছেন জেরাল্ডিন মার্লো, ক্ষুদে একখানা হাতপাখা চুলের মুখের কাছে একনাগাড়ে নেড়ে চলেছেন। পাশে আরেকটা চেয়ারে বসে একমনে খবরের কাগজ পড়ছেন তাঁর স্বামি হ্যারিসন।

'উইলসন একটা গাধা!' খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আচমকা নিজের মনে বলে উঠলেন হ্যারিসন।

'আস্ত গাধা!'

'কার কথা বলছ, হ্যারি?' হাত পাখা নাড়তে নাড়তে বললেন জেরাল্ডিন।

'আমাদের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের কথা বলছি,' কাগজ থেকে চোখ না তুলে বললেন হ্যারিসন, 'লীগ অফ নেশনস-এর প্রসঙ্গে এতদিনে উনি বলছেন শান্তি স্থাপনের জন্য ইওরোপে ওঁর না গেলেই নয়। একা কাইজারের জন্য জার্মানি শেষ হয়ে গেল বুঝলে? প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির হেরে যাবার জন্য একা কাইজারই দায়ী।'

'অনেকক্ষণ চামড়ায় কড়া রোদ লাগিয়েছো,' চাপা শাসনের সুরে বললেন জেরাল্ডিন, 'এবার দয়া করে ছাতার নিচে এসে বোস। রোদ লেগে মুখখানা তেতে কেমন লাল হয়ে উঠেছে যদি দেখতে।'

'মা বাবা, তোমরা এখানে?' কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে রিণা থমকে দাঁড়াল তাঁদের সামনে। 'লাঞ্চের পরে পুরো একঘন্টা কেটেছে, এবার একটু জলে নামব?'

'নামব নয়,' জেরাল্ডিন সংশোধন করে দিলেন, 'বলো নামতে দেবে?'

'ও একই হল,' জেরালডিনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আব্দার করল, 'বলো না মা। একবার জলে নামতে দেবে? কথা দিচ্ছি বেশিক্ষণ সাঁতার কাটবনা।'

'ঠিক আছে, যাও,' জেরালডিন হাসিমুখে বললেন, 'তবে দেখো, খুব বেশ দূরে গিয়ে যেন আমার ভাবনা বাড়িয়োনা। আর যত শীগগির পারো ফিরে এসো।'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই দৌড়ে পালাল রিণা। তার বয়সী আর পাঁচটা মেয়ের চাইতে আলাদা মানসিকতা নিয়ে রিণা বড় হচ্ছে লক্ষ করেছেন শ্রীমতী জেরালডিন। সেই কবে কোন ছেলেবেলা এইটুকু মেয়েটা আপেল গাছের নিচে একা একা পুতুল নিয়ে খেলত। নিজের মা মারা যাবার পরে রিণাকে দত্তক নিলেন তাঁরা, তাঁদের পরিবারের একজন হবার পর থেকেই মনের দিক থেকে মেয়েটার বয়স যেন রাতারাতি বেড়ে গেল, রিণাকে আর একদিনও পুতুল নিয়ে খেলতে দেখেননি তিনি। তাঁর পেটের ছেলে রোনাল্ড রিণারই সমবয়সী, ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে ডাকনামে ল্যাডি বলে ডাকে তাকে, রিণার ওঠাবসা, খেলাধুলো সবকিছু তারই সঙ্গে। চড়া রোদে, ঘোর বাদলে কখনও জলে কখনও ডাঙ্গায় ল্যাডির সঙ্গে সমানতালে দস্যিপনা করে বেড়ায় রিণা। রোদ লেগে তার ধপধপে ফর্সা রং পুড়ে তামাটে হয়ে যাবে বলে রিণাকে বহুবার হুঁশিয়ার করেছেন জেরালডিন, কিন্তু সেই হুঁশিয়ারি কানেই তোলেনি রিণা—চামড়ায় ফর্সা রং তামাটে হল কি কালো হল তা নিয়ে তার কোনও মাথাব্যাথা নেই।

'কাল ব্যাঙ্কের কাজে আমায় একবার শহরে না গেলেই নয়,' খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন হ্যারিসন মার্লো, 'তুমি ছেলেমেয়ে দু'টোকে দেখেশুনে রেখো।'

'সে দেখব' খন,' আনমনা ভাবে সায় দিলেন জেরালডিন। আর ঠিক তখনই পেছনে জলের দিক থেকে রিণা আর ল্যাডির সরু গলায় চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এল। 'রিণার ব্যাপারে কিছু ভাবতে হবে, বুঝেছো?' স্বামির দিকে আনমনাভাবে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

'রিণা?' চমকে উঠে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকালেন হ্যারিসন, 'রিণাকে

নিয়ে আবার ভাবনার কি হল?'

'তোমার কি কিছুই চোখে পড়েনা?' স্বামির দিকে মুখ ফেরালেন জেরাল্ডিন, 'সেদিনের ছোট্ট মেয়েটা যে দিনে দিনে বেড়ে উঠছে তা দেখতে পাওনা? নাকি দেখেও দ্যাখোনা?'

'উঁস্‌স্‌-হুঁস্‌স্‌!' অল্প কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন হ্যারিসন,' 'মায়েদের চোখে মেয়েরা সব দেশেই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু আমার কাছে ও সেই ছোট্ট এইটুকু পুঁচকে খুকুমণিই আছে।'

'নাগো, নয়!' ব্যাকুলভাবে কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন জেরাল্ডিন, গলা নামিয়ে বললেন, 'দিনরাত নজর রাখি বলেই বলছি। এখন আর ও খুকুমণি নেই, গেল বছর ও যুগ্যিমত্ত হয়েছে, বিশ্বাস করো। তোমার সেই আদরের খুকুমণি এবার যুবতী হয়ে উঠছেন।'

স্ত্রীর কথার মানে আঁচ করে লজ্জা পেলেন হ্যারিসন, ঘাড় ফেরাতেই ছেলেমেয়ে দু'জনকে জলের ভেতর হুটোপাটি করতে দেখলেন।

'মেয়েটাকে ডাকো, বুঝলে?' স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন তিনি, 'কখন ঢেউ এসে গভীর জলে টেনে নিয়ে যাবে, তখন হবে আরেক কেলেংকারি! ওকে ফেরাও, ফিরে আসতে বলো!'

'আমিও যেমন!' স্বামির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিজের মনে হাসলেন জেরাল্ডিন, নিজের ব্যাঙ্কের কাজকর্ম ছাড়া এসব কিছুই যে তোমার মাথায় ঢোকেনা বুঝেও বারবার একই ভুল করছি আমি। মুখে বললেন, 'না, না, ডাকাডাকি করার কোনও দরকার নেই, খেলুক ওরা যেমন খেলছে। তাছাড়া মেয়ে তোমার মাছের মত সাঁতার কাটতে শিখেছে তাই ওকে জলে পাঠিয়ে আমি ডরাই না। আমাদের ল্যাডির চেয়েও ভাল সাঁতার কাটতে শিখেছে তোমার রিণা।'

'তুমি কথাটা বললে বলেই বলছি।' খবরের কাগজ কোলের ওপর নামিয়ে রেখে স্ত্রীর চোখে চোখ রাখলেন হ্যারিসন, 'এইসময়, মানে মেয়েদের যখন যৌবন আসে, সেইসময় শরীরের সব ব্যাপার স্যাপারগুলো ওকে সংক্ষেপে সাধারণভাবে দু'চারকথায় বুঝিয়ে দেয়া কি উচিত নয়? তুমি ত জানো, ল্যাডির কাছে এসব কিছুই আমি গোপন করিনি, ও বড় হচ্ছে বুঝতে পেরে দু'বছর আগে সব বলেছিলাম। কিভাবে মানুষ বাবা মা হয়, এইসব ব্যাপার আর কি, আমার মনে হয়, রিণাকেও এসব আগে থেকে তোমার বুঝিয়ে বলা দরকার।'

স্বামির কথা শুনে জেরাল্ডিনের বেদম হাসি পেল। বহুকষ্টে হাসি চেপে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'এই না খানিক আগে বলছিলে মেয়ে তোমার কাছে এখনও খুকুমণিই আছে? আমি বললাম আর অমনি ওকে পাকানোর মতলব? আচ্ছা, তোমার নিজের বয়স কবে বাড়বে বলতে পারো? এসব ব্যাপার স্যাপার যে মেয়েদের আগেভাগে শেখানোর কোনও দরকার হয়না। সব যথাসময় নিজেরাই শেখে ওরা অবস্থা বিশেষে। এই সহজ সরল সত্য আর কবে শিখবে তুমি বলতে পারো?'

'ও, তাই বলো,' বলে খবরের কাগজখানা আবার চোখের সামনে মেলে ধরলেন হ্যারিসন মার্লো।

'রিণাকে নিয়ে আমার তেমন ভাবনা নেই,' খানিক আগের মত আনমনাভাবে বলতে লাগলেন জেরাল্ডিন, 'বয়ঃসন্ধিকালে যেসব ছেলেমেয়ে কোনরকম ধাক্কা না খেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন না করে যৌন শিক্ষা পায়, ও তাদের একজন। কি চমৎকার চামড়া রিণার, কোথাও ব্রণ, ফোঁড়া এসবের দাগ নেই। পেটের ছেলে হলে কি হবে, আমার ল্যাডির চামড়া ওর মত এত মোলায়েম মসৃণ নয়, অথচ প্রায় সমবয়সী দু'জনেই। রিণাটাকে একটু ভালভাবে গড়ে পিঠে তুলতে হবে। এবার ওর বুক না ঢাকলেই নয়, ভাবছি শহর থেকে কিছু ব্রা কিনে এনে ওকে পরাব।'

তাঁর স্বামি কিছু না বলে একমনে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন।

'এইটুকু বয়সে এখনই ওর বুকের গড়ন আমার সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে,' স্বামির কাছ থেকে কিছু শোনার আশায় জেরালডিন বললেন, 'আমার ত মনে হয় আমার আর ওর বুকের মাপ প্রায় এক। পেটে না ধরলে কি হবে, দেখে নিয়ো আরেকটু বড় হলে আমার রিণা কেমন ডাকসাঁইটে রূপসী হবে!'

'হবে নাই বা কেন,' মৃদুগলায় বললেন হ্যারিসন, 'রিণাকে যে কোলেপিঠে করে বড় করে তুলছে তার রূপ কি কম?'

'হ্যাঁগো,' স্বামির কানের কাছে মুখ এনে আবদার করলেন জেরাল্ডিন, 'আজ আমায় একবার শহরে নিয়ে যাবে? একটা রাত কোনও ভাল হোটেলে কাটিয়ে কাল ফিরে আসব।'

'মন্দ বলোনি,' স্ত্রীর হাতে আলতো চাপ দিলেন হ্যারিসন। 'কথাটা আমিই পাড়ব ভাবছিলাম।'

'ছেলেমেয়েদের জন্য ভেবোনো,' জেরালডিন হাসলেন, 'মলি আছে, সে ওদের সময়মত খাইয়ে দেবে। তারপরে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ভাবনা কি, গান গেয়ে ঘুম পাড়ানোর বয়স ত ওরা দু'জনেই পেরিয়ে এসেছে। আজকের সন্ধেটা একটু বেরিয়ে হোটেলে খেয়ে দেয়ে কাটাব, তারপরে কাল সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়ব। ফেরার পথে কেনাকাটা যা করার করা যাবে।'

'তাই হবে,' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন হ্যারিসন, 'আমি এক্ষুণি হোটেলে ফোন করে ঘর বুক করছি। তুমি সেজেগুজে চটপট তৈরি হয়ে নাও! এক চোখ টিপে হাসলেন হ্যরিসন, 'হোটেলে পা দিয়েই যাতে মার্টিনি চেখে গলা ভেজাতে পারি সে কথা আমি আগে ভাগে ফোনে ওদের বলে রাখছি।'

'বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি হচ্ছ, জানো? একটা ধেড়ে লোচ্চা!' বলে হাসতে লাগলেন জেরাল্ডিন।

সমুদ্রের ধারে খানিকটা জায়গা বাঁধিয়ে সিঁড়ি আর ডাইভিং বোর্ড তৈরি হয়েছে সাঁতারুদের জন্য। সমবয়সী বন্ধু টমি র‍্যাণ্ডালের সঙ্গে এতক্ষণ সেই ডাইভিং বোর্ড থেকে নিচে ছুটে আসা বড় বড় ঢেউ-এ বুকে বারবার ঝাঁপ দিচ্ছিল ল্যাডি। এবার রিণাও

এসে মাতল সেই খেলায়। বেদিং সুট পড়া রিণাকে তাদের দেখাদেখি পরপর ক'বার ঢেউ-এর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বিরক্ত হল ল্যাডি। ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুই আবার আমাদের মাঝখানে এসে ভিড়ে গেলিযে বড়। যাঃ! মেয়েরা যেখানে ডাইভ দিচ্ছে সেখানে যা!'

'আই চোপ!' সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শিরদাঁড়া টানটান করে ধমকে উঠল রিণা. 'নিজের চরকায় তেল দে।

'কোথায় নোটিস ঝুলিয়েছে এটা শুধু ছেলেদের জন্য আমায় দেখিয়ে দে, আমি চলে যাব. তার আগে একদম মুখ নাড়বি না বলে দিচ্ছি!' বলেই তড়বড় করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আবার ঢেউ-এর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

'থাক গে, কিছু বলিস না,' রিণার বুকের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল টমি র‍্যাণ্ডাল, 'হিম্মত থাকলে যত খুশি ডাইভ দিক তাতে তোর আমার কি! আগে দেখি কতক্ষণ দম রাখতে পারে।'

কথাটা কানে যেতে জল থেকে উঠে তাদের দিকে তাকাল রিণা; ফচ্‌কে টমিটা অনেকক্ষণ থেকে তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে আড়চোখে আগেই দেখেছে রিণা। এবার দেখল ল্যাডিও হ্যাঁ করে তাকিয়ে তার বুক দেখছে। বুকের দু'দিকে চাপা বেদনা অনুভব করছে সে, ব্যথা হচ্ছে স্তনবৃন্তের। আবার সামনের দিকে তাকাল রিণা, দেখল ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই, দারুণ মজার জিনিস দেখার চাউনি মেলে তাকিয়ে আছে তার বুকের দিকে।

'অ্যাই, তোরা হাঁ করে কি দেখছিস রে?' ধমকে উঠল রিণা। ধমকে কাজ হল, সঙ্গে সঙ্গে টমি চোখ ঘোরালো জলের দিকে, ল্যাডি তাকালো খানিক দূরে বাঁধা রবারের ভেলার দিকে।

'চোখ ঘুরিয়ে নিলে কি হবে,' গলা অল্প চড়াল রিণা। 'দুটোকেই হাতে নাতে ধরেছি। আমি দেখেছি তোরা হাঁ করে আমার বুকের দিকে এতক্ষণ তাকিয়েছিলি!'

'বাজে কথায় কান দিস্‌নে, টমি,' ল্যাডি সঙ্গির উদ্দেশে বলল, 'যত উটকো লোক এসে ভিড় জমাচ্ছে, আয় চলে আয়।' বলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভেলার কাছে। ভেলায় চেপে খানিক আগের মত জলে ডাইভ দিতে লাগল তারা।

দুটো আজব জানোয়ার, মনে মনে বলল রিণা, আমার ভাইটিও দেখছি কম যায় না।

আরও কয়েকবার ডাইভ দেবার পরে সিঁড়ির গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল রিণা, আঁটোসাটো বেদিং স্যুট যেন দুই স্তনের মাংস কেটে বসেছে। বুকের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে রিণা এক ঝাঁকুনি দিয়ে বেদিং স্যুটের ফাঁস খুলে ফেলল।

দু'হাতের দিকে তাকাল রিণা তারপরে ঘাড় হেঁট করে তাকাল বুকের দিকে— রোদে পুড়ে হাতের চামড়া তামাটে হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার দুটি স্তনবৃন্তের রং এখনও আগের মতই গোলাপি আছে।

আলতো আঙুল বুলিয়ে দেখল স্তনবৃন্ত দু'টি পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠেছে সেইসঙ্গে

এক অদ্ভুত ব্যথা শুরু হয়েছে ভেতরে। অসহ্য যাতনা নয়। এ ব্যথায় আছে এক আরামের স্বাদ।

সূর্য হেলে পড়ছে পশ্চিম দিগন্তে, শেষ হয়ে হাসছে বেলা। পড়ন্ত রোদে দাঁড়িয়ে বেলাশেষের সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকের দু'দিকের আরামদায়ক সেই অদ্ভুত ব্যথা একা উপভোগ করতে লাগল রিণা।

৪

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন কেনা দামি ব্রা-র ফিতে আঁটতে আঁটতে বুক ভরে শ্বাস নিল রিণা, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল।

'দ্যাখো মা, এবার ঠিক হয়েছে ত?'

'শেষ হুকটায় আঁটো, সোনা' খাটের ধারে বসে বললেন জেরাল্ডিন।

'অনেক চেষ্টা করেছি মা,' রিণার গলায় আক্ষেপের সুর, 'নিজের চোখেই ত দেখলে, কিছুতেই হলনা, ফিতে দুটো বুকের দু'দিকের মাংস কেটে বসে যাচ্ছে।'

মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন জেরাল্ডিন। বাড়ন্ত গড়ন হবার ফলে তাঁর কিনে আনা ব্রা রিণার ছোট হচ্ছে, তখনই আঁটোসাটো করে দিতে আঁটতে রীতিমত কষ্ট পাচ্ছে বেচারি। এর পরের বার আরেক সাইজ বড় দেখে কিনতে হবে। তিনিই বা কি করবেন। চৌত্রিশ সাইজের ব্রা এত পাতলা ছিপছিপে শরীরে খাটো হবে তা তিনি জানবেন কি করে। পনেরোয় পা দিতে রিণার এখনও দু'বছর বাকি, এরই মধ্যে তার স্তনদু'টি যে পূর্ণযুবতীর বুকের মত এমন বেঢপভাবে বেড়ে উঠছে দিনরাত চোখের সামনে থাকলেও বুঝতে পারেন নি তিনি। আয়নার দিকে তাকাতে রিণা লক্ষ করল মা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার বুকের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'এরপরে আরেক সাইজ বড় দেখে ব্রা কিনো। আর হ্যাঁ, আমার আর কয়েকটা বেদিং স্যুট কিনে দাওনা মা, পুরোনোগুলো সব ছোট হয়ে গেছে, পরতে কষ্ট হয়।

'আমিও তাই ভাবছি, সোনা,' আয়নার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে বললেন জেরালডিন, 'বেদিং স্যুটের সঙ্গে তোমার নতুন কিছু জামাকাপড়ও দরকার। ব্রেকফাস্ট খেয়ে তোমার বাবার সঙ্গে হায়ানিজ পোর্টের দিকে যাব ঠিক করেছি। ওখান থেকে কিছু কেনাকাটা করব।'

'ওঃ মা!' দৌড়ে এসে দু'হাতে জেরালডিনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে মুখ গুঁজল রিণা। গর্ভধারিণী বার্থা বেঁচে থাকতে সে ছিল খুবই ছোট, তখনও একেক সময় এইভাবে তার বুকে মুখ গুঁজত তার স্পষ্ট মনে আছে। জেরাল্ডিনের বুকে মুখ গুঁজে বার্থার বুকের গন্ধ আজও হাতড়ে বেড়ায় রিণা।

প্রবল মাতৃস্নেহে রিণার মাথাটা অনেকক্ষণ বুকে চেপে ধরে থাকেন জেরাল্ডিন। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখখানা তুলে ধরেন, রিণার দু'চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজেন।

'কি হল, সোনা?' রিণার সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে জানতে চান জেরাল্ডিন।

'কিছু না, মা,' বলতে গিয়ে অচেনা অজানা আবেগে বারবার গলা ধরে আসে। অনেক কষ্টে বলে ওঠে, 'তুমি না বলছিলে আমি বড় হয়ে উঠছি। তাই তোমার বুকে মুখ গুঁজে দেখছি কতটা বড় হয়েছি।'

'শোন মেয়ের কথা!' রিণার মুখখানা আবার কিছুক্ষণ বুকে চেপে ধরেন জেরাল্ডিন, তারপর তার দু'গালে কপালে চুমু খেয়ে বলেন, বলেছি বলেই তোকে এখুনি বড় হতে হবে ভেবেছিস নাকি? ল্যাডি ত এমনিতেই হাতে পায়ে বড় হয়েছে, এখন আর ধারে কাছে ঘেঁষে না, এমনভাবে তাকায় যেন আমি কত দূরের মানুষ। তারপরে তুইও যদি ওর মত বড় হয়ে যাস তবে আমি কাকে নিয়ে থাকব তুইই বল্? আমার ত আর ছেলেপিলে নেই। না, সোনা, তোমার এখনই বড়সড় হয়ে কাজ নেই, তুমি আরও যে ক'বছর পারো আমাদের ছোট্ট খুকুমণি হয়েই থাকো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ল্যাডি বলটা ফার্স্ট বেস-এ ছুঁড়ে দিতেই জুতোয় একরাশ ধুলো উড়িয়ে রাণার পাক খেয়ে গিয়ে দাঁড়াল নিরাপদ অবস্থানে। ধুলোর মেঘ সরে যেতে 'তুমি আউট!' বলে আম্পায়ার চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বেসবল ম্যাচ শেষ হল।

'জোয়ান কবে আসবে রে?' বাড়ি ফেরার পথে টমি র‍্যাণ্ডালকে প্রশ্ন করল ল্যাডি।

'জোয়ান মানে আমার পিসতুতো বোনের কথা বলছিস?'

' পেঁয়াজি হচ্ছে?' রাগ রাগ গলায় বলল ল্যাডি, 'ঐ নামে আরকটা মেয়ে আছে তোর লিস্টে?'

'হয়ত এই উইকএণ্ডেই চলে আসবে,' বলতে গিয়ে হেসে ফেলল টমি।

'ভাল খবর দিলি ভাই!' টমির পিঠে আলতো চাপড় দিল ল্যাডি, 'এবার জোয়ান এলে ওকে নিয়ে সিনেমায় যাব।'

'বাঃ, সাবাস!' ঘোঁত ঘোঁত করে বলল টমি, 'তুমি ত বাপু দিব্যি নিজের লাইন ক্লিয়ার করে নিলে, কিন্তু দু'জন হলে বসে ছবি দেখার ফাঁকে মজা লুটবি আর আমি একা পাশে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাই দেখব। আমি কাকে নিয়ে যাব?'

'তুই কাকে নিয়ে যাবি আমি কি করে বলব?' ল্যাডি হাত উল্টে বলল, 'আমার মত একজনকে আগে খুঁজে বের কর, দেখ সে রাজি হয় কিনা।'

জবাব না দিয়ে অনেকক্ষণ গুম খেয়ে রইল টমি, খানিকবাদে তুড়ি মেরে বলল, 'পেয়েছি!' বলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি পেয়েছিস, কাকে পেয়েছিস?'

'তোর বোন রিণাকে পেয়েছি,' এতটুকু ভাবনা চিন্তা না করে দিব্যি বলল টমি, 'তুই নিয়ে যাবি আমার পিসতুতো বোনকে, আর আমি নিয়ে যাব তোর বোনকে।'

'রিণার কথা বলছিস?' হাসল ল্যাডি, 'কিন্তু ওযে বাচ্চা মেয়ে। আমার চেয়ে অনেক ছোট।'

'বটে, ছোট?' ল্যাডির কথায় চটে উঠল টমি,' আমার বোনকে বাগানোর বেলায় ত দিব্যি এগিয়ে এলে বাপু তাহলে নিজের বোনটির বেলায় এই দাদাগিরি কেন? বোন

তোমার পুঁচকে, ছোট, না? কত ছোট সেদিন নিজের চোখেই ত দেখলাম। বাপ্স, বুক ত নয় যেন পাশাপাশি দুটো পাহাড়, বেদিং স্যুট ফেটে বেরিয়ে আসছে!'

'বিশ্বাস কর টম্, রিণার গড়ন বরাবরই বাড়ন্ত, কিন্তু আসলে ওর বয়স খুব কম, সবে তেরোয় পা দিয়েছে।'

'তোর তেরোয় ইয়ে—!' আচমকা একটা খারাপ গালি দিল টম, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তেরো বছরের মেয়েকে আর যাই হোক পুঁচকে বা ছোট বলা যায় না রে, ল্যাড়ি। আমার পিসতুতো বোন জোয়ানার বয়সই ত চোদ্দ। গেল বছর গরমের ছুটিতে আমাদের বাড়ির পেছনের বারান্দায় যখন তুই ওকে আদর করে চুমু খেলি তখন ওর বয়সও ছিল তেরো।'

'বেশ,' টমি তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলল, 'তুই নিজেই রিণাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ্। তবে আমার মা ওকে আমাদের সঙ্গে সিনেমায় পাঠাতে রাজি হবে বলে ত মনে হচ্ছেনা।'

'তুই বললে রিণা ঠিকই রাজি হবে,' বলল টমি, 'বাড়ি গিয়ে এখুনি জিজ্ঞেস করে দ্যাখ্।'

'এখন বাড়ি ফিরে আগে আমি গরম জলে সাবান মেখে ভাল করে চান করব,' ল্যাডি বলল, 'তারপর নতুন স্যুট গায়ে চাপাব। তারপরে মুড ভাল থাকলে রিণাকে জিজ্ঞেস করে দেখব। তুই হাত পা ধুয়ে জলের ধারে চলে আয়।'

'আসব, তুইও আয়।' বলে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বাড়ির দিকে এগোল টমি র‍্যাণ্ডাল।

'মলি?' বাড়িতে পা দিয়েই কাজের মেয়ের নাম ধরে ডাকল ল্যাডি, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল আজ বৃহস্পতিবার। মলির সাপ্তাহিক ছুটির দিন। 'মা! মা!' বলে জোরে জোরে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল সে।

'মা বাবা, কেউ বাড়ি নেই!' রিণার গলা ভেসে এল ওপর থেকে, 'রাতে কাদের সঙ্গে ডিনার পার্টি আছে, সেখানে খানিক আগে বাবা মাকে নিয়ে গেল।'

'তাই বল্!' বলে ল্যাডি হাত মুখ ধুয়ে এসে ঢুকে পড়ল কিচেনে। আইসবক্স খুলে বের করল এক বোতল দুধ আর এক টুকরো চকোলেট কেক। বোতলের ঠাণ্ডা দুধ পুরোটাই চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিল, তারপরে কেকটা খেল তারিয়ে তারিয়ে। আর কেকটা খাবার পরেই মনে পড়ে গেল গায়ে চর্বি জমবে এই ভেবে সে মিষ্টি না ছোঁবার শপথ করেছিল ক'দিন আগে।

এরপরে আলসেমি পেয়ে বসল ল্যাডিকে, বাথরুমের দোর বন্ধ হবার পরেপরেই জলে ভেজা পা ফেলার ছপছপ আওয়াজ রিণার শোবারঘরের দিকে যাচ্ছে। সূর্য ডুবে গেলেও সন্ধে হতে এখনও ঢের দেরি, এখনও আঁধার নামেনি। রিণার একপাল মেয়ে বন্ধু আছে যাদের সব ক'টাকে তার নিরেট বোকাবুদ্ধু ছাড়া আর কিছু ভাবতে ভাল লাগে না। আর সব দিনে তাদের সঙ্গে এইসময় জলের ধারে দৌড়ঝাঁপ করে রিণা। কিন্তু আজ এমনকি হল যে রিণা এইসময় বাড়িতে বসে? অনেক ভেবেও কারণটা ভেবে বের করতে পারল সে।

টমি খানিক আগে হয়ত ঠিকই বলেছিল, ল্যাডির মনে হল, রিণা বড় হয়ে উঠছে। আর বলবে নাই বা কেন; যেমন নির্লজ্জের মত বুক দেখিয়ে কাল বারবার ডাইভ দিচ্ছিল তা দেখে কে না হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে? ল্যাডি মুখে যাই বলুক, কাল রিণাকে ঐ অবস্থায় দেখে তার একবারও বাচ্চা মেয়ে বলে মনে হয়নি। টমি একটা কথা ঠিকই বলেছে—তার নিজের পিসতুতো বোন জোয়ানের চাইতে রিণার দু'টি স্তন আকারে ঢের ঢের বড়। ধারে পা ঝুলিয়ে কিছুক্ষণ বসেছিল রিণা, সাগরের ঢেউ বারবার এসে ওর পা দুটো ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। রিণার একরাশ ভেজা লম্বা সোনালি চুল ঝাপটে পড়েছিল দু'কাঁধে, ফোলা আর পুরু দেখাচ্ছিল তার নিচের ঠোঁট, সে ছবি মনে পড়তে ল্যাডির গা যেন তেতে পুড়ে উঠল, নিজের অজান্তে চাপা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল তার ঠোঁট দিয়ে। না, আর নয়, যখন তখন নিজের কামপ্রবৃত্তির বশীভূত আর হবে না বলে নিজেকে কথা দিয়েছে সে। শেষবার আর নয়। মনে জোর এনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ল্যাডি, এঁটো প্লেট আর দুধের খালি বোতল সিঙ্কে রেখে জল চোখে হাত ধুয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল কিচেন থেকে। এবার ঠাণ্ডা জলে সাবান মেখে চান সেরেই আবার বেরিয়ে পড়বে, সাগরতীরে খানিক বাদে টমি আসবে বলেছে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যাডি। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক তার মুখোমুখি রিণার ঘর, সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছে ল্যাডি দেখল যে ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে জোরালো আলো, চলাফেরা করার আওয়াজ কানে আসতে কৌতূহলী হল ল্যাডি, সিঁড়ির চওড়া ধাপে নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে বসে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল সে।

ঘরের ভেতর রিণার পরনে শুধু আঁটো ব্রা আর অন্তর্বাস, খোলা দরজার দিকে পেছন ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত। ল্যাডি দেখল হাত পেছনে নিয়ে পিঠের হুক খুলে ফেলল রিণা। পরমুহূর্তে অন্তর্বাসের বাঁধন খুলে পা দুটো বের করে আনল ভেতর থেকে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ঘরের ভেতর এগিয়ে গেল সে, ফিরে এল একটা বেদিং স্যুট হাতে নিয়ে। আয়নার সামনে আবার এসে দাঁড়াল রিণা, নিজের উলঙ্গ দেহ কয়েক মুহূর্ত খুঁটিয়ে দেখল। তারপরে বেদিং স্যুটের ভেতরে পা গলাল। ওপরের দিকটা টেনে তুলে কাঁধের ফাঁস ঠিক করতে উদ্ধত বুক ঢাকা পড়ল।

দরজার বাইরে সিঁড়ির ধাপে হাঁটু গেড়ে বসা ল্যাডির কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। এই প্রথম সে একটি মেয়েকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখল। আবরণহীন উলঙ্গ নারীদেহে এত সৌন্দর্য এত উত্তেজনা লুকোনো আছে আগে জানতনা ল্যাডি। পা দুটো টনটন করছে তাই উঠে দাঁড়াল ল্যাডি, রিণার ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে। দরজা ভেজিয়ে দেবার পরে ল্যাডি দেখল উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপছে থরথর করে। কাঁপতে কাঁপতে খাটের একধারে বসে পড়ল সে। ঘরে ঢোকার পরে তার উত্তেজনা যে আরও বেড়ে গেছে তা বেশ টের পাচ্ছে সে।

না সে এতটুকু টলবে না, নিজেকে বোঝাল ল্যাডি, কখনো কোনমতেই না। এখন যদি টলে গিয়ে একবার পা ফস্কায়, তাহলে আজীবন, এইভাবেই চলতে হবে তাকে প্রবৃত্তি-

ক্রীতদাস হয়ে। নিজের মনকে এইভাবে বোঝানোর ফলে সুস্থবোধ করল ল্যাডি, রুমালে কপালের ঘাম মুছে নেমে পড়ল খাট থেকে।

ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নিজের আত্মসংযম বাড়ানো, এটাই এইমুহূর্তে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। তার জানার গণ্ডিতে যতরকম প্রলোভন আছে সে সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। যেসব অশ্লীল ছবি সে কিনেছে সেসবও পড়ছে এই প্রলোভনের গণ্ডির ভেতরে।

ড্রেসারের দেরাজ খুলে ভেতর থেকে দ্রুতহাতে অশ্লীল ছবিগুলো বের করে আনল ল্যাডি, সেগুলোর দিকে একটিবারও না তাকিয়ে উল্টো করে রেখে দিল ড্রেসারের ওপর। ল্যাডি স্থির করল খানিক বাদে চান করার সময় ছবিগুলো ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দেবে টয়লেটে, তারপর জলের তোড়ে ওগুলো ভেসে তলিয়ে যাবে নর্দমার পাঁকে।

জামাকাপড় খুলে চানের বাথরোব গায়ে চাপাল সে, পেছন ফিরে না তাকিয়ে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। অশ্লীল ছবিগুলো পড়ে রইল ড্রেসারের ওপরে, প্রবল আত্মবিশ্বাস ওগুলোর কথা ভুলিয়ে দিল তাকে।

চান সেরে বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মোছার সময় তার ঘরের ভেতর পায়চারি করার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল ল্যাডি, আর ছবিগুলোর কথা তখনই তার মনে পড়ে গেল। তক্ষুণি বাথরুমের দরজা খুলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এসে ঢুকল সে।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, ঘরে ঢুকে ল্যাডি দেখল অশ্লীল ছবিগুলো মুঠোয় চেপে ধরে ড্রেসারের সামনে দাঁড়িয়ে রিণা। তাকে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'ল্যাডি, এসব বাজে নোংরা ছবি তুমি কোথায় পেলে?' চাপা উত্তেজনায় তার গলা যে কেঁপে গেল ল্যাডির কান এড়াল না।

'যেখানে থেকেই পাই তা দিয়ে তোর দরকার কি রে?' বলে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল ল্যাডি 'দে, ওগুলো আমায় ফিরিয়ে দে!'

'দেব না, ভাগ্!' বলে মুচকি হাসল রিণা, ছবিগুলো মুঠোয় চেপে পেছন ফিরে বলল, 'দাঁড়া, আগে ভাল করে দেখি, ফিরিয়ে দেবার কথা তারপরে ভাবব।'

'না!' গর্জে উঠল ল্যাডি, 'ভাল চাস ত এখুনি ফিরিয়ে দে বলছি।'

তার হাতের নাগাল থেকে বাঁচাতে ছবিগুলো নিয়ে রিণা লাফিয়ে উঠে পড়ল খাটে, ওপাশে গিয়ে নেমে দাঁড়াল। তাকে রাগানোর মতলবে বলল, 'ফিরে পাবার জন্য এত ছটফট করছিস কেন, ল্যাডি? বললাম ত আমি আগে দেখে নিই তারপরে ভেবে দেখব এগুলো তোকে ফিরিয়ে দেয়া যায় কিনা। আগে আশ মিটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি, তারপরে ইচ্ছে হলে তোকে ফিরিয়ে দিতে পারি, আবার মন চাইলে মার হাতেও তুলে দিতে পারি। তুই মুখ বুঁজে শুধু দেখে যা!'

'না!' মায়ের হাতে রিণা ঐসব ছবি তুলে দেবে শুনে ভীষণ রেগে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল ল্যাডি, দৌড়ে খাটে উঠে ওপাশে গিয়ে হাত বাড়িয়ে খামচে ধরল রিণার কাঁধে আঁটা ব্রা-র ফিতে। জোরে টান লাগতে ফিতে ছিঁড়ে অনাবৃত হল রিণার কাঁধ

আর বাঁদিকের স্তন। সেদিকে চোখ পড়তে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ল্যাডি।

'আই, তুই আমার ব্রা-র স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে দিলি কেন?' উত্তেজিত হয়ে নয়, শান্ত স্বাভাবিক গলায় বলে উঠল রিণা। ল্যাডি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখেও অনাবৃত স্তন ঢাকবার চেষ্টা করলনা সে।

'কি হল, মুখে জবাব নেই কেন, কি দেখছিস অমন হাঁ করে?' আবার বলে উঠল রিণা।

ল্যাডি যেন জবাব দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, পলক না ফেলা চাউনি মেলে একভাবে তাকিয়ে আছে রিণার বুকের দিকে। এবার রিণা ডানহাতে বুক আড়াল করে মৃদু হাসল, 'তাহলেই বল্, ঐসব ছবিতে ছাপানো মেয়েগুলোর মতই আমায় সুন্দর দেখতে কিনা, তুই-ই বল্।'

'কি হল, বল্?' অধৈর্য গলায় বলে উঠল রিণা, 'একবারটি বল্ আমায় দেখতে ওদের মত সুন্দর কিনা, বল্ না! ও, বলতে লজ্জা হচ্ছে? ঠিক আছে, এখন বাড়িতে আর কেউ নেই, এইবেলা আমায় চুপিচুপি বল্। কথা দিচ্ছি, আমি একথা কাউকে বলবনা। মাকে, বাবাকে, কাউকে না। বল্ না, ল্যাডি। তবু চুপ করে থাকবি তুই? আরে বোকা, তোর মুখ থেকে জবাবটা শুনব বলেই না খানিক আগে দরজা খুলে ব্রা-র ফিতে আঁটছিলাম। সেই যে তুই যখন বাইরে সিঁড়িতে বসে লুকিয়ে দেখছিলি আমায়।'

'তুই টের পেয়েছিলি আমি তোকে দেখছি?' এতক্ষণে কথা ফুটল ল্যাডির মুখে।

'হ্যাঁরে বোকা, আমি সবই দেখেছি, সব টের পেয়েছি,' হাসল রিণা। 'এতে অবাক হবার কি আছে? আমি যে তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তা তোর চোখেই পড়েনি। আয়নার দিকে তাকাতেই দেখলাম তুই সিঁড়ির ধাপে বসে গিলে খাবার মত হাঁ করে তাকিয়ে আছিস আমার দিকে, মনে হচ্ছিল তোর চোখদুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।'

'তুই হাসছিস বটে কিন্তু এটা মজার ব্যাপার নয়,' বলতে গিয়ে ল্যাডি টের পেল তার শরীর গরম হয়ে উঠছে।

'দাদাগিরি না ফলিয়ে চোখ তুলে আমার আগাপাশতলা ভাল করে খুঁটিয়ে দ্যাখ্,' রিণা হাসল, 'তারপরে তোর চেনাশোনা যত ছোঁড়া আছে সব ক'টাকে নিয়ে আয়, তারাও দেখুক আমায়। আমি নিজে ত তাই চাই।'

'তুই চাইলে কি হবে,' গম্ভীর গলায় বলল ল্যাডি, 'সেটা ঠিক হবেনা।'

'কেন, এতে ঠিক না হবার আছেটা কি?' চেঁচিয়ে উঠল রিণা, 'আমার মন চাইছে তাই ত তোকে দেখছি, হাঁ করে তাকিয়ে আছি তোর দিকে। তুই নিজেও পাল্টা আমায় দেখবি না কেন?'

'এ নেহাৎ তোর মুখের কথা,' বলল ল্যাডি, 'সত্যিই ত তুই আমায় দেখিসনা।'

'দেখব না কেন,' দুষ্টু হাসি ফুটল রিণার ঠোঁটে 'দেখেছি ঠিকই, তবে লুকিয়ে তোকে জানতে না দিয়ে।'

'কবে দেখেছিস? কোথায় দেখেছিস?'

'এর মাঝে একদিন বাড়িতে কেউ ছিলনা সেদিনের কথা বলছি। বিকেলবেলা তুই সাগরতীর থেকে ফিরে এলি, মনে নেই? বাড়িতে এসেই গেলি বাথরুমে। তোর চোখমুখ সেদিন কেমন যেন অন্যরকম ঠেকছিল, দেখেই আমি উঁকি দিলাম বাথরুমের জানালায়, ভেতরে তুই যা যা করলি সব দেখলাম।'

'সব দেখলি?' রিণার অকপট সত্যভাষণ শুনে অজানা আতংকে ল্যাডির বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

'সব দেখলাম,' আত্মতৃপ্তির গলায় বলল রিণা, 'দেখলাম তুই বাথরুমে নর্দমার সামনে দাঁড়িয়ে এক মনে তলপেটের ব্যায়াম করছিস,' বলে ল্যাডির চোখে চোখ রেখে হাসল সে, 'ব্যায়াম করা ভাল, ওতে শরীর মন দুটোই ভাল থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ওটা এত বড় হয়ে উঠেছে তা আগে জানতে পারিনি, বিশ্বাস কর্। যখন ছোট ছিলি তখন ওটা ঠিক কড়ে আঙ্গুলের মত এইটুকু ছিল। আমার ধারণা ছিল ওটা দেখতে এখনও তেমনই আছে। জানিস ল্যাডি, তখন একেকসময় আমার মনে হত তোর ওটা ঝুলতে ঝুলতে একদিন ঠিক টুপ করে খসে পড়বে।'

'অনেক বাজে বকেছিস, এবার থাম্।' পৌরুষের অপমানে ছটফটিয়ে উঠে হেঁড়ে গলায় ল্যাডি বলল, 'তুই এবার আমার ঘর থেকে বিদেয় হ।'

'কেন রে এত শীগগির আমায় চলে যেতে বলছিস কেন?' হাসতে হাসতে বলল রিণা।

'আরেকবার, শুধু একটিবার আমার শরীরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার সাধ হচ্ছে না? লজ্জা না করে বল্না মুখ খুলে।'

ল্যাডি জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। রিণা এবার আর দ্বিধা না করে অন্য কাঁধের ফিতেটা খুলে ফেলতেই ব্রা সমেত পরনের বেদিং সুট খসে পড়ে গেল মেঝেতে। রিণার উলঙ্গ দেহের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেল ল্যাডি, পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

'নে, আর দাঁড়িয়ে থেকে সাধু সাজতে হবেনা,' গলা সামান্য চড়াল রিণা, 'চটপট এবার আমার মত তুইও কাপড় চোপড় খুলে ফ্যাল্, তোর চেহারাটা আমি একবার দেখি।'

রিণার কথায় এমন কিছু ছিল যার বিরুদ্ধে যেতে পারল না ল্যাডি, বোতাম খুলে ফেলতেই পরনের চানের ঢোলা আলখাল্লা খসে পড়ল। সেই মুহূর্তে রিণার সামনে নিজেকে তার বড় খাটো মনে হল, দু'হাতে নিজের পুরুষাঙ্গ আড়াল করে খাটের পাশে মেঝেতে পাতা কার্পেটে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ল্যাডি।

চটপট খাটে উঠে পড়ল রিণা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এল এপাশে। উলঙ্গ ল্যাডির দিকে একপলক তাকিয়ে বিজয়িনীর হাসি হেসে বলল, 'ঠিক আছে, এবার তুই আমায় নিয়ে যা করতে চাস করতে পারিস।' বলেই ল্যাডির ডানহাতটা জোর করে তুলে নিজের বুকে ছোঁয়াল, ছোঁয়াল দু'টি স্তনে, তারপরেই ছিটকে খানিক তফাতে সরে বলল। 'খবরদার! আমায় একদম ছুঁবি নে। ঐখানে বসে যা করার কর্।'

ল্যাডি যেন কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, প্রচণ্ড যৌবন জ্বালা

বাঁধভাঙ্গা যন্ত্রণার মত ঢেউ তুলে বইছে তার সর্বাঙ্গে, মাথায়, ধমনীতে। সেই যন্ত্রনা সইতে না পেয়ে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে সে।

'তুই আমারটা করে দে,' অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল রিণা, 'আমিও তোকে করে দিচ্ছি, দ্যাখ্ কেমন আরাম লাগে। কিন্তু হুঁশিয়ার। একদম ছুবি না আমায়। ঐখানে বসে থাক চুপটি করে।'

৫

হলের ভেতরের আলো নিভেছে অনেকক্ষণ আগে, ছবিও শুরু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। গল্প তরতর করে অনেকদূর এগিয়েছে। এর মধ্যে ওদের থেকে থেকে ফিসফাস কথাবার্তা আর চাপাগলায় খিলখিল হাসি বারবার ভেসে আসছে ল্যাডির কানে। আঁধারের পর্দা ভেদ করে দেখতে না পেলেও ছবি দেখার ফাঁকে ওরা যে কোনও গোপন মজার খেলায় মেতেছে তা আঁচ করতে তার অসুবিধে হচ্ছেনা।

আরও খানিকক্ষণ বাদে আঁধার চোখে অনেকটা সয়ে এলে রিণা টমির কাছে লজেন্স চাইল। লজেন্স ভর্তি ছোট থলেটা টমি এমনভাবে বাড়িয়ে দিল রিণার দিকে যাতে তার হাতের তালু ঘষটে গেল রিণার বুকে। ব্যাপারটা ল্যাডির নজর এড়ালনা।

'আমায় দুটো দাওনা,' ল্যাডির কানের কাছে মুখ এনে লজেন্সের আব্দার করল টমির পিসতুতো কোন জোয়ান।

'হ্যাঁ, এই যে, তুলে নাও,' বলে থলে ভর্তি লজেন্স ল্যাডি এগিয়ে দিল। পাশ ফিরে হাত বাড়িয়ে লজেন্স তুলে নিল জোয়ান আর সেইমুহূর্তে তার নরম বুকের ছোঁয়া লাগল ল্যাডির হাতে। রিণার বুকের কথা মনে পড়তেই তার মনটা নিমেষে খারাপ হয়ে গেল।

ফেরার পথে টমির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল জোয়ান, হেসে বলল, 'ভেতরে ঢুঁ মারবে নাকি? বক্সে একটা বড়সড় বোতল রাখা আছে।'

'না, থাক, ধন্যবাদ,' চটপট মাথা নাড়ল ল্যাডি,' আটটা বাজতে দেরি নেই। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে মাকে বলেছি সন্ধের মধ্যে ফিরে আসব।'

রিণার মুখে সাড়া শব্দ নেই, হল থেকে বেরোনোর পর থেকেই চুপ করে আছে সে।

'রিণাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তুমি পরে একবার আসবে?' ল্যাডির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল জোয়ান।

জবাব দেবার আগেই রিণা তার দিকে তাকাল। তার চাউনি দেখে চমকে উঠল ল্যাডি, বলল, 'না, আমার শরীর আর বইছেনা। এখন বাড়ি গিয়ে অল্প কিছু খেয়েই সোজা শুয়ে পড়ব।' তোমার অনুরোধ রাখতে পারছিনা বলে কিছু মনে কোরনা।'

একটি কথাও না বলে অদ্ভুত চাউনি মেলে জোয়ান তার দিকে তাকাল তারপরে মুখ ফিরিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়িতে। 'গুডনাইট,' অস্বস্তি মেশানো গলায় বলল ল্যাডি, 'কাল জলের ধারে আবার দেখা হবে।'

'জোয়ান আর টমি বাড়িতে ঢোকার পরেও বাকি পথটুকু রিণা আর ল্যাডি কেউ

কারও সঙ্গে কথা বললনা। সন্ধে হয়েছে অনেকক্ষণ আগে, বারান্দায় উঠে ল্যাডি দরজায় পাল্লা টেনে ধরতে রিণা বলল, 'বাড়িতে ঢুকবিনা?'

'না রে, তুই যা,' আনমনা গলায় বলল ল্যাডি, 'আমি এখানে বারান্দায় বসে একটু জিরিয়ে নিই।'

'তোরা এলি?' রিণা একা ভেতরে ঢুকতে জেরালডিন বললেন, 'ল্যাডি কই?'

'বাইরে বসে আছে,' বলল রিণা। 'আমিও একটু যাব মা? ভেতরে বড্ড গরম।'

'যাও, কিন্তু আধঘন্টার মধ্যে দু'জনেরই ফেরা চাই মনে রেখো,' বললেন জেরালডিন। 'রিণা, আমি দেখতে চাই তুমি চটপট খেয়ে-দেয়ে সাড়ে আটটার মধ্যে শুয়ে পড়েছো।

'ঠিক আছে মা, তাই শোব,' বলে বাইরে এল রিণা, অন্ধকার বারান্দায় ল্যাডির পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে আচমকা বলল, 'জোয়ান ওদের বাড়িতে তোকে এত রাতে যেতে বলছিল কেনরে?'

'কথাটা আমায় জিজ্ঞেস না করে ওকে জিজ্ঞেস করলেই ত পারতিস!' অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল ল্যাডি।

'আমি জানি কেন বলেছিল,' বলল রিণা, 'তোর কাছ থেকে ওর একটু আদর খাবার সাধ হয়েছিল।'

'মোটেও না।' রেগেমেগে বলল ল্যাডি।

'জোয়ানকে আমার মোটেও লাগেনা,' বলল রিণা, 'মেয়েটা ভাল নয়, মন্দ। বজ্জাতি আর ভণ্ডামি ছাড়া ওর ভেতরে আর কিছু নেই।'

'হঠাৎ জোয়ানের ওপর চটে গেলি যে বড়,' জানতে চাইল ল্যাডি, 'কি দেখেছিস ওর ভেতর যাতে—'

'হলের ভেতরে ছবি দেখতে দেখতে টমির আমার গায়ে হাত দেবার সাধ হয়েছিল,' বলল রিণা, 'কিন্তু আমি দিতে দিইনি। তখন ও দিব্যি জোয়ানের হাতটা কোলে নিয়ে খেলতে লাগল। জোয়ানেরও দেখলাম সাধ পুরোপুরি আছে, টমির গায়ের এখানে সেখানে দিব্যি হাত বোলাল।'

রিণার অভিযোগের জবাবে একটি কথাও জোগালনা ল্যাডির মুখে। জোয়ানের স্বভাব অত্যন্ত বদ তা ল্যাডির অজানা নয়।

'হতচ্ছাড়ি এরপরে একটিবারও টমির দিকে তাকালনা বুঝলি ঠায় বসে রইল পর্দার দিকে' ড্যাবডেবে চোখ মেলে কে জানে টমির সঙ্গে ও এখন কি করছে!'

রিণার মন্তব্যে দেহ সুখের যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল তা বুঝতে পেয়ে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠল ল্যাডি।

'আমি জোয়ানের মত মন্দ নই ত?' জানতে চাইল রিণা, 'ওর মত ভণ্ডামি নেই ত আমার মধ্যে?' অদ্ভুত হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলল রিণা, ল্যাডির উরুতে হাত বুলিয়ে বলল, 'এখন আমাদের সেই খেলাটা একটু খেলবি নাকি?'

'এখন?' রিণার আহ্বান শুনে অবাক হল ল্যাডি, দরজার দিকে ভীত চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'কিন্তু এখানে—'

'ভয় কি,' চাপাগলায় আশ্বাস দিল রিণা, 'বাবা মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে আর মা সেলাই নিয়ে ব্যস্ত, ওঁরা কেউই এখন এখানে আসবেন না।'

'কিন্তু—' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল ল্যাডি,' কিন্তু এখানে কি করে?'

'বোকা ছেলে, এটা কোনও ব্যাপারই নয়,' মৃদু হেসে বুক পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল রিণা।

ম্যান্টেল রাখা ঘড়ির দিকে চোখ তুলে তাকালেন শ্রীমতী জেরালডিন মার্লো—কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে আটটা। ঠিক তখনই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রিণা। জেরালডিন লক্ষ করলেন রিণার দু'চোখ উজ্জ্বল, মুখখানা খুশিতে ঝলমল করছে, পরিতৃপ্তির চাপা হাসি ফুটেছে তার ঠোঁটে। এ হাসি সংক্রামক তা জানেন জেরালডিন। হাসিমুখে বললেন, 'কেমন, ছবি দেখে সময় ভাল কাটল ত?'

'হ্যাঁ মা, ধন্যবাদ,' ঘাড় নাড়ল রিণা। 'সত্যিই সময়টা আজ কিভাবে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলামনা। আগে দুপুরের শো'-এ ছবি দেখতে গেলে চারপাশে থেকে কচি ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচিতে কান রাখতে পারতাম না। নিজেরা একসঙ্গে ছবি দেখতে গেলে সেই ঝামেলা হয়না। চুপচাপ স্বস্তিতে তাকিয়ে থাকা যায় পর্দার দিকে।'

'বলছ ত সোনা,' হাসলেন জেরালডিন, 'কিন্তু এই সেদিন তুমি নিজেও যে কচি বাচ্চাটি ছিলে। ছবি দেখাতে নিয়ে গেলে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়তে।'

'কিন্তু এখন ত আমি বড় হয়েছি, তাই না মা?' গম্ভীর গলায় বলল রিণা।

'হ্যাঁ, বাছা,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন জেরালডিন, 'তুমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছো। কিন্তু রাত অনেক হল, এবার দয়া করে শুতে যাও, শ্রীমতী শুয়ে আমাদের উদ্ধার করো।'

'যাচ্ছি মা,' হেঁট হয়ে জেরালডিনের গালে চুমু খেল রিণা, পাশের ঘরে ঢুকে বাবাকেও চুমু খেল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিল ভেতর থেকে।

'কি ব্যাপার বলো ত।' হ্যারিসন মার্লো খবরের কাগজখানা নামিয়ে রেখে আপনমনেই বললেন, 'রিণাকে আজ এত খুশি খুশি লাগছে কেন?'

'লাগবে নাই বা কেন?'

'আজ যে উনি প্রথম অভিসারে গিয়েছিলেন, প্রণয়ীর সঙ্গে এই প্রথম ফিল্ম দেখলেন। প্রথম অভিসারের পরে সব মেয়েকেই এমনই খুশিখুশি দেখায়।'

'ঘরের ভেতর বড্ড গরম,' হ্যারিসন বললেন, 'চলো, বারান্দায় গিয়ে একটু বসি।'

'ল্যাডি, তুই এখানে বসে আছিস' বারান্দায় এককোণে ছেলেকে একা বসে থাকতে দেখে অবাক হলেন জেরালডিন, 'সময় ভাল কেটেছে ত?'

'হ্যাঁ মা, ধন্যবাদ।'

'রিণা কোনও ঝামেলা করেনি ত?'

'না।'

'তোর গলা এমন শোনাচ্ছে কেন, ল্যাডি? মনে হচ্ছে রিণা সঙ্গে ছিল বলে যেন খুব রেগে আছিস?'

'না মা, ও কিছু নয়,' গম্ভীর গলায় জবাব দিল ল্যাডি।

'মন না চাইলেও অনেক সময় কিছু কিছু কাজ করতে হয় বাবা,' হ্যারিসন বললেন, 'তার মধ্যে একটা হল বোনের দিকে নজর দেয়া, মনে রেখো এটা ভাই হিসেবে তোমার কর্তব্য।'

'বললাম ত বাবা সব ঠিক আছে।' বিরক্ত হয়ে খেঁকিয়ে উঠল ল্যাডি, 'বলছি কোনও ঝামেলা হয়নি—'

'ল্যাডি!' চাপা গলায় ধমক দিলেন জেরালডিন, 'বাবার কথায় অত বিরক্ত হচ্ছ কেন? উনি কি বলেন মন দিয়ে শোন—'

'দুঃখিত, মা,' নিমেষে নিজেকে শামুকের মত খোলসের ভেতর গুটিয়ে নিল ল্যাডি, 'তোমরা কিছু মনে কোরনা।'

'তোর কি হয়েছে বল্ ত ল্যাডি', উদ্বেগ ফুটল জেরালডিনের গলায়, 'তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কপাল, মুখ ঘেমে উঠেছে। শরীর ভাল আছে ত? দেখি রুমালটা দেখি, ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছি।' বলে তার বুক পকেটে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন, 'একি। পকেট খালি কেন, তোর রুমাল গেল কোথায়? আমার বেশ মনে আছে দুপুরে বেরোবার সময় তোর বুক পকেটে রুমাল দেখেছিলাম।'

'মনে হচ্ছে ওটা হলের ভেতরে পড়ে গেছে,' আমতা আমতা করে বলল ল্যাডি।

'ল্যাডি,' ছেলের কপালে হাত রেখে বললেন জেরালডিন, 'তোর কপাল ত দেখছি ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। জ্বর আসেনি ত?'

'এখানে বসে না থেকে এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।' গম্ভীর গলায় ছেলেকে বললেন হ্যারিসন।

'হ্যাঁ, বাবা। যাচ্ছি, গুডনাইট', বলে দু'জনকে চুমু খেয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল ল্যাডি।

'রিণা এত খুশি, অথচ ল্যাডিকে এমন গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন বুঝতে পারছিনা,' বললেন জেরালডিন, 'ওর আবার কি হল?'

'আমি জানি ওর কি হয়েছে,' বললেন হ্যারিসন।

'কি হয়েছে?'

'যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে,' রাগ রাগ গলায় বললেন হ্যারিসন, 'তার ওপর আছে দিন নেই রাত নেই মায়ের লাগামছেঁড়া আদর। ফলে এখন মানুষ থেকে বাঁদর হয়েছে, আমাদের কথায় বোনকে সিনেমায় নিয়ে যেতে হয়েছে বলে বাবু রাগে ফুঁশছেন। সিনেমায় না গিয়ে র‍্যাণ্ডেলের জমিতে বসে টমির পিসতুতো বোন জোয়ানের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারলেই দেখতে রিণার মত ওরও চোখমুখ খুশিতে ঝলমল করছে। অল্পবয়সে বেশি বখে গেছে বলেই এমনটা হয়েছে। আর রিণার হালও তুমি এমনি করে

ছাড়বে। যখন যা আবদার করছে তাই এনে দিচ্ছ, এরপর যখন ছেলের মত ও নিজেও সাংঘাতিক বখে যাবে, তখন মজা টের পাবে। তার খুব বেশি দেরি নেই।'

'তোমার কি হয়েছে আমারও জানতে বাকি নেই,' আহত গলায় বললেন জেরালডিন, 'ছেলেমেয়েরা বড় হোক, স্বাধীনভাবে চলাফেরা মেলামেশা করুক তা তোমার ইচ্ছে নয়। তুমি চিরকাল ওদের কচি ছেলেমানুষ বানিয়ে রাখতে চাও।'

'বাজে কথা বোলনা। ওরা দু'জনেই যে বখে গেছে এটা তোমায় মানতেই হবে।'

'আমি একবারের জন্যও এ অভিযোগ অস্বীকার করিনি,' হাসলেন জেরালডিন, 'রিণা আর ল্যাডি সমবয়সী, এই সময় ছেলেমেয়েদের দেহে নানা ভাঙ্গচুর হয় যার প্রভাব পড়ে মনে কথাবার্তায়, চালচলনে। স্বভাবেরও কিছু পরিবর্তন ঘটে যা বাবা মায়ের চোখে বখামি বলে মনে হয়। হ্যাঁ, এই বয়সে একটু আধটু বখে যাওয়া ছেলেমেয়েদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'যাক, বাদ দাও এ তর্ক,' হ্যারিসন হাসলেন, 'আসছে মাস থেকে ওদের দু'জনেরই স্কুল খুলে যাচ্ছে, আমার নিশ্চিত ধারণা বারিংটনে থেকে লেখাপড়া শিখলে আমার ল্যাডি মানুষ হবে, পাঁচজনের একজন হতে পারবে।'

'রিণার কথাটাও বলো,' বললেন জেরালডিন, 'জেন ভিনসেন্ট স্কুলে থেকে লেখাপড়া শিখে একদিন ও খুব বড় হবে, সবাই বলবে লেডি রিণা!'

ভাষায় বর্ণনা করা যায়না এমনই লাগামছেঁড়া আদিম বন্য জৈবিক তাগিদ, সেইসঙ্গে মানসিক যন্ত্রণা, সর্বোপরি বিবেকের অহরহ তাড়না, পুরো গরমের ছুটিটা—এই অসহ্য নরক যন্ত্রণার মধ্যে কাটাল ল্যাডি। দিনে খেতে পারেনা, রাতে চোখের পাতা বুঁজলেও ঘুমোতে পারেনা, এর মধ্যে রিণার মুখোমুখি কখনও হলে প্রচণ্ড সংকোচ এমনভাবে টুঁটি টিপে ধরে যে চোখ তুলে সে তাকাতে পারেনা তার মুখের দিকে। আবার এর পাশাপাশি যা ঘটছে তা সত্যিই মজার, রিণাকে একমুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারেনা ল্যাডি। সমবয়সী কোনও ছেলের সঙ্গে কখনও রিণাকে হেসে কথা বলতে দেখলে ভেতরে ভেতরে হিংসের জ্বলে পুড়ে মরে ল্যাডি। আবার এরই পাশাপাশি রিণাকে নিবিড়ভাবে কাছে পাবার কথা কল্পনা করে ল্যাডি এক ধরনের সুখ পায়, অনুভব করে তৃপ্তি। রিণা কখনও কাছাকাছি এলে সব অস্বস্তি আর ভীতি উপেক্ষা করে সেই সুখ আর তৃপ্তি অদ্ভুতভাবে উপভোগ করে সে।

ল্যাডির অবচেতনার গভীর অতলে সাঁতারে বেড়াচ্ছে যে অনুভূতি তার নাম ভীতি—কবে কোন অসতর্ক মুহূর্তে রিণার সঙ্গে তার দৈহিক মিলনের কথা বাবা মা জেনে ফেলেন সেই ভীতি। কখন সে ভীতি হাঙ্গরের মত তার পা কামড়ে ধরতে এই দিনরাত কুরে কুরে খাচ্ছে ল্যাডিকে।

রিণাকে নিয়ে যতই অস্বস্তি হোক, সে চোখে চোখ রেখে একটু আধটু হাসি ছুঁড়ে দিলে কি চলাফেরার মাঝখানে কখনও তার ছোঁয়া লাগলে এত বিতৃষ্ণা, যন্ত্রণা, ভীতি, সব নিমেষে মিলিয়ে যায়। সেইমুহূর্তে তাকে খুশি করতে, তার পায়ে নিজেকে বিলিয়ে

দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ল্যাডি। মান মর্যাদা, অহমিকা, সব বিসর্জন দিয়ে তখন রিণার সামনে যেন মাটিতে মিশিয়ে দেয় সে নিজেকে; যে মানসিক যাতনা অহরহ বয়ে বেড়াচ্ছে ল্যাডি সেইমুহূর্তে তার দু'চোখ ফেটে তা ঝরে পড়তে চায় নোনা জল হয়ে। পরক্ষণে ভীতি আবার মাথা তোলে, যেন জানিয়ে দিতে চায় যে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও মা তাকে ছোটবেলা থেকে লালন করেছেন নিজের মেয়ের মত সেই হিসেবে সে তার বোন। সেদিক থেকে জৈবিক তাগিদের বশে তার সঙ্গে সহবাস করে খুবই অন্যায় ও গর্হিত কাজ করেছে সে।

গরমের ছুটি শেষ হয়ে আসতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ল্যাডি। এবার স্কুলের হোস্টেলে ফিরে গেলে রিণাকে ভুলে যাওয়া সহজ হবে তার পক্ষে, দিনরাত তখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারবে। দৈহিক মিলনের যে নেশা রিণা তার রক্তে ধরিয়েছে তার কাছ থেকে কিছুদিন দূরে থাকলেই তা কেটে যাবে জানে ল্যাডি। আসছে বছর গরমের ছুটিতে আবার বাড়ি ফিরে আসবে সে সাগরতটে আবার দেখা হবে রিণার সঙ্গে, কিন্তু ততদিনে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে, সেইসঙ্গে মনের দিক থেকেও সুস্থ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠবে তারা দু'জনেই।

গরমের ছুটির শেষে এই আত্মবিশ্বাসে ভরসা করেই স্কুলে ফিরে গেল ল্যাডি।

৬

'আমি মা হতে চলেছি ল্যাডি,' চাপা থমথমে গলায় বলল রিণা, 'বেশ বুঝতে পারছি আমার পেটে বাচ্চা এসেছে।'

রিণার কথাগুলো যেন ভোঁতা অস্ত্রের মত আঘাত হানল ল্যাডির শরীরের নিচের দিকে। তলপেটে কেটে ছিন্নভিন্ন করে উঠতে লাগল আরও ওপরে, দু'বছর আগে গরমের ছুটিতে বাড়িতে এসে গোপনে যে খেলায় তারা মেতে উঠেছিল তার পরিণতি এমনি দাড়াবে তার আভাস অনেক আগেই পেয়েছিল সে। চড়চড়ে রোদটা চোখের ওপর পড়েছে, ভুরু কুঁচকে বলল ল্যাডি, 'পেটে বাচ্চা এসেছে তুই জানলি কি করে?'

'আমার মাসিক ঋতুস্রাব এখনও হয়নি,' প্রায় ফিসফিস করে জবাব দিল রিণা, 'এত দেরি আগে কখনও হয়নি।'

'তাহলে ত ভালই ঝামেলা পাকিয়েছিস,' চোখ নামিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল ল্যাডি, 'এবার কি করবি?'

'জানিনা রে,' রিণা সাগরের দিকে মুখ ফেরাতে রোদ লেগে তার সোনালি চুলে ঝিলিক দিল, 'কালকের দিনটা দেখি, কালও মাসিক শুরু না হলে মাকে বলতেই হবে।'

'তুই কি—মাকে আমাদের সব ব্যাপার বলে দিবি? 'ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল ল্যাডি, 'আমার নামও বলে দিবি?'

'না!' চাপা গলায় চটপট বলল রিণা, 'তোর নাম বলব কেন! টমি, বিল, নয়ত জো, এদের কাউকে দায়ি করব,' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল রিণা।

'তার মানে—তুই কি সত্যিই ওদের সবার পাশে শুয়েছিস?' এই পরিস্থিতিতেও ঈর্ষার জ্বলুনি অনুভব করল ল্যাডি।

'না!' এবার ল্যাডির চোখে চোখ রাখল রিণা, 'তোকে বাঁচাতে মাকে ওসব বলতে হবে, আসলে তুই ছাড়া আর কারও পাশে শুইনি এটা তুই নিজেও জানিস, ল্যাডি!'

'কিন্তু তোর কথা শোনার পরে মা যদি ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করে তখন কি হবে ভেবেছিস? তুই যে মিথ্যে বলছিস তা ত তখনই ধরা পড়ে যাবে!'

'তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন?' জোরগলায় বলল রিণা, 'আমি ত সরাসরি কাউকে দায়ী করব না, বলব টমি, বা বিল, বা জো এদের মধ্যে যে কোনও একজনের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করার ফলে ঘটেছে, কিন্তু কে এজন্য দায়ী তা আমি নিজেও জানিনা। একথা শোনার পরে মা ওদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিস? যেন রাখ্, মা সে ধারও মাড়াবেনা।'

অবাক হয়ে রিণার দিকে তাকিয়ে রইল ল্যাডি, শুধু বয়স নয়, বুদ্ধি বিবেচনার দিক থেকেও তার মাথা যে অনেক বেশি খেলে তা যেন হঠাৎই উপলব্ধি করল ল্যাডি।

'মা জানতে পারলে কি করবেন বলে তোর মনে হয়?' জানতে চাইল ল্যাডি।

'কে জানে কি করবে,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল রিণা, 'তবে করার মত কিছু মায়ের আছে বলে ত আমার মনে হয়না।'

সমস্যাটাকে কোনও গুরত্ব না দিয়ে রিণা অন্য দিনের মত এল সাগরতটে, জলের ধারে বন্ধুদের সঙ্গে রোজের মত কথাবার্তা বলল স্বাভাবিকভাবে। অন্যদিকে ল্যাডি পড়েছে ফাঁপরে, সমস্যার মধ্যেও রিণার মত বেপরোয়া ভাব বজায় রাখতে পারছে না সে, বালুর বুকে চিত হয়ে শুয়ে বারবার অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করছে। ঘটনার পরিণতি যে এমনটা দাঁড়াবে তা আগেই আঁচ করেছিল ল্যাডি, কিছুদিন আগে এক রাতের কথা ছবির মত ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়।

প্রতি বছরের মত এবারেও গরমের ছুটির মধ্যে রোজ ফাঁক পেলেই রিণার সঙ্গে সে চলে আসত সাগতটে। তবে এবারের পরিস্থিতিটা তার নিজের দিক থেকে ছিল অন্যরকম। নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল ল্যাডি, রিণাকেও তা জানিয়ে দিয়েছিল। কথায় কথায় বলেছিল, 'ঢের ছেলেমানুষি হয়েছে, আর নয়। এবার থেকে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আবার আগের মত মেলামেশা করব, তুইও তোর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করবি। আমরা দু'জনে দু'জনের খুব কাছে এলেই ঝামেলা বাঁধে। তার চেয়ে এই ভাল।' সেদিন ল্যাডির কথায় আন্তরিকভাবে সায় দিয়েছিল রিণা, ল্যাডির মতই তার সঙ্গে মেলামেশা করবেনা বলে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল নিজের কাছে। দুঃখ এই যে এত করেও কোনও ফল হলনা। নিজের কাছে করা শপথ ভাঙ্গতে হল তাকে। যত নষ্টের মূলে সেই অরেঞ্জ পপ্-এর বোতলটা।

ক'হপ্তা আগের সেই ঘটনার স্মৃতি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হবে তা জানে ল্যাডি। সন্ধে হতে তখনও ঢের দেরি, চারদিক আঁধার করে বিকেলবেলা আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি পড়ছে বলে সেদিন তারা দু'জনেই আছে বাড়িতে। অসহ্য

গরমে হাঁসফাঁস করছে ল্যাডি, স্যাঁতসেঁতে গরম বাতাস যেন অদৃশ্য কম্বলের মত চেপে বসেছে তার গায়ে। ঘামে পরনের শার্ট আর ট্রাউজার্স ভিজে জবজব করছে।

আচমকা ল্যাডির মনে পড়ল কিচেনে আইসবক্সে একবোতল অরেঞ্জ পপ্ সে বরফের চাঁইয়ের ফাঁকে গুঁজে রেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কিচেনে এসে ঢুকল সে। বরফে ডোবানো কমলালেবুর ঠাণ্ডা মিষ্টি রস খেলে হাঁসফাঁস অবস্থা থেকে কিছুটা রেহাই পাবে ভেবে আইসবক্সের ঢাকনা খুলল সে। কিন্তু ভেতরে বরফ আছে ঠিকই নেই শুধু অরেঞ্জ পপ্-এর বোতলটা যা গতকাল নিজের হাতে ভেতরে রেখেছিল সে। অসহ্য রাগে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিড়বিড় করে জ্বলে উঠল। আইসবক্সের ঢাকনা আগের মত এঁটে বেরিয়ে এল কিচেন থেকে। রেগেমেগে সিঁড়ি বেয়ে ল্যাডি উঠে এল ওপরে, রিণার ঘরের দরজা খোলা, পাশ কাটানোর আগেই ঘাড় ফেরালো, দেখল ভেতরে খাটে আধশোয়া হয়ে রিণা, ডানহাতের মুঠোয় ধরা তার অরেঞ্জ পপ-এর বোতলখানার দিকে রিণা উদগ্র চাউনি মেলে তাকিয়ে। রিণা যে পুরোপুরি উলঙ্গ তা ল্যাডির চোখ এড়ালনা। হাতুড়ি পেটার মত শিরাগুলো দপদপ করতে লাগল মাথার ভেতরে, ঘাম জমল কপালে, কানফাটানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল 'অ্যাই, আমার অরেঞ্জ পপ্ নিয়ে তুই কি করছিস?' বলে, নিজের গলার আওয়াজে নিজেই চমকে উঠল ল্যাডি।

'খাচ্ছি তা ত নিজের চোখেই দেখছিস,' বলতে বলতে ঘাড় ফেরালো রিণা, বোতলের ছিপি খুলে কয়েক ঢোঁক গলায় ঢালল। তার গলা কেমন রুক্ষ শোনাল, ল্যাডি দেখল ভারি হয়ে এসেছে রিণার দু'চোখের পাতা, ঘোলাটে দেখাচ্ছে দু'চোখ। সোডা মেশানো খানিকটা কমলার রস রিণার মুখের ভেতর থেকে উপচে পড়ল তার গালে, নিরাবরণ বুক আর উঁচু পেট বেয়ে সেই রস গড়িয়ে পড়ল বিছানার সাদা চাদরে।

'নে, খা!' হেসে বোতলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল রিণা।

সেই আহ্বান এড়াতে না পেরে পায়ে পায়ে রিণার ঘরে ঢুকে পড়ল ল্যাডি, বোতলটা ঠোঁটে ছোঁয়াতে দেখল এতক্ষণ রিণার মুঠোর ভেতর থাকায় ফলে সেটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। দু'চার ঢোঁক গলায় ঢেলে চোখ নামাতেই মুখ টিপে হাসল রিণা, হাসতে হাসতে বলল, 'তুই উত্তেজিত হচ্ছিস ল্যাডি, তোর গা তেতে উঠছে। সেদিন খুব ত বলছিলি আর কখনও উত্তেজিত হবিনা। হুঁশিয়ার থাকবি যাতে শরীর তেতে না ওঠে। তাহলে এখন এটা কি করে হল?'

অসাবধানে খানিকটা অরেঞ্জ সোডা শার্টে চল্‌কে পড়েছে দেখতে পেল ল্যাডি আর রিণার চোখে সে যে ধরা পড়ে গেছে তা সেইমুহূর্তে টের পেল সে। আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে বাঁচতে দরজার দিকে পা বাড়াতেই রিণার বাড়িয়ে দেয়া দু'হাত ময়াল সাপের মত কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে আনল তাকে খাটের কাছে। ভয়ে আঁতকে উঠে চাপাগলায় চেঁচিয়ে উঠল ল্যাডি।

'শুধু একবার, ল্যাডি,' ফিসফিস করে বলল রিণা। শুধু একটিবার করে বাঁচা আমায়, কথা দিচ্ছি এই শেষ, আর কখনও বলবনা। বিশ্বাস কর ল্যাডি, আমি আর পারছিনা! দোহাই, কথা রাখ্!'

'না!' জোরগলায় চেঁচিয়ে উঠল ল্যাডি, রিণার কথা শুনে তার পা দুটো যেন এঁটে গেছে মেঝের কার্পেটে, পা বাড়াতে গেলেই টাল সামলাতে না পেরে সে টলে পড়বে বলে তার মনে হল।

'লক্ষ্মীটি ল্যাডি, সোনা আমার, না বলিসনা।' আবার ফিসফিস করে একই অনুরোধ করল রিণা। দু'হাতের দশটি আঙুল ল্যাডির তলপেটে হাতড়ে বেড়াতে লাগল। শরীরের কোথাও সাড় নেই এমনিভবে রিণার খাট ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল ল্যাডি, একটা যন্ত্রণাকাতর গোঙানি উঠে এল বুকের ভেতর থেকে। অনেক ছেলেখেলা হয়েছে, আর নয়, যখন তখন রিণার শরীরের খিদে মেটাতে এই লাঞ্ছনা, তার শাসনে চোখেমুখে অসহায় ভাব ফোটানো, বরাবরের মত এই খেলা শেষ করতেই হবে। এবার থেকে তাকে যে একাই বাঁচতে হবে তা রিণাকে আজই ভাল করে বুঝিয়ে দেবে সে।

কি খেয়াল চাপল মাথায়। রিণার সরু কব্জী দু'টো একহাতের মুঠোয় চেপে ধরল ল্যাডি আরেক হাতে তার মাথাটা জোরে ঠেশে ধরল খাটে। ফ্যালফ্যাল করে একদৃষ্টে রিণা, তাকিয়ে রইল তার দিকে, ল্যাডির আচরণে এতটুকু ঘাবড়ায়নি সে। রিণার দু'চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ল্যাডির কি যেন হল, তার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরল। রিণার ঠোঁট এখনও গরম আর ভেজা, অরেঞ্জ পপ্‌-এর মিষ্টি রস এখনও লেগে আছে সেখানে। ঠোঁটের ওপর থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিল ল্যাডি, চুমু খেল রিণার কপালে, গালে, কানের লতিতে, নাকের পাটায়, গলায়। সবশেষে স্তনবৃন্তে।

'না!' ছটফটিয়ে উঠল রিণা, ফিসফিস করে বলল, 'আমায় ছুঁস না! একদম ছুঁস না!' কিন্তু রিণার সে কথা ল্যাডির কানে গেলনা, তার ভেতরের সব মানসিক প্রতিরোধ যে ধ্বসে পড়েছে রগের ঘনঘন দপদপানিতেই তা টের পাচ্ছে সে। কি যেন একদলা জমেছে বুকের ভেতরে ঠিক মাঝখানে। গায়ের চামড়ায় রিণার ধারালো নখের আঁচড়ের দাগ দেখে অস্বাভাবিক রেগে উঠল ল্যাডি, 'হারামজাদি বারো ভাতারি।' চেঁচিয়ে উঠেই হাতের পাতার উল্টো পিঠ দিয়ে এক ঘা বসাল সে রিণার মুখে। সেই আঘাতে রিণা ছিটকে গিয়ে পড়ল খাটের এক ধারে, এবার তার দু'চোখে ফুটল ভয়ের ছায়া। 'খানকি তৈরি হচ্ছিস, গেছো খানকি!' রিণার হাতদুটো খাটের লোহার ছত্রিতে জোরে চেপে ধরল ল্যাডি; খাটের একধারে অরেঞ্জ পপ্‌-এর বোতলটা কাৎ হয়ে গড়াচ্ছে, ভেতরে খানিকটা পানীয় এখনও আছে।

'কি, আরও খাবি?' বোতলটা তুলে নিয়ে জানতে চাইল ল্যাডি, 'তেষ্টা মেটেনি এখনও?'

মুখে কিছু না বলে ঘাড় নাড়ল রিণা।

'নে তবে খা, যত পারিস খা!' বলে বোতলটা হাসতে হাসতে গড়িয়ে দিল সে রিণার গায়ে। বোতলের ভেতরে যেটুকু পানীয় ছিল তা গড়িয়ে পড়ল রিণার উলঙ্গ দেহে। পরমুহূর্তে রিণার লাথির ঘায়ে বোতলটা ঘরের অন্যদিকে ছিটকে পড়ল। আড়চোখে বোতলটার দিকে তাকিয়ে একলাফে খাটে উঠে পড়ল ল্যাডি, দুই হাঁটু দিয়ে রিণার দু'পা চেপে ধরে হেসে উঠল হা হা করে। রিণার ভয়মাখানো চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে

হাসতে বলল, 'সোনা বোনটি আমার, ছেলেদের নিয়ে খেলাধুলো করার সাধ তোমার এখুনি মিটিয়ে দিচ্ছি।' বলতে বলতে উলঙ্গ রিণার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল স্যাড়ি, ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল রিণার ঠোঁট। একটি মুহূর্ত, তারপরেই তলপেটে সজোরে কিছু গেঁথে গেল যেন। তার তীব্র যন্ত্রণা সইতে না পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল রিণা। রিণার চিৎকার থামাতে তার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরল স্যাডি। আবার, আবার তলপেটে কিছু গেঁথে বসে যাবার অবর্ণনীয় প্রচণ্ড যন্ত্রণা, রিণার মনে হল তার শরীর যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। স্যাডি মুখে হাত চেপে রাখার ফলে আর জোরে চেঁচাতে পারছেনা রিণা, মৃদু গোঙানির মত একটা আওয়াজ শুধু বমির মত থেকে থেকে উগড়ে আসছে তার গলার ভেতর থেকে।

সব শেষ, বালুর ওপর গড়িয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে আক্ষেপ করছে স্যাডি, রিণার পেটে বাচ্চা আসার খবরটা কাল মা ঠিক জানতে পারবেন, সব দায় বর্তাবে তার ওপর। সবাই দোষ দেবে তাকে আর তাতে কোনও অন্যায় হবেনা। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এমন একটা ঘটনা ঘটতে দেয়া তার উচিত হয়নি। হঠাৎ বালুর বুকে কার ছায়া পড়তে চমকে মুখ তুলে তাকাল স্যাডি, দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে রিণা। চোখে চোখ পড়তে তার গা ঘেঁষে বসল রিণা। চাপাগলায় বলল, 'এবার আমাদের কি হবে?'

'কি হবে তা আমি জানব কি করে,' খানিকটা বিরক্ত হয়েই জবাব দিল স্যাডি।

'তোকে তাতিয়ে অতটা বাড়াবাড়ি করা আমার উচিত হয়নি,' তার হাতে হাত রেখে বলল রিণা।

'মিছে ওসব ভেবে কষ্ট পাচ্ছিস্' আশ্বাস দেবার গলায় বলল স্যাডি, 'আমায় নামানোর ক্ষমতা তোর ছিলনা। দোষ আমার, আমি পাগলের মত হয়ে উঠেছিলাম। জানিস রিণা, সুযোগ থাকলে আমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতাম।'

'তা আমি জানি, স্যাডি।'

'আমরা ত আর সত্যিসত্যি এক মায়ের পেটের ভাইবোন নই,' ক্ষুব্ধ শোনাল স্যাডির গলা, 'মা তোকে পুষ্যি না নিলে—

'তবু ত উনি নিয়েছিলেন,' বলতে বলতে কান্নায় রিণার গলা ধরে এল, 'উনি পুষ্যি নিয়েছিলেন বলেই না তোদের বাড়িতে আমি ঠাঁই পেয়েছিলাম। জানিস ত সব, আমার নিজের মা যখন মারা যান তখন আমি ছিলাম খুব ছোট ঐসময় তোর মা কোলে টেনে না নিলে কে আমায় আশ্রয় দিত, ঐটুকু কচি মেয়ের খাওয়া পরা জুটত কোথা থেকে? মা বাবাকে মিছিমিছি দোষ দিয়ে লাভ নেই, যা ঘটেছে তার জন্য ওঁদের কোনভাবে দায়ী করা যাবেনা।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল রিণা। চোখের জল দরদর করে গড়াতে লাগল তার দু'গাল বেয়ে।

'শুধু শুধু কাঁদিস না,' চাপাগলায় ধমক দিল স্যাডি, 'কান্নাকাটি করলেই পার পাবি ভেবেছিস?'

'কান্না পাচ্ছে যে, কি করব বল্,' ফিসফিস করে বলল রিণা, 'আমার বড্ড ভয় হচ্ছে রে ল্যাডি।'

'ভয় আমারও হচ্ছে,' ল্যাডি বলল, 'কিন্তু কান্নাকাটি করলেই ত ঝামেলা মিটবেনা।'

রিণা কেঁদেই চলল, চোখের জল তার গাল বেয়ে পড়তেই লাগল। কান্নার বেগ খানিকটা কমলে মুখ তুলে তাকাল রিণা। কানে এল ল্যাডির গলা, পুষ্যি বোন হলেও তোকে যে আমি ভালবাসি তা কি তুই জানিস রিণা, কখনও জানার চেষ্টা করেছিস?'

জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল রিণা।

'অনেক চেষ্টা করেছি রিণা, বিশ্বাস কর্', ল্যাডির স্পষ্ট গলা তার কানে বাজল, 'কোনভাবে তোকে মন থেকে সরাতে পারিনি। অনেক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে মেলামেশা করেছি অনেকের সঙ্গে তা তুইও জানিস, কিন্তু তাদের কাউকে তোর পাশে দাঁড়াবার যোগ্য মনে হয়নি।'

'আজ বলতে বাধা নেই অন্য মেয়েদের সঙ্গে তোকে মেলামেশা করতে দেখলে হিংসেয় আমি জ্বলে পুড়ে মরতাম।' দোষ স্বীকার করার গলায় বলল রিণা, 'ওদের মধ্যে কেউ তোর দখল নিক তা আমি মোটেও চাইনি। তাই ওরা তোর সঙ্গে যা করত তা আগেভাগে তোর সঙ্গে করলাম। করে খারাপ হলাম, বদনাম কিনলাম। তুই যেমন আমাকে মন থেকে ভালবেসে এসেছিস আমিও তেমনি তোকে ভালবেসেছিরে ল্যাডি, তাই তোর জায়গায় অন্য কোনও ছেলের কথা ভাবতে পারিনি। আর কোনও ছেলেকে আমার ভাল লাগেনা রে, মোটেও বরদাস্ত হয়না।'

'এ নিয়ে এখন আর এত ভাবিসনা, রিণা,' শক্ত মুঠোয় রিণার হাত চেপে ধরল ল্যাডি, আশ্বাস দিয়ে বলল, 'মিছিমিছি ভেবে কোনও লাভ নেই।'

'হয়ত তাই,' অদ্ভুত হতাশা ফুটে উঠল রিণার গলায়, এরপরে ভাষা হারিয়ে ফেলল দু'জনেই, সমুদ্রের উত্তাল সফেন ঢেউ-এর ওঠাপড়ার দিকে তাকিয়ে রইল রিণা আর ল্যাডি।

পালতোলা ছোট নৌকোর পেছনে হাল ধরে বসে ল্যাডি, তার মা শ্রীমতী জেরালডিন মার্গো বসেছেন সামনের দিকে গলুইয়ে। মার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে ল্যাডি। অনেকক্ষণ হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিল সে, কিন্তু এখন থেকে থেকে দমকা বাতাস বইতে শুরু করেছে আর সেই বাতাসের ছোঁয়ায় নৌকে পাল তুলে ছুটে চলেছে আপন বেগে। কিন্তু আকাশের বুকে জমা খণ্ড খণ্ড কালো মেঘের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল ল্যাডি। তাড়াতাড়ি ডকে নৌকা ভেড়াতে না পারলে মুশকিল, যে কোন মুহূর্তে ঝড় বৃষ্টি শুরু হতে পারে, তখন মাঝ সমুদ্রে মাকে নিয়ে সত্যিই বিপদে পড়তে হবে। আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে নৌকোর মুখ ডকের দিকে ঘোরাল ল্যাডি।

'এখুনি ফিরে যাবি?' গলুই থেকে বলে উঠলেন শ্রীমতী জেরালডিন।

'হ্যাঁ মা,' গলা অল্প চড়াল সে। 'আকাশের চেহারা ভাল ঠেকছেনা।' তার সঙ্গে নৌকোয় চড়ার খেয়াল কেন মায়ের মাথায় চাপল তাই গোড়ায় বুঝে উঠতে পারেনি

সে, পরে আঁচ করেছে সে কোনও কারণে মনোকষ্ট পাচ্ছে ধরে নিয়ে মা ছুটে এসেছেন তার সঙ্গে।

তার ধারণা যে নির্ভুল নৌকোয় মুখ ঘোরানোর খানিক বাদেই তার প্রমাণ পেল ল্যাডি— 'আজ সকালে অমন থমথমে গোমড়া মুখে ছিলি কেন?' জানতে চাইলেন তার মা।

'নৌকোটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখছিলাম।' অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল সে।

'তোদের এখনকার ছেলেমেয়েদের ভাবগতিক একেক সময় বুঝতে পারিনা বাপু,' আপন মনেই বললেন মা, 'যখন তখন মেজাজ বিগড়ে যায়। কি যে হয় তোদের!'

জবাব না দিয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল ল্যাডি, ঠিক মাথার ওপরেই একখণ্ড গাঢ় কালো মেঘ তার চোখে পড়ল। মেঘের আকার যত বাড়ছে তত বাড়ছে বাতাসের বেগ, শীগগিরই ঝড় উঠবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই তার মনে। রিণার মুখটা আচমকা ভেসে উঠল চোখের সামনে, মায়া হল তার জন্য, বেচারি। 'নিজের কথা, মা বাবার কথা মনে এল, আর কৃতকর্মের জন্য এক গভীর অনুতাপবোধ সেইমুহূর্তে ছেয়ে ফেলল তাকে, তার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে টের পেল ল্যাডি।

'কি হল ল্যাডি,' মায়ের ব্যাকুল গলা তার কানে এল, 'কাঁদছিস কেন?'

মায়ের ঐ কথায় নিজেকে আর সামলাতে পারলনা ল্যাডি। শক্ত হাতে হাল ধরা অবস্থাতেই কেঁদে ফেলল ভেউ ভেউ করে। তাকে ঐভাবে কাঁদতে দেখে তার মা গলুই থেকে উঠে এলেন। পাশে বসে ছোটবেলায় যেভাবে ভোলাতেন সেইভাবে তার মাথাটা তুলে নিলেন বুকে, 'কি হয়েছে ল্যাডি?' জানতে চাইলেন শ্রীমতী জেরাল্ডিন, 'কোনও ঝামেলায় পড়েছিস?'

'কিছু না মা,' মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে ধরাগলায় বলল ল্যাডি, 'কিছু হয়নি।'

'তুই বললেই ত আমি মানব না বাপ।' ছেলের মাথায় আলগোছে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তার মা বললেন, 'নিশ্চয়ই কোথাও কোনও ঝামেলা বেঁধেছে। তুই আমায় বিশ্বাস করে কথাটা বল্ ল্যাডি, তা ব্যাপার যাই ঘটুক। আমি যতদূর সম্ভব সাহায্য করব কথা দিচ্ছি।'

'কথা দিলেও তোমার করার কিছু নেই গো মা,' ধরাগলায় বলে উঠল ল্যাডি, 'এখন আর কারও কিছু করার নেই।'

'দেখছি কিছু করা যায় কিনা,' তার মা বললেন, 'তুই মুখ ফুটে বল্ আমায়।' ল্যাডি তবু চুপ করে রইল। দু'হাতে তার কান্নাভেজা মুখখানা তুলে ধরলেন তার মা। তার চোখমুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন. ছেলে যে মানসিক অশান্তিতে কষ্ট পাচ্ছে তার হদিশ পাবেন এই আশায়। খানিক বাদে একটা নিদারুণ আশংকা মনের কোণে উঁকি দিতে তিনি বললেন, 'সত্যি করে বল্ ত ল্যাডি, ঝামেলা কি রিণাকে নিয়ে বেঁধেছে?'

'হ্যাঁ, মা, হ্যাঁ!' মায়ের প্রশ্ন শুনে যেন স্বস্তি পেল ল্যাডি, 'মাগো, রিণার প্রতি যে

অন্যায় আমি করেছি তার উচিত সাজা হয় না। মা, রিণার পেটে বাচ্চা এসেছে, আর সে বাচ্চার বাবা আমি।'

'ল্যাডি,' চেঁচিয়ে উঠলেন তার মা, 'কি সব বলছিস?'

'যা বলছি তাতে এতটুকু ভুল নেই মা', থমথমে গলায় জবাব দিল ল্যাডি, 'এবার যে সাজা খুশি আমায় দিতে পারো, আমি তৈরি আছি। শুধু রিণাকে কিছু বোল না। ও বেচারির সত্যি কোনও দোষ নেই। রিণা সত্যি বড্ড ভাল মেয়ে মা। ওর তুলনা হয়না।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন শ্রীমতী জেরালডিন। ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের এতটুকু কষ্ট সইতে দেননি তিনি, যখন যা চেয়েছে তারা তাই জুগিয়ে এসেছেন, আজ এই তার প্রতিদান! ল্যাডি আর রিণার মধ্যে কোনদিন এতটুকু বিভেদ করেননি তিনি। তবু তাদের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটল? কিছুক্ষণ কেঁদে বুকের বোঝা হালকা করলেন শ্রীমতী জেরালডিন, তারপরে চোখ মুছে বললেন, 'অনেকক্ষণ ত হল, এবার চল্ ফিরে যাই।'

'আমরা ফিরেই যাচ্ছি মা,' চোখ নামিয়ে বলল ল্যাডি, 'কি যে এক সর্বনাশা নেশা মাথায় চেপেছিল আজও বুঝে উঠতে পারিনা মা, বড় হবার মানে যে এরকম তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা। বিশ্বাস করো মা, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরছি আমি।'

'ঠিক আছে বাবা,' শান্ত সংযত গলায় মা বললেন, 'যা ঘটে গেছে তা নিয়ে এখন আর দুঃখ করে নিজের কষ্ট বাড়াসনা!'

বাতাসের বেগ যত বাড়ছে তত উত্তাল হয়ে উঠছে সমুদ্রের ঢেউ। পরপর একেকটা ঢেউ এসে আছড়ে ফেটে পড়ছে নৌকোর গায়ে।

'রিণার কোনও দোষ নেই মা,' গলা আর চড়ালো ল্যাডি, 'ওটা এখনও বাচ্চা আছে। যা কিছু ঘটেছে সব আমারই জন্য, দেখো, ওকে যেন মিছিমিছি বকাবকি কোর না। রিণার কান্না আমার বুকে বড্ড বাজে।'

ল্যাডির কথায় এমন কিছু ছিল যা শুনে চমকে উঠলেন তার মা, মুখ তুলে তাকাতেই ছেলের চোখের চাউনি তাঁর নজরে পড়ল আর তখনই সব অস্পষ্ট ভাব কেটে গেল, অস্পষ্টতার পুরো পর্দাটা মুছে গেল সামনে থেকে।

'তুই ঠিক বলেছিস ল্যাডি,' ছেলের কথায় সায় দিয়ে বললেন তিনি, 'রিণা সত্যিই খুব ভাল মেয়ে-র ল্যাডি, ওকে কি ভাল না বেসে থাকা যায়?'

'আমি রিণাকে ভালবেসে ফেলেছি মা,' বলতে গিয়ে লজ্জায় ল্যাডির মুখ লাল হয়ে উঠল, 'রিণা ত সত্যিই আমার নিজের বোন নয়, ওকে ভবিষ্যতে নিজের করে পেতে বাধা কোথায়?'

ভেতরে ভেতরে সায় দিলেও মুখে সেই মুহূর্তে জেরালডিনের একটি কথাও জোগালনা।

'আমার কথার জবাব দেয়া কি খুব কঠিন, বলো না মা?' জানতে চাইল ল্যাডি,

'বোন নয়, রিণাকে আমি অন্য চোখে দেখি, ওর প্রতি আমার যে ভালবাসা তার চেহারা অন্যরকম।'

আলাদা, অন্যরকম, মনে মনে কথা দুটো আওড়ালেন জেরালডিন।

'বলো না মা,' আবার জানতে চাইল ল্যাডি,' তোমার পক্ষে জবাব দেয়া কি খুব কঠিন?'

এবার আর চুপ করে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারলেন না জেরালডিন। ছেলের মুখের দিকে চোখ পড়তেই তার জন্য গভীর বেদনা অনুভব করলেন তিনি। 'না, ল্যাডি,' শান্তগলায় বললেন তিনি, 'যা ঘটে গেছে তা অনিবার্য ছিল ধরে নাও, দেখবে মন শান্ত হবে।'

মায়ের জবাব শুনে ল্যাডির বিক্ষুব্ধ অশান্ত মন কিছুটা শান্ত হল, মা তাহলে তার অবস্থা বুঝতে পেয়েছেন, তাই তাদের গালমন্দ দেননি। 'তাহলে এখন আমরা কি করব মা,' জানতে চাইল সে।

'কি করব?' ছেলের চোখে চোখ রেখে জেরালডিন বললেন। 'বেচারি রিণা যে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে তা ত তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি। এবার ফিরে গিয়ে সবার আগে ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কাণ্ড তোমরা বাধিয়ে বসেছো তা আমার জানতে বাকি নেই।'

'ওঃ মা, তুমি কত ভালো।' মায়ের একটা হাত দু'হাতে চেপে ধরে চুমু খেল ল্যাডি, 'কত সহজে তুমি আমার সমস্যার সমাধান করে দিলে।'

কিন্তু ল্যাডি আর তার মায়ের সঙ্গে রিণার আর দেখা হলনা—ল্যাডির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কাঁপিয়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। তার মধ্যে আচমকা এক বিশাল ঢেউ-এর ধাক্কায় মা আর ছেলেকে নিয়ে ছোট্ট নৌকোটি তলিয়ে গেল সাগরের অতলে।

সাগরতটে উবু হয়ে বসে রিণা, খানিক তফাতে শুইয়ে রাখা ল্যাডি আর তার মায়ের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে, চোখে মুখে বিচলিত হবার কোনও ভাব নেই। অনেকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় খামচে ধরার মত ব্যথা শুরু হল তলপেটে। ব্যথার তাড়না আর সইতে পারল না রিণা। ল্যাডির মৃতদেহের কাছে এসে বসল হাঁটু গেড়ে, তারপরেই বুকফাটা কান্নায় সেই সাগরতটে ভেজা বালুকাবেলায় আছড়ে পড়ল।

৭

"প্রিয়তমা পেগি,

গতকাল আমার বিয়ে হল....." বান্ধবী স্যালির নিজে হাতে লেখা চিঠিখানা মার্গারেট ব্র্যাডলি এত গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন যে বাইরে দরজার গায়ে টোকা দেবার মৃদু আওয়াজ শুনতে পাননি। দ্বিতীয়বার আবার টোকা পড়ল। এবার

আগের চাইতে জোরে। শুনতে পেয়ে চিঠি থেকে মুখ তুললেন মার্গারেট, স্বভাবসিদ্ধ খস্‌খসে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে, কাকে চাই?'

'আমি রিণা, মিস ব্র্যাডলি,' দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল চেনা কিশোরীর গলা, 'রিণা মার্গো। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দরজাটা দয়া করে একটু খুলবেন?'

'একটু দাঁড়াও, আসছি,' বলে রিণার শিক্ষিকা উঠে পড়লেন সোফা ছেড়ে, স্যালির চিঠিটা টেবলের ড্রয়ারে গুঁজে ঢুকে পড়লেন বাথরুমে। বেসিনের আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলেন অনবরত চশমা পরার ফলে দু'চোখের চামড়ার গায়ে ফ্রেমের গোল দাগ পড়েছে, ফোলাফোলা বিশ্রি দেখাচ্ছে চোখদুটো, ধেবড়ে গেছে ঠোঁটের লিপস্টিক। মার্গারেট ব্র্যাডলির বয়স মাত্র ছাব্বিশ কিন্তু দেখাচ্ছে আরও বেশি। বেসিনের কল পুরোদমে খুলে দিলেন তিনি, জলের ঝাপটায় মুখ ধুয়ে সাবান মেখে তুলে ফেললেন ঠোঁটের লিপস্টিকের ধেবড়ানো দাগ, ভাল করে জলের ঝাপটা দিলেন চোখে। কল বন্ধ করে তোয়ালেতে চোখমুখ মুছে বাইরে এলেন মার্গারেট, দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'ভেতরে এসো।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শিক্ষিকার মুখের দিকে তাকাল রিণা। কোনও ব্যক্তিগত কারণে হয়ত কান্নাকাটি করছিলেন তিনি তাই দরজা খুলতে দেরি হয়েছে এটাই ধরে নিল সে।

'না জেনে বিরক্ত করে থাকলে দুঃখিত, মিস ব্র্যাডলি,' কুণ্ঠাজড়ানো গলায় বলল রিণা, 'আমি না হয় পরে আসব।'

'না, না, আমি ঠিক আছি,' মিস ব্র্যাডলি বললেন, 'কি বলবে বলো।'

আলতো হাতে দরজা ভেজিয়ে রিণা বলল, 'শনিবার রাতে নাচের প্রোগ্রাম থেকে আমায় দয়া করে বাদ দিন, অনুরোধটুকু করতেই এসেছি।'

বড় বড় চোখে মার্গারেট ব্র্যাডলি তাকালেন রিণার মুখের দিকে, তাঁর মনে হল তিনি ভুল শুনছেন। উঁচু ক্লাসের মেয়েদের মাসের কোনও এক শনিবার রাতে সমবয়সী ছাত্রদের সঙ্গে নাচবার ব্যবস্থা করা হয়, সহবৎ শিক্ষার অঙ্গ হিসেবেই এই ব্যবস্থা। সাধারণত উঁচু ক্লাসের মেয়েদেরই এই নাচে অংশ নিতে দেয়া হয় যে সুযোগ পাবার অপেক্ষায় তারা দিন গুণতে থাকে, সাজগোজ আর মেকাপ শুরু করে একদিন আগে থেকে। উঁচু ক্লাসের কোনও মেয়েকে কখনও শাস্তি দেবার দরকার হলে মিস ব্র্যাডলি তাকে একদিন বা পরপর কয়েকদিন নাচে যোগ দিতে দেননা, তার বদলে একগাদা কঠিন অঙ্ক কষতে দেন। একবার সাজা পেলেই সে মেয়ে টিট হয়ে যায়, স্কুল জীবনের বাকি ক'টা দিন আর একই ভুল করেনা সে। শুধু এই নাচের আসরে যোগ দেবার উপলক্ষে কমবয়সী ছেলেরা মেয়েদের এই স্কুলে মাসের কোনও এক নির্দিষ্ট শনিবারে ঢোকার সুযোগ পায়। স্বাভাবিকভাবে তাদের সঙ্গে নাচতে যেখানে সবাই উন্মুখ হয়ে থাকে, সেখানে রিণার এই নাচে বিমুখতা তলিয়ে দেখার মত ব্যাপার বলেই মিস ব্র্যাডলির মনে হল।

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না,' তিনি বললেন, 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।'

'মাসে একবার ছেলেদের সঙ্গে আমি নাচতে চাই না। এছাড়া আমার বলার কিছু নেই।'

মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে বলল রিণা।

ব্যাপারটা কি, ছেলেদের সঙ্গে রিণা কেন নাচতে চাইছেনা, নিজেকে প্রশ্ন করলেন মিস ব্র্যাডলি। ছেলেরা ওকে পছন্দ করেনা এটা কি তাদের আচরণে টের পেয়েছে রিণা? কিন্তু তা কি করে হবে, লিকলিকে বেতের মত পাতলা ছিপছিপে একমাথা সোনালি চুল রিণা মার্লোকে নাচের পার্টনার হিসেবে পেতে ছেলেদের মধ্যে কেমন হুড়োহুড়ি শুরু হয় তা তাঁর নিজের চোখে দেখা। ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে রিণা। ওর বাবা হ্যারিসন মার্লো বোস্টনের নামী ব্যাংকার, হালে ওঁর স্ত্রী এক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবে তাঁর নৌকো ডুবে গেছে সাগরের অতলে। খবরের কাগজ পড়ে মিস ব্র্যাডলি জেনেছেন ভদ্রমহিলার একমাত্র ছেলে তাঁর সঙ্গে ছিল, ঐ দুর্ঘটনায় মায়ের সঙ্গে জলে ডুবে তারও মৃত্যু ঘটেছে।

'তোমার এই অদ্ভুত অনুরোধের পেছনে কারণটা কি জানত পারি?' রিণাকে প্রশ্ন করলেন মিস ব্র্যাডলি। রিণা জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে রইল।

'চুপ করে না থেকে ব্যাপার কি ঘটেছে খুলে বলো,' শিক্ষিকার গাম্ভীর্যের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে সহজ হবার চেষ্টা করলেন তিনি, 'বয়সে আমি তোমার চেয়ে বড় ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তোমার ব্যক্তিগত সমস্যা বুঝবনা এত বুড়ি হইনি।'

এবারে মুখ তুলল রিণা, মিস ব্র্যাডলির চোখের দিকে তাকাল, কিন্তু সেখানে ভয়ের ছায়া দেখতে পেয়ে নিমেষে নিজেকে আবার গুটিয়ে নিল। মাথা নিচু করে মেঝের দিকে আগের মত তাকিয়ে রইল সে।

রিণার সংকোচের বেড়া ভাঙ্গতে বদ্ধপরিকর মিস ব্র্যাডলি এবার উঠে দাঁড়ালেন, ডেস্কের এপাশে এসে হাত ধরে রিণাকে টেনে এনে বসালেন একটা চেয়ারে, পাশে আর একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই কোনও কারণে ভয় পাচ্ছো।'

'ওদের ছোঁয়া আজকাল আমার অসহ্য লাগে, ফিসফিস করে বলল রিণা, 'গা জ্বলে যায়।'

'ওদের মানে?' কিছু বুঝতে না পেরে মিস ব্র্যাডলি বললেন, 'কাদের কথা বলছ তুমি?'

'ঐ ছেলেগুলোর কথা বলছি,' বলল রিণা, 'নাচতে আসা ওদের ছুতো, আসলে সেই ফাঁকে ওরা সবাই আমায় ছুঁয়ে দেখতে চায়, বিশ্বাস করুন, ওরা ছুঁলে আমার গা থেকে থেকে শিউরে ওঠে,' বলতে বলতে মুখ তুলে সরাসরি তাঁর চোখে চোখ রাখল রিণা, সত্যিই আমার সঙ্গে নাচার বা কথা বলার ইচ্ছে ওদের থাকলে আপত্তি করতাম না, কিন্তু লক্ষ করে দেখছি কমবেশি ওরা সবাই আমায় সবার সামনে থেকে সরিয়ে আড়ালে নিয়ে যেতে চায়।'

'কোন ছেলেরা এসব নোংরামি করছে?' নাচতে রিণার আপত্তির আসল কারণ এতক্ষণে বুঝতে পেরে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন মিস ব্র্যাডলি, কঠোরগলায় বললেন, 'ওদের ব্যবস্থা আমি করছি। আর কখনও নাচবার ছুতোয় যাতে ওরা এখানে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থা আজই করছি আমি।'

'আনি এবার আসছি' বলে উঠে দাঁড়াল রিণা। আমতা আমতা করে বলল, 'আমার কথায় কাজ হবে ভাবতে পারিনি।'

'একটু দাঁড়াও!' পেছন থেকে গম্ভীরগলায় বললেন মিস ব্র্যাডলি। রিণা দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাতে বললেন, 'সত্যি করে বলতো, নাচের ছুতোয় গায়ে হাত বোলানো ছাড়া আরও কিছু ওরা তোমার সঙ্গে করেছে কখনও?'

মুখে জবাব না দিয়ে ঘাড় নেড়ে রিণা বোঝাল তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি।

'কত বয়স তোমার?'

'ষোল।'

'ছেলেরা সবাই যে ওরকম এতদিনে তা আশা করি তোমার জানতে বাকি নেই?' ঘাড় নেড়ে সায় দিল রিণা

'তোমার বয়সে আমারও একইরকম অনুভূতি হত।'

'সত্যি বলছেন?' মিস ব্র্যাডলির কথা শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে, 'এতদিন শুধু মনে হত আমি একমাত্র মেয়ে যার এই জাতীয় অনুভূতি হয়। আমার মত অভিজ্ঞতা আর কোনও মেয়ের হয়না।'

'ওরা সবাই বোকা।' বলেই নিজেকে চটপট সামলে নিয়ে মিস ব্র্যাডলি, বললেন, 'এককাপ চা করব ভাবছিলাম। তুমি খাবে এককাপ?'

'আপনার অসুবিধা না হলে খাব,' দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল রিণা।

'তোমার জন্য বাড়তি এককাপ চা বানাতে আমার কোনও অসুবিধেই হবেনা, সোনা,' মিস ব্র্যাডলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আমি কিচেনে যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ জিরোও, আরাম করো। চা তৈরি করতে এক মিনিটের বেশি সময় আমার লাগবেনা।' বলতে বলতে খুদে কিচেনেটে ঢুকলেন তিনি। স্টোভের বার্ণারে আগুন লাগাতে গিয়ে মিস ব্র্যাডলি লক্ষ করলেন নিজের অজান্তেই তিনি গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে শুরু করেছেন, পুরোনো দিনের প্রেম নিবেদনের গান।

এই গরমের ছুটি ইওরোপে কাটাতে পারলে দেহমন দু'দিক থেকেই ভালো হবে। অবশ্য এটা আমার নিজের ধারণায়, বললেন মিস ব্র্যাডলি।

সাদা চাদর বিছোনোর দরুন বিশাল ডিনার টেবল যেন লম্বায় চওড়ায় আরও বেড়ে গেছে, চেয়ারে ঠেস দিয়ে টেবলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হ্যারিসন মার্লোর অন্তত তাই মনে হল। রিণা আর তাঁর শিক্ষিকা দু'জনে তাঁর দু'পাশে মুখোমুখি বসেছে। মিস ব্র্যাডলির পরনে সাধারণ পোষাক, ফ্যাসানের ছিটেফোঁটাও তাতে নেই। তাঁর চেহারাও সাধারণ, যৌবনের বিন্দুমাত্র আকর্ষনের হদিশ মেলেনা সেখানে। মিস ব্র্যাডলির বয়স কুড়ির কোঠার শেষপ্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে তা তাঁর চোখমুখ খুঁটিয়ে দেখেই আঁচ করেছেন হ্যারিসন, তাঁর ছিরিছাঁদহীন সাধারন চেহারা আর সাদাসিধে পোষাক দেখে ভরসা পেলেন তিনি, এই যুবতীকে বিশ্বাস করা যায় এই ধারণা দানা বাঁধল তাঁর মনে।

'ওর মা বেঁচে থাকতে রিণাকে ইওরোপ দেখিয়ে আনার ব্যাপারে ওর মায়ের সঙ্গে প্রায়ই আমার কথাবার্তা হত,' তুলোর ব্যবসায়ী হ্যারিসন মার্লো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

'আমার মতে অন্তত একবার ওখানে না গেলে কোনও মেয়েরই শিক্ষাদীক্ষা বলতে

যা বোঝায় তা পরিপূর্ণ হয়না," আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে জবাব দিলেন মিস ব্র্যাড্‌লি।

নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন হ্যারিসন। মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঘরসংসার করার উপযুক্ত করে তোলা রীতিমত গুরুদায়িত্ব, স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর চার পাঁচ মাস পরে একটি ঘটনায় তা তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছেন।

কি বার ছিল মনে নেই, শুধু এইটুকু হ্যারিসনের মনে আছে যে অফিসের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে তিনি রিণাকে বসার ঘরে দেখে অবাক হয়েছিলেন।

রিণার পরনে ছিল জমকালো ঘন নীল রং-এর পোষাক, বেলাশেষের ম্লান আলো একমাথা সোনালি চুলে পড়ায় মনে হচ্ছিল তার বয়স যেন রাতারাতি অনেক বেড়ে গেছে, রিণাকে তাঁর পূর্ণযুবতী মনে হচ্ছিল।

'কেমন আছো, বাপি?' সামনাসামনি পড়তে রিণাই প্রথমে কথা বলল।

'রিনা!' মেয়েকে দেখে তাঁর বিস্ময় বাধা মানল না, 'খবর না পাঠিয়ে হঠাৎ চলে এলে যে বড়! ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার কিছু নয় বাপি,' মুচকি হাসল রিণা, 'মা নেই, ল্যাডিও চলে গেল! প্রায়ই মনে হচ্ছে এতবড় বাড়িতে একা একা তোমার সময় নিশ্চয়ই কাটছে না, খুব কষ্ট হচ্ছে। এসব ভেবে আমার নিজের মনটা প্রায়ই ভারি হয়ে উঠছে, তাই তোমায় কোনও খবর না দিয়ে ক'দিনের ছুটি নিয়ে স্কুল থেকে চলে এলাম।'

'চলে ত এলে, কিন্তু তোমার পড়ায় যে ফাঁক পড়ল তার কি হবে?'

'ও নিয়ে শুধুশুধু ভেবোনা, বাপি, ও আমি ঠিক পুষিয়ে নেব।'

'কিন্তু—'

'ওঃ, বাপি! সত্যি করে বলো ত, আমি যে এসেছি এটা তোমার মোটেও পছন্দ নয়, তাই ত? আমায় দেখে তোমার মোটেও ভাল লাগছেনা!' চাপা অভিমানের সুর ফুটল তার গলায়।

'কে বলল!' পলকে নিজেকে সামলে নিলেন হ্যারিসন, 'অ্যাদ্দিন বাদে তোমায় দেখে আমি খুব খু-উ-ব খুশি হয়েছি, সোনা!'

'তাহলে তুমি এখনও আমায় চুমু খাওনি কেন?' বলে তাঁর মুখের কাছে গাল নিয়ে এল, হ্যারিসনও দেরি না করে টুক করে সেই বাড়িয়ে দেয়া গালে চুমু খেলেন।

'উফ্ বাপি!' চুমু খেয়েই খিলখিল করে হেসে উঠল রিণা, 'গালে তোমার গোঁফের সুড়সুড়ি লাগল।'

'এত আজ নতুন কিছু নয়, সোনা,' হাসি মুখে বললেন হ্যারিসন, 'যখন এইটুকু ছোট্টটি ছিলে তখনও আমার গোঁফের সুড়সুড়ি লাগত গালে মনে নেই?'

'কিন্তু এখন ত আমি আর ছোট্টটি নেই, বাপি, তাই না?'

হ্যারিসন তাকালেন তার দিকে, ঘন নীল পোষাক সেদিনের ছোট্ট রিণাকে আজ এই-মুহূর্তে পূর্ণবয়স্কা যুবতী বলেই মনে হচ্ছে। সায় দিয়ে বললেন, 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক সোনা, তুমি আগের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছো।'

'ডিনারের আগে একটু ড্রিংকস নেবেনা বাপি?' বলে ঘাড় ফিরিয়ে সাইডবোর্ডের দিকে তাকাল রিণা, এগিয়ে এসে বরফ বের করে ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরো করে বালতিতে রাখল।

'আজ ডিনারে কি রেঁধেছ?' মেয়ের কাছে এসে জানতে চাইলেন হ্যারিসন।

'তুমি যা যা খেতে ভালোবাসো মলিকে দিয়ে সব আমি তৈরি করিয়েছি,' বলল রিণা, 'চিকেন রোস্ট আর সেঁকা আলু।'

'বাঃ, খাসা।' পরিতৃপ্ত গলায় কথাটা বলেই হ্যারিসন হাত বাড়ালেন হুইস্কির বোতলের দিকে, ঠিক তখনই রিণা বলে উঠল, 'হুইস্কি কেন, বাপি? মার্টিনির বোতল দেখছি পুরোটাই ভর্তি আছে, অনেক দিন খাওনি বুঝি? আজ এক ঢোঁক খাওনা।'

খানিক ইতস্তত করে জিন-এর বোতলটা তুলে নিলেন হ্যারিসন, তারও খানিক বাদে দেখলেন পুরোনো অভ্যাসের বশে একটা নয়, দু'জনের জন্য দুটো ককটেল বানিয়ে ফেলেছেন তিনি, স্ত্রী বেঁচে থাকতে যেমন বানাতেন। স্ত্রী বিয়োগের এতদিন পরেও অভ্যাস পাল্টায়নি দেখে অবাক হলেন, নিজের ওপর বিরক্তও হলেন ভেতরে ভেতরে, দ্বিতীয় গ্লাসটা নামিয়ে রাখতেই রিণা বলে উঠল, 'আমায় আজ একটু দাওনা বাপি, আমার ত ষোল পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন ডিনারের আগে ককটেল চালাতে আমার বাধা কোথায়? আমাদের স্কুলে অনেক মেয়ে আছে যারা ডিনারের আগে বাবা মার সঙ্গে ককটেল চালায়। আমাকেও একটু দাও না, বাপি!'

মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে তার আবদার ফেলতে পারলেন না হ্যারিসন, সে পুরোনো অভ্যাসের বশে স্ত্রীর জন্য তৈরি করা ককটেলের গ্লাসখানা নিয়ে তুলে দিলেন রিণার হাতে, নিজের গ্লাস তুলে মেয়ের স্বাস্থ্যকামনা করে আলতো চুমুক দিলেন।

'বাঃ, খাসা বানিয়েছো!' ককটেলে প্রথম চুমুক দিয়ে আপনমনে বলে উঠলো রিণা, আর তা কানে যেতেই চমকে উঠলেন হ্যারিসন। ডিনারের আগে ককটেলে চুমুক দিয়ে তাঁর স্ত্রীও এমনি তারিফ করতেন, সেইমুহূর্তে তাঁর মনে পড়ে গেল সেই একই গলা, একই বলার ঢং। স্ত্রীর কথা মনে পড়তে দু'চোখ ফেটে জল এল, অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, মেয়ের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন যাতে তাঁর চোখের জল তার খুসির মুহূর্তকে ছাপিয়ে না যায়। পানীয় ভর্তি গ্লাস নামিয়ে রেখে কৌচে বসে পড়লেন হ্যারিসন, রিণাকে হাত ধরে পাশে বসালেন, তার ঘাড়ে মুখ গুঁজে অবোধ শিশুর মত কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

'বাপি। আমার বাপি। আ হা রে!' তাঁর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ব্যথিত গলায় বলে উঠল রিণা, 'কাঁদে না বাপি! আহা বেচারা!'

ঐভাবেই হ্যারিসনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল রিণা, কিন্তু খানিক বাদে চিবুকে মেয়ের উদ্ধত স্তনের ছোঁয়া লাগতে চমকে উঠলেন তিনি, স্বজন হারানোর অসহায় ভাব নিমেষে কেটে গেল, মুখ সরিয়ে নিজেকে শুনিয়ে আপনমনে বললেন, বয়স যত বাড়ছে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি তত লোপ পাচ্ছে।'

'না বাপি,' শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল রিণা, 'বিশ্বাস করো, নিজেকে আমার আর মোটেও ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছে না। এই একটু আগে মায়ের কথা ভেবে তুমি যখন চোখের জল ফেলছিলে তখন মনে হচ্ছিল আমি মায়ের মত বড় হয়ে উঠেছি, আমাকে এখন কারও দরকার, খুব, খু-উ-ব দরকার।'

কাজকর্মের ক্লান্তি আর প্রিয়জনের শোক, মানসিক অবসাদ এনে দিয়েছে তাঁকে, তার মধ্যে রিণার কথা শুনে হাসি চাপতে পারলেন না হ্যারিসন, বললেন, 'ও, বড় হবার সখ চেপেছে, মায়ের মত বড় হবার সখ! তা তোমার বড় হবার এখনও ঢের দেরি আছে সোনা, বড় হবার মত সময় আসতে এখনও বাকি আছে।'

পরে সে রাতে ডিনারের পরে রিণা এল তাঁর কাছে, স্টাডিতে ঢুকে চেয়ারের হাতলে বসে বলল, 'আমি আর স্কুলে ফিরে যাচ্ছিনা বাপি, এখন থেকে আমি বাড়িতেই থাকব, তোমার ঘরসংসার দেখাশোনা করব।'

'বাড়িতে থেকে ঘরসংসার দেখবে?' হাসলেন হ্যারিসন, 'কিন্তু মামনি, বেশিদিন যে ঐকাজ তোমার ভাললাগবে না। এখন মুখে বলছ বটে কিন্তু দু'দিন বাদে তোমার ভীষণ খারাপ লাগবে, একঘেয়ে ঠেকবে, হাঁফিয়ে উঠবে। স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলো, দৌড়ঝাপ, আউটিং, পিকনিক, কত মজা! তার ওপর ছেলেবন্ধুরা আছে, তাদের কাছে যাবেনা—'

'ছেলে! ছেলেবন্ধু!' ঝাঁঝিয়ে উঠল রিণা, 'দোহাই বাপি, ওদের কথা আমায় বোলনা, ওদের ছাড়াও আমার চলবে! দেখছি'ত অ্যাদ্দিন ধরে, ওগুলো মানুষ নয়, জানোয়ার! দিনরাত শুধু ছোঁকছোঁক করছে! হতভাগাদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না!'

'দেখতে পারেন না, কেমন?' বিদ্রূপের গলায় বললেন হ্যারিসন, 'সহ্য করতে পারেন না! তা কেমন ছেলে আমাদের রাজকন্যের পছন্দ একবার শুনি?'

'তা যদি জানতে চাও ত বলব ওসব ছেলেছোকরা নয়, আমার পছন্দ বয়স্ক পুরুষমানুষ,' গম্ভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিঃসংকোচে জবাব দিল রিণা, 'সে তোমার বয়সী হলেও আমার আপত্তি নেই। সবরকম নিশ্চিন্ততা আর নিরাপত্তা আমি পাব তার কাছে, কোন কমবয়সী ছেলেছোকরার কাছে যা পাওয়া যায়না। তাছাড়া দৈহিক আর মানসিক সঙ্গের কথা যদি বলো ত তাও ওরা দিতে পারে অকাতরে হাসিমুখে। ছেলেছোকরাদের কাছে গায়ের জোরটাই বড়, তাই চাওয়া পাওয়ার ধার ওরা ধারে না, গায়ের জোরে সব ছিনিয়ে নিতে চায়।'

'তা এর মধ্যে দোষের কি দেখলে?' মৃদু হাসলেন হ্যারিসন, 'যাদের ওপর তোমার এত রাগ সেই ছেলেছোকরারা যে নেহাৎ ছেলেমানুষ!'

'তা আমার জানা আছে,' গম্ভীর গলায় বলল রিণা, 'আর তাই আমি ওদের এত ভয় পাই, এড়িয়ে চলি। এত স্বার্থপর ওরা যা বলার নয়, সবাই যে যার নিজের স্বার্থের পেছনে ছুটছে, সেটুকু পেলেই সব পাওয়া হয়ে গেল, এদিকে আমি কোথায় গেলাম, আমার কি হাল হল, তা নিয়ে কারও এতটুকু মাথাব্যথা নেই।' বলতে বলতে ঝুঁকে হ্যারিসনের মাথায় চুমু খেল রিণা, 'একরাশ কালোর মাঝে দুটো একটা সাদা চুলের রূপোলি আভা কি সুন্দর দেখাচ্ছে! তোমার গোটা চেহারাটাই এতে পাল্টে গেছে। ইস্, আমার বরাত সত্যিই খারাপ, ভীষণ খারাপ বাপি, তাই মন চাইলেও তোমায় বিয়ে করতে পারবনা।'

'রিণা! কি হচ্ছে এসব?' মেয়ের লাগামছেঁড়া প্রগলভতায় বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠলেন হ্যারিসন। রেগে চোখ পাকিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ফোঁশ ফোঁশ করলেন, খানিক বাদে গলা চড়িয়ে বললেন, 'বয়স যত বাড়ছে তত ফাজিল আর ডেঁপো তৈরি হচ্ছ, তাই না? মা নেই বলে যা খুশি করবে ভেবেছো? দাঁড়াও তোমার ডেঁপোমি বের করছি—সঙ্গে বলে রাখছি কাল সকালেই তোমাকে আবার স্কুলে ফিরে যেতে হবে। আমি পীটার্সকে বলে রাখছি, ও গাড়ি করে পৌঁছে দেবে। তোমার বজ্জাতি বের করছি!'

'ওঃ বাপি!' এক ধমকে রিণার দু'চোখ জলে ভরে উঠল, এগিয়ে এসে দু'হাতে বাবার

গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি জানি, মা নেই বলে তুমি এখন আর আমায় মোটেও ভালবাসোনা, তাই আমি তোমার কাছে এসে থাকি তা চাও না।'

'ধুর পাগলি!' মেয়ের অভিমান দেখে হ্যারিসনের সব রাগ নিমেষে জল হয়ে গেল, অনেকদিন আগে গাছতলায় বসে রিণার আপনমনে খেলা করার ছবিটা ভেসে উঠল চোখের পর্দায়, সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'আমায় ভুল বুঝোনা সোনা, তাতে আমার কষ্ট হয়। তোমার দুঃখ তোমার মনের ব্যথা সবই বুঝি, কিন্তু আমাদের ত এই দুনিয়াতে থাকতে হবে, তাই এখানকার নিয়মকানুন কিছু বাদ দিয়ে ত চলতে পারব না।'

'কিন্তু আমি যে সবসময় তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, বাপি!'

'না, সোনা, তা হয় না, হবার নয়!' ধৈর্য বজায় রেখে শান্ত গলায় বললেন হ্যারিসন, 'আজ এখন তুমি ব্যাপারটা ঐভাবে ভাবছো ঠিকই, কিন্তু যখন আরও বড় হবে, বয়স আরও বাড়বে, নিজে যখন ছেলেপুলের মা হবে, তখন আর তা বুঝিয়ে দেবার দরকার হবে না।'

'না! কখনোই না!' বাবার হাত থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিল রিণা, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি কাউকে বিয়ে করবনা আর কখনোই ছেলেপুলের মা হবনা। আর কোনও লোককে কখনোই আমার গায়ে হাত দিতে দেবনা!'

'রিণা!' মেয়ের উগ্রমূর্তি আর তার কথা শুনে চমকে উঠলেন হ্যারিসন মার্লো।

'বাপি! বাপি!' উত্তেজনার দমক সামলাতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি না, তুমি নিজেই সবকিছু দেখেও বুঝতে পারছোনা!'

'মা হারা মেয়ে আমার!' গভীর মমতায় দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন হ্যারিসন, 'আয় সোনা, বুকে আয়!'

কিন্তু রিণার অভিমান তখনও যায়নি, বাপের কাছ থেকে এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকল সে, ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে বিছানায় উপুড় হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

ক'মাস আগের সেই ঘটনা ছবির মত এতক্ষণ ভাসছিল চোখের সামনে, একসময় সেগুলো মুছেও গেল, হ্যারিসন মার্লো অতীত থেকে ফিরে এলেন বর্তমানে, রিণা আর তার শিক্ষিকা দু'জনেরই চোখমুখ খুঁটিয়ে দেখলেন।

'মিস্ ব্র্যাডলি,' হ্যারিসন বললেন, 'রিণার মা বেঁচে থাকলে আপনার মত যোগ্য লোকের হাতে আমাদের মেয়েকে আমরণ খুশি মনে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।'

'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, মিঃ মার্লো,' বলতে বলতে মাথা নিচু করে সুপের বাটিতে চামচ ডোবালেন মিস ব্র্যাডলি, তাঁর দু'চোখের মণিতে যে বিজলি লহমার জন্য ঝিলিক দিল অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী হ্যারিসন মার্লোর চোখে তা ধরা পড়লনা।

৮

স্ট্যাচু অফ লিবার্টি আর এলিস দ্বীপ পেরিয়ে জল কেটে এগিয়ে চলেছে যাত্রিবাহী জাহাজ লেভিয়াথান। পড়ন্ত বেলায় ওপরের ডেকে পাশাপাশি চেয়ারে বসেছে দু'জনে। তীরভূমি মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই, সামনে তাকালে শুধু মহাসাগরের সবুজ

সফেন জলরাশি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনা। ভেতরে ভেতরে রোমাঞ্চ বোধ করছে দু'জনেই।

'মুখ বুঁজে আছো কেন,' ছাত্রীর চোখমুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠলেন মিস্ মার্গারেট ব্র্যাডলি, 'উত্তেজনা হচ্ছে ত?'

'তা আর বলতে,' মৃদু হাসল রিণা, 'চারপাশে তাকিয়ে মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি।'

'স্বপ্ন দেখা এইত সবে শুরু,' এবারে মার্গারেট হাসলেন, 'চলো, কেবিনে গিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।'

'এখনই যাব?' ঘাড় বাঁকিয়ে মৃদু প্রতিবাদ করল রিণা, 'কিন্তু আমার ত ক্লান্তি হচ্ছেনা।'

'হবে সোনা,' মিষ্টি গলায় বললেন মার্গারেট, 'খানিক বাদেই দেখবে ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়ছে। দু'একদিন নয়, টানা ছ'দিন আমাদের কাটবে এই জাহাজে, কাজেই ডেকে বসে দেখার মত অনেক সময় পাবে তুমি।'

আর কথা না বাড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিণা, মার্গারেটের পেছন পেছন ঢুকল কেবিনে। প্রথমশ্রেণীর বিলাসবহুল কেবিন, আধুনিক জীবনযাত্রায় যাবতীয় উপকরণ সেখানে সাজিয়ে রাখা। কোট খুলে মার্গারেট বসলেন গদিমোড়া চেয়ারে, হাতব্যাগ খুলে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন, নাক দিয়ে পরিতৃপ্তির ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে দেখলেন রিণা হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে—শিক্ষিকাকে এই প্রথম ধূমপান করতে দেখে অবাক হয়েছে সে। কোটিপতি বাবার গেঁইয়া আনাড়ি মেয়েটার কচি মাথা চিবিয়ে খাওয়ার সাধ জাগল মনে, খোলা সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন; 'নাও তুমিও ধরাও।'

প্রবল সংকোচে নিমেষে কুঁকড়ে সরে বসল রিণা, ঘাড় নেড়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করল।

'নাও, নাও সোনা, অত লজ্জা করতে নেই!' মার্গারেট ব্র্যাডলির গলা তাঁর নিজের কানেই অদ্ভুত দৃঢ় শোনাল, 'মেয়েমানুষ বলে সিগারেট ফুঁকবেনা এ আবার কেমন কথা? আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই ইওরোপের বেশিরভাগ মেয়েই সিগারেট খায় সে খবর রাখো? আমার কথা বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখো। ওরা আমাদের মত এমন গেঁয়ো না।'

এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না রিণা, প্যাকেট থেকে একখানা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরল। মিস্ মার্গারেট লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিতেই খানিকটা ধোঁয়া ঢুকল গলায়। ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে খকখক করে কাশতে লাগল রিণা।

'ধুর বোকা!' তার দুর্দশা দেখে হেসে উঠলেন মার্গারেট, 'ধোঁয়া মোটেও গিলতে নেই, নাক মুখ দিয়ে বের করে দিতে হয়।

দু'চারবার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধূমপানের গোড়ার দিকটা রপ্ত করে ফেলল রিণা।

'কেমন লাগছে?' জানতে চাইলেন মার্গারেট।

'মন্দ না,' জবাব দিল রিণা, 'বেশ মজা লাগছে।'

'মজা লাগছে ত বেশ! এবার থেকে তাহলে নিয়ম, রীতিনীতি এসব বস্তাপচা ব্যাপারগুলো জলে ছুঁড়ে ফেলে আমার আরও কাছাকাছি চলে এসো। জানো ত, আমার ডাকনাম পেগি, এখন থেকে তুমি অনায়াসে আমায় ঐনামে ডাকতে পারো।' বলতে বলতে আধপোড়া সিগারেট ছাইদানিতে পিষে নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মার্গারেট, 'কে আগে চান করতে যাবে বলো, তুমি, না আমি?'

'না মিস্ ব্র্যাডলি,' নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ঘাড় হেলাল রিণা, 'আপনি আগে যান।'
'আবার মিস ব্র্যাডলি? বলো পেগি!'
'ইয়ে ... হ্যাঁ পেগি, আপনি আগে যান ...

চান সেরে রিণা ফিরে আসতে পানীয়ভর্তি দু'টি গ্লাস ট্রে-তে সাজিয়ে স্টুয়ার্ড ঢুকল কেবিনে, একটা গ্লাস রিণার হাতে দিয়ে মার্গারেট বললেন, 'নাও, শেরি খাও। এতে গা গুলোনো যেমন কমবে, তেমনই বাড়বে খিদে। চিয়ার্স!' বলে নিজের গ্লাসে চুমুক দিলেন তিনি।

'জিনিসটা খেতে দেখছি সত্যিই ভালো,' শেরিতে চুমুক দিয়ে বলল রিয়া, 'আচ্ছা, পেগি, আজ রাতে ডিনারে কি আমার নতুন নীল স্যুটটা পরব?'

'রিণা!' বিস্ময় মেশানো গলায় চাপা শাসনের সুরে বললেন মার্গারেট, 'আমাদের ফার্স্টক্লাস ডাইনিং হলে যেতে হবে। ওখানে পোষাকের ব্যাপারে কিছু নিয়মকানুন আছে।'

'পার্টিতে যাবার কিছু পোষাক আমি নিয়ে এসেছি,' রিণা বলল, 'তা থেকে ভাল দেখে একটা বেছে পরতে পারি।'

'পার্টিতে যাবার পোষাক?' ভুরু কুঁচকে বললেন মার্গারেট, 'তার মানে যেসব পোষাক পরে স্কুলে অ্যাদ্দিন বাইরের ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে নাচতে? ধ্যাত্! ঐসব বিশ্রি পোষাক পরে ফার্স্টক্লাস ডাইনিংরুমে যাবার কথা তুমি বললে কি করে তাই ত আমি ভেবে পাচ্ছি না!'

তাঁর কথায় মনে আঘাত পেয়েছে রিণা, একপলক তার চোখের দিকে তাকিয়ে তা আঁচ করে নিজেকে শুধরে নিলেন মার্গারেট, 'আসলে আমি বলতে চাইছি ঐসব পোষাক বাচ্চা মেয়েদের বেলায় ঠিক আছে, কিন্তু তুমি ত এখন আর বাচ্চা মেয়ে নও, রীতিমত লেডি যে আমার সঙ্গে ইওরোপে যাচ্ছে। ঐ পোষাকে তোমাকে খুবই বিশ্রি দেখাবে।'

'তাহলে আমি কি পরব আপনিই ঠিক করে দিন,' অসহায় ভাবে বলল রিণা।

'তোমার পোষাক ওতে আছে,' খাটের ওপর সাজিয়ে রাখা দুটো মাঝারি বাক্স ইশারায় দেখালেন মার্গারেট, তাঁর মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রিণা ছুটে এসে বাক্সদুটো খুলে ফেলল, ভেতরে তার মাপের কতগুলো দামি পোষাক থেকে মার্গারেট নিজের পছন্দমত একটা কালো রেশমি ককটেল গাউন বেছে তুলে দিলেন তার হাতে।

ঘণ্টাখানেক বাদে সেই গাউন পরে রিণা মার্গারেটের সঙ্গে এল ডিনার সেলুনে। ভেতরে যে ক'জন পুরুষ খাচ্ছিল সবাই খাওয়া ছেড়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

টয়লেটে এইমুহূর্তে মার্গারেট একা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। তোয়ালেটা খুলে নিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। চোখ, নাক, কান সব খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে একসময় অজান্তেই হাতদুটো এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বুকের ওপর, মার্গারেটের বুক ছেলেদের মতন সমতল, ছেলেদের মতন দুটি খুদে বৃন্ত বা বোঁটা ছাড়া স্তনের কোনও অস্তিত্ব সেখানে নেই, বুকের মত তাঁর নিতম্বও ছেলেদের মত সমতল, এমনক নারীত্বের সামান্য ছিরিছাঁদ নেই পায়ের গড়নেও। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেশমি পাজামার ভেতর পা দু'টি গলালেন তিনি, কোমরে ফাঁস এঁটে গায়ে চাপালেন আঁটো বোলারো জ্যাকেট। পুরুষ দর্জিকে মাপ দিয়েই এসব

তৈরি করানো। এরপরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেদের ঢং-এ ছোটবড় চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ালেন। এইমুহূর্তে একনজরে তাকালে তাঁকে পুরুষ বলে যে কেউ ভাবতেই পারে।

টয়লেট থেকে কেবিনে ফিরে আসতে রিণা হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে, রিণার দিকে তাকিয়ে হাসলেন মার্গারেট, 'হাঁ করে দেখছ কি, কেমন মানিয়েছে বলো!' রিণার উত্তরের অপেক্ষা না করে আলমারি খুলে মাঝারি আকারের পুরু কাগজের বাক্স বের করে তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'ভেতরে কয়েকটা নাইটগাউন আছে, সব তোমার জন্য কেনা!'

বাক্স খুলে ভেতরের পোষাকগুলো দেখতে দেখতে রিণার মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে— রঙিন আর মোলায়েম এই পোষাকগুলো সব তার একার?

'সবকটাই ত দেখছি রেশমি,' বলল রিণা, 'সব আমার?'

'সব তোমার,' হাসলেন মার্গারেট, 'প্রত্যেক রাতের জন্য একটা। আজ রাতে সাদাটা পরবে, যাও টয়লেটে গিয়ে পরে এসো।'

'পেগি,' টয়লেটের দরজার কাছে এসে বলল রিণা, 'আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব তাই ভেবে পাচ্ছি না। আপনি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সুন্দর করে তুলেছেন।'

'তোমাকে সুখী দেখতে চাই বলেই ত তোমায় নিয়ে এতদূরের পথ পাড়ি দিতে বেরিয়েছি!' পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন মার্গারেট, 'তুমি পোষাক পাল্টে নাও, সেই ফাঁকে আমি এক বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার দিচ্ছি। আজ রাতে একটা ছোট্ট পার্টি হয়ে যাবে, কি বলো, শুধু আমাদের দু'জনকে নিয়ে?'

'ওফ্, দারুণ হবে!' হেসে উঠল রিণা, 'জানেন শ্যাম্পেন খাবার আমার অনেকদিনের সাধ, কিন্তু বাপি একবারও চাখতে দেয়নি।'

'এখানে ত আর তোমার বাপি নেই, তাই আজ কেউ তোমায় মানা করবেন না। ভয় নেই, আমি ওঁকে বলবনা,' বলে ইন্টারকমের রিসিভার তুলে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলেন মার্গারেট।

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল রিণা।

'কি হল আবার?' চেয়ারে গা এলিয়ে নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন মার্গারেট।

আমার নাইটগাউন থেকে ফুলকি বেরোচ্ছে,' রিণা বলল, 'নড়াচড়া করলেই হচ্ছে।'

'ওটা স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্রিয়া,' বললেন মার্গারেট, 'রেশম বিদ্যুতের পরিবাহী।'

'জানি পেগি,' রিণা বলল, 'আপনিই ক্লাসে আমাদের পড়িয়েছিলেন।' নিজের পোষাকে হাত ঘষল সে, 'খুদে নীল ফুলকি বেরোচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন?'

'কই না।'

'ঘরে আলো আছে বলে চোখে পড়ছেনা,' বলে সুইচ টিপে কেবিনের আলো নেভালো রিণা, তারপর মার্গারেটের সামনে দাঁড়িয়ে গাউনের ধারে হাত ঘষতেই চাপা মুড়মুড় আওয়াজ তুলে একরাশ খুদে নীল ফুলকি ঠিকরে পড়ল। সুইচ টিপে আলো জ্বালাল রিণা, খালি গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমায় আরেকটু শ্যাম্পেন দেবেন, পেগি?'

'নিশ্চয়ই দেব,' বলে তার খালি গ্লাসে আবার শ্যাম্পেন ঢাললেন মার্গারেট। বললেন, 'এটা খাবার পরে গা কেমন গরম হয়ে উঠছে খেয়াল করছো?'

'দেখেছি, পেগি,' রিণা বলল, 'পাখা চালিয়ে দেব?'

'অমন কাজটিও কোর না, সোনা,' চটপট বললেন মার্গারেট, 'সাগরের বুকে আচমকা ঠান্ডা লাগলে বেজায় ভুগতে হবে।' বলতে বলতে জ্যাকেট খুলে ফেললেন তিনি, 'এতেই হবে।'

জ্যাকেটের নীচে মার্গারেটের সমতল বুক আর পুরুষালি দু'টি স্তনবৃন্তের দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল রিণা, হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। রিণার দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করলেন মার্গারেট, তার খালি গ্লাসে আবার শ্যাম্পেন ঢেলে দিতেই রিণা তিন চুমুকে তা খেয়ে নিল। ততক্ষণে তার বেশ নেশা হয়েছে, অল্প জড়ানো গলায় বলল, 'কাছেই কোথাও যেন বাজনা বাজছে, শুনতে পাচ্ছেন, পেগি?'

'বলরুমে অর্কেস্ট্রা বাজছে।'

'ওয়াল্‌জ! আহা, কি মিষ্টি বাজনা,' বাজনার তালে তালে দুলতে দুলতে বলল রিণা, 'নাচতে আমার খুব খু-উ-ব ভাল লাগে, পেগি।' বলতে বলতে কেবিনের ভেতর নাচের ছন্দে দুবার পাক খেল রিণা, পোর্টহোল দিয়ে ভেসে আসা সাগরের দামাল হাওয়া তার সাদা গাউন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল, তার লম্বা ধপধপে সাদা দু'টি পায়ের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মার্গারেট। তাঁর নিজেরও এতক্ষণে যথেষ্ট নেশা হয়েছে, চেয়ার ছেড়ে উঠে রিণার সামনে নাচের রীতি মেনে অল্প নুয়ে বললেন, 'মিস মার্লো, আমার সঙ্গে একটু নাচবেন?'

'শুধু একা আমারই সঙ্গে মনে থাকে যেন, মিস ব্র্যাডলি,' মজা পেয়ে হাসল রিণা, 'আর এই একবার।'

'মিস নয়, বলো মিঃ ব্র্যাডলি,' রিণার ভুল হাসিমুখে শুধরে দিলেন মার্গারেট।

'ঠিক বলেছেন, মিঃ ব্র্যাডলি।' সায় দিল রিণা। একহাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বলরুম থেকে ভেসে আসা বাজনার তালে পা ফেলে কেবিনের ভেতর নাচ শুরু করলেন মার্গারেট, রিণাও মজা পেয়ে পা মেলাল। রিণার উত্তাপে তাঁর নিজের অতৃপ্ত বুভুক্ষু দেহ থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে টের পেলেন মার্গারেট। খানিক বাদে বলরুমে বাজনা থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একবারে ঘুরে মার্গারেট থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, থমকে দাঁড়াল রিণাও। খালি গ্লাস দুটোতে আবার শ্যাম্পেন ঢেলে মার্গারেট বললেন, 'তুমি ভারি চমৎকার নাচতে পারো তো রিণা, একবারও তাল কাটেনা।'

'ধন্যবাদ,' পানীয়ে চুমুক দিয়ে রিণা জড়ানো গলায় বলল, 'স্কুলে বাইরের যে ছেলেগুলো নাচতে আসে তাদের সবার চেয়ে ভাল নাচার ক্ষমতা আপনারও আছে, পেগি। কিন্তু আমার মাথা ঘুরছে কেন, হয়ত নেচেছি বলে, তাই না?'

'যথেষ্ট পরিশ্রম করেছো।' মার্গারেট বললেন, 'এবার শুয়ে একটু জিরিয়ে নাও।'

'ঠিক আছে,' গ্লাস টেবিলে রেখে খাটে উঠে হাত পা টানটান করে শুয়ে পড়ল রিণা।

'এখন কেমন লাগছে?' পাশে বসে বললেন মার্গারেট, 'একটু সুস্থ মনে হচ্ছে?'

'আর কিছু নয়, মনে হচ্ছে ঘরটা ঘুরপাক খাচ্ছে,' থেমে থেমে বলল রিণা।

হুঁম্, চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকো,' ঝুঁকে পড়ে তার কপালে তর্জনি দিয়ে কয়েকবার আলতো টোকা দিলেন মার্গারেট। খানিকবাদে চোখ মেলল রিণা, স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এবার ভাল লাগছে।'

'ঘরটা আর ঘুরপাক খাচ্ছে না ত?'

'না, না,' মুচকি হাসল রিণা।

'সমুদ্রে এমনিতেই গা গুলোয়, মাথা ঘোরে,' মার্গারেট বললেন, 'তারওপর প্রথম দিনে তোমার একটু বেশি শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে তাই এই বিপত্তি।'

'শুধু ইওরোপে বেড়াতে যাচ্ছি বলেই না,' রিণা বলল, 'আপনার মত এত অন্তরঙ্গ ভাবে কোনও মেয়েবন্ধু এর আগে আমি পাইনি, স্কুলে যাদের সঙ্গে পড়াশুনো করি তারা ত একেকজন শোকেস-এর পুতুল, রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসেছে এমনিই ধরণধারণ। ওদের যত ভাবনা ছেলেদের নিয়ে, কার ক'জন ছেলে বন্ধু, মাসে ক'টা চিঠি লেখে, ক'বার চুমু খেয়েছে এইসব ওদের আলোচনার বিষয়, আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই ওদের নেই।'

'ওদের নিয়ে ভেবে লাভ নেই, রিণা,' মার্গারেট হাসলেন, 'ওরা প্রায় সবাই বোকাসোকা ছেলেমানুষ। তবে তোমার কথা আলাদা। একসঙ্গে পড়াশোনা করলেও তোমার ব্যক্তিত্ব ওদের চেয়ে আলাদা। সে রাতে প্রথম যে দিন আমার ঘরে এলে সেদিন একপলক দেখেই তোমাকে ওদের চাইতে আলাদা আর পরিণত মনে হয়েছিল।'

'ল্যাডি মারা যাবার পর থেকে ছেলেদের আমি মোটেও সহ্য করতে পারিনা, ওদের দু'চোখের বিষ মনে হয়!'

'ল্যাডি কে?'

'আমার ভাই,' বলতে গিয়ে রিণার গলা ধরে এল, 'আমার বাপি আর ল্যাডি, এই দু'জনে ছাড়া আর কোনও পুরুষকে আমার কখনও ভাল লাগেনি।'

'ল্যাডি নিশ্চয়ই তোমার খুব স্নেহের ছিল,' বললেন মার্গারেট।

'শুধু স্নেহ বললে কম বলা হয়,' মাথা হেলিয়ে বলল রিণা, 'এখন একেকসময় মনে হয় আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম।'

'ও এমন কিছু নয়।' প্রসঙ্গটা হালকা করতে বললেন মার্গারেট। 'মনস্তত্ত্বের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, মেয়েরা সবাই জীবনের কোনও একসময় তাদের নিজেদের ভাইদের প্রেমে পড়ে।'

'ল্যাডির সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক ছিল না,' রিণা হাসল, 'আমার নিজের মা যখন মারা যান তখন আমি ছিলাম খুব ছোট। ঐসময় ল্যাডির বাবা মা আমায় আইন সম্মতভাবে পুষ্যি নেন, নিজের মেয়ের মতন ওঁরা আমায় এতবড় করেছেন।'

'তুমি ল্যাডির প্রেমে পড়েছিলে এমন ধারণা তোমার মনে হল কি করে?' রিণার অকপট স্বীকারোক্তি ঈর্ষার উত্তাপ জাগালো মার্গারেটের মনে।

'সব অনুভূতি ব্যাখ্যার ধার ধারেনা!' দৃঢ় গলায় বলল রিণা, 'আপনি নিজে শিক্ষিকা, ভয় আর ভালোবাসা দুটোই যে অনুভূতি নির্ভর তা ত আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন। আমি একা নই, ল্যাডি নিজেও যে আমার প্রেমে আকুল ছিল তা বেশ বুঝতে পারতাম।'

'তাই বুঝি?' ঈর্ষার জ্বলুনিতে ছটফট করতে করতে মার্গারেট যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রসঙ্গ বোঝাতে অশ্লীল ভঙ্গিতে ভুরু আর চোখ নাচিয়ে বললেন, 'ওর সঙ্গে তোমার ইয়ে— হয়েছিল? তোমরা 'ইয়ে' করেছিলে?'

'মাফ করবেন,' রিণা হঠাৎ সংযত গলায় বলল, 'এ নিয়ে আগে কখনও কারও সঙ্গে আমি আলোচনা করিনি।'

'আগে করোনি ত হলটা কি?'

রিণার কথা শুনে এমনিতেই অতৃপ্ত মার্গারেট ঈর্ষায় জ্বলছেন, তার জবাব শুনে এবার ভেতরে ভেতরে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি, একবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠে নিজেকে সামলে নিলেন---রিণার বাবার দৌলতেই তাঁর এই ফুটানি, তাঁর টাকা উড়িয়ে ধনী মত যাত্রীদের যাবতীয় বিলাসবহুল সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে করতে ইওরোপ বেড়াতে যাচ্ছেন তাঁর একমাত্র মেয়েকে সঙ্গি করে।

রিণার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁসের মত তার কোটিপতি বাবাকে চটিয়ে নিজের আখের মাটি করবেন এমন বোকা তিনি নন। 'তুমি কি আমাকে তোমার বন্ধু বলে এখনও মেনে নিতে পারছো না?' রিণার আঁতে ঘা দিলেন মার্গারেট, 'মেনে নিতে পারলে আমার কাছে তোমার অতীতের কথা কখনো গোপন করতে না, যা যা ঘটেছিল সব খুলে বলতে।'

'বলতে পারি,' রিণার প্রতিরোধ এবার ভেঙ্গে পড়ল, 'কিন্তু শুনলে আপনি রাগ করবেন না ত? আমায় খারাপ মেয়ে ভাববেন না?'

'মিছেই এসব ভাবছো, রিণা,' মার্গারেট বললেন, 'আমি তোমায় আমার বন্ধু ছাড়া আর কিছু ভাবছিনা। বন্ধুর কাছে মুখ ফুটে সব কথা বলতে কোনও বাধা নেই।'

'ল্যাডি আর আমি দু'জনেই তখন বহুদূর এগিয়ে গেছি,' বালিশে মুখ গুঁজে কান্না চাপা গলায় বলতে লাগল রিণা, 'এতটা দূরে যেখান থেকে ফেরার কথা ভাবা যায় না, আপনাদের চোখে যা হয়ত বেশি বাড়াবাড়ি। পরিণতি কি নিদারুণ শোচনীয় হতে পারে তা কিন্তু আমি আগেই আঁচ করেছিলাম আর তাই আমি গোড়ায় ল্যাডিকে আমায় ছুঁতে দিইনি। কিন্তু বেশিদিন ও নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, একদিন আমার ঘরে ঢুকে পড়ল তারপরেই বেল্ট দিয়ে আমার হাতদুটো বেঁধে শরীরের খিদে মেটাল। সেদিন আমার বড্ড লেগেছিল, কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলতে পারিনি।'

'তাহলে আমি বলব তুমি যাই ভাবোনা কেন ল্যাডি তোমায় মোটেও ভালবাসত না!' বিষ ওগড়ানো গলায় বললেন মার্গারেট, 'সত্যিসত্যিই ভালবাসলে ল্যাডি কখনোই তোমায় সেদিন ব্যথা দিতনা।'

'ল্যাডিকে দোষ দিচ্ছেন কেন,' বালিশ থেকে মুখ তুলে গলা চড়াল রিণা, 'আমি চেয়েছিলাম বলেই না সেদিন ল্যাডি আমার ওপর ঐভাবে জোর খাটাল, আমায় প্রচণ্ড ব্যথা দিল! আমায় ব্যথা দিতে, কষ্ট দিতে আমিই তাকে উস্‌কেছিলাম!'

'ল্যাডি আশ মিটিয়ে আমায় ব্যথা দিল, যন্ত্রণা দিল, আর তারপরেই বুঝলাম আমি ওকে মন থেকে কতটা ভালবাসি। কিন্তু ল্যাডিকে শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারিনি, ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে ল্যাডি পালতোলা নৌকোয় চেপে সাগরে বেড়াতে গেল, মাও গেলেন ওর সঙ্গে। মাঝপথে ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে দু'জনেই মারা গেলেন!' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল রিণা, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'জানেন পেগি, ভুলটা আমার ছিল, আমি তাকে দিয়ে আমার শরীরের খিদে মেটাতে চাই আর তাই ওকে একনাগাড়ে তাতাচ্ছি এটা ল্যাডি বুঝতে পেরেছিল! নৌকোডুবিতে মা নয়, আমারই ডুবে মরা উচিত ছিল! ঐ ঘটনার ক'দিন আগে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম আমি অথৈ জলে তলিয়ে যাচ্ছি, ধারেকাছে কাউকে পাচ্ছিনা। কিন্তু বাস্তবে আমি বেঁচে গেলাম, জলে ডুবে মরলেন মা আর মরল ল্যাডি। ওরা মারা যাবার পর থেকে স্বপ্ন আর আমি দেখিনি।'

'স্বপ্ন দেখছনা বলে এত মন খারাপ!' রিণার মাথাটা নিজের বুকে ঘষতে ঘষতে বললেন মার্গারেট, 'তোমায় স্বপ্ন দেখার দিন আবার শুরু হবে রিণা, আমি তোমায় যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সে এক স্বপ্নের দেশ।' বলতে বলতে রিণার মাথাটা ধীরে ধীরে বালিশে শুইয়ে দিলেন মার্গারেট, কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন 'চোখ বোঁজ, রিণা, তোমার হারানো স্বপ্ন এখুনি আবার ফিরিয়ে আনছি আমি। এবার বলো আমাকে কার মত পেতে চাও?'

'ল্যাডির মত,' একবার চোখ মেলে লজ্জা জড়ানো গলায় কথাটা বলেই আবার চোখ বুঁজল রিণা।

রিণার কথা শুনে চমকে উঠলেন মার্গারেট, তার মুখের দিকে তাকাতে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে এল, তাঁর মনে হল রিণা বেঁচে নেই, স্বপ্নে যেমন দেখেছিল সেভাবে সত্যিই মরে গেছে সে।

'রিণা!' দু'হাতে তাকে আঁকড়ে ভেউভেউ করে কেঁদে ফেললেন মার্গারেট, 'রিণা! দোহাই তোমায়, ফিরে এসো! আমি বড় নিঃসঙ্গ আর অসহায়! আমায় এইভাবে একা ফেলে তুমি চলে যেয়োনা!' বলতে বলতে রিণার দু'ঠোঁটে পাগলের মত চুমু খেতে লাগলেন মার্গারেট।

'পেগি!' বলতে বলতে চোখ মেলল রিণা, 'আপনি সত্যিই কাঁদছেন? আমার জন্য' চোখের জলে ধোয়া মার্গারেটের গাল, ঠোঁট ছুঁয়ে আবার চোখ বুঁজল রিণা, আত্মতৃপ্তির চাপা হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

'কি সুন্দর তোমায় দেখতে রিণা!' বলতে বলতে পরনের রেশমি নাইটগাউন খুলে ফেললেন মার্গারেট, তার কানের কাছে ঠোঁট এনে বললেন, 'চোখ বুঁজলে তোমায় কি সুন্দর দেখায় তা তুমি নিজে জানো না, রিণা। রিণা সত্যি বলছি, আমার চোখে তুমি দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। তোমার মত রূপসীর আর যাই হোক এত শীগগির মৃত্যু কখনোই হতে পারে না!'

'সত্যি বলছেন?' চোখ মেলে বলল রিণা, 'আমায় দেখতে এত সুন্দর?'

'আমার চোখের দিকে তাকাও,' বলতে বলতে নিজের পাজামা তিনি খুলে ফেললেন, 'আমার চোখের মণির দিকে তাকাও, দেখবে তুমি কত সুন্দর!' বলে রিণার হাত টেনে নিজের সমতল বুকে ছোঁয়ালেন মার্গারেট, কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'দ্যাখো, আমার বুক ভাল করে নিজের হাতে ছুঁয়ে দ্যাখো। ঠিক পুরুষ মানুষের বুক, দেখেছো?'

রিণা জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তাঁর চোখের দিকে, অস্তিত্বের অতল খাদ থেকে উঠে আসা আবেগ চাপতে না পেরে হার মানলেন মার্গারেট, রিণাকে সহবাসের ভঙ্গিতে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে উদগ্র লালসা মাখানো ঠোঁট চেপে ধরলেন তার ঠোঁটে, দুই গালে, আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তাঁর শরীর।

'আপনার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে হচ্ছে পেগি,' সহজ গলায় বলল রিণা, 'আপনি আর সব ছেলেমেয়েদের মত নন, ওদের আমার ভয় হয়, ঘেন্না হয়। কিন্তু আপনাকে ভয় বা ঘেন্না দুটোর কোনটাই হচ্ছেনা, আপনাকে ভাল লাগছে, পেগি, ভীষণ ভাল লাগছে!'

অব্যক্ত যন্ত্রণা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে মার্গারেটের শরীর, রিণার গাউন তুলে পা দুটো ফাঁক

করে তার শরীরে নিজের শরীর যতটা সম্ভব মিশিয়ে একাত্ম হতে চাইলেন। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল রিণা, মার্গারেট চাপাগলায় বললেন, 'আমি তোমায় ভালবাসি রিণা, তোমার মরা চলবে না।'

'ল্যাডি! ল্যাডি! আমার ল্যাডি এসেছিস?' বলতে বলতে গলা চড়িয়ে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল রিণা, 'ল্যাডি, আমায় সুখ দে! আরও জোরে! আরও ব্যথা দে! যত পারিস কষ্ট দে! ব্যথা দে, ব্যথা দিয়ে আমার সব আশা মিটিয়ে দে সোনা আমার! আমি তোকে সত্যিই ভালবাসি রে ল্যাডি! আরও বেশি করে কষ্ট দে আমায়! আরও জোরে সুখ দে!'

৯

'আড়াইটে বাজে,' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আপনমনে বলল রিণা, 'এবার না উঠলেই নয়।'

'পেটপুরে এমন তোফা লাঞ্চ সাঁটিয়ে এখনই পালাবে?' বাধা দেবার ভঙ্গিতে হাত বাড়ালেন মাঝবয়সী জ্যাকুইস, 'এভাবে পালাতে নেই সোনা, তাতে লাঞ্চের অসম্মান হবে। আরে বাপু, বাড়ি ত যাবে ঠিকই, তবে তার আগে কম করে একটা 'লিকার' অন্তত খাও।'

'কিন্তু—আমি—' কথা শেষ না করে মুখ টিপে হাসল রিণা।

'এক বছরের ওপর আছো প্যারিসে,' হাসলেন জ্যাকুইস, 'অথচ পেটপুরে খেয়েই কেটে পড়া যে এখানকার রীতি নয় এই সহজ ব্যাপারটা এতদিনেও তোমার রপ্ত হলনা। যত তাড়াই থাক, হাতে যত জরুরি কাজই থাক খেয়েদেয়ে খানিকক্ষণ বসতে হয়। হাতে জরুরি কাজ থাকলে শিকেয় তুলে রাখো।' কথা শেষ করে শিষ দিয়ে একজন ওয়েটারকে ডাকলেন তিনি।

ওয়েটারটি চেনা, এগিয়ে এসে অল্প হেঁট হয়ে বলল, 'বলুন, মঁসিয়ে?' ততক্ষনে রিণা আগের মত সোফায় গা এলিয়ে বসেছে, জ্যাকুইসের ইশারার জবাবে বলল, 'একটা পেরনদ, বরফ দিয়ে।'

'মাদমোয়াজেল-এর জন্য বরফ দিয়ে একটা পেরনদ, আর আমার জন্যও তাই,' বললেন জ্যাকুইস।

ওয়েটার সরে পরতে রিণার দিকে তাকিয়ে হাসলেন জ্যাকুইস, 'তারপর? তোমার পেইন্টিং কেমন চলছে বলো, কতদূর এগোলে?'

'সে ত আপনি নিজেই ভাল জানেন,' জবাব দিল রিণা, 'কতদূর এগিয়েছি জানিনা তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি ভবিষ্যতে আর যাই হই পেইন্টার কখনও হতে পারবনা।'

'না-ই বা হলে পেইন্টার,' হাসলেন জ্যাকুইস, 'তাহলেও দিব্যি ফূর্তি আর মজায় দিন কাটছে তা ত মানবে?'

হ্যাঁ না কিছু না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রিণা। মে মাস সরে পড়েছে, প্যারিসের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বসন্তের চাপা মিঠে সুবাস। একটানা শীতের শেষে দূরপাল্লার ট্রাক চালকদের গায়ে আবার উঠেছে নীল উর্দি, হোটেল আর কলকারখানায় যেসব মেয়ে কাজ করে কালো নয়ত ধূসর পাঁশুটে রং-এর পুরু গরম কোট তারাও খুলে ফেলছে।

'কিছু বলছ না যে,' বললেন জ্যাকুইস, আর ঠিক তখনই ওয়েটার পানীয় ভর্তি দুটো গ্লাস ট্রে-তে চাপিয়ে এনে রাখল টেবলে।

'নিজেই ত বলছেন দিব্যি ফূর্তি আর মজার মধ্যে আমার দিন কাটছে,' গ্লাস তুলে আলতো চুমুক দিল রিণা, 'এরপরপ বলার মত আর কিছু থাকতে পারে? আপনার ভাষাতেই বলছি আমায় এখন মজা করে বরফ দেয়া পেরনদে চুমুক দিতে দিন।'

'সত্যি বলছ তোমার বলার মত কিছু নেই?' জ্যাকুইস-এর গলায় হতাশা ফুটল।

'নিশ্চয়ই,' বলে ফিক্ করে হাসল রিণা।

'আর সেই মহিলাটি, মানে তোমার মেয়ে বন্ধু পেগি?' একবার চুমুক দিয়ে গ্লাস নামালেন জ্যাকুইস, 'তেনার খবর কি, আছেন কেমন?'

'পেগি খুব ভাল আছেন,' বলেই রিণার মনে এল কথাটা যেন আপনিই বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। একদৃষ্টে জ্যাকুইসকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমার প্রতি ওঁর দয়ার অন্ত নেই। সত্যিই, পেগি সঙ্গে না থাকলে আমার অবস্থা কি হত জানিনা।'

'অবস্থা খারাপ হত ভাবলে কি করে?' বললেন জ্যাকুইস, 'ওঁকে সঙ্গে না নিয়ে একটি পা কখনও এগোনোর চেষ্টা করোনি। অথচ চেষ্টা করলে তুমি অনেক কিছুই হতে পারতে। তোমার বয়স কম, তারওপর রূপেরও অন্ত নেই। ইচ্ছে করলে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে পারতে, ছেলেপুলের মা হতে পারতে, এমন কি—'

'আপনার রক্ষিতাও হতে পারতাম, তাই না?' জ্যাকুইসের কথার মাঝখানে হাসতে হাসতে বলল রিণা।

'ঠিক তাই!' হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন জ্যাকুইস, 'আমার রক্ষিতাও হতে পারতে, সত্যিসত্যি তাহলে কারও কিছু যেত আসতনা, তার চেয়েও যাচ্ছেতাই ঘটতে পারত। তবু আমার শর্তের কথা মনে রেখো।'

'আপনি সত্যিই খুব ভাল লোক, জ্যাকুইস,' মাঝবয়সী ফরাসী পুরুষটির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল রিণা, 'অসীম করুণা আপনার।' এক বিকেলের কথা তার মনে পড়ে গেল— সবে কয়েকমাস হল তারা পৌঁছে এদেশে এর মাঝে মাথা গোঁজার একটা ভদ্র আস্তানাও জোগাড় হয়েছে, পেগির সঙ্গে বছরখানেক প্যারিসে থাকায় অনুমতি চিঠির মাধ্যমে বাবার কাছ থেকে রিণা পেয়েছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অধ্যাপকের অধীনে গবেষণা করছেন পেগি তাঁর দেওয়া এক পার্টিতে সেদিন বিকেলে পেগি নিয়ে এলেন রিণাকে। ফরাসি ভাষাটা তখনও তেমন রপ্ত হয়নি তার ওপর অভ্যাগতরা এমন হাবভাব করছেন যেন তাকে দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না। ভাষা রপ্ত হয়নি তাই কারও সঙ্গে আলাপ করতে পারছেনা। অভ্যাগতরা অনেকেই তাকে দেখেছেন কিন্তু এমন হাবভাব করে পাশ কাটাচ্ছেন যেন দেখতে পাননি। অস্বস্তি কাটাতে এককোণে দাঁড়িয়ে আপনমনে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে রিণা এমন সময় নিখুঁত ফরাসিতে পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল 'তোমায় বলছি গো মেয়ে, তুমি আমেরিকা থেকে এসেছো?'

চমকে মুখ ফেরাতে এক মাঝবয়সী পুরুষের মুখোমুখি হল রিণা—ধপধপে ফর্সা চামড়া রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে, পাতলা ছিপছিপে গড়ন, মাথাভর্তি কুচকুচে কালো চুলের এখানে ওখানে দু'একটা সরু রুপোলি তারের আভা, অল্প পাক ধরেছে দু'দিকের রগে। জ্যাকুইস দেস্যাম্পের সঙ্গে সেই তার প্রথম পরিচয়। রিণা ফরাসি জানেনা আঁচ করে

হেসে ফেললেন জ্যাকুইস, 'আমি ইংরাজি জানি।' শুনে হাসল রিণা, তার সঙ্গে করমর্দন করে জ্যাকুইস বললেন, 'দূর থেকে দেখলাম একটা ফুটফুটে সুন্দর মেয়ের সঙ্গে কেউ কথা বলছে না, বেচারি একা এককোণে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন ঘাঁটছে। তাই ছুটে এলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করতে। এসে দেখছি এই পার্টিতে তোমায় যে নিয়ে এসেছে সে একটা আস্ত গর্দভ বই কিছু নয়।'

'উনি আর বন্ধু,' ইশারায় পেগিকে দেখাল রিণা, 'উনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন। আমি ওঁর সঙ্গেই এসেছি।' পেগির পরণে পুরুষালি তিন পিস ডিনার সুট, প্যারিসের সেরা দর্জির দোকানে তৈরি। সুট তৈরির খরচ যে রিণার বাবাকেই বহন করতে হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা, রিণাকে ইওরোপ ঘুরিয়ে দেখানোর বিনিময়ে এইভাবে নিজের অনেক সাধ আহ্লাদ মেটানোর নামে ফুটানি করে বেড়াচ্ছেন পেগি।

'ও, ওঁর কথা বলছ?' পেগির দিকে বিতৃষ্ণার চোখে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন জ্যাকুইস। পেগি তখন অভ্যাগতদের একজনের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলতে ব্যস্ত, রিণার দিকে তাকানোর সময় এইমুহূর্তে তাঁর নেই।

'আর আপনি? আপনি কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?' ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে দুঃসাহসীর মত প্রশ্নটা জ্যাকুইসকে করে বসল রিণা।

'কাউকে না,' তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল জ্যাকুইসের ঠোঁটে, 'সত্যি বলতে কি, দূর থেকে তোমায় দেখেই আলাপ করার ইচ্ছে হল, তাই ত তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে ছুটে এলাম।' ঠিক তখনই তাঁর ডানহাতের অনামিকায় হিরের আংটি চোখে পড়তে রিণা আঁচ করল ওটা বিয়ের আংটি, সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'কিন্তু আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হলে আপনার স্ত্রী মাদমোয়াজেল দেশ্যাম্প কি বলবেন?'

'আমার স্ত্রীর কথা বলছ?' মুচকি হেসে বললেন, 'সে ভদ্রমহিলা খুব বুদ্ধিমতী। ক'দিন হল এক অতিথি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তার দেহে, তলপেট ফুলে ঢোল। তাই তোমার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ মেলামেশায় উনি কিছু মনে করবেন না।' জ্যাকুইসের কথা শুনে রিণা বুঝল তাঁর স্ত্রীর পেটে বাচ্চা এসেছে। তাঁকে কাছে পাচ্ছেন না বলেই মঁশিয়ে দেশ্যাম্প তার সঙ্গ পেতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন বুঝতে রিণার বাকি রইল না।

তাহলে জ্যাকুইস যেচে তার সঙ্গে আলাপ করে তার নিঃসঙ্গতা কাটিয়েছেন শুধু একথা মনে রেখেই রিণা তাঁর রসিকতা উপভোগ করতে লাগল। পেগি দূর থেকে সব দেখছেন, খানিক বাদে এগিয়ে এসে পেছন থেকে তার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললেন, 'বাঃ, মজা লুটতে তুমিও দেখছি কম যাওনা, সোনা! লুটে নাও!'

ক'দিন বাদের ঘটনা, পেগি ব্রেকফাস্ট সেরে বিশ্ববিদ্যালয় চলে যাবার অনেকক্ষন পরে রিণাকে টেলিফোনে লাঞ্চের নেমন্তন্ন করলেন জ্যাকুইস দেশ্যাম্প। টেলিফোন পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রিণা। সেজেগুজে তখনই বেরিয়ে পড়ল সে। লাঞ্চ খেল জ্যাকুইসের সঙ্গে। এরপরে আরও কয়েকবার জ্যাকুইসের সঙ্গে লাঞ্চ খেল রিণা।

তার কিছুদিন বাদে আবারও এক রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি বসে লাঞ্চ খেল দু'জনে, আজকের মত সেদিনও ছিল বিকেলের পড়ন্ত বেলা, দুগ্লাস বরফ দেয়া পেরনদ সামনে রেখে হাল্কা আলোচনায় মত্ত দু'জনে। এক সময় আচমকা জ্যাকুইস বললেন, 'একটা কথার জবাব দাও ত, লক্ষ করছি তুমি পুরুষদের ভয় পাও। কেন?'

বাবার বয়সী লোকটির মুখে আচমকা এই প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল রিণা। বিষাক্ত সাপের ফণা তোলার মত কামনার চাপা আগুন বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে যেন আচমকা জ্বলে উঠল গলার ভেতরে, নিমেষের মধ্যে সেই আগুনের উত্তাপ চোখে মুখে স্পষ্ট অনুভব করল সে, কিন্তু সে ভাব চেপে রাখল রিণা, হালকা গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন, ব্যাপার কি মশাই?'

'তোমাদের মত আমাদের মানে পুরুষদেরও একেকসময় কিছু কিছু অনুভূতি হয়,' জবাব দিলেন জ্যাকুইস, 'অনুভূতি হল বলেই প্রশ্নটা করলাম।'

উত্তর না দিয়ে চোখ নামিয়ে গ্লাসের পানীয়ের দিকে তাকিয়ে রইল রিণা।

'তোমার মেয়েবন্ধুর কথা বলবে কিনা ভাবছো?' হাসলেন জ্যাকুইস, 'আমার প্রশ্নের জবাবে উনি নন।'

'আপনার প্রশ্নের মাঝখানে পেগি আসছেন না,' মুখ তুলে বলল রিণা, 'তাই ওঁকে এর মধ্যে না আনলেই খুশি হব। উনি আমার বন্ধু, তার বেশি কিছু নন।'

'জানো ত, এটা ফ্রান্স,' রিণার চোখে চোখ রেখে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন জ্যাকুইস, 'সাধারণ চোখে যা অন্যায় অনৈতিক ঠেকে এদেশে তার ধরাবাঁধা মাপকাঠি নেই বললেই চলে। নেই বলেই খুলে না বললেও আমরা ফরাসিরা অনেক কিছু টের পাই, আঁচ করি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তোমাকে এতদিনেও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। ন্যায় অন্যায়ের তোয়াক্কা না করে যারা চলে তুমি সে জাতের মেয়ে নও এটুকু শুধু বুঝছি, তার বেশি নয়।'

'তাহলে আর কি,' ভেতরের জ্বলুনি চাপা দিতে হালকা গলায় বলল রিণা, 'আমায় উদ্ধার করলেন। তাতে আমায় নিয়ে এভাবে মাথা না ঘামালেই খুশি হব।'

'বিশ্বাস করো,' বললেন জ্যাকুইস, 'এভাবে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করছ কেন তা কিছুতেই আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

'নয়ত কি করব? মেয়েদের প্রতি সহানুভূতি বা দরদ কোনোটাই নেই এমন এক বোধবুদ্ধিহীন গাড়লের গা গরম করতে তার পাশে শোব, তাই না?' রেগেমেগে বলল রিণা, 'আপনি তাই চান?'

'মোটেও না,' অস্বীকার করার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন জ্যাকুইস, 'ঐরকম কোনও জানোয়ারের সঙ্গে তোমায় রাত কাটাতে আমি বলবনা। তার চেয়ে তুমি আমার পাশে শোও না কেন?'

'ঐরকম জানোয়ারের চাইতে আপনি আলাদা এমন ধারণা আপনার মনে এল কি করে?'

'কারণ আমি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ,' রিণার চোখে চোখ রাখলেন জ্যাকুইস দেশ্যাম্প, 'কমবয়সী ছোকরা নই। পূর্ণবয়স্ক বলেই জীবনের অনেককিছুর মত মেয়েমানুষের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আমার ঢের বেশি। বিছানায় তোমাকে পরিতৃপ্ত করাই হবে আমার লক্ষ্য, সেই চেষ্টাই রাতভর করব আমি, কমবয়েসী ছোকরাগুলো দেখতে দু'পেয়ে, আসলে ওরা সবাই চারপেয়ে ষাঁড়েরও অধম, নিজেদের সুখ আর তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামায়না। বোধবুদ্ধিহীন গাড়ল বলতে তুমি যে ওদের দিকে ইঙ্গিত করেছ তা আমার বুঝতে বাকি নেই, এদিক থেকে তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু মেয়েমানুষ বলে সহবাসে সুখ আর পরিতৃপ্তির খেলাটা শুধু তোমরা একাই খেলতে জানো তা যেন মোটেও ভেবোনা। বহু পুরুষ চারপাশে আছে যারা মেয়েদের সুখানুভূতি সম্পর্কে। যথেষ্ট সচেতন।'

'যেমন আপনি?' হালকা গলায় বলল রিণা।

'ঠিক বলেছো। যেমন আমি। তা আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? ছবি আঁকা তোমার কতদূর এগোল সেই খোঁজ নিতেই আমি বারবার তোমার কাছে আসি তাই ভেবেছো বুঝি? তা যদি ভেবে থাকো ত বলব আমায় চিনতে ভুল করেছো।'

'আপনি সৎ, ভেতরে বাইরে একইরকম, আপনার সম্পর্কে এর বেশি কিছু আমি জানিনা,' বলে আচমকা হেসে ফেলল রিণা।

'আমি সত্যে বিশ্বাসী, রিণা।'

ক'মাস বাদে এক বৃষ্টিভেজা দুপুরে রিণা এল জ্যাকুইসের অ্যাপার্টমেন্টে। সহবাস প্রসঙ্গে পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে এর আগে ভদ্রলোক যা বলেছিলেন রিণা দেখল বাস্তবে তিনি তা হাতেকলমে প্রমাণ করলেন—কথাবার্তার মতন শান্ত ও সংযত তাঁর মিলনভঙ্গিমা যার দরুন এতটুকু ব্যথাবেদনা সে অনুভব করল না। পাশাপাশি সত্তার গভীরে নিহিত এক দৃঢ় শক্তিও অনুভব করল, শক্তি তাঁর অনুভূতিকে পৌঁছে দিল চরমানন্দের শিখরে। দৈহিক মিলনের সেই চরমবিন্দুতে পৌঁছে জ্যাকুইস যেন লীন হয়ে গেলেন সেখানকার সুখানুভূতিতে, সেই অনুভূতিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে তাঁর শক্তির সঙ্গে নিজের প্রকৃতিকে একাত্ম করল রিণা।

সময়ের হিসাব রাখেনি রিণা, অনেকক্ষণ পরে বিযুক্ত হল দু'টি দেহ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ট্রাউজার্স এঁটে শার্টের বোতাম আঁটছেন জ্যাকুইস এমনসময় রিণা তাঁর নাম ধরে ডাকল, 'জ্যাকুইস।'

'কি হল, সোনা,' ঘুরে দাঁড়ালেন জ্যাকুইস, 'কিছু বলবে?'

'এদিকে আসুন, জ্যাকুইস,' আবেগমথিত রিণা দু'হাত বাড়িয়ে দিল, 'আরও কাছে আসুন।'

রিণার বাড়ানো দু'হাতের ফাঁদে নিজেকে ধরা দিলেন জ্যাকুইস, খাটের গা ঘেঁষে নত হয়ে প্রগাঢ় চুম্বনের রেখা আঁকলেন তার নগ্ন দু'টি স্তনে। কিছুক্ষণ গভীর আবেশে স্তনে মুখ গুঁজে রইলেন, তারপরে মুখ তুলে বললেন, 'মিলনমুহূর্তে তোমার স্তনবৃন্ত দু'টি লাগছিল যেন পুরুষ্টু কিসমিস, এখন দেখাচ্ছে যেন আফিমের ফুল

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন, জ্যাকুইস,' গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল রিণা, 'আমি পরিতৃপ্ত।'

'শুনে ভাল লাগছে।'

জ্যাকুইসের পুরুষালি হাত দু'খানা চেপে ধরল রিণা, চোখ নামাতেই অনামিকার আঁটা সোনার আংটিখানা চোখে পড়ল—বিয়ের আংটি। 'এখন মনে হচ্ছে আপনার রক্ষিতা হতে পারলেই আমি সুখী হব।'

'জানতাম তুমি একথা বলবে,' জ্যাকুইস হাসিমুখে বললেন, 'আর তাইত এই অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছি। তুমি আজ রাতেই এখানে চলে এসো।'

'এখানে চলে আসব?' তাঁর কথা শুনে অবাক হল রিণা।

'হ্যাঁ,' ঘাড় নাড়লেন তিনি, 'তবে এটা তোমার পছন্দ না হলে অন্য কোনও অ্যাপার্টমেন্ট নেব।'

'কিন্তু আমার পক্ষে এখানে এসে ওঠা ত সম্ভব নয়।' বলল রিণা, 'পেগির কি হবে? উনি কি ভাববেন?'

'এর মধ্যে আবার উনি আসছেন কোথা থেকে?' তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন জ্যাকুইস, 'ওঁর ব্যাপার ত আগেই চুকেবুকে গেছে।'

'তার চেয়ে আমরা এইভাবেই মিলিত হতে পারিনা? যখন চাইবেন তখনই চলে আসব আমি।'

'তার মানে তুমি পাকাপাকিভাবে এখানে এসে থাকতে চাইছো না কেমন?'

'আপনি চাইলেও তা সম্ভব নয়, জ্যাকুইস,' প্রবলভাবে ঘাড় নাড়ল রিণা, 'পেগির কি হবে, ওঁর কথা কে ভাববে? যে অ্যাপার্টমেন্টে আমরা উঠেছি সেটা ঠিকঠাক রাখতে গেলে আমার সাহায্য দরকার। তাছাড়া এসব ব্যাপার জানতে পারলে বাবা আমায় মেরেই ফেলবেন।'

'কিন্তু ঐ সমকামী মহিলার সঙ্গে তোমার একসঙ্গে থাকা নিয়ে তোমার বাবার দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না।'

'আপনি আমার বাবাকে জানেন না বলেই এসব বলছেন। আপনার সঙ্গে আমার এই মেলামেশা, বোস্টনের লোকেরা এসব ভাবতেই পারেনা।'

'পেগিকে তোমার বাবা কি চোখে দেখেন?'

'এতদিন যে চোখে দেখে এসেছেন,' জবাব দিল রিণা, 'পেগিকে বাবা বরাবর আমার শিক্ষিকা আর সঙ্গি হিসেবে দেখেছেন।'

'শিক্ষিকা!' চাপা শব্দ করে হাসলেন জ্যাকুইস, 'চমৎকার বললে কথাটা।'

'ওঃ, জ্যাকুইস,' আহত গলায় বলল রিণা, 'এভাবে মন্তব্য করে এই আনন্দের মুহূর্ত নষ্ট করবেন না। আমরা যদি মাসেমাসে আজকের মত মিলিত হই ত তাতে বাধা কোথায়?'

'তাহলে তুমি এখানে পাকাপাকিভাবে এসে উঠছোনা?' রিণার দিকে তাকিয়ে একই প্রশ্ন করলেন জ্যাকুইস।

'আমি তা পারবনা,' জবাব দিল রিণা, 'আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

একটি কথাও না বলে সরে এলেন জ্যাকুইস, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শার্টের বোতাম এঁটে গলায় টাই বাঁধলেন।

'এখানে এসে ওঠা, আর মাঝেমাঝে মিলিত হওয়া, এ দুটোর মাঝে কোনও তফাৎ ত আমার চোখে পড়ছেনা,' বলল রিণা, 'যাই বলুন না কেন, আপনি বিবাহিত, বাড়িতে আপনার বৌ আছেন। আমি এখানে এসে থাকলে কতটা সময় রোজ আমার সঙ্গে কাটাতে পারবেন?'

'সেটা অন্য ব্যাপার,' রিণাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে জবাব দিলেন জ্যাকুইস।

'অন্য ব্যাপার মানে কি বলতে চান?' রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠল রিণা, 'আমার বেলায় যেটা একই ব্যাপার সেটা আপনার বেলায় অন্য ব্যাপার হয় কি করে?'

'একজন পুরুষ তার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত নাও থাকতে পারে যেহেতু ইচ্ছে করলে তার স্ত্রীও তার স্বামীর প্রতি একই রকম আচরণ করতে পারে। কিন্তু একজন পুরুষ তার রক্ষিতার প্রতি সবসময়েই বিশ্বস্ত থাকে। তেমনই যে কোনও রক্ষিতাও তার প্রণয়ীর প্রতি সবসময় বিশ্বস্ত থাকে।'

'কিন্তু পেগি ত আর পুরুষ নন?'

'না, তা নন,' হিংস্র শোনাল জ্যাকুইসের গলা, 'উনি পুরুষের চেয়েও অধম, জঘন্য জীব।'

'এসবই কি আপনার শর্ত?' মাথা তুলে একমুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল রিণা।

জ্যাকুইস মুখ ফেরালেন তার দিকে, দেখলেন দৃপ্ত গর্বিত ভঙ্গিতে টানটান হয়ে বসে আছে রিণা, নিবিড় বুকের শোভা বাড়িয়েছে নিরাবরণ দুটি স্তন। নিঃশ্বাসের ওঠাপড়ার তালে তালে ওঠানামা করছে চামড়ার ঢাকা পাঁজরার হাড়, এতটা তফাতে দাঁড়িয়েও তা ধরা পড়ছে তার চোখে।

আহা, কি রূপ, রিণার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনমনে বললেন জ্যাকুইস, এমন রূপের ডালি এর আগে একটাও চোখে পড়েনি।

'তুমি যদি ঐভাবে নাও,' বললেন জ্যাকুইস, 'তাহলে বলব এ সবই আমার শর্ত।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' রিণা বলল, 'থাক গে, আমার জামাকাপড় দিন।'

সেদিনের পরে কেটে গেছে অনেকগুলো মাস, তারপরে আজও বন্ধুত্ব বজায় আছে দু'জনের মাঝে। পেরনদের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল রিণা, 'এবার আমায় উঠতেই হবে। পাভানকে কথা দিয়েছি কাঁটায় কাঁটায় তিনটেয় ওঁর স্টুডিওতে যাব।'

'পাভান?' অবাক হলেন জ্যাকুইস, 'তুমি তাহলে পেন্টিং ছেড়ে মূর্তিগড়া শিখবে ঠিক করলে?'

'না,' ঘাড় নাড়ল রিণা,' আমি ওঁর মূর্তি গড়ার সময় মডেলিং করছি।'

পাভান কিভাবে কাজ করেন জ্যাকুইস জানেন, একটি মূর্তি গড়তে একাধিক মডেলের সাহায্য নেন তিনি। সবসময় আদর্শ শিল্পসৃষ্টি করতে চান ফলে কখনও সফল হন না।

'না, ওসব নয়,' জ্যাকুইস তার স্তনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বুঝতে পেরে অস্বস্তিতে ঘাড় নাড়ল রিণা, 'আপনি যা ভাবছেন তা নয়।'

'নয়?' অবাক হলেন জ্যাকুইস, 'কেন নয় কেন?'

'পাভান বলেন এ দুটো বড্ড বেশি বড়।'

'ওঁর মাথার ঠিক নেই তাই বলেন,' চটপট জবাব দিলেন জ্যাকুইস, 'শুধু উনি কেন, সব শিল্পীরই এক অবস্থা, মাথার ঠিক ওঁদের কারও নেই, সবাই পাগল, তা তোমার স্তন না হয় ওঁর চোখে বড্ড বেশি বড়, বেমানান। কিন্তু তোমার কোন অঙ্গটি দেখে মজেছেন পাভান?'

'আমার গোপনাঙ্গ,' বলে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল রিণা।

রিনার কথার জবাব শুনে থ হয়ে গেলেন জ্যাকুইস, সঙ্গে সঙ্গে রিণা হো হো করে হেসে উঠল।

'কিন্তু ওটা ভাল লাগার কারণটা কি?' বললেন জ্যাকুইস।

'কারণ মেয়েদের গোপনাঙ্গ পাভানের মতে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়।' হাসতে হাসতে বলল রিণা।

'এভারেস্টের তুলনায় এই পাহাড়ে চাপতে গিয়ে অনেক বেশি মানুষ মরে।' ঘাড় হেঁট করে গলা নামিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি যে ঐ পাহাড়ে চেপেও দিব্যি বেঁচেবর্তে আছেন তা এখনও জানেননা পাভান। কেমন, জ্যাকুইস, পাভানকে জানাব কথাটা?' বলে

তাঁর গালে আলতো চুমু খেয়ে রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এল রিণা, ভিড়ের মধ্যে যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল ততক্ষণ জ্যাকুইস পেছন থেকে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে ওয়েটারকে ডেকে বললেন, 'ওহে, আমায় আরেকটা পেরনদ দাও তো!'

১০

পাভানের স্টুডিওতে না গিয়ে রাতে ডিনারের জন্য রান্না করা একটা গোটা চিকেন কিনে রিণা নিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্টে। পেগি তখনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরেননি, এই অবসরে রিণা ডিনার তৈরি করে ফেলল। কুসুম কুসুম গরম জলে গা ধোবে কিনা ভাবছে ঠিক তখনই সদর দরজায় কলিং বেল বাজল। দরজা খুলতেই পেগি ঢুকলেন ভেতরে।

'আজ এত আগে ফিরে এলেন যে বড়?' স্বাভাবিক গলায় বলল রিণা। জবাব না দিয়ে হিমশীতল চোখে পেগি তাকালেন তার দিকে। সেই চাউনি শানানো ছুরির ইস্পাতের ঠাণ্ডা ফলার মত গেঁথে গেল তার দেহে। 'একটুকরো চিজ্ আর খানিকটা ওয়াইন টেবিলে রাখা আছে,' পেগি ভেতরে ভেতরে তার ওপর চটেছেন টের পেয়ে বলল রিণা, 'ইচ্ছে করলে ডিনারের আগে ওটুকু খেয়ে নিতে পারেন।'

সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ালেন পেগি, বিষঢালা হিংস্র গলায় বললেন, 'জ্যাকুইস দেশ্যাম্পের ধারে কাছে ঘেঁষতে আমি-না তোমায় মানা করেছিলাম!'

চোখ তুলে পেগির মুখের দিকে তাকাল রিণা। তাহলে এই হল আসল ব্যাপার, এইজন্যই ঘরে ঢোকার পর থেকে পেগি আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেননি, হাঁড়িপানা মুখ করে আছেন, মনে মনে বলল রিণা। আমায় চেনে এমন কেউ নিশ্চয়ই জ্যাকুইসের সঙ্গে আমায় রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করতে দেখেছে, তারপরে পরম উপকারী সুহৃদের মত খবরটা পৌঁছে দিয়েছে পেগির কানে। জ্যাকুইস ওঁকে পাত্তা দেন না, ঘেন্না করেন তা জানেন পেগি, আর তাই আমার আকর্ষণে জ্যাকুইস বাঁধা পড়েছেন টের পাবার পর থেকে হিংসের আগুনে উনি জ্বলে পুড়ে মরছেন। সুপুরুষ যুবা দূরে থাক আজ পর্যন্ত কোনও কমবয়সী ছেলেছোকরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেননি পেগি, সত্যি বলতে কি, তিনি তাদের প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করেননা। কিন্তু জ্যাকুইসের কথা আলাদা— পাতলা ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা একটুকরো হাসি চোখে কামনাতুর ঠেকলেও প্রখর আত্মবিশ্বাসের অভাব তাতে নেই। মানুষের মনের অতলে যারা ডুবুরির মত মণিরত্ন খুঁজে বেড়ান সেইসব রসিক নরনারীর চোখে জ্যাকুইস দেশ্যাম্পের এ-হাসি একেকসময় দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় ঠেকে। জ্যাকুইসের সঙ্গ পেগির কাছে ঈশ্বরলাভের মত তা জানে রিণা। এও জানে সেই মাঝবয়সী রসিকপুরুষের কাঁচাপাকা চুলে ভরা উজ্জ্বল মুখ মনে পড়লে নিজেকে স্থির রাখতে পারেননা পেগি।

'হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে যেতে উনি আমায় লাঞ্চ খাওয়াতে চাইলেন—' পেগির হিংসুটেপনা নয়, আসলে আমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়না বলেই কথাটা বলল রিণা, 'পথের মাঝখানে ওঁর কথায় রাজি না হলে অভদ্রতা করা হত। আমি তা করতে চাইনি বলেই ওঁর লাঞ্চের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি।'

'সে না হয় বুঝলাম,' পেগি বললেন, 'কিন্তু লাঞ্চের পরে গোটা বিকেলটা তুমি কোথায় ছিলে? বাড়িতে ছিলেনা, আঁকার স্কুলেও যাওনি। দু'জায়গাতেই বারবার টেলিফোনে খোঁজ

নিয়েছি আমি। বিদেশ বিভুঁই-এ এসে তোমার কি হল সেই ভাবনায় আমার নিজের মাথা খারাপ হবার জোগাড়!'

'আঁকাবুকি করতে মন চাইছিলনা তাই আজ স্কুলে যাইনি,' বলল রিণা।

চোখ কুঁচকে পেগি সরাসরি তাকালেন তার দিকে, বিদ্রূপ মেশানো গলায় বললেন, 'জ্যাকুইসের অ্যাপার্টমেন্টে , নাকি জ্যাকুইসের টানে ওঁর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে টুঁ মেরেছিলে? গেলে বলেই ফ্যালো, লজ্জায় মুখ বুঁজে থেকোনা।'

'না, আপনি আমায় ভুল বুঝছেন।' স্বাভাবিক গলায় বলল রিণা, 'আমি মোটেও সেখানে যাইনি।'

'সত্যি বলছ কিনা তা তুমিই জানো,' পেগি বললেন, 'আজ বিকেল চারটে নাগাদ এক সুন্দরী সদ্যযুবতীর হাত ধরে জ্যাকুইসকে ওঁর অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে অনেকেই দেখেছে, মেয়েটির চুল তোমারই মত লালচে সোনালী।'

'প্যারিসে কি আমিই একমাত্র সদ্যযুবতী যার চুলের রং লালচে সোনালী?' পেগিকে পাল্টা প্রশ্ন করল রিণা।

'আমি জ্যাকুইসকেও ওঁর অ্যাপার্টমেন্টে বহুবার টেলিফোন করলাম,' পেগি বললেন, 'কিন্তু উনি বা ওঁর বাড়ির লোকেরা কেউ রিসিভার তুললেন না!'

'ওঁর বিরুদ্ধে বলার মত কিছু আমার ঘটেনি,' মুখ টিপে হাসল রিণা, 'আপনার ঘটেছে নাকি?'

'তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলছ!' গলা অল্প চড়ালেন পেগি, 'তোমার একটি কথাও সত্যি না!' কথা শেষ করেই টেনে এক চড় মারলেন রিণার গালে। পেগি হিংসেয় জ্বলে মরলেও তাঁর এই আচরণ রিণার কাছে সম্পূর্ণ অভাবিত। হাত দিয়ে গাল চেপে ধরে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রিণার অন্য গালে সজোরে আবার চড় মারলেন পেগি, দু'হাতে তার দু'কাঁধ চেপে ধরে ঝাকুনি দিতে দিতে বললেন, 'বল্, সত্যি করে বল্ সারা বিকেল কোথায় ছিলি?'

রিণার সহ্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে, 'সত্যি যা বলার গোড়াতেই বলেছি।' জোরগলায় কথাটা বলেই ঠাস্ ঠাস্ করে পাল্টা কয়েকটা চড় মারল রিণা তাঁর দু'গালে। রিণার হাতে মার খেয়ে থমকে গেলেন পেগি, অবাক চোখে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তিনি তার দিকে। ততক্ষণে নিজেকেঅনেকটা সামলে নিয়েছেন পেগি, কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, 'আমি কত দুঃখী তা ত তোমার অজানা নয়, রিণা, সবটুকু ভালবাসা নিজেকে উজার করে তোমায় ঢেলে দিয়েছি তাও তুমি জানো। সব জেনেও কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছ তুমি, কেন এত দুঃখ দিচ্ছ আমায়?'

তার পেট থেকে আসল কথা বের করার উদ্দেশ্যেই পেগি এসব মনভোলানো কথা বলছেন জানে রিণা, তাহলেও সেইমুহূর্তে প্রেম ভালবাসা, সববাস এসব তুচ্ছ ঠেকল তার কাছে, মনে হল একটু সুখের জন্য এসবের পেছনে ছোটা অর্থহীন পাগলামো। একই সঙ্গে প্রথমে পেগি, তারপরে নিজের প্রতি করুণা অনুভব করল সে। তার মনোভাব আঁচ করে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন পেগি, আচমকা হাঁটু গেড়ে বসে অসহায়ের মত দু'হাতে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তার দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ গুঁজে বললেন, 'রিণা। সোনা আমার। দোহাই, অমন চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়োনা! বিশ্বাস

করো, তোমার চোখের ঐ চাউনি দেখে আমার বুকের ভেতরটা বারবার কেঁপে উঠছে থরথর করে। আমার ওপর আর রাগ করে থেকোনা সোনা, মাথা ঠাণ্ডা করো। শান্ত হও! হিংসেয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো! বিশ্বাস করো! আমি আর কখনও তোমায় হিংসে করবনা।'

পেগির চড় খেয়ে রিণার মুখ তখন টনটন করছে, ক্লান্তি জড়ানো গলায় কোন মতে বলল, 'ভবিষ্যতে কথাটা মনে রাখবেন দয়া করে, নিজের ভাল চাইলে আর কখনও আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করবেন না!'

'কথা দিচ্ছি করবনা!' হাঁফাতে হাঁফতে বললেন পেগি, 'আসলে ঐ লুচ্চা দেশ্যাম্প ওঁর নোংরা হাতে তোমায় ছুঁয়েছেন মনে হতে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল!'

'আবার ভুল করলেন! মঁশিয়ে দেশ্যাম্প লুচ্চা নন, মানুষ, পুরোপুরি সক্ষম পুরুষ মানুষ। খাঁটি পুরুষ বলতে যা বোঝায় উনি তাই। আর যাই হোক, উনি নকল পুরুষ সাজা কামুক মেয়েছেলে নন!'

'আমার দুঃখের সুযোগ নিয়ে এইভাবে অপমান করছ, সোনা?' জলভরা চোখ তুলে তাকালেন পেগি, ধরাগলায় বললেন, 'দুনিয়ায় সব পুরুষের কাছ থেকে তুমি যা পেতে তার অনেক বেশিই তো আমি দিয়েছি তোমায়! এত শীগগির সেকথা ভুলে গেলে তুমি?'

পেগির কান্নামেশানো সেই আক্ষেপ শুনে ভেতরে ভেতরে ধাক্কা খেল রিণা, এক অনভূত ভীতি আচমকা যেন সাপের মত ফণা মেলে দাঁড়াল মনের আঙিনায়।

'ঐ ত আপনার ভুল,' চোখ নামিয়ে পেগির উদ্দেশে বলল সে, 'প্রেম ভালবাসা দেহমিলন, এসব আমার হাতেকলমে দেখাতে আপনার আগ্রহের অন্ত নেই। কিন্তু হৃদয় নিংড়ে যে সত্যিকার ভালবাসা জন্মায় তা অনুভব করতে, সেই ভালবাসা অকাতরে বিলিয়ে দিতে আমায় শেখাননি কেন বলতে পারেন?' পেগি তার দু'হাঁটুর মাঝখানে নাক গুঁজে বসে। রিণা এবার অস্বস্তি বোধ করল, তাঁর মাথাটা আলতো করে ধরে ঠেলে সরিয়ে দিল। পরমুহূর্তে কি যে হল, রিণা নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলনা, মেঝেতে বসে পেগির বুকে মুখ গুঁজে ভেঙ্গে পড়ল বুকফাটা কান্নায়।

'কাঁদো সোনা, কাঁদো,' তার কানের কাছে ঠোঁট এনে ফিসফিসিয়ে বললেন পেগি, 'প্রেমিক আমার, কাঁদো যত পারো। চোখের জল ঝরিয়ে ভেতরের সব দুঃখ উগরে দাও। মনে রেখো আমি সবসময় তোমায় দেখব, সাধ্যমত নজর রাখব তোমার ভালমন্দের ওপর। আর সেখানেই ত ভালবাসা দায়বদ্ধ।'

বিখ্যাত ভাস্কর পাভান যে মূর্তিখানা গড়েছেন তাঁর মতে তা অতুলনীয়। সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে একটি পার্টির আয়োজন করেছেন তিনি। অমরু সিং এসে পৌঁছোল সন্ধে ছ'টায়।

অতিথিসেবক পাভানকে নম্রভাবে অভিবাদন জানাল, ভদ্রভাবে ড্রিংকস প্রত্যাখ্যান করে ফাঁকা ঘরে বসে পড়ল দেয়ালে ঠেস দিয়ে। অন্যান্য দিনও একই জায়গায় বসে অমরু।

বসার জন্য ঐ একটি জায়গা রোজ বেছে নেবার কারণ একটিই—ওখানে বসে ঘরের ভেতর কে কোথায় কি করছে সব স্পষ্ট দেখা যায় ঘাড় না ঘুরিয়ে, যদিও অমরু মুখ ফুটে সেকথা স্বীকার করেনা। অমরু নিয়মিত যোগাভ্যাস করে, ভাস্কর পাভানের ঘরের

নির্দিষ্ট এই জায়গাটিতে সবার সামনে পদ্মাসনে বসে নিজের অনুভূতিকে চেতনার উর্দ্ধে নিয়ে যায় অমরু।

চোখ বুঁজে ধ্যানের অতলে ডুব দিয়েছিল অমরু, চোখ মেলতেই দেখল ঘরের এককোণে বিশাল সোফার পেছনে দুই যুবক যুবতী সবার নজর এড়িয়ে সহবাসের আগের শৃঙ্গারের খেলায় মেতে উঠেছে।

এঘরে ঢোকার দরজার পাশে বেদির ওপর দাঁড় করানো কাপড়ে ঢাকা সেই মূর্তি যার আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে পার্টি দিয়েছেন পাভান। কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটাকে নিস্পন্দ শবদেহের মত দেখাচ্ছে। খানিক বাদে দরজা ঠেলে পেগি ঢুকলেন রিণাকে নিয়ে। আড়চোখে একবার তাঁদের দিকে তাকাল অমরু সিং।

খানিক বাদে পাভান এগিয়ে এলেন, বেশি মদ খাবার ফলে পা টলছে। বেদির পাশে দাঁড়িয়ে একখানা ভাষণ দিলেন, তারপরে মূর্তির আবরণ একটানে খুলে ফেললেন।

ঘরের ভেতর কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই, সবার চোখ ঠিকরে পড়েছে পাভানের অনুপম শিল্পসৃষ্টির দিকে—ফিকে গোলাপি আভাযুক্ত ইটালিয়ান মার্বেল কুঁদে গড়া এক পূর্ণাবয়ব যুবতীর মূর্তি, ঘরের উজ্জ্বল আলোয় মূর্তিটিতে যেন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যুবতী মুখ তুলে চেয়ে আছে তার দয়িত সূর্যের দিকে, দু'হাত মেলেছে আহ্বানের ভঙ্গিমায়।

অপূর্ব। অতুলনীয়। নিশ্চিদ্র নীরবতা ভেঙ্গে এবার বইল প্রশংসার বন্যা। প্রশংসা নেই শুধু একজনের মুখে—নানারকম শিল্পদ্রব্যের কারবারী লিওকাডিয়া। বেঁটেখাটো একমাথা পাকা চুল আধবুড়ো লোকটিকে দেখলে কেন কে জানে, সুদখোর মহাজন শাইলক চরিত্রের কথা মনে পড়ে।

'বলুন, মঁসিয়ে,' টলতে টলতে পাভান এসে দাঁড়ালেন তার সামনে, 'মূর্তিটা কেমন হয়েছে বলুন।'

'মূর্তি কেনাবেচার বাজার এখন মন্দা চলছে,' অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল লিওকাডিয়া।

'বাঃ!' বিদ্রূপের হাসি হাসলেন পাভান, 'কি প্রশ্ন করলাম আর কি জবাব দিলেন! ওহে, বাজারদর নয়, মূর্তিটা কেমন হয়েছে তাই তোমার কাছে জানতে চেয়েছি।'

'নতুন আর কি বলার আছে,' দায়সারাভাবে জবাব দিল লিওকাডিয়া, 'আপনার কাজ বরাবর যেমন হয় এও তেমনই হয়েছে।'

লিওকাডিয়ার দায়সারা জবাবে খুশি হলেন না পাভান, ঘুরে দাঁড়িয়ে মূর্তির দিকে হাত তুলে বললেন, 'ভালকরে একটিবার তাকান ওর বুকের দিকে, স্তনের কি বাহার ফুটেছে দু'চোখ মেলে দেখুন। ভাবতে পারেন মঁসিয়ে, স্তনের ঐ শোভা ফুটিয়ে তুলতে এক নয়, একাধিক মডেল নিয়ে আমায় কাজ করতে হয়েছে? শুধু কি স্তন? মুখখানা কি কম যায়? একেবারে নিখুঁত। তারপরে ভুরু, কপাল, নাক, চোয়াল, এসব দেখুন! আবার, নাকখানা কেমন সুন্দর গড়েছি একটিবার দেখুন, কে আছো হে ধারেকাছে! মঁসিয়ে লিওকাডিয়াকে একপাত্তর মদ দাও! তাই ত, আমিও ত তাই ভাবছি, মঁসিয়ে লিওকাডিয়া এমন চুপ মেরে গেছেন কেন? মূর্তির নাকে যে খুঁত আছে সেকথা তোমরা আগে কেন বলোনি আমায়? যত্তোসব!' বলেই পাভান টলতে টলতে এসে দাঁড়ালেন বেদির কাছে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তার ওপরে, তারপরে সরু বাটালি দিয়ে মূর্তির নাকের ডগা অল্প চেঁছে আরও টিকালো করে জামার আস্তিনে ঘষে পালিশ করে নেমে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়লেন।

'হয়নি! কিছুই হয়নি! অতি যাচ্ছেতাই আর জঘন্য দেখতে হয়েছে!' নিজের হাতে গড়া অতুলনীয় মূর্তিটিকে ইশারায় দেখিয়ে নেশাজড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন পাভান, 'আপনি এতক্ষণ আমায় বলেন নি কেন! মঁসিয়ে লিওকাডিয়া? কেন সবার সামনে আমায় এভাবে ছোট করলেন?'

লিওকাডিয়া এসব পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত, একটি কথাও না বলে চুপ করে রইল সে।

বেনে লিওকাডিয়ার মনোভাব আঁচ করতে না পেরে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কেঁদে ফেললেন ভেউ ভেউ করে। পরমুহূর্তে কি খেয়াল চাপল মাথায়, একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানলেন মূর্তির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির মাথা ভেঙ্গে খসে পড়ল বেদির নীচে। মাথা ভেঙ্গে পড়তে দেখে পাভান যেন খেপে গেলেন, হাতুড়ির ঘায়ে মূর্তির কাঁধ, হাত,. বুক, পেট, পা, সব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেললেন তিনি।

'আমি তোমায় আমার মন প্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম, উজার করে দিয়েছিলাম আমার সব ভালবাসা!' নিজের হাতে গড়া সেই অনুপম মূর্তির ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বসে কাঁদতে কাঁদতে চেঁচিয়ে উঠলেন পাভান, নেশাজড়ানো গলায় বললেন, 'আমি আমার ভালবাসা তোমায় বিলেয়ে ভিখিরি হলাম, আর তার বদলে তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে!' উপস্থিত অভ্যাগতরা খানিক আগেও যারা তাঁর গড়া মূর্তি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতেছিলেন, স্রষ্টার হাতে তা এইভাবে ধ্বংস হতে দেখে কি বলবেন ভেবে পেলেন না। পাভান যতবড় ভাস্কর হোন এইমুহূর্তে বেহেড মাতাল ছাড়া তাঁকে আর কিছু বলা যায় না ভেবে তাঁদের বেশিরভাগ আক্ষেপসূচক উঃ! আঃ! শব্দ করতে করতে কেটে পড়লেন। যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁরা কি করবেন ভেবে না পেয়ে পাভান আর তাঁর মূর্তির ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি এসে মজা দেখার মানসিকতা নিয়ে দাঁড়ালেন।

চোখের জল মুছে আচমকা উঠে গেলেন পাভান, মার্বেলের ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে একটা টুকরো তুলে নিলেন দু'হাতে। যেন দুর্লভ কোনও দ্রব্য খুঁজে পেয়েছেন এমনিভাবে সেই টুকরোটার গায়ে কিছুক্ষণ চুমু খেলেন, জাপটে ধরলেন বুকের মাঝখানে, তারপরে লিওকাডিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে উদাত্ত গলায় বললেন, 'বুঝলেন মঁসিয়ে, এতক্ষণে নিজের ভুল বের করেছি। এই দেখুন!'

লিওকাডিয়া সেই মার্বেলের টুকরোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, পাভান যা বলতে চাইছেন তা যে তিনি বুঝতে পারেননি তা ধরা পড়েছে তাঁর চোখের চাউনিতেই। কিন্তু সেভাব প্রকাশ করে মাতাল পাভানকে আরও রাগিয়ে তোলার ঝুঁকি নিতে চাননা তিনি, তাই এমনভাবে মাথা নাড়লেন যাতে পাভান ধরে নেন তাঁর বক্তব্য তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন।

'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ!' নেশাজড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন পাভান, 'আশা-

ভঙ্গের মুহূর্তে এমন এক অতুলনীয় সৌন্দর্য আমায় ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি!'

তাঁর মন্তব্য শুনে লিওকাডিয়া আগের মতন নির্বিকার থাকলেও ভেতরে যারা রয়ে গেছেন তাঁদের কৌতূহল গেল বেড়ে। পাভানের নিজে হাতে গড়া দুর্লভ মূর্তির নির্মম ধ্বংসসাধন নিজচোখে খানিক আগে দেখেছেন তাঁরা, তারপরেও পাভান কোন দুর্লভ বস্তু খুঁজে পেয়েছেন জানতে উদ্‌গ্রীব হলেন সবাই। কৌতূহল চাপতে না পেরে একজন চাপাগলায় বলেই ফেললেন, 'জিনিসটা কি, মশাই?'

'এখনও চিনতে পারোনি হতভাগা?' প্রশ্নকর্তার উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠলেন পাভান, 'এতদিন আমার পেছনে ঘুরেও নজর তৈরি হল না? কেন আসো আমার এই খোঁয়াড়ে, মাল খেতে আর মাগিবাজী করতে? ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখো, তুমি যেখান থেকে পয়দা হয়েছো এটা সেই যন্তোর! নারীদেহের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা—তার গোপনাঙ্গ যাকে শিল্পীরা পূজো করেন।' বলতে বলতে পরম মমতায় হাতে ধরা সেই মার্বেলের টুকরোয় চুমু খেলেন পাভান।

'এবার আমি বুঝতে পেরেছি কোথায় ভুল করেছি,' হাতে ধরা যোনির আকৃতির সেই মার্বেল উঁচু করে ধরে বললেন পাভান, 'এই একটুকরো পাথরের গায়ে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সত্ত্বা ফুটিয়ে তুলব আমি!'

'আমি হাজার ফ্রাঁ দিয়ে ওটা কিনব!' পাভানের বক্তব্যের মর্ম এতক্ষণে বুঝতে পেরে দর হাঁকল লিওকাডিয়া। পাভান যা বলছেন, সত্যিই ঐ একটুকরো মার্বেলের গায়ে তেমন কোনও নারীমূর্তি খোদাই করতে পারলে সমঝদার খদ্দেরদের কাছে তা চড়া দামে বিকোবে আঁচ করে এতক্ষণ বাদে উৎসাহিত হল সে।

'হাজার ফ্রাঁ!' লিওকাডিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন পাভান, 'মাত্র হাজার ফ্রাঁ?'

'তাহলে দেড় হাজার ফ্রাঁ!' প্রচণ্ড অনিচ্ছায় বিড়বিড় করে দর চড়াল লিওকাডিয়া।

'না, মঁসিয়ে,' তার মুখের দিকে সরাসরি তাকালেন পাভান, 'সাফ কথা বলছি শুনুন। পুরো আড়াই হাজার ফ্রাঁ সেইসঙ্গে যে মডেলকে সামনে রেখে এটা গড়েছি তার বাবদ কমিশান, এই আমার পাওনা! রাজি থাকেন ত বলুন!' সবাইকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে দর হাঁকলেন পাভান।

'কিন্তু যে মডেলকে চিনি না জানিনা তার বাবদ এই কমিশান দিই কি করে আপনিই বলুন!' মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল লিওকাডিয়া।

মূর্তির যোনিদেশ তৈরি করতে পাভান যে ক'জন মডেলের সাহায্য নিয়েছেন তারা সবাই বসেছে একধারে। লিওকাডিয়ার কথা কানে যেতে পাভান তাদের সবাইকে এক এক করে খুঁটিয়ে দেখলেন কিন্তু কাউকে পছন্দ হল না। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে একসময় পেগির পাশে রিণাকে চোখে পড়তে চেঁচিয়ে উঠলেন পাভান, 'এই যে, তোমায় বলছি!' রিণাকে ইশারায় ডাকলেন তিনি, 'সামনে এসো।'

পেগির সামনে পাভানের আহ্বানে অস্বস্তি বোধ করল রিণা, কি করবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। সঙ্গে সঙ্গে পাভান এগিয়ে এসে হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে এনে দাঁড় করালেন সবার সামনে। একপলক রিণাকে দেখে লিওকাডিয়া বলল, 'বেশ, আমি রাজি, যা চাইছেন তাই দেব!'

বিজয়ীর চাপা উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এল পাভানের গলা দিয়ে। দু'হাতে রিণাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, উত্তেজনার আবেগে বারবার চুমু খেলেন দু'গালে। 'তুমি চিরজীবী হবে সোনা, বুকের ধন আমার! বিশ্বাস করো, তোমার রূপসুধা ঐ একফালি পাথরের বুকে ফোটাতে আমি কত সময় নষ্ট করেছি, অনন্তকাল যাকে পূজো করবে শিল্পরসিকেরা!'

পাভানের দাড়িগোঁফের সুড়সুড়ি মুখে লাগায় খিলখিল করে হাসছে রিণা, পাগলামি দেখে তার দারুণ মজা লাগছে। তাকে দু'হাতে মাথার ওপর তুলে ধেই ধেই করে কয়েকপাক নাচলেন পাভান, তারপরে মূর্তি যেখানে ছিল সেই বেদির ওপর তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপরেই রিণার পরনের পোষাক এক এক করে টেনে খুলে ফেললেন। এখন বেদির ওপর দাঁড়ানো রিণা সম্পূর্ণ নগ্ন, একটুকরো সুতোও নেই দেহে। খামখেয়ালির ঘোরে নিজের তৈরি মূর্তি ভেঙ্গে পাভান রিণাকে দাঁড় করালেন বেদিতে। এইমুহূর্তে সে যেন পাভানের গড়া এক নতুন মূর্তি, জীবন্ত, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। তার দিকে চোখ পড়তে বাকি অতিথিরা থমকে গেলেন, হা করে অপলক চোখে তাকিয়েই রইলেন তাঁরা।

পাভানই একসময় রিণাকে নামিয়ে আনলেন সেই বেদি থেকে। একখণ্ড কাপড় তিনি তার নগ্ন দেহে জড়িয়ে দিলেন। মডেলদের একজন রিণার হাতে তার নিজের জামাকাপড় তুলে দিতে সে সেগুলো নিয়ে ঢুকে পড়ল বাথরুমে, খানিক বাদে নিজের জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এল বাইরে। পেগি তারই অপেক্ষায় তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি রিণাকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন দরজার দিকে। পাতলা কাঠের পার্টিশানের ওপাশ থেকে ভেসে আসা তাঁদের গলা পদ্মাসনে বসে স্পষ্ট শুনতে পেল অমরু সিং।

'রিণা, তোমার মাথা কি সত্যিই খারাপ হয়েছে, কি যাচ্ছেতাই সব করছ?'

'পেগি, এটা আদৌ কোনও গুরুতর ব্যপার না, আপনি মিছিমিছি একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে বড় করে দেখছেন।'

'যখন কাপড় ছেড়ে একদম উদোম হয়ে বেদির ওপর দাঁড়িয়েছিলে তখন ক'টা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলছিল খেয়াল করেছো? এসব ছবি একবার কোনও গতিকে খবরের কাগজে ছেপে বেরোলে হাল কি দাঁড়াবে একটিবার ভেবেছো? খবর সমেত ফোটো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে বোস্টনে।'

'আপনি খামোখা ভয় পাচ্ছেন, পেগি,' রিণার জোরগলার হাসি চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলল, খবরের কাগজে সত্যিই আমার আজকের ফোটো ছেপে বেরোলে একটা দারুণ ব্যাপার হবে। ফোটোর নিচে লেখা থাকবে 'বোস্টন-তনয়া প্যারিসের সেরা বারবধূ মনোনীত!'

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটায় তোমার খুব গর্ব হচ্ছে!'

'হবে নাই বা কেন? এতদিনে এই একটা কাজ আমি নিজের মুখ চেয়ে করে উঠতে পেরেছি যেখানে কেউ আমায় এতটুকু মদত দেয়নি।'

'এটা প্যারিস, কেচ্ছা কেলেংকারির খবর এখানে বাতাসের বেগে ছোটে। তোমার কথা একবার রটলে প্যারিসের যত মাগিবাজ আছে সবাই এসে জুটবে তোমার পাশে। এইমুহূর্তে তোমার মানসিক অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে তেমন কিছু ঘটলে তা তোমার মনের মত হবে বলেই আমার ধারণা।'

'হতেই পারে। এখন আমি বড় হচ্ছি, নিজের পছন্দমত পথে চলতেই পারি। সব ব্যাপারে আপনার মর্জিমতন চলব এ-নিয়ম ত আজীবন মেনে চলতে আমি বাধ্য নই...'

প্রচণ্ড জোরে চড় মারার আওয়াজে রিণার বাকি কথাগুলো চাপা পড়ল।

'খান্‌কি! প্যারিসে এসে তুমি একটা রাস্তার সস্তাদরের খানকি তৈরি হয়েছো। তোমার মত খানকিদের এইভাবেই টিট করতে হয়!'

'ফের আপনি আমার গায়ে হাত তুললেন!' রিণার গলা চিনতে অম্‌রু সিং-এর অসুবিধা হলনা। 'আপনাকে সেবার মানা করেছিলাম ভুলেও আমার গায়ে হাত তুলবেন না!'

'চোপ্‌! খান্‌কি! আবার মুখে মুখে কথা?' পরমুহূর্তে আবার সপাটে চড় মারার আওয়াজ। কয়েমুহূর্ত দু'পক্ষই নীরব, তারপরে পেগির গলা ভেসে এল, 'ও কি, রিণা! কি করছ জুতো খুলছো কেন? ওটা নামিয়ে রাখো বলছি? ওঃ...আঃ আঁক্‌!' পেগির চিৎকারের সাথে প্রচণ্ড জোরে নিচে কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ হল। অমরু সিং আর থাকতে না পেরে উঠে এল। দরজা খুলে বেরোতে দেখল সিঁড়ির রেলিং-এর মুখে রিণা একা দাঁড়িয়ে নিদারুণ আতংকে তার ফর্সা মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। সরু ছুঁচোলো জুতোর একপাটি তখনও তার হাতে। একটি কথাও না বলে অম্‌রু সিং হাত থেকে জুতোটা নিয়ে উবু হয়ে গলিয়ে দিল তার খালি পায়ে।

'আমি ওঁকে ছুঁইনি!' অম্‌রুর মুখের দিকে না তাকিয়ে বলল রিণা।

'জানি, আমায় বলতে হবে না।' বলল অম্‌রু।

'উনি কথা কাটাকাটি করতে করতে পা ফসকে নিচে পড়ে গেছেন!' বলতে বলতে অম্‌রুর বুকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রিণা। নিমেষে অম্‌রু দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে, রিণার কলেজের ওঠাপড়া টের পাচ্ছে সে।

'কথাবার্তা যা বলার আমি বলব,' রিণার কানের কাছে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে আদেশ দেবার ঢং-এ বলল অম্‌রু, 'তুমি কারও কাছে মুখ খুলতে যেয়োনা!'

দরজা খুলে কয়েকজন অতিথি বাইরে বেরিয়ে এলেন। রিণার মুখ এখনও অম্‌রুর বুকে গোঁজা। তার মুখ বুকে চেপে ধরে মুখ তুলে অম্‌রু অতিথিদের বলল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে এঁর সঙ্গি মহিলাটির একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, আপনাদের মধ্যে কেউ এখুনি ডাক্তার ডাকুন।'

১১

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে চমকে গেলেন জ্যাকুস, দেখলেন শোবার ঘরে খাটের ওপর মাথা রেখে গোটা শরীরটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা দুটো উঁচু করে আছে রিণা, যেন ডিগবাজি খেতে গিয়ে এক লহমার জন্য থমকে গেছে।

'ও কি,' রিণাকে ঐ অবস্থায় দেখে মজা পেলেন জ্যাকুইস। শান্তভাবে জানতে চাইলেন, 'ওটা কি হচ্ছে?'

'মাথা নিচের দিকে করে দাঁড়িয়ে আছি।

'তা ত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই বিটকেলপনার দরকার কি?'

'দরকার আছে মঁসিয়ে,' গম্ভীর গলায় বলল রিণা।

'আমার ভারতীয় বন্ধু অম্‌রু সিং-এর মতে এভাবে মাথার ওপর ভর দিয়ে রোজ কিছু সময় থাকলে মস্তিষ্কের সক্রিয়তা বাড়ে, মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গিরও উন্মেষ ঘটে। এর

নাম শীর্ষাসন। এভাবে শুয়ে সব কিছু দেখতে কি অদ্ভুত লাগে আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'এইভাবে মাথার ওপর ভর দিয়ে শুয়ে একটা মেয়েকে চুমু খেতে কেমন লাগে সেকথা অমরু সিং বলেনি?' মুচকি হেসে বললেন জ্যাকুইস।

'না!' দুষ্টু হাসি হাসল রিণা। 'অমরু সিং বলার আগেই আমার জানা হয়ে গেছে।' বলে পিঠ বেঁকিয়ে দেয়াল থেকে পা সরিয়ে আনল, তার দিকে তাকিয়ে জোরে হাসলেন জ্যাকুইস। উঁচু করে রাখার দরুন এইমুহূর্তে পা দুটো ইংরেজি 'ওয়াই' অক্ষরের আকার নিয়েছে। রিণার দুপায়ের নীরব আমন্ত্রণ তাঁর নজর আর অনুভূতিকে ফাঁকি দিতে পারলনা, এগিয়ে এসে তার দু'পায়ের মাঝখানে মাথা পুরো গুঁজে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন দু'পায়ের মাঝখানে তলপেটের নিচে প্রগাঢ় চুমু খেলেন। তলপেটে সুড়সুড়ি লাগতে খিলখিল করে হেসে উঠল রিণা। হাসি চাপতে না পেরে খাট থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

'তোমায় প্রাণভরে হাসতে দেখে আমার নিজেরও ভাল লাগছে,' বললেন জ্যাকুইস। 'গোড়ার দিকে তোমার মুখে হাসি মোটেও চোখে পড়তনা, সবসময় গোমড়া মুখে থাকতে।'

'গোড়ার দিকে যে আমার মনে সুখ বলতে কিছু ছিল না,' মেঝে থেকে খাটে উঠতে উঠতে বলল রিণা. 'তাই গোমড়ামুখে থাকতাম।'

'আর এখন? এখন তোমার মনে সুখ আছে ত?'

'নিশ্চয়ই!' রিণা মুখ তুলতে তার দু'চোখ যেন হাসছে বলে তাঁর মনে হল। সেইমুহূর্তে ক'মাস আগের এক রাতের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল সেরাতে দেখা রিণার হতবুদ্ধি চোখমুখ।

রাতের খাওয়া অনেকক্ষণ আগেই সেরে নিয়েছেন। রোজের মত একটু হালকা মদ খেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন। বালিশে মাথা রাখার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে এসেছে, ঠিক তখনই টেলিফোনের আওয়াজে ঘুমের পাতলা আমেজ গেল কেটে।

'মঁসিয়ে দে'শ্যাম্প?'

রিসিভার কানে ঠেকাতে বহুদূর থেকে ভেসে এল পুরুষকণ্ঠ, যেমন শান্ত, তেমনই গভীর।

'কথা বলছি,' ঘুমজড়ানো গলায় বললেন তিনি।

'এত রাতে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য মাফ চাইছি,' ইংরেজি ঘেঁষা নির্ভুল ফরাসিতে ওপাশ থেকে সেই কণ্ঠ বলল, 'আমি একজন প্রবাসী ভারতীয়, নাম অমরু সিং। আপনার বান্ধবী রিণা মার্লো এখানে আমার কাছেই আছেন। আপনার সাহায্য ওঁর এইমুহূর্তে খুব দরকার।'

'ব্যাপারটা কি খুব গুরুতর?' ততক্ষণে তাঁর ঘুম কেটে গেছে।

'খুবই গুরুতর মঁসিয়ে দে'শ্যাম্প। মাদমোয়াজেল মার্লো যে মহিলার সঙ্গে থাকেন সেই মাদমোয়াজেল ব্র্যাডলির খানিক আগে এক দুর্ঘটনা ঘটেছে, সিঁড়ির রেলিং-এর ধার ঘেঁষে উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন আচমকা পা ফসকে নিচে পড়ে যান, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যান মাদমোয়াজেল ব্র্যাডলি।

পুলিশ এসেছে, ওদের হাবভাব কথাবার্তা শুনে বেশ বুঝতে পারছি মাদমোয়াজেল মার্লোকে নিয়ে ঝামেলা পাকানোর তালে আছে।'

'মাদমোয়াজেল মার্লোকে একবার রিসিভারটা দিন, বলুন আমি কথা বলব।'

'দুঃখিত, মঁসিয়ে দেশ্যাম্প, মাদমোয়াজেল মার্লো এইমুহূর্তে কথা বলার অবস্থায় নেই। দুর্ঘটনার ফলে উনি মানসিক ভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ডাক্তার ওঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে শুয়ে থাকতে বলেছেন।'

'আপনারা আছেন কোথায়? কোথা থেকে ফোন করছেন?'

'ভাস্কর মঁসিয়ে পাভানের স্টুডিও থেকে, জায়গাটা চেনেন ত?'

'চিনি,' জ্যাকুইস বললেন, 'আমি আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি। আমি পৌঁছোনোর আগে রিণা যেন কারও সঙ্গে কথা না বলে।'

'সে ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি,' অমরু সিং বলল। 'আপনি আসার আগে কারও সঙ্গে কথা বলতে ওকে নিষেধ করেছি।'

'আপনার বান্ধবী মানসিক দিক থেকে খুব জোরালো আঘাত পেয়েছেন মঁশিয়ে,' জ্যাকুইস নিজের পরিচয় দেবার পরে বললেন তদন্তকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর, 'আমি ডাক্তারকে আবার ডেকে আনতে লোক পাঠিয়েছি।'

'আপনি ওর জন্য যথেষ্ট করেছেন, ইন্সপেক্টর,' বললেন জ্যাকুইস, 'আপনার কর্তব্য পরায়নতার তুলনা হয় না। আচ্ছা, ঘটনাটা কি ঘটেছিল দয়া করে বলবেন? আমি ত শুয়ে ছিলুম, কিছুই জানিনা। এক বন্ধুর টেলিফোন পেয়ে ছুটে এলাম।'

'ঘটনা যা ঘটেছে তা আমাদের ধরাবাঁধা রুটিনের মধ্যেই মঁসিয়ে,' হাত পা নেড়ে বললেন ইন্সপেক্টর, 'মাদমোয়াজেল মার্গারেট ব্র্যাডলি শুনলাম সিঁড়ির রেলিং-এর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, আচমকা পা ফসকে উনি নিচে পড়ে যান তাতেই মারা যান। মারা যাবার আগের মুহূর্তে মাদমোয়াজেল মার্লো ওঁর পাশে ছিলেন তাই ওঁর একটা জবানবন্দি আমাদের দরকার।'

কোনও মন্তব্য না করে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন জ্যাকুইস। শুধু জবানবন্দি নিয়েই ইন্সপেক্টর ক্ষান্ত হবেন না। তার পরেও তিনি এমন কিছু করতে পারেন যা রিণার পক্ষে খুব সুখকর না হবারই সম্ভাবনা আর নিশ্চয়ই তা ঘটতে চলেছে আঁচ করে অমরু সিং তাঁকে ফোন করেছে।

'মাদমোয়াজেল মার্লো কোথায়?' জানতে চাইলেন জ্যাকুইস।

'ভেতরে, ড্রেসিং রুমে।'

'আমি একবার ওঁর কাছে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন মঁসিয়ে।'

জ্যাকুইস ড্রেসিংরুমে ঢুকে দেখেন রিণা বড় কৌচে চোখ বুঁজে শুয়ে, এক দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে। লোকটি ভারতীয় তা তার চামড়ার রং দেখেই তিনি আঁচ করলেন।

'মঁসিয়ে দে'শ্যাম্প?' জানতে চাইল সেই দীর্ঘদেহী পুরুষটি।

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে সিং,' অভিবাদনের ঢং-এ অল্প ঝুঁকলেন জ্যাকুইস, 'ও কি এখনও ঘুমুচ্ছে?' রিণাকে ইশারায় দেখিয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

'মাদমোয়াজেল,' রিণার কানের কাছে ঠোঁট এনে শিশুকে আশ্বস্ত করার গলায় বলল অম্‌রু সিং, 'আপনার বন্ধু মঁশিয়ে দেশ্যাম্প এসে গেছেন, আর আপনার ভয় নেই।'

রিণা চোখ মেলে হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল, তাঁকে দেখে তার কোনও ভাবান্তর ঘটল না।

'ঘটনার সময় আমি কাছেই ছিলাম, মঁসিয়ে দে'শ্যাম্প,' বলল অম্‌রু, 'মাদমোয়াজেল মার্লো শুধু মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন তাই নয়, ঘটনার পুরো দায় উনি নিজের ওপর তুলে নিতে চান যেন বান্ধবীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য উনি একা দায়ী।'

'এই ঘটনার জন্য উনি কি সত্যিই দায়ী?' অম্‌রুর চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন জ্যাকুইস।

অম্‌রুর কালো চোখের চাউনি তাঁর কাছে দুর্জ্ঞেয় ঠেকল, চাঁছাছোলা গলায় বলল, 'এই প্রসঙ্গে পুলিশকে আগে যা বলেছি আপনাকেও তাই বলছি—মাদমোয়াজেল মার্লোকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করার মত কিছু ঘটতে আমি দেখিনি বা শুনিনি।'

'আমি এখানে আসার আগে উনি পুলিশকে কি বলেছেন, কতটুকু বলেছেন?'

'কিছুই বলেন নি, মানে আমি ওঁকে পুলিশের জেরার মুখোমুখি হতে দিইনি।'

'আপনি কি ডাক্তার?'

'না মঁসিয়ে আমি একজন ছাত্র,' বলল অম্‌রু সিং।

'ইন্সপেক্টর, আপনি অনুমতি দিলে আমি মাদমোয়াজেল মার্লোকে ওঁর বাড়িতে এবার পৌঁছে দিতে পারি। ওঁর নিজের ডাক্তার পরীক্ষা করে মত দিলে আগামিকাল বিকেলে আমি নিজে ওঁকে জবানবন্দি দেবার জন্য আপনার দপ্তরে নিয়ে যাব। এ ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগত মুচলেকা দিতে তৈরি আছি।'

ইন্সপেক্টর জ্যাকুইসের এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। এরপরে জ্যাকুইস ট্যাক্সি ডাকিয়ে রিণাকে পেছনের সিটে জানালার ধারে বসালেন।

'একটা কথা বলছি,' মঁসিয়ে জ্যাকুইসের দিকে তাকাল অম্‌রু, 'আমার মনে হয় পুরোনো অ্যাপার্টমেন্টে মাদমোয়াজেল মার্লোর ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। ওখানে এতদিন উনি মাদমোয়াজেল ব্র্যাডলির সঙ্গে কাটিয়েছেন, হয়ত সারাক্ষণ তাঁর কথা ভেবে ওঁর মন খারাপ হবে।'

'ঠিকই বলেছেন,' ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে জ্যাকুইস ট্যাক্সি চালককে নিজের ঠিকানা দিলেন। রিণাকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে, অম্‌রু সিংও এল সঙ্গে।

'আমার যেটুকু করণীয় ছিল করেছি,' অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে বলল অম্‌রু সিং, 'এবার বান্ধবীর দায়িত্ব আপনি নিন।'

'জ্যাকুইস! জ্যাকুইস! 'এতক্ষণে রিণার চোখের চাউনি স্বাভাবিক হল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি জানতাম আপনি আসবেন। এই সংকট থেকে আমায় উদ্ধার করবেন।'

রিণার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করে ঘাড় ফেরালেন জ্যাকুইস, কিন্তু অম্‌রু সিংকে আর দেখতে পেলেন না।

সে কোন এক ফাঁকে চলে গেছে। পরদিন রিণাকে নিয়ে জ্যাকুইস এলেন পুলিশ ইন্সপেক্টরের দপ্তরে, জবানবন্দি লেখার কাজ শেষ হতে রিণাকে নিয়ে এলেন তার পুরোনো আস্তানায়। সেখান থেকে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এলেন নিজের অ্যাপার্টমেন্টে।

দু'দিন বাদে কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতে দেখেন অম্রু আবার এসে হাজির হয়েছে, রিণার সঙ্গে কি সব গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করছে।

'অম্রু সিং আমার বন্ধু,' তাঁকে দেখে দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল রিণা।

'সে ত আনন্দের কথা,' অম্রুর সঙ্গে করমর্দন করলেন জ্যাকুইস, 'উনি যখন তোমার বন্ধু তখন আমারই বা বন্ধু হবেন না কেন?'

অম্রু হাসল। সেই থেকে তিনজনের বন্ধুত্ব অটুট আছে, ফি হপ্তায় তিনজনে একদিন বাইরে লাঞ্চে যায়।

সেদিন রাতে শোবার আগে মেঝেতে কার্পেটের ওপর পদ্মাসনে বসে পড়ল রিণা, হাত দুটো এক বিশেষ ভঙ্গিমায় নিয়ে এল বুকের কাছে।

'এসব কি হচ্ছে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন জ্যাকুইস।

'শোবার আগে কিছুক্ষণ ধ্যান করব,' বলল রিণা। 'এসব তারই প্রস্তুতি। অম্রু সিং বলে, রাতে শোবার আগে কম করে পাঁচ মিনিট ধ্যান করলে দেহমনের সব জড়তা আর চাপা উত্তেজনা কেটে যায়।'

'তাই নাকি?' টেপা বোতাম ক'টা শার্ট থেকে খুলে ড্রেসারে রাখতে রাখতে জ্যাকুইস বললেন, 'তোমার হাল দেখে মনে হচ্ছে খুব শীগগিরই অম্রু সিং আমার ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠবে।'

'তেমন কিছু সত্যিই ঘটলে তা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে,' গম্ভীর গলায় বলল রিণা, 'কারণ তখন অম্রু সিং-এর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা আমার বন্ধ করতে হবে।'

'আমার জন্য ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে তুমি?'

'নিশ্চয়ই,' জোরগলায় বলল রিণা।

'আপনি আমার প্রণয়ী আর অম্রু শুধু আমার বন্ধু আর শিক্ষক, তার বেশি কিছু নয়।'

'সে যে আমারও বন্ধু সেকথা তুমি ভুলে যাচ্ছ! হালকা ভাবে বললাম কথাটা, তাকে সত্যি ধরে নিয়ে তুমি ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলে তা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার! যাক গে আজ তোমায় বন্ধুর কাছ থেকে কি শিখলে বলো।'

গর্ভবতী মেয়েদের জন্য কিছু বিশেষ আসন আছে, মুচকি হাসল রিণা। 'তার কয়েকটা ও আমায় শেখাল। এগুলো আয়ত্ত করতে পারলে দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

'গর্ভবতী মেয়েদের আসন তোমার কোন কাজে লাগবে?' জবাব না দিয়ে চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হল রিণা। খানিক বাদে তার ধ্যান ভাঙ্গার পরে জ্যাকুইস বললেন, 'গর্ভবতী মেয়েদের আসন এইমুহূর্তে তোমার কি কাজে লাগবে বললে না?'

'লাগবে গো সোনা, লাগবে,' জ্যাকুইসের চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসল রিণা, 'ক'দিন ধরে দেখছি শরীরটা ভার ভার লাগছে। খিদে পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু খেতে বসার পরে কিছু মুখে তুলতে ইচ্ছে করছে না। ডঃ ফোন্টে-র সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আজ দুপুরে ওঁর চেম্বারে গিয়েছিলাম। আমার খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করে উনি যা বললেন তার মানে

দাঁড়ায় আপনার বাচ্চা আমার পেটে এসেছে জ্যাকুইস, আমি শীগগিরই মা হব।'

শুনে জ্যাকুইসের আনন্দ আর ধরে না, রিণাকে জাপটে ধরে কোলে তুলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত অসংখ্য চুমু খেলেন। তার কানের কাছে মুখ এনে বারবার বললেন একই কথা—সাউথ অফ ফ্রান্সে তাঁদের বিশাল পারিবারিক ভিলায় রিণাকে ক'দিন বাদে নিয়ে যাবেন। রিণা সেখানেই তার সন্তানের জন্ম দেবে। তবে তার আগে নিজের স্ত্রীকে অবশ্যই ডিভোর্স করবেন।

'আপনার শিক্ষাদীক্ষা, বংশ মর্যাদা, সম্মানজনক পেশা, সব এই একটা কথায় চাপা পড়ে গেল, জ্যাকুইস।' হাসতে হাসতে বলল রিণা, 'বোকা হাঁদা আমেরিকানদের মত বেচারি বৌটাকে শুধুশুধু ডিভোর্স করবেন কেন, ছিঃ! তাছাড়া এইভাবে ডিভোর্স করলে তা আপনার পেশার পক্ষে ক্ষতিকারক হবে আপনি আমি দু'জনেই তা জানি। কাজেই একথা যেন আপনার মুখে আর কখনও না শুনি। মনে রাখবেন, আপনার স্ত্রীর ওপর আমার কোনও রাগ বা ক্ষোভ নেই, আপনার মত তিনিও আমার ভালবাসা দাবি করতে পারেন। ওঁকে নিয়ে যেমন ঘরসংসার করছেন করুন। আমি এদিকে সময়মত আমার সন্তানের জন্ম দেব। এখন যেমন হপ্তায় ২/৩ বার আমার খোঁজখবর নিতে আসেন, তখনও তেমনই আসবেন। খেয়েদেয়ে মাঝেমাঝে রাতও কাটাবেন আমার বাচ্চার পাশে। আপনি ত তার বাবা। এও মনে রাখবেন আপনি যেমন তার বাবা, তেমনই পেটে না ধরলেও আপনার স্ত্রী সম্পর্কের দিক থেকে সেই বাচ্চার মা হবেন। কাজেই তাঁকে ডিভোর্স করার কথা কখনোই আপনার চিন্তা করা উচিত হবে না।'

'বেশ, আমার স্ত্রীর প্রসঙ্গে তোমার যুক্তি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তোমার বাবা মঁশিয়ে মার্লো? উনি যখন শুনবেন তুমি সন্তানের মা হয়েছো তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে একবারও ভেবে দেখেছো?

'কি আর হবে,' রিণা সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'বাবা বড়জোর জানতে চাইবেন আমি কার বাচ্চা পেটে ধরেছি, এ বাচ্চার বাবা কে? তেমন পরিস্থিতি দেখা দিলে বাবাকে বলব প্যারিসে এসে অনেক ছেলেবন্ধুর সঙ্গে লাগামছেঁড়া মেলামেশা করেছিলাম, পরিণতির কথা না ভেবে তাদেরই একজনকে ঝোঁকের মাথায় বিয়েও করে বসেছিলাম। বলব এ বাচ্চা তারই। আপনিই যে আমার সন্তানের বাবা সেকথা আমার বাবা না জানলেই ত হল। তাছাড়া আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমার মা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। বাচ্চার বাবা কে, কি করে, কোথায় থাকে, দু'বেলা কি খায়, মাসে কত উপার্জন করে, কোন বংশের ছেলে এসব ব্যাপার নিয়ে মেয়েরাই বেশি মাথা ঘামায় কারণ তাদের হাতে কাজকর্ম কিছুই থাকে না। আমার বাবা পুরুষ মানুষ। ব্যবসার কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। এত কথা ভাবার মত সময় তাঁর নেই। নিন, অনেক রাত হল, এবার বাথরুমে গিয়ে চটপট চান সেরে এসে শুয়ে পড়ুন। ভাল কথা বোস্টনের কয়েকটা খবরের কাগজ আনতে বলেছিলাম, এনেছেন?'

'ওগুলো আমার ব্রিফকেস-এ আছে, কষ্ট করে নেমে বের করে নাও,' বলে জ্যাকুইস লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। কুসুম কুসুম গরম জলে সাবান মেখে চান সেরে বাইরে বেরিয়ে দেখেন বোস্টন থেকে প্রকাশিত একখানা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে রিণা। তার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে

উঠেছে, দু'চোখে ফুটেছে নিদারুণ আতংক। তার হাত পা থরথর করে কাঁপছে জ্যাকুইসের চোখ এড়ালনা।

'কি হল, রিণা?' জোরগলায় নাম ধরে ডেকে বললেন জ্যাকুইস।

'হঠাৎ আবার কি হল?'

'আমায় কালই বাড়ি ফিরতে হবে, জ্যাকুইস' বলতে বলতে' ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল রিণা।

'কালই বাড়ি যাবে?' অবাক হলেন জ্যাকুইস, 'কেন, হলটা কি?'

জবাব না দিয়ে রিণা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো একটি খবর ইশারায় দেখাল। জ্যাকুইস এগিয়ে এসে দেখলেন বড় ব্যানার হেডলাইনে ছাপা হয়েছে—

হ্যারিসন মার্লো আদালতে অভিযুক্ত!

পৈত্রিক কারবারের শোচনীয় ভরাডুবি!

ফৌজদারি মামলায় জড়ালেন বোস্টন ব্যাংকার!

খবরের নিচে রিণার বাবা হ্যারিসন মার্লোর তিনকলম জোড়া সাদাকালো ছবিও ছাপা হয়েছে।

'হা ঈশ্বর!' দু'হাতে রিণার কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে আক্ষেপ করলেন জ্যাকুইস দে'শ্যাম্প, খানিকবাদে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তোমার পেটে যে বাচ্চা এসেছে তার এখন না জন্মালেও চলবে। আগে তোমার বাবার ঝামেলা ভালোয় ভালোয় মিটে যাক, তারপরে ফ্রান্সে ফিরে এসে আবার না হয় আরেকটা বাচ্চার কথা ভাববে।'

'ওগো, না! তা আর হবে না!' প্রণয়ীর বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধরাগলায় বলল রিণা, 'ডঃ ফোন্টে বলেছেন এই একবার, এই শেষ। ভবিষ্যতে আর কখনও আমি মা হতে পারব না!'

১২

অনেক উঁচু ছাদ থেকে লম্বা রডে ঝোলানো পাখাটা খুব জোরে ঘুরলেও তার হাওয়ায় গভর্নরের অফিসের ভ্যাপসা গরম মোটেও দূর হচ্ছে না। পাতলা ছিপছিপে সেক্রেটারি বিশাল ডেস্ক-এর এপাশের একটি চেয়ার ইশারায় দেখাতে রিণা বসল।

ডেস্কের ওপাশে প্রৌঢ় গভর্ণর মুখোমুখি বসে একের পর এক কাগজে সই করে চলেছেন। সইসাবুদের পালা শেষ হতে সেক্রেটারি সই করা শেষ কাগজটি তুলে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

'আমি চুরুট খেলে তোমার অসুবিধে হবে না ত?' বলতে বলতে বাক্স থেকে চুরুট বের করলেন গভর্ণর, 'কিছু মনে করবে না ত?'

ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে ঘাড় নেড়ে রিণা বোঝাল তার অসুবিধে হবে না।

'আমি দীর্ঘজীবী হতে চাই, বুঝলে?' অল্প ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন গভর্ণর, 'কম করে একশো পঁচিশ বছর বাঁচতে চাই। তা আমার ডাক্তার বলেছেন একশো পঁচিশ বছর না হলেও সুস্থদেহে আমি বহুদিন বেঁচে থাকতে পারি, তবে এজন্য সবার আগে আমায় ধূমপান চিরদিনের জন্য ছাড়তে হবে।'

'চেষ্টা করলেই আপনি তা পারেন, গভর্ণর,' অল্প হেসে বলল রিণা।

'তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি মেয়ে,' চেয়ারে ঠেস দিয়ে বললেন গভর্ণর।' 'সত্যিই অতদিন বাঁচব কিনা তা নিয়ে আমার কিন্তু মাথাব্যথা নেই। আসলে আমার যত দুষমণ আছে, আমি তাদের সবার চেয়ে বেশিদিন বাঁচতে চাই, বুঝলে কিনা? আমি মারা যাবার অনেক আগেই তারা সবাই ঝাড়ে বংশে শেষ হোক ঈশ্বরের কাছে এটাই আমার দিনরাতের একমাত্র প্রার্থনা।' বলতে বলতে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন। রিণাও রসিকতার এই নমুনা শুনে না হেসে পারলনা।

'তুমি তখন খুব ছোট,' আচমকা হাসি নামিয়ে বললেন গভর্ণর, 'এইটুকু পুঁচকে মেয়ে ঐ সময় তোমার মা মারা যান। হ্যারিসন মার্লোর বাড়িতে তোমার মা রাঁধুনির কাজ করতেন। উনি মারা যাবার পরে হ্যারিসন মার্লো তোমায় পুষ্যি নেন। সেসব কাগজপত্রে আমিই সইসাবুদ করেছিলাম। ভাল কথা, তোমার বয়স কত? আসলে আমি জানতে চাই তুমি সাবালিকা হয়েছো কিনা।'

'আসছে মাসে উনিশ পূর্ণ হবে,' চটপট জবাব দিল রিণা।

'তাহলে ত একবছর আগেই সাবালিকা হয়েছো,' ছাই ঝেড়ে আধপোড়া চুরুট অ্যাশ-ট্রে-র খাঁজে রেখে গভর্ণর বললেন, 'তুমি আমার কাছে কেন এসেছো তা আমি আঁচ করতে পেরেছি। তোমার বাবা মিঃ মার্লো যে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েছেন সেজন্য আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি।'

'ওঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো কি আপনি পড়ে দেখেছেন?' জানতে চাইল রিণা।

'আমি কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়েছি,' স্বীকার করলেন গভর্ণর।

'আপনার কি ধারণা আমার বাবা সত্যিই অপরাধী?'

'ব্যাংকের কারবারটা ঠিক রাজনীতির মত, বুঝলে?' গভর্ণর মুখ তুলে সরাসরি তাকালেন, 'এই কারবারে এমন অনেক ব্যাপার আছে যা নীতিগতভাবে ঠিক হলেও আইনত বেআইনী। ব্যাপার হল যেসব পথ অবলম্বন করলে বিচারের রায় মাথা পেতে নেয়া ছাড়া অন্য বিকল্প নেই।'

'তাহলে বলতে চান সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকাটাই আসল কৃতিত্ব, আমার বাবা যা পারেন নি?' কে যেন রিণার মুখে চটপট কথাগুলো এগিয়ে দিল।

'ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছ আসলে কিন্তু তত সহজ নয়,' ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন গভর্ণর। মেয়েটি তার জেলে আটক বাবাকে ছাড়ানোর জন্য করুণা ভিক্ষা করতে এসেছে তিনি জানেন। তাঁর যতদূর সাধ্য তিনি করবেন ঠিকই তবে তার আগে মেয়েটিকে একটু বাজিয়ে নেবার লোভ সামলাতে পারছেন না। আসলে মেয়েটির স্বাস্থ্য, চেহারার চটক আর স্পষ্ট জবাব দেবার ক্ষমতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে।

'আইন কিন্তু অনমনীয় কোন শক্ত বস্তু নয়,' ধীরে ধীরে বললেন গভর্ণর।

'মনে রেখো, চোখে দেখা না গেলেও আইনের কিন্তু প্রাণ মন সবই আছে, আর তাই জনগণের আশা আকাঙ্খা, কামনা বাসনা তাতে প্রতিফলিত হয়। আইনের সঙ্গে নীতির লড়াই সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে। আমরা আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে কোনও একদিন এ লড়াই-এর অবসান ঘটবে, সেদিন আইন ও নীতি মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে যেমন গণিতের নিয়ম অনুযায়ী সমান্তরাল দুটি রেখা অনন্ত অসীমে সবার দৃষ্টির আগোচরে একদিন ঠিকই মিলিত হয়।'

'অনন্ত অসীম বলতে দীর্ঘসময় বোঝায়,' বলল রিণা। 'আমার বাবার পক্ষে ততদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, কারণ অতদিন কেউ অপেক্ষা করতে পারেনা। আপনি নিজেও পারবেন না। একশো পঁচিশ বছর যদিবা বেঁচে থাকেন অতদিন কারও বা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করে থাকা আপনার নিজের পক্ষেও সম্ভব হবে না।'

'সমষ্টি নিয়ে কাজ করার বেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় বিবাদ বা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়,' গভর্ণর বললেন। 'ব্যাংকের যেসব ঋণ পরিশোধ না করার জন্য তোমার বাবাকে দায়ি হতে হল সেসব উনিই মঞ্জুর করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত ওঁর সামনে এক বড় ঝুঁকি হয়ে দেখা দিয়েছিল। একদিক থেকে উনি কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে ঠিক ছিলেন কারণ ঐসব ঋণ মঞ্জুর না হলে অনেকগুলো কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হত, বহু লোক বেকার হয়ে বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়াত, অনেকের টাকা লগ্নির পথ যেত বন্ধ হয়ে। তাই সেদিন তোমার বাবা যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন নীতিগতভাবে তাকে কখনোই বেঠিক বা অন্যায় বলা চলে না।

আবার আইনের কথা যদি তোল ত বলতে বাধ্য হচ্ছি ঐসব ঋনের আবেদন মঞ্জুর করে তিনি সত্যিই অন্যায় করেছিলেন। যারা টাকা গচ্ছিত রাখে ব্যাংকের যাবতীয় ও আইনগত দায়দায়িত্ব তাদের কাছে বাঁধা। আইন এ-সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ঐসব ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার নিয়মকানুন সে তুলে দিয়েছে রাষ্ট্র বা সরকারের হাতে। যথেষ্ট জামিন না পেয়েই ঐসব ঋণের আবেদন মঞ্জুর করা তোমার বাবার পক্ষে মোটেও উচিত হয়নি। মজার ব্যাপার কি জানো, ঋণের টাকা মঞ্জুর হবার পরে কারখানাগুলো যদি বন্ধ না হত, ঋণের টাকা নির্দিষ্ট সময়ে যদি আদায় হত তাহলেই অবস্থাটা পুরোপুরি পাল্টে যেত, তখন জনগণের প্রকৃত বন্ধু বলে সবাই তোমার বাবাকে কাঁধে তুলে নাচত, রাতারাতি উনি হয়ে উঠতেন দূরদর্শী ব্যবসায়ী। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঘটনা হল ঠিক তার উল্টোটাই। যাদের প্রশংসা করার কথা তারাই এখন ওঁর গর্দান চাইছে।'

'কিন্তু এই ব্যাংক ত ওঁর পাঁচ পুরুষের কারবার,' রিণা বলল, 'এই কারবার বাঁচাতে গিয়ে যে ওঁকে পুরোপুরি নিঃস্ব হতে হল সেটা কি ধর্তব্যের মধ্যে আসবেনা?'

'দুর্ভাগ্যবশত না,' গভর্ণর ঘাড় নাড়ালেন।

'তাহলে কি ওঁকে বাঁচানোর মত কিছুই আপনার করার নেই?' রিণার গলা তার নিজের কানেই ব্যাকুল শোনাল।

'রাজনীতির খেলায় যারা ওস্তাদ তারা কখনও জনমতের স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকো বায়না,' ধীরে ধীরে বললেন গভর্ণর, 'আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন আখেরে কাজে লাগবে। ঠিক এইমুহূর্তে জনগণ কি চাইছে জানো? বলির পাঁঠার মত একটা লোক ব্যাংকের কারবারের ভরাডুবির সব দায় যার ঘাড়ে চাপানো যায়। মামলা রুজু হলে তোমার বাবা যদি সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে চান ত সেটা হবে তাঁর পক্ষে চরম মূর্খতা। সেক্ষেত্রে তাঁর পরাজয় ঘটবেই, কেউ তা রুখতে পারবে না। এছাড়া বাড়তি যা জুটবে তা হল কম করে পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এখানেই শেষ নয়। শর্তাধীনে তাঁর মুক্তি পাবার সময় আসার ঢের আগে আমার কার্যকালের মেয়াদ যাবে ফুরিয়ে। আর চেয়ার ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা আর প্রভাব সবই যে হাতের বাইরে চলে যায় তা বোঝার মত বুদ্ধি তোমার আছে।'

রিণা কিছু না বলে চুপ করে শুনে যেতে লাগল। অ্যাশট্রে থেকে নিভু নিভু চুরুট তুলে দাঁতে চেপে গভর্ণর বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমতী, দ্যাখো বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অপরাধ স্বীকার করতে রাজি করাতে পারো কিনা। যদি পারো তাহলে কথা দিচ্ছি এমন কোনও জজের কাছে মামলা পাঠাবার ব্যবস্থা করব যিনি তোমার বাবাকে বড়জোর এক থেকে তিনবছরের সাজা দেবেন। একবার উনি মাথা পেতে সাজা নিয়ে নিলে পনেরো মাসের মাথায় আমি ওঁকে খালাস করিয়ে আনব।'

'কিন্তু তার আগে আপনার নিজেরই যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়?' বড় বড় চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল রিণা।

'খানিক আগে কি বললাম এত শীগগির ভুলে গেলে?' গভর্ণর হাসলেন, 'বলিনি আমি কম করে একশো পঁচিশ বছর বাঁচব? তবে তার আগে মারা গেলেও বাবাকে নিয়ে তোমার চিন্তার কিছু নেই। আমি মারা গেলেও জেলে ঢোকার কুড়ি মাস বাদে উনি শর্তাধীনে ছাড়া পাবার অধিকারী হবেন।'

'আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিণা। গভর্ণরের চোখে চোখ রেখে বলল, 'বাবার যাই হোক না কেন, আপনার একশো পঁচিশ বছর পরমায়ু আমি অবশ্যই কামনা করব।'

গরাদের এপাশে দাঁড়িয়ে রিণা দেখল বাবা ওপাশ থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। মাথার সব চুল পেকে গেছে, চোখের চাউনি দুর্বোধ্য। ফর্সা মুখের চামড়ার ফ্যাকাশে রং কয়েদির মেটে ধূসর উর্দির সঙ্গে অদ্ভুত খাপ খেয়েছে।

'বাবা, এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ত?' উদ্বেগ ফুটল রিণার গলায় 'ওরা তোমার ওপর—'

'না, মা, মারধোর, অত্যাচার কিছুই ওরা করছেনা,' রিণার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই চটপট জবাব দিলেন হ্যারিসন মার্লো, 'এখন পর্যন্ত ওরা খুব ভাল ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে। এখানে জেল লাইব্রেরিতে ওরা আমায় কাজ দিয়েছে। ওখানে যত বই আছে তাদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরির দায়িত্ব ওরা দিয়েছে আমায়। লাইব্রেরির অনেক বই খোয়া গেছে।'

বাবার চোখের দিকে তাকাল রিণা, বুঝতে চাইল তিনি ঠাট্টা করছেন কিনা।

'স্ট্যান হোয়াইট মানে আমার উকিলের একটা চিঠি পেয়েছি। লিখেছে আমাদের বাড়িটা বিক্রি করার ভাল অফার আছে ওর হাতে, দর উঠেছে ষাট হাজার ডলার।'

'তাহলে ত বলব ভালই দর দিয়েছে,' বলল রিণা, 'আমি নিজেও খোঁজ নিয়ে দেখেছি বড় বাড়ি বিক্রি করার হিড়িক পড়ে গেছে। সেদিক থেকে এত দর কিন্তু এই বাজারে আশা করা যায় না।'

'খদ্দেরটি ইহুদি,' বাবার কথায় রিণা চাপা বিদ্বেষের স্বাদ গন্ধ পেল না, 'তাই বেশি দর দিতে চাইছে।'

'অতবড় বাড়িতে আমাদের দরকার নেই বাবা,' রিণা বলল, 'তুমি ছাড়া পাবার পরে আমরা আর ওখানে থাকবনা।'

'ধার দেনা আর স্ট্যান হোয়াইটের পারিশ্রমিক মেটানোর পরে আমাদের হাতে খুব বেশি টাকা থাকবেনা, বড়জোর দশ হাজার ডলার, তার বেশি নয়।'

'খুব বেশি টাকা আমাদের দরকার হবে না। বাবা,' রিণা বলল, 'তুমি যতদিন না আবার দাঁড়াও ততদিন ঐ কম টাকাতেই আমরা চালিয়ে নেব।'

'তুমি চাইলেও আমায় কে দাঁড়াতে দেবে?' এতক্ষণ বাদে বাবার গলা তিক্ত শোনাল, 'নতুন করে দাঁড়ানোর সুযোগই বা কে দেবে আমায়? আমি ত এখন আর ব্যাংকার নই। জেলের কয়েদি।'

'ও ভাবে বোলনা বাবা!' তীক্ষ্ণ গলায় প্রতিবাদ করল রিণা, 'সবাই জানে যা কিছু ঘটেছে তার জন্য তুমি দায়ী নও, সব দোষ তুমি নিজের কাঁধে যেচে নিয়েছো তাও কারও জানতে বাকি নেই।'

'তাতেই ত পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে,' বিকৃত গলায় বললেন হ্যারিসন মার্লো, 'চোর হয়ে সাজা ভোগ করা আর কি বিনা দোষে মূর্খের মত সব দোষ মেনে সাজা ভোগ করা। দুটো দু'রকম।'

'এখন বুঝতে পারছি বাড়িতে তোমায় একা রেখে ইওরোপে বেড়াতে যাওয়া আমার মোটেই উচিত হয়নি। অমি বাড়িতে তোমার পাশে থাকলে হয়ত এই সংকটে তোমায় পড়তে হত না।'

'তুমি নও, মা, আসলে আমিই তোমার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিনি। চিন্তা ভাবনা করার অখণ্ড অবকাশ আছে এখানে। রাতের ঘুম ত কবেই ঘুচেছে, তুমি এখন কি করবে, কে তোমায় দেখবে, শুয়ে শুয়ে এসব ভেবেই আমার অনেক রাত কেটেছে।'

'আমায় নিয়ে তুমি অত ভেবোনা, বাবা। যে কোনও একটা কাজ আমি ঠিক জুটিয়ে নেব।'

'কাজ জোটানো কি অতই সোজা? এখনও তোমার কিছুই শেখা হয়নি। বয়স বাড়ছে, আর কিছু না হোক, একটা ভাল ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে অন্তত দিতে পারতাম। আমার জন্য তাও মাটি হল।'

'বিয়ের কথা কখনও আমার মনে ঠাঁই পায়নি, বাবা।' গরাদে মাথা ঠেকিয়ে হাসল রিণা, 'বোস্টনের কমবয়সী ছেলেছোকরাদের সবাইকে কচিখোকা মনে হচ্ছে যাদের মুখ শুঁকলে এখনও দুধের গন্ধ পাওয়া যায়। ওদের একজনও আমার উপযুক্ত নয়, বাবা। যদি সত্যিই কখনও বিয়ে করলে এমন কাউকে করব যে হবে তোমার সমবয়সী। জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ।'

'বড্ড চাপ পড়ে গেছে মা তোমার ওপর,' গরাদের ওপাশ থেকে স্নেহঝরা চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন হ্যারিসন, 'চোখে মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ ফুটে উঠেছে। এখন তোমার কিছুদিন ছুটি দরকার।'

'আগে তুমি বাড়ি ফিরে এসো তখন তুমি আর আমি দু'জনেই ছুটি কাটাতে যাব ইওরোপে। এমন জায়গার খোঁজখবর আমি জানি যেখানে মাত্র দু'শো ডলারেরও কম টাকা খরচ করে পুরো একটা বছর আমরা কাটাতে পারব।'

'আমার বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হ্যারিসন, 'কিন্তু তোমার যে এখনই বিশ্রামের জন্য ছুটি দরকার, সোনা।'

'মনে হচ্ছে তুমি কিছু বলতে চাইছো, বাবা,' রিণা বলল, 'চেপে না রেখে খুলে বলো।'

'তোমার ফস্টার কাকাকে ত জানো, আমি ওকে চিঠি লিখেছিলাম। ফস্টার সে চিঠির

জবাবে লিখেছে ও আর ওর বৌ বেটি দু'জনেরই ইচ্ছে তুমি ওদের কাছে গিয়ে থাকো। ওরা যেখানে থাকে সে জায়গাটা ভারি সুন্দর। মেয়াদ শেষ করে যতদিন না বেরাচ্ছি ততদিন পর্যন্ত ওরা তোমাকে নিজেদের কাছে রাখতে চায় বলে লিখেছে।

'কিন্তু তখন ত আর আমি এখানে দেখতে আসতে পারবনা।' বাবার হাতের নাগাল পেতে গরাদের ভেতর নিজের হাত ঢুকিয়ে দিল রিণা।

'সে না হয় নাই হল।' তার হাতে মৃদু চাপ দিলেন হ্যারিসন, 'কিন্তু তাতে তোমার ভালই হবে।

তুমি নিশ্চিন্ত আছো জেনে আমার দুর্ভাবনা কমবে, নিজেদের লোক কাছে পেয়ে তোমারও মনের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল হবে।'

'কিন্তু বাবা—'

দেখা করার সময় ততক্ষণে শেষ, ভারি বুটের আওয়াজ তুলে প্রহরী এগিয়ে এল হ্যারিসনকে তাঁর সেল-এ নিয়ে যেতে।

'বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে যা যা করণীয় সব স্ট্যান হোয়াইটকে আমি লিখে জানিয়েছি,' বলতে বলতে হ্যারিসন মার্লো উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার কথা শুনে তোমার চলতে হবে তোমার ফস্টারের কাছে গিয়ে থাকতে হবে।' কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। রিণাকে আর একটি কথাও বলার সুযোগ না দিয়ে এগিয়ে চললেন প্রহরীর সঙ্গে। ঝাপসা চোখে পেছন থেকে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল রিণা। এরপর বহুদিন বাপবেটিতে আর দেখাসাক্ষাৎ হলনা। কয়েকমাস বাদে বিয়ের পরে ইওরোপে হনিমুনে রওনা হবার আগে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে স্বামিকে জেলখানায় নিয়ে এল রিণা।

'বাবা,' লজ্জাজড়ানো গলায় মাঝবয়সী পুরুষটিকে দেখাল রিণা, 'ইনি কর্ড এক্সপ্লোসিভস-এর মালিক জোনাস কর্ড। আমাদের বিয়ে হয়েছে, হনিমুনে ইওরোপ যাচ্ছি। যাবার আগে জোনাসকে তোমায় দেখাতে নিয়ে এলাম।'

রিণার স্বামি! হ্যারিসনের মনে হল সমবয়সী নয়, লোকটি বয়সে তাঁরও বড়। বয়স যাই হোক, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব সব দিক থেকে যৌবন এখনও টিকে আছে তার ভেতরে। বেশি বয়সেও যৌবনকে ধরে রাখার এই বৈশিষ্ট্য শুধু ওয়েস্টার্ণদের মধ্যেই দেখা যায়।

'আমাদের কাছে কিছু চাইবার থাকলে তা নিঃসংকোচে বলো, বাবা!'

'বলুন, মিঃ মার্লো,' জোনাস কর্ড বললেন, 'আপনার জন্য আমাদের কিছু করার থাকলে বলুন।'

'অশেষ ধন্যবাদ, না, আমার চাইবার কিছু নেই।'

তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী নীল চোখের চাউনি মেলে হ্যারিসন তাকালেন জোনাস কর্ড-এর দিকে।

'মিঃ মার্লো' আমার কারবার বাড়ছে,' বললেন জোনাস কর্ড, 'এখান থেকে যাবার আগে কাজকর্ম সম্পর্কে যদি কিছু ভেবে থাকেন ত তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলছি, আপনার মত ব্যবসায় অভিজ্ঞ একজন লোকই আমার দরকার। কারবার বাড়াবার মুখে একা সবদিক আমার পক্ষে সামলানো হয়ে উঠছেনা।'

'আপনি সত্যিই দয়ালু মিঃ কর্ড।'

'আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি,' রিণার মুখের দিকে তাকালেন জোনাস। 'তুমি এই ফাঁকে বাবার সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে নাও।'

রিণা ঘাড় নেড়ে সায় দিতে জোনাস কর্ড বিদায় নিয়ে বাইরে গেলেন। বাবা আর মেয়ে দু'জনের বেশ কিছুক্ষণ বিহ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল একে অপরের দিকে। খানিকবাদে রিণাই প্রথম বলল, 'আমার বরকে কেমন দেখলে, বাবা?'

'এ তুই কি করলি রিণা?' আক্ষেপের সুরে বললেন হ্যারিসন, 'এত আমার বয়সী লোক?'

'জেনেশুনেই ওকে বিয়ে করেছি, বাবা,' রিণা বলল, 'আগেই ত বলেছিলাম সমবয়সী ছেলেদের আমার কচি বাচ্চা ছেলে মনে হয়। আগেই বলেছিলাম বেশি বয়সের কোনও পুরুষকে বিয়ে করব জীবন সম্পর্কে যে রীতিমত অভিজ্ঞ।'

'কিন্তু-কিন্তু তুমি ত ওর মেয়ের সমান। তোমার বয়স খুবই কম, জীবনের পুরোটাই পড়ে আছে তোমার সামনে। সব জেনেশুনে ওকে বিয়ে করলে কেন?'

'লোকটা প্রচুর টাকা আর বিষয় সম্পত্তির মালিক, বাবা।' রিণা হাসল, 'তাছাড়া ও বড্ড একা।'

'শুধু এই কারণে?' বলেই হ্যারিসনের মনে পড়ল খানিক আগে জোনাস তাঁকে ভাল অফার দিয়েছেন, নাকি উনি আমার নতুন করে দাঁড়াবার সুযোগ দেবেন সেকথা জেনে?'

'না বাবা' রিণা কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিল, 'ওঁকে বিয়ে করার সেটাই কারণ নয়।'

'তা হলে কারণটা কি?'

'দেখলাম আমার দায়িত্ব নেবার একমাত্র উপযুক্ত লোক হল জোনাস,' চোখ নামিয়ে শান্ত গলায় বলল রিণা।

'কিন্তু রিণা—'

'কেন বাবা, তুমিই ত বলেছিলে নিজের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আমার নেই আর তাইত তুমি আমায় ফস্টার কাকার কাছে পাঠাতে চেয়েছিলে। কেমন? ঠিক বলেছি ত, বাবা?'

হ্যারিসন মার্লো এর জবাবে কিছুই বলতে পারলেন না, মেয়ের হনিমুন যাবার শুভমুহূর্তে আর কোনও জবাব খুঁজে পেলেননা তিনি। আরও খানিকক্ষন নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে রিণা বিদায় নিল তাঁর কাছ থেকে।

নিজের সেল-এ ফিরে এসে পলকা কাঠের বাংকে শুয়ে পড়লেন হ্যারিসন মার্লো, পুরু কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কড়িকাঠের দিকে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যেন ছুরির মত বিঁধেছে তাঁর বুকে—কলজে, ফুসফুস, একে একে সব যেন বিদীর্ণ হচ্ছে তার আঘাতে। রিণার প্রতি কি তিনি কোনও ভুল বা অন্যায় করেছেন যা শোধরানো সম্ভব নয়? বারবার এই প্রশ্ন কুরে কুরে খেতে লাগল তাঁকে। বেশিক্ষণ একদৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না হ্যারিসন। দু'চোখ জলে ভরে উঠতে পাশ ফিরে শুলেন তিনি। খড়ের বালিশে মুখ গুঁজে শিশুর মত অসহায়ভাবে কাঁদতে লাগলেন। ওদিকে ছুরির ফলার মত যে ঠাণ্ডা অনুভূতি তাঁকে বিদ্ধ করেছে তার আঘাত ক্রমে বাড়তে লাগল। রাতে খেতে না যাওয়ায় রক্ষি এল খোঁজ নিতে। আলতো করে ঠেলতে তার হাতে লাগল ছ্যাঁকা; কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

সে রাতে জেল হাসপাতালে হ্যারিসন মার্লোকে যখন ভর্তি করা হল তখন তাঁর জ্বর

১০২ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে জেলের ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন ব্রংকো নিউমোনিয়া। তিনদিন বাদে জেল হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন হ্যারিসন মার্লো, তাঁর মেয়ে জামাই তার দু'দিন আগে পা রেখেছে ইওরোপের মাটিতে।

১৩

স্বপ্নে প্রিয়জনকে কাছে পাওয়া, হারানো দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া যেন পটে আঁকা সুন্দর নিসর্গচিত্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকার তৃপ্তি বয়ে আনে। তারপরে আচমকাই মাথার ভেতরে কোথায় এক অদেখা বেদনার দপদপানি ঘুমের ভেতরে কানের দু'পাশে রগে আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনি তুলল। পটে আঁকা সুন্দর নিসর্গচিত্রে ঢেলে দেয়া ক'ফোঁটা কুৎসিৎ কালো কালির লেপটে যাওয়া স্বপ্নের ভেতর স্পষ্ট টের পেল রিণা, সঙ্গে সঙ্গে নাচের তাল কাটার মত ঘুমের রেশ গেল ছিঁড়ে। চোখ মেলতেই যাদুর মত সব, সবাই উধাও, সীমাহীন নিঃসঙ্গতা গ্রাস করতে এল তাকে বীভৎস প্রেতের মত দু'হাত বাড়িয়ে।

চারপাশে চোখ বোলাতে গোড়ায় অনেক কিছু অচেনা ঠেকল, তারপরেই মনে পড়ল এটা হাসপাতাল। খাটের মুখোমুখি ড্রেসারে ফুলদানিতে নতুন একগোছা ফুল রাখা, আগে তো ছিলনা। তাহলে নিশ্চয়ই আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন কেউ এগুলো এনেছে, মনে মনে ভাবল রিণা। মাথা অল্প হেলাতে দেখল জানালার ধারে বসে ঝিমুচ্ছেন আইলিন। জানালায় কাচের ওপাশে রাতের আকাশ ঘুটঘুটে কালো, এক আধটা তারার উজ্জ্বল ঝলকির হদিস আর নেই সেখানে।

মাথাটা বড্ড ধরেছিল,' চাপা কিন্তু স্পষ্টগলায় বলে উঠল সে, 'অ্যাসপিরিন দাওনা!'

সঙ্গে সঙ্গে আইলিনের ঝিমুনি গেল কেটে, চোখ মেলে তাকালেন রিণার দিকে।

'পুরো বিকেল ঘুমিয়ে কাটিয়েছি,' বিষণ্ণ হাসি ফুটল রিণার ঠোঁটে।

'পুরো বিকেল?' আইলিন যেন অবাক হলেন—হপ্তায় এই প্রথম রিণাকে সজ্ঞানে দেখলেন তিনি। 'পুরো বিকেল?' আবার প্রশ্ন করলেন আইলিন।

'হ্যাঁ,' বলল রিণা, 'বড্ড ক্লান্ত লাগছিল। আরও দেখছি দিনের বেলায় ঘুমোলেই মাথা ধরছে। অ্যাসপিরিন দাও না!'

'আমি এক্ষুনি নার্সকে ডাকছি।'

'থাক, আমিই ডাকছি,' বলল রিণা। মাথার ওপরে খাটের সঙ্গে আঁটা কলিং বেল, বোতাম টিপলেই নার্স ছুটে আসবে। কলিং বেল-এর বোতাম টিপতে ডান হাত তুলতে গেল রিণা, কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও হাত তুলতে পারল না। ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল ডান হাতখানা খাটের সঙ্গে বাঁধা, কব্জির কিছু পরে সূঁচ বেঁধানো, সেই সূঁচের পেছনদিক একটা সরু নলের সঙ্গে আঁটা, শিয়রের কাছে দাঁড় করানো স্ট্যান্ডে ওল্টানো বোতল থেকে কোনও জলীয় পদার্থ নল হয়ে সূঁচের ভেতর দিয়ে ঢুকছে হাতে।

'এটা কি ব্যাপার?' ইশারায় হাতে বেঁধানো সূঁচ দেখিয়ে জানতে চাইল রিণা।

'ঘুম না ভাঙ্গিয়ে আপনাকে খাওয়ানোর জন্য ডাক্তার এই ব্যবস্থা করেছেন,' বলেই হাত বাড়িয়ে কলিং বেল-এর বোতাম টিপলেন আইলিন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল নার্স, পরমুহূর্তে কেবিনে ঢুকে আইলিনের পাশে দাঁড়িয়ে রিণার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'ঘুম হল?'

'হ্যাঁ, ঘুম হল,' আধো আধো গলায় জবাব দিল রিণা, 'আপনি এখানে নতুন এসেছেন, তাই না? আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছেনা।'

'আমার ডিউটি, আমি রাতের বেলা থাকি,' আড়চোখে আইলিনের দিকে অর্থপূর্ণ চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে জবাব দিল নার্স।

হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে এই নার্সই যে তার সেবা করছে তা এইমুহূর্তে ভুলে গেছে রিণা।

'দুপুরে ঘুমোলেই দেখছি ভীষণ মাথা ধরছে,' রিণা বলল, 'অ্যাসপিরিন খেলে কেমন হত ভাবছি।'

'আমি এখুনি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি,' নার্স বলল।

'আপনার নিশ্চয়ই ক্লান্ত লাগছে?' আইলিনের দিকে তাকাল রিণা, 'সেই কখন থেকে বসে আছেন এখানে, এবারে বাড়ি যান, গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন।'

'আমি মোটেও ক্লান্ত হইনি।' বললেন আইলিন, 'আপনি যেমন ঘুমিয়েছেন আমিও তেমনই সারা দুপুর বসে ঝিমুচ্ছিলাম।'

গুড ইভনিং, মিস মার্লো,' বলতে বলতে ডাক্তার ঢুকলেন কেবিনে, 'দুপুরে ভাল বিশ্রাম নিয়েছেন ত?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার,' হাসল রিণা, 'আর তার ফলে শুরু হয়েছে মাথা ধরা। মাথাধরাটা কেমন যেন অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত?' বলতে বলতে এগিয়ে এলেন ডাক্তার, রিণার নাড়ি ধরে ঘড়ির দিকে তাকালেন, 'অদ্ভুত মনে হচ্ছে কেন?'

'অদ্ভুত মনে হচ্ছে কারণ কোনও লোক বা জায়গার নাম যতবার মনে করার চেষ্টা করছি ততবার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।' ইশারায় আইলিনকে দেখাল সে, 'আপনার নাম জানি, ওরটাও জানি, কিন্তু মুখে আপনার নাম যতবার বলতে যাচ্ছি ততবার ব্যাথাটা ফিরে ফিরে আসছে আর আমিও নামটা ভুলে যাচ্ছি, অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারছিনা।'

'এটা তেমন অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক কিছু নয়,' ডাক্তার হেসে নাড়ি ছেড়ে দিলেন, 'কিছু কিছু মাইগ্রেণের মাথাব্যথায় এমন হয় যখন চেনা লোকের নামও লোকে ভুলে যায়। এবার আপনার চোখটা একবার দেখব।' বলতে বলতে পকেট থেকে অপথ্যালমোস্কোপ বের করে ঝুঁকে পড়লেন ডাক্তার, 'চোখে বেশি চাপ পড়ার ফলেই মাথাব্যথাটা হচ্ছে কিনা এখুনি বুঝতে পারব, আপনি যেন আবার ঘাবড়ে যাবেন না,' বলে বাঁ হাতের তর্জনি আর বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে রিণার চোখের চামড়া অল্প তুললেন। ডান হাতে ধরা যন্ত্রের বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে সুঁচের মত সরু আলোর রেখা ঠিকরে পড়ল রিণার চোখের মণিতে।

'আপনার নাম কি?' হালকা গলায় বললেন ডাক্তার।

'ক্যাট্রিনা ওসটারল্যাগ,' চটপট জবাব দিল রিণা, 'দেখেছেন ত ডাক্তার, অন্যের নাম ভুলে গেলেও মাথাব্যথার সময় নিজের নাম আমার ঠিক মনে থাকে।'

'আপনার বাবার নাম কি?' রিণার অন্য চোখে আলো ফেলে জানতে চাইলেন ডাক্তার।

'হ্যারিসন মার্লো। দেখলেন ত, এবারেও ঠিক বলেছি।'

'আপনার নিজের নাম বলুন।'

'রিণা মর্লো,' বলেই হাসল সে, 'আপনি আমার সঙ্গে মজা করছেন?

'না, মজা করতে আমি আসিনি,' আলোটা নিভিয়ে ডাক্তার হাসলেন, 'সে ক্ষমতাই আমার নেই।' তিনি সরে দাঁড়াতে দু'জন মেডিক্যাল অ্যাটেন্ড্যান্ট একটা বড় ভারি চৌকো যন্ত্র ধরাধরি করে নিয়ে এল কেবিনের ভেতরে, রিণার খাটের পাশে যন্ত্রটা নামিয়ে রাখল ওরা।

'এর নাম ইলেকট্রো এনসিফ্যালোগ্রাফ,' যন্ত্রটা ইশারায় দেখিয়ে বললেন ডাক্তার, 'মগজের ভেতরে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক আবেগ পরিমাপের কাজে এটা লাগে। মাথাব্যথা কেন হচ্ছে, তার উৎস কোথায়, এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে এর সাহায্য অপরিহার্য। এর রিপোর্ট পেলে চিকিৎসা করা আমাদের পক্ষে সহজ।'

'এতে কষ্ট করার চেয়ে অ্যাসপিরিনের কটা বড়ি গিলে ফেললেই ব্যথা কমে যেত,' বলল রিণা।

'আমরা ত ডাক্তার নাকি?' হাসলেন ডাক্তার, 'এই যে এত মোটা ফি আদায় করছি আপনার কাছ থেকে, তার বিনিময়ে ভাল করে চিকিৎসা না করলে চলবে কি করে? ক'টা বড়ি গিলিয়ে দিলেই কি ফল পাওয়া যাবে?'

রিণা জবাব না দিয়ে হাসল। ডাক্তার একটি কথাও না বলে আইলিনের দিকে চেয়ে ইশারায় কিছু বোঝাতে চাইলেন। অ্যাটেন্ড্যান্ট দু'জন তৎক্ষণে যন্ত্রটা চালু করতে এই প্লাগ আঁটছে, সেই সুইচ চালু করছে। ডাক্তার বেরিয়ে যাবার কয়েক মুহূর্ত পরে আইলিনও বাইরে বেরিয়ে কেবিনের দরজার পাল্লা দুটো বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দিলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক্তারের খাস কামরায় তাঁর মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন আইলিন।

'আপনাকে বলতে বাধা নেই,' ডাক্তার অল্প কেসে গলা সাফ করে বললেন, 'পেশেন্টের মগজের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হবার চিহ্ন স্পষ্ট দেখলাম, এর ফলেই লোকের নাম, জায়গার নাম মনে করতে ওঁর কষ্ট হচ্ছে। নিজের অজান্তে ওঁর মন সেসব মনে করার চেষ্টা করছে আর তারই ফলে দেখা দিচ্ছে মাথাব্যথা।'

'কিন্তু আজ প্রায় এক হপ্তা পরে ত ওঁকে স্বাভাবিক মনে হল,' ব্যাকুল শোনাল আইলিনের গলা।

'গোড়া থেকেই আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে ওঁর শুশ্রূষা করছেন দেখেছি তাই ওঁর সেরে ওঠার জন্য আপনি কতটা চিন্তিত তা আমি জানি, মানুষের শরীর একটা অদ্ভুত যন্ত্র, আর সবার যন্ত্রের ক্ষমতা কিন্তু একরকম না। আসলে রোগের সঙ্গে লড়াই করার সহজাত ক্ষমতা ওঁর অপরিসীম তাই এখনও মুখ বুঁজে সব সইতে পারছেন। উনি প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছেন। এ জ্বরের বৈশিষ্ট্য হল সামনে যা পড়ে তাই ধ্বংস করে। আপনি কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে আসার আন্দাজ মিনিট কুড়ি পরে ওঁর তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করেছিল। নার্সের মুখে শুনে আমি তখনই গিয়ে ওঁকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছি।'

'আর কতদিন ওঁকে এইভাবে কষ্ট পেতে হবে ডাক্তার?' চাপা গলায় মিনতির সুরে বললেন আইলিন।

'জানিনা,' আইলিনের হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন ডাক্তার, 'তার চেয়ে চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। বিশ্বাস করুন উনি ঘুমোচ্ছেন, আজকের রাতটুকু আরামেই ঘুমোবেন। আজ আপনার করার মত কিছু নেই।'

'যাবার আগে একটিবার ওঁকে দেখে আসি,' দ্বিধা জড়ানো গলায় বললেন আইলিন।

'যেতে চাইছেন যান, কিন্তু হুঁশিয়ার! ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ঘাবড়ে গিয়ে কান্নাকাটি জুড়বেন না যেন! আপনি ওঁর কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার পরেই যন্ত্রটা চালু করা হয়েছে, আর তার আগে মিস রিণার মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলা হয়েছে!'

অফিসের দরজা ভেজিয়ে আইলিন ডেসকের সামনে এলেন। নতুন ছবির কয়েকটি নারী চরিত্রের পোষাকের নমুনার কিছু হাতে আঁকা স্কেচ ডেসকের ওপর পড়ে আছে, তিনি অনুমোদন করলে তবেই ওসব তৈরির কাজে হাত লাগানো হবে। আলো জ্বালিয়ে ঘরোয়া বার-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি, গ্লাসে খানিকটা স্কচ নিয়ে কয়েকটি বরফের কিউব ঢাললেন, তারপর গ্লাস হাতে ফিরে এলেন ডেসকের সামনে। চেয়ার টেনে বসে গ্লাসে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে স্কেচগুলো খানিকক্ষণ দেখলেন খুঁটিয়ে। খানিকবাদে সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেল। খানিক তফাতে দাঁড় করানো পেডেস্টাল, নতুন পোষাক গায়ে চড়িয়ে মডেলরা তার ওপর দাঁড়ায়। গ্লাস হাতে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আইলিন, স্কেচ-এর পোষাক কোন মডেলকে পরলে মানাবে কল্পনা করতে গিয়ে দু'চোখ জলে ভরে এল। আইলিনের কল্পনায় স্পষ্ট ভেসে উঠল রিণার অবয়ব, স্কেচ-এর পোষাকগুলো পরে পেডেস্টালে দাঁড়ানো রিণা, ঘরের উজ্জ্বল আলো পড়েছে তার মাথায়, কিন্তু লালচে সোনালি চুলের একটি গুছিও নেই সেখানে, ডাক্তারের নির্দেশে রিণার মাথা কামিয়ে ফেলা হয়েছে।

'হা ঈশ্বর!' চাপা আক্ষেপ বেরিয়ে এল আইলিনের গলা দিয়ে, ছাদের দিকে মুখ তুলে কান্নাচাপা গলায় বললেন, 'যেখানে যা কিছু সুন্দর সব ধ্বংস করার এই নেশা তোমার কবে ঘুচবে? একমাথা লালচে সোনালি চুল ছাড়া জনম-দুখী মেয়েটার তো আর কিছুই ছিলনা, তাও এমনি নিষ্ঠুরের মত তুমি কেড়ে নিলে?'

তাঁর আক্ষেপ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কানে পৌঁছোল কিনা কে জানে, তবে চোখের জলের ধারায় জেগে উঠল আইলিনের শিল্পী সত্ত্বা। রিণার প্রথমবার পেডেস্টালে দাঁড়ানোর চেহারা বহুদিন বাদে আবার ফুটে উঠল তাঁর কল্পনায়—মাথায় কাঁধ ঝাঁকানো লালচে সোনালি চুল, ধপধপে সাদা রেশমী পোষাকের আবরণে ঢাকা উদ্ধত শরীরে রিণা এসে দাঁড়িয়েছে পেডেস্টালে মাত্র পাঁচ বছর আগে। সেদিনের তার পরনের সাদা রেশমী পোষাকটি আসলে ছিল রিণার গাউন। নেভাদা স্মিথকে বিয়ে করার ক'দিন আগের ঘটনা।

১৪

লণ্ডনে নিজের অফিসের ছোট স্ক্রিনিং রুমে বসে জোনাস কর্ড মুখ তুলে তাকাল সামনের পর্দার দিকে। অন্ধকার ঘরে প্রোজেক্টরের ঠিকরে পড়া আলোয় রূপোলি পর্দার বুকে ফুটে উঠল গির্জার ছবি। বাইরে জনতার ভিড়, তাদের চোখে মুখে উপচে পড়ছে কৌতূহল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল ঘোষকের গলা—

'বার্নার্ড বি নংম্যান রিলিজের ছবি 'পলাতক'-এর নায়ক নায়িকা নেভাদা স্মিথ ও রিণা মার্লোর বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এই গির্জাতেই, যে অনুষ্ঠান দেখতে অগুনতি চলচ্চিত্রপ্রেমী নমেত গোটা হলিউড চাপা উত্তেজনায় অপেক্ষা করছে...

ঘোষণার মাঝখানে তুষারধবল এক সাদা ঘোড়ায় চেপে হাজির হল নেভাদা, পরনে

কুচকুচে কালো কাউবয় স্যুট, গির্জার সিঁড়ির সামনে ঘোড়া থেকে নামতেই জনতার উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। নেভাদার প্রিয় ফ্যানেরা অনেকেই তার ধারেকাছে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু পুলিশ তাদের ঠেকিয়ে রাখল। প্রায় একই সময়ে একখানো কালো লিমুজিন এসে দাঁড়াল গির্জার সামনে, দরজা খুলে নামল বার্নার্ড (বার্ণি) নরম্যান, বিয়ের গাউন পরা রিণাকে ধরে ধরে নামিয়ে আনল সে।

নেভাদা আর রিণাকে দু'পাশে নিয়ে গির্জার ভেতরে ঢুকল বার্ণি, এরপরে পর্দার বুকে ভেসে উঠল নেভাদার বিলাসবহুল বাড়ি, সেখানে থেকে ক্যামেরার লেন্স ফিরে এল গির্জার সামনে, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো চলচ্চিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রী, আর খবরের কাগজের রিপোর্টার, ফোটোগ্রাফার আর হিতৈষীদের মুখ আলাদাভাবে তুলে ধরল পর্দার বুকে। আরও খানিক বাদে দেখা গেল বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে গির্জার বাইরে বেরিয়ে এসেছে রিণা আর নেভাদা, খানিক আগের মতই দু'পাশে দু'জনকে নিয়ে দাঁড়াল বার্ণি নরম্যান। টকটকে লাল গোলাপের মালাখানা গলা থেকে খুলে অদূরে দাঁড়ানো গুণমুগ্ধদের দিকে রিণা ছুঁড়ে দিতেই মাথায় লালচুল এক যুবতী তা লুফে নিল। ক্যামেরা যুবতীর কাছে এগিয়ে এল। ঘোষক জানাল যুবতী রিণার বান্ধবী, নাম অ্যালা ব্যারি, 'পলাতক' ছবির এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে সে অভিনয় করেছে। মেয়েটির কাজে খুশি হয়ে পরপর আরও কয়েকটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য নরম্যান পিকচার্স তার সঙ্গে চুক্তি করেছে।

ক্যামেরা এরপরে বাইরে থেকে চলে এল থিয়েটারের ভেতরে—বরকনের মাঝখানে অভিভাবকের মত দাঁড়িয়ে বার্ণি নরম্যান, তাঁর এক হাত পরম স্নেহের ভঙ্গিতে জড়িয়ে আছে নেভাদার গলা, অন্য হাতটি দেখা না গেলেও তা যে কণের পেছনে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পর্দার বুকে দৃশ্যটি মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনিং রুমের সব আলো জ্বলে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জোনাস কর্ড, এই মুহূর্তে পেটের ভেতর তার দারুণ অস্বস্তি হচ্ছে। ছবির শেষদৃশ্যের প্রতিক্রিয়া তাতে সন্দেহ নেই। বাস্তবে বরকনের ছবি তোলার মুহূর্তে বার্ণি নরম্যানের অন্য হাতের আঙ্গুলগুলো যে সবার নজর এড়িয়ে রিণার পাছায় সুড়সুড়ি দিচ্ছিল পর্দার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা সত্ত্বেও তা টের পায়নি জোনাস।

পলাতক ছবিখানা বাণিজ্যিক সাফল্য পেল ঠিকই কিন্তু ছবি তোলার খরচ অস্বাভাবিক তাই ওয়েস্টার্ণ ছবি তোলার বাজারে দেখা দিল মন্দা। ফলে দুর্দ্ধর্ষ অভিনয় করা সত্ত্বেও ঐ জাতীয় ছবির আর কোনও অফার না পেয়ে হতাশ হতে হল নেভাদাকে। হাতে নতুন কাজকর্ম না এলে শেষকালে সে তার ওয়াইল্ড ওয়েস্ট শো নিয়ে মেতে ওঠার সিদ্ধান্ত নিল। আড়াই লাখ ডলার খরচা করে বাড়ি বানানোর জন্যে এখন নেভাদায় নিজের হাত কামড়াতে হচ্ছে—ঐ বাড়ি বজায় রাখতে গেলে মাসে কম করে দু'হাজার ডলার খরচা বাঁধা। বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবার পরেপরেই রিণার সঙ্গে নেভাদার ছাড়াছাড়ি হল, সাময়িকভাবে হোটেলে গিয়ে উঠল রিণা, সেখান থেকে আইলিনের বাড়িতে। নেভাদাকে কষ্ট না দিতে রিণা নিজেই বনিবনার অভাবের অজুহাত দেখিয়ে আদালতে ডিভোর্সের আবেদন করল, অল্প সময়ের মধ্যে সে আবেদন মঞ্জুরও হল।

১৫

সত্যি বলতে কি, রিণা মার্লোর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে পর্যন্ত প্রৌঢ়া মা আর নাটক

ছাড়া অন্য কোনও আকর্ষন ছিল না ক্লড ডানবারের জীবনে। হ্যামলেট সমেত শেকসপিয়ারের বেশ কয়েকটি মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক নাটক সে প্রযোজনা করেছে, ঐসব নাটকের পাত্রপাত্রীদের আধুনিককালের পোষাক পরিয়ে, সংলাপে হাল আমলের বাক্যাংশ জুড়ে সমসাময়িক নাট্যামোদী মহলে কিছু খ্যাতিও কুড়িয়েছে। 'সানস্পটস' নামে একটি নাটক প্রযোজনা করতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে ক্লড রিণার সংস্পর্শে এল।

সানস্পটস নাটকে চরিত্র মাত্র তিনটি— বিশাল মরুভূমির প্রান্তের বাসিন্দা দুই পেশাদার প্রসপেক্টর বা খনি খোঁজারু, এদের দু'জনের মাঝখানে এসে জুটেছে এক কমবয়সী যুবতী যে নিজের পূর্ব স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে। খনি খোঁজারু দু'জনের মধ্যে বয়স্ক লোকটি মার্কামারা লম্পট, তার কুনজর পড়েছে মেয়েটির দিকে। লম্পটের হাত থেকে মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়ে কমবয়সী খোঁজারু নিজে মেয়েটির প্রেমের বশীভূত হল, এই হল গল্পের সারসংক্ষেপ।

পুরোপুরি সংলাপনির্ভর কাহিনী, পুরো একটি বছর সাফল্যের সঙ্গে ব্রডওয়েতে চলার পরে বার্ণি নরম্যানের মুখ থেকে ক্লড ডানবার জানল চলচ্চিত্রে রূপ দেবার উদ্দেশ্যে সে নাটকটি কিনেছে এবং ঐ ছবির পরিচালনার দায়িত্ব সে তাকেই দিতে চায়। কোনরকম চিন্তাভাবনা না করে ক্লড বার্ণির প্রস্তাবে রাজি হল। ক্যালিফোর্ণিয়ায় পৌঁছে ক্লড জানাল ছবির নায়িকা চরিত্রে রূপ দেবে রিণা মার্লো।

'রিণা মার্লো?' ক্লড যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'কিন্তু আপনি ত আগে বলেছিলেন নায়িকার ভূমিকায় বেটি ডেভিসকে নেবেন।'

'তাই ঠিক ছিল।' বলল বার্ণি, 'কিন্তু ওয়ার্ণার ব্রাদার্স আগে থেকে খবর পেয়ে ডেভিসকে এমন চুক্তির বাঁধনে বেঁধেছে যার ফলে ওঁকে পাবার কোনও সম্ভাবনাই দেখছিনা। তাই রিণার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছি।'

'তা ত বুঝলাম,' ক্লড ওজর তুলতে চাইল, 'কিন্তু উনি কি এই স্মৃতিভ্রষ্ট মেয়েটির চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারবেন?'

'ক্লড, আপনি ভুলে যাচ্ছেন রিণা এর আগে কয়েকটা ছবিতে ভাল অভিনয় করেছে। বলতে পারেন চলচ্চিত্রে অভিনয় আর মঞ্চে অভিনয় এক নয়। সেই যুক্তি মেনে নিয়ে ও বলতে বাধ্য হচ্ছি, অভিনয় ক্ষমতা থাকলে তবেই ও দু'টি ক্ষেত্রে কোনও একটিকে আয়ত্ত করা যায়, রিণার সে ক্ষমতা আছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তা হলেও বলছি আপনি নিজে একবার গিয়ে দেখা করুন রিণার সঙ্গে, আজই চিত্রনাট্য নিয়ে চলে যান ওঁর বাড়িতে।'

রিণার পরনে গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা আঁটোসাটো কালো লিওটার্ড, লালচে সোনালি চুল টেনে মাথার পেছনে বাঁধা। মুখে এতটুকু মেক আপ নেই তা ক্লড ডানবারের চোখ এড়ালনা। ড্রইংরুমে ঢুকেই রিণা বন্ধুত্বের হাত বাড়াল তার দিকে, হেসে বলল, 'আপনার নাম আগে শুনেছি।'

'আমি শুধু আপনার নাম শুনেছি তাই নয়,' পাল্টা হেসে রিণার বাড়িয়ে দেয়া হাত নিজের মুঠোয় ধরল ক্লড।

'আপনার অভিনিত সবক'টি ছবি আমার দেখা। বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, বলতে পারেন মিঃ নরম্যানই আমায় পাঠিয়েছেন।'

'বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আপনি 'সানস্পটস'-এর চিত্রনাট্য পড়েছেন?'

ঘাড় নেড়ে রিণা জানাল সে পড়েছে।

'মরুভূমির বুকে দুই খনি খোঁজারুর শিবিরের মাঝখানে হাঁটতে হাঁটতে যুবতী মেয়েটির সংলাপের প্রথম লাইনটা মনে আছে?

'আছে।'

'এই যে চিত্রনাট্য,' টাইপ করা একগোছা কাগজ এগিয়ে দিল ক্লড, 'এটা দেখেই পড়ুন।'

'আমার নাম মেরি,' চিত্রনাট্যের দিকে না তাকিয়ে বলল রিণা, 'হ্যাঁ, এটাই ত লেখা ছিল—'মনে হচ্ছে আর নাম মেরি।'

'হুঁস্!' ভুরু কুঁচকে রিণার দিকে তাকাল ক্লড, 'কিন্তু এত গড়গড় করে শুধু পড়ে গেলেন, সংলাপের অর্থ বুঝলেন না, তার ভেতরে ঢুকলেন না। নিজের নাম মনে করতে গিয়ে স্মৃতিশক্তি হারানো মেয়েটিকে যে অদম্য চেষ্টা করতে হচ্ছে তা কিন্তু আপনার সংলাপে ফুটল না।' রিণা কোনও মন্তব্য না করে মন দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল।'

'এবার অনুগ্রহ করে বসুন!' ইশারায় সোফাটা দেখিয়ে একধারে বসে পড়ল রিণা, ক্লড বসল তার গা ঘেঁষে।

'সানস্পটস' ছবির শুটিং এর শেষদিনে বার্ণি নরম্যান এল স্টুডিওর সেটে। মরুভূমির বিশ্বাসযোগ্য চেহারা ফুটিয়ে তুলতে পেল্লায় একখানা স্টেজ ভাড়া নিতে হয়েছে। মাথা ঠিক কাজ করছে কিনা তা নিয়ে এইমুহূর্তে নিজের ওপর বার্ণির বেশ সন্দেহ হচ্ছে। এমন একখানা জগঝম্প গল্প কেনা যে নেহাৎ মূর্খামি হয়েছে তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বার্ণি।

শুধু গল্প কেনা নয়, খরচখরচা করে এতবড় সেট তৈরি করার পরে পরিচালক শুটিং মাসখানেকের জন্য পিছিয়ে দিল। কারণ জানতে চাইলে ক্লড জানাল রিণা তার চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য পাকা ত্রিশ দিন সময় চেয়েছে! ক্লডের কথা শুনে বার্ণির মনে হয়েছিল এর চেয়ে রিণা আর ক্লড দু'জনে মিলে তার মাথা ফাটিয়ে দিলে ভাল হত— একমাসের জন্য শুটিং পিছিয়ে দেবার মানে স্টুডিওর সবাইকে ঐসময়ের জন্য বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেয়া, যার মোট পরিমাণ কম করে দেড় লাখ ডলার। এখানেই শেষ নয়, এরপরে শব্দ, আলো, ক্যামেরার কাজ, সব পুরোপুরি নিখুঁত করতে ক্লডের উপরি আব্দার—তাতেও পঞ্চাশ হাজার ডলার। এইভাবে এক মাসের জায়গায় সময় গিয়ে ঠেকলে পুরো তিন মাসে আর সেই বাবদ বার্ণির লোকসান হল পুরো দশলাখ ডলার, বিরক্তিতে দাঁত খিঁচোনোর মত কাউকে ধারে কাছে চোখে পড়ল না, চোখ পিটপিট করতে করতে বার্ণি এসে দাঁড়াল আলোকোজ্জ্বল সেটের মাঝখানে। তবু রক্ষা, এটাই ছবির শেষদৃশ্য—সকালবেলা কেবিনের দরজা খুলে চমকে গেল মেরি নামে সেই স্মৃতিভ্রষ্ট মেয়েটি দেখল বুড়ো আর জোয়ান দুই খনি খোঁজারুর রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে মরুভূমির বালুর ওপর। লম্পট বুড়োটাকে গুলি ছুঁড়ে খুন করে ছোকরা খনি-খোঁজারু নিজের ওপর চরম হতাশায় আত্মহত্যা করেছে। লাশ দুটোর দিকে চোখ পড়তে মেরি অসহায়ভাবে কাঁদবে, তারপরে ধীরে ধীরে মরুভূমির বুকে হাঁটতে হাঁটতে একসময় বিলীন হবে দিগন্তরেখায়, ছবির শেষ সেখানেই। খুব সহজ পরিণতি।

'যে যার জায়গায় যান!' পরিচালকের নির্দেশ প্রতিধ্বনিত হল, 'অ্যাকশন! স্টার্ট সাউন্ড! ক্যামেরা!'

দরজা খুলে কেবিনের বাইরে পা রাখতেই সামনে বালুর বুকে পড়ে থাকা অতি পরিচিত

রক্তাক্ত লাশ দুটোর দিকে রিণার চোখ পড়ল। ক্যামেরার লেনসে রিণার মুখের ক্লোজ আপ, একটা মুহূর্ত পেরোল, পেরোল আরও একটা। 'কাঁদুন! বুকফাটা চিৎকার করে কাঁদুন!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুড।

রিণা চেষ্টা করেও চোখে জল আনতে পারলনা, শুধু চোখ পিটপিট করাই সার হল।

'কাট!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুড। আবার শুরু হল নতুন করে শট নেয়ার প্রস্তুতি, সবকিছুই এগোল আগের মত ধাপে ধাপে, কিন্তু শেষমুহূর্তে এবারেও কাঁদতে পারল না রিণা।

'কাট!' আবার চেঁচিয়ে উঠল ক্রুড।

'দুঃখিত, ক্রুড,' মিনতির সুর রিণার গলায়, 'এমনিতে হচ্ছে না, তার চেয়ে বরং মেক আপ নিই, তাতে চোখের জল দেখানো সুবিধে হবে।'

'না। একদম না!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুড ডানবার, 'দোহাই, একবার বোঝার চেষ্টা করুন! দুটো লোক মরেছে শুধু আপনার জন্য তাদের মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছেন বলে আপনি চোখের জল ফেলছেন তা কিন্তু না, আসলে স্মৃতিভ্রংশ হবার পরে এখনও আপনার সত্তার মৃত্যু ঘটেনি, তাই কাঁদছেন। খুব বেশি নয়, অঝোরধারে না, এমন মুহূর্তে একটি মেয়ের চোখে যতটা জল আসা সম্ভব, ততটুকু জলই ফেলবেন। আপনি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে নিন, আবার শুরু করুন গোড়া থেকে, কেবিনের ভেতরে যান।'

আবার গোড়া থেকে শুরু হল শট নেওয়া, আবারও সেই ব্যর্থতা, কিছুতেই চোখে জল আনতে পারছেনা রিণা। শুটিং জোনের বাইরে দু'হাতে রগ চেপে মুখখানা হাঁড়িপানা করে বসে বার্ণি নরম্যান, আজকের দিনটা এইভাবে কাটলে শুধু খামোখা দশহাজার ডলার জলে যাবে।

'আপনি মেয়েমানুষ, না বাজারের মাগি?' বারবার ব্যর্থতায় ভব্যতার সব বেড়া ক্রুড ডানবারের ওপর থেকে আপনিই খসে পড়ল—'এই ছবিটা তুলতে গত পাঁচ মাস ধরে আমায় দিনে রাতে কেমন পরিশ্রম করতে হচ্ছে নিজে চোখে দেখেছেন। কেন জানেন? একটিই কারণ—আপনি যে জাত শিল্পী তা হাতেকলমে প্রমাণ করতে চাই বলে। অভিনয় করতে নেমেছেন যখন তখন নিজের ক্ষমতা প্রমাণ না করা পর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ছিনা। কি সাংঘাতিক জেদী লোক আমি। জানেন না আপনি! নিন, উঠুন, আবার চেষ্টা করুন! আমার কথাগুলো আগে মন দিয়ে শুনুন তারপরে আবেগ ফোটানোর চেষ্টা করুন। কেবিন থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে তাকান, প্রথমে পল, তারপরে জোসেফের লাশ মাথা অল্প ঝুঁকিয়ে দেখুন। ওদের দু'জনের একজনও যে বেঁচে নেই তা নিমেষের মধ্যে টের পেলেন। এরপরে মুখ তুলে তাকান ওপরে আকাশের দিকে। হতে পারে ওদের কাউকে ভালবাসেন নি আপনি, কিন্তু তা হলেও এতদিন একসঙ্গে কাটিয়েছেন ওদের সঙ্গে, দু'বেলা ভাগ বসিয়েছেন ওদের খাবারে, অবসর সময় গল্পগুজব করেছেন, রাতে ঘুমিয়েছেন ওদেরই পাশে শুয়ে। অবশ্য এটাও ঠিক, এসবের বিনিময় একেকসময় চরম মূল্য দিতে হয়েছে আপনাকে। সেইসব মুহূর্তের স্মৃতি মেঘের মত ঘুরেফিরে দানা বাঁধছে আপনার মনের কোণে। ওদের লাশ দেখে হয়ত বাবা, মা, ভাই, বোন, বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর দেখা মৃতদেহের মুখ বারেকের জন্য উঁকি দিচ্ছে মনে, আর তাই জল আসছে দু'চোখ তাকিয়ে হাজার চেষ্টা করেও যা আপনি দমন করতে পারছেন না।

নাটুকে ছোঁড়াটার কথা বলার ধরনও ভারি চমৎকার! ক্রুডের প্রত্যেকটা কথা শুনতে

পেল বার্ণি, কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার জলে যাবার দুঃখ নিমেষে ভুলে অবাক হয়ে তাকাল সে তার মুখের দিকে। ততক্ষণে পরিচালকের নির্দেশে আবার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে রিণা, পড়ে থাকা লাশ দুটোর দিকে চোখ পড়তে বাঁধভাঙ্গা জল বইতে শুরু করেছে তার দু'চোখ বেয়ে।

রিণা কাঁদছে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে খানিক বাদে দু'চোখ এল শুকিয়ে। প্রথমে ওপরে তারপরে বহুদূরের দিকে মুখ তুলে তাকাল রিণা, তারপরে পায়ে পায়ে লাশদুটোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দিগন্তরেখায় মিলিয়ে গেল মেরি নামে স্মৃতিভ্রষ্ট সেই অসহায় যুবতী।

'কাট্।' যুদ্ধজয়ী সেনাপতির মত পরিচালক ক্লড ডানবারের নির্দেশ এসে ঠেকল বার্ণি নরম্যানের কানে, মুখ তুলতে বার্ণি দেখল প্রশংসা ঝরানো চাউনি মেলে ক্লড তাকিয়ে রিণার দিকে।

'সাবাশ! মিস মার্লো!' আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ক্লড ডানবায়র, 'সত্যিই আপনি জাত অভিনেত্রী! আপনার সঙ্গে কাজ করে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে!'

'অত সহজে ধন্যবাদ দিয়ে ছাড়া পাবেন না,' ক্লডের হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরল রিণা, 'আমার হোটেলে চলুন, আইলিন!'

পর্দা তুলে আইলিন বেরিয়ে আসতে হুকুম দিল রিণা, 'হোটেলে আমার স্যুটের গেস্ট রুমটা মিঃ ডানবারের জন্য তৈরি রাখতে বলো, উনি ক'দিন ওখানে বিশ্রাম নেবেন!'

'কেন মিছিমিছি আমার জন্য কষ্ট করতে যাবেন, মিস মার্লো?' আপত্তি করল ক্লড।

'আপনার কোনও ওজর আমি শুনতে রাজি নই,' দৃঢ় গলায় বলল রিণা, 'এ ছবির শুটিং শুরু হবার পর থেকে একটি রাতও আপনি দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন নি তা আর কেউ না জানলেও আমি জানি, মিঃ ডানবার!'

'কিন্তু আমার বুড়ি মা যে আমার ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে আছেন!' করুণ সুরে আবার আপত্তি করল ক্লড।

'একজন মায়ের পক্ষে তা খুবই স্বাভাবিক, মিঃ ডানবার,' রিণা, বলল, 'হোটেলে আমার স্যুটে টেলিফোন আছে, মায়ের জন্য মন খারাপ হলে আপনি সেই টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।'

'প্রিন্ট সম্পাদনার কথা ভাবছেন ত?' চেয়ার ছেড়ে উঠে এল স্বয়ং বার্ণি নরম্যান, ক্লডের পিঠে আলতো চাপড় মেরে বলল, 'হাতে এখনও পাকা দশ হপ্তা সময় আছে, প্রিন্ট কাটাছেঁড়া করার পক্ষে তা যথেষ্ট। সেসব পরের কথা, এখন রিণা যা বলছে তাতে রাজি হয়ে যান, ওর হোটেলের স্যুটে গিয়ে ক'দিন জিরিয়ে নিন।'

রিণার অসামান্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ক্লড তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল আগেই, তার ওপর ছিল রিণার দেহের আকর্ষণ, তাই কিছুদিন তার কাছাকাছি কাটানোর এমন লোভনীয় প্রস্তাব সে ফেলতে পারল না।

কিন্তু এর পরিণতি হল মর্মান্তিক শোচনীয়—দৈহিক মিলনে উন্মুখ রিণাকে শারীরিকভাবে অক্ষম ক্লড পরিতৃপ্ত করতে পারল না, আত্মহত্যা করে নিজের পৌরুষের অক্ষমতার লজ্জাকর গ্লানির হাত থেকে বাঁচল সে।

১৬

সান্টা মোনিকার এই কোল্টন স্যানাটোরিয়ামের বাইরের চেহারাটা এতটাই জাঁকালো যে হাসপাতালের বদলে একে যদি কেউ হোটেল বলে ভেবে বসে ত তাকে দোষ দেয়া যাবে না। গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকে রিসেপসান কাউন্টারে দাঁড়ালাম। সাদা পোষাকপরা নার্সের নির্দেশে আরেকজন নার্স আমার এলিভেটরে চাপিয়ে নিয়ে এল ঝকঝকে করিডরে, ইশারায় একটা স্যুটের দরজা দেখিয়ে নার্স বলল, 'ভেতরে যান, মিঃ কর্ড, মিস মার্লো ওখানেই আছেন।'

দরজা খুলে যেখানে পা দিলাম সেটা একটা বড়সড় কেবিন। দেয়াল ঘেঁষা খাটে শোয়া রোগীর মুখের ওপর ক্ষুদে তাঁবুর মত প্ল্যাস্টিকের স্বচ্ছ আবরণ থাকায় মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু খাটের পাশে দাঁড়ানো ডাক্তার আর নার্সের পাশে আইলিন গেলার্ডকে দেখে রোগী যে রিণা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম, কাছে এগিয়ে আসতে রিণার দু'টি বোঁজা চোখ আর চোখের চামড়ার ফ্যাকাশে নীল রং নজরে পড়ল। গাল দু'টো বসে যাবার ফলে মনে হয় চামড়ার নিচের মাংস হয়ত রোগজনিত কারণে শুকিয়ে ঝরে গেছে। ভরা ঠোঁটদুটো আলগা হয়ে ঝুলে পড়ায় ভেতরের ধপধপে সাদা দাঁত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পুরু সাদা ব্যান্ডেজে গোটা মাথা ঢাকা ভেতরের লালচে সোনালি চুলগুলো এখনও অক্ষত আছে কিনা জানিনা।

'উনি এখনও বেঁচে আছেন, মিঃ কর্ড,' আইলিনের পাশে দাঁড়ানো ডাক্তার বললেন 'তবে আর বেশিক্ষণ ওঁকে আমরা ধরে রাখতে পারব না।'

'ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, মিঃ কর্ড, তবে উনি উত্তর দিতে না পারলে মনখারাপ করবেন না। গত দশ বারো ঘণ্টা হল মিস মার্লো এই অবস্থার মধ্যে আছেন। তাছাড়া উত্তর দিলেও হয়ত উনি আপনাকে চিনতে পারবেন না।'

'রিণা,' আরেকটু কাছে এসে বললাম, 'আমি জোনাস, তোমায় দেখতে এসেছি।'

আমার আর্তি রিণার কানে পৌঁছোল কিনা কে জানে, একই রকম নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল সে, এবার মুখের ওপর চাপা দেয়া প্ল্যাস্টিকের ক্ষুদে তাঁবুর ভেতর হাত গলিয়ে ওর দু'হাতের নাগাল পেলাম। দুটো হাতই নরম আর ঠাণ্ডা ঠেকল। এ যেন রিণার না, কোনও মরা মানুষের হাত। রিণা কি তবে সত্যিই চলে যাচ্ছে? আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, প্ল্যাস্টিকের আবরণের একদিক তুলে ভেতরে মাথা গলিয়ে বললাম, 'দয়া করো, রিণা, লক্ষীটি। আমি জোনাস বলছি, দয়া করে এভাবে চলে যেয়োনা।'

রিণা কি শুনতে পেল? না পেলে আমার হাত আলতো করে চেপে ধরবেই বা কেন? ঝুঁকে মুখের দিকে তাকাতে দেখি তার দুচোখ বেয়ে জল ঝরছে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতে সেই উষ্ণ অশ্রুধারার ছোঁয়া লাগল আমার গালেও। কয়েক মুহূর্ত বাদে তার হাতের চাপ বাড়ল আগের চেয়ে। আরও কিছুক্ষণ পরে দু'চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তাকাল রিণা।

গোড়ায় তার দু'চোখের চাউনি কেমন দুর্বোধ্য ঠেকল, মনে হল আমার মুখের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সব ভেদ করে তার চোখের তীক্ষ্ণ চাউনি পৌঁছে গেছে বহুদূরে। এইভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বাভাবিক হয়ে এল তার দু'চোখের দৃষ্টি। 'এসেছো, জোনাস?'

অল্প হেসে ফিসফিস করে বলল রিণা, 'জানতাম শেষ সময়ে তোমার দেখা ঠিকই পাব, তুমি ঠিক এসে দাঁড়াবে আমার পাশে।'

'এত কথা না বলে আপনি একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করুন, মিস মার্লো,' পেছন থেকে ভেসে এল ডাক্তারের গলা, 'প্রচুর ঘুম আর বিশ্রাম দুটোই এই মুহূর্তে আপনার খুব দরকার।'

'আপনাদের কথা ঢের শুনেছি।' রিণার গলায় চাপা ক্ষোভ ফুটল, 'আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। চোখ বোঁজার আগে প্রাণ খুলে জোনাসের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

'বেশ, তাই বলুন.' ডাক্তার বললেন, 'তবে বেশিক্ষণ নয় কিন্তু,' বলে আমাদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে নার্স আর ডাক্তার দু'জনেই চলে গেলেন কেবিন ছেড়ে।

কেবিনের ভেতর এখন শুধু আমরা দু'জন। ধীরে ধীরে হাত তুলল রিণা, আলতো করে টোকা দিল আমার গালে। তার আঙুলগুলো ধরে আমার ঠোঁটে বোলালাম।

'চলে যাবার আগে তোমার সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করা আমার দরকার ছিল, জোনাস,' কেটে কেটে বলল রিণা, 'কতক্ষণে আসবে শুধু সেই আসার দিন গুনছি।'

'কেন রিণা, আজ এতদিন পরে আমার জন্যে অপেক্ষা করার কি এমন দরকার ছিল?'

'ছিল, জোনাস,' ফিসফিস করে জবাব দিল সে, 'তোমায় দেবার মত অনেক কৈফিয়ত বুকে জমে আছে যে।'

'কৈফিয়ত দেবে?' রিণার কথা শুনে হাসি পেল, 'এখন আর তোমার দেয়া কৈফিয়ত কোন কাজে লাগবে?'

'আমার অবস্থা বোঝার চেষ্টা করো, জোনাস,' একই রকম শোনাল রিণার গলা, 'প্রথম তোমায় দেখেই আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম। কিন্তু একসঙ্গে মনে মনে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম—লক্ষ করেছি যখন যাকে ভালবেসেছি কোনও না কোনওভাবে আমি তার দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছি। আমার মা আর ভাই দু'জনকেই প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতাম, সমুদ্রে নৌকো উল্টে একইসঙ্গে মরতে হল দু'জনকেই। বাবাকেও কম ভালবাসিনি, জেলের ভেতরে মারা গেলেন তিনি।'

'এসব মৃত্যুর কোনটির জন্যই তুমি দায়ী নও,' নিজের গলা নিজের কানে দৃঢ় শোনাল।

'প্যারিসে এক সন্ধ্যায় আমার শিক্ষিকা মার্গারেট ব্র্যাডলিকে আচমকা পেছন থেকে ধাক্কা মেরে সিঁড়ির নিচে আমিই ফেলে দিয়েছিলাম,' অদ্ভুত ধরা গলায় স্বীকার করল রিণা, 'অনেক নীচে শানে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যান তিনি। নেভাদার ক্যারিয়ারের ক্ষতি হবার জন্য একা আমিই দায়ী, এমনকি এই সেদিন ক্লড ডানবার যে আত্মহত্যা করল, বাবা ছিল ঐ ঘটনারও মূলেও ছিলাম আমি।'

'ঐসব ঘটনা স্বাভাবিকভাবে ঘটার ছিল তাই ঘটেছে,' তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'এসব ঘটনার কোনটির জন্যই তুমি দায়ী নও।'

'আমায় ভোলাতে এসো না।' আচমকা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল রিণা, 'একশোবার আমি দায়ী। তোমার নিজের বিবাহিত জীবনের এ-হাল আমি ছাড়া কে করল। সে রাতে তোমার হোটেলে যাওয়া আমার মোটেও উচিত হয়নি।'

'সে আমার ভুল, হোটেলে আসতে আমিই তোমায় বাধ্য করেছিলাম। কেউ যদি সত্যিই দায়ী হয় ত সে আমি ছাড়া কেউ নয়।'

'ভুল করলে, জোনাস,' আবার ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'তুমি কেন কেউ আমায় বাধা

করেনি। চেয়েছিলাম বলেই হোটেলে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তারপরে যখন সেই মেয়েটি এল তখন তাকে দেখে বুঝলাম কতবড় ভুল করেছি।'

'কেন?' নিজের গলা নিজের কানে তিক্ত শোনাল, 'মেয়েটার ফোলা পেট দেখেই ধরে নিলে ওর পেটে আমার বাচ্চা? না রিণা, সেদিন মণিকার পেটে যে বাচ্চা ছিল তার বাবা আমি নই।'

'তাতে কিই্বা এসে গেল? ধরে নিলাম তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আগে মেয়েটি কারও সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, তাতে কি হল? নিশ্চয়ই এসব জেনেই তুমি ওকে বিয়ে করেছিলে। তখন যদি এতে কিছু না এসে যায় তাহলে ওর পেটে সেই লোকটির বাচ্চা এলেই বা ব্যাপারটা গুরুত্ব পাবে কেন?'

'গুরুত্ব এইজন্য পাবে যেহেতু আমার টাকাকড়ি ছাড়া আর কোনও কিছুর ওপর তার এতটুকু আগ্রহ কোনদিনই ছিল না। আমার সঙ্গে বিয়েটা খারিজ হবার পরে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে পাঁচলাখ ডলার মণিকা পেয়েছিল তারই বা কি হল? তুমি ত সেকথা একবারও তুলছো না।'

'তোমার ধারণা ভুল, জোনাস,' ফিসফিস করে বলল রিণা, 'মণিকা মেয়েটা সত্যিই তোমায় ভালবেসেছিল। ওর চোখের চাউনিতে আমি আঘাতের ছাপ স্পষ্ট দেখেছি। শুধু তোমার টাকার ওপরেই ওর নজর ছিল বললে না? তাই যদি হবে তাহলে সে টাকার পুরোটা ও নিজের বাপকে এককথায় দিয়ে দিল কেন?'

'সেকি! এ ঘটনা ত আমার জানা নেই, কেউ বলেনি আমায়!'

'অনেক কিছুই তোমার জানা নেই, জোনাস, অনেক কথাই বলা হয়নি তোমায়,' একইরকম ফিসফিস করে বলল রিণা, 'তোমায় এসব কথা বলার মত সময় আমিও পাইনি। তবে এটা ঠিক যে তোমার বিবাহিত জীবন ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য আমি একাই দায়ী। তুমি মণিকার মেয়ের বাবা, কিন্তু পিতৃত্বের পরিচয় ছাড়াই বেচারি বেড়ে উঠছে। আমার ইচ্ছে বাবা হিসেবে ও তোমাকেই চিনুক, জানুক!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রিণা বলল, 'জীবনে টাকাকড়ির সদ্ব্যবহার কখনও করতে পারিনি। টাকাকড়ি সামান্য যেটুকু আছে সেসব মণিকার মেয়ের নামেই লেখা আছে আমার উইলে, আর সে উইলের এক্সিকিউটর করেছি তোমাকে। জোনাস, কথা দাও, আমার সব টাকা ওকে দেবে।'

'কথা দিচ্ছি, রিণা,' তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম।

'ধন্যবাদ, জোনাস,' রিণা বলল, 'জানতাম তোমার ওপর নিশ্চিন্তমনে নির্ভর করা যায়।'

'অনেকক্ষণ একটানা কথা বলেছো, রিণা,' আমি বললাম, 'এবার চুপ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করো।'

'গোটা দুনিয়াটা দিনরাত পাগলের মত পাক খেয়েই চলেছে, জোনাস,' বলতে বলতে হাসল রিণা, 'সেই ঘূর্ণির পাক সবসময় টের পাচ্ছি আমার মাথার ভেতরে, বেশ বুঝতে পারছি মগজের পুরোটা ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেকি অসহ্য জ্বালা আর যন্ত্রণা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। এই অসহ্য জ্বালাযন্ত্রণা মুখ বুঁজে সইবার জন্য আরও কিছুদিন আমায় বাঁচতে হবে আর তাই তুমি আমায় বিশ্রাম নিতে বলছ? না, জোনাস, এই যন্ত্রণা ঢের সয়েছি, আর নয়। এবার আমায় মরতেই হবে, না মরলে এই যন্ত্রণা থেকে আমার রেহাই দেবার ক্ষমতা কারও নেই। তবে এখানে মরার সাধ আমার নেই, জোনাস, আমায়

একটিবার তুলে নিয়ে চলো সামনের ঐ বারান্দায়, ওখানে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে বাতাস নিতে নিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলব!' বলতে বলতে দু'হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

'কিন্তু ডাক্তারকে না বলে তোমায় ওখানে নিয়ে যাই কি করে?'

'দোহাই জোনাস,' বলে করুণ হাসল রিণা। মৃত্যুপথযাত্রী রিণাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। অক্সিজেনের তাঁবু সরিয়ে তার পালকের মত পলকা দেহটা দু'হাতে তুলে কেবিন থেকে বেরিয়ে সামনের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

'কতদিন, কতযুগ পরে আবার আমায় এইভাবে তুলে নিলে বলো ত?' চাপাগলায় বলল রিণা, 'কি ভাল আর নিশ্চিন্ত লাগছে বলে বোঝাতে পারবনা!'

উত্তর না দিয়ে তার ছোট কপালে আলগোছে ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

'পাতা ভর্তি গাছ কি অদ্ভুত চোখজুড়োনো সবুজ দেখায় প্রায় ভুলেই গেছি, জোনাস,' কানের কাছে ঠোঁট এনে চাপাগলায় বলল রিণা, 'জানো, বোস্টনে বাবাকে যেখানে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি ঠিক তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ওক গাছ, হলফ করে বলতে পারি এমন ঝলমল সবুজ গাছ আগে কখনও তোমার চোখে পড়েনি। বাবার পাশে অনেকটা জমি এখনও ফাঁকা পড়ে আছে। জোনাস, আমাকেও ওঁর পাশেই শুইয়ে দিও। কেমন, দেবে ত?'

'তাই দেব সোনা,' কথা দিতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারলাম না।

'আমার জন্য চোখের জল ফেলছ, জোনাস?' আস্তিনের হাতায় রিণা আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল, তারপরে গরম সোহাগে তার মুখখানা গুঁজে দিল কাঁধে। সামনের দিকে তাকিয়ে সেই গাছটা খুঁজলাম যার সবুজ পাতা খানিক আগে তাকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু আমার জলে ঝাপসা চোখে তা ধরা পড়ল না। আরও খানিকবাদে তার পলকা শরীরটা কেমন যেন ভারি ঠেকল, কেবিনে ফিরে এসে দেখি ডাক্তার নার্স আর আইলিন, তিনজনে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। আলগোছে রিণাকে খাটে শুইয়ে বললাম, 'বাইরে সূর্যের আলোয় উনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে চাইলেন তাই বাইরে বারান্দায় নিয়ে গিয়েছিলাম...' নিজের গলা নিজের কানে অদ্ভুত কর্কশ শোনাল, মনে হল আমার আরও কিছু যেন বলার ছিল, আরও ভালভাবে।

১৭

সমাধিপর্ব শেষ হতে মাননীয় পাদ্রি চামড়া বাঁধানো বাইবেলখানা মুড়ে সমাধিক্ষেত্রের লাগোয়া পথ ধরে এগিয়ে চললেন। আইলিন আর আমি ছাড়া উপস্থিত আর সবাই তাঁর সঙ্গে পা মেলাল। কবরের ওপর বসানো রিণা মার্লো নামলেখা ফলক ইশারায় দেখিয়ে আইলিন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সব শেষ, মিঃ কর্ড!'

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, 'রিণার ইচ্ছেমতই ওর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। মিস গেলার্ড, চাইলে হোটেল পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিতে পারি।'

'ধন্যবাদ, মিঃ কর্ড,' ঘাড় নাড়লেন আইলিন, 'আমি আরও কিছুক্ষণ ওঁর কবরের পাশে কাটাব।'

টেলিফোনে আমার উকিল ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে কথা বলে জানলাম রিণার উইলের কপি আছে ওঁর হেপাজতে। নিশ্চিন্তমনে এরপরে বেরোলাম মণিকার খোঁজে।

মণিকা বাড়ি ছিল না, পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক বললেন মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গেছে।

পৌনে সাতটা বাজে, সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে, আর খানিকক্ষণ পরে দিগন্তে বিলীন হয়ে ঘটাবে একটি সকালের পরিসমাপ্তি। এইসব ভাবনার মাঝখানে মণিকা ফিরে এল মেয়েকে নিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে মায়ের আগে লাফিয়ে উঠতে যেয়ে আমায় দেখে থমকে দাঁড়াল। বড় বড় দুটি কালো চোখ কুঁচকে কয়েকমুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মামণি, দ্যাখো কে একজন এসেছে!'

চোখ তুলে তাকালাম মণিকার দিকে, সেও তাকাল। কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই অপলক চোখ মেলে দেখলাম দু'জনকে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও মণিকার চেহারা একইরকম আছে, হয়ত চুল বাঁধার ধরণেই তা মনে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, পাল্টেছে তার দু'চোখের চাউনি—এমন প্রখর অথচ শান্ত সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া যে মণিকাকে চিনতাম তার চোখের চাউনিতে কখনও দেখিনি।

'হ্যাঁ, জো অ্যান,' মেয়েকে কোলে তুলে নিল মণিকা, 'উনি তোমার মামণির বন্ধুর, ওঁর সঙ্গে হাতে হাত মেলাও।'

'হেল্লো,' মার কোলে থেকেই আমার দিকে হাত বাড়াল মণিকার পুঁচকে মেয়ে, 'মামণির বন্ধু, বলো, ভাল আছো তো?'

'নিশ্চয়ই,' তার হাতে হাত মেলালাম, 'কেমন আছো, মণিকা?'

'মনিকা, ভাল আছো?'

'হ্যাঁ, জোনাস, ধন্যবাদ। তুমি কেমন আছো বলো।'

'দিন একরকম কাটছে। মণিকা, তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে।'

'কি ব্যাপারে?' মণিকা যেন চমকে উঠল, 'যতদূর জানি আমাদের ব্যাপার সব চুকেবুকে গেছে।'

'তোমার আমার নয়,' চটপট বললাম, 'তোমার মেয়ে সম্পর্কে কিছু বলব বলেই এসেছি।'

আমার কথা শুনে ভীতি ফুটল মণিকার দু'চোখে, বাচ্চাকে বুকে জাপটে ধরে কাঁপা গলায় বলল, 'কেন, আমার জো অ্যান কি করেছে?'

'অত ভয় পাচ্ছো কেন,' আমি বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই।'

'এসো, ভেতরে এসে বোস,' বলে চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলে মেয়েকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল মণিকা, পেছন পেছন ঢুকলাম আমি। মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে মণিকা বলল, 'যাও ত মা, তোমার ঘরে গিয়ে পুতুলদের সঙ্গে খেলো গিয়ে।' বাচ্চা মেয়েটা হাসতে হাসতে দৌড়ে ভেতরে উধাও হল।

'বোস, জোনাস,' মণিকা তাকাল আমার দিকে, 'বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে?'

'খুব বেশিক্ষণ নয়।'

'একটু বোস, কফির জল গরম করছি।'

'আমার জন্য ওসব ঝামেলা করতে যেয়োনা, মণিকা, আমি কাজের কথাটুকু সেরেই চলে যাব।'

'একটু নাহয় বসলেই বাপু,' মিনতি করল মণিকা, 'আমাদের কাছে লোকজন তেমন আসেনা বললেই চলে।'

একথার পরে নিষ্ঠুরভাবে চলে যাওয়া যায়না। চেয়ার টেনে বসলাম। চারপাশে তাকাতে বেশ দমে গেলাম—মেয়েকে নিয়ে থাকার পক্ষে ঘরখানা খুবই ছোট। ভেতরে আসবাব যা আছে তা সামান্য আর কমদামি হলেও বেশ গুছিয়ে রাখা হয়েছে। খানিক বাদে মণিকা কালো কফি নিয়ে এল, আমার পাশের টেবলে কফির পট নামিয়ে রেখে বলল, 'চিনির কিউব দুটো, কেমন?'

'ঠিক।'

'মনে হচ্ছে তোমার মাথা ধরেছে, জোনাস, অ্যাসপিরিন খাবে?'

'মাথা ধরেছে কি করে বুঝলে?'

'অল্প ক'দিনের জন্য হলেও আমি ত তোমার বৌ ছিলাম, না কি? আমার বেশ মনে আছে মাথা ধরলে তোমার কপালে একরকম ভাঁজ পড়ত।'

'মনে আছে দেখছি। দুটো বড়ি দাও তাহলে।'

মাথাটা সত্যিই ধরেছিল, অ্যাসপিরিন খাবার পরে খানিকটা সুস্থ লাগল। মুখোমুখি বসে মণিকা কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল আমায় তারপরে বলল, 'এমন একটা জায়গায় আমায় দেখে অবাক লাগছে, তাই না জোনাস?'

'অবাক কিছুটা লাগছে বইকি,' আমি বললাম, 'আমার দেয়া ক্ষতিপূরণের টাকার কিছুই তুমি নিজের জন্য রাখোনি দেখেও অবাক লাগছে। টাকাটা কি করলে, জানতে পারি?'

'তোমার টাকা ত আমি চাইনি জোনাস,' মণিকা জবাব দিল, 'ব্যবসার জন্য টাকাটা বাবার দরকার ছিল, তাই যা দিয়েছিলে তার পুরোটাই ওঁকে দিয়েছি।'

'টাকা চাওনি ত কি চেয়েছিলে?'

'যাকে পেয়েছি, আমার মেয়ে জো অ্যানকে। ও একটু বড় হবার পরে ঠিক করলাম চাকরি করব। আমি এখন একটা কোম্পানির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, মাইনে হপ্তায় সত্তর ডলার।'

'অ্যামোস কেমন আছেন?'

'জানিনা,' তাচ্ছিল্যের গলায় জবাব দিল মণিকা, 'চার বছর হল ওঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। আমার এখানকার ঠিকানা কে দিল?'

'রিণা মারা যাবার আগে দিয়েছে।'

'তুমি হয়ত বিশ্বাস করবেনা তবু এটা ঠিক যে কাগজে ওঁর মৃত্যুসংবাদ পড়ে মনটা ভীষণ ভেঙ্গে গিয়েছিল। জীবনে দু'হাত ভরে সব পাবার পরে কারও এভাবে চলে যাওয়া খুব কমই চোখে পড়ে।'

'রিণার আত্মীয় স্বজন কেউ বেঁচে নেই।' আমি বললাম, 'সেই কারণেই ছুটে এসেছি তোমার কাছে।'

'তার মানে?' অবাক চোখে তাকাল মণিকা, 'রিণা মারা যাবার আগে তার জমানো সব টাকাকড়ি তোমার মেয়ের নামে উইল করে দিয়ে গেছে। টাকার মোট পরিমাণ ঠিক আমার জানা নেই, সরকারি কর আর পাওনা টাকা বাদ দিলে হয়ত চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার ডলার দাঁড়াবে। টাকাটা যাতে তোমার মেয়ে পায় সেকথা মাথায় রেখে ও আমাকে উইলের এক্সিকিউটার করে গেছে।'

'কিন্তু ওঁর কাছে আমার তো কোনও ঋণ ছিলনা,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল মণিকা, 'তাহলে এমন একটা কাজ উনি করতে গেলেন কেন?'

'তোমার আর আমার বিয়ে ভাঙ্গার জন্য ও দায়ী এই ধারণা গড়ে উঠেছিল রিণার মনে,' আমি বললাম, 'হয়ত তাই মারা যাবার আগে ও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।'

'উনি যাই ভাবুন না কেন, আসলে তুমি আর আমি, আমাদের দু'জনের ভুলেই আমাদের বিয়ে ভেঙ্গেছে,' জোরগলায় বলল মণিকা,' কিন্তু সেসব ত অতীতের ব্যাপার, কবে চুকেবুকে গেছে, অ্যাদ্দিন বাদে সেসব কথা তুলে উত্তেজিত হওয়া নিছক বোকামি!'

'ঠিকই বলেছো, মণিকা,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম। 'সে'সব কবে চুকেবুকে গেছে। তুমি সময় করে আমার উকিল ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে উনিই দলিলপত্র আর ব্যাংকের চেক তোমার হাতে ধরিয়ে দেবেন। আমার কাজ শেষ, আমি চললাম,' বলে দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

'এখনই চলে যাবে?' মুখ তুলে আহত গলায় বলল মণিকা, 'একটা দিন রাতের খাওয়াটা আমাদের সঙ্গেই না হয় খেতে! আমি এখনই রান্না চড়িয়ে দিচ্ছি।'

'আজ থাক, মণিকা,' শান্তভাবেই বললাম, 'জরুরি কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, এখুনি না গেলেই নয়!'

'ও হ্যাঁ, তোমার ত আবার ব্যবসা আছে,' মণিকা বলল, 'আমার কথাটা মনেই ছিল না!'

'না, না, এ আর এমন কি, মানুষের ভুল হতেই পারে!'

'তবু এটা ত ঠিক যে ব্যবসার কাজে তোমায় দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়, তার মধ্যে সময় করে এখানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, জোনাস!' বলল মণিকা। তার কথায় মৃদু খোঁচা ছিল, কিন্তু আমি তার জবাব দেবার আগেই ও ভেতরে গিয়ে মেয়েকে ডেকে আনল।

'জো-অ্যান,' ইশারায় আমায় দেখিয়ে মণিকা মেয়েকে বলল, 'মামণির বন্ধু চলে যাচ্ছেন, ওকে গুডবাই করে দাও।'

'দ্যাখো এ হল আমার ডলি।' মণিকার পুঁচকে মেয়ে একটা ছোট পুতুল বাড়িয়ে দিয়ে হাসল।

'বাঃ, তোমার ডলিকে ত ভারি চমৎকার দেখতে,' আমি বললাম।

'জো-অ্যান, ওঁকে গুডবাই করে দাও।' মেয়েকে তাড়া দিল মণিকা।

'গুডবাই মামণির বন্ধু,' বলে বাত বাড়াল মণিকার মেয়ে, 'শীগগিরই আবার এসো কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই আসব, জো-অ্যান,' তার খুদে হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, 'আজ তাহলে গুডবাই।'

জো-অ্যান একগাল হেসে মায়ের কোলে মুখ গুঁজল।

'যাচ্ছি মণিকা,' দরজার কাছে এসে বললাম, 'কখনও দরকার হলে টেলিফোনে যোগাযোগ করো।'

'ধন্যবাদ, জোনাস,' মেয়ের হাত ধরে জবাব দিল মণিকা, 'জো অ্যানের বোঝার ক্ষমতা থাকলে সেও নিশ্চয়ই তোমায় ধন্যবাদ দেবে।'

'ও ভারি সুন্দর মিষ্টি মেয়ে,' আমি বললাম।

'গুডবাই, জোনাস,' বলে মেয়ের হাত জড়িয়ে এগিয়ে এল মণিকা, সিঁড়ির মুখে এসে বলল, 'জোনাস!'

'বলো, মণিকা!' আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

'কিছু না, জোনাস,' একমুহূর্ত দ্বিধায় কাটিয়ে হেসে বলল, 'খাটাখাটুনি একটু কম কোরো!'

'চেষ্টা করব,' পাল্টা হেসে জবাব দিলেও ও যে আরও কিছু বলতে চেয়েছিল তা বুঝতে বাকি রইল না।

মণিকা ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালাম। চারপাশে একবার তাকাতে বড্ড ঘেন্না এল।' ছিঃ, এই ঘিঞ্জি নরকে মানুষ থাকে!'

১৮

সান ডিয়েগো বিমানবন্দরে যখন পৌঁছোলাম তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত একটা। মার্কিন নৌঘাঁটির কাছেই একটা ছোট জাহাজঘাট ভাড়া নেয়া ছিল, ট্যাক্সি চেপে চলে এলাম সেখানে। জায়গাটায় আলো জ্বলতে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম—যতই গালাগাল দিই না কেন, মণিকার বাবা এই অ্যামস লোকটা খুবই কাজের তা মানতেই হবে। প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও সে হাতের কাজ সময় মত সারে। অ্যামসের স্বভাবের এটাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। একবার দায়িত্ব নিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই ঘুরঘুটে ব্ল্যাক আউটের আঁধারেও রাতের শিফটের একগাদা 'ক্রু' জুটিয়ে সে তা ঠিক পালন করে, কাজ বুঝিয়ে দেয় হাতে হাতে।

পায়ে পায়ে পুরোনো শেড-এর কাছাকাছি পৌঁছোতে কানে এল অ্যামসের পুরুষালি গলার নির্দেশ—'সিধা চালাও, রাণওয়ে পর লে যাও!'

পুরোনো এই শেডটা প্লেনের হ্যাঙ্গার হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে। নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রু-রা হ্যাঙ্গার থেকে 'দ্য সেঞ্চুরিয়ন'-কে ঠেলে নিয়ে এল রাণওয়ের দিকে। মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই বিমান আসলে এক উন্নতশ্রেণীর সি-প্লেন যাকে চালানোর জন্য দরকার বারোজন ক্রু। জলের ওপর ছুটতে ছুটতে আচমকা আকাশে ডানা মেলে এই সি-প্লেন ডাঙ্গায় ও জলে চলতে সক্ষম। একজোড়া হালকা উভচর ট্যাংক ছাড়াও প্রচুর মর্টার, হালকা কামান, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, খাবারদাবার ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সমেত পুরো দেড়শো নৌযোদ্ধার একটি কোম্পানি এ বহন করতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছোট ছোট দ্বীপে মার্কিণ নৌবাহিনীর ঝটিকা হানার উপযোগী এই বিনাম সবদিক থেকেই ফ্লাইং বোট বা উড়োজাহাজ সামনে থেকে যাকে দেখায় দক্ষিণ আমেরিকার 'কণ্ডর' শকুনের মত।

পরদিন বিকেল ঠিক সাড়ে চারটেয় 'দ্য সেঞ্চুরিয়ন' জাহাজঘাট ছেড়ে জলের ওপর দৌড়ল। পাইলটের সিটে আমি নিজে, পাশে কো পাইলট ও ন্যাভিগেটর অ্যামস। তাছাড়া আছে রেডিও অপারেটর জো কেটস। মাঝখানে ডানদিকের এক, তিন, আর পাঁচনম্বর এঞ্জিনের দায়িত্বে আছেন ফ্লাইট এঞ্জিনীয়ার স্টিভ জ্যাবলনস্কি, তাঁর পাশে বাঁ দিকের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ এঞ্জিনের দায়িত্বে আছেন দ্বিতীয় ফ্লাইট এঞ্জিনীয়ার ব্যারি গোল্ড। ক্রুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে অ্যামস গোড়াতেই বলেছে এঁরা সবাই নৌবাহিনীর লড়াই ফেরত পোড়খাওয়া লোক, বিমানের কাজ বেসামরিক পেশাদারদের চেয়ে তাই ভালই জানেন অ্যামসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় ঢেউ আছড়ে পড়েছে প্লেনের সামনে, তার খানিক বাদে সি-প্লেন 'দ্য সেঞ্চুরিয়ন' জলের ওপর ছুটতে ছুটতে আচমকা একলাফে ডানা মেলেছে আকাশে।

কিন্তু আমাদের সবার মিলিত দুর্ভাগ্যের জন্যই হোক বা বিমানের নকশার কোনও ক্রটির জন্যই হোক, আকাশে ডানা মেলার কিছুক্ষণ পরেই দেখা দিল যান্ত্রিক বিপত্তি—একটার পর একটা এঞ্জিন অচল হতে লাগল। আমরা ততক্ষণে জল থেকে প্রায় তিনহাজার ফিট ওপরে হাওয়া কেটে এগোচ্ছি। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি অ্যামস সমেত ক্রুদের সবাই এরই মাঝে গায়ে প্যারাস্যুট চাপিয়েছে।

আমার কথা আলাদা—হয়ত বহুদিন বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা আছে বলেই প্যারাস্যুট বস্তুটিকে ধারে কাছে রাখি না, প্যারাস্যুট কাছে না রাখলে ওটা গায়ে চাপানোর আদৌ দরকার হয়না ত বিশ্বাস আমার আছে যা অনেকের মতে নিছক কুসংস্কার।

'মে ডে। মে ডে।' রেডিও অপারেটরের উত্তেজিত গলা কানে এল, 'কর্ড এয়ারক্র্যাফটের সি-প্লেন 'দ্য সেঞ্চুরিয়ন' থেকে বলছি, সব এঞ্জিন বিকল হওয়ায় আমরা প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবতে চলেছি। আমরা সান ডিয়েগো দ্বীপের পশ্চিমে আন্দাজ একশো পঁচিশ মাইল দূরে আছি। আবার বলছি, সান ডিয়োগোর পশ্চিমে আন্দাজ একশো পঁচিশ মাইল দূরে আমরা আছি। মে ডে। মে ডে।'

পিঠে হাতের ছোঁয়া লাগতে ঘুরে দাঁড়ালাম, রেকর্ডারে মেসেজটা চালু করে রেডিও অপারেটর এসে দাঁড়িয়েছে আমার ঠিক পেছনে। চোখে চোখ পড়তে অল্প হেসে বলল, 'স্যর, আপনি হুকুম দিলে আমরাও প্লেনের সঙ্গে ডুবতে তৈরি আছি!'

'লড়াই ফেরত বলে পেঁয়াজি মারবেন না!' হেসে ধমক দিলাম, 'এটা লড়াই নয়, বাণিজ্যের ব্যাপার। প্যারাস্যুট ত আগেই গায়ে চাপিয়েছেন। এবার লাফ দেবার জন্য তৈরি হোন। যান, এগোন!' বলে ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'অ্যামস, আর বসে থেকে লাভ নেই, আপনিও ওদের সঙ্গে এগোন।'

জবাব না দিয়ে অ্যামস সেফ্‌টি বেল্‌ট টেনে উঠে পড়ল সিট থেকে। কেবিনের দরজা খুলে সবাই যাত্রীদের নির্দিষ্ট কামরায় ঢুকে এগিয়ে চলল এমার্জেন্সি দরজার দিকে। এতক্ষণ ছিলাম ৩৮০০ ফিট ওপরে। উচ্চতা কমে ৩৪০০ ফিটে এসে দাঁড়াতে লাল আলো জ্বলে খুলে গেল এমার্জেন্সির দরজা, আড়চোখে তাকাতে দেখলাম পরপর তিনটে প্যারাসুট কিছুদুর নেমে ছাতার মত খুলে গেল। অল্টিমিটারে দেখলাম উচ্চতা আরও কমে ২৮০০ ফিটে এসে ঠেকেছে।

পেছনে আওয়াজ হতে চমকে তাকালাম, দেখি অ্যামস আবার ফিরে এসে বসেছে তার কো পাইলটের সিটে।

'কথা কানে যায় নি?' আমি খেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনাকে না ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে বললাম।'

'ওরা ছেলেমানুষ, ওদের বাঁচা দরকার।' বলতে বলতে সামনের চাকা দু'হাতে চেপে ধরল অ্যামস। শেষপর্যন্ত ত থামব আমরা দু'জন, প্লেনটাকে ভাসিয়ে রাখার যত দায় ত শুধু আমাদের দু'জনের।'

'যদি আমরা তা না রাখি?' তার জবাবের ধরণে ভীষণ রেগে বললাম, 'যদি আমরাই এটাকে ডুবিয়ে দিই?'

'তাতেও আমাদের হারাবার তেমন কিছু নেই,' অদ্ভুত শান্তগলায় বলল অ্যামস, 'ওদের মত হারানোর খুব বেশি সময় আমাদের নেই। তাছাড়া এটা তৈরি করতে কয়েক লাখ ডলার খরচ হয়েছে।'

'তাতে কি এল আর গেল,' আবার চেঁচিয়ে উঠলাম,' টাকাটা ত আপনার পকেট থেকে যায়নি।'

'টাকাটাই কি সব?' অদ্ভুত চাইনি ফুটল অ্যামসের চোখে, 'এ প্লেন আমার হাতে তৈরি, এর নকশাও আমার তৈরি।'

উইন্ডস্ক্রিণের দিকে তাকাতে দেখি আমরা আরও নিচে নেমে এসেছি, আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সমুদ্র উঠে আসছে। দূরত্ব একশ ফিটে নেমে আসার খানিক বাদে প্লেনের ডানদিকের ডানাটা আছড়ে পড়ল জলে। সঙ্গে সঙ্গে প্লেন অর্দ্ধেকটা কাত হয়ে পড়ল সেদিকে। প্লেনের ডানদিকটা এইমুহূর্তে জলের নিচে, বাঁদিকের ডানাটা কিম্ভূত চেহারা নিয়ে জল থেকে নাক উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। নিচের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম জল ঢুকছে কেবিনে, আমাদের জুতো তলিয়ে গেছে জলের নিচে। এখন প্রাণ বাঁচাতে হলে বাইরে বেরোনো ছাড়া আর কোন পথই নেই।

বেরোতে গিয়ে দেখা দিল আরেক বিপত্তি, কেবিনের দরজা, এমার্জেন্সি দরজা, সব এমন শক্ত করে এঁটে বসেছে যে ডিনামাইট ফাটলেও খুলবেনা।

'সবগুলো দরজা জ্যাম হয়ে এঁটে বসেছে।' বলে অ্যামস পাশ থেকে একটা বড় রেন্চ তুলে সামনে উইণ্ডস্ক্রিণে প্রাণপণে এক ঘা মারল, এক ঘায়েই কাঁচের বাঁদিকে একজন মানুষ গলে যাবার মত গর্ত তৈরি হল। রেন্চ ফেলে লাইফ জ্যাকেট সে ছুঁড়ে দিল আমার গায়ে।

'ঠিক আছে।' বলল অ্যামস, 'এবার ঐ গর্ত দিয়ে গলে বেরিয়ে যান।'

'তা কি হয়?' হেসে বললাম, 'সমুদ্রের কিছু নিয়ম মানতে হয়—ক্যাপ্টেন সবার শেষে জাহাজ ছাড়ে। আগে আপনি যান।'

'আপনার মাথা খারাপ?' চেঁচিয়ে উঠল অ্যামস, 'কেটে দু'ভাগ না করলে এই লাশ নিয়ে ঐটুকু গর্ত দিয়ে আমি বেরোব কি করে?'

'যতটা বলছেন ততবড় লাশ আপনার নয়,' আমি বললাম, 'আপনাকে তুলে ঐ গর্ত দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

আচমকা আমার কথা শেষ হতেই মুচকি হাসল অ্যামস। আমায় আগেই হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল—মাথায় শয়তানি চাপলেই যে ও এমনি ধূর্ত নেকড়ের মত হাসে তা আমার বোঝা উচিত ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শক্ত কিছু দিয়ে অ্যামস বেদম এক ঘা বসাল আমার মাথায়। বেদম চোট খেয়ে মাথাটা ভারি হয়ে উঠল, অতীতের ঘটা ঘটনা স্বপ্নের মত ভাসতে শুরু করল মনের পর্দায়। বেশ টের পেলাম আমার মাথাটা দু'হাতে চেপে উইন্ডস্ক্রিণের বাঁদিকে সেই গর্তের ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিল অ্যামস সেইসঙ্গে পেছন থেকে মারল বেজায় জোরে ধাক্কা। ট্যারাব্যাঁকা ফাটা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোর ঘষটে গিয়ে জ্বলে পুড়ে যাবার অনুভূতি টের পেলাম মুখের চামড়ায়। ধাক্কা খেয়েও জলে পড়লাম না, তার বদলে এসে পড়লাম আকাশের দিকে নাক তুলে থাকা বাঁদিকের ডানার ওপর।

'অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা!' বাঁদিকের ডানায় ভর দিয়ে কোনরকমে ভেতরে ভাঙ্গা কাঁচের গর্তের কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এক বাপের ব্যাটা হোস ত এগিয়ে আয়রে খানকির বাচ্চা। তোর জান নিয়ে তারপরে আমি ডুবব, তার আগে নয়! সাহস থাকে ত এগিয়ে আয়, ডবল খানকির বাচ্চা!'

অ্যামসের সাড়া শব্দ পেলাম না, তাকে গালিগালাজ করার পরপরেই প্লেনখানা পুরোপুরি কাত হয়ে পড়ল। বাঁদিকের ডানা ভেঙ্গে কয়েক টুকরো হল, একটা টুকরো আমায়

প্রচণ্ড জোরে তুলে ছুঁড়ে ফেলল জলে। জ্ঞান হারাবার আগে দু'হাতে লাইফ জ্যাকেট জড়িয়ে বালিশের মত তাতে মাথা রাখলাম এটুকু মনে আছে।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম আমি শুয়ে আছি হাসপাতালের বিছানায়। শুনলাম ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোয় ক্ষতবিক্ষত আমার মুখের চামড়া তুলে সেখানে নতুন চমড়া বসানো হয়েছে, নতুন চামড়া বসানোর আগে মুখের চামড়ায় বেঁধা দানার মত অসংখ্য কাঁচের গুঁড়ো তুলতে হয়েছে সার্জনকে। মুখের একটি মাংসপেশিরও তেমন ক্ষতি হয়নি, শুধু মুখের চামড়ায় ওপরের দিক আঘাতের ফলে কিছুটা বিকৃত হয়েছিল। আমায় সি-প্লেনের যে ক'জন 'ক্রু' প্যারাসুট নিয়ে বাইরে লাফিয়েছিল শুনলাম তারা সবাই অক্ষতদেহে আছে। কিন্তু অ্যামস আমায় মারধর করে প্লেন থেকে ফেলে দেবার পরে নিজে প্রাণে বাঁচেনি, প্লেনের ভেতরটা সমুদ্রের জলে কানায় কানায় ভরে যাবার পরে কো-পাইলটের সিটে বসা অবস্থায় তার সলিল সমাধি ঘটেছে। এও শুনলাম লাইফ বেলট সমেত অজ্ঞান অবস্থায় জলে ভাসতে দেখে একজন গরীব জেলে তার মাছধরা নৌকোয় আমায় তুলে নেয়, পরে সেই আমায় হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করে। চোখ মেলার পর থেকে দেখছি আমার ডান-পা আর ডানদিকের কোমরে ট্র্যাকশান আঁটা, কোথায় চোট লেগেছে প্রশ্ন করতে নার্সদের একজন বলেছেন যে নেহাতই বরাতজোরে আমি বেঁচে গেছি। আমার ডানপায়ের হাড় তিনজায়গায় ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে কোমরের ডানদিকের হাড়, সেইসঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে ডানদিকের কয়েকটা পাঁজরাও। চোখ, নাক, আর ঠোঁট ছাড়া আমার গোটা মুখ পুরু ব্যাণ্ডেজে মোড়া, কোমর থেকে পা পর্যন্ত আটক ট্র্যাকশনের কপিকলের খাঁচায়। তবু প্রাণে বেঁচে আছি এই ঢের।

বাবার আমলের খাস আর্দালি রোবেয়ার হাসপাতালে প্রায়ই আমায় দেখতে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে ক'দিনের জমানো খবরের কাগজ। ঐসব কাগজে চোখ বুলিয়ে জাপানের শর্তাধীন আত্মসমর্পণের কথা জেনেছি, জেনেছি বিজ্ঞানের উন্নতির নামে পারমাণবিক মহাশক্তিকে বোমায় পরিণত করে বিজয়ী মিত্রপক্ষ কিভাবে নির্লজ্জের মত সেদেশের দুটো শহরকে ছাই করে ফেলেছে! মুখের ব্যাণ্ডেজ খোলার পরে রোবেয়ারের মুখ থেকে শুনলাম এতদিনে আমায় নাকি হুবহু আমার বাবার মত দেখাচ্ছে। শুনে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। শুধু চেহারা নয়, বাবার স্বভাবের কোনও বৈশিষ্ট্য যাতে আমার ব্যক্তিত্বে বাসা না বাঁধে জীবনভর সেই চেষ্টাই আমি প্রাণপণে করেছি। কিন্তু করলে কি হবে, যে রক্তস্রোত দিনরাত বয়ে চলেছে আমার শিরায় তার সঙ্গে তিনি যে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, সে ত আমার ব্যক্তিত্বে তাঁর যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ আমার জন্মমুহূর্তেই দাগিয়ে দিয়েছে।

১৯

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলাম। রোবেয়ার আমায় বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে, জিনিসপত্র সব গুছিয়ে একটা বড় চামড়ার ঝোলায় ভরেছে। হুইলচেয়ারে বসে আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি ঠিক এমনই সময় কেবিনের দরজা গেল খুলে, বাইরে থেকে ভেসে এল চেনা গলা, 'কোথায় গো, জুনিয়র?'

গলা শুনে আবেগে দু'চোখ জলে ভরে এল, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল নেভাদা, নেভাদা স্মিথ।

'কেমন আছো, জুনিয়র?' বলতে বলতে এগিয়ে এল নেভাদা, 'একি তোমার চোখে জল কেন?'

'এ কিছু নয়,' চোখ মুছে বললাম, 'কিন্তু তুমি হঠাৎ এখানে কি মনে করে বলো ত? ব্যাপার কি?'

'তোমায় বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলাম, জুনিয়র,' হাসল নেভাদা।

কান্না ভুলে গিয়ে এবার আমিও হাসলাম। নেভাদা ততক্ষণে আমার জিনিসপত্র গোছগাছের ব্যাপারে হাত লাগিয়েছে রোবেয়ারের সঙ্গে। দেখে আমার খারাপ লাগল—ছোটবেলায় নেভাদাকে আমাদের কাজের লোকেদের একজন বলেই জানতাম। বড় হবার পরে সেই নেভাদা আমারই চোখের সামনে কিভাবে ওয়েস্টার্ণ ফিল্মের নামজাদা হিরো হয়েছে তা দেখেছি নিজের চোখে।

'তুমি আবার ওগুলো নিয়ে পড়লে কেন, নেভাদা,' বাধা দিয়ে বললাম, 'ওসব রোবেয়ারের কাজ, ওকেই করতে দাও।'

'পুরোনো দিনের টানে আবার ফিরে এলাম, মিঃ জোনাস,' হাসল নেভাদা, 'বিশ্বযুদ্ধ শেষ, সেইসঙ্গে আমায় ওয়েস্টার্ন শো-ও শীতকাল পর্যন্ত বন্ধ। কাজকর্ম কিছু না করলে হাত পা একদম জমে যায়। এই লম্বা ছুটিটা কাজে লাগানোর কথা মনে হতে চলে এলাম। মার্থা, আমার গিন্নি দেখলাম সেও তাই চায়। মার্থাকে সঙ্গে এনেছি, ও এখন ওবাড়িতে জিনিসপত্র সব গোছগাছ করছে, খানিকবাদে ঢুকবে রান্নাঘরে।'

হাসপাতাল থেকে সোজা চলে এলাম অফিসে। ম্যাক অ্যালিস্টার একগাদা জরুরি কাগজপত্র সাজিয়ে বসেছিলেন, অ্যাদ্দিন বাদে আমায় হাতে পেয়ে পরপর অনেকগুলো সই করিয়ে নিলেন। শেষ দলিলে সই করতে করতে বিকেল চারটে বাজল। মুখ তুলে বললাম, 'আর কি বাকি রইল?'

'আর একটা জিনিস তোমায় দেখানো বাকি,' বলে ম্যাক দেয়ালের কাছে টেবলের ধার ঘেঁষে দাঁড়ালেন। টেবলের ওপর একটা বড়সড় বাক্স রাখা তার গায়ে আঁটা একফালি কাঁচ, জিনিসটা দেখতে অনেকটা রেডিওর মত।

'এটা আবার কি মশাই?' আমি জানতে চাইলাম।

'এটা হল কর্ড ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির তৈরি প্রথম মাল,' ম্যাক বললেন, 'এর নাম টেলিভিশন।'

'টেলিভিশান?' অবাক হয়ে বললাম, 'সেটা কি জিনিস?'

'রেডিওর আরও উন্নত সংস্করণ,' ম্যাক জবাব দিলেন, 'এতে শুধু কথাই না, বক্তার ছবিও বাতাসের ভেতর দিয়ে পাঠানো হয়, তারপরে ধপধপে সাদা পর্দার বুকে সেসব ছবি ফুটে ওঠে, বাড়িতে দেখানো ফিল্ম বা 'হোম মুভিজ'-এর মত।'

'বুঝেছি,' আমি হাসলাম, 'এই বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকে ডুপন্ট ত এ জিনিস নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে, কিন্তু কাজ কিছু হয়নি।'

'তখন হয়নি।' ম্যাক বললেন, 'কিন্তু পরীক্ষা সফল হবার পরে যেসব প্রতিষ্ঠান রেডিও আর ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি তৈরি করত তারা সবাই ওই টেলিভিশন তৈরির বাজারে এখন হামলে পড়েছে। আর সি ও, কলম্বিয়া, এমার্সন, জিন, ফিলকো, ফিলিপস, কেউ বাদ নেই। একবার চালিয়ে দেখাব?'

'নিশ্চয়ই।'

ম্যাক অ্যালিস্টার জানালার কাছে গিয়ে বাক্সটায় একটা নব ঘোরাতেই বিজলির মত বৈদ্যুতিক আলো প্রথমে ঝলসে উঠল কাঁচের পর্দার বুকে, এরপরে গাদাগাদা গোলাকার বৃত্ত আর রেখা ফুটল সেখানে। তারপরে ফুটল লেখাটা, 'কর্ড ইলেকট্রনিকসের প্রযোজনায়—' এক মুহূর্ত কাটতে না কাটতে রঙিন চলন্ত ছবি ফুটে উঠল লেখার ওপরে, ঘোড়ার পিঠে চেপে অল্পবয়সী এক সুপুরুষ যুবক দূর থেকে ছুটে আসছে ক্যামেরার দিকে। আরও কাছাকাছি আসতে ঘোড়ার পিঠে বসা সওয়ারকে চিনতে কষ্ট হলনা—নেভাদা, এই মুহূর্তে যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আচমকা বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ল এত নেভাদারই সেই আকাশ কাঁপানো বিখ্যাত ছবি 'পলাতক'-এর অংশ। পুরো পাঁচ মিনিট কারও মুখে টুশব্দটি নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে দেখলাম অতীতের সেই দুর্দ্ধর্ষ শিল্পকর্মের কয়েকটি দৃশ্য।

'দ্যাখো কাণ্ড!' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বলল নেভাদা, 'কতবছর দেখতে দেখতে কেটে গেল, এখন ওসব ভাবলে মনে হয় স্বপ্ন।' আড়চোখে রোবেয়ারের দিকে তাকাতে দেখি তার কুচকুচে কালো মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিঃ জোনাস, এ যে দেখছি সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার। এবার থেকে তাহলে বাড়ি বসেই ভাল ভাল ফিল্ম দেখতে পাব, বেশি পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে নিগ্রো ভাইদের হলে ঢোকার আর দরকার হবে না।'

'এবার বুঝতে পারছি কেন ওরা আমার পুরোনো ছবিগুলো কিনতে শুরু করেছে,' চাপাগলায় বলল নেভাদা, 'তার মানে?' তার চোখের দিকে তাকালাম, 'অ্যাদ্দিন পরে এলেই যখন তখন একটু ঝেড়ে কাশো না বাপু?'

'মোট নব্বুইখানা ওয়েস্টার্ণ ছবি আমরা তুলেছিলাম, মনে পড়ে?' নেভাদা শুধোলো। 'ছবিগুলোর মালিক এখন আমি একা।'

'ঠিক তাই,' ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললাম।

'ঐসব ছবি কেনার জন্য কিছু লোক ক্ষেপে উঠেছে,' বলল নেভাদা, 'ছবি পিছু আমায় পাঁচ হাজার ডলার দিতে চাইছে।'

'তাই নাকি?' হেসে বললাম, 'নেভাদা তোমার পাল্লায় পড়ে ফিল্মের কারবারেও ত আমার টাকা ঢালতে হয়েছে। তা সেই কারবার করতে গিয়ে এটাই শিখেছি যে ভাড়া খাটিয়ে ভাল টাকা পাওয়া যায় এমন কোনও জিনিস কখনও বিক্রি করতে নেই।'

'তার মানে আগে সিনেমা হলগুলোতে দেখানোর জন্য যেমন ফিল্ম ভাড়া দিয়েছি এইসব রাতারাতি গজিয়ে ওঠা টেলিভিসান কোম্পানিগুলোকেও তেমনই ওগুলো ভাড়া দিতে বলছ?'

'ঠিক তাই,' আমি বললাম, 'এসব কোম্পানির ধাত আমার মত ভাল কম লোকই জানে। তোমার কাছ থেকে একটা ছবি পাঁচ হাজারে ওদের কেনার মানে দাঁড়ায় সে ছবি টিভিতে দেখিয়ে কম করে পঞ্চাশ হাজার ডলার মুনাফা করার মতলব ওরা আগেই করেছে।'

'কিন্তু এসব দর বাড়ানোর কারবারের কোনও অভিজ্ঞতা যে আমার নেই, জোনাস,' বলেই নেভাদা তাকাল আমার উকিল ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে, 'ম্যাক, আপনি আমার এই উপকারটুকু করবেন?'

'করব, নেভাদা,' মুচকি হেসে বললেন প্রৌঢ় ম্যাকঅ্যালিস্টার।

বিকেলের পড়ন্তবেলায় রোদ এসে পড়েছে পেছনের বারান্দায়, সেই রোদে বসে অস্তগামী সূর্যের শোভা দেখছি দু'চোখ ভরে। খানিক বাদে নেভাদা এসে একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল। ছুরি দিয়ে আখের কাটা টুকরো চেঁছে মুখে পুরে চিবুতে লাগল আরাম করে। তারপরে চিবুনো ছিবড়েগুলো মেঝেতে ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'অনেকদিন আগে একদিন রাতের বেলা তোমার বাবা আর আমি এই বারান্দায় এমনই মুখোমুখি বসেছিলাম। অনেকক্ষণ কথা বলার পরে আচমকা তোমার বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'নেভাদা, হঠাৎ আমার কিছু একটা হয়ে গেলে ছেলেটাকে দেখো, কেমন? জোনাস বড্ড ভাল ছেলে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেলেই ওর চর্বি বাড়ে আর তখনই পাল্লা দিয়ে বাড়ে ওর মাগিবাজি। এছাড়া আর কোনও দোষ ওর ধাতে নেই। আমি জানি একদিন ও খুব বড় হয়ে ওর বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে। তুমি ত জানো, নেভাদা, আমার ঐ একটাই মা মরা ছেলে, কত ভালবাসি ওকে, তা ও জানো। ও ছাড়া আমার নিজের বলতে আর কেইবা আছে বলো।'

'অ্যাদ্দিন পড়ে আমার বাবার গুণ আর গাইতে এসো না, নেভাদা,' নিজের গলা নিজের কানে বিকৃত শোনাল, 'এত ভালবাসতেন বলেই হয়ত উনি আমার প্রেমিকাকে দেখে আর লোভ সামলাতে পারেন নি, নিজেই তাকে বিয়ে করে বসেছিলেন।'

'হয়ত তোমার ভালর জন্যই উনি তা করেছিলেন, জোনাস,' সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল নেভাদা, 'হয়ত রিণা তোমার স্ত্রী হবার উপযুক্ত নয় বুঝেই তিনি রাজী করেছিলেন।'

'কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ আজই বা তুমি এসব কথা আবার তুলছ কেন?'

'তার কারণ একটু আগেই বলেছি, 'রেড ইণ্ডিয়ানের বন্য চাউনি মেলে আমার দিকে তাকাল নেভাদা, 'তোমার বাবা তোমায় দেখ্‌ভাল করার দায়িত্ব সঁপে দিয়েছিলেন আমার হাতে। তুমি সত্যিসত্যি কতটা মানুষ হতে পেরেছো, তা আমি খুব কাছ থেকে নিজের চোখে দেখেছি। ভেবেছিলাম তুমি সত্যিই পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছো, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি আমার সে দেখা ভুল, তুমি তা হওনি। সব দেখেশুনে তোমার বাবার মত জীবনে দ্বিতীয়বার আর ভুল করার সাধ আমার নেই।'

নেভাদার কথা শেষ হতে তার বৌ মার্থা এল আমার চা নিয়ে, আখের ছিবড়ে ছিটিয়ে বারান্দা নোংরা করতে নেভাদাকে মানা করল সে আমারই সামনে। বৌয়ের কথায় লজ্জা পেল নেভাদা। চিবুনো ছিবরেগুলো মেঝে থেকে তুলে পেছনের ঝোপে ফেলে দিতে সবে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে সে, ঠিক তখনই একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল মোরাম বিছানো পথে, দরজা খুলে ভেতর থেকে মেয়ে জো-অ্যানকে নিয়ে নেমে এল মণিকা।

'আরে, কি খবর!' খানিক আগের ভেতরে জমে ওঠা সব তিক্ততা তাদের দু'জনকে দেখে নিমেষে উধাও হল, লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে তাদের ভেতরে আসার আহ্বান জানালাম।

মণিকার মুখ থেকে শুনলাম অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে ও ক্যালিফোর্ণিয়ায় ফিরে এসেছে। নিউইয়র্কে যাবার ট্রেন ছাড়তে সন্ধে সাতটায় তার আগে আমার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে চায়। বুঝলাম কথা বলার ফাঁকে মণিকা ওর বাপ অ্যামস উইনথর্প সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিতে চায়।

মণিকা অল্প কিছুক্ষণের জন্য এসেছে শুনে মার্থা আর নেভাদা কর্তা গিন্নি একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে ইশারায় কি যেন বলাবলি করল। খানিক বাদে নেভাদা জো-অ্যানের সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'খুব ভাল সময়ে এসেছো, দিদিভাই। একটা নতুন ঘোড়া সবে দু'দিন আগে খোঁয়াড়ে পুরেছি, তোমার মত এক সুন্দরীকে পিঠে তোলার জন্য বেচারা ছটফট করছে। এসেছো যখন তখন চলো ঘোড়ায় চড়াটা তোমায় নিজে হাতে শিখিয়ে দিই।'

কিছু ওয়েস্টার্ন ছবিতে নায়কের ভূমিকায় নেভাদাকে যে অভিনয় করতে দেখেছে জো-অ্যান তার খুশিতে ঝলমল চোখের চাউনিতে তা ফুটে উঠল, নির্বাক ওয়েস্টার্ন ছবির নায়ক নেভাদা স্মিথ নিজে তাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাতে চাইছে এমন রোম্যান্টিক মুহূর্ত তার মত এক চোদ্দ বছরের বাচ্চা মেয়ের কাছে জীবন্ত স্বপ্ন। মার্থা যেন এসবের জন্য তৈরি ছিল, মণিকার মেয়ের ভাল পোষাক ছাড়িয়ে একখানা পুরোনো আধময়লা পোষাক নিয়ে এসে তাকে পরতে দিল।

ফিতে খুলে পনিটেল চুল মাথার পেছনে বাঁধল জো-অ্যান, তারপরে ছুটল নেভাদার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া শিখতে।

'তোমার মেয়ে ত দিব্যি বেড়ে উঠছে,' মণিকাকে বললাম, 'বড় হলে ওকে খুব সুন্দর দেখতে হবে।'

'মেয়েরা ছেলেদের চাইতে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে,' মণিকা বলল।

অ্যামসের সঙ্গে শেষ কয়েকঘণ্টা কাটানোর অভিজ্ঞতা, বেকায়দায় পেয়ে আমায় আঘাত করে সি-প্লেন থেকে বাইরে ফেলে দেয়া, সব ঘটনা মণিকাকে খুলে বললাম। গম্ভীর মুখে সব শুনল মণিকা, জ্যান্ত অবস্থায় সলিলসমাধি ঘটেছে শুনেও বাপের জন্য একফোঁটা চোখের জল সে ফেলল না। 'বাবার কথা ভাবলে এখন আমার আর কান্না পায় না, জোনাস।' মণিকা বলল, 'জীবনভর ওঁর জন্য অনেক কেঁদেছি আমি। একটা কথা বলতে পারি, তোমার সাফল্য আর সৌভাগ্যকে সারাজীবন ঈর্ষা করেছেন বলেই বাবা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি, তোমায় খুন করতে গিয়েছিলেন! তোমার যে দারুণ ক্ষতি বাবা করেছিলেন, তা শোধরানোর কথা মনে এসেছিল, ভেবেছিলেন তোমায় খুন করলে বিবেকের জ্বালা থেকে রেহাই পাবেন।'

'কি বলছ তুমি?' অবাক হয়ে তাকালাম মণিকার মুখের দিকে, 'তোমার বাবা আমার কি ক্ষতি করেছিলেন? ব্যবসার বাইরে আমাদের দু'জনের মধ্যে আর কোনও সম্পর্ক ছিল না।'

'কি ক্ষতি করেছিলেন সত্যিই বুঝতে পারছো না?' অদ্ভুত চোখে মণিকা তাকাল আমার দিকে, 'নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করছ?'

'সত্যিই বুঝতে পারছিনা, বিশ্বাস করো।'

'তাহলে আর কোনওদিনই তা বুঝতে পারবে বলে আমার মনে হয়না।' অভিমানের সুরে কথাগুলো বলে বারান্দার শেষপ্রান্তে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল মণিকা। দূর থেকে জো-অ্যানের জোরগলার হাসি কানে এল। নেভাদার মত শেখানোর লোক পেয়ে ঘোড়ায় চড়তে ওর খুব ভাল লাগছে বুঝতে পারছি।

'তোমার বেটি তো দেখছি ঘোড়সওয়ার হয়েই জন্মেছে!' আড়চোখে মণিকার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'না হবার কি আছে, শুনি?' জবাব দিল মণিকা 'ঘোড়সওয়ারের রক্ত

শরীরে নিয়েই ত জন্মেছে তাই এবার নিজেও ঐরকম হয়ে উঠেছে।'

'তাই নাকি!' এবাব আমার অবাক হবার পালা, 'তুমি যে ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারো তা তো আগে জানতাম না।'

'আমিই ওর একমাত্র অভিভাবক নই,' আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মণিকা, সে যে ভেতবে ভেতরে বেশ রেগে গেছে তা তাব চাউনি আর গলা শুনেই বুঝতে পারছি। খানিকবাদে পুবোনো আমলেব গাড়িব হর্ণ কানে আসতে বুঝলাম ডঃ হ্যানলি আমার নিয়মিত চেক আপ করতে এসেছেন। ঘোড়ায় খোঁয়াড়ের কাছে গাড়ি দাঁড় করালেন ডঃ হ্যানলি, পবে হেঁটে এগিয়ে আসতে লাগলেন বারান্দার দিকে।

'ডঃ হ্যানলি এসেছেন আমার চেক আপ করতে,' আমি বললাম, 'তাহলে আর তোমায় আটকে বাখবনা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল মণিকা, 'এখান থেকেই আমরা বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে।' বলে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে খোঁয়াডেব দিকে এগিয়ে গেল সে। 'একটু অপেক্ষা কবো মণিকা,' পেছন থেকে বললাম, 'রোবেয়ার তোমাদের ট্রেনে তুলে দিতে সঙ্গে যাবে।'

'থাক্, তার দবকাব হবে না।' রাগতভাবে জবাব দিযে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল সে, দেখলাম ডঃ হ্যানলিকে কি যেন বলছে। আচমকা মণিকা আমার ওপর কেন চটে গেল বুঝতে না পেবে বাবাব স্টাডিতে এলাম, কৌচে গা এলিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ল মণিকার ধাত ববাবর একইরকম রয়ে গেল, যখন তখন কারণে অকারণে মাথা গরম করে ফেলে। আমার চেয়ে বয়সে সাত বছরের ছোট মণিকা, সেই হিসেবে ধরলে আমার বয়স এখন চলছে একচল্লিশ, তাহলে ওর মাত্র চৌত্রিশ। খানিক আগে মেজাজ দেখিয়ে ছোট সরু নাক তুলে চলে যাবাব সময়ে কি অপরূপ দেখাচ্ছিল ভাষায বর্ণনা করা যায় না।

ডঃ হ্যানলিকে নিযে মুশকিল একটাই, একবার কথা শুরু কবলে উনি আর থামতে জানেন না। সন্ধে সোযা দু'টো নাগাদ চেক-আপ শেষ করে বললেন, 'আপনার পায়ের অবস্থা এখন যথেষ্ট ভাল। মিঃ কর্ড, আগের চেয়ে অনেক সেরে উঠেছেন।'

'তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে,' জানতে চাইলাম, 'কবে থেকে লাঠি ছাড়া আগের মত হাঁটা চলা শুরু কবতে পারব সেটা বলুন।'

'তা যদি জানতে চান বলব এখুনি এই মুহূর্তে আপনি আবার আগের মত হাঁটাচলা শুরু কবতে পারেন।' বাইফোক্যাল চশমার নিচের কাঁচের ওপাশ থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন ডঃ হ্যানলি বলেই নিমেষে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন তিনি। 'আপনার মেয়েকে দেখলাম, মিঃ কর্ড, খাসা দেখতে হয়েছে। যেমন সুন্দর নাক, চোখের গড়ন, তেমনই সুন্দর স্বাস্থ্য। এইটুকু বয়সে কি চমৎকার ঘোড়া ছোটালো! বাঃ! চমৎকার!'

'আমার মেয়ে হবে কেন?' মনে মনে প্রমাদ গুণলাম, 'ও মণিকার মেয়ে, তবে ওর বাবা আমি নই।'

'একি বলছেন মিঃ কর্ড!' ডঃ হ্যানলি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'ঐ মেয়ে জো-অ্যানের জন্ম ত আমারই হাতে। ওর জন্মের ক'দিন আগে ওর মা মণিকার নিয়মিত চেক আপ আমি নিজে হাতে করেছি। স্পষ্ট মনে আছে মণিকা সেবারে আমায় চুপিচুপি বলেছিল আপনার

সঙ্গে বিয়ের ঠিক পনেরো দিনের মাথায় ঐ মেয়ে ওর পেটে আসে। আজ আপনি ঐ মেয়ের বাবা নন বললেই আমি মানব কেন? একি সব্বনেশে কথা মশাই, বাবা হয়ে নিজের মেয়েকে চিনতে পারছেন না। তাকে মেনে নিচ্ছেন না? ছিঃ। ছিঃ। ছিঃ মিঃ কর্ড, এসব কথা আপনার মুখে মানায় না, কতবড় মানুষের একমাত্র ছেলে আপনি। ছিঃ। আমি ত ভাবতেই পারছিনা।' বলতে বলতে ডঃ হ্যানলি বাক্স হাতে ঝুলিয়ে চলে গেলেন। আমি পড়লাম সমস্যায়। এতদিন বাদে ডঃ হ্যানলি একি নিদারুণ সত্য উদঘাটন করলেন আমার সামনে। জো-অ্যান আমার মেয়ে? আমি তার বাবা? হা ভগবান মণিকা এসব কথা নিজেমুখে এতদিন আমায় বলেনি কেন?

নেভাদা ঘোড়াকে খোঁয়াড়ে তুলে রান্নাঘরে গিন্নির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে, তাকে ডেকে এনে সব বললাম। শুনে তার খুশি আর ধরে না। আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, 'জোনাস, আর দেরি কোরনা। নিউইয়র্কের ট্রেন ছাড়তে এখনও দেরি আছে, তার আগে মণিকা আর তার মেয়েকে এখুনি ফিরিয়ে নিয়ে এস।'

স্টেশনের ওয়েটিংরুমের টেলিফোন নম্বর দিয়ে গিয়েছিল মণিকা, ডায়াল ঘুরিয়ে নাম বলতেই আর্দালি ডেকে দিল। উল্টোদিক থেকে তার গলা কানে আসতেই বললাম, 'মণিকা, আমি জোনাস বলছি। শোন, তোমাদের নিউইয়র্ক যাওয়া হবেনা। নেভাদা আর রোবেয়ার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, তুমি মেয়েকে নিয়ে ওদের সঙ্গে এক্ষুণি ফিরে এসো।'

'সে কি!' মণিকার হাসি স্পষ্ট ভেসে এল, 'হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিলে যে বড়। ব্যাপার কি?'

'আর লজ্জা দিওনা মণিকা, খানিক আগে ডঃ হ্যানলি নিজেমুখে বলে গেছেন জো-অ্যান আমারই মেয়ে। এবার বুঝতে পারছি তোমার বাবা অ্যামস আমার কি ক্ষতি করেছিলেন, তোমার পেটে আমার বাচ্চাকে জোর গলায় অবৈধ বলে আমার কাছ থেকে মোটা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিলেন। কিন্তু তুমি নিজে ত তখন রুখে দাঁড়াওনি, মণিকা, কথাটা এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন?'

'আমার বাবা তোমায় খুন করতে গিয়েছিলেন, জোনাস,' ধরা গলায় বলল মণিকা, 'রুখে দাঁড়ালে তিনি আমাকেও খুন করতেন। জীবনে যে এত মেয়ে ঘেঁটেছে সে নিজের মেয়েকে ঠিক চিনতে পারবে এটাই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম আমার সে ধারণা ভুল। ছোটবেলায় জো অ্যান বলত ওর একটা ছোট ভাই থাকলে বেশ হত,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল মণিকা।

'হবে বাপু, তাই হবে, আগে ফিরে এসো মেয়েকে নিয়ে,' কোনোরকমে হাসি চেপে লাইন ছেড়ে দিলাম, বাবার বাঁধানো ছবির উদ্দেশে বললাম, 'কেমন, বড়সাহেব, কাজটা পছন্দ হল ত?'

মনে হল বাবার দু'চোখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

অনুবাদ ☐ শুভদেব চক্রবর্তী